বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ------- কলিকাতা

গ্রন্থাবলী সিরিজ

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত

Ashutosh Bhattacharya.

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

সূচি-পত্র

১। কাঞ্চনমালা ... ১

২। বাল্মীকির জয় ... ৪৭

৩। ভারত-মাহলা ... ৭৯

৪। বেণের মেয়ে ... ১০৫

৫। মেঘদূত ... ১৯৭

৬। বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনা ... ২২৫

১। বাঙ্গালা ভাষা ... „

২। বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা-সাহিত্য ... ২৩২

৩। নূতন কথা গড়া ... ২৪৬

৪। বাঙ্গালা ভাষার পরিণতি ... ২৪৯

৫। মুসলমানী বাঙ্গালা ... ২৫৩

৬। কবি-পরিচয় ... ২৫৬

৭। সাহিত্য-সমালোচনা ... ২৬১

১। কালিদাস ও সেক্ষপীয়র ... „

২। শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন ? ... ২৬৯

৩। ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার ... ২৭৪

৪। বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি ... ২৭৮

৫। বেদ ও বেদব্যাখ্যা ... ২৮৬

৮। ঐতিহাসিক নিবন্ধ-মালা ... ২৯১

১। গৌরবের দুই সময় ... „

২। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ... ৩০১

৩। কলিকাতা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ... ৩০৬

৯। শিক্ষা-সন্দর্ভ ... ৩১০

১। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ... „

২। শিক্ষা ... ৩১৫

৩। "সাবেক মনুষ্যত্ব" ও "হালের সাইন করা" ৩১৮

৪। কালেজী শিক্ষা ... ৩২১

৫। ভট্টাচার্য্যবিদায়-প্রণালী ... ৩২৫

১০। সমাজ-সংস্কার নিবন্ধরাজি ... ৩২৯

১। সমাজের পরিবর্ত্ত কয় রূপ ... „

২। স্ত্রী-বিপ্লব ... ৩৩৫

৩। তৈলদান ... ৩৩৮

১১। মোহিনী (খণ্ডকাব্য) ... ৩৪১

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কাঞ্চনমালা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই প্রণীত

ভূমিকা

১২৯০ সালে যখন ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গদর্শনে"র সম্পাদক, তখন "কাঞ্চনমালা" "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশ হইয়াছিল। তাহার পর নানাকারণে আমি অনেক দিন ধরিয়া বাঙ্গালা লিখি নাই; সুতরাং "কাঞ্চনমালা" প্রকাশের জন্য যত্ন করি নাই। এত কালের পর আধুলি-গ্রন্থমালা-প্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহা পুনরায় প্রকাশ করিতে চাওয়ায় আবার প্রকাশ করা গেল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লেখা হইয়াছিল, তাঁহাদের নাতিরা এই পুস্তক কি চক্ষে দেখিবেন, বলিতে পারি না।

২৬ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১লা ফাল্গুন, ১৩২২

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কাঞ্চনমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুইটি ফুল, সমান ফুটিয়াছে, সমান হাসিতেছে, গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। পাশাপাশি ফুটিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গন্ধ ছড়াইতেছে, আর হাসিভরে একবার এ ওর গায়ে পড়িতেছে, একবার ও এর গায়ে পড়িতেছে। একবার এ উহাকে পাপড়ী দিয়া মারিতেছে, ও আবার তাহার শোধ দিতেছে। বাতাস ইহাকে উহার গায়ে ফেলিয়া দিতেছে। বাতাস থামিলে ও আবার ইহার গায়ে পড়িয়া সরিয়া যাইতেছে। কেমন সুন্দর! এরূপ সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমগন্ধামোদিত, সমান কুসুমদ্বয়ের মিলন কেমন সুন্দর!

আবার দুইটি পাখী,—সুন্দর, সুরস—সুকণ্ঠ,—সুপুষ্ট,—ও সুহৃষ্ট—যখন মদভরে খেলা করে, তখন উহারা কেমন সুন্দর! এই উড়িতেছে, এই পড়িতেছে, এই বসিতেছে, আবার উড়িতেছে, একবার দেখিতে না পাইলেই করুণস্বরে বন পূরিয়া ডাকিতেছে, আবার দেখা হইলেই ঠোক্রাইতেছে, কেমন? এমন দুটি পাখীর মিল কেমন সুন্দর!

পাখী ও ফুলের মিল সুন্দর বটে, কিন্তু যদি ঐরূপ সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি মানুষের মিল হয়, তাহার চেয়ে সুন্দর জিনিষ পৃথিবীতে আর আছে কি? সুন্দর—সুস্থ—সবল—সতেজ,—সুশিক্ষিত,—সুবংশজাত,—কলাকোবিদ দুট মানুষের যদি মিল হয়, তবে তাহা কবির বড় লোভনীয় হয়। তাহার উপর আবার যদি তাহাদের দুইটি হৃদয়ের মিল হয়, যদি সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি, হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মিল হইয়া যায়, তবে দেবতারাও তাহা স্বর্গ হইতে দেখেন।

এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি? হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমডোরে বাঁধা দেখিয়াছ কি? নয়নের আড় হইলে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায় দেখিয়াছ কি? নয়নে নয়নে এক হইলে প্রাণ কাড়িয়া লয় দেখিয়াছ কি? দেখিলে বাক্শক্তি থাকে না দেখিয়াছ কি? না দেখিলে সব অন্ধকার হয় দেখিয়াছ কি? নয় শরৎ-জ্যোৎস্না, কর্ণে সুধাধারা, স্পর্শে অমৃতহ্রদ, আ হৃদয়ে মহামোহ, এমন মিল দেখিয়াছ কি? অপা অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ বারিধির সহি- অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ আকাশের মিল দেখিয়াছ কি? তেমনি অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশির সহিত অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশির মিল দেখিয়াছ কি? যখন আবার সেই অপার, অগাধ, অনন্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশিদ্বয় পরস্পর সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়, তখন সেই অনন্ত সমুদ্রে আকাশস্পর্শী তরঙ্গ উঠে দেখিয়াছ কি? আবার যখন অদর্শনে অনন্ত আকাশে ভীষণ ঝটিকা উঠে, যখন ঝটিকায় অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত করে, তখন দেখিয়াছ কি?

দেখিবে কোথা হইতে? অবোধ মানুষ আহারের জ্বালায় ব্যস্ত, এরূপ দেবদুর্ল্লভ প্রেমরাশি কোথা হইতে দেখিবে? পৃথিবীতে অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশি কদাচ কখন মিলে বলিয়া কবিরা লেখেন বটে, কিন্তু কাজে মিলে না।

একবার মিলিয়াছিল। দুই হাজার বৎসর আগে পাটলীপুত্র নগরে একবার মিলিয়াছিল, সেইখানে একবার দেখিয়াছিলাম। এক দিন সন্ধ্যার সময়, গঙ্গার তীরে অশোক রাজার প্রমোদকাননে, এইরূপ দুইটি হৃদয় মিলিতে দেখিয়াছিলাম।

২

একটি রমণী, অপরটি পুরুষ। দাঁড়াইয়া মালা গাঁথিতেছেন। উভয়ের মধ্যে অগাধ পুষ্পরাশি; মল্লিকা, মালতী, যূথি, জাতি, সেফালিকারাশির দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই জনে মালা গাঁথিতেছেন। উভয়ের রূপরাশি পুষ্পরাশিতে প্রতিফলিত হইতেছে। পুষ্পরাশির রূপরাশি উভয়ের কমনীয় শরীর-প্রভায় প্রতিফলিত হইতেছে। জ্যোৎস্নাময় পুষ্পরাশিতে প্রেমিক-যুগলের জ্যোৎস্নাময় লাবণ্য পতিত হইয়া,

শাদার উপর শাদা, তাহার উপর শাদা মিশাইতেছে। তরল দীপ্তির উপর তরল দীপ্তি, তাহার উপর তরল দীপ্তি পড়িয়া মিশিয়া তরলতর তরলতম হইয়া যাইতেছে। যুবকের উজ্জ্বল, শ্যামল, দীর্ঘ কর্ণান্ত-বিশ্রান্ত নয়ন একবার মালায় আর একবার যুবতীর মুখে পড়িতেছে। নয়নের গতি কখন অলস, কখন চঞ্চল হইতেছে। অলস—অথচ মধুর; চঞ্চল—অথচ মধুর, সদাসর্ব্বদাই মধুর। দৃষ্টি "অলস বলিত মুগ্ধ স্নিগ্ধ নিস্পন্দ, মন্দ"; অলস অথচ মধুর; বলিত কুঞ্চিত, অথচ মধুর; মুগ্ধ—হৃদয়ের মোহ-ব্যঞ্জক,—অথচ মধুর, স্নিগ্ধ, স্নেহ-পরিপূর্ণ, অথচ মধুর; নিস্পন্দ, অথচ মধুর; মন্দ—ধীর গতি,—অথচ মধুর; ডাগর ডাগর চক্ষুর মধ্যে, গাঢ়ান্ধকার-মগ্ন স্থানের ভিতর দিয়া এক একবার বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে। প্রতিনয়ন-নিপাতে প্রণয়িনীর উপর স্নেহ, মমতা, প্রেম বিকীর্ণ করিতেছেন। নয়ন দিয়া হৃদয় যেন গলিয়া প্রাণেশ্বরীকে স্নান করাইয়া দিতেছে।

যুবতীও মুগ্ধ, সুন্দর ও কমনীয়। তিনি আপন মনে মালা গাঁথিতেছেন আর মনে মনে কি ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন, কেমন করিয়া জানিব? বোধ হয়, প্রাণনাথের অপরিমেয়, অজেয়, অক্ষুব্ধ প্রেমরাশির কথা ভাবিতেছেন। নহিলে তাঁহার কোমল, চিক্কণ, মার্জ্জিত মহামূল্য মণিমনোহর কপোলে মধ্যে মধ্যে রক্তিমোদয় হইতেছে কেন? তিনি এক একবার তাঁহার প্রিয়তমের দিকে চাহিতে-ছেন কেন? তাঁহার চাহনি বড় চমৎকার, তিনি চঞ্চলসুন্দরীর ন্যায় আড়ে আড়ে চাহিতেছেন না; একবার চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইতেছেন না; যখন চাহিতেছেন, উজ্জ্বল ও বৃহৎ চক্ষু মেলিয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিতেছেন; যেন একতানমনে প্রাণ ভরিয়া নয়নচকোরকে প্রিয় বক্ত্রসুধা পান করাইতেছেন।

তাঁহাদের কাজ দেখিয়া বোধ হইতেছে, একটু ত্বরা আছে, মালা গাঁথিতে দুই জনেই ক্ষিপ্রহস্ত। দেখিতে দেখিতে ফুল অর্দ্ধেক হইয়া দাঁড়াইল। তখন যুবক আপন হস্তস্থিত মালাগুলি যুবতীর মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে পরাইয়া দিলেন। সেই সময়ে যুবক রমণীর চিবুক ধরিয়া তুলিলে যুবতী দেখিলেন, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; যুবক দেখিলেন, মাটীতে চাঁদ উঠিয়াছে। দুই জনেই দেখিলেন, দুই জনেই মুগ্ধ হইলেন, নয়ন ভরিয়া দেখিলেন, তৃপ্ত হইলেন না। যুবক মুখ অবনত করিয়া আনিতেছেন, এমন সময় যুবতী হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"আকাশের দিকে দেখিতেছ না? আর যে বেলা নাই, মালা গাঁথিয়া শীঘ্র শীঘ্র সাজিয়া লইতে হইবে।"

যুবক "তা হোক্" বলিয়া বাহুযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া বারংবার যুবতীর বিম্ববিনিন্দিত, কোমল, মসৃণ, রসপরিপূর্ণ অধরের উপর আপনার বিম্ব-বিনিন্দিত, কোমল, মসৃণ, রসপরিপূর্ণ অধর স্থাপন করত তাঁহাকে ছাড়িয়া আবার মালা গাঁথিতে গেলেন। যুবতীও একটু অপ্রতিভ হইয়া আবার মালা গাঁথিতে গেলেন।

৩

মালা গাঁথিতেছেন। এক হস্তে সূচি ও সূত্র, অন্য হস্তে ফুল। টুপ্ টুপ্ করিয়া তুলিতেছেন ও পরাইতেছেন; যেটির উপর যেটি বসিবে, যেটির পর যেটি বসিলে সুন্দর দেখাইবে, সেটি ঠিক সেইটির পর সেইরূপই বসিতেছে। উভয়েই কৃতকর্ম্মা, এজন্য ফুল তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইতেছে না। একছড়া মালা হইল সরু যুঁই-ফুলের, একছড়া মোটা মল্লিকার, একছড়া ছোট কুঁদ-ফুলের। কোন ছড়ায় দুই প্রকার ফুল, কোনটিতে তিন প্রকার, কোনটিতে চারি প্রকার। লাল, নীল, সবুজ পুষ্প কেয়ারিতে কেয়ারিতে সাজান হইতে লাগিল। যুবকের মস্তকে যুঁইএর গড়ে, তাহার পার্শ্ব হইতে কর্ণবিলম্বী দুই ছড়া ছোট ছোট মালার আগায় ভূমিচম্পক দুলিতেছে। তিনি যতবার হাত নাড়িতেছেন, ভূমিচম্পক ততবার তাঁহার নাকের উপর পড়িয়া তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় শীতল করিয়া দিতেছে।

রমণীর অঙ্গে সমস্ত পুষ্প-আভরণ;—পুষ্পের কঙ্কণ, পুষ্পের মুকুট, পুষ্পের হার, পুষ্পের অঙ্গদ, পুষ্পের অবতংস, পুষ্পনির্ম্মিত গ্রীবা-ভূষণ। তিনি মালা গাঁথিতেছেন, আর সেইগুলি নড়িতেছে, দুলিতেছে। পুষ্পরাশি যত কমিয়া আসিতেছে, দুজনে তত নিকট হইতেছেন, ততই কাছে আসিতেছেন। এক একখানি গহনা গাঁথা হইতেছে, আর উহা যথাস্থানে পরান হইতেছে, আর দেখা হইতেছে। একে ত যখনই দেখা যায়, তখনই নূতন, তাহাতে আবার নূতন নূতন গহনা, বড়ই নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যত পুষ্পরাশি ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, প্রণয়িযুগল ততই বসিতে লাগিলেন। মনে মনে বাসনা, সমস্ত পুষ্পাভরণ প্রস্তুত হইলে খানিক দুজনে একটু গল্প করিয়া যান; দুই জনে সেই পুষ্পাভরণে ভূষিত

হইয়া একবার কাছে কাছে বসিয়া, গাছপালা, বন-জঙ্গল, আহার-নিদ্রা প্রভৃতি পার্থিব সমস্ত ব্যাপার ভুলিয়া স্বর্গের উপর স্বর্গ, তাহার উপর স্বর্গ, তাহার উপর যে স্বর্গ আছে, একবার সেই স্বর্গীয় লোকের মত "প্রেমে সুখে মোহে আর মোহিনীতে মজিয়ে" কিছুকাল মনুষ্য-জীবনে দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, সুখস্বপ্নবৎ অবস্থায় মৃদু মৃদু আলাপ করেন। আলাপ বলিব, না রসালাপ? ছি! রসালাপ। অশোক রাজার প্রিয়পুত্র, প্রধান সেনাপতি, অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কলাভিজ্ঞ, ধর্ম্মানুরাগী কুণাল, রমণীকুলচূড়া, সুশিক্ষিতা, সুপণ্ডিতা প্রেমপূর্ণ-হৃদয়া কাঞ্চনমালার সঙ্গে রসালাপ করিবে? কুৎসিত নায়ক-নায়িকাবৎ কদর্য্য ভাবের অথবা কদর্য্যভাবব্যঞ্জক কথায় ঠাট্টা-তামাসা করিবে? আমার ত এমন বোধ হয় না। যদি তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইত, যদি তাহারা সেইরূপ আলাপ বা রসালাপ করিতে পারিত, তবে বুঝিতাম, লিখিতেও পারিতাম, কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কিন্তু এখনও ফুলধনু প্রস্তুত হয় নাই, এখনও পঞ্চশর প্রস্তুত হয় নাই, এখনও কাঞ্চনমালার মুকুটের মাথায় ফুলের থোবনা প্রস্তুত হয় নাই, ফুল ফুরাইয়া গেল!

৪

সন্ধ্যা প্রায় উপস্থিত; সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়াছেন, এখনও ডুবেন নাই। মৃদু পবন-হিল্লোলে গঙ্গাতরঙ্গ দুলিতেছে ও খেলিতেছে। কিন্তু ফুল ফুরাইয়াছে, সন্ধ্যার একটু পরেই তূর্য্যধ্বনি হইবে; সেই সময় সকলকে সাজিয়া ললিতবিস্তরের অভিনয়ে উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু সাজা এখনও হয় নাই, ফুলও ফুরাইয়াছে। এই কার্য্য উপলক্ষে বাগানের অর্দ্ধস্ফুটিত কোরক পর্য্যন্ত তোলা হইয়াছে, আর ফুল বাগানে নাই। কুণাল ও কাঞ্চনমালা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন, নবদূর্ব্বাদলময় সমতল ভূভাগ, তাহার উপর দূর্ব্বা পুষ্প সুধাময় শ্বেতকান্তি দুলাইয়া নমিয়া নমিয়া পড়িতেছে; দেখিলেন, অশোক, কিংশুক, বক, বকুল, নাগ, পুন্নাগাদি বৃক্ষসমূহ বায়ুভরে নড়িতেছে, দেওদার-জাতীয় নানা বৃক্ষ শোঁ শোঁ করিয়া শব্দ করিতেছে। বক্ষঃস্থলে ছায়াকাশ ধারণ করিয়া গঙ্গাবক্ষঃ প্রেমভরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তদুপরি ক্ষুদ্র নৌকা-সমূহ সারি দিয়া পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় যাইতেছে, নাবিকেরা প্রাণ খুলিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে, তাহার স্বরের দুরন্ত তরঙ্গ, গঙ্গা-সমীরণে শীতল হইয়া মৃদু মৃদু কাণে লাগিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের একটু উৎকণ্ঠা থাকায় তাঁহারা ইহার তত মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দ্রুতপদে লতা, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, পুষ্পবৃক্ষাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, পুষ্প কোথাও পাইলেন না। সময় যত বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই একটু একটু করিয়া উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটু ত্বরাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা গাত্রস্থিত পুষ্পাভরণ সকল মোচন করিয়া নিকটস্থ মর্ম্মর-নির্ম্মিত মঞ্চে রাখিলেন। কাঞ্চনমালার অলঙ্কারগুলি বামে ও কুণালের গুলি দক্ষিণে রক্ষিত হইল; তখন উভয়ে একটুকু উত্তরমুখে গেলেন। তথায় নিকটে কৃত্রিম শৈলের প্রতি তাঁহাদের নয়ন পড়িল। তখন কাঞ্চনমালা বলিলেন,—"যাহারা পুষ্পচয়ন করিয়াছিল, তাহারা বাগানের ফুলই তুলিয়াছে। বোধ হয়, দুরারোহ বলিয়া এই শৈলশিখরস্থিত পুষ্প চয়ন করে নাই। উহার উপর গেলে নিশ্চয়ই ফুল পাইব।"

কুণালও সম্মত হইলেন। তখন উভয়ে শৈল আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন।

যে দুইটি পথ শৈল বেষ্টন করিয়া বরাবর উপরে উঠিয়াছে, তাহার একটির পার্শ্বে অত্যন্ত বন হইয়াছে। ঘাস, লতা, ফুল, গাছ প্রভৃতি এত ঘন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কিছুই দেখা যায় না। এইটি কিছু অধিক খাড়াই, অতএব ইহার দ্বারা শীঘ্রই উঠিতে পারিবেন ভাবিয়া উভয়ে ঐ পথই অবলম্বন করিলেন। দুই এক পা উঠিতে না উঠিতেই নিবিড় লতান্তরাল হইতে কুপিত ফণিফণার ঘোরগর্জ্জনবৎ কি শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু ত্বরাপ্রযুক্ত তাঁহারা কেহই উহার প্রতি কোন লক্ষ্য করিলেন না। কিছু দূর উঠিয়াই দেখিলেন, কোথাও একটা পাতা ছেঁড়া, কোথাও একটা ডাল ভাঙ্গা, কোথাও দুটি পুষ্প দলিত। দেখিয়া কাঞ্চন বলিল, "বুঝি কে এইমাত্র এখানে আসিয়াছিল।" আরও কিছু দূর উঠিয়া এক স্থানে দেখিলেন, একটি ডালে একেবারে পাতা নাই। পাতাগুলি যেন পদদলিত দেখিয়া কুণাল বলিলেন, "যে আসিয়াছিল, সে বোধ হয়, এইখানে বসিয়া বা দাঁড়াইয়াছিল।" আর একটু উপরে উঠিয়াই দেখিলেন, কাঞ্চন যাহা বলিয়াছিল, তাহা ঠিক, পুষ্পচয়নকারীরা এত দূর উঠে নাই। রাশি রাশি পুষ্প শৈলাগ্রদেশ পর্য্যন্ত ফুটিয়া যেন আকাশের লঘু বায়ুকেও সৌরভময় করিয়া তুলিয়াছে। তখন কাঞ্চন আপন অঞ্চলে এবং কুণাল উত্তরীয়ে পুষ্প তুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। উভয়ে পুষ্পচয়নে ক্ষিপ্রহস্ত,—ফুল-চয়ন বড় সোজা, টানিয়া

ছিঁড়িতে হয় না, হাত দিলেই খসিয়া যায়—অমনি ধরেন, আর যথাস্থানে রাখেন। এই ফুল, এই ফুল, এই ফুল, দুটিতে নড়িয়া নড়িয়া যাইতেছেন আর ফুল তুলিতেছেন। নাচ ইহার কাছে কোথায় লাগে? হে নৃত্যকলাকোবিদত্বগর্ব্বকারিণী বঙ্গীয় নৃত্যেশ্বরীগণ! তোমরা যদি তাহাদের দুজনের সেদিনকার ফুল তোলা দেখিতে, তোমাদের নৃত্যগর্ব্ব কোথায় থাকিত? এই এখানে আবার পাহাড়ের আড়ালে, আবার উপরে, আবার পার্শ্বে। কুণাল যেমন সময়ে সময়ে আপন মনোমধ্যে দেখিতেন, এই এই আসে যায়, থাকে না তিলেক, এখানেও সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন। উভয়েই বিদ্যুদ্বৎ চঞ্চল-পদে চলিতেছেন, আর তর-তর করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছেন, আর ফুল তুলিতেছেন। অত দ্রুত না কাঞ্চন, অত দ্রুত না কুণাল, একবার একটু থাম, আমি একবার তোমাদের এই অবস্থার চিত্র লিখিয়া লই। না, তোমরা থামিবে না। বুঝিয়াছি, তোমাদের ত্বরা আছে। যাও, শীঘ্র পুষ্পচয়ন করিয়া ধনুক, বাণ আর খোপনাটি তৈয়ারী করিয়া লও। দাঁড়াইও না, যে মহৎ কর্ম্মের জন্য তোমরা আজি উদ্যোগী, বিধর্ম্মী ব্রাহ্মণের যদি আশীর্ব্বাদ গ্রাহ্য হয়, আশীর্ব্বাদ করি, কৃতার্থ হইয়া জগৎকে কৃতকৃতার্থ কর।

ক্রমে ফুল তুলিতে তুলিতে অপ্সরার ন্যায়, প্রোজ্জ্বলকান্তি দেব-দেবীর ন্যায় কুণাল ও কাঞ্চনমালা পর্ব্বতের শিখরারোহণ করিলেন। তথায় উপবেশনার্থ যে সুন্দর মস্মরখণ্ড পতিত ছিল, তথায় বসিয়া অঞ্চল ও উত্তরীয়স্থিত পুষ্প লইয়া ত্বরায় অভিলষিত ধনুর্ব্বাণাদি প্রস্তুত হইল। গগনে বিষমমণ্ডল রাজহংস ভাসিতেভাসিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দুগ্ধফেনধবল কিরণমালা বসুধাকে স্নাপিত করিয়া দিতে লাগিল। শৈত্যসৌগন্ধমান্দ্যময় মলয়-সমীর দক্ষিণদিক হইতে গঙ্গা পার হইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে শীতল করিতে লাগিল।

কুণাল তখন বলিতে লাগিলেন, "কাঞ্চন, আমি যখন যখন এই শৈলশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হই, তখনই আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে।"

কা। তুমি আমায় এখানে আর আসিতে দিবে না, তাহারই যোগাড় করিতেছ।

কু। না, কাঞ্চন! এখানে আসিলেই সেই কথা মনে পড়ে, যে দিন গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে মৃগয়া করিতে গিয়া—

কা। আমি কাণে আঙ্গুল দিলাম, ও কথা আমি শুনিব না।

কু। কেন, কাঞ্চন? যে দিন আমার ধর্ম্মলাভ হয়, যে দিন আমার প্রাণলাভ হয়, যে দিন আমার তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে দিনের কথা শুনিতে তোমার এত অনিচ্ছা কেন, কাঞ্চন?

কাঞ্চন মৃণালকোমল বাহুযুগলে কণ্ঠ জড়াইয়া বিহ্বলভাবে বলিল, "কণ্ঠরত্ন! যাহাতে তোমার এত আমোদ, তাহা শুনিতে কি আমার অনিচ্ছা হইতে পারে? তবে—"

কু। তবে তোমার অনেক প্রশংসার কথা আছে বলিয়া তুমি শুনিতে রাজী নহ?

কা। তা কেন?

কু। তবে কি?

কা। তুমি আমার কথা কেন বলিবে? তুমি তোমার কথা বল।

কু। তা কি হয়, কাঞ্চন? সেই দিন থেকে আমার কথা বলিলেই তোমার কথা, তোমার কথা বলিলেই আমার কথা—

কা। হবে বৈ কি? বলিবে বল। তোমার কথা তুমি বল, আমার কথা তাহার পর বলি।

কু। আচ্ছা বেশ! প্রায় আট বৎসর হইল, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার দিন আমি শিকার করিতে করিতে গয়াশীর্ষ পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিলাম। তথা হইতে দেখিলাম, একটি ব্যাঘ্রদম্পতি এক জায়গায় রহিয়াছে। আমি একেবারে অশ্বপৃষ্ঠে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ব্যাঘ্রদিগের খরনখরপ্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া আছি, স্বপ্নবৎ বোধ হইল, যেন এক প্রাচীন ঋষির আদেশে ব্যাঘ্রেরা পালিত কুকুরের মত তাঁহার গা চাটিতে লাগিল। তখন তিনি অপ্সরানিন্দিত রূপমাধুরী একটি দেবকন্যাকে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। কন্যা আমায় বক্ষঃস্থলে রাখিয়া আস্তে আস্তে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলে শয়ন করাইল। তখন আমার চৈতন্য হইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, সত্য সত্যই সেই বটবৃক্ষ, সত্য সত্যই সেই অপ্সরানিন্দিত রূপমাধুরী কন্যা, আর সত্য সত্যই সেই ঋষিতুল্য সিতশ্মশ্রু স্থবিরবর রক্তাম্বর-পরিধারী। তাঁহার দুই দিকে দুইটি ব্যাঘ্র। তিনি স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্তবে আমার মন গলিয়া যাইতে লাগিল। আমি তাঁহার বাটী রহিলাম। আহা! তেমন সুখের দিন কি আর হইবে! তাহার পর আমি এক দিন সেই অপ্সরার সহিত গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে গেলাম, সে কত কি বলিল। রোজ সেইখানে বেড়াইতে যাইতে লাগিলাম।

ঋষি-প্রবর্ত্তনায়, অপ্সরার প্ররোচনায় ও নিজের মনের আবর্ত্তনায় সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিলাম, ঐহিক ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে। ভোগ ভিন্ন জগৎ চলে, আকাঙ্ক্ষা অনেক উচ্চে উঠিতে পারে, অনেক সুন্দর হইতে পারে। ক্রমে সেই ঋষির অনুকম্পায় আমার ত্রিরত্ন লাভ হইল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমা হেন চতুর্থ রত্ন লাভ করিলাম।

কা। আর কত বলিবে?

কু। তাহার পর ধর্ম্ম ত্যাগ করায় পিতা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, কত দেশে কত অবস্থায়ই ঘুরিয়াছি, কিন্তু দেখিলাম, গৃহে, বনে, শ্মশানে, গাছতলায়, পালঙ্কে তুমি সকল অবস্থাতেই সমান।

কা। সে কাহার গুণ? তোমার না আমার?

কু। আজ এই পাহাড়ে উঠিয়া পূর্ব্বকথা মনে পড়িল। যে দিন ত্রিরত্নলাভ হয়, যে দিন তোমায় লাভ হয়, যে দিন ঐহিক পারত্রিক সুখের বীজবপন হয়, আজি সেই দিন স্মরণ হইতেছে। কারণ, সে এক দিন ছিল, আর এ আর এক দিন; বল দেখি, তোমার কোন্‌টি ভাল লাগে, কাঞ্চন?

কা। যখন রোজ রোজ বনে ও পাহাড়ে তোমায় দেখিতাম, তুমি বাঘ শিকার করিতে, বাঘের পিঠে বর্শা ফুটাইয়া দিয়া তাহারই উপর আরোহণ করিয়া পর্ব্বতচূড়া হইতে পর্ব্বতচূড়ায় গমন করিতে তোমায় দেখিতাম আর পিতার সহিত সন্ধ্যানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিতাম, সে সময়ের কথা মনে হইলে সত্য সত্যই আনন্দ হয়। তুমি তখন আমার প্রতি কত সদয় ছিলে, পরিচয় ছিল না অথচ বোধিবৃক্ষমূলের নিকটে আসিলে আমার সঙ্গে দুই চারি দণ্ড গল্প না করিয়া যাইতে না। সে এক দিনই ছিল। যে দিনের কথা কহিতে তুমি এত ভালবাস, যে দিন তুমি যখন ব্যাঘ্রনখরাঘাতে পীড়িত হইলে, পিতা তোমার উদ্ধার করিলেন, তখন তোমার অসুখ দেখিয়া আমার যে কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা কি প্রকারে বলিব? তাহার পর তোমায় যখন বোধিবৃক্ষমূলে লইয়া গেলাম, তখন বড়ই আনন্দ হইল, বোধিদ্রুম সহসা মুকুলিত হইল। উহার শোভাসমৃদ্ধি যে শুদ্ধ আমিই দেখিলাম, এমন নহে, পিতা দেখিয়া বলিলেন, এই রাজকুমার হইতে সদ্ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আমি পূর্ব্ব হইতে তোমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলাম, তুমিও আমার প্রতি বিরূপ নও জানিতাম। কিন্তু শুদ্ধ ভোগমাত্র যে প্রণয়ের উদ্দেশ্য, সে প্রণয়ে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। যখন জানিলাম, তোমা হইতে আমার চির-অভিলষিত সদ্ধর্ম্ম বিস্তার হইবে, "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" প্রচার হইবে, সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান বিস্তার হইবে, তখন তোমার সহিত মিলিবার জন্য বড়ই বাসনা হইল। পিতার অনুগ্রহে, ত্রিরত্ন-প্রসাদে ও তোমার অনুকম্পায় মিলন হইল। তোমার সহিত মিলনে এক দিনও অসুখী নহি। এখন সদ্ধর্ম্ম-প্রচারের যত সমৃদ্ধি হয়, ততই আমার আনন্দবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু সত্য বলিতে কি, সদ্ধর্ম্মপ্রচার আর তোমার অতুল্য প্রণয়, এই উভয়ে আমি এত মগ্ন আছি যে, আর আমার অন্য চিন্তা নাই।

এইরূপ প্রণয়পূর্ণ হৃদয়োন্মাদক বাক্যলহরী সৃজন করিয়া উভয়ে উভয়কে মোহিত করিতেছেন। উচ্চপর্ব্বতোপরি শান্ত সমীরণ বহিতেছে, নির্ম্মল আকাশে উজ্জ্বল তারা জ্বলিতেছে, জগৎ যেন তাঁহাদের অগাধ অপার অনন্ত প্রশান্ত প্রণয়ের প্রতিকৃতি। ঝিল্লীরব যেন তাঁহাদের প্রণয়পূর্ণ স্বরলহরীর প্রতিধ্বনি।

উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; কথাবার্ত্তায় হৃদয় পুরিয়া উঠিয়াছে, মন উন্মত্ত হইতেছে, মন ক্রমে মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গে, তাহার পর ভুবর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক প্রভৃতি সপ্তশত স্বর্গ অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সুখময়, প্রেমময়, মোহময় ধামে উঠিতেছে। সমস্ত জগতের সত্তালোপ হইয়াছে, শরীর আছে কি না আছে জ্ঞান নাই, আছে কেবল তিনটি জিনিষ;—একটি সুধাময় প্রেমময় কি-যেন-কি-ময় স্বরলহরী, একটি সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি যেন-কি-ময় আত্মা, আর তাহার সঙ্গে উহারই সমান সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি-যেন-কি-ময় আর একটি আত্মা। পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ঘাতপ্রতিঘাত করিতেছে।

এমন সময়ে দূরে বাজনা বাজিল, অভিষেকারম্ভসূচক তূর্য্যধ্বনি হইল। উভয়কে আবার পৃথিবীর অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিল। উভয়ে আবার পৃথিবীর বায়ুস্পর্শ অনুভব করিলেন, আসনস্বরূপ মর্ম্মর-প্রস্তরের স্পর্শ অনুভব করিলেন। কিন্তু হঠাৎ স্বর্গ হইতে নামিতে হইল বলিয়াই হউক বা আর কিছুতেই হউক, কাঞ্চনমালা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। কি যেন হারাইয়াছি, আশা যেন পূরিল না। যে সুখে এতক্ষণ নিমগ্ন ছিলাম, উহা যেন আর ইহজন্মে

ফিরিয়া আসিবে না। যেন যে সকল আশা এতক্ষণ করিতেছিলাম, তাহা যেন স্বপ্ন, কখন পূরিবে না। তিনি একবার বলিলেন, "হঠাৎ মনটা কেন উদ্বিগ্ন হইল, বল দেখি?"

কুণাল বলিলেন, "আমরা আত্মচিন্তায় মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ অন্য চিন্তায় বিশেষ কার্য্যনাশসম্ভাবনা-চিন্তা উদয় হওয়ায় আমিও উদ্বিগ্ন হইলাম।"

কাঞ্চন বলিলেন, "না, এ সে উদ্বেগ নহে, বোধ হয়, কোন বিপদ শীঘ্র উপস্থিত হইবে।"

এই কথা কহিতে কহিতে উভয়ে সত্বর শৈলশিখর হইতে নামিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

কুণাল নামিয়া আসিয়া দেখেন, কাঞ্চনমালার উৎকণ্ঠার বাস্তবিকই কারণ হইয়াছে। যেখানে তাঁহারা আপন আপন পুষ্পাভরণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, কুণালের আভরণ সেইখানেই রহিয়াছে, কিন্তু কাঞ্চনের পুষ্পগুলি সেখানে নাই। কোথায় গেল? কে লইল? এ রাত্রিতে এখানে লোক আসিবার ত সম্ভাবনা নাই? আর ত সময় নাই যে খুঁজি। অভিনয় সত্বর আরম্ভ হইবে। ললিতবিস্তরের তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইলেই কুণাল ও কাঞ্চনমালা মার ও মারপত্নী সাজিয়া বুদ্ধদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইবেন। উভয়েই অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কি করা যায়, কাঞ্চন ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইলেন, কুণালের আর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার অবসর হইল না। আবার তূর্য্যধ্বনি হইল, প্রস্তাবনা শেষ হইয়াছে। পাত্রপ্রবেশ আবশ্যক। কুণাল বলিলেন, "কাঞ্চন, তুমি অমনি আইস, তুমি নিরাভরণা হইয়াও মারপত্নীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবে।"

কিন্তু কাঞ্চন কোন জবাব করিল না। তাহার উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, সে কেবলই ভাবিতেছে, আমার মন যে চঞ্চল হইয়াছিল, তাহাতে জানিয়াছিলাম, অমঙ্গল অবশ্য হইবে; কিন্তু সে অমঙ্গল কি এই মাত্র—না, তা হইবে না—এখনও ত উৎকণ্ঠা দূর হইতেছে না, তবে নিশ্চয় আরও বিপদ হইবে। তিনি এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। সুতরাং কুণালের কথায় উত্তর দিলেন না, সমস্ত শুনিলেন কি না সন্দেহ।

কুণাল বলিলেন, "মারপত্নী কিছু নাটকে নাই। তুমি আমায় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছ, অতএব অশোক রাজার ধর্ম্ম-গ্রহণের সময় তুমি আমোদ করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া আমি মারপত্নী নামে একটি নূতন পাত্র উহাতে নিবেশ করিয়াছি। অতএব তুমি না যাইলেও আমি যাই। নচেৎ অভিনয়ে ব্যাঘাত হইবে।" বলিয়া কুণাল দ্রুততর-বেগে অভিনয়স্থলে গমন করিলেন। কাঞ্চন ভাবিতে লাগিলেন, "আমার অমঙ্গলের কি এইখানেই বিরাম হইবে?"

২

কুণাল আসিয়া দেখেন, সমস্ত প্রস্তুত, তাঁহার জন্য নেপথ্য-গৃহে সকলেই ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত। তাঁহার জন্য লোকও প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার রঙ্গস্থল-প্রবেশের আর বিলম্ব নাই, বরং দুই এক মিনিট বিলম্ব হইয়াছে। কুণাল আর নেপথ্যশালায় বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কৈ? আমার সেনাপতি ও দুহিতৃগণ কৈ?"

অমনি মারপত্নী আসিয়া কহিলেন, "নাথ! সকলেই উপস্থিত। বসন্ত, কোকিলকুহু, আম্রমুকুল, দক্ষিণপবন প্রভৃতি দলবল সব উপস্থিত। আপনার কন্যাগণ সব উপস্থিত।"

কুণাল বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। যে মারপত্নী সাজিয়া আসিয়াছে, এ কে? মুখ দেখিতে পাইলেন না, কারণ, উহা আবৃত। গলার স্বরে বুঝিলেন, কাঞ্চনমালা নহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার স্বহস্ত-গ্রথিত পুষ্প-অলঙ্কারগুলি সমস্তই তাহার গায়ে রহিয়াছে। এ অলঙ্কার এ কোথা হইতে পাইল? তিনি এই সকল ভাবিতেছেন আর অন্যমনস্ক হইতেছেন। যে যুবতী মারপত্নী সাজিয়া আসিয়াছে, সে অতি রসিকা, প্রত্যুৎপন্নমতিশালিনী। সে অমনি বলিল, "নাথ, এত চিন্তিত কেন? যখন সত্যযুগে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের ধ্যানভঙ্গ করাইয়াছেন, তখন কলিতে এই সামান্য রাজপুত্রের ধ্যানভঙ্গ করিতে পারিবেন না?" কুণাল ভয়বিস্ময়সূচক স্বরে কহিলেন, "কিন্তু বোধ হয়, এ অত্যন্ত কঠিন ঠাঁই।" তাঁহার ভাব এমনি মনোহর হইল যে, সভাস্থ লোক সকলেই "বেশ বলিয়াছ" "খুব বলিয়াছ" বলিয়া সুখ্যাতি করিয়া উঠিল। কুণালের বিস্ময়জড়তা কতক দূর হইল। তিনি তাহার পর রীতিমত অভিনয় করিতে লাগিলেন; দেখিতে লাগিলেন যে, মারপত্নী

হাবভাব আদির দ্বারা তাঁহার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটা কে, জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। তাঁহার এইরূপ কৌতূহল ও বিস্ময় থাকা প্রযুক্ত তাঁহার অভিনয় আজি অন্য দিন অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সকলেই কুণালের অভিনয়পারিপাট্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। কুণাল অভিনয়ে অত্যন্ত পটু, কিন্তু আজি তাঁহার সুখ্যাতির কারণ শিক্ষার গুণ নহে। ঐ যে চমকিত ভাব, উহাই সভাস্থ জনগণের মনোরঞ্জনের মূল। তাহারা কিন্তু জানিল না যে, কেন তাঁহার অভিনয় এত সুন্দর, তিনিও জানিতে পারিলেন না, কেন আজিকার অভিনয় লোকের এত ভাল লাগিল।

এই রমণী কে? এ ত কাঞ্চনের ফুলের গহনাগুলি চুরি করিয়াছে? নিশ্চয়ই ঐ করিয়াছে, নহিলে সে সব দেবদুর্লভ অলঙ্কার, কুণালের স্বহস্তগ্রথিত, ও ত আমরা বেশ চিনি, ও গহনা ও কোথায় পাইল, বিশেষ ঐ দেখ, মুকুটের থোপনা নাই। এই থোপনার ফুলের জন্য পাহাড়ে উঠিয়াই ত কাঞ্চন বেচারার আজি এই মনঃপীড়া ভুগিতে হইল। অতএব এ নিশ্চয় সেই গহনা চুরি করিয়াছে, কিন্তু লোকটা কে? কেমন করিয়া জানিব? স্ত্রীলোকের মুখের ঘোমটা খুলিয়া ত দেখিতে পারি না। আপনার কেহ হইত, কোনরূপ আশা থাকিত, না হয় অভব্যতা করিয়াও দেখিতাম। কিন্তু ঐ চোরের মুখের ঘোমটা খুলিয়া উহার পরিচয় লইব, উহাকে চিনিয়া লইব? ছি! ও কেন রাজরাণী হউক না? ও চোর—না হয় চোরাও মাল কিনিয়াছে—ওর সঙ্গ আমরা চাই না।

নিজেই চুরি করিয়াছে, নহিলে ফুল আবার কে চুরি করিতে যাইবে? ধরা পড়ারও ত ভয় করিতেছে না! কি সাহস! যাহার চুরি করিয়াছে তাহার সম্মুখে সেই জিনিষ লইয়া কেমন সপ্রতিভের মত কথা কহিতেছে, যেন কোন দুষ্কর্ম্মই করে নাই। এত সাহস! এ ত সামান্য লোক নয়! কিন্তু কি জন্য চুরিই করিল, কি জন্যই বা এত সাহস করিয়া চোরাও মাল শুদ্ধ রাজাধিরাজের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল? দেখিতেছ না উহার রকম? ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া কুণালের কাছে দাঁড়াইয়াছে, যতবার নাম করিতেছে, যেন গলার স্বর জড়িত হইয়া আসিতেছে, দেখিতেছ না ভাবভঙ্গী? ও কি ভাল? ওর বড় সুবিধা হয়েছে, লোকে জানে, এ কাঞ্চনমালা—কুণাল ভিন্ন আর কেহ ত জানে না যে, ও কাঞ্চনমালা নহে। কাঞ্চনমালা হতাশ্বাস হইয়া অভিনয় দেখিতেও আজি আইসেন নাই। সুতরাং ও লোকের কাছে ঠিক কাঞ্চনের মতই বোধ হইতেছে। দুষ্টাও এ সব ঠিক বুঝিয়া বুঝিয়া আপনার সুবিধা পাইয়াছে, একেবারে মারপত্নী ও কাঞ্চন এই উভয়ের ভূমিকা ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেছে। কুণাল প্রথম খানিক হাঁ করিয়া অন্যমনস্ক ছিলেন, তাহার পর রীতিমত অভিনয় করিতে লাগিলেন। হতবুদ্ধি ভাবটা কতক অন্তর্হিত হইল। তিনি আপন কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল নজর রাখিলেন যে, দুষ্ট মাগী যেন হঠাৎ বাহির হইয়া না যায়। উহার প্রতি কুণালের বার বার দৃষ্টি পড়ায় সে মনে করিল, বুঝি শিকার পাকড়াইয়াছি। সে তখন মারপত্নীর কর্ত্তব্য নৃত্য করিতে লাগিল। সম্মুখে উপগুপ্ত, অশোকের দীক্ষাগুরু, বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভিত্তি, বুদ্ধ সাজিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যান করিতেছেন। প্রশান্তমূর্ত্তি স্থূলকায়, মুণ্ডিতশিরা, কৌপীনমাত্র রক্তাম্বর পরিধান, অটল অচলবৎ নিস্পন্দ। তাহারই প্রলোভনার্থ মার ও মারপত্নী বসন্তসেনা মারদুহিতাদিগের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। মারপত্নী নৃত্য করিতে লাগিল। যে হও তুমি সে হও, অত নাচিও না, সুন্দরি! কি নৃত্য!! মরি মরি মরি! বুদ্ধদেব নিতান্ত পাষাণ, তাই তোমার নৃত্যে ভুলেন নাই। তোমার নৃত্য ধ্যানের দুর্লভ, কামনার উচ্চপদ, সার হইতেও সার,—অত নাচিও না, সুন্দরি! মনুষ্য দর্শক মজিয়া যাইবে, হয় ত অশোক রাজার দীক্ষা লওয়া ফিরিয়া যাইবে। অত নাচিও না। উহার সঙ্গে আবার ও কি! কটাক্ষ! এক একবার বিদ্যুৎ ছুটিতেছে। ও কাহার উপর? কুণাল, আজি বুঝিব, তুমি সীসা কি সোণা, আজি তোমার ধর্ম্ম বুঝিব, আজি তোমার বিদ্যা-পরীক্ষা হইবে। ও কি কুণাল, তুমিও যে আরম্ভ করিলে, তুমিও কটাক্ষ করিতেছ, এ কি তোমার কলানৈপুণ্য? তুমি কি শুদ্ধ দর্শকমণ্ডলীর মন রাখিবার জন্য কটাক্ষে কটাক্ষের জবাব দিতেছ? না কাচ-মূল্যে কাঞ্চনমণি বিক্রয় করিতেছ? না! না! তোমার কটাক্ষ আমি বুঝিয়াছি, ভয় নাই, ও কখন পালাবে না, তোমার রূপ দেখিয়া যে মজিয়াছে, তাহাকে না তাড়াইলে সে যাইবে না নিশ্চয়।

কিন্তু হঠাৎ সব শুদ্ধ হইল কেন? এ কি? সূচ পড়িলে শুনা যায়, হঠাৎ এরূপ কেন হইল? এক অংশে রাজপরিবার সমভিব্যাহারে মহারাজ অশোক, আর এক পার্শ্বে করদ ও মিত্ররাজগণ, মধ্যস্থলে মন্ত্রী প্রাড়্বিবাক, মহাপাত্র প্রভৃতি সকলেই

নিস্তব্ধ। পার্শ্বে রমণীকুল নিস্তব্ধ। কেন এত নিস্তব্ধ? শুদ্ধ নিস্তব্ধ? সকলে একতানমনে বুদ্ধদেবের দিকে তাকাইয়া আছে। অর্হৎশ্রেষ্ঠ উপগুপ্তের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি কথা কহিতেছেন, মার-কন্যারা তাঁহাকে লোভ দেখাইতেছে, আর তিনি তাহার জবাব দিতেছেন। কি গভীর ভাব! কি গভীর স্বর! যে স্বরে উপগুপ্ত দেবাসুর-যক্ষ-রক্ষ-নর-কিন্নর সমীপে সদ্ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন, যে স্বরে বৌদ্ধমণ্ডলী মোহিনীমুগ্ধ হইয়া থাকে, আজি সেই স্বরে ভগবান্ উপগুপ্ত মার-দুহিতাদিগের সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "তোমরা আমায় নির্ব্বাণ-পথ দেখাইয়া দিতে পার ত দাও। ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া আমার মন তোমাদের ভোগ আশায় নিবিষ্ট হইবে না। তোমরা বিদায় হও। অসংখ্য প্রাণী আমার চারিপার্শ্বে জন্ম-জরা-মরণকৃত দুঃখের জ্বালায় দহিয়া মরিতেছে, আমি দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া কিরূপে আবার সেই দুঃখে পড়িব? আমি প্রাণত্যাগ করিয়া এই অসংখ্য জীবের মুক্তির উপায় করিয়া দিব। তাহাদের নির্ব্বাণ-লাভের পথ করিয়া দিব। তোমরা কি মনে কর আমায় ভুলাইবে?" এইরূপ নানা কথোপকথন হইতে লাগিল, শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া, কর্ণ ভরিয়া নিজ উপাস্য দেবতার অধরচ্যুত বচনসুধাপানে আত্মজীবন সার্থক করিতে লাগিল। কুণালের চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

চোরের মন বুঁচকির দিকে। দুষ্টরমণী ক্রমাগত কুণালের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উপগুপ্তের বক্তৃতায় সকলে মোহিত হইতেছে, কিন্তু সে দুষ্টচরিত্রার তাহাতে কাণও নাই। না শুনিলে কে কবে কোন্ কথায় মজিয়া থাকে? তাহার চেষ্টা কুণালকে লইয়া কোনও ঘরাও কথা পাড়ে, অভিনয়-ছাড়া অন্য কথা পাড়ে, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি কুণাল উপগুপ্তের বক্তৃতায় মোহিত হইতেছেন। বক্তৃতা যখন বড় জমিয়া আসিল, তাঁহার নয়ন বাষ্পে ভরিয়া গেল, সে অমনি তাড়াতাড়ি অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়ন মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত। কি দুষ্ট! কুণালের এটা অত্যন্ত অসহ্য হইল। তিনি সরিয়া গিয়া দূরে উপগুপ্তের ওপাশে দাঁড়াইলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে কুণালের বড় অনুরাগ, তিনি যদিও মার সাজিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনিই পাটলীপুত্র রাজধানীর প্রথম বৌদ্ধ। উপগুপ্ত মার-দুহিতাদিগের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া আবার ধ্যানস্থ হইলেন। পাত্রগণ রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। কুণাল বাহির হইয়া, যে রমণী মারপত্নী সাজিয়াছিল, তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, তাহাকে পাইলেন না। তখন কাঞ্চনমালাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য এবং তাঁহাকে এই অদ্ভুত ব্যাপার জানাইবার জন্য দ্রুতপদবিক্ষেপে কাঞ্চনপুরী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। আর একবার ফুলের গহনা পরিয়া যাত্রাভঙ্গের সময় দেবদম্পতী সাজিয়া অশোক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতে হইবে। এবার স্থির করিয়াছেন, নিরাভরণা কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

৩

তিনি দ্রুতপদে যাইতেছেন আর ভাবিতেছেন—আহা! কাঞ্চন এতক্ষণ কত মনস্তাপ পাইতেছে, তাহার এই অভিনয়ে উপস্থিত হইবার বড়ই সাধ ছিল। তাহাকে গিয়া কি ভাবে দেখিব? হয় ত শয্যায় শুইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছে, না হয়, গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত আছে, না হয়, গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া পথপানে চাহিয়া আছে, সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি জ্যোৎস্নায় নাইয়া জ্যোৎস্নায় মিশিয়া দাঁড়াইয়া আছে! এই ভাবিতেছেন আরও দ্রুতপদে যাইতেছেন! এমন সময়ে রাজবাটীর এক জন দাসী বলিল যে, তোমার ফুল যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে চাও? কুণাল কহিলেন, 'হাঁ, চাই।' সে বলিল, 'তবে ঐ লতাকুঞ্জমধ্যে যাও।' কুণাল ভাবিলেন, একাকী লতাকুঞ্জমধ্যে স্ত্রীলোকের নিকট যাওয়া উচিত কি না; কিন্তু মাল্য-চোর কে, ও চুরি করার অভিপ্রায়ই বা কি, জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য ছিল, এই ঔৎসুক্যের প্রধান কারণ এই যে, জানিলে কাঞ্চনমালাকে প্রবোধ দিতে পারিবেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

স্ত্রীলোকটা কোন্ পথে আসিয়াছিল, জানি না। আসিয়া এই লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে। কুঞ্জটি নানা বিলাসসামগ্রীতে পরিপূর্ণ। কোথাও বারিপূর্ণ গন্ধবারি, কোথাও স্বাদু তোয়, কোথাও স্বাদু অন্ন প্রভৃতিতে সুশোভিত। সে কি ভাবিতেছিল, জানি না। বোধ হয় ভাবিতেছিল, কত দিন ভেবেছি, কুণালকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব। যে

দিন অশোক রাজার বাটীতে কুণাল আমার নজরে পড়িয়াছে, সেই দিন অবধি জানিয়াছি যে, রাজ-পরিবারে এই বৃদ্ধ স্বামীর সংসারে কুণাল বৈ আমার গতি নাই। কত দিন কত দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই, কত দিন ঠারে-ঠোরে লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছি, প্রত্যাখ্যান বৈ পাই নাই। আজ পাহাড় থেকে প্রাণভ'রে দেখিয়াছি। আর আসবার সময় ফুলের মালা চুরি করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। রঙ্গভূমে কেহই টের পায় নাই, আমি কে? আমি প্রাণ ভরিয়া তাহারে আমার জীবনসর্ব্বস্ব দিয়াছি। তাহাকে "নাথ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। কত কথাই কহিয়াছি। কতবার কটাক্ষ করিয়াছি; বোধ হয়, কুণালও একটু টলিয়াছেন। টলিবার কথাই ত তাতে আর সন্দেহ আছে? একবার, দুইবার, বার বার আড়ে আড়ে দেখিতেছিলেন—না টলিবে কেন? যা হোক, আজ অতি সুদিন, যা ধরেছি, তাই হয়েছে, ধরিলাম, দেখিব—প্রাণভ'রে দেখিলাম। ধরিলাম, রঙ্গভূমে উহার পাশে উহার স্ত্রী সাজিয়া দাঁড়াইব—বিধাতা ফুলের গহনাগুলি আমার পথে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর রঙ্গস্থলে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, বিধাতা বুঝি বড় সদয়। কি চোখ! পটলচেরা!! এমন চোখ কখন দেখি নাই! মরি! সেই চোখের আড়ে আড়ে চাহনিতে প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে। ঐ চোখেই ত আমায় মজাইয়াছে। ঐ চোখেই ত আমায় এই কলঙ্কে টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু কলঙ্কই বা কি? টের ত কেউ পাবে না, আর যদি কেউ টের পায়, আমার রসিক বুড়া কখনও বিশ্বাস করিবে না। বাকী লোক ত বাজে লোক। বিশ্বাস করলে আর না করলে বড় বয়ে গেল। কিন্তু এ যে নূতন ফাঁদ পেতে ব'সে আছি, এ ফাঁদে ত এখনও কিছু হ'ল না।

সে স্ত্রীলোক ব্যস্তভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া খানিক রহিল। তখনও কুণাল ইতস্ততঃ করিতেছেন। পরে কুণাল যখন যাওয়াই স্থির করিলেন, তখন লতাকুঞ্জমধ্যে তাঁহার বিমাতা তিষ্যরক্ষা এইরূপ চিন্তায় আকুল ছিলেন।

কুণাল ক্রমে যত নিকটে আসিতে লাগিলেন, তিষ্যরক্ষা আহ্লাদে আটখানা হইতে লাগিলেন। দ্বারের আড়ালে লুকাইয়া উহার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন কুণাল কুঞ্জগৃহে কাহাকেও না দেখিয়া কতকটা থতমত খাইয়া গেলেন, তখন তিষ্যরক্ষা হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন "কি, রাজকুমার, চিন্‌তে পার?" তখনও অভিনয়ের বেশ অপনীত হয় নাই।

"পারি বৈ কি—মালাচোর!"

"তবে চোরের কাছে এত রাত্রে নির্জ্জনে?"

কুণালের স্বর একটু গম্ভীর হইল, বলিলেন, "আমি জানিতে আসিয়াছি, আপনি কাঞ্চনের গহনাগুলি কেন চুরি করিলেন?"

"সত্য কথা বলিব?

"নির্ভয়ে বলুন।"

"তুমি আমার মন কেন চুরি করিলে?"

"আমি আপনার কথার ভাব পাইলাম না।"

তখন পাপীয়সী তিষ্যরক্ষা আপন অন্তরের পাপ আশা, পাপ আকাঙ্ক্ষা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিল; আপনার অন্তরের পাপজ্বালা জানাইল; স্বামীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল; আপনার পরিচয় দিল; বলিতে লাগিল, "জানি আমি, তোমার পাপ হইবে, কিন্তু এই সংসারে বিশুদ্ধ পুণ্য কোথাও নাই। তোমার হৃদয় বিশাল, তাহার এক প্রান্তে আমায় স্থান দাও। আমার দারুণ পিপাসা, আমায় বারি দান কর!"

কুণাল বলিল "মাতঃ"—

"এই সম্বোধনটি করিও না। তোমার মুখে ও সম্বোধন বিষবৎ লাগে।"

"আপনি এরূপ কথা আর মুখে আনিবেন না।"

"দেখ কুণাল! তুমি আমায় চরণে রাখ। আমি তোমার উপকার করিব। তুমি জান, অশোক রাজা আমা-গত প্রাণ। আমি বলিতেছি, এই বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার তোমায় দেওয়াইব। তুমি জান, তোমার শতাধিক ভ্রাতা আছে, তোমার উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা বড় অল্প। তুমি জান, রাজকর্ম্মচারিমধ্যে তোমার অনেক শত্রু। সমস্ত হিন্দুগণ তোমার বিদ্বেষী, তোমার জীবন-নাশের জন্য অনেকে উদ্যোগী আছে। তোমার বন্ধু নাই, তোমার ন্যায় গুণবান্ সাধুশীলের বন্ধু মিলে না। অতএব যদি বন্ধু চাও, যদি উত্তরাধিকার চাও, আমায় ভিক্ষা দাও। আর দেখ, অশোক রাজার জীবন আমার মুষ্টিমধ্যে, চাও, কালই তোমায় উত্তরাধিকার দেওয়াইতে পারি।"

কুণাল। আপনি এ সকল নিষ্ঠুর কথা মুখেও আনিবেন না। ত্রিরত্ন আমার একমাত্র সহায় ও

বন্ধু। আমি উত্তরাধিকার চাহি না, বিশেষ আপনি যে উপায়ে উহা দিতেছেন, ও উপায়ে আমি ইন্দ্রত্ব লইতেও স্বীকৃত নহি। আমায় আর কিছু বলিবেন না, আমি চলিলাম।

তি। বলিব না, জানিও, তুমি স্ত্রীহত্যা করিলে, জানিও, তুমি মাতৃহত্যা করিলে।

কু। আমি নির্দ্দোষ।

তি। এক দিন ইহার জন্য তোমায় অনুতাপ করিতে হইবে। এক দিন বলিবে, তিষ্যরক্ষার মান রাখিলে আমার এ বিপদ হইত না।

"কখন না" বলিতে বলিতে কুণাল কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইলেন এবং ত্বরিতগতিতে কাঞ্চনমালার অন্বেষণে গেলেন।

৬

তখন তিষ্যরক্ষার মনের ভিতর বসিয়া সুমতি আর কুমতি দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিল।

সুমতি বলিল, "কেমন? সতীনপোর কাছে গিয়েছিলে, উচিত শাস্তি হয়েছে?"

কু। এক দিনেই কি আশা ছেড়ে দিতে হবে না কি?

সু। আবার যাবে না কি?

কু। যাব না? আজ ও আমার কাছে এসেছিল, এবার আমি ওর কাছে যাব।

সু। ধন্য মেয়ে! আবার যদি অমনি হয়? এবার কি কিছু সুবিধা দেখেছ না কি?

কু। না।

সু। তবে আর কেন? মিছা কষ্ট পাবে। ও আশা ছেড়ে দাও।

কু। খুব বুদ্ধি! এতটা করিলাম, এত অপমান সইলাম, বুঝি ছেড়ে দিবার জন্যে?

সু। ধরতে ত পার নাই, তবে আর ছাড়লে কৈ? বৃথা চেষ্টায় কষ্ট পাও কেন? তাই বলি, ও আশা ত্যাগ কর। কুণাল বড় ভাল ছেলে।

তখন কুমতি ও সুমতি একটু ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সুমতি। বলি, অপমানটার শোধ লও না কেন? যে ভরসায় যাইতেছ, সে ভরসা নাই।

কুমতি। এই ভাল পরামর্শ, খানিকটে জব্দ হ'লে উহাকে বশে আনা সুকর হইবে!

সুমতি। তবে সেই ভাল, যাও।

এই বলিয়া দুজনে নিরস্ত হইল। তিষ্যরক্ষা লতাকুঞ্জ ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুণাল অত্যন্ত কাতর ও আকুল মনে কাঞ্চনের সন্ধানে গেলেন; কিন্তু অন্তঃপুরে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না; পুষ্পোদ্যানে খুঁজিলেন, পাইলেন না; বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। যেখানে কাঞ্চনমালাকে ফেলিয়া অভিনয়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া খানিক ভাবিলেন। তথা হইতে নিকটবর্ত্তী মঠায়তনে দেখিলেন, তখনও আলো জ্বলিতেছে। কাঞ্চন প্রত্যহ তথায় ত্রিরত্নসেবার্থ গমন করেন, কিন্তু সে ত এত রাত্রে নয়। এ রাত্রে কাঞ্চন কুণালের কাছ-ছাড়া প্রায় থাকেন না, আজি কাছছাড়া হওয়ায়, কোথায় গেলেন, ভাবিয়া কুণাল কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার মঠ দেখা ভাল বলিয়া উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ও ত্রস্তভাবে তথায় গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কুণাল ত্যাগ করিয়া গেলে পর কাঞ্চন খানিক আপনাকে বড়ই অসহায় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, স্বামী বুঝি আর ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি অন্তঃপুরে গেলেন না, রঙ্গভূমিতে গেলেন না, কোনখানেই গেলেন না। খানিক ত্রিরত্নের ধ্যান করিয়া "ভগবান্ রক্ষা কর, যে বিপদ হয়, আমার হউক, যেন কুণালের পায়ে কাঁটাটিও না ফুটে। আর যেন, অভিনয়ান্তে তাঁহাকে দেখিতে পাই।" এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মঠের সন্ধ্যাকালীন পূজা আরম্ভ হইল, কাঞ্চন সেই দিকে গেলেন, পূজার সমস্ত উদ্যোগ স্বয়ং স্বহস্তে করিলেন। পূজার পর অর্হৎগণের অনুমতি লইয়া ত্রিরত্নমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া পূজা, স্তব ও প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। মঠবাসীরা অনেকেই অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, সুতরাং কাঞ্চনকে, কেন এখানে? কি বৃত্তান্ত? ইত্যাদি প্রশ্নের বড় একটা জবাব দিতে হইল না। যাহাও হইল, তাহা সংক্ষেপে সারিয়া দিয়া একান্তমনে গললগ্নীকৃতবাসাঃ হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন:—"হে ধর্ম্ম! হে সংঘ! হে বুদ্ধ! আমার উৎকণ্ঠা দূর কর, আমার স্বামীর কোনরূপ অমঙ্গল যেন না হয়, আমার স্বামীকে সুস্থশরীরে আমার নিকটে আনিয়া দাও।"

এমন সময় স্বয়ং কুণাল ত্রিরত্ন-সমীপে গললগ্নীকৃতবাসাঃ হইয়া নমস্কার করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হে ত্রিরত্ন! হে ত্রিশরণ! আমার সমূহ

বিপদ উপস্থিত, আমার চিত্ত স্থির করিয়া দাও, আজি যাহা শুনিলাম ও এ পর্য্যন্ত যাহা জানি, তাহাতে প্রাণ বড়ই আকুল হইতেছে ; ধৈর্য্য হইতেছে না। দেব! মনে বল দাও, তোমাতে যেন মন স্থির থাকে, ইহা করিয়া দাও, আমি রাজ্য-ধন কিছু চাহি না। সদ্ধর্ম্ম-প্রচার আমার উদ্দেশ্য, যাহাতে সদ্ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধা হয়, করিয়া দাও, পাপ হইতে রক্ষা কর।"

উভয়েই অবনতমস্তক হইয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, আর প্রার্থনা করিতেছেন। কুণাল যে উপস্থিত, তাহা কাঞ্চন জানেন না। কুণালও কাঞ্চনের ধ্যানে এ পর্য্যন্ত বাধা দেন নাই। কিন্তু প্রণয়ীদের মনে কিছু বৈদ্যুতি আছে, তাহার বলে উহারা পরস্পরের কার্য্যকলাপ যেন কিছু কিছু টের পায়। বিশেষ কাছে আসিলে, কে যেন সে সুখের কথা উহাদের মনোমধ্যে বলিয়া দেয়। সেই ঘোরা দ্বিপ্রহরা, শান্তনলিনী, কুমুদসন্ধ্যামোদিনী, ঝিল্লী-রবরুতমারুতসংসেবিনী, বিহগকুলকলরববিধ্বংসিনী, পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জু তারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয় কচিদুৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌত-বিধৌত সুরভি-চর্চ্চিত বদন শাট্যঞ্চলে আচ্ছাদন করে, আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ় প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য মেধ্যামনঃ-সংযোগবৎ, পুরীতকীমনঃসংযোগবৎ, রুদ্ধবাহ্যকরণক ধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল। যেন ঘোর ঝটিকা-বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইল। যেন দারুণ গ্রীষ্মক্লেদের পর ধীরে ধীরে শৈত্য-সৌগন্ধ-মান্দ্যময় সমীরণ বহিল। তখন দেবতা প্রসন্ন বুঝিয়া কাঞ্চনমালা মস্তক উত্তোলন করিলেন, দেখিলেন, পার্শ্বেই কুণাল—গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাঞ্চন একবার ভাবিতেছেন, ধ্যান ভঙ্গ করি কি না? তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছে, অমঙ্গলের ভাবী ফল উত্তম, অতএব তিনি নির্ভয়ে উঁহার ধ্যানভঙ্গ করাইলেন, তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা চিন্তা মনোবেগের পর পরস্পর সাক্ষাতে, পরস্পর গাঢ়ালিঙ্গনের পর কাঞ্চন কহিলেন, "নাথ! আমার প্রতি ত্রিরত্ন প্রসন্ন হইয়াছেন, আমাদের উপস্থিত অমঙ্গল শুভফল প্রসব করিবে। কিন্তু নাথ! রাজবাটীর এ সকল সুখ দুঃখময়, ইহাতে পদে পদে উৎকণ্ঠা, পদে পদে বিপদ, ও পদে পদে বাধা, আইস, অদ্যাবধি আমরা এই বৃথা সুখভোগ ত্যাগ করিয়া সদ্ধর্ম্মপ্রচারার্থ তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে বেড়াই গিয়া, আমাদেরও কখন বিচ্ছেদ হইবে না। বিশেষ যাহার জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা, তাহারও সুসিদ্ধি হইবে।"

কুণাল বলিলেন—"কাঞ্চন! তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি সুখভোগের জন্য আবার রাজবাটীতে আসিয়াছি? ধনলোভে অথবা যশোলোভে আসিয়াছি? কিছুমাত্র না। আমি এই আশায় আসিয়াছি যে, এখানে থাকিলে,—রাজার প্রিয়পুত্র হইতে পারিলে সদ্ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হইবে। দেখ, আমি করি আর নাই করি, রাজপরিবারের কেহ কেহ আমাদের মত গ্রহণ করিতেছে, রাজা সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আবার উপগুপ্তের নিকট পুনর্দ্দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। এবার উনি সদ্ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করিবেন, এইবার আমার দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইবে ভরসা আছে।"

কাঞ্চন কহিলেন—"নাথ, তোমার এরূপ উদ্দেশ্য, তাহা কি আমি জানি না? জানি, কিন্তু আজি আমার এক প্রস্তাব আছে, আজি পূর্ণিমা রাত্রি, শুভলগ্ন উপস্থিত। আজি ত্রিরত্ন আমাদের উপর বড় সদয়। নচেৎ এমন উৎকণ্ঠার সময় তোমায় আমার কাছে আনিয়া দিবেন কেন? অতএব আমার নিতান্ত ইচ্ছা, আজি এই দ্বিপ্রহররাত্রে দেবতা-সাক্ষাৎ শুভলগ্নে আমরা সদ্ধর্ম্মের জন্য এ জীবন উৎসর্গ করি।"

কুণাল। "সেটা বাহুল্য, কাঞ্চন!" বলিয়া যোড়করে গললগ্নীকৃতবাসে জানূপরি উপবেশন করত উভয়ে একতানমনঃপ্রাণ হইয়া একস্বরে পরস্পরের গলা মিলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ত্রিরত্ন! হে ধর্ম্ম! হে সঙ্ঘ! হে বুদ্ধ! হে বোধিসত্ব! প্রত্যেক বুদ্ধ! শুদ্ধ বুদ্ধ! জীবন্মুক্তগণ, তোমরা সাক্ষী, আমরা স্ত্রী পুরুষ অদ্য শুভদিনে, শুভক্ষণে, সদ্ধর্ম্মের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও প্রচারের জন্য জীবনের অবশিষ্ট অংশ উৎসর্গ করিলাম। যাহাতে সদ্ধর্ম্মের উন্নতি নাই, যাহাতে বুদ্ধদেবের মহিমা-ঘোষণা নাই, এমন কার্য্য আমরা কখন করিব না। অদ্যাবধি ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, বিদ্যা যদি কখন চাই, সে কেবল ঐ একমাত্র কার্য্যের জন্য। হে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ, বোধিসত্বগণ, আমাদের চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন কর।" সহসা মঠায়তনের দীপ হাসিয়া উঠিল। দেবমূর্ত্তির মুখে আনন্দময় মৃদু হাস্যের আবির্ভাব হইল। শৈত্য-সৌগন্ধ-মান্দ্যময় বায়ু প্রবাহিত হইল। আকাশে যেন মাঙ্গল্য তূর্য্যধ্বনি হইল, বোধিসত্বগণ যেন বলিলেন, "তোমাদের মঙ্গল হউক।" এইরূপে জীবন উৎসর্গ করার পর উভয়ে দীক্ষানন্তর অশোক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য দেবদম্পতী সাজিতে গেলেন।

তিষ্যরক্ষা লতাকুঞ্জ হইতে যখন বহির্গত হন, তখন তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে, ভয়মৈত্রী ভিন্ন কুণালকে বশ করা অসম্ভব। এই জন্য তিনি অশোককে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন। অশোককে আশু খুসী করার একমাত্র উপায় আছে বলিয়া বোধ হইল। অশোকের কোন মহিষীই অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তিষ্যরক্ষা যদি এই দিনেই অশোকের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার বড়ই প্রিয়পাত্র হইতে পারিবেন। এই ভাবিয়া পাপীয়সী নিজ পাপবাসনা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে অনায়াসে এক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। নিজ গৃহে গিয়া নিভৃতে অশোক রাজার নামে এক চিঠি লিখিল। পত্রের মর্ম্মার্থ এই—"কয়েক মাস ধরিয়া আমি স্বপ্নে দেখিতেছি, ভগবান্ বুদ্ধ আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। পাছে লোকে অন্যরূপ ভাবে বলিয়া শ্রীচরণে এ ঘটনার বৃত্তান্ত নিবেদন করি নাই, কিন্তু আজি এ উৎসবের সময় আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রার্থনা, দাসীর অনুনয় গ্রাহ্য হয়, ইতি।"

দাসী দ্বারা পত্র প্রাড্বিবাকের নিকট প্রেরিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই প্রাড্বিবাক নানা কারণে এই দুশ্চারিণীর বশীভূত হইয়াছিলেন। ক্ষণে মুহূর্ত্তমধ্যে সভাস্থ রাজার হস্তে পত্র পৌঁছিল, রাজা পত্রপাঠে মহাহৃষ্ট হইয়া তিষ্যরক্ষাকে সময়োচিত রক্তাম্বর পরিধান করিয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। মহা আদরে নিকটবর্ত্তী অনুচরবর্গকে পত্র দেখাইলেন, এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আজি রাজার প্রিয়মহিষী তিষ্যরক্ষারও দীক্ষা হইবে।

গভীর নিবাত নিস্তব্ধ পয়োধির ন্যায় মহার্হৎ উপগুপ্ত বুদ্ধ সাজিয়া বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানে মগ্ন আছেন, তাঁহার সমস্ত বাধা, সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম হইয়া গিয়াছে, ক্রমে তাঁহার মুখে হর্ষচিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। নয়ন মুদ্রিত, মুখ হাস্যময় হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর আহ্লাদে কাঁপিতে লাগিল। তিনি ক্রমে নয়ন উন্মীলিত করিলেন, তাঁহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া ত্রিশরণের নাম উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। স্বর্গ হইতে সিদ্ধ পুরুষ এক জন নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভগবান্, আপনার তপঃসিদ্ধির উদ্দেশ্য কি?" উত্তর হইল, "মগধ সাম্রাজ্যে ধর্ম্মভ্রংশ হইয়াছে, এইখানে সদ্ধর্ম্মপ্রচারই আমার উদ্দেশ্য।" অমনি সিদ্ধপুরুষবেশী অশোকরাজার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপনীত করিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাসনা করিতেছেন, তাঁহার প্রিয়মহিষী তিষ্যরক্ষাও এই সঙ্গে দীক্ষিতা হইতে চান।"

তখন বুদ্ধরূপী উপগুপ্ত উভয় হস্তে উভয়কে ধারণ করত উচ্চৈঃস্বরে সহস্র সহস্র গাথা পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই গভীরস্বরে মধ্যরাত্রির গভীর নিস্তব্ধভাব ভেদ হইয়া যাইতে লাগিল। সভ্যবৃন্দ একতানমনে তাঁহার গাথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণমধ্যে স্বর্গের দেবদম্পতী উপস্থিত হইলেন। শরীর নিরাভরণ, অথচ শরীর-প্রভায় সভাস্থ দীপমালা নিস্তেজ হইয়া গেল। তাঁহারা আশীর্ব্বাদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন, অচিরাৎ সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী বৌদ্ধধর্ম্ম-মহিমায় ব্যাপ্ত হইবে। অশোকের কীর্ত্তিকলাপ দিক্‌চক্রবাল আচ্ছাদন করিবে। মহারাজাকে আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না, তাঁহার ইহলোকেই নির্ব্বাণলাভ হইবে। যেমন কৌমুদী-স্রোত এক প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া অবিরতধারে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পূরিত করে, তেমনি অশোকের যশঃ একমাত্র প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া দিগ্দিগন্তর আচ্ছাদিত করুক।"

সকলে মুগ্ধ হইয়া দেবদম্পতীর আশীর্ব্বাদ শুনিতে লাগিলেন, মহারাজ অশোক দেখিতে লাগিলেন। দিগ্বলয় সমুদ্রজলে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার কেন্দ্রস্থ দ্বীপে তিনি বসিয়া আছেন, তাঁহার চারিদিকে দ্বীপমালা। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈর্ঋত যে দিকে চাও, দ্বীপের পর দ্বীপ, তাহার পর দ্বীপ অনন্ত দ্বীপমালা অনন্ত দিগ্বলয়ে লীন হইয়াছে, আর দেখা যায় না। প্রত্যেক দ্বীপে এক একটি বোধিদ্রুম; এক একটি বৃক্ষের বহুকোটি পত্র, বহুকোটি ফল, বহুকোটি শাখা এবং বহুকোটি কাণ্ড। কোথাও পত্র সকল মরকতময়, স্বর্ণময় ফল, মর্ম্মর-নির্ম্মিত ডালপালা ও স্ফটিকের কাণ্ড; কোথাও শ্বেতমণির পত্র, পীতমণির ফল, নীলমণির পত্র, কৃষ্ণমণির গুঁড়ি; কোথাও কোটি পত্র নীল, কোটি পত্র সবুজ, বৃক্ষসমূহ আদ্যন্ত উজ্জ্বল কিরণ

বিকীর্ণ করিতেছে। সমস্তের উপর ধর্ম্মজ্যোতি চন্দ্রজ্যোতি অপেক্ষা শুভ্রতর স্নিগ্ধতর কিরণ বর্ষণ করিতেছে। বোধ হইতেছে, দুগ্ধসমুদ্রে নবনীত-দ্বীপসমূহ ভাসমান। প্রত্যেক বোধিদ্রুমতলে এক এক জন বোধিসত্ব ধ্যানমগ্ন। কেহ নবনবতি কোটি-কল্প ধ্যান করিতেছেন, কেহ বা তাহার অধিক, কেহ বা তাহা অপেক্ষা অল্প ধ্যান করিতেছেন। কেহ কীটযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি কোটি যোনি ভ্রমণান্তেও এক্ষণে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। কেহ কেহ বুদ্ধ হইতেছেন, নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের ওষ্ঠাধরে হাস্য হইতেছে, আর দন্তপাঁতি হইতে শ্বেত নীল পীত হরিদ্বর্ণের অংশু নির্গত হইয়া জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিয়া গাঢ় অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীবগণের নিকট ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছে।

তিষ্যরক্ষা দেখিলেন, ভয়ানক অন্ধকারমধ্যে চৌরাশীটি নরককুণ্ড রহিয়াছে; একরকম না আলো না অন্ধকার দেখা যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক এই অন্ধকারে চীৎকার করিতেছে! একটি নরকে গন্ধকের অগ্নি জ্বলিতেছে, নাক জ্বলিয়া যায়! কোথাও বিষ্ঠামূত্রহ্রদে পড়িয়া পাপী বিষ্ঠামূত্র উদ্গার করিতেছে! তাহাদের যাতনায় উঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। অমনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। করিলে কি হয়? তখনও উপগুপ্তের হস্ত তাঁহার অঙ্গে স্থাপিত; সেই নরকদৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, কাঞ্চনমালা অবলোকি-তেশ্বর সাজিয়া পাপীদের ত্রাণার্থ উপস্থিত; দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ পাপী চৌরাশী কুণ্ড ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কাঞ্চনমালা তাঁহার দিকে চাহিল না। সমস্ত পাপীগুলি উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল। সেই ঘোরান্ধকারমধ্যে, চৌরাশী ভীষণ নরককুণ্ডের মধ্যে তিষ্যরক্ষা—একাকিনী—বড় ভীতা—প্রায় সেই সভামধ্যে চীৎকারোন্মুখা! এমন সময়ে একটি রশ্মি উপর হইতে তাঁহার মুখে পড়িল। রশ্মিপথে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, কাঞ্চনমালা তাঁহাকে "আয় আয়" বলিয়া ডাকিতেছে, আর কুণাল পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

এই ভাবে উভয়ে আছেন, উপগুপ্ত তাঁহাদের শরীরস্পর্শ ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা আমার মর্ত্ত্যভুবনে প্রবেশ করিয়া উপগুপ্তকে প্রণাম করিলেন। উপ-গুপ্ত তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুণাল ও কাঞ্চনমালা কোথায়?" তিনি তাহাদিগকেও আশীর্ব্বাদ করিতে চান। তাহারা পরম ধার্ম্মিক, ধর্ম্মার্থ বহুতর ক্লেশ পাইয়াছে।

তখন অশোক রাজা প্রিয়পুত্রের এরূপ প্রশংসা শুনিয়া উল্লসিত হইয়া পুত্রকে আহ্বান করার জন্য লোক পাঠাইলেন। পুত্র উপরে বসিয়া তিষ্যরক্ষার ভাব দেখিতেছিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত স্মরণ হইতে লাগিল, তাহার পর দেখিলেন, তিষ্য কেমন ভালমানুষের মত, বকঃ পরমধার্ম্মিকের মত, অশোকের পাশে বসিয়া দীক্ষাসূচক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। যেন সে লোকই নয়। কুণাল তিষ্যের আচরণে স্ত্রীচাতুরীর চরম দেখিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন, পিতা তাঁহার অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিতেছেন। অমনি সস্ত্রীক উপর হইতে নামিয়া পিতার চরণে নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া উপগুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপগুপ্ত তাঁহা-দের মস্তকে হস্ত দিয়া গাথা উচ্চারণ করত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কুণাল দেখিলেন, জেতবনে বুদ্ধদেব সদ্ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন। সিদ্ধ, চারণ, দেব, নর, কিন্নর সকলে শুনিতেছেন, বুদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী বলিতেছেন, এবং কিরূপে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধ হওয়া যায়, কিরূপে ক্রমে দশভূমি অতিক্রম করিয়া বুদ্ধ হওয়া যায়, সমস্ত বিবৃত করিতেছেন; কর্ণা-মৃত-পানে হৃদয় পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, এমন সময়ে বুদ্ধদেব কুণালকে লইয়া আপন আসন-পার্শ্বে বসাইলেন। অমনি সমবেত জনমণ্ডলী হইতে "জয় কুণাল, জয় কুণাল" ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল।

কাঞ্চনমালা দেখিতে লাগিলেন, তিনি নিজে বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানমগ্না, তাঁহার নির্ব্বাণসময় উপস্থিত, প্রায় দশম ভূমি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন ব্রহ্মাণ্ডস্থ পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, দেবদানব, সিদ্ধচারণ-গণ তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "মাতঃ! আমাদের কি উপায় করিয়া গেলে?" বলিয়া রোদন আরম্ভ করিল। তখন কাঞ্চনমালা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, "আমিও অবলোকিতেশ্বরের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ডে এক প্রাণী নির্ব্বাণশূন্য যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণ-প্রত্যাশী নহি।" অমনি সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল, পৃথিবী, চৌরাশী নরক হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল, দেখিলেন, ভগবান্ তেজঃপুঞ্জ অবলোকিতেশ্বর তাঁহার দেহে মিশাইয়া গেলেন।

চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি শুনিতেছেন, আশীর্ব্বাদ শেষ হইল। উপগুপ্ত কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনার পুত্র ও পুত্রবধূর তুল্য লোক জগতে আর নাই। উঁহারা সদ্ধর্ম্মপ্রচারের জন্য

জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।" কুণাল ও কাঞ্চনমালার প্রতি, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণাবধি, রাজার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। অদ্য উপগুপ্তের মুখে তাহাদের অতিবাদ প্রশংসা শুনিয়া রাজার আনন্দ আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি স্নেহনির্ভরহৃদয়ে উহাদের গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন জয় ধর্ম্ম, জয় সংঘ, জয় বুদ্ধ, জয় মহারাজ ধর্ম্মাশোক, জয় কুণাল, জয় কাঞ্চনমালা, জয় রাজমহিষী তিষ্যরক্ষা—ইত্যাকার জয়ধ্বনির মধ্যে সকলে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আপন আপন বিশ্রামালয়ে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিষ্যরক্ষা প্রাতঃকালে কি করিল, বলিবার পূর্ব্বে উহার জীবনবৃত্তান্তের পূর্ব্বকথা বলা আবশ্যক। তিষ্যরক্ষা এক জন ক্ষৌরকারের কন্যা। তাহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধেও এ বংশের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল না। তিষ্যরক্ষা ভূমিষ্ঠ হইলে এক জন গণক বলিয়াছিলেন যে, সে রাজরাণী হইবে। তিষ্যরক্ষা অতি অল্পবয়সে সে কথা শুনিয়াছিল। তদবধি রাজরাণী হইবার জন্য বাসনা বড়ই প্রবল হয়। তাহার পিতা তাহাকে সমান ঘরে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন; তাহাতে সে বলিয়াছিল, "রাজরাণী হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে সূর্পণখার ন্যায় বাসরঘরেই বৈধব্যের উপায় করিয়া লইব।"

এই সময়ে বিন্দুসার-পুত্র অশোক অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিলেন। বয়স অল্প; অথচ তাঁহার জ্বালায় রাজা, মন্ত্রী, রাণীগণ, প্রজা, বণিক, ব্যবসায়ী সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাজা এরূপ দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে রাজধানী হইতে দূর করিবার অভিপ্রায়ে কীকট দেশের দক্ষিণস্থিত অরণ্যবাসী পিঙ্গলবৎসের নিকট শিক্ষার্থ তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। পিঙ্গলবৎস যে কেবল জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন, তাহা নয়; তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বিশেষ তিনি দুর্গম জঙ্গলমধ্যে বাস করিতেন বলিয়া সন্তান দুর্ব্বৃত্ত হইলে লোকে তাঁহারই নিকট শিক্ষার্থ প্রেরণ করিত।

অশোক তথায় প্রেরিত হইবার অল্পদিন পরেই তিষ্যরক্ষার পিতাও উহার জ্বালায় অস্থির হইয়া উহাকে প্রেরণ করেন। এইরূপে পিঙ্গলবৎসের গৃহে এই দুই ঘোর দুর্ব্বৃত্ত, নিষ্ঠুর, খলস্বভাব যুবক-যুবতীর পরস্পর সাক্ষাৎ হয়।

অশোকের ইতিপূর্ব্বে দুই তিনবার বিবাহ হইয়াছিল। পিঙ্গলবৎস গণিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিন্দুসারের সন্তানগণের মধ্যে অশোকই রাজা হইবে। এই কথা শুনিয়া অবধি পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে অশোককে মুগ্ধ করাই তিষ্যরক্ষার প্রধান কর্ম্ম হইয়াছিল। তিষ্যরক্ষা তাদৃশ সুন্দরী ছিল না, শিল্পাদি বিদ্যায়ও তাহার কিছুমাত্র দখল ছিল না; কিন্তু সে যাহা ধরিত, তাহা ছাড়িত না।

সংকল্প করিল, যেরূপে হয়, অশোককে বিবাহ করিতেই হইবে। সে ষড়্যন্ত্রকার্য্যে বাল্যকাল হইতেই বৃহস্পতি; প্রথম হইতেই অশোককে ভুলাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। অশোক প্রথম হইতেই নাপিতের মেয়ে বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতেন। সুতরাং বিবাহের নামেই তিনি চটিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা পণ করিল, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াও অশোকের সহিত মিলিত হইবে।

অশোকেরও এ সময় পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাল-মন্দ, কিছুই জ্ঞান ছিল না। সুতরাং নিজ পণ বজায় করিতে তিষ্যরক্ষার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না। তিনি অচিরাৎ পাপীয়সীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া তিষ্যরক্ষা সর্ব্বপ্রথম মহাবিপদে পড়িল; এ কথা প্রকাশ করিলে অশোক তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবে। অপ্রকাশ থাকিলেও রাজরাণী হওয়া হইবে না। আপনা আপনি প্রকাশ হওয়া অনেক গোল। অতএব পাপীয়সী গোপনে তাহার পিতাকে পত্র লিখিল। পত্রে জানাইল, "এখানে অনেক দুষ্ট লোক আছে, অধিক দিন রাখিলে আমার উপর ঘোরতর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা।"

পত্র পাইয়া ধূর্ত্ত নাপিত বুঝিল। সে তৎক্ষণাৎ পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে গিয়া প্রকৃত অবস্থা পিঙ্গলবৎসকে বলিল। আর বলিল—"আমাদের জাতি যাহাতে রক্ষা হয়, তাহা আপনি করুন।"

পিঙ্গলবৎস ক্রোধে অন্ধ হইয়া অশোককে ডাকাইলেন, জোর করিয়া তিষ্যরক্ষার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত রাজাকে লিখিয়া বলিলেন—"এরূপ দুর্ব্বৃত্ত কুমারের শিক্ষাদান আমার কর্ম্ম নহে। আপনি আপনার পুত্র ও পুত্রবধূকে এখান হইতে লইয়া যান।"

বিন্দুসার উভয়কে রাজধানী লইয়া গেলেন। পুত্রকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন, পুত্রবধূকে অন্তঃপুরমধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। সে অতি দীনভাবে অন্তঃপুরমধ্যে দিনযাপন করিতে লাগিল।

অল্পদিনের মধ্যেই আবার রাজপুত্রের অত্যাচারে নগরশুদ্ধ লোক উত্যক্ত হইয়া উঠিল। রাজা পুত্রকে আবার রাজধানী হইতে বিদায় করিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তক্ষশিলায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বিদ্রোহী হইয়াছে সংবাদ আসিল। রাজা এই সুযোগে অশোককে সেনাপতি করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন।

তিষ্যরক্ষা অশোকের মহিষী হইল এবং রাজার অন্তঃপুরেও রহিল। কিন্তু সে দেখিল, রাজরাণী হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। অশোকের জ্যেষ্ঠ অনেকগুলি ভাই আছে। সেগুলিকে বঞ্চিত করিতে না পারিলে রাজরাণী হওয়া হইবে না। অতএব কি উপায়ে ইহাদিগকে দূর করা যায়, সেই চেষ্টায় রহিল। প্রথমতঃ বিহিতবিধানে শাশুড়ী সুভদ্রাঙ্গীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। রাজার কাণে গেল, নাপিত কন্যা পুত্রবধূ বড়ই সাধুশীলা। অতএব এই অবধি তাহার আদর বাড়িল, তাহার পরিচর্য্যায় দাসদাসী নিযুক্ত হইল। অন্তঃপুরস্থিত অপর স্ত্রীলোকেরা তাহার শত্রু হইল। সেও রাণীর কাছে বসিয়া নিত্য নিত্য পৌরস্ত্রীগণের বিরুদ্ধে তাঁহার কাণ ভারী করিয়া দিতে লাগিল। রাজার কাণ ক্রমে অন্যান্য পুত্রবধূদের বিরুদ্ধে ভারী হইয়া উঠিল। অল্পদিনের মধ্যেই সকলে জানিল, অন্তঃপুরে তিষ্যরক্ষা যা করে, তাই হয়।

এই সময়ে রাধগুপ্ত রাজবাড়ীতে প্রথম চাকরী স্বীকার করিয়াছেন। রাধগুপ্ত চাণক্যের মন্ত্রশিষ্য। ষড়্‌যন্ত্র-নির্ম্মাণে কুটিল, রাজনীতিজ্ঞতায়, বিষাদি প্রয়োগে চাণক্যের প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু অদ্যাপি লোকে তাহার মর্ম্ম জানিতে পারে নাই। সেও বুঝিয়াছিল যে, একটি কোন বিষম গোলযোগ না ঘটিলে সহসা বড় হইতে পারা যাইবে না। সুতরাং সে রাজ্যের মধ্যে বিষম একটা গোলমালের সময় অপেক্ষা করিতেছিল। সে দেখিল, নাপিতানী তিষ্যরক্ষা আমার অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে। নাপিতানীও দেখিল, রাধগুপ্তকে হাত করিলে রাজরাণী হইবার যোগাড় হইতে পারে। সুতরাং অর্দ্ধপথে উহাদের মিল হইল। দুজনেই পরস্পরের মন যোগাইয়া চলিতে লাগিল। দুজনেই অপেক্ষা করিতে লাগিল—একটা গোলযোগ বাধিলে হয়

তাহাদের অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না; শীঘ্রই একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল।

রাজার শ্রেষ্ঠ পুত্র সুষীম এই গোলযোগ বাধাইবার হেতু। রাজা অনেক কার্য্যে সুষীমের পরামর্শ লইতেন। সুষীম বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, ধীর ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি অতি লম্পটস্বভাব। তাঁহার লাম্পট্য-দোষ হেতু রাধগুপ্ত ও প্রধান মন্ত্রী উভয়েই তাঁহার প্রতি চটা ছিলেন। এক্ষণে পাটলীপুত্রস্থ শ্রেষ্ঠীবংশীয় কোন মহিলার প্রতি দারুণ অত্যাচার করায় তাঁহার প্রতি দেশের লোক অতিশয় চটিয়া গেল। এমন কি, সকলে আসিয়া মহারাজের নিকট উহার নির্ব্বাসনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী, রাধগুপ্ত ও তিষ্যরক্ষা সকলেই এই লোকবিরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; শেষে এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে, রাজপ্রাসাদের মধ্যেও সুষীমের বাস করা দুরূহ হইয়া পড়িল। তখন রাজা অনন্যোপায় হইয়া সুষীমকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন এবং অশোককে রাজধানী প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন।

মাসমধ্যে অশোক আসিয়া পাটলীপুত্রে পৌঁছিলেন। তিনি পৌঁছিবার দুই তিন দিনের মধ্যেই হঠাৎ রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হইল। হঠাৎ মৃত্যুর কারণ-নির্ণয় হইল না। নগরবাসীরা কেহ কেহ "বিষ বিষ" বলিয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল, কিন্তু কে দিল, কেহই জানে না। দুই এক দিনের মধ্যেই নগরবাসিগণ নূতন অভিষেকে মত্ত হইল। পুরাণ রাজার আকস্মিক মৃত্যুর কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। রাধগুপ্ত অশোককে অভিষেক করিলেন; রাধগুপ্ত প্রধান মন্ত্রী হইলেন। অশোকের প্রধান মহিষী পরিষ্যরক্ষিতা পাটরাণী হইয়া সিংহাসনার্দ্ধভাগিনী হইলেন।

কিন্তু সাত আট দিনের মধ্যেই অভিষেকের আহ্লাদ ভয়ে পরিণত হইল। সুষীম বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া পাটলীপুত্র অবরোধ করিলেন। অশোকের মন ভ্রাতার সহিত বিবাদ করা উচিত কি না ভাবিয়া চলৎচিত্ত হইল। তিনি কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে তিষ্যরক্ষা আসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। রাজার মনের অস্থিরতা দেখিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আমি আপনার মত অবস্থায় পড়িলে এত দিনে ফলে-ফুলে বাগানের সমস্ত গাছ কাটিয়া পার করিয়া দিতাম।"

তিষ্যরক্ষা যেরূপ দার্ঢ্য সহকারে বাগানের গাছ

কাটিয়া পার করিবার কথা বলিলেন, তাহাতে অশোকের মনে দার্ঢ্য সম্পাদন করিল। তিনিও বলিয়া উঠিলেন,—"নাপিতানী! এই চলিলাম, বাগানে একটি গাছ থাকিতে কুঠার ত্যাগ করিব না।"

বলিয়া সশস্ত্রে মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধকার্য্যে অশোক বীরাগ্রগণ্য। তাঁহার ভুজবলে সুষীমসেনা পরাজিত হইল। সুষীমও পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাহার পর চন্দ্রগুপ্তের বংশীয় গর্ভস্থ শিশুরও প্রাণসংহার করিয়া অশোক বিস্তীর্ণ মগধ সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। মাতা সুভদ্রাঙ্গীর একান্ত অনুরোধে স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বীতাশোককে জীবিত রাখিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা তাঁহাকে ধৰ্ম্মভ্রষ্ট করিয়া বৌদ্ধ মঠে আবদ্ধ করিবার পরামর্শ দিল। বীতাশোক শাক্যভিক্ষু হইয়া পৌণ্ড বর্দ্ধন নগরে ভিক্ষা দ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিল।

এইরূপে অশোক রাজা হইলেন, তিষ্যরক্ষা রাজরাণী হইল। সে নাপিত-কন্যা এবং সম্যক্ বিবাহিতাও নহে, এই জন্য সে পাটরাণী হইতে পারিল না। কিন্তু গণকে সে তো পাটরাণী হইবে বলে নাই? সুতরাং সে জন্য তাহার মনের ক্ষোভও নাই। অশোক রাজা হইলেন, তিষ্য রাজরাণী হইল। বাল্যকালাবধি যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সে দিনরাত্রি চিন্তা করিত, যাহার জন্য ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য সকলই অসার বলিয়া বোধ হইত, যাহার জন্য কোন দুষ্কর্ম্ম করিতেই সে কুণ্ঠিত হয় নাই, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। অশোক রাজা হইলেন, তিষ্য রাজরাণী হইল। উভয়েই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির আমোদে কিছুদিন কাটিয়া গেল। ক্রমে রাজপদ ও রাজরাণী পুরান হইয়া উঠিল। উভয়েরই ভাবিবার অবসর হইল।

উভয়েই দেখিলেন যে, সব ত হইল, কিন্তু আমার কি হইল? এত কষ্ট করিয়া, এত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া, এত আত্মীয়-বান্ধবের প্রাণনাশ করিয়া, এই যে উচ্চপদে আরোহণ করিলাম, ইহাতে আমার নিজের কি হইল?

অশোকের "নিজের কি হইল" ইহার অর্থ—আমার পরকালের কি হইল? তিষ্যরক্ষার "আমার কি হইল" ইহার অর্থ—আমার নারীজন্মের সুখ কৈ হইল?

অশোকের এই ভাবনার ফল বৌদ্ধ-ধৰ্ম্মাশ্রয় ও জগতে "অহিংসা পরমো ধৰ্ম্মঃ" প্রচার।

তিষ্যরক্ষার ভাবনার ফল হইল, স্বামীতে তাহার মন উঠিল না। স্বামীর বয়স হইয়াছে, তিনি রাজকার্য্যে ব্যস্ত, আবার তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক হইলেন। তিষ্যরক্ষা জানিল, এ স্বামী হইতে তাহার নারীজন্মের সুখ হইবে না। সুতরাং সে পরপুরুষসহবাসে নারীজন্মের সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে ভুবনমোহন রূপবান্ কুণাল তাহার নয়নপথের পথিক হইল। কুণালের স্নিগ্ধ শ্যামল উজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া সে ভুলিয়াছিল। সে কুণালকে পাইবার জন্য বিবিধ বিধানে চেষ্টা করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালার সুখ তাহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। সে প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বদাই কুণালকে চখে চখে রাখিতে লাগিল। তাই আজি সন্ধ্যার সময়ে কৃত্রিম শৈলোপরি দাঁড়াইয়া সে কুণাল ও কাঞ্চনমালার মালা-গাঁথা দেখিতেছিল। তাই সে কাঞ্চনমালার মালাগুলি চুরি করিয়া অভিনয়স্থলে মারবেশী কুণালের পত্নী সাজিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাই সে আজ কুঞ্জমধ্যে এ প্রকার নির্লজ্জভাবে আপনার মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুণাল ও কাঞ্চন গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দুই জনেরই মনে ভয়ানক আশঙ্কা হইয়াছে, শীঘ্রই বিপদ হইবে; কিন্তু দুজনেরই ভরসা হইয়াছে যে, উহার পরিণাম সদ্ধর্ম্ম-প্রচারের পক্ষে বড় শুভকর হইবে। তাঁহারা সমস্ত পথ কাটাইয়া কাঞ্চন-কুটীরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবামাত্র দ্বারের উপর হইতে একখানি ভূর্জ্জপত্র পতিত হইল, তাহাতে এই লেখা আছে,—

"তোমায় আজি আমার বিশেষ প্রয়োজন; একবার তিষ্যরক্ষার কুঞ্জে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও—অভিনয়ান্তে তথায় তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।"

কুণাল দেখিলেন, পাটরাণী পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর। তখন তিনি আর বিলম্ব না করিয়া কাঞ্চনকে বলিলেন,—"কাঞ্চন! পাটরাণী আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

কাঞ্চন বলিলেন, "এত রাত্রে পাটরাণী ডাকিবেন কেন ?"

"যখন ডাকিয়াছেন, তখন তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য" বলিয়া কুণাল তিষ্যরক্ষার কুঞ্জাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

কাঞ্চন ভাবিলেন, রাজবাড়ীতে কেবল ভয়, ভাবনা আর বিচ্ছেদ ও অধর্ম্ম। ইহা অপেক্ষা বনে বনে ভ্রমণ ভাল না কি ? ভাবিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কুণালও দ্রুতপদে কুঞ্জমধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিষ্যরক্ষাই বাস্তবিক যত নষ্টের গোড়া। সে পরিষ্যরক্ষিতার গৃহ হইতে ঐ পত্রখানি চুরি করিয়াছিল। গোপনীয় পত্র বলিয়া তাহাতে শিরোনাম ছিল না। চুরি করিয়া সে নিজেই পত্রখানি কুণালের দ্বারের চৌকাঠে লাগাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, অভিনয়ের পর এই উপায়ে আবার কুণালকে কুঞ্জমধ্যে পাইবে; এবং সেই সুযোগে আপনার অভীষ্টসিদ্ধির সুবিধা করিয়া লইবে। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যসাধনের এক বড় বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অভিনয় শেষ হইলে রাজা বলিলেন,—"তিষ্যরক্ষে প্রেয়সি! আজি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তুমি আমায় বড় সন্তুষ্ট করিয়াছ। আজি আমি তোমার মহলেই রাত্রিযাপন করিব।"

তিষ্যরক্ষা মুখে মহা আনন্দ সহকারে বলিল, "মহারাজ! দাসীর প্রতি ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি অনুগ্রহ হইতে পারে ?"

কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং কি উপায়ে বৃদ্ধ রাজাকে শীঘ্র ঘুম পাড়াইয়া নিজের পাপ-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শীঘ্র পলায়ন করিতে পারে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন, "আমি তোমার গৃহে যাইব শুনিয়া হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হইলে কেন ?"

দুষ্টবুদ্ধি তিষ্যরক্ষা অমনি বলিল, "মহারাজ! আমার ইচ্ছা, অদ্য রাত্রে শয়ন করিব না। বহুকাল অসদ্ধর্ম্মে কাটাইয়াছি, কখন বৌদ্ধ দেবায়তন দেখি নাই, তাই মনে করিতেছিলাম, দীক্ষা লইয়া একবার রাজপ্রাসাদের ও নগরের মঠগুলি নমস্কার করিয়া আসি।"

রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"প্রেয়সি! তুমি অত্যন্ত সাধু সংকল্প করিয়াছ। অতএব আমি আর তোমার মহলে যাইব না, আমি নিজ মহলেই যাই।"

তিষ্যরক্ষা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল—"স্বামিন্! দেবদর্শন অপেক্ষা স্বামি-পাদদর্শন অধিক বাঞ্ছনীয়। অতএব আপনি যদি আজি আমার মহলে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে অতি সত্বর দেবদর্শন সমাপন করিয়া স্বামিপাদ দর্শন করিব, তাহাতে অনেক পাপ বিনষ্ট হইবে এবং সদ্ধর্ম্ম গ্রহণের বিশেষ অধিকারী হইব।"

রাজা মহা আহ্লাদিত-চিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং শতমুখে তিষ্যরক্ষার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

৩

কোনরূপে রাজাকে শয়ন করাইয়া তিষ্যরক্ষা তাড়াতাড়ি কুঞ্জের মধ্যে উপস্থিত হইল। দেখিল, কুণাল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন এবং চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

তিষ্যরক্ষা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিষ্যরক্ষাকে দেখিয়া কুণালের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"তবে তুমিই কি চক্র করিয়া আমাকে এখানে আনাইয়াছ ?"

তিষ্যরক্ষা হাসিতে হাসিতে কহিল,—"হাঁ, আনাইয়াছি। আমি পরিষ্যরক্ষিতার পত্রখানি চুরি করিয়া তোমার দ্বারে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। উহা গোপনীয় পত্র, উহাতে শিরোনামা ছিল না বলিয়া আমার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমি তোমার জন্য এত করিতেছি, তোমার মন কি কিছুতেই বিচলিত হয় না ? এইমাত্র বৃদ্ধপতিকে বঞ্চনা করিয়া তোমার নিকট আসিতেছি, তুমি এত কঠিন কেন ?"

কুণাল অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া তথা হইতে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তিষ্যরক্ষা দৌড়িয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল—"যখন তুমি আসিয়াছ, যখন তোমায় একবার পাইয়াছি, তোমায় আমার কতকগুলি কথা শুনিতে হইবে। নহিলে আমি ছাড়িব না, এখনই চীৎকার করিয়া উঠিয়া মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ করিব।"

কুণাল বড় বিপদে পড়িলেন। উহাকে ঠেলিয়া

ফেলিয়াও যাইতে পারেন না, অথচ রাগে সর্ব্বাঙ্গ শরীর জ্বলিতেছে, বলিলেন, "বল, কিন্তু আমার অঙ্গস্পর্শ করিও না।"

তিষ্যরক্ষা বলিল,—"আচ্ছা, শুন, রাজার উপর আমার প্রভাব দেখিলে তো? এক মুহূর্ত্তে আমি রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র হইয়াছি। তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দেওয়াইতে পারিব। তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। যদি না হও, আমি রাজাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার কাঞ্চনমালার সর্ব্বনাশ করিব।"

কুণাল বলিলেন,—"সে যাহা করিবার করিও, এখন আমায় ছাড়িয়া দেও।"

তিষ্যরক্ষা বলিল,—"তবে জানিও, রাজপুরীমধ্যে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।"

কুণাল বলিলেন,—"থাক, তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি নাই। তোমার আর কিছু বলিবার আছে?"

"না, কিন্তু আর এক দিন তোমায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।"

"সে যখন হইবার, তখন হইবে, এখন আমার পথ ছাড়িয়া দেও।"

এমন সময় দূরে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তিষ্যরক্ষা বুঝিল, পরিষ্যরক্ষিতা এই কুঞ্জে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি সরিয়া একটি নিবিড় লতার মধ্যে প্রবেশ করিল, কুণালকে বলিল,—"তুমি পলাও।"

পরিষ্যরক্ষিতা লতাগৃহে প্রবেশ করিয়া মহামাত্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"আজি কি কি ঘটনা হইল?" ব্রাহ্মণ সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। তিষ্যরক্ষা বৌদ্ধ হইয়াছে শুনিয়াই পাটরাণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"সে কি! সে যে আমার ডান্ হাত।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তাহার অভিপ্রায় তো বুঝিতে পারিলাম না।" পাটরাণী বলিলেন,—"তবে তো কাহাকেও বিশ্বাস নাই। আমাদের কাজকর্ম্ম অতি গোপনে করিতে হইবে। তুমি কি পরামর্শ বল?"

ব্রা। গোপনে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কিসে এ বিধর্ম্ম-স্রোতঃ রোধ হয়?

পা। দেবতারা নিজেই রক্ষা করিবেন। কিন্তু আপাততঃ কি করিলে লোকের মন ফিরান যায়?

ব্রা। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ প্রবল, সেইখানে সেইখানেই বিদ্রোহ হইবে।

পা। কিন্তু অশোক রাজার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে কি?

ব্রা। সকলে একত্র হইলে কি হয়, বলা যায় না। কিন্তু সকলের একত্র হইবার সম্ভাবনা বড়ই অল্প। ব্রাহ্মণেরা যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান।

পা। বিদ্রোহের কথায় আমাদের কাজ নাই। অন্য কিছু উপায় আছে বলিতে পার?

ব্রা। এক উপায় আছে। আমরা বোধিদ্রুমটি লুকাইয়া ফেলি। তাহার পরদিন দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিব যে, বিধর্ম্মীদের বটগাছ দেবতারা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

পা। কিন্তু তাহা কি প্রকারে করিবেন? সেখানে অনেক পাহারা আছে।

ব্রা। সে ভার আমার। বৃক্ষ অদৃশ্য হইলে লোকে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে এবং বিধর্ম্মীর মুখে চূণকালি পড়িবে।

এই প্রস্তাবে উভয়ে সম্মত হইয়া দণ্ড দুই রাত্রি থাকিতে ফিরিয়া গেল। উভয়ে দিব্য করিয়া গেল, কাহারও কাছে এ কথা প্রকাশ করিবে না। তাহার পর প্রয়োজন হয়, নগরমধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও লাগাইয়া দিবে। কিন্তু এই দুজন ছাড়া আর কাহারও কাণে উঠিবে না।

তিষ্যরক্ষা বনান্তরালে বসিয়া সমস্ত শুনিল। শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—"আর কাজ নাই।"

আবার,—"যদি অভীষ্টই সিদ্ধ না হইল, তবে জীবনেরই প্রয়োজন কি?"

এইরূপে কুণালের কথা ভাবিতে ভাবিতে পরিষ্যরক্ষিতা ও ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়িল। তখন পাপীয়সী ভাবিল,—"এই পরিষ্যরক্ষিতাকে তাড়াইয়া পাটরাণী হইবার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। পাটরাণী হইলে, পরিষ্যরক্ষিতা অপেক্ষা আমার অনেক অধিক ক্ষমতা হইবে। যদি পাটরাণী হইতে পারি, কুণালকে আয়ত্ত করিবার অনেক সুবিধা হইবে। আমি পাটরাণী হইলে, আমিই রাজা, আমিই মন্ত্রী, এবং আমিই সেনাপতি হইব। তখন আর একবার দেখিব।"

পরিষ্যরক্ষিতার সর্ব্বনাশ করিয়া পাটরাণী হইবে, আপাততঃ ইহাই তাহার সঙ্কল্প হইল। সে কিছুকালের মত কুণালকে বিস্মৃত হইবে বলিয়া মন বাঁধিল।

কুণাল নিজগৃহে ফিরিয়া দ্বার খুলিলেন [illegible]ল-য়াই দেখিলেন, কাঞ্চনমালা স্বপ্নে কাঁদিয়া বলিতেছে,—"তুমি কোথায়, নাথ! তুমি কোথায়, নাথ!"

কুণাল শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, কাঞ্চনের শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে—সে যেন কোন বিষম স্বপ্ন দেখিয়া বিহ্বল ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কুণাল আস্তে আস্তে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আস্তে আস্তে উহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"এই যে কাঞ্চন, আমি এসেছি।"

কাঞ্চন কাঁদিয়া বলিল,—"ও কি, তুমি যে পথ দেখিতে পাইতেছ না? তুমি যে অন্ধ হইয়াছ!"

কুণাল আবার বলিলেন,—"কৈ কাঞ্চন, আমার ত দিব্য চক্ষু রহিয়াছে?"

"না, না, তুমি অন্ধ হইয়াছ বৈ কি। চল, এখানে আর কাজ নাই। ঐ দেখ, ভগবান্ ডাকিতেছেন। আমি লাঠি ধরি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে এস। নহিলে উঁচট খাইয়া পড়িবে।"

কুণাল দেখিলেন, কাঞ্চনমালা বড়ই যন্ত্রণা পাইতেছে। উহার অনাবৃত শ্বেতবক্ষ তরঙ্গাভিহত গঙ্গাসলিলের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তিনি আস্তে আস্তে উহার গায়ে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া উহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। সহসা নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহস হইল না। ভাবিলেন,—সমস্ত দিন উৎকণ্ঠার পর একটু ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙ্গাব কি?

অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিলেন, স্বপ্নের কষ্ট নিবারণ হইল না। কাঞ্চন বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। উহার বুক আরও ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তখন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে—অতি ধীরে নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিলেই কাঞ্চনের একটু সুস্থ বোধ হইল। কিন্তু তখনও হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—"নাথ! করিলে কি? এ যে শেষ রাত্রের স্বপ্ন?"

কুণাল বলিলেন,—"তা হোক্, তুমি আবার ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

বলিয়া উভয়েই শয়ন করিলেন। কুণাল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সহজেই ঘুম আসিল। কিন্তু কাঞ্চন অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারিল না। তাহার প্রাণ হুহু করিতে লাগিল। বার বার প্রাণনাথকে স্পর্শ করিতে লাগিল। কিন্তু মনের ভয় ও উদ্বেগ দূর হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রিপ্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তিষ্যরক্ষা আপন মহলে আসিয়া জুটিল। দেখিল, মহারাজের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সে আর নিজে ঘুমাইল না। রাজার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল; পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণে নিদ্রের এক একবার ঢুলনি আসিতে লাগিল, অতি কষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া রাজার নিদ্রাভঙ্গের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একবার অঞ্চল পাতিয়া রাজার পদপ্রান্তে শয়ন করিল; আবার উঠিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বেই মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, তিষ্যরক্ষা তাঁহার পদসেবা করিতেছে। উঠিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি এখনও ঘুমাও নাই?"

"না মহারাজ, আমার আর ঘুমাইবার যো নাই।"

"সে কি, যো নাই কেন? তুমি বুঝি এই ঠাকুর দেখিয়া আসিতেছ?"

"না মহারাজ, আমার ঠাকুর দেখিতে যাওয়া হয় নাই!"

"আমি তো দেখিলাম, তুমি বাহির হইয়া গেলে?"

"গিয়াছিলাম বটে, তখনই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।"

"আসিতে হইয়াছে! ইচ্ছাপূর্ব্বক আইস নাই?"

"না মহারাজ, সে সব কথায় কাজ নাই" বলিয়া তিষ্যরক্ষা তাড়াতাড়ি স্বহস্তে রাজার মুখ-প্রক্ষালনার্থ সুগন্ধি বারি আনিয়া দিল, এবং তাঁহার মুখাদি প্রক্ষালনের জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া উদ্যোগ করিতে লাগিল।

রাত্রে কি স্বপ্ন দেখিয়া রাজার মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তিষ্যরক্ষার কথায় তাঁহার মন আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি উহার কার্য্যে বাধা দিয়া বলিলেন,—"তুমি বল, কেন তোমায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে?"

"সে অতি সামান্য কারণ, আমি ভয় পাইয়াছিলাম।"

"না, না, তুমি গোপন করিতেছ। ঠিক করিয়া বল, কি হইয়াছে?"

"কিছু নয়" বলিয়া তিষ্যরক্ষা আবার রাজার মুখ-প্রক্ষালনার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিল। রাজা বলিলেন,

—"না বলিলে আমি ছাড়িব না, তোমায় বলিতেই হইবে।"

"সত্যই মহারাজ, আমার ভয় লাগিয়াছিল।"

"কিসের জন্য ভয় লাগিল ?"

"মহারাজ, আমি মহল হইতে বাহির হইয়া আমার বাগানের সীমা পার হইতে না হইতেই দেখি, আমারই কুঞ্জমধ্যে জনকতক লোক বসিয়া কি বলাবলি করিতেছে। আমার অত্যন্ত ভয় হইল। তাহার পর দেখি, দুই তিন জন লোক আমার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। মহারাজ এখানে একাকী শয়ন করিয়া আছেন, সুতরাং আমার বড় ভয় হইল। আমি ঘুরিয়া অন্য পথে বাড়ীর মধ্যে আসিবার চেষ্টা করিলাম, দেখিলাম, সকল পথেই দুই এক জন দুই এক জন লোক। হঠাৎ কতকগুলা শুষ্ক পাতা আমার পায়ে লাগিল। তাহার মধ্যে একটা কি ঠাণ্ডা জিনিস বোধ করিলাম, আস্তে আস্তে তুলিলাম; তুলিয়া দেখি ছোরা। তখন আর আমার সন্দেহ রহিল না। ভয়ে প্রাণ হাঁপাইতে লাগিল। ভাবিলাম, মহারাজ আমার মহলে একা শয়ন করিয়া আছেন।"

"অ্যাঁ, শুষ্ক পাতার মধ্যে ছোরা পেলে ?"

"তাই পাইয়াই তো আমার আরও ভয় হইল; আমি একটু থতমত খাইয়া রহিলাম। শেষে ভাবিলাম, মহারাজ একাকী শুইয়া রহিয়াছেন, আমার কোথাও যাওয়া উচিত নয়!"

"তোমার কি বোধ হয়, আমারই উপর তাহাদের রাগ ?"

"কেমন করিয়া জানিব, মহারাজ ? আমি তো সেই ছোরা সহায় করিয়া, সাহসে ভর করিয়া দরজার দিকে দৌড়িলাম। যাহারা আমার বাড়ীর দিকে আসিতেছিল, তাহারা আমায় তাড়া করিল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঝনাৎ করিয়া দরজা ফেলিয়া হুড়কা দিলাম। সে শব্দ কি শুনিতে পান নাই ?"

রাজাও স্বপ্নে কি একটা শব্দ শুনিয়াছিলেন, বলিলেন,—"ঝনাৎ শব্দ শুনি নাই, একটা কি হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্ শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

"তবে আপনি হুড়কা দিবার শব্দ শুনিয়াছিলেন।"

রাজা অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন,—"হবে।"

ভিম্যরক্ষা আবার তাঁহার মুখ-প্রক্ষালনাদির উদ্যোগ করিতে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন রাজা সম্বিৎ হইলেন, ভিম্যরক্ষাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"কে কে লোক আসিয়াছিল, কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছ কি ?"

"না, মহারাজ, কাহাকেও চিনিতে পারি নাই।"

"তাহাদের বেশ কিরূপ ছিল ?"

"একে আমার ভয়ে ধাঁধা লাগিয়াছিল, তাহার পর জ্যোৎস্নালোকে সবই চক্চকে দেখাইতেছিল।"

"কয়েক জন লোককে এদিক্ ওদিক্ দিয়া আসিতে দেখিলে, কে কোন্ দিক্ দিয়ে আসিল মনে হয় ?"

"দুই এক জন লোক কাঞ্চনকুটীরের দিক্ দিয়া আসিয়াছিল।"

"কাঞ্চনকুটীরের দিক্ দিয়া ? ব্যাপারখানা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। যা হোক্, তুমি আমায় ডাক নাই কেন ?"

"প্রথমে দরজা দিয়াই তো খানিকক্ষণ অজ্ঞানের মত পড়িয়া রহিলাম। তাহার পর আসিয়া দেখিয়া গেলাম, মহারাজ নিদ্রাগত আছেন, বাড়ীর ভিতরে কোন গোলযোগ নাই। একবার ভাবিলাম, মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ করি; আবার ভাবিলাম, ছাদের উপর হইতে দেখিয়া আসি; বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখিলে মহারাজকে জাগাইব।"

"তুমি ছাদে উঠিয়াছিলে ? কিছু দেখিতে পাইয়াছ ?"

"কিছুই না।"

"একেবারে কিছু না ? এত লোক সব তবে কোথায় গেল ?"

"কেবল বোধ হইল যেন, দুজন একজন লোক পাটরাণীর মহলের কাছ দিয়া কোথায় গেল।"

"পাটরাণীর মহলের দিক্ দিয়া গেল, না মহলে গেল ?"

"ঠিক বলিতে পারিতেছি না; সেই পর্য্যন্তই গেল, তার পর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না।"

"আমার একটা বড় সন্দেহ হইতেছে।"

"আমি তো, মহারাজ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; রাত্রে আমার বড় ভয় হইয়াছিল।"

মহারাজ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ভয়ের তো খুবই কারণ আছে দেখিতেছি।" বলিয়া মহারাজ সত্বর রাধগুপ্তকে ডাকাইয়া তাহাকে এই ব্যাপারের তথ্য অনুসন্ধানের ভার দিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভিম্যরক্ষা আপত্তি করিল যে, তাহার মহলে বসিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান না হয়। রাজা তাহার সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না।

রাজা চলিয়া গেলে, রাধগুপ্ত রাণীকে ইঙ্গিত করিয়া একটু নিভৃত স্থানে গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ আবার কি খেলা খেলিতেছ ?"

"বুঝিতেছ না কি ?"

"কার মাথা খেতে হবে ?"

"পরিষ্যরক্ষিতার প্রথম, আর কুণালের যদি পারি।"

"পরিষ্যরক্ষিতার কি অপরাধ ? পাটরাণী হবার সখ হয়েছে না কি ?"

"কণ্টক দূর করাই ভাল।"

"কুণালের উপর অত্যাচার কেন ?"

"রাজা বৌদ্ধ হওয়া অবধি উহার উপর বড় ভক্তি, উহাকে বিদায় করা প্রয়োজন।"

"আবার তক্ষশিলায় না কি ?"

"বিম্বিসার-বংশের কোন্ ছেলে তক্ষশিলার জল না খেয়েছে ?"

"বুঝিলাম। আপাততঃ তবে কুণাল আর পরিষ্যরক্ষিতাকে ধ'রে আন্‌তে হচ্ছে ?"

"শুধু তাই নয়, আর জনকত লোক যারা পড়্‌লেই কথাটা বুঝ্‌তে পারে, আর কিছুতেই ডরায় না, এমন চার পাঁচ জন লোকও সেই সঙ্গে।"

রাধগুপ্ত অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজকে সংবাদ দিল,—"কিছুই তো ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

রাজা অত্যন্ত উৎসুকচিত্তে তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার পর কিছুই সন্ধান পাইল না শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমার বাড়ীর মধ্যে আমার দ্বারদেশে কতকগুলা লোক জমায়েত হইল, তোমরা ইহার কিছুই সন্ধান করিতে পারিলে না ? তোমাদের মত মন্ত্রী লইয়া রাজ্য করা বিড়ম্বনামাত্র।"

রাধগুপ্ত অবনতবদনে অধোমুখে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, আমি তো কিছুই সন্ধান পাইলাম না, কিন্তু আপনি সত্বরই সন্ধান পাইতে পারেন। যাহারা জমায়েত হইয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ কাঞ্চনকুটীরের দিকে, কেহ কেহ পাটরাণীর মহলের দিকে গিয়াছে। আপনি ইহাদের কাহাকেও যদি আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, অনেক সংবাদ পাইতে পারেন। আমি উহাদের ভৃত্য ও কঞ্চুকীবর্গকে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা কেহই কিছু বলে না।"

"বলে না, তাহাদের মুণ্ডপাত করিতে হইবে। কঞ্চুকী! শীঘ্র যাইয়া কুণাল ও পরিষ্যরক্ষিতাকে কহ যে, রাজা অশোক আপনাদের স্মরণ করিতেছেন।"

কঞ্চুকী দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রাজা, মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা গত রাত্রের ঘটনাবলীর বিষয় কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা রাজার ভয় ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন।

কঞ্চুকী কাঞ্চন-কুটীরে প্রবেশ করিবামাত্র টিক্‌টিকি "টিক্ টিক্ টিক্" শব্দ করিয়া উঠিল, বামভাগে কাক সকল "আকা আকা আকা" করিয়া বিকট শব্দ করিয়া উঠিল, আর মৎস্যহারক গৃধ্রের মুখচ্যুত রক্তবিন্দু কাঞ্চনের সম্মুখে পতিত হইল। কাঞ্চন কুণালের জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে চারিদিকে নেত্রনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই কঞ্চুকীকে দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন যমদূত। তিনি ত্বরায় কুণালের পার্শ্বে যাইয়া লুকাইলেন। কঞ্চুকী কুণালকে রাজাদেশ বিজ্ঞাপন করিল। কাঞ্চন শুনিয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইল। কুণালও একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন। কুণাল উৎকণ্ঠিতচিত্তে রাজসমীপে যাইতে লাগিলেন, কাঞ্চন পথ পানে তাকাইয়া রহিল। কুণাল নয়নের অন্তরাল হইলে সে বসিয়া পড়িল, ভাবিল, "বুঝি আর দেখা হইবে না।"

কুণাল রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠিতভাব—বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া রাজারও বিস্ময় ও ত্রাস হইল। রাজা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কালি কতকগুলি লোক কোন গুপ্ত অভিপ্রায়ে এই বাড়ীর বাগানে জমায়েত হইয়াছিল, তাহাদের হাতে অস্ত্রাদিও ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার বাড়ীর দিকে বা দিক্ দিয়া গিয়াছে। তাহারা কে, তুমি জান ?"

"না মহারাজ, আমি নিজেই তিষ্যরক্ষা দেবীর কুঞ্জে কালি আসিয়াছিলাম।"

"তুমি ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"সশস্ত্রে!"

"যে বেশে অভিনয়ে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলাম, সেই বেশে।"

"তুমি তবে অভিনয়ান্তে নিজ গৃহে যাও নাই ?"

"গিয়াছিলাম, তথায় এক পত্র পাইলাম।"

"পত্র কাহার ?"

"হস্তাক্ষরে বোধ হইল পরিষ্যরক্ষিতার।"

"পরিষ্যরক্ষিতার ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

মন্ত্রী বলিল, "যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে, তিনি সদ্ধর্ম্মের বড়ই দ্বেষবতী।"

এমন সময়ে প্রতীহারী পরিষ্যরক্ষিতার আগমন-সংবাদ রাজার গোচর করিল। রাজা যথোচিত সম্বর্দ্ধনা সহকারে তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! আপনি কল্য কুণালকে তিষ্যরক্ষার কুঞ্জে আসিতে বলিয়াছিলেন ?"

"কুণালকে ? কৈ, না।"

রাজা মন্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন। কুণালকে বলিলেন, "কৈ সে পত্র ?"

"কোথায় ফেলিয়াছি, মনে নাই :—"

মন্ত্রী বলিল, "ওরূপ কথায় এখানে হইবে না, স্বরূপ বল। রাজার নিদ্রাগৃহের নীচে সশস্ত্রে লোক আসিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তোমার পত্র।"

রাজা বলিলেন, "এ কি কুণাল, তোমার পিতার যাহারা সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিল, তাহাদের আজি বিচার হইবে, তুমি কোথায় আগ্রহসহকারে তাহার প্রমাণ-প্রয়োগ সন্ধান করিয়া দিবে, না তুমিই তাহাদের প্রশ্রয় দিতেছ ?"

কু। আমি নির্দ্দোষ, আমি কাহাকেও প্রশ্রয় দিতেছি না; কিন্তু আপনি তো আমার সব কথা শুনিলেন না।

রা। এ বিষয়ে তোমার কি কথা থাকিতে পারে, তাহা আমি জানি না।

কু। কথাটি এই, পত্রখানি যদিও পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর, কিন্তু সেখানি তিষ্যরক্ষা পাঠাইয়াছেন।

মন্ত্রী বলিলেন,—"তাহার প্রমাণ ?"

কু। তিষ্যরক্ষা ঠাকুরাণী কাল আমাকে তাহা কুঞ্জগৃহে বলিয়াছেন।

রা। তবে তিষ্যরক্ষার সহিত কাল তোমার কুঞ্জগৃহে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?

কু। হইয়াছিল।

রাজা বিরক্তভাবে তিষ্যরক্ষার মুখপানে চাহিলেন। তিষ্যরক্ষার মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে বলিল— "মহারাজ! ভয়ে আপনাকে আমি সকল কথা বলিতে পারি নাই। আমি বৌদ্ধ দেবায়তন দর্শনের সঙ্গী কুণালকেই স্থির করিয়াছিলাম, এবং উহাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম।"

রাজা বলিলেন,—"পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর কোথা হইতে আসিল ?"

তিষ্যরক্ষা অম্লানমুখে বলিল—"উনি বিনা স্বাক্ষর, বিনা শিরোনামা অনেক পত্র প্রত্যহ পাঠাইয়া থাকেন।"

পরিষ্যরক্ষিতা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ, আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। আমি দেখিতেছি, আপনি বৌদ্ধ হইয়া অবধি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, কুচক্রী লোকে সেই সুযোগে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে। মহারাজ, আপনি বিচারকর্ত্তা, সুবিচার করুন, আমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই।" বলিয়া ব্যস্তভাবে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কুণাল কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। রাজা, মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা কিয়ৎক্ষণ পরস্পর চাহাচাহি করিতে লাগিল। তিষ্যরক্ষা বলিল, "আরও আছে, টের পাবেন।"

রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, পরিষ্যরক্ষিতাই তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের কথা কহিবার পূর্ব্বেই নগরমধ্যে মহা কোলাহলধ্বনি হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড দাঙ্গা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সকলে ব্যস্ত হইয়া ছাদের উপরে উঠিলেন। গিয়া দেখিলেন, কুক্কুটারাম ভস্মীভূত হইতেছে। রাজা তিষ্যরক্ষার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এও কি উহার কাণ্ড না কি ?"

তিষ্যরক্ষা বলিল, "বিচারে যাহা হয় করিবেন, আমার কোন কথায় কাজ নাই।"

রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া মন্ত্রীর প্রতি পরিষ্য-রক্ষিতার ঘর ঘেরাও করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং কুণাল সমভিব্যাহারে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণার্থ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

৬

এরূপ মহামারীর সময় তিষ্যরক্ষা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে পুরুষের বেশ ধারণ করিল, দশ বারো জন সৈনিক সংগ্রহ করিল, করিয়া একবারে হাঙ্গামাস্থল ভেদ করিয়া মহামাত্য ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সমস্ত বাধাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছে, যেন কিছুই জানে না। তিষ্যরক্ষা হঠাৎ লোক সঙ্গে তাহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মহামাত্য

একটু ব্যস্ত হইল। তখন তিষ্যরক্ষা বলিল,—"আমার পুরুষের বেশ দেখিতেছ, আমি পুরুষ নহি, আমার নাম তিষ্যরক্ষা। আমার কুঞ্জে বসিয়া পাটরাণীর সহিত যে পরামর্শ করিয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি। তুমিই এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার মূল আমি জানি, এবং রাজাকে বলিয়াছি। তুমি যদি প্রাণ চাও, গাছটি কোথায়, দেখাইয়া দেও। যদি দেখাইয়া দেও, তোমায় নির্ব্বিবাদে নগরের বাহির করিয়া দিয়া আসিব। যদি না দেও, তবে এখনই তোমায় রাজার নিকট লইয়া যাইব। লইয়া গিয়া তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়াইব। জান, বৌদ্ধ রাজার দেশে ব্রাহ্মণ আর অবধ্য নয়।"

ব্রাহ্মণ ভয়ে, ত্রাসে, শঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল, একটি কথাও কহিতে পারিল না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাকে একটি সুড়ঙ্গের মুখ দেখাইয়া দিল। তিষ্যরক্ষা তাহাকে সঙ্গে করিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গেল। সেখানে ব্রাহ্মণের কথা ফুটিল। ইতিপূর্ব্বেই পরিষ্যরক্ষিতার কি দশা হইয়াছে, তিষ্যরক্ষা তাহাকে শুনাইয়াছিল। সে করযোড়ে নানাপ্রকার বিশ্লিষ্ট বাক্যপরম্পরা সৃজন করিয়া, তিষ্যরক্ষার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল।

তিষ্যরক্ষা তাহাকে গঙ্গাতীরে শপথ করাইয়া লইল যে, "অদ্যাবধি আমি যা বলিব, তুমি তাহাই করিবে।"

শপথ শেষ হইলে তিষ্যরক্ষা বলিল,—"কুঞ্জরকর্ণ, তুমি তক্ষশিলায় যাও। তোমায় আমার বিস্তর প্রয়োজন আছে। আমি প্রাণপণে তোমার ভাল করিব।"

কুঞ্জরকর্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

তিষ্যরক্ষা স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

৭

অশোক ও কুণালের প্রতাপে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শীঘ্রই শমিত হইল। কুক্কুটারামের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের কি ঘোর অপযশ! ব্রাহ্মণদের দেবতা কি জাগ্রত! নাস্তিকদের সেই বটগাছ দেবতারা হরণ করিয়াছেন। তাহা আর পাওয়া গেল না। রাজা অশোক, কুণাল, উপগুপ্ত প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বিষণ্ণবদনে, অনাহারে, যেখানে বৃক্ষ ছিল, তাহার চারি দিকে বসিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে তিষ্যরক্ষা মহারাজের সংবাদ লইবার জন্য বার বার লোক পাঠাইতে লাগিল। রাজা আসিলেন না। তিষ্যরক্ষা রাজদর্শনের প্রার্থনা জানাইল। রাজা সম্মত হইলে, সে বোধিমণ্ডপে গমন করিল, এবং তথায় অন্য লোকেও যেরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, সেও সেইরূপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষা কহিল,—"মহারাজ! ভগবান্ অবলোকিতেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। আমি এখনি ঋদ্ধিবলে সেই বোধিবৃক্ষ দেবভবন হইতে পুনরানয়ন করিব। আপনারা আর কিয়ৎক্ষণ কোন মঠায়তনে গিয়া ধ্যানমগ্ন থাকুন।"

তিষ্যরক্ষা, যেখানে বৃক্ষ ছিল, সেইখানে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইল, বোধিবৃক্ষ অল্পে অল্পে উঠিতে লাগিল। ভূখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া বোধিদ্রুম স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। চারিদিক্ হইতে তিষ্যরক্ষার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে যথাস্থানে স্থাপিত হইল। দেবপূজকদিগের মুখ কালিমাবর্ণ হইল—বৌদ্ধদিগের জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

অশোকাদি বৌদ্ধমণ্ডলী তিষ্যরক্ষার চারিদিকে দাঁড়াইয়া তাহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। উপগুপ্ত এই সভাস্থলে তিষ্যরক্ষাকে অর্হৎ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, এবং অর্হতী দীক্ষা দিয়া আপনার জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী তখন এই ঋদ্ধিমতী পতিপরায়ণা, ধর্ম্মানুরাগিণী, রমণীকুলললামভূতা কামিনীকে সদ্ধর্ম্মবিদ্বেষিণী পতিপ্রাণহারিণী ষড়্‌যন্ত্রকারিণী পরিষ্যরক্ষিতার পরিবর্ত্তে পাটরাণী করিবার প্রস্তাব করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থির হইল, তিষ্যরক্ষা পাটরাণী হইবেন এবং পরিষ্যরক্ষিতা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের দুর্গে অবরুদ্ধ হইবেন।

৮

এই জয়োল্লাসের মধ্যে তিষ্যরক্ষা পুনঃ পুনঃ কুণালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন, কুণালের মুখে সেই ঘৃণা, সেই অবজ্ঞা ও সেই বিতৃষ্ণা।

৯

এই ব্যাপারের দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই তিষ্যরক্ষার অভিষেক হইল। তিষ্যরক্ষা অন্যান্য পাটরাণীদের ন্যায় কেবলমাত্র অন্তঃপুরের কর্ত্রী হইলেন না, তিনি সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। যে সকল আজ্ঞা

বাহির হইত, তাহা অশোক ও তিষ্যরক্ষা এই উভয়ের নামে বাহির হইত। মন্ত্রিসভায়ও তিষ্যরক্ষা রাজার বামে বসিতেন। রাজাও এই অবধি ষড়্‌যন্ত্রের ভয়ে তিষ্যরক্ষার মহল ত্যাগ করিতেন না। সুতরাং এই অবধি তিষ্যরক্ষাই প্রকৃতপক্ষে মগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় অন্তঃপুর চলিত, মন্ত্রিসভা চলিত এবং রাজা অশোকও চলিতেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা সর্ব্বদাই ভাবিতেন,—"আমার উদ্দেশ্য কি করিয়া সিদ্ধ করিব?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

তিষ্যরক্ষার রাজ্যাভিষেকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজবাড়ীমধ্যে একটি ধর্ম্ম-সভা স্থাপিত হইল। ভগবান্ উপগুপ্ত তাহার সভাপতি হইলেন। মহারাজ অশোক, কুণাল, তিষ্যরক্ষা ও রাধগুপ্ত উহার প্রধান সভ্য হইলেন। বোধিবৃক্ষের অলৌকিক আবির্ভাব অবধি বৌদ্ধগণ তিষ্যরক্ষাকে "ঋদ্ধিমতী" বলিয়া ডাকিত। এই সভার মধ্যে রাজা ও উপগুপ্ত আপন আপন উপাসনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। মন্ত্রী রাজকার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারাদির ভার তিষ্যরক্ষা ও কুণালের উপর অর্পিত ছিল। তিষ্যরক্ষা কুণালকে সর্ব্বদা রাজকার্য্যে সাহায্য করিত; রাজা বা উপগুপ্তের সহিত কুণালের মতান্তর হইলেই কুণালের পক্ষ সমর্থন করিত; যাহাতে সদ্ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে দেশে দেশে অর্হৎগণ প্রেরিত হয়, যাহাতে "ভিক্ষুদের" সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়, যাহাতে "শ্রমণদিগের" বিদ্যোন্নতি হয়, যাহাতে "শ্রাবক"-সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে বহুসংখ্যক মঠ স্থাপিত হয়, যাহাতে "চৈত্য"-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের লীলাভূমি-সকলের সমুচিত সম্মান হয়, যাহাতে বাৎসরিক বিজ্ঞান-সভার উন্নতি হয়, যাহাতে চিকিৎসালয় ও পশু-চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের নখ-কেশাদি সুসংরক্ষিত হয়, যাহাতে "দন্তযাত্রাদি" উৎসবের শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে ধর্ম্মের, সঙ্ঘের ও বুদ্ধের প্রতি লোকের মন আকর্ষিত হয়, সেই সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে কুণালকে সাহায্য করিত। যাহাতে তাহার প্রতি কুণালের শ্রদ্ধা জন্মে, তদ্বিষয়ে সে কিছুমাত্র ত্রুটি করিত না।

২

কাঞ্চনমালা এই সভার কেহই নহেন। তিনি সভায় আসিতেন; কুণাল, তিষ্যরক্ষা ও উপগুপ্তের সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিতেন। কিন্তু তিনি রাজবাটীতে প্রায় থাকিতেন না। তিনি দিবারাত্রি হীনবেশে নগরমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন; "ভিক্ষুদিগকে" ভিক্ষা দিতেন, বালক-বালিকাদিগের সহিত মিলিয়া সদ্ধর্ম্মে তাহাদের মতি লওয়াইতেন। যে দিন উপগুপ্ত কুক্কুটারামে বসিয়া বৌদ্ধমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, সে দিন অবহিতচিত্তে ভক্তিভাবে সেই উপদেশ গ্রহণ করিতেন, এবং তৎপরদিবস গোষ্ঠে গোষ্ঠে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী সেই উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেন। যাহারা সদ্ধর্ম্মবিদ্বেষী, তাহাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ ছিল না। তাহাদের বিপদ হইলে, তাহাদের অন্নাভাব হইলে, তাহাদের পীড়া হইলে তিনি সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য করিতেন। প্রত্যহ সংঘভোজন করাইতেন। প্রত্যহ স্বহস্তে দীন-দরিদ্রদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। যেখানে শোক, যেখানে পীড়া, যেখানে দ্বন্দ্ব, যেখানে দুঃখ, কাঞ্চনমালা সেইখানেই উপস্থিত থাকিতেন। তিনি কাহাকেও পর ভাবিতেন না; পরদুঃখনিবারণে কাতর হইতেন না। পরের সুখে তাঁহার সুখ, পরের দুঃখে তাঁহার দুঃখ হইত। ধর্ম্মালয়, চিকিৎসালয়, মঠায়তন প্রভৃতি স্থানে তিনি সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেন। এমন কি, তিনি পরের জন্য একপ্রকার আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়া উঠিলেন। রাজা কাঞ্চনমালার ধর্ম্মাচরণে এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, কোষাধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, কাঞ্চন যখনই যাহা চাহিবেন, তখনই বিনা আপত্তিতে যেন তাহা প্রদান করা হয়। কাঞ্চনের প্রবর্ত্তনায় রাজা ও কুণাল, এমন কি, তিষ্যরক্ষাও নগর-পরিভ্রমণার্থ বাহির হইতেন এবং আধিব্যাধিপীড়িতদিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। লোকে কাঞ্চনমালাকে স্বর্গীয় দেবী বলিয়া মনে করিত। যেন নূতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, আর্ত্ত ব্যক্তির আর্ত্তি-নিবারণের জন্য, এবং আপামর সাধারণ লোককে নির্ব্বাণ-প্রদানের জন্য, ভগবান্ "অবলোকিতেশ্বর" রমণীবেশে পাটলীপুত্র নগরে ভ্রমণ করিতেছেন।

এইরূপে বৎসারাবধি কাটিয়া গেল। প্রকাণ্ড মগধ সাম্রাজ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল পাটলীপুত্র নগরে সদ্ধর্ম্মবিরোধী লোক রহিল না।

সব পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু তিষ্যরক্ষার মন ফিরিল না। কুণালকে ভুলাইবার জন্য তিষ্যরক্ষা অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল,—কিন্তু দেখিল, কুণাল অটল। সুতরাং তিষ্যরক্ষা আর সাহস করিয়া আপন মনের কথা তাঁহার নিকট পাড়িতে পারিল না। এইরূপে সম্বৎসর কাটিয়া গেল—তিষ্যরক্ষা নানা ছলে কুণালের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিবার চেষ্টা পাইত। কখন নিজ মহলে, কখন কাঞ্চন-কুটীরে, কখন গঙ্গাতীরে, কখন উদ্যানমধ্যে, কখন কুঞ্জবনে উঁহার সহিত পরামর্শ করিতে যাইত, কিন্তু ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না। কেবল এক দিন কুণালকে এক নিভৃত স্থানে পাইয়া সাবধানে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"কুণাল, তুমি কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না ?"

কাঞ্চনমালার সংঘভোজনে উপস্থিত থাকিতে হইবে বলিয়া কুণাল সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। এই অবধি নির্জ্জনে পরামর্শের প্রস্তাব হইলে কুণাল আর সম্মত হইতেন না। দৈবাৎ নির্জ্জনে তিষ্যরক্ষার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুণাল অন্যপথে চলিয়া যাইতেন।

৪

এক দিন তিষ্যরক্ষা অশোক রাজার প্রাচীন রাজপ্রাসাদে অর্থাৎ অশোকের পূর্ব্বকার কেলিগৃহে গমন করিয়া তাহার একটি প্রকোষ্ঠ নানাবিধ বিলাসসামগ্রীতে পরিপূর্ণ করিল। তথায় কতকগুলি কদর্য্য চিত্রপট ছিল, তাহাতে গৃহটি সাজাইল। নিজে নানাবিধ বেশভূষা করিল, এবং সেই অবস্থায় প্রকাশ্য আজ্ঞাপত্র দ্বারা কুণালকে ডাকাইয়া পাঠাইল।

কুণাল এবার আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সম্রাটের প্রকাশ্য আজ্ঞাপত্র লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি উঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়াছেন, হঠাৎ কাঞ্চনমালা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিল, এবং নানা প্রকারে জেদ করিতে লাগিল, "আজি তোমার কোথাও যাওয়া হইবে না।" কুণাল তাহাকে আজ্ঞাপত্র দেখাইলেন, কিন্তু কাঞ্চনমালা আজি প্রবোধ মানিল না। সে আজি বড় অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইল—"কেন" "কি বৃত্তান্ত" কিছুই বলে না; হয় তো নিজেই জানে না যে, তাহার এত ব্যাকুলতা কেন। কিন্তু কোনমতেই কুণালকে যাইতে দিতে চাহে না! কুণাল নানারূপে কাঞ্চনমালাকে ভুলাইতে লাগিলেন, শেষ বলিলেন, —"কাঞ্চন, কুক্কুটারামের পশ্চিমদিকে আম্রকাননের মধ্যবর্ত্তী পুষ্করিণীর ধারে যে ব্রাহ্মণসন্তানটি পীড়িত হইয়াছিল, এতক্ষণ হয় তো সে মরিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে মুমূর্ষু দশায় দেখিয়া আসিয়াছি, সে অনেকক্ষণ হইয়াছে। তুমি যাও, গিয়া তাহার পিতাকে সান্ত্বনা কর।"

কাঞ্চন আগ্রহসহকারে বলিল,—"আমি যাই, তুমি কোথাও অনেকক্ষণ থাকিও না, শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হইও," বলিয়াই প্রস্থান করিল।

৫

কুণালের মাথার উপর "কা কা কা" করিয়া কাক ডাকিয়া উঠিল। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই একটা ভয়ানক সাপ তাঁহার রাস্তা পার হইয়া গেল। দূরে শিবাগণ বিকট শব্দ করিয়া উঠিল। কুণাল ক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন, অন্তঃপুর বিলাসদ্রব্যে পরিপূর্ণ। এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে গমন করিয়া তিনি শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন, কক্ষভিত্তিতে অশ্লীল আলেখ্য ঝুলিতেছে। কিন্তু শয়নকক্ষদ্বারে আসিয়া দেখিলেন, ভিত্তিসমূহে কতকগুলা অতি জঘন্য আলেখ্য, চারি ভিত্তিরই ঠিক মধ্যস্থানে পরস্পর সম্মুখীন চারিখানি প্রকাণ্ড দর্পণ। গৃহমধ্যস্থলে খট্টোপরে অর্দ্ধবিবসনা তিষ্যরক্ষা বিচিত্র অঙ্গরাগে বিভূষিত। দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব, সেই প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব, তাহার প্রতিবিম্ব, আবার প্রতিবিম্ব, অনন্ত অসংখ্য অর্দ্ধ-বিবসনা তিষ্যরক্ষা দেখা যাইতেছে। ইহা দেখিয়াই কুণাল ফিরিলেন। তিষ্যরক্ষা তখন সেই আলুথালু অবস্থাতেই দৌড়াইয়া উঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া লুণ্ঠিত হইল। আপন অনাবৃত হৃদয় কুণালের পদ-প্রান্তে ফেলিয়া পদদ্বয় বেড়িয়া ধরিল। সর্পে পদ-বেষ্টন করিয়া ধরিলে লোকে যেমন পা ছুড়িয়া সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করে, কুণাল তিষ্যরক্ষাকে তদ্রূপ ফেলিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন। আর ফিরিয়াও চাহিলেন না।

৬

বহুক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষার চৈতন্য হইল। সে ফণিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। চুল গুছাইল। যে

পথে কুণাল গিয়াছে, সেই দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "যদি ওই চোখ"—পরে মাটীতে পা ঘষিয়া বলিল, "যদি ওই চোখ—এক দিন এমনি করিয়া পদতলে দলিত করিতে পারি, তবেই আমি তিষ্যরক্ষা!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তিষ্যরক্ষা আবার যে সেই হইল। যেন কিছুই জানে না, যেন কোন গোলযোগই ঘটে নাই। পূর্ব্বমত ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইতে লাগিল, তিষ্যরক্ষা কুণালের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিল, বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য সে বড়ই উৎসাহবতী হইল। বাহিরে সব যেমন ছিল, তেমন রহিল। কিন্তু সে ভুলিবার পাত্র ছিল না। এইরূপে মাসেক কাটিয়া গেল। ত্রিশ দিনের দিন তক্ষশিলা হইতে দ্রুত অশ্বারোহণে দূত আসিল। তথায় বিদ্রোহ হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কুঞ্জরকর্ণ বিদ্রোহীদের নেতা।

পত্র পাইয়াই রাজা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পাটলীপুত্রনগরে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। কামারের দোকানে দিবারাত্রি ঠন্ ঠন্ শব্দ হইতে লাগিল; রাশি রাশি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আয়ুধাগারে সংরক্ষিত হইতে লাগিল। বড় বড় বাঁশ কাটিয়া ধনুক নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। মণিপুর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, অঙ্গ, ওড্র, বিদেহ, সমতট প্রভৃতি প্রদেশের করদ রাজগণকে সুশিক্ষিত হস্তী প্রেরণের জন্য পত্র লেখা হইল। সহস্র সহস্র ঘোটকে রাজার অশ্বশালা পুরিয়া যাইতে লাগিল। হ্রেষারবে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র সূত্রধর দিবানিশি রথ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। পাটলীপুত্র বন্দরের সমস্ত আহারীয় দ্রব্য যুদ্ধার্থ ক্রীত হইতে লাগিল। নানা দেশীয় বীরগণকে সৈন্য ও সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা হইল। সৈন্যেরা নগর-প্রান্তরে সর্ব্বদা যুদ্ধ অভ্যাস করিতে লাগিল, এবং যুদ্ধের উপকরণ বহিবার জন্য অযুত অযুত শকট ও অযুত অযুত নৌকা আনীত হইতে লাগিল। দেশের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এ দিকে তক্ষশিলা হইতে দূতের পর দূত আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা। আজি এ গ্রাম, আজি ও গ্রাম, আজি সে গ্রাম বিদ্রোহীদের হস্তগত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, সমস্ত দেশের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তথায় সমবেত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, বৌদ্ধদেবায়তন সকল উন্মূলিত ও উৎপাটিত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকার্য্যে বৌদ্ধদিগকে ধরিয়া বলি দিতেছে। সমস্ত উদ্যোগ সমাধা হইলে, রাজা, মন্ত্রী ও প্রধান পারিষদবর্গ সেনাপতি নির্ব্বাচন করিতে বসিলেন। রাজা প্রিয়পুত্র কুণালকে ছাড়িয়া দিতে একান্ত অসম্মত। কিন্তু মন্ত্রী যে সকল আকট্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই যে, কুণাল বৌদ্ধ এবং তাঁহার ধর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। দ্বিতীয়, তিনি বীর। তৃতীয়, তিনি কষ্টসহিষ্ণু। তিনি সকল দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি সকল লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন। চতুর্থ, যে সমস্ত জাতি হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারা কুণালের একান্ত অনুগত।

এই সকল কারণবশতঃ কুণালই এই বিদ্রোহ-শান্তি নিমিত্ত সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন। রাজাও অন্য উপায় না দেখিয়া কুণালকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার মন কেন এরূপ ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

২

কুণাল সেনাপতি হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, যে ত্রিশরণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, সেই ত্রিশরণের কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে জীবন গেলেও ক্ষতি নাই। তিনি আবার ভাবিলেন যে, এই সুযোগে তিনি পাপীয়সী তিষ্যরক্ষার চক্র হইতে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য পরিত্রাণ পাইবেন। একবার কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়িল। কাঞ্চনমালাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া একবার বড়ই কষ্ট হইল। আবার ভাবিলেন, কাঞ্চনমালা যেরূপ মহৎ কার্য্যে ব্রতী আছে, যে কার্য্যের জন্য সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সে যে আমায় যাইতে বাধা দিবে, তাহা বোধ হয় না। যদি আমি না থাকায় তাহার কিছু কষ্ট হয়, সেই জন্য তাহাকে আমার সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়া যাইব। যে সমস্ত কার্য্য লইয়া তাহার জীবন, যে সকল কাজ সে এত ভালবাসে, তাহা পাইলে সে নিশ্চয়ই দিন কতকের মত আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে।

কাঞ্চনমালা যখন শুনিলেন, কুণাল সেনাপতি হইয়াছেন, তখন তাঁহার মন হর্ষে ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বামী পশ্চিমাঞ্চলে বিলুপ্তপ্রায় সদ্ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবেন, এই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আবার যখন সে দিনের স্বপ্নের কথা মনে পড়িল, যখন সেই সুন্দ-চুরির উৎকণ্ঠার কথা মনে পড়িল, যখন কঞ্চুকীর আগমনে নানা অনিমিত্তদর্শনের কথা মনে পড়িল, তখন তিনি ভাবিলেন, এত কাল যে অমঙ্গলের ভয় করিয়াছিলাম, এইবার বুঝি সেই অমঙ্গল ঘটিবে। কিন্তু এই মহৎ কর্ম্মে বাধা দিতে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি একবারও "না" এ কথা বলিতে পারিলেন না।

কুণাল বিদায় হইতে আসিলে, তিনি উঁহাকে নানাপ্রকার উৎসাহ-বাক্যে উৎসাহিত করিলেন। পরে বুদ্ধদেব যশোধরাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় যে গান করিয়াছিলেন, সেই গান গাইলেন—বলিলেন,—"ভগবান্ যেরূপ যশোধরাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া লোকহিত-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ সদ্ধর্ম্মের হিতে সিদ্ধকাম হও। আমি এখানে যে ভাবে আছি, এই ভাবেই থাকিব। কিন্তু আমায় অনুমতি দিতে হইবে যে, এই সময়ে একবার গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে গিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।"

কুণালও কাঞ্চনমালার ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—বলিলেন, "তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অনুমতি রহিল।" এই বলিয়া হাসিমুখে অথচ সজলচক্ষে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সৈন্যমণ্ডলীর অগ্রবর্ত্তী হইতে চলিলেন। কাঞ্চনমালা দেখিতে লাগিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে নয়নপথ অতিক্রম করিয়া গেলেন। যখন কুণালের অশ্ব আর দেখা গেল না, তখন কাঞ্চনমালা সত্বরপদে আবার সেই শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, অগণ্য রণপোত একতালে দাঁড় ফেলিয়া যাইতেছে। মাঝিরা ও আরোহীরা সমস্বরে সিংহনাদ পূর্ব্বক অশোক রাজার জয় গান করিতে করিতে যাইতেছে। তাহাদের জয়ধ্বনিতে নৌকার দাঁড়ের ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার প্রশান্ত গম্ভীর শব্দ হইতেছে। সে শব্দে ভীরু লোকেরও সাহস উদয় হয়। নৌকার মাস্তলে মাস্তলে শ্বেত, নীল, পীত, হরিদ্রাদি নানা রঙের পতাকা সকল শোভমান হইতেছে। অনুকূল বায়ুতে পতাকা সকল প্রতাড়িত হইয়া দুলিতেছে—যেন বলিতেছে—শত্রুগণ, পলায়ন কর, আমাদের সঙ্গে পারিবে না। কাঞ্চনমালা আর এক দিকে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তক্ষশিলাযায়ী রাজবর্ত্ম পরিপূরিত করিয়া সৈন্য-সমূহ চলিতেছে। কোথাও ভেরী, তূরী, কাড়া, পাড়া, দামামা, দগড়া বাজাইয়া পদাতিগণ চলিতেছে। কোথাও প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডের ন্যায় হস্তিসমূহ ধূলিপটলে আবৃত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীর একতা সম্পাদন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে আরোহীদিগের শাণিত তরবারিতে ক্ষীণ সূর্য্যালোক পড়িয়া ক্ষীণ চাকচিক্য বিকাশ করিতেছে—যেন গাঢ় মেঘে ক্ষীণ বিদ্যুৎ উঠিতেছে। কোথাও দেখিলেন, অশ্বসমূহ লাল, নীল, পীত, সবুজ নানাবর্ণের পৃষ্ঠাবরণে শোভিত হইয়া যাইতেছে। তাহার উপর প্রকাণ্ডকায় বীরসকল শব্দায়মান বর্ম্মকবচাদি ধারণ করিয়া "আমি অগ্রে যাইব" "আমি অগ্রে যাইব" বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিতেছে।

আর এক স্থানে দেখিলেন, রথসমূহ দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া চলিতেছে। রথের অশ্ব সকল সারথি কর্ত্তৃক প্রতাড়িত হইয়া বায়ু অপেক্ষাও বেগে ধাবিত হইতেছে। দেখিলেন, রথের পতাকা সকল হেলিতেছে ও দুলিতেছে। এই দিগন্তব্যাপী রথমণ্ডলীর মধ্যে দেখিলেন, একখানি প্রকাণ্ড রথ, উহার অভ্রভেদী ধ্বজ, চীনাংশুক-নির্ম্মিত চারু পতাকা। রথের স্বর্ণময় কিঙ্কিণী সকল সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত করিতেছে। কাঞ্চনমালা দেখিয়াই জানিলেন যে, এই কুণালের রথ। কাঞ্চনমালা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বায়ু অনুকূল, আকাশ নির্ম্মেঘ, চারিদিকে বলাকা উড়িতেছে। দেখিলেন, আকাশে চাতকপক্ষী মদভরে শব্দ করিতেছে। এই সকলের মধ্যে কেবল একটি জিনিষ দেখিয়া তাঁহার কিছু উৎকণ্ঠা হইল। তিনি দেখিলেন, কুণালের অভ্রভেদী ধ্বজের উপর একটি শকুনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রথমে পাটলীপুত্র হইতে কুণালের যুদ্ধযাত্রা-সংবাদ তক্ষশিলা প্রদেশে পৌছিল। তৎকালে তক্ষশিলা-প্রদেশ প্রায় দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ

ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে মহা ধূমধাম পড়িয়া গেল। তাহারা সকলে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। কুঞ্জরকর্ণ নিজে ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধবিদ্বেষী; সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধ-দ্বেষিগণ তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। তাহারা পরামর্শ করিল, আপনাদের দ্বারা যে সমস্ত দেশ আয়ত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে রাজার সৈন্য উপস্থিত হইলেই প্রজারা রাজার সহিত যোগ দিবে। অতএব রাজার অধিকৃত দেশেই যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত।

এই পরামর্শের পর এক লক্ষ রণ-দর্পিত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ তক্ষশিলা প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অশোক রাজার রাজ্যমধ্যে আসিয়া কুণালের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সৈন্য-শিবিরের চারি দিকে খাত করিয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এক দিন হঠাৎ তাহারা শুনিতে পাইল, কুণাল অল্পসংখ্যক কিন্তু বীরত্বপূর্ণ সৈন্যের সহিত পশ্চাদ্‌ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কুণাল শত্রুদের শিবিরসন্নিবেশের বিষয় চরমুখে বিশেষরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি কতকগুলি দ্রুতগামী অশ্ব এবং হস্তী আপন সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা অনেক দূর ঘুরিয়া শত্রুশিবিরের প্রায় পাঁচ সাত ক্রোশ পশ্চাদ্ভাগে নির্ব্বিঘ্ন স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে লাগিল। কুণাল সৈন্যদের প্রতি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, শত্রুদের রসদাদি যেন বন্ধ করা না হয়। দেশের লোক আমাদের পক্ষীয়, অতএব তাহাদের প্রতি কোন উৎপাত করা না হয়। সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, তোমরা কোথায় আছ, তাহা যেন শত্রুরা টের না পায়। কুণাল এই সময়ে কেবল আকাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যুদ্ধের জন্য কোন ব্যস্ততাই প্রদর্শন করিতেন না। সেনাপতিরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "যুদ্ধের বিলম্ব আছে।" আর কেহ দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিত না। কিন্তু বিলম্বে সৈন্যগণ ক্রমে বড়ই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। এক দিন প্রাতঃকালে কুণাল হঠাৎ আজ্ঞা করিলেন, "অদ্য বৈকালে যুদ্ধ।" সৈন্যগণ রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল।

শত্রুরা অনুসন্ধান-দ্বারা জানিয়াছিল যে, কুণালের অধিকাংশ সেনা তাহাদের সম্মুখে আছে। সুতরাং আশঙ্কা করিয়াছিল, নিশ্চয় সম্মুখে যুদ্ধ হইবে। কিন্তু হঠাৎ এক দিন পশ্চাদ্ভাগ হইতে কুণাল পদাতি ও অশ্বারোহীর সহিত ভীমপরাক্রমে আক্রমণ করিলে তাহারা কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। পরে তাহারা দুই ভাগ হইয়া এক ভাগ ফিরিয়া কুণালের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল ও অপর ভাগ শিবিরে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

বিদ্রোহীরা প্রায়ই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। পুরুষানুক্রমে তাহারা কখন রণে ভঙ্গ দেয় নাই। তাহারা যখন অসমসাহসে কুণালের সৈন্য আক্রমণ করিল, তখন বৌদ্ধসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু কুণাল স্বয়ং রথোপরি হইতে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। দার্ঢ্য সহকারে বলিতে লাগিলেন—"ধর্ম্মের জয়! ব্রাহ্মণ কখনই জিতিবে না।"

তথাপি কুণালসৈন্য ক্ষত্রিয়দিগের রণে স্থির থাকিতে পারিল না। অনেক শত বৌদ্ধ রণে নিহত হইতে লাগিল। কিছু পরে দৈব বৌদ্ধদের সহায় হইলেন। পশ্চিমাকাশ সহসা গাঢ় নীল হইয়া ভীমবেগে আঁধি উঠিল। পশ্চিমদিক হইতে যে ঝড় বহিতে লাগিল, সেই বায়ুতে পৃথিবীস্থ ধূলি আকাশে উত্থিত হইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুলিল। কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কুণালের সৈন্য পশ্চিমে, তাহাদের মুখ পূর্ব্বদিকে; ব্রাহ্মণসৈন্য পূর্ব্বে—তাহাদের মুখ পশ্চিমদিকে। সুতরাং এই আঁধির সমস্ত ধূলি আসিয়া ব্রাহ্মণ-সৈন্যের নয়নে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুণালের সৈন্যের কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। তখন কুণাল উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সৈন্যগণ! বৌদ্ধগণ! ধর্ম্ম আমাদের অনুকূল, বুদ্ধ আমাদের অনুকূল, আঁধি থাকিতে থাকিতে বিধর্ম্মীদিগকে পরাজিত কর।"

ঝঞ্ঝাবায়ুর সহিত অসির ঝন্‌ঝনা বিদ্রোহী সৈন্যের বিষম ভয় উৎপাদন করিল। তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না—কে স্বদল, কে বৈরী, কিছুই চিনিতে পারে না, সুতরাং ভ্রমে আপনাদের সৈন্য আপনারা কাটিতে লাগিল। কুঞ্জরকর্ণ ইহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিন্তু কুণাল তাহা বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন, এবং কৌশলে আপনার সেনা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। পরে যখন আঁধি ছাড়িয়া আসিতে লাগিল, বিদ্রোহীরা আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিল। সেই সময় কুণালের সেনা সদর্পে ঘোর হুঙ্কার করিয়া তাহাদের উপর পড়িল। কুঞ্জরকর্ণ দেখিলেন, সৈন্যেরা পলায়নোন্মুখ, তাহাদের গতিরোধ করা দুঃসাধ্য। ক্রমে অশ্বে, হস্তীতে, মানুষে, ঢালে, তরবারিতে, ধূলায় আর ভয়ে, ব্রাহ্মণ-শিবিরে একটা ভয়ানক গোলযোগ হইয়া উঠিল

কুণাল অমনি এই সুযোগে পলায়নপর শত্রু ও শত্রুশিবিরের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কয়েক জন বীর সৈনিককে অশ্বারোহণে দ্রুতগতি উঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন।

এইরূপ অল্প প্রাণিহত্যায় জয়লাভে তাঁহার উল্লাসের সীমা রহিল না। কুণালের পর অনেকেই আঁধির আশ্রয়ে জয়লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রাণিহিংসা নিবারণার্থ উহার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যবন ও মুসলমান পশ্চিম হইতে আসিয়া অনেকবার জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই জানেন যে, আঁধি তাঁহাদের অনুকূল, আর হিন্দুর প্রতিকূল ছিল। এই আঁধিতেই হিন্দুকে বরাবর পরাজিত করিয়াছে। নহিলে বুদ্ধি ও ভুজবলে কাহার সাধ্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ হয়?

৩

ক্রমে রাত্রি হইয়া পড়িল। দুই দিকের শত্রু-সৈন্যের মধ্যে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কুণালের কিছু-মাত্র ত্রাস জন্মিল না। তিনি সমস্ত রাত্রি স্বয়ং প্রহরীর কাজ করিতে লাগিলেন, এবং "ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, বুদ্ধের জয়" বলিয়া তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যে অশ্বারোহীদিগকে তিনি পলায়নপর হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা কয়েক জন প্রধান বন্দী লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বন্দীরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী কুঞ্জরকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কুঞ্জরকর্ণকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে এমনি নিঃশঙ্ক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, যেন সেই প্রকৃত বিজেতা। কুণাল তাহাকে এক জন সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাজ অশোককে এই যুদ্ধের সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং কুঞ্জরকর্ণের প্রতি কি আজ্ঞা হয়, জানিতে চাহিলেন।

তৎপরদিনে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া হিন্দুশিবির ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তখন কুণাল বিজয়ী সৈন্যসমভিব্যাহারে তক্ষশিলা রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তক্ষশিলা রাজ্যে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। কুণাল ভগ্ন মঠায়তন সকল পুনর্নির্ম্মিত করিতে লাগিলেন। অর্হৎ, ভিক্ষু, শ্রমণ, শ্রাবক আবার নির্ভয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই কুণাল বিদ্রোহীদের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। কাঞ্চনমালাকে যুদ্ধের সংবাদ দিয়া তিনি যে পত্র লিখিলেন, তাহার শেষভাগে লিখিলেন, "বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ যুদ্ধে আহত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে। আমি তাহাদিগের শুশ্রূষার চেষ্টা করিতেছি সত্য; কিন্তু তুমি থাকিলে বোধ হয় তাহারা শীঘ্রই আরাম হইতে পারিত।"

দশম পরিচ্ছেদ

যথাকালে কুণালের পত্র রাজধানীতে পৌঁছিল। কিন্তু তখন অশোক আর রাজা নাই। যে দিন কুণাল যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তদবধি প্রিয়পুত্রের শোকে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্বদাই ভাবনা হইতে লাগিল, কুণালের পাছে কোনরূপ অনিষ্ট হয়; এই আশঙ্কায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। একবার মনে করিলেন, স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন; কিন্তু আর কেহই সে পরামর্শ দিল না। ক্রমাগত ভাবনায় ও ক্রমাগত পরিশ্রমে অশোক রাজার বহুমূত্র রোগ উপস্থিত হইল। বহুমূত্র রোগের লক্ষণ এই যে, প্রথম অবস্থাতেই উহা অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। কুণাল যাইবার দশ বারো দিন পরে রাজার এই বিষম অবস্থা ঘটিয়া উঠিল। পাটলীপুত্র নগরের প্রধান প্রধান চিকিৎসক পুস্তকাদি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিবারাত্রি রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পাতা-লতা, ফল-মূল, গুল্ম, অস্থি প্রভৃতিতে রাজবাড়ীর এক মহল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যে বড় বড় কবিরাজেরা পঞ্চবার্ষিকী সভায় সাত আটবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং স্বহস্তে ঔষধ, তৈল, আরক, বটিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। পাটলীপুত্র নগরের বড় বড় বৌদ্ধ মঠে প্রত্যহ উপহারাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। ভগবান্ উপগুপ্ত রাজবাটীতে আসিয়া রাজার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল যে,

পরিচর্য্যার কিছুমাত্র ত্রুটি হইলেই রাজার জীবনরক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। ঔষধসেবন, পথ্যাদি প্রদান, নিদ্রার সময় ব্যাঘাত হইতে না দেওয়া, আহারাদি বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া, শয্যা-গৃহাদি পরিষ্কার করা প্রভৃতির কোনরূপ ত্রুটি হইলেই তাঁহার আর অব্যাহতি থাকিবে না। এরূপ পরিচারিকা অন্তঃপুরমধ্যে মিলিয়া উঠা ভার। অশোকের মহিষীগণ প্রায়ই ব্রাহ্মণপক্ষীয়, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাস হয় না। যাঁহারা বৌদ্ধ, তাঁহারা হয় সেরূপ পরিচর্য্যা করিতে জানেন না, না হয় করিতে প্রস্তুত নন। কাঞ্চন রোগ-শোকে পরের মাতা-পিতা। কিন্তু রাজার পীড়ায় পুত্রবধূ অপেক্ষা মহিষীরা সেবা করিলেই ভাল হয়। সুতরাং সে ভার তিষ্যরক্ষার স্কন্ধেই পড়িল।

তিষ্যরক্ষা দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, রাজা অশোকের সেবা করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিনেই অশোক এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার উত্থান-শক্তি একেবারে রহিল না। তখন তিষ্যরক্ষাই তাঁহার হাত-পা হইল। তিষ্যরক্ষারও কিছুতেই সেবার বিরতি হইত না। যে সময়ে কোন কাজ না থাকিত, সে সময়ে সে রাজার কাছে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিত। দিনরাত্রি গায় হাত বুলাইত, পাখা লইয়া বাতাস করিত, একবার ঘর হইতে বাহির হইত না। দাসীবৃন্দকে রাজার নিকটে আসিতে দিত না। রাজা নিদ্রিত হইলে পার্শ্বে বসিয়া মশা-মাছি তাড়াইত এবং যাহাতে রাজার নিদ্রার বিঘ্ন না হয়, তাহার জন্য নিজে ঘুমাইত না। দারুণ গ্রীষ্মসময়ে সে রাজার মহলটি এমনি সুশীতল করিয়া রাখিত যে, সেখানে গেলে লোকের আর ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিত না।

এইরূপ নিরন্তর সেবায় রাজার শরীর ক্রমে সুস্থ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তিষ্যরক্ষা অনিদ্রায়, অনাহারে, অস্নানে ও অনিয়মে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি উহার সেবায় বিতৃষ্ণা বা বিরতি রহিল না। অনিয়মে তাহার একপ্রকার উৎকট শিরঃপীড়া জন্মিল; শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে সময়ে সময়ে সে দুই তিন ঘণ্টা অজ্ঞান অভিভূত হইয়া থাকিত।

রাজা আরোগ্য হইয়া উঠিয়া তিষ্যরক্ষার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। পরে বিশেষ সেবা-শুশ্রূষা করাইয়া উহার শরীর শোধরাইয়া দিলেন এবং তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। সে প্রার্থনা করিল যে, আমি একাকী এক বৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্য শাসন করিব। অশোক সম্মত হইলেন। চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, মহারাণী তিষ্যরক্ষা এক বৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্যে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবেন। মৌল, রক্ষী, সামন্ত, গ্রামীক, সেনাপতিদিগকে আজ্ঞা দেওয়া হইল যে, তাহারা এই এক বৎসরের জন্য তিষ্যরক্ষার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। এই কয়দিন অশোক প্রজাভাবে রাজপুরীমধ্যে বাস করিবেন।

এই নূতন রাজত্বের দ্বিতীয় দিনে কুণালের দূত জয়বার্ত্তা লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল এবং কুঞ্জরকর্ণের বন্দী হওয়ার সংবাদ আনিয়া দিল। যুদ্ধের জয়-সংবাদে মহারাণী তিষ্যরক্ষা ঘোষণা দ্বারা নগরবাসীদিগকে উৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন, রাত্রিতে মহানগর দীপরাজিতে আলোকিত হইল, বৌদ্ধমহলে আজি বড়ই আনন্দ। অশোক শুনিলেন, তিনিও নিজ বাসস্থান প্রদীপ দিয়া দীপান্বিত করিয়া তুলিলেন।

রাজা ও তিষ্যরক্ষার পীড়ার সময় কাঞ্চন সর্ব্বদাই রোগীদের নিকট থাকিত, উভয়ে সারিয়া উঠিলে আবার নগর পরিভ্রমণ করিয়া দীন-দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিতে আরম্ভ করিল। আজি এই সুখের দিনে সেও কাঞ্চনকুটীর দীপমালায় শোভিত করিল। দূত আসিয়া তাহাকেও পত্র দিল, পত্রের শেষ অংশ পড়িয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল। সে তিষ্যরক্ষার নিকট তক্ষশিলা গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিষ্যরক্ষা যুদ্ধস্থলে স্ত্রীলোকের যাওয়া উচিত নয় বলিয়া যাইতে দিলেন না। কাঞ্চনের যাওয়া হইল না এবং সে বড় বিষণ্ণ হইল। তাহার হাসিখুসী ও প্রফুল্লভাব দিনকত বড় একটা দেখা গেল না। দুই পাঁচ দিন পরে আবার যে সেই হইল, কুণালের নিকট হইতে সদ্ধর্ম্মের জয়-সংবাদ এবং কুণালের অবিচলিত প্রণয়ের চিহ্ন সকল প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাঞ্চন ইহাতেই সুখী।

ওদিকে যথাসময়ে কুণালের নিকট তিষ্যরক্ষার রাজ্যারোহণবার্ত্তা পৌঁছিল। তৎপরদিন যুদ্ধজয় শ্রবণে মহারাণী বড় আনন্দিত হইয়াছেন সংবাদ আসিল। তৎপরে কুঞ্জরকর্ণকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা

আসিল, কুণাল তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তৎপর-দিন পত্র আসিল যে, কুঞ্জরকর্ণ আমায় "মা" বলিয়াছে, অতএব আমি তাহাকেই তক্ষশিলায় শাসনকর্তা করিলাম, তুমি তাহার আজ্ঞাধীন হইবে। এই সংবাদে কুণালের অধীনস্থ সেনাপতিগণ বড় অসন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহাকে নাপিতকন্যার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উপদেশ দিল। কুণাল বলিলেন, সে যেই হোক্, সে যখন মহারাণী হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমায় তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। সেনাপতিরা অগত্যা সম্মত হইল, কিন্তু সেনাস্থ লোক রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, "স্ত্রীলোকের রাজত্বে মানুষের বাস করিতে নাই। কি অবিচার! বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বন্দী রাজা হইল, আর বিজয়ী রাজপুত্র তাহার অধীন হইল!"

এইভাবে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। পাঁচ দিনের দিন কুঞ্জরকর্ণ ব্যস্তসমস্তভাবে কুণালকে আসিয়া বলিল, "মহারাণীর আজ্ঞা, আজি তোমায় আমার সহিত তক্ষশিলার দুর্গের মধ্যে যাইতে হইবে।" কুণাল মস্তক অবনত করিয়া রাণীর আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া কুঞ্জরকর্ণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। বামাঙ্গ-স্পন্দন হইল, কাক-চিল উড়িতে লাগিল, কুণাল ভাবিলেন, বুঝি কাঞ্চনের সঙ্গে আর দেখা হইল না। বাহিরে তাঁহার আন্তরিক আবেগের চিহ্নও দেখা গেল না। ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম করিয়া তিনি কুঞ্জরকর্ণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

বহুসংখ্যক সৈনিক তাঁহার সহিত যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি হস্তসঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

কুঞ্জরকর্ণ কিয়দ্দূর গিয়া বলিল, "কুণাল, মহারাণী তোমার উপর বড় কঠিন আজ্ঞা করিয়াছেন।"

"তিনি যাই আজ্ঞা করুন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।"

"সে আজ্ঞা পালন করিলে জীবন ও মৃত্যু সমান হইবে।"

"হয় হইবে।"

কুঞ্জরকর্ণ বলিলেন—"এসো! আমরা কেন দুই জনে যোগ করিয়া তক্ষশিলায় নূতন রাজত্ব স্থাপন করি না?"

কুণাল এ কথার উত্তর দিলেন না, কিন্তু এমনি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তাহার হৃদয় কম্পিত হইল। সে ভয়-কম্পিত স্বরে বলিল,—"তবে আমি মহারাণীর আজ্ঞার সহিত লোক পাঠাইয়া দিতেছি, তুমি আপন মন দৃঢ় কর।" বলিয়া কুঞ্জরকর্ণ প্রস্থান করিল।

কুণাল ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের স্তব করিতে লাগিলেন। একমনে বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"জীবলোকের সুখের জন্য জীবন ত্যাগ করা শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আমি কিসের জন্য জীবন ত্যাগ করিতেছি? ইহাতে পাপীয়সীর পাপবাসনা চরিতার্থ বৈ আর কিছুই হইবে না।" তখনি আবার মনে হইল,—"সে যেই হোক, সে এক্ষণে মহারাণী। তাহার আজ্ঞা কোন-রূপেই লঙ্ঘন করা হইতে পারে না—করিলেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইবে।"

এই সময়ে একবার কাঞ্চনমালার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি উদ্দেশে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন—বলিলেন, "জীবিতেশ্বরি! আমার সহিত তোমার এবার আর দেখা হইল না।"

এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দুই জন চণ্ডাল রাজপত্র-হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়েই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বশরীর তৈলাক্ত, প্রকাণ্ড মুখ, বড় বড় চোখ,—অনবরত মদ্যসেবনে জবাফুলের ন্যায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সেই কাল তৈলাক্ত মুখের উপর কোঁকড়া কোঁকড়া দাড়ী এবং অপরিষ্কৃত ভয়ানক কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। গলায় রাঙা জবা-ফুলের মালা, হাতে তীর ও ধনুক। আসিয়াই এক জন আর এক জনকে বলিল—"ওরে, এই শালাটার কি চোখ তুল্‌তে হবে? কিন্তু শালার চোখ দু'ট কি বড়!"

দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল,—"লেখনখানা ওর হাতে দে।"

প্রথম চণ্ডাল আবার বলিল,—"আর পত্র দিয়ে কি হবে? এখনি তো ও পত্র দেখা ফুরিয়ে যাবে!"

"তবে আর কাজ নাই" বলিয়া উভয়ে কুণালের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া তীর তুলিল। প্রথম চণ্ডাল বাম ও দ্বিতীয় চণ্ডাল দক্ষিণ চক্ষু লক্ষ্য করিল। কুণাল দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তোমরা পত্রখানি আগে দেখাও, তাহার পর যাহা হয় করিও।"

"দেখিয়া আর কি হইবে, কাজ দেখো না।"

"না দেখিলে আমি কিছুই করিতে দিব না" বলিয়াই তিনি তাহাদের প্রতি এমনি তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন যে, তাহাদের হস্ত কম্পিত হইল।

কুণাল উঁহাদের হস্ত হইতে পত্র লইয়া মস্তকে ছোঁয়াইয়া পড়িলেন—দেখিলেন, তাঁহারই চক্ষু উৎপাটনের আজ্ঞা। দেখিলেন, তাহাতে তিষ্যরক্ষার নাম স্বাক্ষর।

পত্রখানি পাঠ করিয়া চণ্ডাল দুই জনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তোমরা যাহা আজ্ঞা পাইয়াছ, তাহা কর।"

প্রথম চণ্ডাল বলিয়া উঠিল,—"দেখ্‌লে তো, এখন চোখ তুলি ?"

এই বলিয়া তীর-ধনু তুলিল। কিন্তু চোখের দিকে সে আর চাহিতে সাহস করিল না। ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে রাখিয়া কুণালের চক্ষে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া বাম চক্ষুটি উৎপাটন করিল। কুণাল তখন—

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"

বলিতে লাগিলেন। প্রথম চক্ষু উৎপাটন করিয়াই সে মাতিয়া উঠিল, এবং অপর অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল,—"ও চক্ষু আমার, আমি তুলিতে দিব না" এবং কুণালের চক্ষু আবরণ করিয়া দাঁড়াইল। প্রথম চণ্ডাল উহাকে পদাঘাত দ্বারা দূর করিয়া দিয়া, কুণালের অপর চক্ষুটিও উপাড়িয়া লইল। পরে চক্ষুদুটি কুড়াইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় দ্বিতীয় চণ্ডালকে আর একটি লাথী মারিয়া গেল।

দ্বিতীয় চণ্ডাল কি ভাবিয়াছিল, বলিতে পারি না—সে এ পর্য্যন্ত কথা কহে নাই। প্রথম চণ্ডাল চলিয়া গেলে সে কুণালকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এখনও সেই মন্ত্র পড়িতেছ ?"

কুণাল বলিলেন,—"হাঁ।"

"তোমায় লাগে নাই ?"

"অল্প।"

"চোখ উপড়াইয়া লইল, অথচ অল্প লাগিয়াছে বলিতেছ কেমন করিয়া ?"

কুণাল বলিলেন,—"আমার তো সামান্য কষ্ট হইল, কিন্তু কত লোক আমা অপেক্ষা কত অধিক কষ্ট পায়।"

"তুমি কি তাই ভাবিয়া এত স্থির থাকিতে পারিয়াছ ?"

"হাঁ, তাহাই আমাদের ধর্ম্মের উপদেশ।"

"কি তোমাদের ধর্ম্মের উপদেশ ?"

"আপনার কষ্ট মনে করিবে না, কেবল পরের কষ্ট মনে করিবে এবং তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে।"

"এই তোমাদের ধর্ম্ম ?"

"হাঁ।"

"তবে আমি চলিলাম।"

কুণাল দেখিতে পাইলেন না, সে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, তীর-ধনুক, অস্ত্রশস্ত্র, জবাফুলের মালা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

৬

কিয়ৎক্ষণ পরে কুঞ্জরকর্ণ কুণালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল—বলিল,—"কুণাল, তোমায় এই গৃহেই অবস্থান করিতে হইবে,—মহারাণীর আজ্ঞা।"

"শিরোধার্য্য" বলিলে, কুঞ্জরকর্ণ স্বহস্তে সেই ভূগর্ভস্থ অন্ধকার গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পাটলীপুত্রে তিষ্যরক্ষা একাধীশ্বরী। মহামন্ত্রী রাধগুপ্ত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। উভয়ে পরামর্শ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন ; দুই এক বিষয়ে মহারাজা অশোকেরও মত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে চারি মাস অতীত হইয়া গেল। পঞ্চম মাসের প্রথমেই সংবাদ আসিল, "তক্ষশিলার কুঞ্জরকর্ণ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে।" দুই এক দিন পরে আবার সংবাদ আসিল, "কুঞ্জরকর্ণ আবার বিদ্রোহী হইয়া কুণালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" আবার দুই তিন দিনমধ্যে সংবাদ আসিল, "যুদ্ধে কুঞ্জরকর্ণ জয়লাভ করিয়াছে ও কুণাল বন্দী হইয়াছেন।"

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সংবাদ আসিতে প্রায় এক মাস লাগে, সুতরাং এই এক মাস কুঞ্জরকর্ণ কি করিতেছে, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। নগরবাসী লোকদের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেহ

বলিল—"কুঞ্জরকর্ণ বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে পাটলীপুত্র নগরে আসিতেছে।" কেহ বলিল—"ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বৌদ্ধ বধ করিতে করিতে আসিতেছে।" কেহ বলিল—"মেয়েমানুষের হাতে রাজ্য দিলে সবই বিশৃঙ্খল হয়।" কেহ বলিল—"যখন কুণালকে পরাজয় করিয়াছে, তখন রাজা অশোকের তো কথাই নাই।"

অনেকে পাটলীপুত্র নগর হইতে স্ব স্ব পরিবার স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালা কুণালের বন্দিত্ব শ্রবণ করিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য তিষ্যরক্ষার অনুমতি প্রার্থনা করিল—তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল—কিন্তু এবার তাহার প্রাণ বড়ই কাঁদিতেছে—সে আর কাহারও কথা মানিল না। সেই রজনীযোগেই সে তক্ষশিলা যাইবার পথ আশ্রয় করিল। কাঞ্চনমালা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, শুনিয়া নগরের মধ্যে আবার হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল,—"অশোক রাজার রাজলক্ষ্মী এইবার ত্যাগ করিয়া গেলেন।"

কাঞ্চন যে দুঃখী-দরিদ্রের মাতা-পিতা ছিলেন। কাঞ্চন যাওয়া অবধি তাহারা সর্ব্বদাই অশোক রাজাকে গালি দিতে লাগিল—কেহ কেহ উহার অনুসন্ধানার্থ তক্ষশিলার পথে গমন করিতে লাগিল, কিন্তু কাঞ্চনের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পাটলীপুত্র হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য আবার প্রেরিত হইল। তাহারা কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল, তাহারা কুঞ্জরকর্ণের সহিত যোগ দিয়াছে। তখন নগরবাসীদের ভয়ের আর সীমা রহিল না। তাহারা সকলে তিষ্যরক্ষার প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে গিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল—বলিতে লাগিল—"শত্রু তো এলো, নগরের রক্ষার উপায় কি?"

তিষ্যরক্ষা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে গালি দিতে দিতে অশোক রাজাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। মহারাজ অশোক তখন নগর হইতে অনেক দূরে বেণুবনে উপগুপ্তের সহিত বাস করিতেছিলেন। সমস্ত লোক গিয়া তথায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং তাঁহাকে এই অভাবনীয় বিপদের সময় স্বয়ং রাজ্য-ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন অশোক রাধগুপ্ত ও তিষ্যরক্ষার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অশোক আসিতে আসিতে নগরবাসীদের মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন। কাঞ্চন ও কুণালের অবস্থা শুনিয়া তাঁহার মনের উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি রাজবাটীর দ্বার হইতে আশ্বাসবাক্যে প্রজাদিগকে বিদায় দিয়া, প্রথমেই তিষ্যরক্ষার মহলে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, তিষ্যরক্ষা ও রাধগুপ্ত কি পরামর্শ করিতেছেন। রাজা রাধগুপ্তকে দেখিয়া বলিলেন—"কুঞ্জরকর্ণ না কি সসৈন্যে আসিতেছে?"

রাধগুপ্ত বলিল—"কুঞ্জরকর্ণ তক্ষশিলায় জয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু সে তক্ষশিলা হইতে বহির্গত হইয়াছে, এরূপ সংবাদ আমরা পাই নাই।"

"কুণালের কি হইয়াছে? কাঞ্চন কোথায়? তোমরা এত দিন সৈন্য পাঠাও নাই কেন? যে সব সৈন্য পাঠাইয়াছ, তাহাদেরই বা সংবাদ কি? আমি তো এ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

রাজা এত দ্রুত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে, রাধগুপ্ত কিছুরই জবাব দিতে পারিল না। রাজা যে এ সময় উপস্থিত হইবেন, তাহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। রাজা প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া আরও ব্যস্ত হইয়া আরও লক্ষ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া তিষ্যরক্ষাকে সংবাদ দিল যে, তক্ষশিলা হইতে এক জন বিজ্ঞানবিৎ আসিয়াছে। সে বলে, মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

রাজা বলিলেন,—"তক্ষশিলা হইতে?" কঞ্চুকী রাজাকে দেখিয়াই আভূমি প্রণত হইয়া বলিল,—"মহারাজের জয় হউক।"

"জয় পরে হবে, সে লোক কি তক্ষশিলা হইতে আসিয়াছে?"

কঞ্চুকী বলিল—"আজ্ঞা হাঁ।"

"তাহাকে লইয়া আইস।" মন্ত্রী নিষেধ করিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় দিয়া বলিল—"দূতের সহিত সাক্ষাতের এ সময় নহে, বিশেষ মহারাণী ক্লান্ত আছেন।"

রাজা রাধগুপ্তের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—"তুমি মহারাজের আজ্ঞা পালন কর।"

কঞ্চুকী শশব্যস্তে বিজ্ঞানবিৎকে আনিতে প্রস্থান করিল। মন্ত্রী বলিল,—"মহারাজ, আপনার রাজ্যান্তের আর অল্পদিনই আছে।"

রাজা বলিলেন,—"অল্পদিন আছে, তাহা জানি, কিন্তু সে কথা স্মরণ করাইয়া দিবার তাৎপর্য্য?"

"এই কয় দিন স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে না দিলে আপনার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে।"

"তত দিনে মগধ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইবে।" রাজা এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে কঞ্চুকী বিজ্ঞানবিৎকে লইয়া উপস্থিত হইল, এবং মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বিজ্ঞানবিৎ আপন বস্ত্রমধ্য হইতে একটি বাক্স লইয়া রাণীর হস্তে দিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তক্ষশিলা হইতে আসিতেছ?"

সে বলিল,—"হাঁ।"

সে রাজার কথায় আর কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল,—"দেবি, এই দুইটি চক্ষু লইয়া আসিতে আমার যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে, বলিতে পারি না। রাজপথে বিশল্যকরণী মিলে না। সুতরাং আমাকে"—

চক্ষুর কথা শুনিয়া তিষ্যরক্ষা শিহরিয়া উঠিল, বাক্সটি খুলিল, খুলিয়া চক্ষু দুইটি বাহির করিল—দেখিল, সে চক্ষু এখনও তেমন উজ্জ্বল—সে উহা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পাতিত করিয়া পদতলে দলিত করিল—করিয়াই ব্যস্তসমস্তভাবে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

রাজাও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চোখ কাহার? কোথা পাইলে?" কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার পথের কষ্টের কথা বলিতেছিল। সে বিশল্যকরণী অন্বেষণ করিবার জন্য কখন সাপের মুখে পড়িয়াছে, কখন বাঘের মুখে পড়িয়াছে; নহিলে সে চক্ষু টাটকা থাকে না; ইত্যাদি বলিতেছিল।

রাণী চলিয়া গেলে রাধগুপ্ত তাহাকে বলিলেন,—"থাম, দেখিতেছ না, রাণীর অসুখ হইয়াছে? তোমায় এ সময় কে আসিতে বলিয়াছিল?"

সে বলিল,—"আমি কি করিয়া জানিব? আমায় এক জন অনেক টাকা দিয়া ঐটি মহারাণীর হস্তে দিতে বলিয়াছিল। আরও বলিয়াছিল যে, মহারাণীর হাতে দিলে তিনি অনেক পুরস্কার দিবেন।"

রাজা বলিলেন—"কে সে লোক?"

বিজ্ঞানবিৎ বলিল,—"তাহা আমি জানি না। আমায় বিজ্ঞানের অনেক পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহাতে আমার অনেক টাকার প্রয়োজন। সে আমায় টাকা দিল এবং আরও পাইবার আশা দিল—আমি লইয়া আসিলাম।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে সে, তুমি তাহাকে চেনো?"

সে বলিল,—"না।"

"তুমি আসিতেছ কোথা হইতে?"

"বাসুকিশীল হইতে।"

"সে কোথায়?"

"তক্ষশিলা হইতে আট ক্রোশ পূর্ব্বে।"

"সেখানকার বিদ্রোহের কি সংবাদ জান?"

"বিদ্রোহ কোথায়?"

"তক্ষশিলায়।"

"হাঁ, একটু একটু জানি। পাঁচ ছয় মাস হইল, কতকগুলি কাটা পা যোড়া দিয়াছি। শুনিয়াছিলাম, বিদ্রোহে তাহাদের পা কাটা গিয়াছিল।"

রাজা দেখিলেন, উহার নিকট হইতে কোন সংবাদই পাওয়া গেল না; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি পরীক্ষার জন্য এত টাকা চাও?"

সে বলিল,—"অন্ধত্ব দূর করিবার জন্য।"

রাজা বলিলেন,—"অশোক সিংহাসনে আরূঢ় হইলে আসিও; তিনি তোমায় পুরস্কৃত করিবেন।"

"মহারাণী আমায় পুরস্কার কৈ দিলেন? আমি কি অশোকের অভিষেক পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিব?"

"থাকিলেই বা হানি কি?"

"তাহাও যদি ঠিক জানিতাম যে, নিশ্চয় হইবে, না হয় দুপাঁচ দিন থাকিতাম। কিন্তু যে একবার আপন রাজ্য পরকে, বিশেষ স্ত্রীলোককে দেয়, সে কি আর উহা ফিরিয়া পায়?"

মন্ত্রী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন,—"তুমি তো বড় অর্ব্বাচীন। তুমি জান, কাহার সহিত কথা কহিতেছ?"

সে বলিল—"জানি আর নাই জানি, সত্য কথা যমের সাক্ষাতেও কহা যায়।"

মন্ত্রী বলিলেন—"তুমি এখন অতিথিশালে যাও, আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার পুরস্কারের ব্যবস্থা করিব।"

"কিন্তু আমি অধিক দিন থাকিতে পারিব না।"

"আজিই ব্যবস্থা করিব" বলিয়া মন্ত্রী তাহাকে বিদায় দিলেন।

৩

বিজ্ঞানবিৎ চলিয়া গেলে রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সব কি?"

মন্ত্রী গললগ্নীকৃতবাস হইয়া রাজার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন—"মহারাজ, এ কয় দিন আমায় কিছু বলিবেন না। আমি আপনারই

ভৃত্য। আপনিই আমাকে অন্য হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আপনি জানেন, রাজ্যের কার্য্য অতি দুরূহ। এ কয়েক দিন আমার প্রভুর অনুমতিতে আপনাকে কোন কথা বলিতে পারিব না।"

রাজা বলিলেন—"সাধু, কিন্তু নগরবাসীদের ভয় নিবারণের কি উপায় করিয়াছ ?"

"তাহাও মহারাণীর ইচ্ছা।"

এই সময়েই আবার তক্ষশিলা হইতে দূত আসিল। কুণাল বন্দী হওয়ার পর তাঁহার সৈন্যেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কেহ বিদ্রোহে যোগ দিতেছে, কেহ দেশীয় লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছে।

শীঘ্র সৈন্য ও সেনাপতি না পাঠাইলে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ হইবে, এই সংবাদ লইয়া উভয়েই দ্রুতগতি রাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখনও তাহার মনের আবেগ শান্ত হয় নাই। সে হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া উহাদিগকে পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিতে বলিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই তথায় আসিয়া মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল— "মহারাজ, আমার আর রাজত্বে কাজ নাই। আমি স্ত্রীলোক। রাজ্যচিন্তা আমার পক্ষে বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।"

মন্ত্রী তখন বার বার রাণীর শরীরের অসুখের কথা কহিতে লাগিল,—"এদিন শিরঃপীড়া হইয়াছিল, ও-দিন ভ্রমি হইয়াছিল, সেদিন মূর্চ্ছা হইয়াছিল, আজিও তো দেখিলেন" ইত্যাদি।

রাজা বলিলেন—"রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারি না।"

অমনি রাধগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন—"তবে আপনি প্রধান মন্ত্রী হইয়া আমায় অব্যাহতি দিন।"

"রাধগুপ্ত থাকিতে অন্য কেহ মন্ত্রী—"

রাণী বলিলেন—"তবে এই গোলযোগের সময় আপনি সেনাপতি হন।"

রাজা বলিলেন—"সেই ভাল। আমি নগরবাসীদিগকে শান্ত করিয়া তক্ষশিলায় যাত্রা করিব। যাবৎ না ফিরিয়া আসি, তোমরা যেমন রাজ্য করিতেছিলে, তেমনি রাজ্য কর।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

স্বামী বন্দী হওয়ার সংবাদ পাইয়া অবধি কাঞ্চনের মনের স্ফূর্ত্তি ছিল না। তাঁহার যাহা নিত্যকর্ম্ম ছিল, তাহা তিনি করিতেন,—কেবলমাত্র অভ্যাসের গুণে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বড় একটা উৎসাহ ছিল না। নিত্য সঙ্ঘ-ভোজন করাইতেন, নিত্য দীন-দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র দিতেন, নিত্য রোগীদের সেবা করিতেন, নিত্য ঔষধ বিতরণ করিতেন, সমস্ত কেবল অভ্যাসের গুণে। ক্রমে দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার কাজ ভাল হয় না। এক দিন সঙ্ঘভোজনে পরিবেশন করিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে পায়স দিয়া ফেলিলেন ; এক দিন এক জন রোগীকে ঔষধ সেবন করাইয়া আসিলেন, পরদিন পথ্য দিতে হইবে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথ্যের কথা তাঁহার মনে পড়িল না। মনে পড়িলেই দৌড়িয়া গেলেন, গিয়া দেখেন, রোগী অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছে। এক দিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য কিছু খাবার লইয়া যাইতে যাইতে এক পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন। মনে হইল, এক দিন কুণাল ও তিনি এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন ; আবার সেই পূর্ব্বের কাহিনী মনে পড়িয়া গেল, গয়াশীর্ষ পর্ব্বতের বাঘ শিকার হইতে সকল কথা মনে পড়িল। দাঁড়াইয়া একমনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন—আত্ম-চিন্তায় মগ্ন হইয়া উঠিলেন, খাবারগুলি চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

কাঞ্চন দেখিলেন, এরূপ মনে গৃহে বাস করা সঙ্গত নয়। যে কাজে উৎসাহ নাই, সে কাজ করিতে নাই। যেখানে থাকিলে মনের স্ফূর্ত্তি হয় না, সেখানে থাকিতে নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া কাঞ্চন গৃহত্যাগ করিলেন। এক দিন ঘোরা দ্বিপ্রহরা নিবিড়-গাঢ় তমস্বিনী রাত্রিতে পতি-অন্বেষিণী কাঞ্চনমালা আপন কুটীরে বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিলেন ; শাক্য ভিক্ষুণী সাজিলেন। রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন, স্বহস্তে আপাদলুণ্ঠিত কেশরাশি ছেদন করিলেন। কতকগুলা ধূলাকাদা মাখিয়া সে তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ বর্ণের হীনতা সম্পাদন করিলেন। ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন ; ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন ; করিয়া অনন্ত পিচ্ছিল অন্ধকার-সমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিলেন।

২

পাটলীপুত্র হইতে তক্ষশিলা যে অনেক দূর। একখানি চিঠি আসিতে এক মাস লাগে ; একা কাঞ্চন এত দূর কি করিয়া যাইবে ? কিন্তু কাঞ্চন ঋষিকন্যা, পর্ব্বত তাহার জন্মভূমি, সে রাজপুরীর সুখকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে। রাজ-পুরীতে পাখীরা

প্রাণ খুলিয়া গান গাইতে পারে না। যে বায়ু পর্ব্বত-শীর্ষে প্রাণ প্রফুল্ল করিয়া দেয়, সে বায়ু রাজবাড়ীতে পাওয়া যায় না। রাজবাড়ীতে প্রাণ খুলিয়া কথা কহারই যো নাই; সুতরাং কাঞ্চনের পক্ষে রাজ-বাড়ীই কষ্টকর; পথশ্রম তাহার পক্ষে কষ্টকর নহে। কিন্তু এবার পথ চলিতে গিয়া কাঞ্চন বুঝিতে পারিল যে, সেকালের পথ চলায় আর একালের পথ চলায় অনেক তফাৎ। এখন ভাবনার ভারে মন পীড়িত, পথ যেন বড় লম্বা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পা যেন উঠিতেছে না বোধ হইতে লাগিল তিনি অন্য লোক অপেক্ষা অনেক দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার মন উঠিল না। পাছে রাজ-পথে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে তিনি সে পথে গেলেন না। রাজপথ বাঁকিয়া গিয়াছে, মগধ সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রধান নগরগুলি ঐ একটি রাস্তার ধারে, সুতরাং সে পথে যাইতে গেলে অনেক দেরী হইবে ভাবিয়া কাঞ্চন গ্রাম্য পথ আশ্রয় করিলেন। কখন মাঠের উপর দিয়া, কখন বনের মধ্য দিয়া, কখন গ্রামের ভিতর দিয়া, কখন বড় বড় নদী সন্তরণ করিয়া, পতিগতপ্রাণা পতির অন্বেষণে গমন করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে পতির রূপ অঙ্কিত, পতির ভাবনায় পথের ক্লেশ অনুভব হইল না। এক দিন সরযূতীরে বহুসংখ্যক লোক সংগ্রহ হইল, দেখিল, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকিরণে দীপ্যমান মূর্ত্তি দেবতা বা গন্ধর্ব্ব বা বিদ্যাধর সকলের সম্মুখে সরযূ-জলে ঝাঁপ দিল; সরযূ তখন উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-পরিপ্লুত মৃত্যুর দন্তাবলীর মত বন্ধুর। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িল, কেহ কেহ নৌকা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ যাইবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু সে দেব বা মানুষ হাত তুলিয়া বারণ করিল এবং "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি," "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিতে বলিতে বক্ষোভরে উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া অবিরল ঘূর্ণ্যমাণ হস্তদ্বয়ের দ্বারা নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া অল্পক্ষণেই নদীর অপর পারে পৌঁছিল। তাহার পর সেই আর্দ্র বস্ত্রে পুনরায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

৩

এক দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় অহিচ্ছত্রের লোক সহসা জাগরিত হইয়া শুনিল, স্বরলহরীতে আকাশ-পাতাল পরিপূর্ণ করিয়া গাথা গান করিতে করিতে কে রাজপথের মধ্য দিয়া যাইতেছে। কেহ বলিল, নগরের অধিষ্ঠাত্রী, কেহ বলিল বিদ্যাধরী।

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় মদিপুরার লোকে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহা কোলাহল করিতেছে, একটি বালক জলে ডুবিয়া গিয়াছে, কেহ তুলিতে পারিতেছে না। তাহার পিতামাতা হাত-পা আছড়াইয়া কাঁদিতেছে। কেহ সান্ত্বনা করিতেছে, কেহ ক্রন্দন করিতেছে, কেহ ডুবরী ডাকিতে যাইতেছে। এমন সময়ে সহসা আশ্চর্য্য হইয়া তাহারা দেখিল, জয় ধর্ম্ম, জয় সঙ্ঘ, জয় বুদ্ধ ধ্বনি করিয়া এক রক্তাম্বরী দেবী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কাহাকে কোন কথা বলিলেন না, জলমধ্যে ঝাঁপ দিলেন, ডুবিলেন, কিয়ৎপরে জল যেমন ছিল, তেমনি হইল। তাহার গর্ভে যে দুইটা মানুষ আছে, তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। সকলে ভাবিল, কোন যক্ষ বালককে লইয়া পাতালপুরী প্রবেশ করিল। ও মা !! অল্পক্ষণে বালক-কোলে দেবী জলোপরি ভাসমান হইলেন, বালক মূর্চ্ছিত অচেতন। তাহার বাপ-মা দৌড়িয়া বালক কোলে লইতে আসিল। দেবী দুই পা ধরিয়া বালককে ঘুরাইতে লাগিলেন, লোকে বিস্মিত হইল; পিতা-মাতা ব্যাকুল হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে গেল; কিন্তু মানুষের সাধ্য কি দেবীর বলরোধ করিতে পারে? কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেবী মাতার ক্রোড়ে সন্তান দিলেন। সন্তান মাতৃক্রোড়ে হাসিতে লাগিল। সকল লোকে ছেলের মা-বাপের জন্য আহ্লাদ করিতে লাগিল। এ দিকে দেবীও অন্তর্হিতা হইলেন।

৪

ক্রমে কাঞ্চনমালা মাণিক্যালা আসিয়া পৌঁছিলেন। মাণিক্যালা পার হইয়াই বিদ্রোহী দেশ। কাঞ্চন মাণিক্যালার প্রধান মঠে এক রাত্রি অবস্থান করিলেন। সমস্ত দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন; এবং প্রাতঃকালে ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম স্মরণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে বিদ্রোহী রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই তিন দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে শতদ্রু নদী পার হইয়া তিন চারি ক্রোশ যাইয়া তিনি দেখিলেন, এক স্থানে বহুসংখ্যক সেনা সমবেত হইয়াছে। কাঞ্চনমালা সৈন্য দেখিয়া অন্য পথে যাইবার উদ্‌যোগ করিলেন, কিয়ৎ দূর গিয়া ক্রমে শালবনে প্রবেশ করিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, দেখিলেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছ—যাহার মধ্যে

সূর্য্যরশ্মি কখন প্রবেশ করিতে পায় না। সেই নিবিড় অন্ধকারমধ্যে দেখিলেন, কোথাও কতকগুলা কম্বল পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কতকগুলা ভাঙ্গা ডাল পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কতকগুলা ভাঙ্গা হাঁড়ি রহিয়াছে, কোথাও কতকগুলা কাঠ রাশি করা রহিয়াছে; কিন্তু সব ঝোপের মধ্যে লুকান; কোথাও একটি মনুষ্য নাই। চারি দিক চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও একটি মনুষ্য নাই। পশ্চাদ্‌ভাগে অনেক দূরে বোধ হইল, একটা কি আসিতেছে, ঠিক স্থির করিয়া বুঝিতে পারিলেন না মানুষ কি জানোয়ার। তিনি সত্বর-পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গেলেই একটা বিকটধ্বনি শুনিতে পাইলেন, শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কয়েক জন প্রকাণ্ড-কায় অশ্বারোহী কতকগুলি গুনে গোরু বেড়িয়া আসিতেছে, দেখিতে পাইয়াই তিনি বৃক্ষান্তরাল দিয়া যাইতে লাগিলেন। আবার সমস্ত বনভূমি কম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ হইল; আর প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে দুইটি, একটি, তিনটি করিয়া বহুসংখ্যক লোকে কানন ব্যাপ্ত হইল। কাঞ্চন যে দিকে চাহেন, দেখেন রণবেশ! ব্রাহ্মণ সেনা, প্রকাণ্ড বলবান্, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, অপরিষ্কার শরীর; কাহার যজ্ঞোপবীত আছে, কাহার নাই। বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পড়িয়া সকলে অশ্বারোহীদিগের প্রতি ধাবিত হইল, বোধ হয়, অশ্বারোহিগণ ইহাদের জন্য খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। দেখিয়া কাঞ্চন রক্তাম্বরখানি বিলক্ষণরূপে মুড়ি দিয়া একটি বৃক্ষের দুইটি শিকড়ের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু বহুসংখ্যক দুষ্টস্বভাব সৈনিক বৃক্ষের উপর হইতে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী একটি রমণীকে কাননমধ্যে একাকী দেখিয়াছিল। দেখিয়া অনেকের মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু কি করে? অশ্বারোহিগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার নিষেধ ছিল। সুতরাং এতক্ষণ তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। এক্ষণে তাহারা সুন্দরী কোথায় গেল, খোঁজ করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। অধিকক্ষণ খুঁজিতে হইল না। সন্ধান করিয়া সন্ধান করিয়া, বৃক্ষমূলে রক্তাম্বর দেখিয়া তদভিমুখে সাত আট জন ধাবিত হইল। যখন কাঞ্চন দেখিলেন, লুকান আর থাকা গেল না, তখন তিনি সত্বর বৃক্ষারোহণ করিলেন। বৃক্ষের শাখায় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সৈনিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি পতি-অন্বেষণে বহুদূর হইতে আসিতেছি, আমার পতি তক্ষশিলায় বন্দী আছেন, আমি তথায় যাইব, আমায় বাধা দিও না।

এক জন সৈনিক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিল, তত দূর যাইতে হইবে না, এই স্থানেই পতিলাভ করিবে। আর এক জন বলিল, পতির অন্বেষণে না উপ-পতির? দুই তিন জন সত্বর বৃক্ষ আরোহণ করিতে লাগিল। কাঞ্চন বলিল, বৃক্ষে উঠিও না, এক পদাঘাতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিব। সকলে হাস্য করিয়া উঠিল, কিন্তু যে সর্ব্বাপেক্ষা উহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তিনি উহাকে এমন দারুণ পদাঘাত করিলেন যে, সে রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তখন সকলে ভয়ে অভিভূত হইয়া সত্বর বৃক্ষ হইতে নামিয়া পড়িল। বহুসংখ্যক লোক বৃক্ষতলে সমবেত হইল। তখন সকলে কি করা যায় পরামর্শ করিতে লাগিল, আর কাহার সাহস হইল না যে, বৃক্ষে আরোহণ করে। কেহ বলিতে লাগিল, প্রেতিনী, কেহ বলিল, দেবী, কেহ বলিল, উহাকে ছাড়িয়া দাও, কেহ বলিল, ও পতি অন্বেষণে আসিয়াছে, উহাকে দুই একটা পতি দিয়া দিতে হইবে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দৃষ্ট হইল, দূরে সংগৃহীত কাষ্ঠ-কম্বলাদি জ্বলিয়া উঠিল, অগ্নি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া যেন বনরাশিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। হঠাৎ অগাধ ধূমরাশিতে কাননাভ্যন্তর গাঢ়তর অন্ধকার হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে যে স্থানে অশ্বারোহিগণ সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর খাদ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার সন্নিকটে প্রচণ্ড পাবকরাশি পরিদৃশ্যমান হইল। সেনাপতি বারংবার তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন; বোধ হইতে লাগিল, যেন অগ্নিদেব সৈনিকদিগের প্রাণভূত অন্নরাশি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন বৃক্ষতলস্থ সকলেই আহার্য্য দ্রব্যরাশি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে ধাবিত হইল। কেবল কাঞ্চন যাহাকে পদাঘাত করিয়াছিল, সে ও আর এক জন বিকটাকৃতি লোক বৃক্ষতলে বসিয়া রহিল, এবং ঘন ঘন বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাদের কি অভিসন্ধি ছিল, বলিতে পারি না; কিন্তু যতদূর অনুমান করা যায়, অভিসন্ধি ভাল ছিল না। কাঞ্চন একবার মনে করিলেন নামি, আবার ভাবিলেন, এরূপ দুর্দ্দান্ত লোকের হাতে পড়া ভাল নয়, ভাবিয়া তিনি বৃক্ষের উপরিভাগ আরোহণ করিতে লাগিলেন, এবং ইহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কিছু উপায় আছে কি না, চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাঞ্চনের উপায় ভগবান্ আপনি করিয়া দিলেন। কাঞ্চন বৃক্ষোপরি উঠিয়া দেখিলেন, অরণ্যানী

পরিবেষ্টন করিয়া বহুসংখ্যক অশ্বারোহী প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইতেছে, সূর্য্য-কিরণে তাহাদের বর্ম্ম, উষ্ণীষ, কবচাদি জ্বলিতেছে; তীক্ষ্ণধার বর্শার অগ্রে অপরাহ্ণ-সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত, শীর্ণ, বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা ঘুরিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কাঞ্চন যে বৃক্ষে আছেন, তাহার নিকট দিয়া ব্রাহ্মণ সেনার পশ্চাদ্‌ভাগে আক্রমণ করিল। যাইবার সময়ে এক জন বৃক্ষতলস্থ যোধবেশী ব্রাহ্মণ সৈন্যদ্বয়ের পৃষ্ঠে বর্শাঘাত করিল, তাহারা উভয়েই তরবারি নিষ্কাশন করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু তিন চারিটি বর্শার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উভয়েই ধরাশায়ী হইল। ও দিকে ব্রাহ্মণসৈন্যগণ সম্মুখে প্রচণ্ড অগ্নি, পশ্চাতে প্রচণ্ড অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। কিন্তু তাহারা বীর—যুদ্ধে পরাজিত হইবার লোক নয়—অগ্নিদেবকে ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক সকলে সম্মুখ ফিরিয়া অশ্বারোহীদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন অশ্বে অশ্বে, অশ্বে পদাতিকে প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইতে লাগিল। কাঞ্চন উপর হইতে দেখিতেছিলেন। গাঢ় ধূমান্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু শুনিতে লাগিলেন, হ্রেষারব করিয়া—অশ্ব পড়িতেছে, বিকট হুঙ্কার করিয়া—মনুষ্য মরিতেছে, অগ্নিমধ্যে মনুষ্যদেহ অশ্বদেহ পুড়িতেছে—কেহই পলাইতেছে না।

কাঞ্চন এ দৃশ্য অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন না। তিনি চক্ষু ফিরাইলেন; দেখিলেন, যে দুই জন লোকের ভয়ে তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে পারেন নাই, তাহারা ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি সত্বর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। আসিয়া দেখেন, উভয়েই মুমূর্ষু। দেখিলেন, বর্শা-ফলক এক জনের বক্ষোদেশে বিদ্ধ, পৃষ্ঠদেশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার সামান্যমাত্র জ্ঞান আছে। কাঞ্চন নিকটবর্ত্তী হইলে, সে কষ্টে ক্ষীণ হস্ত যোড় করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল—দেবি, ক্ষমা—তাহার আর কথা কহিতে হইল না। কাঞ্চন একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন যে, প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাহার গাত্র হইতে বর্শাফলক তুলিয়া লইলে সে বাঁচিতে পারে। তৎক্ষণাৎ কাঞ্চন ধীরে ধীরে বর্শাফলক উত্তোলন করিলেন, প্রবল বেগে রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল। কাঞ্চন নিজ রক্তাম্বরের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া ক্ষত-মুখে অর্পণ করিলেন; সম্মুখে জল ছিল না, ক্ষতমুখে ধূলিবৃষ্টি প্রদান করিলেন এবং নিকটে যে সকল লতাপাতা ছিল, তাহার রস নিঙ্‌ড়াইয়া ক্ষতমুখে দিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অশ্বতর আরোহণ করিয়া এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভের পৃষ্ঠে কি কতকগুলা বোঝাই দিয়া কতকগুলা লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে এক জন আকার-প্রকারে বোধ হইল দলাধিপতি। দেখিলেন, দুইটা মানব মৃতপ্রায়; দেখিয়া দলস্থগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়া তথায় উপস্থিত রহিলেন। তখন কাঞ্চন কতকগুলা লতাপাতা সংগ্রহ করিয়া তাহার রস ক্ষতস্থানে দিতেছেন। সে-ও অশ্বতর হইতে অবতীর্ণ হইয়া গাধার বোঝা নামাইল এবং তাহার মধ্য হইতে কি কয়েকটি ঔষধ লইয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে দিল। তখন রোগীর চৈতন্য হইল। সে সম্মুখে কাঞ্চনমালাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি!" আগন্তুক কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি তোমার কে হন?" রোগী অমনি বলিয়া উঠিল, "আমি উহার পরম শত্রু" আগন্তুক আবার কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল—"শত্রুর সেবা করিতেছ কেন?" কাঞ্চন বলিল, "উহার যন্ত্রণা দেখিয়া সে সব কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

এই কথা শুনিয়া আগন্তুক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দুইবার বলিয়া উঠিল—"গুরুদেব! গুরুদেব!" কাঞ্চন বলিল, "তোমার গুরুদেব কে?" সে বলিল, "জানি না, তিনি কে। আমি পূর্ব্বে চণ্ডাল ছিলাম; তক্ষশিলা নগরে জল্লাদের কর্ম্ম করিতাম। এক দিন শাসনকর্ত্তা আমাকে ও আর এক জন জল্লাদকে এক নির্জ্জন ভূগর্ভস্থ ঘরে লইয়া গিয়া এক জন ঋষির চক্ষু উৎপাটন করিতে বলিলেন। আমার সঙ্গী চক্ষু উৎপাটন করিল। কিন্তু আমি দেখিলাম, ঋষি চক্ষু উৎপাটনে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেও ঐ কথাই বলিলেন। আজি আবার তোমার মুখে সেই কথা শুনিয়া তাঁহার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার পর কতবার তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু দুষ্ট ব্রাহ্মণেরা কোথায় যে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, খুঁজিয়া পাই নাই। তদবধি আমি আমার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা করিয়া বেড়াই। এই যে কয়েক জন লোক আসিয়াছিল, ইহারা সকলেই চণ্ডাল, সকলেই আমার মতাবলম্বী হইয়াছে।"

কাঞ্চন যতক্ষণ চণ্ডালের কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছিল। এক একবার

সেই দিনের স্বপ্নের কথা মনে হইতেছিল। তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইতেছিল যে, এ কুণাল ভিন্ন আর কেহ নহে। চণ্ডালের কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মহোত্তর! তোমার গুরুদেবকে একবার দেখাইতে পার?" সে বলিল, "দেখিতে পাইলে আমিই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতাম।"

কাঞ্চন বলিল, "তুমি আমার দুঃখে কাতর হইলে, তাই তোমায় বলিতেছি, আমার স্বামী এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছেন। তিনি মহারাণীর সেনাপতি ছিলেন। তোমার গুরুদেবকে পাইলে আমার স্বামীর অন্ততঃ সন্ধান পাওয়া যায়। তোমার কথায় বোধ হইতেছে, তিনিও পাটলীপুত্র হইতে আসিয়াছিলেন।"

এই সময়ে রোগী চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমরা দুই জনে আমার প্রাণ দিয়াছ, তোমাদের একটা কথা বলি। আমায় এক দিন (পার্শ্বে দেখাইয়া দিয়া) এই মৃত চণ্ডাল দুইটি চক্ষু দিয়া বাসুকিশীল পাঠাইয়াছিল। আমি আর কিছু জানি না। এই সকল জানি।"

তখন বৌদ্ধ চণ্ডাল হিন্দু চণ্ডালের কাছে গিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ! এই সেই, এই চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল।" বলিয়াই সে চণ্ডালের গাত্রবস্ত্রমধ্যে হস্ত পুরিয়া দিল, দিয়া কিছুই পাইল না; কেবল এক সঙ্কেতের মোহর পাইল। সে কাঞ্চনকে বলিল, "চল, গুরুদেবের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিয়া দিব। কারাগৃহে যাইবার উপায় করিয়াছি। সেই কারায় তিনি নিশ্চয়ই আছেন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মোহর পাইয়া বৌদ্ধ চণ্ডাল যুদ্ধস্থলে গেল। তথায় স্বদলবলের উপর আহত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সৈন্যের শুশ্রূষার ভার দিয়া সে কাঞ্চনকে সঙ্গে লইয়া তক্ষশিলায় গমন করিল।

তক্ষশিলার অবস্থা এখন বড় শোচনীয়। অশোকের রাজ্য অনেক দিন লোপ হইয়াছে। বার বার যুদ্ধে নগরের বড় বড় পরিবার বিধবার পুরী হইয়া উঠিয়াছে। রাজবাড়ীতে লোক অতি অল্প। সমস্ত বিদ্রোহী পল্টন, অশোক সেনাপতি হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া, সীমাপ্রদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছে। নগররক্ষী সেনাও কেহ যুদ্ধের জন্য, কেহ লুঠের জন্য, নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে, তাহাদের উৎপাতে নগরবাসীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। নগরের বড় লোকে ছোট লোকের উপর উৎপাত করিতেছে। ছোট লোকে একযোট হইয়া বড় লোকের বাড়ী লুঠ করিতেছে, কোথাও শৃঙ্খলা নাই।

তাঁহারা দুই জনে অতি কষ্টে কারাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যদিও বিদ্রোহীদিগের জন্য কারাগৃহ, তথাপি তাহাতে অধিক পাহারা নাই। যাহাও দুই চারি জন আছে, তাহারা দ্বারের পার্শ্বে একটা ছোট ঘরে কি একটা গোলযোগ করিতেছে। বোধ হইল, কি যেন একটা ভাগ লইয়া গণ্ডগোল হইতেছে। বৌদ্ধ চণ্ডাল পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের বেশ ধরিয়া গিয়াছে। গিয়া মোহর দেখাইল। এক জন বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি চাও?"

"রাজার হুকুম তামিল করিতে চাই।"

"আজ কয় জন?"

"তিন জন।"

"সব কটা একেবারে সার না।"

"রাজার হুকুম।" তখন ভিতর হইতে এক জন বলিল, "কি হে, বাহিরে গোল করিতেছ, এখানকার কাজটা সারিয়া যাও না।"

"দাঁড়াও হে, সরকারী কাজ।"

"আর পাঁচ সাত দিনেই সরকারী কাজ বাহিরে হইবে। এই যোগে কিছু ক'রে লও।"

তখন পাহারাওয়ালা এক থোলো চাবি লইয়া বলিল, "আমরা আর ভিতরে যাইতে পারি না। তুমিও সরকারী চাকর—যাও—চাবিটা আমাদের দিয়া যাইও।"

স্বচ্ছন্দে এক জন অপরিচিত লোককে চাবি দিয়া শাস্ত্রীরা লুঠের টাকা ভাগ করিতে বসিল। উহার সঙ্গে যে কাঞ্চনমালাও গেল, তাহা দেখিলও না। উহারা দুই জনে প্রবেশ করিলে, কাঞ্চনমালা শিহরিয়া উঠিলেন—দেখিলেন, ঘোর অন্ধকার—ছুঁচা, ইঁদুর ও চামচিকার আড্ডা—দুই হাত অন্তরের বস্তু দেখা যায় না। পথ দেখা যায় না। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দ্বার দেখিতে লাগিলেন। দ্বার দেখিয়াই চাবি খুঁজিয়া দ্বার খুলিলেন, দেখেন, ঘরটি অতি ছোট, এক জন কষ্টে থাকিতে পারে। তাহার মধ্যে একটি লোক। ঘরে বিছানা নাই, খাবার জল নাই। কেবল কয়েদীর লোটাটি মাত্র রহিয়াছে। যাইবামাত্র কয়েদী বলিল,

"আমায় মারিয়া ফেল ; জলতৃষ্ণায় প্রাণ যায়, একটু জল পর্য্যন্ত পাই না। যদি খুন করিতে হয়, একেবারে কর না কেন? দগ্ধাও কেন?"

কাঞ্চন বৌদ্ধ চণ্ডালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারাগারে এত কষ্ট?"

কাঞ্চনের স্বরে কয়েদী একটু উন্মনা হইল। চণ্ডাল বলিল, "কয়েদী ভাই! আমরা তোমাদের শত্রু নহি ; তোমাদের বন্ধু, আমরা বৌদ্ধ। সত্বর তোমাদের উদ্ধার করিব। বলিতে পার, কুণাল নামে রাজপুত্র কোথায়?"

"কুণাল কোথায়? সর্ব্বপ্রথম তাহাকে বন্দী করিয়াছে। কোথায় কিরূপ অবস্থায় রাখিয়াছে, জানি না, তিনি আছেন কি না, তাহাও জানি না!"

"এখানে তোমরা কে কে আছ?"

"কেমন করিয়া জানিব? আমি এই ঘরে আছি, এইমাত্র জানি। যখন বড় কষ্ট হয়, এক একবার চীৎকার করি, পাশের ঘর হইতেও কে চীৎকার করে—ভ্যাঙ্গায় কি জবাব দেয়, জানি না—মানুষের কথা শুনিতে পাই না—প্রাণ যায় যায় হইয়াছে।"

"তোমরা খাও কি?"

"আগে শাস্ত্রীরা খাবার দিত, এখন সাত আট দিন দেয় না। ঐ উচ্চে ছোট গবাক্ষটি দেখিতেছ, ঐ দিয়া কে দুইখানি করিয়া রুটী দেয়, কখন দিনে দেয়, কখন রাত্রে দেয়, তাই খাই। জল পাই না, কখন ঘাম খাই, কখন কখন প্রস্রাব খাইতে যাই, কিন্তু সে দুর্গন্ধে প্রাণ বাহির হয়।"

কাঞ্চন কহিল,—"তবে ইহাদের একটু জল আনিয়া দিই।"

চণ্ডাল বলিল,—"মা, এমন কর্ম্ম করিবেন না। আমিই ইহাদের উদ্ধার করিব।"

কয়েদী জিজ্ঞাসা করিল,—"মা! আপনি স্ত্রীলোক? আপনি কে? মনে হয়, পাটলীপুত্রে আমার পীড়ার সময় শিয়রে বসিয়া দুগ্ধ পান করাইতেন, স্বরে বোধ হয়, আপনি সেই।"

"আমিও তোমার মত বিপদ্‌গ্রস্ত।"

কয়েদী বলিয়া উঠিল,—"বুঝিয়াছি, কুণালের কথা জিজ্ঞাসা করাতেই বুঝিয়াছি, যখন আপনি আসিয়াছেন, আমাদের নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবে।"

চণ্ডাল তখন আপনি জল আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। যদি আসিতে না দেয়। বিশেষ একটুকু টের পাইলে ইহারা নিশ্চয় কাটিয়া ফেলিবে।

কয়েদীকে বলিল,—"কেমন হে, এখন তোমার গায়ে জোর আছে, আমাদের কিছু সাহায্য করিতে পারিবে?"

"জোর কি সবে সাত আট দিনে যায়? এখনও উদ্ধারের ভরসা পাইলে দশ হস্তীর বল ধরিতে পারি। এখন কি করিতে হবে বল।"

"কারাগারের সব ঘরের দরজা খুলিয়া দিতে হইবে।"

"এখনি"—বলিয়াই কয়েদী হর্ষে জয়ধ্বনি করিল। অমনি পার্শ্বস্থ তিন চারিটি ঘর হইতে শব্দ হইল—"জয়"।

শাস্ত্রীরা বলিয়া উঠিল,—"শালারা আচ্ছা গোল করে।" বলিয়া আবার লুঠের টাকা গণিতে বসিল।

২

এক জনকে উদ্ধার করিয়া তিন জন হইল। আর এক জনকে উদ্ধার করিয়া চারি জন হইল। ক্রমে পাঁচ ছয় সাত আট জন হইল। তখন চাবির থোলো ছিঁড়িয়া সকলের হাতে দেওয়া হইল, যে যে ঘর পাও, খুলিয়া দাও। ক্রমে সেই গাঢ় অন্ধকার গৃহ-সমূহ হইতে ১৫০ জন বৌদ্ধবীর বহির্গত হইল। তখন সমবেত কয়েদীগণ, কাঞ্চনমালা দেবী তাহাদের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন জানিয়া, আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

শাস্ত্রীরা এখনও কি করিতেছিল, এবারকার জয়ধ্বনিতে তাহাদের বড় ভয় হইল। তাহারা বাহিরে আসিল, আসিয়া দেখিল, সমস্ত কয়েদীরা ঘর খুলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে দ্বারের দিকে আসিতেছে। তখন তাহারা প্রমাদ গণিয়া যাহা সম্মুখে পাইল, লইয়া পলায়ন করিল। কতক ভাগ হইয়াছিল, কতক হয় নাই, কতক লইতে পারিল, কতক পড়িয়া রহিল, শাস্ত্রীয়া পলায়ন করিল। তখন কাঞ্চন কয়েদীদিগকে আহার ও জল দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। সকলে শাস্ত্রীদিগের ভাণ্ডার হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিল। কাঞ্চন পাক করিয়া স্বহস্তে সমস্ত লোকদিগকে খাওয়াইলেন।

আহারান্তে তাহারা বিশ্রাম করিলে কাঞ্চন তাহাদের নিকট হইতে কুণালের সংবাদ সংগ্রহ করিতে গেলেন। কেহই সংবাদ বলিতে পারিল না।

কুণালকে কুঞ্জরকর্ণ রাণীর গুপ্ত আদেশ জানাইবার জন্য লইয়া গেল, তাহার পর আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুণালের সংবাদ না পাওয়া গেলে সৈন্যেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন নানা

কৌশলে অসন্তুষ্ট সেনাপতিদিগকে কারারুদ্ধ করিল। কাহাকেও বলিল মহারাণীর আদেশ; কাহাকেও রাজসভা হইতে কারাগারে পাঠাইল; কাহাকেও যুদ্ধে জয় করিয়া কারারুদ্ধ করিল। এইরূপে কতক মারিয়া ফেলিয়াছে। অবশিষ্ট এই কারাগারে ছিল, কাঞ্চন দেবী উদ্ধার করিলেন।

কাঞ্চন স্বামীর কোন সন্ধান পাইলেন না। তিনি তখন কয়েদীদিগের মধ্য হইতে এক জন উপযুক্ত লোকের হাতে উহাদিগের ভার দিলেন। বলিলেন,—"আমি এইখানেই স্বামীর অন্বেষণের জন্য রহিলাম। তোমরা যেরূপে পার আত্মরক্ষা কর।"

তখন চণ্ডালের আদেশমত সকলে এক পরামর্শ করিল; তাহারা বলিল,—"এখানে বসিয়া আত্মরক্ষা অসম্ভব; আইস, আমরা আত্মরক্ষা না করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করি।"

কারাগার রাজবাটীর অতি সন্নিকট। তাহারা সকলে একত্রে এক রাত্রের মধ্যে কারাগার হইতে রাজবাটী পর্য্যন্ত একটি প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ কাটিল। পরদিন প্রাতঃকালে ৫০ জন সুড়ঙ্গপথে রাজবাড়ীর উঠানে গিয়া উঠিল এবং আর ৫০ জন রাজবাড়ীর দ্বারদেশ আক্রমণ করিল। রক্ষী অধিক ছিল না, ত্বরায় রাজবাটী দখল হইয়া গেল। তখন কারাগার ত্যাগ করিয়া উহারা রাজবাটীতে বাস করিল। রাজবাটীর ভাণ্ডার উহাদের হস্তগত হইল। উহারা অশোকের নামে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা চিরদিন গোলযোগে বড় বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা উহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

অশোকের সৈন্যের মধ্যে যাহারা আশেপাশে লুঠিয়া খাইতেছিল, তাহারা যোগ দিল। উহাদের অনেক লোক সহায় হইল। অল্পদিনের মধ্যে সংবাদ আসিল, অশোক কুঞ্জরকর্ণকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। সে কোথায় পলায়ন করিয়াছে, তাহার অন্বেষণে অশোক রাজা এক দল সৈন্য পাঠাইয়াছেন। বিদ্রোহীরা সেনাপতিশূন্য হইয়া পলাইয়া তক্ষশিলায় আসিতেছিল, দেখিল, রাজবাটীতে ও দুর্গে অশোকের পতাকা দুলিতেছে। তাহারা নিরুপায় হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। বিদ্রোহ নিবৃত্ত হইল।

বৌদ্ধ যে যেখানে ছিল, আসিয়া একত্রিত হইল। কেবল দুই জনের সন্ধান পাওয়া গেল না। কুণাল কোথায়, কেহ বলিতে পারিল না। আর যে প্রত্যহ কারাগারে রুটী ফেলিয়া যাইত, তাহারও সন্ধান পাওয়া গেল না। কাঞ্চন হাসিতে হাসিতে এক দিন বলিলেন যে, এ বৌদ্ধ চণ্ডালের কর্ম্ম।

সে বার বার বলিল,—"এরূপ কাজ করা আমার স্বপ্নের অগোচর।"

সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইল। অশোক সসৈন্যে শীঘ্র তক্ষশিলা আসিবেন শুনা গেল। কিন্তু কাঞ্চনের মনের শান্তি হইল না। স্বামীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। তিনি নানা উপায়ে, যে সকল গোপন স্থানে বন্দিভাবে থাকিবার সম্ভাবনা, তাহার এক তালিকা লইলেন এবং চণ্ডালকে সঙ্গে করিয়া নিজে সমস্ত স্থানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই এক জন প্রধান বৌদ্ধকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু কোথাও স্বামীর সন্ধান পাইলেন না।

এক দিন সন্ধ্যার সময়ে চণ্ডালের সহিত এক খণ্ড নিবিড় বনভূমির মধ্য দিয়া আসিতেছেন, চণ্ডালের সঙ্গে অনেক কথা কহিতেছেন, তাহাকে অনেক ইতিহাস, অনেক ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কাঞ্চন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাণ দুটি খাড়া করিয়া যেন একমনে কি শুনিতে লাগিলেন।

চণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ও?"

কাঞ্চন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, —"থাম।"

সে আশ্চর্য্য হইয়া কাঞ্চনের মুখ পানে চাহিয়া অনেকক্ষণ রহিল।

আধ ঘণ্টার পর কাঞ্চন বলিলেন,—"কুণাল এইখানে আছেন।"

চণ্ডাল বলিল,—"কেমন করিয়া জানিলে?"

কাঞ্চন কহিলেন,—"শুনিতেছ না সেই স্বর—ও যে আমি বেশ চিনি।"

"কৈ স্বর?"

"শুনিতেছ না? আমার কর্ণ ভরিয়া যাইতেছে, ও স্বর আমার বেশ জানা আছে; এখনও শুনিতেছ না? আমার শরীর শিথিল হইয়া আসিতেছে, আমি আর দাঁড়াইব না।"

"আইস" বলিয়া কাঞ্চনমালা স্বর লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতি ধাবমান হইলেন। লতারাজি ছিন্নভিন্ন করিয়া, কণ্টকরাশির মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সিংহ-ব্যাঘ্রাদি জন্তুর ভয় তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া, কাঞ্চন বায়ুবেগে ধাবমান হইয়া এক কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং "এই আসিয়াছি, নাথ!" বলিয়া লাফ দিয়া সেই কূপে পড়িলেন।

চণ্ডালও আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কূপের নিকটে গিয়া শুনিল, "ধর্ম্মং

শরণং গচ্ছামি," "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি," "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি," শব্দ বাহির হইতেছে।

সে দেখিল, কুণাল সর্ব্বধর্ম্ম-মমতাবিপশ্চিৎ নামক সমাধিবলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছেন। কাঞ্চনও কূপতলে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া মূর্চ্ছিতবৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন।

৩

তখন চণ্ডাল উভয়কে স্কন্ধে করিয়া কূপ হইতে উত্তোলন করিল। উভয়েই বাহ্যজ্ঞানশূন্য। অনেকক্ষণ পরে কাঞ্চনের চৈতন্য হইল। কুণালের চৈতন্য হইল না। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই অবস্থায় রহিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কেবল ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম বাহির হইতে লাগিল; প্রভাতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান জন্মিল। তিনি কাঞ্চনের স্পর্শ অনুভব করিলেন।

কুণাল বলিলেন,—"কাঞ্চন! তুমি এত দূর কেমন ক'রে আসিলে?"

কাঞ্চন উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি চাহিয়া দেখেন, কুণালের চক্ষুর বিবরে চক্ষু নাই। তিনি বলিলেন,—"এ কি?"

"কাঞ্চন, চক্ষু না থাকায়ই আমি সমাধি করিতে পারিয়াছি। নইলে পারিতাম না।"

চণ্ডাল কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"নগরে গেলে হইত না?" তাহাতে কুণাল বলিলেন,—"আর নগরে কাজ কি? আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব। তাহাতে সমাধির বিঘ্ন হইবে না।"

তখন চণ্ডাল চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, লতাপাতায় কূপ ও তাহার চারিদিকে অতি সুন্দর স্থান হইয়াছে, কে যেন একখানি চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া সে আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। চণ্ডাল তখন নগরমধ্যে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য প্রস্থান করিল, কুণাল ও কাঞ্চন নানা কথায় সময় কাটাইতে লাগিলেন।

ক্রমে দুইটি একটি করিয়া লোক সংগ্রহ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত বৌদ্ধগণ আসিয়া জুটিল। অশোক রাজা রাত্রিতে তক্ষশিলায় আসিয়া পুত্রবধূর গুণে দেশে শান্তির আবির্ভাব দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আজি পুত্রের সমাধি সফল হইয়াছে শুনিয়া সমস্ত লোকজন সঙ্গে বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। কুণাল তখন উপদেশ দিতে লাগিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের অবদানসমূহের কথা বলিয়া সমবেত লোকসঙ্ঘকে মোহিনীমুগ্ধবৎ করিতে লাগিলেন।

রাজা অশোক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে এই সুধাময় কথা শুনিতেছিলেন। পরে আর আনন্দ রাখিতে স্থান না পাইয়া বক্তৃতার সময়েই পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কুণাল সাষ্টাঙ্গে পিতাকে নমস্কার করিলেন। বহুকালের পর মিলনে উভয়েই কাঁদিতে লাগিলেন। তখন অশোক টের পাইলেন যে, কুণালের চক্ষু নাই!

অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুণাল, তোমার এ দশা কে করিল?"

কুণাল কোন কথা বলিলেন না; কেবল বলিলেন,—"চক্ষু থাকিলে সমাধি হইত না।"

বনমধ্যে সকলে এইভাবে আছেন, এমন সময় কুঞ্জরকর্ণকে ধরিয়া কতকগুলি সৈন্য সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা অশোক রাজা এইখানে আছেন, শুনিয়া উঁহাকে লইয়া অশোক রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। হস্তপদে শৃঙ্খলবদ্ধ, চারিজন সৈনিক উঁহাকে লইয়া অশোকের নিকট উপস্থিত করিল।

তিষ্যরক্ষা যে চক্ষু মর্দ্দন করিয়াছিল, তদবধি রাজার মনটা অত্যন্ত সন্দেহাকুল ছিল। কাহার চক্ষু কে পাঠাইল ইত্যাদি। আজি তাঁহার চক্ষু ফুটিল, তিনি কুঞ্জরকর্ণকে রোষভরে বলিলেন,— "নরাধম! তুই আমার পুত্রের চক্ষু উপড়াইয়াছিস্?"

তখন কুঞ্জরকর্ণ মিষ্ট মিষ্ট করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিল—"সেনাপতি অশোক! আমি তোমার হাতে আর দয়া প্রার্থনা করি না। তুমি যত দিন স্বধর্ম্মে ছিলে, আমি তোমার ভৃত্য ছিলাম। তুমি ধর্ম্মত্যাগ করিলে আমি তোমার শত্রু হইয়াছি। বিধিমতে তোমার শত্রুতা করিয়াছি। কখন বৌদ্ধদের সঙ্গে একটি সত্য কথা বলি নাই। আজি আমার শেষ দিন, আজি তোমার সঙ্গে সত্য কথা বলিব। ধর্ম্মের ভয়ে বলিব, তাহা নহে; বিধর্ম্মীর কাছে মিথ্যা বলিব, তাহাতে আবার অধর্ম্ম কি? আমি সত্য বলিব, কারণ, তাহাতে তোমার কষ্ট হইবে। যাহাকে তুমি এত ভালবাস, যাহাকে তুমি রাজ্যেশ্বরী করিয়াছ, সে ভ্রষ্টা, সেই তোমার পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করাইয়াছে, সে বৌদ্ধ নহে, সে হিন্দু। তোমার দীক্ষার সময়ে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে সেই আমায় বিদ্রোহী হইতে বলে, আমি কুণালের সঙ্গে যুদ্ধে বন্দী হইলে সেই বন্দিত্ব মোচন করিয়া আমায় রাজত্ব প্রদান করে। এখনও সে রাজ্যেশ্বরী; এখনও তোমার

উপর হুকুম জানাইতে পারি যে, তুমি আমার শৃঙ্খল মোচন করিয়া তক্ষশিলায় রাজা করিবে, কিন্তু তাহার আর জ্ঞান নাই। সে এখন পাগল হইয়াছে, তাই পাই নাই। আমার লোক ফিরিয়া আসিয়াছে, নহিলে তুমি আমায় ধরিতেও পারিতে না। আমি এইখান হইতে গিয়া তোমার পাটলীপুত্রে যাওয়া বন্ধ করিতাম।" এই সকল কথা শুনিয়া রাজা অবাক্ হইয়া রহিলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

কুঞ্জরকর্ণ তখন বলিল,—"আমার প্রতি কি শাস্তি দিবে?"

"যত দিন তিষ্যরক্ষার অধিকার না যায়, তত দিন তোমায় ঐ ভাবে থাকিতে হইবে।"

"তবেই তুমি রাখিয়াছ। অদ্য তৃতীয় প্রহরে এ দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে।"

বলিয়া সে রক্ষীদিগকে বলিল,—"চল"! তাহারাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাকে লইয়া গিয়া এক গাছ-তলায় দাঁড় করাইল। তথায় ইষ্টদেবের নাম করিতে করিতে কুঞ্জরকর্ণ দেহত্যাগ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

১

সেই বন হইতেই অশোক রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অদ্য হইতে আমি নিজ রাজ্যভার গ্রহণ করিলাম। পরে তিনি কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে করিয়া তক্ষশিলায় আসিলেন। কুণাল আর সংসারে প্রবেশ করিতে রাজী নহেন। রাজা বলিলেন, "ভগবন্, বোধিসত্ব, আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন ও সুভদ্রাঙ্গীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করুন।" কুণাল সম্মত হইলেন। তখন তক্ষশিলা শাসন ও রক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা কতিপয়মাত্র বিশ্বস্ত সৈন্য ও কুণাল এবং কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া পাটলীপুত্রে প্রস্থান করিলেন।

২

পাটলী-পুত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমেই তিষ্যরক্ষাকে বিচারালয়ে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বেই তিষ্যরক্ষা তথায় উপস্থিত হইল। আর সে বেশের পারিপাট্য নাই, মাথায় এককালে চুল হইয়াছে, ছিন্নবস্ত্র মাত্র পরিধান। আসিয়াই রাজাকে বলিল,—"তুমি আমার আসনে বসিও না।"

রাজা বলিলেন, "দূর হ পাপিষ্ঠা!" তখন সে ঘুসা উঠাইয়া রাজাকে মারিতে গেল। রাজা প্রহরীদিগকে ধরিতে বলিলেন। তাহারা সাহস করিয়া ধরিতে পারিল না। তখন কাঞ্চন উঠিয়া তাহাকে ধরিলেন। সে কাঞ্চনের মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিল, "মা! নমস্কার, তুমি আমার সংসার কেন ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? আমি তোমায় কত খুঁজিয়াছি। কোথায় গিয়াছিলে?" বলিয়া কাঞ্চনের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

আবার সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া বলিল,—"আমি ভ্রষ্টা না হইলে তুমিই বা রাজা হইতে কিরূপে? আর আমিই বা তোমায় ঠকাইয়া রাজ্যেশ্বরী হইতাম কি করিয়া? আমি কুঞ্জরকর্ণকে বলিয়াছিলাম, তুই বিদ্রোহী হ, আমি তোকে টাকা দিব। পারি ত এই কাছাখোলা বেটাদের তাড়াইয়া ব্রাহ্মণদের ধর্ম্ম বজায় করিব।"

রাজা বলিলেন,—"আর শুনিতে চাহি না। পাপীয়সি! ভণ্ডতপস্বি! তুই ক্রমাগত আমায় ঠকাইয়াছিস্, তুই না আগে-ভাগে বৌদ্ধ হইয়াছিলি? তাহার পর তুই আমার প্রিয় পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিস্! তোর মতলব কি, জানি না। কিন্তু তোর মতলব বদ ভিন্ন ভাল হইতে পারে না, তোরে কুকুর দিয়া খাওয়াইব, দূর হ আমার সম্মুখ থেকে!"

"আহা মরি মরি, কি গানই গাইছ! আবার গাও, আমি রাজসিংহাসন তোমায় দিয়া যাইব।"

কুণালের কাছে গেল। কুণালের চিবুক ধরিয়া তুলিল—"কৈ বাছা, তোমার সে মণি দুটি কৈ?

কে নিল নয়ন-মণি
কহ কহ লো সজনি!

বড় যে আমায় দেখ্‌লেই চোখ লুকুতে? খুব হয়েছে। এমনি ক'রে—এমনি ক'রে—এমনি ক'রে—এমনি ক'রে—পায়ে পিষে ফেলেছি। কেমন, এখন একবার চাও ত সোণার চাঁদ!" বলিয়া আবার কুণালের চক্ষে আঙুল পুরিয়া দিতে গেল। সকলে যেমন ধরিতে আসিল, অমনি কুণালের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

রাজা উহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"নাপিতানি! কুঞ্জরকর্ণকে কি হুকুম দিয়েছিলে?"

"নাপিতানি? আমি রাজরাজেশ্বরী। আমি

তো রাজ্যশুদ্ধ সব কলু করিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমায় বলেন নাপিতানি!"

"না, তুমি সাবিত্রী অতি ধন্যা।"

"আমি সাবিত্রী নহি, আমি ভ্রষ্টা।"

কাঞ্চনমালা রাজাকে বলিলেন,—"পিতঃ! ইনি এখন উন্মাদ—পাগল। আপনি ইঁহাকে কেন তিরস্কার করিতেছেন? ইঁহাকে শাস্তি দিলে কিছুই ফল হইবে না। আমার এক ভিক্ষা আছে, আপনি উঁহাকে আমার হাতে দিউন। আমি উঁহার উন্মাদ উপশম করিব ও ধর্ম্মপথে উঁহার মতি লওয়াইব।"

রাজা বলিলেন, "তুমি পারিবে না।"

কাঞ্চন বলিলেন,—"সে ভার আমার, আমি উঁহার উদ্ধারের পথ করিব। না পারি, আপনি রাজা আছেন।"

রাজা বলিলেন,—"সেই ভাল, উন্মাদ উপশম হইলে আমি উঁহার প্রাণদণ্ড করিব।"

"না মহারাজ, এ যাত্রা উঁহাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

"এরূপ পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করিলে, শাস্তি কাহাকে দিব?"

তিষ্যরক্ষা নৃত্য করিতে করিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"নিজে গলায় দড়ি দিয়া মর।"

কাঞ্চন বলিল,—"সে যাহা হউক. মহারাজ, আমার স্বামীর চক্ষু ইনি উৎপাটন করিয়াছেন, আমার স্বামী বোধিসত্ত্ব, তিনি নালিশ করেন নাই। আমারই আবার অনুরোধ, আপনি উঁহাকে ক্ষমা করুন। ধর্ম্ম থাকেন, আমার স্বামী আবার চক্ষু পাইবেন।"

রাজা বলিলেন,—"তবে তুমি নিতান্ত ছাড়িবে না, তবে লও, ও তোমার দাসী হইয়া থাকুক।"

রাজা এই কথা বলিলে কাঞ্চন তিষ্যরক্ষার হাত ধরিলেন, সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

৩

তিষ্যরক্ষা চলিয়া গেলে, রাজা উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া সংবাদ দিল, বাসুকিশীল হইতে বিজ্ঞানবিৎ আসিয়াছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন। সে আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কেন আসিয়াছ?"

"আপনি বলিয়াছিলেন, অশোক রাজা হইলে আসিও, অনেক টাকা পাইবে। আমি সেই জন্য আসিয়াছি। আপনি আমায় এক লক্ষ টাকা দিন।"

"এত টাকা তুমি কি করিবে?"

"কিছু লইয়া মরা মানুষ ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করিব। আর কিছুতে স্ত্রীর গহনা গড়াইব।"

"আচ্ছা, আমি তোমায় এক লক্ষ টাকা দিব, আর তুমি যে আমায় আহাম্মক বলিয়া চৈতন্য দিয়াছিলে, তাহার জন্য তোমায় আমি আর এক লক্ষ টাকা দিব! আর তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে অন্ধত্ব বিমোচন করিবার জন্য পরীক্ষা করিতেছিলে, তাহা সফল হইয়াছে?"

"আমি একের চক্ষু অন্যের চক্ষে লাগাইয়া দিতে পারি। এখনও চক্ষু তৈয়ার করিতে পারি না।"

"আচ্ছা, আর কাহারও চক্ষু লইয়া ঐ অন্ধের চক্ষুতে বসাইয়া দেও দেখি।"

কেহই আপন চক্ষু দিতে সম্মত হইল না। শেষ বৌদ্ধচণ্ডাল আপন গুরুর জন্য আপন চক্ষু উপড়াইয়া দিল। কুণাল বারণ করিলেন, সে শুনিল না। বিজ্ঞানবিৎও সেই চক্ষু কুণালের চক্ষুকোটরে বসাইয়া দিলেন। কুণালের যেমন চক্ষু ছিল, আবার তেমনি চক্ষু হইল।

তিষ্যরক্ষা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"এই যে বাছার চক্ষু হইয়াছে"—বলিয়াই বেগে প্রস্থান করিল,—সকলে দেখিল, তিষ্যরক্ষা শাক্য ভিক্ষুণী হইয়াছে।

কুণাল চক্ষু পাইয়াই চণ্ডালকে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যে চক্ষুদান করিলে, তোমার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই তো?"

তখন চণ্ডাল আনুপূর্ব্বিক আপন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। রাজা শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শেষ সে বলিল,—"যিনি আমার জ্ঞানচক্ষু দিয়াছেন, তাঁহার জন্য চর্ম্মচক্ষু ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইলে, আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ আর নাই।"

এই সত্য কথা কহায় চণ্ডালের যেরূপ চক্ষু ছিল, আবার সেইরূপ হইল।

স্বামীর চক্ষু হইয়াছে শুনিয়া কাঞ্চন দেখিতে আসিলেন। রাজা বলিলেন,—"কাঞ্চন! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।"

কাঞ্চন লজ্জানম্রমুখে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৪

তখন রাজা কুণালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুণাল! তুমি বোধিসত্ত্ব; তোমার উপকার আমার

দ্বারা সম্ভবে না। তথাপি যদি তোমার কোন অভীষ্ট আমার দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে, বল, আমি এখনই করিব।"

কুণাল বলিলেন,—"মহারাজ, আপনি তাড়াইয়া দিলেও পুনরায় যে কার্য্যের জন্য এ রাজসংসারে আসা, সেই কার্য্যটি করিয়া দেন।"

রাজা বলিলেন,—"বল, আমি এখনই করিব।"

কুণাল বলিলেন,—"তবে ঘোষণা করিয়া দিন যে, বিশাল মগধ সাম্রাজ্যে অদ্যাবধি বৌদ্ধ ধর্ম্মই প্রচলিত হইবে, এবং সাম্রাজ্যের বাহিরেও যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তক্ষশিলায় সদ্ধর্ম্ম প্রচার হয় নাই। আর আমায় তক্ষশিলার ধর্ম্মাধ্যক্ষ করিয়া দেন।"

রাজা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম মগধ সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইবে।

রাজা আপন পুত্রদিগকে, কাহাকেও সিংহলে, কাহাকেও পারস্যে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

কুণালকে বলিলেন,—"তোমায় পঞ্চনদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও শাসনকর্ত্তা হইতে হইবে।"

কুণাল বলিলেন,—"শাসনকর্তৃত্ব আর কাহাকেও দেন।"

রাজা বলিলেন,—"তবে কাঞ্চনের উপর সে ভার থাকুক, কাঞ্চন এবার তক্ষশিলা জয় করিয়াছে।"

কুণাল বলিলেন,—"কাঞ্চনও সাংসারিক কার্য্য ভালবাসে না।" বলিয়া তিনি চণ্ডালের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

চণ্ডাল বলিল,—"প্রভু! আমি নীচ জাতি, আমি গুরুর পদসেবা করিব, শাসনকার্য্য আমার জন্য নহে দয়াময়!"

রাজা তখন শাসনকার্য্যের ভার অন্য লোকের হস্তে প্রদান করিলেন।

এই দিবস যে কার্য্য হইল, তাহার বলে এক হাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এসিয়া এই দিনের কার্য্যবলে বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় করে।

৬

শুনা গিয়াছে, তিষ্যরক্ষা কাঞ্চনের অনুগ্রহে আপনার ঋদ্ধিমতী নাম সার্থক করিয়াছিল।

সমাপ্ত

বাল্মীকির জয়

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই প্রণীত

প্রথম খণ্ড

১

বর্ষা শেষ হইয়াছে। শরৎ উপস্থিত। আকাশ পরিষ্কার, মেঘের লেশমাত্র নাই। নীল—সুনীল—গাঢ় নীল—বর্ণনার অতীত মনোমোহন নীলরঙের ছটার মাঝে বড় বড় তারা জ্বল-জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। তারকারাজিমধ্যে ছায়াপথ সমস্ত আকাশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শেষে নিজেও ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর কাদা শুকাইয়া আসিয়াছে, গাছপালা সতেজে বাড়িয়া উঠিতেছে, আর সবুজ-রঙের ছটায় পৃথিবীর নবযৌবন প্রকাশ করিয়া দিতেছে। উপরে সব গাঢ় নীল, নীচে গাঢ় সবুজ; যেখানে এই দুইয়ে মিশিয়াছে, সেখানে বোধ হইতেছে যেন এক ফ্রেমে দুই প্রকাণ্ড চিত্র আঁটিয়া দর্শকের জন্য মাঝখানে একটু স্থান রাখিয়া দিয়াছে।

যখন আকাশ নির্মেঘ, যখন ধুন্ধুলার * সম্পর্কমাত্র নাই, সেই সময়ে—সেই সুখের শরৎসময়ে—কেহ হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ কি? এক দিকে সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, এ দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পরে—কত পরে বরফের পাহাড় দেখিয়াছ কি? সেই শ্বেত স্বচ্ছ বরফের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্-ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, বোধ হইতেছে, যেন রাজপুত্রের আগমনে বিশাল নগরী-সমূহ নানা দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি? পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কেবল দেখিবে চূড়ার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া, তাহার পর আবার চূড়া; শেষ নাই, বিরাম নাই, অনন্ত বলিলেও হয়। বর্ষা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, চারি দিকে ঝরণা হইতে ঝম্-ঝম্ রবে দুধের ফেনার মত শাদা জল বেগে পড়িতেছে, কোথাও তাহার উপর সূর্য্যের আলোকে রামধনু দেখা যাইতেছে, কোথাও কোন নির্ঝরিণী চির-অন্ধকারমধ্য দিয়া চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কেহ দেখিতেছে না, অথচ গতিরও বিরাম নাই। যেখানে ঝরণা, সেইখানেই গাছপালা বন, আর যেখানে নাই, সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর, কাছে গেলে বোধ হয়, এখনই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। এখানে এই ভয়ানক উচ্চতা, আবার পরক্ষণেই গভীর খড; তাহার তলা কোথায়?—দেখা যায় না, যদি দেখা যায়, দেখিবে, একটি ক্ষুদ্র নদী চলিয়া যাইতেছে, উপলে উপলে জল লাফাইতেছে নাচিতেছে, আর চলিতেছে। স্থানে স্থানে নীরস কঠিন তরুবর সহস্র বৎসরেরও অধিককাল কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে, আর সেঁউতিলতা তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া জড়াইয়া পাঁচশতবৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে।

* পশ্চিমাঞ্চলে যে ধূম ও ধূলায় গ্রীষ্মকালে আকাশ আচ্ছন্নপ্রায় থাকে, তাহার নাম ধুন্ধুলা।

এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ, ইহা অনন্তকাল এইরূপ, অনন্তকাল ধরিয়া বরফের পাহাড় এইরূপই আছে, ঝরণা এইরূপই বহিতেছে, আকাশও এইরূপ গাঢ় নীল—সবই এইরূপ। শরতেও হিমালয়ের এমনই গভীর অথচ মনোহর, ভয়ঙ্কর অথচ উন্মাদক সৌন্দর্য্য। কিন্তু আমরা যে শরৎকালের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই শরৎকালের আমাবস্যারাত্রে হিমালয়ের এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হইয়াছিল। সে শরৎ সত্য ও ত্রেতাযুগের সন্ধিসময়ে।

মানুষ মরিয়া কি হয়? কে বলিবে? কেহ বলে ভূত হয়; যাহাদের পিতা-মাতা মরে, তাহারা বলে, তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন। কিন্তু বেদমতে তাঁহারা স্বর্গে যান না। যে সকল লোক পৃথিবীতে সৎকার্য্য করিয়া যান, তাঁহারা ঋভু* হন। ইঁহারা কোথায় থাকেন? কি করেন? কে বলিতে পারে? ইঁহারা ছায়াপথেরও ওপারে কোন সুখময় ভবনে বাস করেন। উক্ত শরৎ অমাবস্যারাত্রে সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তাহার মধ্য হইতে অগণিতসংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিল। ঋভুগণ মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর; কিন্তু যখন তীব্রজ্যোতির্ম্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া—আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল, ধূমকেতু উঠিয়াছে; কেহ বলিল, নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে। ঋভুগণ আজি জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছেন; তাঁহারা যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা আসিয়া হিমলয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন টিব্যায় টিব্যায়†, চূড়ায় চূড়ায়, শিখরে শিখরে, ঋভুগণ দাঁড়াইয়া মহা আনন্দভরে গান ধরিলেন। মানবের সাধ্য কি সে গান বুঝে! কিন্তু সে শ্রুতিমনোহর স্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল। জগৎ নিস্তব্ধ, আকাশ নিস্তব্ধ, নক্ষত্র অচল, দ্বিফাল ছায়াপথ নিশ্চল, নিস্পন্দ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত—স্তিমিত—মহামোহনিদ্রায় অভিভূতবৎ হইল। ঋভুগণ একতানস্বরে গান ধরিলেন। গীতধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর পরিপূরিত করিয়া উন্মুক্ত ছায়াপথ-দ্বারপথে অনন্তে নিলীন হইল।

মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ, আকাশস্থ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ, অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন। উহা সকলেরই কর্ণে সুধাধারাবৎ বোধ হইতে লাগিল। যেমন বড় সুখের সময়ে সুখসন্তানবৎ—স্বপ্নবৎ—অর্দ্ধচেতন, অর্দ্ধ-অচেতনবৎ—মোহময়, সুখময়, শান্তিময়, অমৃতময়, দূরস্থ-মধুরসঙ্গীতধ্বনিবৎ, কাণে কি জানি কি নিলীন হয়, সেইরূপ সে গীতধ্বনি সকলের কর্ণে লাগিল। কেহই বুঝিল না, কেন তাহাদের প্রাণ প্রফুল্ল হইল, অথচ সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিল। কেবল তিন জন লোক গানের অর্থগ্রহ করিয়াছিলেন। তিন জনে গানে মত্ত হইয়াছিলেন, তিন জনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বর লক্ষ্য করিয়া হিমালয়চূড়ায় আসিয়াছিলেন। ইঁহারা ভারতের চূড়া, যত দিন ভারত থাকিবে, যত দিন হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে, যত দিন জগতে মাহাত্ম্যের মান থাকিবে, তত দিন ইঁহাদের নাম লোপ হইবে না।

৩

প্রথম মহর্ষি বশিষ্ঠ ষষ্টিসহস্রশিষ্যপরিবৃত হইয়া আপন আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহাদিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি উপদেশ দিতেছিলেন। কাহাকে বাক্য, বাচ্য, ব্যঙ্গ, কাহাকে প্রমাণ, প্রমেয়, প্রয়োজন, সংশয়, নির্ণয়, ছল, জাতি, হেত্বাভাস প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ব, কাহাকে পঞ্চতন্মাত্রের সহিত লিঙ্গশরীরের ভেদাভেদ, কাহাকে বিবর্ত্তবাদ, কাহাকে পরিণামবাদ বুঝাইয়া দিতেছেন; কাহাকে গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয়, অগ্নিষ্টোম, গোষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন; শিষ্য বিবেচনায় কাহাকেও বা দশকর্ম্মও শিক্ষা দিতেছেন; এমন সময়ে সহসা তাঁহার শিষ্যসমূহ অন্যমনা, স্থির, নিস্পন্দ, শেষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাক্শক্তিবিহীন হইল। গীতধ্বনি বশিষ্ঠেরও কাণে গেল, তিনি যোগবলে জানিলেন, ঋভুগণ আসিয়াছেন; অমনি যোগবলে হিমালয়ের শিখর লক্ষ্য করিয়া আকাশপথে গমন করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া ঋভুদিগকে নমস্কার করিয়া একতানমনে গান শুনিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র। ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, সমস্ত দিন সৈন্যচালনা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে

* যে মানুষ সৎকর্ম্ম করিয়া মরণের পর দেবতা হন বেদে তাঁহাকে ঋভু কহে।

† পাহাড়ের উচ্চ অংশকে পাহাড়িয়া টিব্যা বলে।

হিমালয়ের পাদদেশে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ পথশ্রান্তিনিবন্ধন যে যেখানে পাইল, সে সেইখানেই তাম্বু গাড়িতে আরম্ভ করিল। বিশ্বামিত্র কয়েক জন মন্ত্রী লইয়া কালিকার সৈন্যচালনার পরামর্শ করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীতটে আসিয়া বসিলেন। এমন সময়ে আকাশ আলোকময় হইয়া উঠিল, আর সেই সুমধুর গীতধ্বনি সকলের কাণে গেল। সৈন্যগণ যে যে ভাবে ছিল, সে সেই ভাবেই নিশ্চল, নিস্পন্দ, মুগ্ধ ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। যে তাম্বু গাড়িয়াছে, তাহার বিছানা করা হইল না, যে গাড়িতেছে, তাহার অর্দ্ধেকেই শেষ হইল, আর যে গাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহার ঐ পর্য্যন্ত। বিশ্বামিত্র গীতধ্বনি বুঝিলেন, অমনি ত্রিবিক্রমের ন্যায় ত্রিপাদবিক্ষেপে এক টিব্যায় উঠিলেন; কিন্তু তাঁহার আগমনে যে ঋভুদেব কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলেন, তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।

তৃতীয় বাল্মীকি। ইনি নিজ দস্যুদল সমভিব্যাহারে গিরিরাজের প্রাসাদে ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন। নিজে প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া দুই পাঁচ জনকেও তথায় আনিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতেছেন, চারি দিকে হৈ হৈ রৈঃ রৈঃ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, রাজরক্ষিগণ কে কোথায় যাইবে, স্থির করিতে পারিতেছে না। কোথাও ডাকাত রক্ষী কাটিতেছে, কোথাও রক্ষী ডাকাত কাটিতেছে, কোথাও ডাকাতে ডাকাত কাটিতেছে, কোথাও রক্ষী রক্ষী কাটিতেছে। বাল্মীকি ক্রমাগত অসি আস্ফালন করিতেছেন, আর সঙ্কেতমত শিঙ্গা বাজাইতেছেন। এমন সময়ে আলোক ও গীতধ্বনি হইল। অমনি যে যে ভাবে ছিল, চিত্রপুত্তলিবৎ নিস্পন্দ হইয়া গেল। বাল্মীকি গান শুনিলেন ও বুঝিলেন। অমনি অস্ত্রত্যাগ করিয়া লাফ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং নিকটবর্ত্তী টিব্যায় আরোহণ করিলেন।

৪

গানে মুগ্ধ কে নয়? যখন সামান্য মনুষ্যগায়ক তান ছাড়িয়া গায়, তখন কে না মুগ্ধ হয়? তাহা অপেক্ষা যখন অন্তরের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া গিয়া গান বাহির হয়, তখন আরও মধুর হয়, যে গীত বুঝে, সে আরও মুগ্ধ, যে গীতের ভাব বুঝে, সে আরও মুগ্ধ হয়, গীতে যদি শুধু কাণ না ভরিয়া মনও ভরাইতে পারে, তাহা হইলে সে গীতে লোকে উন্মত্ত হয়। আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পূরিত হইয়া গাইতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই চতুরুদধি-তরঙ্গ-বাহুক্ষালিত চরণা চির-নীহার-ধবলোন্নত-শীর্ষা প্রাচীনা সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা, তাঁহারা শুনিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাবগ্রহ করিতেছেন। কাণ মন, প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। বাহির ইন্দ্রিয় কাণে প্রবেশ করিয়াছে। মন ও প্রাণ কাণে উঠিয়াছে। জ্ঞান, চৈতন্য হত। তাঁহারা গায়কে মুগ্ধ, গায়কের ভাবে মুগ্ধ, গানে মুগ্ধ, সুরে মুগ্ধ আর সুরের ভাবে আরও মুগ্ধ।

সুর যত জমিতেছে, কেবল যেন বলিতেছে ভাই ভাই ভাই। ঋভুরা যেন বাহুপ্রসারণ করিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খেচর, জলচর সকলকে ডাকিতেছে—এস ভাই ভাই, এস ভাই ভাই, এস ভাই ভাই ভাই। সবাই ভাই। সুর জমিতেছে, যেন আরও ডাকিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

পৃথিবী শুদ্ধ যেন বাজিয়া উঠিল ভাই ভাই। ব্রহ্মাণ্ড হইতে যেন প্রতিধ্বনি আসিল ভাই ভাই। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম যেন গভীর স্বরে বলিল, ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই!

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির হৃদয়ের তলা হইতে প্রতিধ্বনি হইল ভাই ভাই। যেন মোহিনীতে তাহাদের ইন্দ্রিয় শুদ্ধ করিয়া হৃদয়কে গলাইয়া বলিল ভাই ভাই। এক জন পণ্ডিত, এক জন দিগ্বিজয়ী, আর এক জন দস্যু, সবারই মনের বিরোধী ভাব যেন মুহূর্ত্ত জন্য তিরোহিত হইল। সবারই হৃদয় যেন একতানমনপ্রাণে বলিয়া উঠিল—ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

৫

তিন জনই উন্মত্ত, কিন্তু মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে একটি ভাবনাস্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল। তাঁহারা গানে এমনি উন্মত্ত যে, বেগবান্ চিন্তাস্রোতেও তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না, হৃদয়ের তলবাহিনী অন্তঃসলিলা ক্ষুদ্র ভাবনার ত কথাই নাই। তাঁহারা যেমন গানে তন্ময়, তেমনই আছেন। অথচ ভিতরে ভিতরে হৃদয় গলিয়া ক্রমে ক্রমে আর একরূপ হইতেছে।

বশিষ্ঠের মনে আত্মপ্রসাদ—আমি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ে

বিবাদ মিটাইয়া তুলিয়াছি। আমি সব ভাই ভাই করিবার যোগাড় করিয়াছি।

বিশ্বামিত্রের মনে আত্মগরিমা—আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এক করিয়া আনিয়াছি, আমার শাসনে সব ভাই ভাই হইয়া যাইবে।

আর বাল্মীকির অন্তরের অন্তরে ভাবনা কি? বিষম আত্মগ্লানি। হায়! আমি কি করিতেছি, আমি কেবল আমার ভাইয়েদের সর্ব্বনাশ করিতেছি!!!

হৃদয়ে এই যে ভাবনা চলিতেছে, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই।

৬

কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল, রাশিচক্র অল্পপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল, আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে; দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন যেমন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেই প্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্বসংসার আবার যেমন ছিল, তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা-বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল; কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি এতক্ষণ একদৃষ্টে ছায়াপথের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়াছিলেন; ঋভুরা চলিয়া গেলে হতাশ হইয়া পড়িলেন; তখনও সে সুর কাণে বাজিতেছে, যেন বলিতেছে, ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

ক্রমে ক্রমে ক্রমে যে চিন্তা তাঁহারা এতক্ষণ টেরও পান নাই, তাহা উদ্দামরূপে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন বাল্যের, যৌবনের, প্রাচীন, নবীন, স্বার্থপর, অস্বার্থপর নানাবিধ প্রবল বিরোধিভাবমালা যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হইয়া এই নবাগত অতীন্দ্রিয় আধিদৈবিক ভাবের সঙ্গে মিলিয়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটাইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ এমন ক্ষমতা রহিল না যে, উঠিয়া কোথাও যান। অথচ কাণে বাজিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

৭

বশিষ্ঠের একবার মনে হইতেছে, বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়দিগকে কি ফাঁকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এমনি কি অন্য জাতি মিলাইতে পারিব না? আবার কাণে বাজিতেছে—সেই সুর—সেই ভাই ভাই। আবার ভাবিতেছেন, সর্ব্বশাস্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি। তেজ কি? শাস্ত্রে ত বলে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ", তার আবার মান অবমান কি? পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি। তারও এই মানে। যোগশাস্ত্র, তারও ঐ মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব, পারিব না কি? তেজঃ, সত্য, ধর্ম্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারি না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন? আহা, কি গান! কি ভাব! পারিব কি? আর কি দেখিতে পাইব? এবার দেখিতে পাইলে আমরাও সেই ভাই ভাই করিয়া জবাব দিব। সম্বল বুদ্ধি আর শাস্ত্র। পারিব বৈ কি! কাণে বাজিল ভাই ভাই ভাই।

বিশ্বামিত্র ভাবিতেছেন, এঁরাই ঋভু! কি গান! কি মূর্ত্তি! আমার কি সৌভাগ্য! হবে না কেন? আমায়ও এক দিন ঐরূপ মাতিতে হইবে। পারিব বোধ হয়। একবার ঋভুদের সঙ্গে জবাব করিব। অহং বিশ্বামিত্রঃ। ভুবন জয় ত করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত করি। তার পর মিলাইব। কাণে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন, পৃথিবীতে এক দিন এইরূপ গাওয়াইতে পারি, তবে আমি বিশ্বামিত্র—কিন্তু পারিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?

বাল্মীকি ভাবিতেছেন, কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই? এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল। আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না। হায়, কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম? কোথায় সব ভাই ভাই হব, না আমায় দেখে সবাই পলায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি

হইয়াছিল? আবার যেন বাজিল ভাই ভাই ভাই। বাল্মীকির নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল। ভাবিলেন, কি পাপই করিয়াছিলাম! এ স্মৃতি কি নিবিবে না? আরও নয়নে দরবিগলিত বাষ্পপাত হইতে লাগিল।

৮

তাঁহারা কতক্ষণ অন্তরের গোলমালে ব্যাপৃত ছিলেন, কে বলিতে পারে? কতক্ষণ ঋভুদত্ত নব-বৈদ্যুতীবলে তাঁহাদের অন্তরাকাশে তুমুল ঝটিকাবৃষ্টি হইতেছিল, কে বলিতে পারে? ক্রমে যখন ভাবশান্তি হইয়া বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইল, তখন দেখিলেন, সমস্তই অন্যরূপ, শরৎ-আকাশে ভানূদয় হইয়াছে, নক্ষত্র কোথায় লুকাইয়াছে, প্রভাতবায়ু প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে, নির্ঝরশব্দ কাণ জুড়াইয়া দিতেছে, তিন জনেরই রজনীর বৃত্তান্ত স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে।

তুমুল-ভাব-ঝটিকার অন্তে বশিষ্ঠের মনে শান্তি ও সুখ দৃষ্ট হইল। তিনি বুদ্ধি, বিদ্যা ও তপোবলে পৃথিবীতে ভাই ভাই স্থাপন করিবেন, এই আশায়, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় গর্ব্বপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

বিশ্বামিত্রের মনে ঘোরতর আত্মগরিমা, একটু ত্রস্ততা, আমি বাহুবলে প্রায় সমস্ত জয় করিয়াছি। বাকাটুকু শীঘ্রই জয় করিয়া ভাই ভাই করিয়া দিব।

বাল্মীকির শান্তি রহিল না, সুখ রহিল না, দারুণ অনুতাপ তাঁহার সর্ব্বস্ব হইল।

তিনি দস্যুদলের দিকেও গেলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে শান্তি উদ্দেশে নিবিড় গহনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

বশিষ্ঠ মহাহৃষ্টচিত্তে প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য যোগ-বলে আশ্রমে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তেজঃপুঞ্জ-শরীর বিশালবক্ষাঃ বিশ্বামিত্র পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া অবতরণ করিতেছেন, অমনি সসম্ভ্রমে যোগ-বলে তাঁহার নিকটে আসিয়া দুই জনে পদব্রজে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র নামিতেছেন, পদভরে পর্ব্বত নমিত ও কম্পিত হইতেছে, সম্মুখস্থিত উপল সকল দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদের পথ প্রদান করিতেছে। প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষাবলী শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মান করিতেছে ও ছায়াদানে তাঁহা-দিগের শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে। শাখায় শাখায় সুপুষ্ট, সুহৃষ্ট, সুকণ্ঠ, বিচিত্রপক্ষ পক্ষী সকল সুমধুর গীতে তাঁহাদিগের কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে, লতাসমূহ বৃক্ষোপরি হইতে তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে পুষ্প বিকিরণ করিতেছে। কলকলনাদিনী নির্ঝরিণীগণ প্রতি পদে তরঙ্গহস্ত দ্বারা তাঁহাদিগের পথমার্জ্জনা করিতেছে। বনতলস্থ কোমলকায় গুল্মসমূহ, শৈত্য-সৌগন্ধ্য-মান্দ্য-ময় পবনহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া উঁহাদিগের শরীরে চামরব্যজন করিতেছে। অতি দুর্গম দুরা-রোহ সানুসমূহেও তাঁহারা অবলীলাক্রমে অবতরণ করিতেছেন। পশ্চাদ্‌ভাগে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা, নিম্নে তৃণাচ্ছাদিত সুনীল সমতলভূমি, মধ্যস্থলে তীব্র-তেজোময় বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। উভয়েই পর্ব্বত-চূড়ার ন্যায় প্রকাণ্ডকায়। বোধ হইতে লাগিল, যেন সৌর-কর-প্রতিফলিত অতএব তীব্রোজ্জ্বল তুষার-শিখরদ্বয় স্বস্থানবিচ্যুত হইয়া সমানগতিতে নিম্নাভি-মুখে পতিত হইতেছে।

প্রথম সাক্ষাতে বন্দনাদির পর বশিষ্ঠদেব উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতাদি স্বরপ্রক্রিয়াপরিশোধিত কোমল মসৃণ অথচ গম্ভীর স্বরলহরীতে গিরিগুহাকন্দরাদি প্রতিধ্বনিত করিয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজাধিরাজ, বহুদিবসাবধি আমি শ্রুত আছি, আপনি ভুবনবিজয়ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। তপঃ-স্বাধ্যায়াদি আনুশ্রবিক ক্রিয়াকলাপে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকাতে ভবাদৃশ বীরজনের অদ্ভুতচরিত্রসম্বন্ধীয় সংবাদও লইতে পারি নাই। অদ্য পরমসৌভাগ্যক্রমে আপনার সাক্ষাৎলাভ হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ-প্রদর্শন করিয়া স্বকীয় দিগ্বিজয়ব্যাপারের অদ্ভুত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ করুন।"

বশিষ্ঠের জীমূতমন্দ্র কণ্ঠধ্বনি গুহায় গুহায়, কন্দরে কন্দরে নিলীন হইবার পূর্ব্বেই রাজাধিরাজ বিশ্বামিত্র ভীষণকোদণ্ডটঙ্কারের ন্যায় স্পষ্ট অথচ দ্রুত, গম্ভীর অথচ ঈষৎ কার্কশ্যময় বীরকণ্ঠে স্বরযোজনা করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মর্ষে, মাদৃশ দীনজনের চরিতজ্ঞানে ভবাদৃশ মহাশয়ের কৌতূহল নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। অতএব নিজমুখে নিজকীর্ত্তি বর্ণনে প্রত্যবায় সত্ত্বেও আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিব।"

"সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চারি উপায়ের মধ্যে দিগ্বিজয়ীর পক্ষে ভেদ ও দণ্ডই প্রশস্ত। এই জন্য আমি ঐ উপায়দ্বয়ই অবলম্বন করিয়া এ ব্যাপারে প্রবৃত্ত

হইয়াছি। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রবিড়, দ্রাবিড়, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, গুজরাষ্ট্র, মৎস্য, মগধ, বিদর্ভাদি দেশসমূহ স্বয়ং অক্ষৌহিণীমাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে হস্তগত করিয়া অদ্য হিমালয়দ্বারে শিবিরসংস্থাপন করিয়াছি। পূর্বাঞ্চলে চীন, হূন, সান, মান, শ্যাম, মগ, নাগাদি রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা সমুৎপাদনের জন্য ভেদক্ষম সুচতুর বিশ্বস্ত মন্ত্রিবর্গকে প্রেরণ করিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন, পারদ, দরদ, আরব, পারস, ম্লেচ্ছ, কিরাতাদি জাতিসমূহকে উচ্ছৃঙ্খল করিবার মানসে নবনবতি অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সদপ্রধান সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছি। সকল স্থান হইতেই সুসমাচার আসিয়াছে। হিমালয়জয়ের পর একবার সসৈন্যে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেই আমার দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হয়।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজের দিগ্বিজয়কাহিনী শ্রবণে পরম আপ্যায়িত হইলাম। আপনি সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ এবং সমরকুশল বীরাগ্রণী সেনানী আপনার পক্ষে ভুবনবিজয় অসম্ভাবিত নহে; কিন্তু আমার এক বিষয়ে সন্দেহ আছে, মহাশয় ভঞ্জন করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।"

বিশ্বামিত্র। দীনের প্রতি এরূপ আদেশ অন্য কেহ করিলে উপহাস বলিয়া বোধ করিতাম, কিন্তু ভবাদৃশ গম্ভীরপ্রকৃতিক লোক হইতে উপহাস সম্ভাবিত নহে, অতএব আজ্ঞা করুন, দাস হইতে যদি আপনার কোন কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, দাস করিতে প্রস্তুত আছে।

বশিষ্ঠ। আমার প্রথম সন্দেহ এই যে, দিগ্বিজয়ের ফলোপধায়িতা কি?

বিশ্বামিত্র। মহাশয় এমন আজ্ঞা করিবেন না। দিগ্বিজয়ে সমস্ত পৃথিবীতে এক জন রাজা হন এবং এক রাজার অধীনে সমস্ত জাতিতে ঐক্য সংস্থাপিত হয়।

বশিষ্ঠ। আমার বোধ হয়, দিগ্বিজয়ে জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মাইয়া ঐক্যসম্ভাবনা সুদূরপরাহত করে। বিজিত জাতিদিগের মধ্যেও জেতার অনুগ্রহতারতম্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমার মন্তব্য এই যে, দিগ্বিজয়ে কি জাতিসমূহমধ্যে ভ্রাতৃভাব উৎপন্ন হয়? সকলে ভাই ভাই হয়?

বিশ্বামিত্র। আমার সংস্কার এই, দিগ্বিজয় ভিন্ন অন্য কিছুতেই পৃথিবীতে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্যবন্ধন হইতে পারে না। দিগ্বিজয়ী রাজা পিতার ন্যায়; সমস্ত প্রজাকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করেন, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই হইয়া উঠে। গত রজনীর ঘটনায় আমার এই সংস্কার আরও দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। আমাকে দিগ্বিজয়ে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্য স্থাপনে উৎসাহিত করিবার জন্যই কল্য ঋভুদিগের আগমন হইয়াছিল।

বশিষ্ঠ। এইটি আপনার ভ্রম। ঋভুগণ সময়ে সময়ে জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাকে উৎসাহিত করিতে আসেন নাই। আর এক কথা, আপনি দিগ্বিজয় করিয়া মনুষ্যের শরীরই জয় করিলেন, তাহাদিগের মনের উপর আপনার প্রভুত্ব কি?

বিশ্বামিত্র। মনে যাহাই থাকুক, প্রকাশ হইতে দিব না।

বশিষ্ঠ। তাহার নাম দমন, পালন নহে, তাহাকে ভ্রাতৃভাব বলে না। মনে বিদ্বেষ থাকিলে ভ্রাতৃভাব হইতেই পারে না।

বিশ্বামিত্র। প্রথম বলে শাসন অভ্যস্ত হইলে যখন সকলেরই সমান দশা হয়, তখন সকলেই ভাই ভাই হইয়া যায়।

বশিষ্ঠ। সে ভাই ভাই নয়, সে রুদ্ধ অগ্নির ধূমোদ্গম মাত্র। সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে দেশ জ্বলিয়া উঠে এবং সেই অগ্নিশিখায়ই দিগ্বিজয়ীর আহুত হয়।

বিশ্বা। আপনি মনে করিবেন না, (দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া) এই হস্তে ধনুর্ব্বাণ থাকিতে প্রজারা বিদ্রোহী হইতে পারিবে।

বশিষ্ঠ। যদি ধনুর্ব্বাণ দ্বারাই ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিতে হইল, তবে তাহাকে কি ভ্রাতৃভাব বলা যাইতে পারে?

বিশ্বা। মানিলাম, পারে না। কিন্তু দিগ্বিজয় ভিন্ন ভ্রাতৃভাবের অন্য উপায় আপনি দেখাইতে পারেন?

বশিষ্ঠ। না পারিলে এত কথা বলির কেন?

বিশ্বা। দেখা যাউক, আপনার কমণ্ডলুমধ্যে কি উপায় আছে।

বশিষ্ঠ। উপায় এই; বলে মানুষের মিল করান যায় না। মানুষে যতক্ষণ নিজে নিজের জন্য চিন্তা করিতে শিখে, ততক্ষণ তুই মানুষকে এক করা কাহারও সাধ্য নয়। অতএব স্বাধীনচিন্তাস্রোত রুদ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন। নীচজাতির যাহাতে স্বাধীনচিন্তা না থাকে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

বিশ্বা। জন পাঁচ ছয় ব্রাহ্মণে মিলে পৃথিবীর লোকের স্বাধীনচিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিবেন?

বশিষ্ঠ। বুদ্ধিবলে কি না হয়? আমি বাল্যকাল হইতে তাহাদের মন অন্যপথে ফিরাইয়া দিব। ভোগসুখে রত করাইব। মনের মধ্যে অন্য চিন্তা জন্মিতে দিব না। একবারে গ্রন্থাদিপাঠ হইতে বঞ্চিত করিব। এইরূপে একপুরুষে না পারি, অন্ততঃ দশপুরুষে ও মনুষ্যে মনুষ্যে দূরে থাকুক, মনুষ্যে পশুতেও ভ্রাতৃভাব জন্মাইয়া দিব।

বিশ্বা। মানুষ পশুবৎ হইবে, কি আশ্চর্য্য ভ্রাতৃভাব!!! এই ভ্রাতৃভাব কেন? ব্রাহ্মণের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য? দিগ্বিজয়ে এক জন রাজার অধীনে থাকে, ইহাতে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের অধীন হইতে হইবে। আপনি মনে করিয়াছেন, তাহাতেই আপনারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন? আপনাদের পরমশক্র আকাশ আছে, দেখিতেছেন না? অনন্ত আকাশের দিকে একবার চাহিলে স্বাধীন চিন্তা যে আপনই উদ্বেল হইয়া উঠে।

বশিষ্ঠ। আমরা তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছি। অনন্ত আকাশের দিকে কাহাকেও চাহিতে দিব না। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেবতা বসাইব। আকাশের তারার সহিত মনুষ্য-অদৃষ্টের একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিব। অন্তরীক্ষ বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া দিব। যে ভাবে আকাশের দিকে চাহিলে স্বাধীনচিন্তা প্রবল হয়, সে ভাব তাহাদের মনেও আসিতে দিব না। সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়, সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করিয়া দিব। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার এমনি বাঁধাবাঁধি করিব যে, ব্রাহ্মণ ছাড়া কাহারও এক পাও যাইবার ক্ষমতা রাখিব না। অথচ ব্রাহ্মণ রাজাও হইবে না।

বিশ্বা। হাঁ হাঁ, বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি। বিটলামি করিয়া জগৎ বশ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু বিটলামিতে কয়দিন লোকে ভুলিয়া থাকিবে? আমি বেশ বলিতে পারি, বিশ্বামিত্রের দলের কাহাকেও আপনি ভুলাইতে পারিবেন না।

বিশ্বামিত্রের কটূক্তিতে বশিষ্ঠের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে উহা শমিত করিলেন। ক্রোধোদ্রেক হইতে ক্রোধশান্তি পর্য্যন্ত বশিষ্ঠ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশ্বামিত্র কূটতর্কে এবং শ্লেষোক্তিতে বশিষ্ঠকে পরাজিত করিয়াছেন মনে করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন, সুতরাং তিনিও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না।

নিঃশব্দে কিয়দ্দূর অবতরণ করিলে, বিশ্বামিত্র দূরে আপন শিবির দেখিতে পাইলেন। তখন একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্, অদ্য বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে, দাসের শিবিরে আতিথ্যগ্রহণ করিলে দাস কৃতকৃতার্থ হইবে।" বশিষ্ঠ সম্মত হইলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে মহাসমাদরে আপন শিবিরে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ জাঁকসহকারে যে সমস্ত অপার রত্নরাশি নানা দেশ হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখাইলেন এবং উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইবার সময় বিশ্বামিত্রকে আপন আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

২

বিশ্বামিত্র যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ বহুদূর হইতে তাঁহাকে আগুবাড়াইয়া লইয়া আসিলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিশ্বামিত্র একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তিনি যখন উপস্থিত হন, তখন তপোবন শাল, তাল, তমাল, পিয়াসাল, হিন্তাল, বক, বকুল প্রভৃতি প্রকাণ্ডকায় বনবৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, তলায় লতাগুল্মাদির লেশমাত্র নাই, সব পরিষ্কার, সিন্দুর পড়িলেও তুলিয়া লওয়া যায়। এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, গণ্ডার, মহিষ, বৃক, তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ; কেউটিয়া, গোক্ষুর, বোড়া, বোয়া প্রভৃতি প্রকাণ্ড অজগরসমূহ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি খাদ্যজন্তুর দিকে তাকাইতেছেও না। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র-প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা তাঁহাদের পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহাত্মন্, বুদ্ধিবলে বন্যজন্তু বশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মানুষ বশ করিতে পারিবেন না।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "ইহারা স্থানমাহাত্ম্যে বশ হইয়াছে; আমাদের বুদ্ধিবলে নহে।"

কিন্তু অল্পক্ষণমধ্যেই এ দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইল, হঠাৎ বন উদ্যানে পরিণত হইল, প্রকাণ্ড তপোবন নানা প্রকার শরতের ফুলের কেয়ারিতে বোধ হইতে লাগিল, কে যেন একখানি গালিচা পাতিয়া দিয়াছে। কোথাও শাদা, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে শাদা,

কোথাও নীল, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে নীল, কোথাও রাঙ্গা, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে রাঙ্গা, কোথাও সবুজ, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে সবুজ, কোথাও পীত, কেমন এক রঙ কমিয়া আর এক রঙ বাড়িয়া যাইতেছে। যে স্থলে ফুলের রঙে বৈচিত্র্য হইতেছে না, সে স্থলে উপলে সে দোষ পূরাইয়া দিতেছে। গালিচার চারি পার্শ্বে নানাজাতীয় গন্ধপুষ্প, তাহার বাতাসে চারি দিক্ ভর ভর করিতেছে, প্রকাণ্ড গালিচা—ঠিক মধ্যস্থলে, প্রকাণ্ড সরোবরে, মার্ব্বল পাথরের সিঁড়ি, তলা পর্য্যন্ত মার্ব্বল পাথরে বাঁধান, জল এমনি স্বচ্ছ, তলার মার্ব্বল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। সরোবরের মধ্য দিয়া শ্বেত-মর্ম্মরের সেতু। সেতুর মরকতময় রেলের উপর নানা মণিনির্ম্মিত বিচিত্র দাঁড়; তাহাতে শুক, শারিকা, হরিয়াল, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি সুকণ্ঠ পক্ষী এবং বিচিত্র পক্ষপুচ্ছধারী ময়ূরময়ূরীগণ গান ও নৃত্য দ্বারা অভ্যাগত রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা করিতেছে। সরোবরের স্বচ্ছজলে লাল, নীল, পীত, হরিত, হরিদ্রা প্রভৃতি নানা রঙের মৎস্যসমূহ সন্তরণ করিতেছে। সরোবরের ওপাশেও গালিচা। এই গালিচার অবিদূরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দ্বার কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। দ্বারে ক্ষোদিত করিয়া স্বর্ণাক্ষরে লেখা—

"স্বাগতং গাধিকুলতিলকস্য বিশ্বামিত্রস্য।"

বিশ্বামিত্র প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে, সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াও তিনি এরূপ অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। হীরা, মতি, পান্না, মুক্তা ইত্যাদি গৃহসজ্জার উপকরণ। উৎকৃষ্ট বহুমূল্য প্রস্তরে বাটীর আদ্যন্ত নির্ম্মিত, আর তাহার উপর পরশুরামের যুদ্ধকাহিনী চারি দিকে তোলা করিয়া অঙ্কিত, কোথাও ক্ষত্রিয়শোণিতহ্রদে পরশুরাম পিতৃতর্পণ করিতেছেন, কোথাও ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছে আর ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইতেছে, এরূপ একুশটি দেয়ালে একুশটি যুদ্ধকাহিনী লেখা রহিয়াছে।

বিশ্বামিত্র হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, বশিষ্ঠ তাঁহার আতিথ্যের জবাব দিতেছে এবং তাঁহার সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহারও জবাব দিতেছে। মনে মনে তাঁহার বিদ্বেষভাব ক্রমে বাড়িতে লাগিল। হিংসা জন্মিতে লাগিল। আপাততঃ মনোভাব গোপন করিয়া আতিথ্যস্বীকার করিলেন। মহানন্দে পান, ভোজন, নৃত্যগীতাদি দর্শন সমাপন হইল, যাইবার সময় বশিষ্ঠ যথোচিত উপঢৌকন আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহাশয়, আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিল ?"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী। তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তবে অল্প উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গোরুটি দিতে হইবে।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "আমি যখন তাহার 'মা'র কাছ হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উহাকে কখন কাহাকে দিব না।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "না দিলে অতিথির অবমাননা হয়, সেটা স্মরণ রাখিবেন, আপনারা সমাজের ব্যবস্থাপক।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "বলে বা কৌশলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করান অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, অতএব আপনাকে এরূপ অসৎ অভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি।"

বিশ্বামিত্র আর ভাব গোপন করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আপনি দিবেন না, কিন্তু আমি অপহরণ করিব। অপহরণ করার অপরাধ বোধ হয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করান অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর নহে" বলিয়াই আপন লোকজনকে গোরু চুরি করিতে হুকুম দিলেন। এ দিকে অতিথি সর্ব্বদেবময়,—ওদিকে বলপূর্ব্বক অপহরণ, বশিষ্ঠ মহাবিভ্রাটে পড়িয়া গেলেন। তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। লোকে ধেনু অপহরণ করিবার উদ্যোগ করিল, ধেনু কাতরনয়নে বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, "কি করি বৎসে, অতিথি, রাজা, প্রবল-প্রতাপ দিগ্বিজয়ী তোমায় অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তুমিই ইহার প্রমাণ।" বলিবামাত্র নন্দিনী হুঙ্কার ছাড়িলেন, হুঙ্কারশব্দে আকাশ-পাতাল ফাটিয়া গেল, আর অগণিতসংখ্যক পারদ, পারস, চীন, সান, মান প্রভৃতি নানাজাতীয় সেনা রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া তথায় তাঁহার ত্রাণার্থ উপস্থিত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিয়াই ভাবিলেন যে, পারদাদি জাতিকে তাঁহার সেনানীরা আজিও বলে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, বশিষ্ঠ বুদ্ধিবলে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়াছেন। জানিলেন, বুদ্ধিবলে মানুষকে আয়ত্ত করা যায়।

ধেনু লইয়া মহাবিবাদ বাধিয়া উঠিল। এক দিকে ক্ষত্রিয় সেনা, আর এক দিকে যবনসেনা, মধ্যস্থলে নন্দিনী;—পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা কোনমতেই ছাড়িতেছে না। যবনগণ গাভী ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করায় যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। যবন ও ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ, ব্রাহ্মণের জন্যে যুদ্ধ—ব্রাহ্মণ দর্শক। দীর্ঘ দীর্ঘ তরবারি, দীর্ঘ দীর্ঘ বর্শা, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধনুক, টঙ্কারে টঙ্কারে মেঘগর্জ্জন অনুভব হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র স্বসৈন্যের অভিনেতা, ব্রাহ্মণ পক্ষে অভিনেতা কেহই নাই, বশিষ্ঠ অতিথির সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক এবং পুত্র ও শিষ্যগণকে যুদ্ধে যাইতে দিলেন না, বলিলেন, পুত্রগণ, শিষ্যগণ, ক্ষত্রিয়ের যাহাই হউক, "ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা।" ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ করিলেন না। কিন্তু যুদ্ধ চলিতে লাগিল, ক্রমে রক্তপাত আরম্ভ হইল, ক্রমে রক্তনদী বহিতে লাগিল, যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলি রক্তে কর্দ্দম হইল। এক দুই করিয়া ক্রমে বিশ্বামিত্রের শত শত সৈন্য হস্তী অশ্ব রথ পদাতি নিহত হইতে লাগিল, তিনি স্বয়ং ভীমা অসি করে ধারণ করিয়া রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এক এক আঘাতে শত শত যবনের মস্তক ছিন্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রয়াস বৃথা, নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে এক এক অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিতেছে, তাঁহার নিজের রণদুর্ম্মদ অক্ষৌহিণী সে অজস্রউদ্গমশীল সৈন্যতরঙ্গের সম্মুখে ভাসিয়া যাইতেছে। তখন বিশ্বামিত্র হুকুম দিলেন, "গোরু মেরে ফেল।" গোরু এখনও ক্ষত্রিয়দিগের করকবলিত হয় নাই। উহারা দূর হইতে নারাচবল্লমাদি ক্ষেপ করিয়া গোরুর প্রাণসংহারে উদ্যম করিবামাত্র গোরু দিব্য স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশপথে উত্থিত হইল শ্বেতপদ্মাসনা শ্বেতবস্ত্রবিভূষিতা শ্বেতবর্ণচ্ছটায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না লজ্জিত হয়, হস্তে শ্বেতবীণা, লাবণ্যে জগৎ আলো; তাহার উপর আবার শ্বেতপদ্মের সমস্ত বিভূষণ! বলিলেন, "রে মূর্খ, আমি ব্রাহ্মণের বিদ্যা, তোর সাধ্য কি, তুই আমায় অপহরণ করিস্। আমি কুলক্রমে ব্রাহ্মণগৃহে বাস করিয়া থাকি, করিয়াছি ও করিব।" বিশ্বামিত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দেখিলেন, সরস্বতী আবার ধেনুমূর্ত্তি ধারণ করত বশিষ্ঠসন্নিধানে অবতীর্ণ হইলেন, সমস্ত সৈন্য বায়ুতে মিশিয়া গেল। বশিষ্ঠের নয়নে দর দর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি স্বহস্তে ধেনুর গাত্রকণ্ডুয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশ্বামিত্রের এই সর্ব্বপ্রথম পরাজয়। মনের ক্ষোভে, দুঃখে, হিংসায় বিশ্বামিত্র আর গাভী বা বশিষ্ঠের দিকে চাহিতে পারিলেন না। ক্রোধে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন, সৈন্যসামন্তকে আপন আপন বাড়ী যাইতে বলিলেন, রাজ্যের ভার মন্ত্রীর উপর দিলেন। বলিলেন—

"ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্"

বলিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমালয়পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বামিত্র যে কেবল বাহুবলে সমস্ত ভুবন এক করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার অসারতা বুঝিতে পারিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

১

বিশ্বামিত্র কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। তিনি সৈন্যদের সঙ্গে আসিলেন না। মন্ত্রী রাজ্য করিতে লাগিল। তাঁহার পরিবারেরা, আজি আসেন, কালি আসেন, ভাবিয়া ক্রমে দিন, মাস, বৎসর কাটাইয়া দিল। বশিষ্ঠ আবার আপন মতলব অনুসারে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল, বিশ্বামিত্রপক্ষীয়েরা তাঁহার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল।

এ দিকে বিশ্বামিত্র একবারে ঘোরতর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ হইবেন, নিজহস্তে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দুই বল এক করিবেন এবং সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় প্রভু হইবেন, সকলকে একশাসনে রাখিয়া একভাবে মিলাইবেন, এই তাঁহার মনস্থ হইল। তিনি হিমালয়ের এক অতি নিভৃত জঙ্গলময় দুর্গম স্থানে গমন করতঃ একেবারে ঘোরতর তপ আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিনে এক গ্রাস আহার, তাহার পর অর্দ্ধগ্রাস; তাহার পর এক দানা, তাহার পর অর্দ্ধদানা; তৎপরে জলবিন্দু, তৎপরে আহার বন্ধ করিয়া তপ আরম্ভ করিতে লাগিলেন। শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত সমস্ত মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। দৃক্পাত নাই, কেবল ধ্যান। চক্ষু কোটরগত হইল, নাসিকার

মধ্য-অস্থিমাত্র স্পষ্ট দেখা যায়, শরীরের সমস্ত হাড় কেবল চর্মমাত্রে আচ্ছাদিত হইল কেশরাশি বর্দ্ধিত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পদ-নখ বর্দ্ধিত হইয়া শিকড়ের মত মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া গেল। উইপোকা গায়ের উপর বাসা করিল। বিশ্বামিত্রের ধ্যান শেষ হয় না। ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ দেখে আর বাবভাবে দূর দিয়া চলিয়া যায়।

এই ভয়ানক অবস্থায় বিশ্বামিত্র নানারূপ স্বপ্ন দেখিতেন, কখন বোধ হইত, সমস্ত জগৎ বিশ্বসংসার পরমাণু হইয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে একমাত্র তিনি, তাঁহার শরীর দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উঠিল। তাঁহার তেজে পরমাণু দগ্ধ হইতে লাগিল। শেষে নিজ শরীরও দগ্ধ হইতে লাগিল। দারুণ অন্তরের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন, কতকগুলি পরমাসুন্দরী—সাক্ষাৎ অপ্সরা কোথায় লাগে, তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের কেহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। কেহ মদনবিহ্বল-লালসাঙ্গ হেলাইয়া বেড়াইতেছে, কেহ শরীরের অর্দ্ধ অংশে বসনত্যাগ করিয়া, কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ কটাক্ষবর্ষণ করিতেছে, কটাক্ষ কখন কোমল, কখন চঞ্চল, কখন ঠারে ঠারে হৃদয়ের অভিলাষ ছড়াইয়া দিতেছে। কখন অলস, কখন বিদ্যুদ্বৎ, কখন চক্ষের পাতা কাঁপিতেছে, তাহার উপর কটাক্ষ বাণবৎ ঘন ঘন পড়িতেছে। কাহারও বেণী বদ্ধ, কাহারও এলো, কাহারও অলক কুঞ্চিত, কাহারও বায়ুভরে দোদুল্যমান। আর সকলেই নানা হাব ভাব বিকাশ করিয়া, কেবল বিশ্বামিত্র প্রতি আপনাদের আলস, মদনভাব প্রকাশ করিতেছে বিশ্বামিত্র দেখিলেন। তাঁহার অন্তর-দাহ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে তিনি পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন।

আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কোটি সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, তেজে নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে, গা পুড়িয়া যাইতেছে, বিশ্বামিত্র পলায়ন করিয়া সূর্য্যসমূহ হইতে দূরে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে, যাইতে যাইতে সূর্য্যের তেজ মন্দ হইল, কিন্তু যেখানে গেলেন, সেইখানে ভয়ঙ্কর সর্প শতসহস্র তাঁহাকে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন—ভয়ানক কাণ্ড। নানাপ্রকার ভীষণাকার জন্তুগণ তাঁহাকে ভয় দেখাইতেছে। কাহারও মুখ শূকরের মত, সিংহের ন্যায় কেশর, যোজনবিস্তৃত লাঙ্গুল। কেহ ভীষণ পিশাচ, মাথার উপর চোখ, অর্দ্ধেক শরীর হাতে ভরা, দুই হাত আর দুই পা দিয়া চারিদিকে আহারসামগ্রী হাতড়াইতেছে, আর যাহা পাইতেছে, অমনি উদরসাৎ করিতেছে। কাহারও দন্ত শূকরের ন্যায়, কাহারও হস্তীর ন্যায়, কাহারও মাথা পর্ব্বতের চূড়ার ন্যায়, কাহারও কেবল মস্তক, পদদ্বয় আছে কি না সন্দেহ। কোন স্ত্রী-পিশাচীর কেবল স্তনদ্বয় পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় বৃহৎ, আবার কাল। কেহ কাল, কেহ নীল, কেহ পীত, কেহ হরিদ্রা, নানা রঙ্গে ভয়ঙ্কর। যখন এই ভয়ানক সৈন্য সেনাপতির আদেশে বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ করিল, তাঁহার আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার কটাক্ষে পিশাচসেনা বিহতবিধ্বস্ত হইয়া গেল। কাহার পদ ভগ্ন হইল, কাহার প্রাণনাশ হইল, কাহার মস্তক ক্ষত হইল। স্তনবতীর স্তনভার খসিয়া গিয়া তাহার শরীর হাল্‌কা হইল। এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে গেল, ওর পা তাহার মাথায় গেল।

এই ভাবে পিশাচসেনার ধ্বংস দেখিয়া পিশাচসেনাপতি হাসি হাসি মুখে ভাব করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বিশ্বামিত্র, তুমি অতি বড় পরাক্রমশালী—তুমি ভুজবলে সমস্ত জয় করিয়াছ। তুমি তপোবলে কটাক্ষে আমার পিশাচসেনা বিহতবিধ্বস্ত করিয়া দিলে। অতএব তুমি আমার পুত্র হও; এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড দেখিতেছ, ইহার সমস্ত অসুর, পিশাচ, দৈত্য, দানব আমার অধীন, তুমিই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবে। আমি অচিরাৎ তোমায় রাজা করিয়া দিয়া স্বয়ং বিলাসসুখভোগে নিরত হইব। অতএব তুমি আমার পুত্র হও। এই হিমালয়চূড়ার উপরে উঠিলে দেখিতে পাইবে, অসংখ্য সমৃদ্ধ রাজ্য চারিদিকে রহিয়াছে,—সমস্ত তোমার হইবে। চীন, জাপান, মিসর, পারস্য, সব তোমার হইবে। এই যে সুন্দরীগণ তোমার প্রলোভনের জন্য আসিয়াছিল, উহারা আমার ভোগ্যা। উহারা তোমার হইবে। যত মণি, মুক্তা, কাঞ্চনের খনি দেখিতে পাইবে, সমস্ত আমার। আমার প্রজার সংখ্যা নাই; তুমি আমার পুত্র হও, এই সমস্ত অতুল রাজত্বের একমাত্র অধীশ্বর হও, তোমার কোন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। যত দিন তুমি রাজ্যে স্থির হইতে না পার, আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার রাজ্যের রক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তুমি আমায় ব্রাহ্মণত্ব দিতে পার? নন্দিনী দিতে পার? বিদ্যা দিতে পার? সরস্বতী দিতে পার?" "না, পারি না। কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ করিবার ক্ষমতা দিতে পারি।

নন্দিনীর প্রাণনাশ করিয়া দিতে পারি। বিদ্যার মূলোচ্ছেদ করিতে পারি, কিন্তু সরস্বতীর কিছুই করিতে পারি না।" "তবে তোমায় দিয়া আমার কাজ হইবে না," বলিয়া বিশ্বামিত্র আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

২

এবার তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হয় না। ক্রমাগত নিশ্বাস বন্ধ করায়, ক্রমাগত একবিষয়ক চিন্তা করায়, ক্রমাগত অনাহারে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইল না। কিন্তু তিনি কঠোর তপস্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন, তাঁহার কর্ণকুহর হইতে ঝাঁঝার ন্যায় শব্দ বাহির হইতে লাগিল, নাসিকায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সেই শব্দের পর তাঁহার মস্তক প্রদক্ষিণ করিয়া রাশিচক্র দক্ষিণ হইতে বাম দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ছায়াপথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মাথার খুলি অভ্যন্তরস্থ অগ্ন্যুত্তাপে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, বিশ্বসংসারে বুম করিয়া শব্দ হইল, শব্দ আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; শেষে ব্রহ্মাণ্ডের কপালক পালিকা বিদীর্ণ করিয়া সেই পথে বাহির হইয়া গেল।

তাহার বাহির হইতে দূরস্থিত শত-সহস্র অনবরত মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শুনা গেল—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য
ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ॥

বিশ্বামিত্র ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মস্তকাস্থি নীচে নামিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার শরীর সবল, সতেজ ও কান্তিপুষ্ট হইল। বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, 'ব্রাহ্মণত্ব না পাই, বেদমন্ত্রদর্শন ব্রাহ্মণের স্বত্ব ছিল, তাহা ত ছিন্ন করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট' বলিয়া আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

৩

বিশ্বামিত্রের ধ্যানে ব্রহ্মাণ্ডে যে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা আর কাহারও অবিদিত রহিল না। তখন ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে মহাসভায় আহ্বান করিলেন। কণ্ব, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, সব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আকাশপথে সভা হইল, বোধ হইল, আকাশপথে শত শত সূর্য্যের উদয় হইয়াছে; সভায় এক জন শূদ্র রাজাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হইল। বিশ্বামিত্রদৃষ্ট মন্ত্র গায়ত্রীনামে ব্রাহ্মণমাত্রেরই আরাধ্য জপনীয় মন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হইল। কিন্তু ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলে, কোন ব্রহ্মর্ষি বা দেবর্ষিই অনুমোদন করিলেন না। কেহ বলিলেন, বিশ্বামিত্র এখনই বিশ্বের প্রায় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব ও বিদ্যা পাইলে এখনই সৃষ্টিলোপ করিবে। কেহ বলিলেন, উহার দুরাকাঙ্ক্ষা বড় প্রবলা, আজি ব্রাহ্মণত্ব পাইলে, কালি ব্রহ্মত্ব চাহিয়া বসিবে। অতএব উহাকে সাহস দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। অনন্তর সমবেত ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মাকে প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইবার সংকল্প করিলেন। ব্রহ্মার প্রতি ভার রহিল, আপনি ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন আর যাহাই চায়, দিবেন। তখন সূর্য্যবিনিন্দিত প্রভারাশি বিস্তার করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সূর্য্যরশ্মিরথে আরোহণ করিয়া হিমালয়ের সেই নিভৃত গুহায় আবির্ভূত হইলেন। বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আমি ব্রহ্মা, তোমার ধ্যানে তৃপ্ত হইয়া বর দিতে আসিয়াছি। কি বর চাহ, যদি অদেয় না হয়, তবে দিব।" "আমি ব্রাহ্মণত্ব চাহি, দিতে পার?" "না।" "আমি তোমার মত ব্রহ্মার বর চাহি না।" ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আবার সূর্য্য-রশ্মিরথে আরোহণ করত ব্রহ্মর্ষিসভায় উপস্থিত হইলেন; এবং উহাকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেহই সম্মত হইল না। তখন পরামর্শ হইল, সকলে গিয়া বিশ্বামিত্রকে বুঝাইয়া পড়াইয়া অন্য কোন বরদানে তুষ্ট করা যাউক। বশিষ্ঠ একবার নিজে যাইতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু পরে ব্রহ্মা ও অন্যান্য সভাসদগণের অনুরোধে যাইতে স্বীকার করিলেন। তখন তেজঃপুঞ্জকান্তি ঋষিগণ কেহ সূর্য্য-রশ্মিরথে, কেহ মনোজবে, কেহ বায়ু অশ্বে, কেহ যোগবলে বিশ্বামিত্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা আবার তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করাইলেন। বিশ্বামিত্র সমাগত বরদাতৃগণের মধ্যে বশিষ্ঠকে দেখিয়াই চটিয়া গেলেন; এবং অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। সভাসদগণ বুঝাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণত্ব অতি সামান্য পদার্থ, তুমি যেরূপ উপযুক্ত, যেরূপ তপস্বী, মহাপুরুষ, তুমি ত ব্রাহ্মণের চূড়া। যখন ব্রাহ্মণমাত্রেই তোমার মন্ত্র পাঠ করিবে, জপ করিবে, নিয়ম করা গেল, তখন তোমার ব্রাহ্মণত্বের বাকি কি রহিল? ব্রাহ্মণত্বে অনেক কষ্ট, অনেক ব্রত-নিয়ম করিতে হয়। তুমি রাজা, তোমার তাহা কষ্টকর হইবে।

বি। আমি যখন এত কঠোর তপ করিয়াছি, তখন কি ব্রাহ্মণের ব্রত পালন করিতে পারিব না?

"তুমি পারিবে না, তা কি বলিতেছি, এত কষ্টে তোমার কাজ কি? তুমি ইন্দ্রত্ব লইবার জন্য চেষ্টা কর না কেন? তাহাই তোমার যোগ্যপদ। আর আমরা তোমার তপে সন্তুষ্ট হইয়া, আজি তোমায় রাজর্ষি 'উপাধি দিলাম। তুমি জান, ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষির নীচেই রাজর্ষি, তোমায় তৃতীয় শ্রেণীর ঋষি করিয়া দিলাম। তোমার ব্রাহ্মণত্বে কাজ কি? এই লহ, রাজর্ষি-সম্ভ্রমসূচক পদক গ্রহণ কর।" বিশ্বামিত্র এই সমস্ত কথার চাতুরী বেশ বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মর্ষিগণ যে তাঁহার তপে ভীত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। তিনি পদক দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "ব্রহ্মর্ষিগণ, তোমাদের চাতুরী বুঝিয়াছি। তোমরা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্ব-প্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার।" বশিষ্ঠ ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কেমন, বলিয়াছিলাম ত, ব্রাহ্মণত্ব এখনও পায় নাই, তাহাতেই এই।" ঋষিরা আবার নানা উপায়ে বিশ্বামিত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "তুমি মনে করিলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে, আশ্চর্য্য কি? যাহার তপোবলে ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধাখণ্ডিত হইয়াছে, সে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে, আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আমরা তোমার বন্ধু, তোমায় এক উপদেশ দিই, কেন এত কষ্ট পাইবে? এই ব্রহ্মাণ্ডে তুমি ত অদ্বিতীয়। তুমি ব্রাহ্মণের উপর, ব্রহ্মারও উপর; তবে কেন তুমি সৃষ্টিশ্রম স্বীকার করিতে চাও?"

বিশ্বামিত্র। ব্রাহ্মণকুল নির্ম্মূল কর, আমি তোমাদের সৃষ্টিতে থাকিতে পারি। ব্রাহ্মণ আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।

ব্রহ্মাদি সকলে কোপে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ড-পর্য্যবেক্ষণার্থ ধবলগিরির সর্ব্বোন্নত শিখরদেশে আরোহণ করিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

১

শরৎকালের পরিষ্কার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অগণ্য তারকাপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে সময়ে সময়ে অস্পষ্ট শ্বেতনীহারের ন্যায় কোন পদার্থ লক্ষিত হয়। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে উহা আরও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব আর কিছু নহে, মালমসলা সংগ্রহ রহিয়াছে, এখনও পৃথিবী বা সৌর-জগৎ গঠিত হয় নাই। নীহারের ন্যায় লক্ষিত হয় বলিয়া কেহ কেহ উহাকে নীহারিকা বলেন।

যে দিন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিবর্গের সহিত বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করেন, সেই দিন প্রথমতঃ ঐ সকল নীহারিকা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তীরের ন্যায়, বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, তড়িতের ন্যায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তে শত-সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নিজে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ, তৎপশ্চাৎ আগুল্ফ-বিলম্বিত পিঙ্গলবর্ণ জটাজূটভার;—সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে। দিবসে-দেখিয়া পৃথিবীস্থ লোক অকাল-উল্কাপাতবৎ বোধ করিতে লাগিল। রজনী গাঢ়ান্ধকার হইলে বশিষ্ঠ আপন আশ্রমে নির্জ্জনে নিজমন্ত্র-সাধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সহসা আকাশে ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। যে হৃদয় মহারণে অটল, ব্রহ্মর্ষিসভায় অক্ষুব্ধ, সে হৃদয় অকস্মাৎ ভীতভীত হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ক্রমে বায়ুপথ, ক্রমে স্থিরবায়ুপথ, ক্রমে কারণবারিপথ, ক্রমে মঙ্গলকক্ষ, ক্রমে বৃহস্পতিকক্ষ, ক্রমে সমস্তগ্রহকক্ষ অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার গ্রহ উপগ্রহ পার হইয়া তৃতীয় সৌর-জগতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে সৌর জগৎ হইতে সৌর-জগৎ, তার পর সৌর-জগৎ, তাহার পর কত সৌর-জগৎ পার হইয়া নিবাত, নিস্তব্ধ, নিঃসংজ্ঞ, নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক্য, অপ্রকল্প্য, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন। উহা অনন্ত, অনাদি, গাঢ়, সুগম্ভীর, অকূল, অতল, অলঙ্ঘ্য, অপার, আকৃতিবিহীন ভীমপারাবারবৎ। আর গ্রহনক্ষত্রাদি নাই, ক্রমে তাহারা দূরতর হইতে লাগিল। আলোকও ক্ষীণতর হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র মানুষবলে উঠিতেছেন না, তিনি যোগবলে

উঠিতেছেন। সুতরাং এই কল্পনারও অগম্য ভীষণ স্থানে তাঁহার ভীতি-সঞ্চার হইল না। বহুদূর এই অগাধ অনন্তমধ্যে যাইয়া তিনি ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইলেন, কোন অলক্ষ্য কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে আবর্ত্ত-ক্রমে অগাধ, অসীম, অসংখ্য, অনন্ত পরমাণুরাশি ক্রমাগত ঘুরিতেছে। এই তাঁহার গন্তব্য নীহারিকা বোধ হওয়ায় তাহার সম্মুখে অবিদূরে আপন গতি রোধ করিলেন।

২

বিশ্বামিত্র তথায় ধ্যানবলে জানিলেন, অগাধ, অনন্ত শূন্যগর্ভে অসংখ্য নীহারিকা আছে। তখন তিনি সেই সমস্ত নীহারিকা যোগবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থরাশিমধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র অতিক্ষীণালোকে দেখিতে লাগিলেন, যেন প্রকাণ্ডকায় জলজন্তুসমূহ জলোন্মথনে ভীত হইয়া কাচস্বচ্ছতড়াগের তলদেশে ত্রস্তভাবে কোন নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতেছে। অথবা যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডসমূহ দুই প্রতিকূল বায়ুতে প্রতাড়িত হইয়া এক স্থানে সমবেত হইতেছে।

যখন ইচ্ছামতসংখ্যক নীহারিকা উপস্থিত হইয়াছে দেখিলেন, তখন তিনি যোগবলে সেই সমস্ত নীহারিকা একত্র করিয়া তাহাতে ঘূর্ণাগতি সমুৎপাদন করিলেন। প্রত্যেক নীহারিকা আপন আপন কেন্দ্রে ঘুরিতে লাগিল, আর সমস্ত নীহারিকা ঐককেন্দ্রিক হইয়া ঘুরিতে লাগিল। ঘূর্ণাগতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে নিমেষে কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, বৃন্দ বৃন্দ, খর্ব্ব খর্ব্ব, নিখর্ব্ব নিখর্ব্ব, পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ ক্রোশ ঘুরিতে লাগিল। যতই ঘুরিতে লাগিল, ততই পরমাণুসমূহ নিকটবর্ত্তী হইতে এবং ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। ক্রমে যত অধিক ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত প্রকাণ্ড পরমাণুরাশি জ্বলিয়া উঠিল। পরার্দ্ধ ক্রোশ দূরে নক্ষত্র ছিল, কোথায় লুকাইয়া গেল। গাঢ়ান্ধকার ভেদ করিয়া, তমোরাশিকে নূতন পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া, চিরান্ধকার অনন্তগর্ভগহ্বর আলোকিত করিয়া, সেই অনন্ত দিক্‌প্রসারী আলোকপরম্পরা নব নব বেশে পলে পলে ছয় কোটি ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া বর্ষিষ্ঠকে সংবাদ দিবার জন্য ধাবিত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ আলোক উত্তম হইয়াছে। তাঁহার সৌর-জগতের সূর্য্য উত্তম হইয়াছে। কোটি কল্পেও এ অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না।

৩

কিয়ৎক্ষণ জ্বলিতে থাকিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, "বুধ হউক," অমনি সেই ঘূর্ণ্যমান জ্বলন্ত পদার্থ হইতে এক খণ্ড বাহির হইয়া গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল এবং ক্রমে শীতল হইয়া বুধগ্রহরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, বুধ উত্তম হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন, "শুক্র হউক," অমনি সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর এক খণ্ড ছুটিয়া গিয়া দূরে উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার বলিলেন, "পৃথিবী হউক," অমনি আবার সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর এক খণ্ড ছুটিয়া গিয়া পাহাড়-পর্ব্বত-নদ-নদী-দ্বীপ-সাগরবতী পৃথিবীরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না। এইরূপে সেই অগাধ পরমাণুরাশি হইতে এক এক করিয়া তিন দিনের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, হর্শেল, নেপচুন, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি আমাদের সৌর-জগতে যাহা যাহা আছে, বিশ্বামিত্র তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার পৃথিবী আমাদের পৃথিবী হইতে কোটি গুণে বড় হইল, সূর্য্য কোটি গুণে বড়। পৃথিবী হইতে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি প্রকাণ্ড দেখাইতে লাগিল।

৪

তৃণ, বায়ু, জল, পর্ব্বত, নদী, বন, বৃক্ষ, বরফ, যেমন যেমন এ পৃথিবীতে আছে, সব ঠিক তেমনি হইল; অধিকের মধ্যে নারিকেলগাছ, তখন এখানে ছিল না—তাহা হইল। তাঁহার জগতে হিংস্র জন্তু রহিল না; বিচিত্র পক্ষী পক্ষচ্ছটায় নয়ন-মন রঞ্জন করে, এই-ই অধিক বিচিত্র পশু, দেখিতে অতি মনোহর; সমস্তই সুগন্ধিপুষ্পের বৃক্ষ—বৃক্ষের পত্র সুগন্ধি, কাষ্ঠ সুগন্ধি, ফুল সুগন্ধি, আস্বাদ সুগন্ধি —যে তৃণ দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগ আচ্ছাদিত, তাহাও আতর অপেক্ষা সুগন্ধি। আকাশ হইতে যে বৃষ্টি পড়িত, তাহা গোলাব। বায়ু ধূপ-ধুনা-গন্ধামোদিত। আহারীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে হয়

না—বন, জল, বায়ু আহারীয় প্রদান করে এবং ইহার পরও সহস্র সহস্র বৎসর দিতে পারিবে, কাহারও কৃষিকর্ম্মের শ্রমস্বীকার করিতে হইবে না; লোকসংখ্যা যদি অগণ্য বর্দ্ধিত হয়, তবেই যাহা হউক। বাড়ী ঘর-দ্বার বিছানা রহিবে না, সুগন্ধি সুস্পর্শ অতি কোমল তৃণের শয্যা, সমস্ত পৃথিবীময় বিশ্বামিত্র পর্ব্বত কাটিয়া বৃষ্টির সময়ে থাকিবার জন্য সুন্দর স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাস্তার উপর দারুণ সূর্য্য-উত্তাপ, এ জন্য সমস্ত রাস্তার উপর আচ্ছাদন দেওয়া, তাহার উপর দুই প্রহরের সময় বরফ দেওয়া হয়, মাঠে যখন দারুণ গ্রীষ্ম, রাস্তার উপর গেলে শরীর একেবারে জুড়াইয়া যায়। বিশ্বামিত্র নিজে ভাবসৌন্দর্য্যের জন্য বড়ই পাগল, এই জন্য পাহাড়ে উঠিবার উপায় করিয়া দিলেন। লোকে যাহাতে সর্ব্বদা পর্ব্বতের শিখরাগ্র হইতে সমুদ্রের তলা পর্য্যন্ত সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারে, তাহার নানা উপায় করিয়া দিলেন।

৮

আর মনুষ্য—নূতন জগতে নূতন মনুষ্য হইল। সৃষ্টি আপনার মনোমত, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিতে মনুষ্য সুখময়, দুঃখভোগের প্রবৃত্তি সকল আদৌ রহিল না। অতি উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিরও উন্নতি হইবার উপায় রহিল। বিশ্বামিত্রের সংস্কার ছিল, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কেবলমাত্র মনের উচ্চতর বৃত্তি সকল চালনা করিয়াই তাহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর স্বার্থসাধন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে একেবারে চক্ষুলজ্জাশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব যাহাতে সকল লোকেরই বুদ্ধিবৃত্তি সমানরূপে পুষ্ট হয়, বিশ্বামিত্র তাহার জন্য চারিদিকে বিদ্যালয়, কালেজ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। উচ্চনীতিশিক্ষা, উচ্চশাসন প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক রহিল না; সকল লোক একত্র হইয়া এ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। যুক্তি একমাত্র উপাস্যদেবতা, তদ্ভিন্ন আর উপাস্য দেবতা একেবারে রহিল না। সকলে নিত্য নিত্য যুক্তিদেবীর মাত্র উপাসনা করিত।

আর প্রেম? সকলই প্রেমময়, মানুষ সব সমান। যদি কাহারও কোন বিষয়ে উন্নতি হয়, তবে সে তাহা দ্বারা অন্য লোকের উপকার করিবে, সব সমান করিয়া লইবে। বিশ্বামিত্রের জগতে সব মানুষ সুন্দর, কাল-কুৎসিত দুই একটা কদাচ কখন মিলিত কি না সন্দেহ। সকলেরই মুখে এমনি মোহিনীময় ভাব যে, মুখ দেখিলেই পরস্পর মোহিত হইয়া যাইতে হয়। সেখানে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইলে, সেকহ্যাণ্ড বা নড বা নমস্কার করিত না, একেবারে কোলাকুলি ও গাঢ় আলিঙ্গন। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই উন্নতিপথে ধাবমান। নূতন জগতে, নূতন উৎসাহে, লোকে এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতেছে, কখন পর্ব্বতে উঠিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, কখন নদীগর্ভে গিয়া তথাকার গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে, কখন আকাশ-পথে উড্ডীন হইয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে। এইরূপে সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আত্মোন্নতি, সমাজোন্নতি, মনুষ্যোন্নতি সাধনার্থ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে।

বিশ্বামিত্রের সংসারে বিবাহ নাই; কিন্তু প্রণয় এমনি পদার্থ, বিবাহ না থাকিলেও একবার মনো-মিলন হইলে প্রায় আর বিচ্ছেদ হইত না। বিচ্ছেদ হইলেও তিনবৎসরকাল পুনর্ম্মিলনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া কেহ অন্যের সহবাস করিত না। এরূপ করিলেও কেহ দোষ বলিত না; লোকে জিতেন্দ্রিয় ছিল; চৌর্য্যাদি ভয়ানক দোষ কিছুমাত্র ছিল না। গীতবাদ্যাদি কলায় সমস্ত লোকই পটু ছিল, সকলে মিলিয়া সকল স্থানে হয় গান, নয় বাজনা, নয় অভিনয়, না হয় নৃত্য প্রত্যহই হইত। প্রত্যহ পৃথিবীময় নূতন উৎসব হইত, কোন প্রকার রাজা, সেনাপতি, কিছুরই ভয় ছিল না। সকলে মিলিয়া যাহা করে, তাহাই হয়। পদার্থের গূঢ়তত্ত্বানুসন্ধান, আর প্রতিবেশীদিগের মনোরঞ্জন, ইহাই বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে লোকের নিত্যকর্ম্ম হইল।

উল্লাস—উল্লাস—উল্লাস, মনের উল্লাসে পৃথিবীস্থ লোক নৃত্য করে। যে সকল কারণ থাকায় পৃথি-বীর মানুষে মানুষে গরমিল, বিশ্বামিত্র মানুষের মন হইতে সেগুলি অতি যত্নে তুলিয়া দিয়াছিলেন। যশের আশা, টাকার তৃষ্ণা ও আধিপত্যের আশা কাহারও ছিল না। কেবল আমোদ; আজি আমার আমোদে তুমি যোগ দিলে, কালি তোমার আমোদে আমি যোগ দিলাম। বিশ্বামিত্রের দেশে মানুষ মরিত না, উহারা এক পৃথিবী হইতে অন্য পৃথিবীতে চলিয়া যাইত; এইরূপে সাত আটবার ঘুরিয়া আবার সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইত। বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে জন্ম দুই প্রকার;—পুনরাবর্ত্তন জন্ম আর নূতন জন্ম। নূতন জন্ম সংখ্যায় সংখ্যিত ছিল, রোজ সেই কয়টি করিয়া নূতন জন্ম হইত; বাকি

পুনরাবর্ত্তন জন্য। বিশ্বামিত্রের পৃথিবী অল্পকাল ছিল, অধিক নূতন জন্ম হইলে কি হইত, বলা যায় না।

৬

ও দিকে বাল্মীকি হিমালয়জঙ্গলমধ্যে কেবল রোদন করিয়া বেড়ান, রোদনের বিরাম নাই, অন্তর্দাহেরও বিরাম নাই, কি পাপই করিয়াছি, কেমন করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, যত ভাবেন, ততই হৃদয় উদ্বেল হয়, ততই একস্থানে স্থির থাকিতে পারেন না। দস্যুদলের সহিত আর দেখা করেন না। তাহারা খুঁজিয়া বেড়ায়, দেখা পায় না। মানুষ দেখিলে হৃদয়ের জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠে, জঙ্গলে পশু-পক্ষীর সহিত বাস হইতে লাগিল, পশু-পক্ষীও তাঁহার কাতর ভাবে কাতর। তিনি কোন পশুকে আহার দেন, কাহার গলা চুল্কাইয়া দেন, কাহাকেও স্নান করাইয়া দেন, এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে এক দিন এক ক্রৌঞ্চমিথুন বড় আদর করিয়া পরস্পর বসিয়া খেলা করিতেছে, এ ওর গায় পড়িতেছে, এ ওকে ঠোকরাইতেছে, এ একবার সরিয়া দূরে যাইতেছে ও আবার সরিয়া সরিয়া ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া আসিতেছে। এ একবার উল্টিয়া উহার ঘাড়ে পড়িতেছে, ও আবার উল্টিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িতেছে। আবার উড়িয়া উড়িয়া পাখা নাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ করিয়া আর এক ডালে বসিতেছে। বাল্মীকি একতানমনে উহাদের ক্রীড়া দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, "ইহারা আমা অপেক্ষা কত সুখী, আমি কেন অমনি করিয়া আমোদে মত্ত হইয়া বেড়াই না। আমারও ত কত সঙ্গী আছে।" আর ভাবিতে পারিলেন না। পূর্ব্বকথা আবার নূতন হইয়া হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, হঠাৎ একটা তীর আসিয়া একটি পক্ষীর প্রাণ সংহার করিল। পক্ষী পড়িয়া ভূতলে লুটাইয়া ছটফট করিতে লাগিল। ব্যাধ দৌড়িয়া পাখী লইতে আসিল। বাল্মীকি বলিলেন, রে পাপাত্মা—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

বলিবামাত্র বাল্মীকি দেখিলেন, নির্ঝরমধ্য হইতে একটি কন্যা কানন-পথ আলো করিয়া আসিতেছে। তাহার কান্তি অপ্সরাবিনিন্দিত, জ্যোৎস্না অপেক্ষাও স্নিগ্ধ, মন্দ ও হৃদয়-মুগ্ধকর। কামিনীর কমনীয় কান্তি দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ব্যাধ ক্রৌঞ্চ সংগ্রহ করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছিল, সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। পশু-পক্ষিগণ নীরব হইল। কন্যা বাল্মীকির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাল্মীকির কথা সরিল না, কন্যাও বাল্মীকিকে কথা কহিবার অবকাশ দিলেন না। বলিলেন, "বাল্মীকি, বিস্মিত হইও না, আমি সরস্বতী, ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহাকেও তোমার মত কোমলহৃদয় দেখি নাই, এই জন্য তোমায় এই বীণা দিতে আসিয়াছি। এই বীণা তোমার ও তোমার মত লোকের হাতে চিরদিন থাকিবে। তোমরা পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়া কেবল পরের জন্য ইহার ব্যবহার করিবে।" বাল্মীকি চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া বীণাগ্রহণ করিলেন, বীণা তাঁহার হাতেই রহিল, সরস্বতী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড

১

বিশ্বামিত্র পৃথিবী হইতে নূতন সৃষ্টির জন্য প্রস্থান করিলে পুরাতন সৃষ্টির কি হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। পৃথিবীময় গোলমাল, অরাজক, লুঠপাট; সর্ব্বদা শোণিতস্রোতপ্রবাহ। আমরা ইতিহাসে অনেক অরাজকসময়ের বিষয় পাঠ করিয়া থাকি। যবনসাম্রাজ্য বিনাশ হইলে ইংরেজসাম্রাজ্য-স্থাপন পর্য্যন্ত ভারতে যেরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর কোথাও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বিশ্বামিত্রের সর্গার্থগমনের পর যাহা ঘটে, উহা তাহার শতাংশের একাংশও নহে। মোটামুটি বলিতে গেলে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাক্ষস ও বানর এই চারিটি প্রধান জাতি ছিল। যবন, ম্লেচ্ছ, হূনাদি জাতির রাজ্য, বিশ্বামিত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের রাজারা অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকে পলাইয়া বশিষ্ঠের আশ্রয় পাইয়াছিলেন, অনেকে যে কে কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার ঠিক নাই; তাঁহাদের রাজ্যেও ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। লুঠেরারা দল বাঁধিয়া দিনে লুঠ করে, নগর দাহ করে, নগরকে নগর কাটিয়া ওয়ার করিয়া দেয়। এই সময় বাল্মীকি সর্ব্বপ্রধান লুঠেরা দলের আধিপত্য ত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয় নাই,

তাঁহারা গুহকনামক চণ্ডালকে কর্ত্তা করিয়া সমস্ত হিন্দুস্থান লুঠ আরম্ভ করিয়াছে। আজি যমুনোত্রী, কালি প্রয়াগ, অদ্য শতদ্রুসঙ্গম, পরশ্ব সরযূতীরে লুঠ করিতে লাগিয়াছে। এই সময়ে লুঠেড়ার দল দেখিলে কলির একাকার বলিয়া বোধ হইত, বড় বড় দলে ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সব একত্র আহার, একত্র শয়ন, এক ব্যবসায়, এক আমোদে মত্ত হইয়া মহাধুমধামে বাস, এক নরহত্যা ও দেশলুণ্ঠনকার্য্যে সব ব্রতী, তাহারা একেবারে দেবেরও দুর্দ্দম হইয়া উঠিল। এই ঘোর বিশৃঙ্খলার সময় যদি একটি রাজত্ব প্রবল থাকিত, তাহা হইলেও হইত। যদি এক জাতির প্রাধান্য থাকিত, তাহা হইলেও হইত। তাহা ছিল না। সকল রাজ্যেই দুইটি করিয়া দল ছিল। সকল জাতির মধ্যেই অনৈক্য ছিল, যে দলের হস্তে রাজ-ক্ষমতা ছিল, তাহারা ঘোর অত্যাচারী, তাহাদের দারুণ অত্যাচার অপেক্ষা লুঠেড়াদিগের অত্যাচার সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। লুঠেড়ারা খুন করিত, উহারা দগ্ধাইয়া মারিত। এই সময়ে রাবণ প্রবলপরাক্রম নরপতি। পরস্ত্রীহরণ, পরধন অপহরণ, পরদেশলুণ্ঠন, পরপীড়ন, ক্রীড়ার্থ পরকে যন্ত্রণাপ্রদান তাঁহার প্রধান আমোদ। তাঁহার দেশে তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষে ভ্রাতা বিভীষণ। রাবণ বিভীষণকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বিভীষণের স্বপক্ষ হইয়া কথা কহিয়াছিল বলিয়া এক জন প্রধান মন্ত্রীর নাসাকর্ণ-চ্ছেদ করিয়াছিলেন। বানররাজস্থ সুগ্রীবের সহিত বিভীষণের মিত্রতা হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য খরদূষণ নামক নিষ্ঠুর ও অবিমৃষ্যকারী সেনাপতিদ্বয়কে দণ্ডকারণ্যে সুগ্রীবের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন।

বানরদিগের দেশে বালী রাজা নিজবিরুদ্ধপক্ষকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। নিজে ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতেন। বড় বড় লোকালয় সকল বালীর অনুচরবর্গের অত্যাচারে জন-শূন্য ভয়ঙ্কর মরুর ন্যায় হইয়াছিল। ঐ যে "দণ্ড-কারণ্য" "দণ্ডকারণ্য" শুনা যায়, উহা এককালে সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা বালী রাজার অত্যাচারে নির্জ্জন অরণ্য, সিংহব্যাঘ্রাদিনিবাসভূমি-রূপে পরিণত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুই দল; দুই দলই বা বলি কেন? সকলেই স্ব স্ব প্রধান, তবে এই সমস্ত স্ব স্ব প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দলের প্রধান নায়ক পরশুরাম—ক্ষত্রিয়ের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিতে কৃতসংকল্প। কিন্তু পরশুরাম সকলেরই উপর চটা, তিনি সমুদ্রতীরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কথামত কাজ না করাতে আবার ক্ষত্রিয় প্রবল হইয়াছে, অতএব তাঁহার ইচ্ছা দুয়েরই মূলোচ্ছেদ হয়। তিনি একাই এক সহস্র। তিনি ব্রাহ্মণদিগের কার্য্যে যোগ দেন না। তাঁহার মত যাহারা ক্ষত্রিয়ান্তক, তাহারা যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করে। ব্রাহ্মণদিগের অপর দলের অধিনায়ক বশিষ্ঠ। তিনিও আপন দলের সর্ব্বময় প্রভু নহেন। তবে তাঁহার দলে তাঁহার কতকটা প্রভুত্ব আছে।

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে এক দল বশিষ্ঠের নিকট নানা প্রকারে বাধ্য, এই জন্য তাহারা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ে যাহাতে মিল থাকে, তাহার জন্য যত্নবান্। এই দলের মধ্যে অযোধ্যার ও মিথিলার রাজবংশ প্রধান। আর এক দল পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয়ান্তক, সেইরূপ ব্রাহ্মণান্তক। বিশ্বামিত্রবংশ ইহাদের সর্ব্বপ্রধান, বশিষ্ঠ ভিন্ন আর সকল দলই পরস্পর অনিষ্ট করিবার জন্য প্রাণও দিতে পারে। ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী খরদূষণকে আহ্বান করিতেন, কখন কিন্তু করিতেন না। প্রয়োজন হইলে পরপক্ষপীড়নের জন্য দস্যুদল আহ্বান করিতে কাহারও মনে কোনরূপ কষ্ট হইত না, সামান্যকারণে বিবাদ হইয়া দেশকে দেশ ছারখার হইয়া যাইত। অধিক উদাহরণ দিতে হইবে না, এক দিন বিশ্বা-মিত্রের রাজধানী কান্যকুব্জ নগরে এক জন ব্রাহ্মণ ধরা পড়িল। মন্ত্রী ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত, কশাঘাত করিলেন, তাহার নাসাকর্ণচ্ছেদ করিয়া কর্ণে গলা সীসা ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর বহুসংখ্যক কুকুর আনিয়া তাহাকে এই সকল কুকুর-সমভিব্যাহারে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলেন, দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজের নাম করিল। ভর-দ্বাজ ঋষি বহুসংখ্যক শিষ্য সঙ্গে যমুনা হইতে অল্প দূরে বাস করেন, তিনি এক প্রকাণ্ড জঙ্গলখণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা, কিন্তু তিনি বশিষ্ঠ বা পরশুরাম কোন দলেই নহেন। তাঁহার মত ব্রাহ্মণ নির্ব্বিরোধে থাকিবে, তিনি পৌরোহিত্য স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহেন; কিন্তু তিনি অসদ্ভাবও করেন না, অতএব তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করে। মন্ত্রী যন্ত্রণায় মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের মুখে ভরদ্বাজের নাম শুনিয়া উহাকে ভরদ্বাজের গুপ্ত-চর মনে করিয়া আরও যন্ত্রণা দিয়া উহার প্রাণবধ করিলেন, এবং কুড়িদল দস্যু সংগ্রহ করত পরদিন ভরদ্বাজ মুনির তপোবনের চারিদিকে আগুন

লাগাইয়া দিলেন। ভরদ্বাজ এবং তাঁহার কয়েক জন শিষ্য যোগবলে নিস্তার পাইলেন, কিন্তু অসংখ্যপ্রাণিসমেত সমস্ত বন এক দিনে মরুময় হইয়া উঠিল।

২

এ দিকে বাল্মীকি সরস্বতীর বীণা পাইয়া ও কবিতার আস্বাদ পাইয়া হিমালয়ের গভীর বনভূমি ত্যাগ করত লোকালয়ে আসিলেন, আসিয়া লোকালয়ের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লোকের দুঃখে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই নয়ন দিয়া জলধারা পড়িল। এই জলধারা কয় জনের পড়ে? কিন্তু এ জলধারা এক একটি অমূল্য ধন, এক এক বিন্দুতে শত অত্যাচার শমিত হয়। এই ভাবে রোদন ও গান করিতে করিতে বাল্মীকি সমস্ত হিন্দুস্থান পর্য্যটন করিলেন। কিরূপে নিবারণ করিবেন, জানেন না; কিন্তু আর থাকিতেও পারেন না। এক দিন এক নদীতীরে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন আর নয়নাসারে সলিলপ্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছেন, এমন সময়ে অতিদূরে ঘোরতর ভয়ঙ্কর শব্দ হইল;—প্রথম ডাকাইতির মত চীৎকার, তাহার পর আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল। বাল্মীকি আর থাকিতে পারিলেন না, দৌড়িয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দূরে গিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড নগরে লুঠ আরম্ভ হইয়াছে। বাল্মীকি বীণা লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দস্যুদলের নায়কের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমরা এ কর্ম্ম ছাড়।"

পরের জন্য কান্নার অনেক গুণ, তুমি নিজের জন্য কাঁদ, তোমার কান্না কেহ শুনিবে না, তুমি একবার পরের জন্য কাঁদ দেখি, সকলেই তোমার সঙ্গে কাঁদিবে; তাহাতে আবার যদি তোমার কান্নায় গভীর সহৃদয়তা থাকে, তাহা হইলে আরও কাঁদিবে। বাল্মীকির রোদনে ও গানে এবং তাঁহার ভাবে দস্যুদলপতি একটু গলিলেন, গলিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন যে, গায়ক বাল্মীকি। দস্যুদলপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ লুঠতরাজ বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন। তাঁহার নিজের দল থামিল। কিন্তু তাঁহার দলে যে ম্লেচ্ছ, যবন, বানর, ও রাক্ষস ছিল, তাহারা থামিবে কেন? দলপতি নিজে তাহাদিগকে থামাইতে গেলেন; কিন্তু গিয়া দেখেন, রাক্ষসেরা রাজপরিবারস্থ সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। দস্যুদলপতি তখনও তাহাদের থামিতে বলিলেন। একে রাক্ষস, তাহাতে মদ খাইয়া লুঠে উন্মত্ত হইয়াছে। তাঁহার কথা তাহারা কেন শুনিবে? তাহারা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন দলপতি বাহুবলে তাহাদিগকে নগরবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু বাহিরে গিয়াই তাহারা যবন, ম্লেচ্ছ ও বানরের সহিত মিলিত হইয়া ভীমপরাক্রমে দস্যুশিবির আক্রমণ করিল। দলপতি কষ্টে শিবিরমধ্যে আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন, বাল্মীকি বীণাহস্তে "ভাই ভাই" গাইতেছেন, সমস্ত দস্যুদল শুনিয়া কেবল কাঁদিতেছে,—নিঃশব্দে সংগ্র যোদ্ধা কাঁদিতেছে। নরহত্যা যাহাদের ব্যবসায়, জীবিকা, তাহারা সকলেই কাঁদিতেছে—অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে। সমবেত রাক্ষসাদি যে আক্রমণ করিতেছে, সে দিকে দৃক্‌পাতও নাই। রাক্ষসেরা ভীমপরাক্রমে আক্রমণ করিল, বাল্মীকির গান আরও উচ্চ হইল, দয়াভিক্ষায় পূর্ণ হইল; মানবদুঃখবর্ণনায় পূর্ণ হইল; হৃদয় মাতাইয়া তুলিল। রাক্ষসগণও ক্রমে মোহিত হইয়া শুনিতে লাগিল। ঋভুদিগের গান শুনিয়া বাল্মীকির যাহা হইয়াছিল, আজি সমস্ত দস্যুদলের সেই ভাব হইল। কি যবন, কি ম্লেচ্ছ, কি রাক্ষস, কি বানর সব মোহিত, দয়া সকল হৃদয়ে প্রবল হইল। গানে যেমন বলিতেছে "ভাই রে, যা করেছিস্ করেছিস্, আর করিস্ নে। দেখ দেখি, তোর যদি এমনি হয়, তুই কি করিস্? সকলেই মানুষ তো? তোর শরীর যেমন রক্তমাংসময়, সবারই তেমনি। মনে কর, যদি তোর লাগে, কত দরদ হয়; কিন্তু আপনার একটু লাগিলে অস্থির হ'স্, আর অন্যের মস্তকে তরবারি আঘাত করিস্। আহা! একবার মনে কর দেখি রে, তাদের তখন কি হয়। পরের ছেলের মাথা অনায়াসেই কাটিস, কিন্তু একবার মনে কর দেখি রে, তোর নিজের ছেলের ও রকম হ'লে কি হয়?" শ্রোতৃগণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল, "রক্ষা কর গুরো! উপায় বলিয়া দেও।" আবার গান চলিল, "সব ভাই ভাই বল, সবাই আপন, পর কেহ নাই, সবাই মানুষ, শীতে তোমার যেমন, সবারই তেমনি। গ্রীষ্মে তোমার ঘাম হয়, সবারই তেমনি। বর্ষার জলে তুমি ভিজ, সবাই সেইরূপ ভিজে। অতএব তোমায় আর আর মানুষে ভেদ কি? সবাই মিল, সবাই মিল, একতান একপ্রাণ হও, আমি তোমার, তুমি আমার হও। এক তৃণ সবার শয্যা, এক পৃথিবী সবার বাস, এক সূর্য্য সকলকে আলো দেয়, এক চাঁদে সকলের প্রাণ

জুড়ায়। তবে প্রাণ কেন তুই থাকে?" গানে যে কত বলিতেছে, কে বলিবে, কতক্ষণ যে গাইল, কে বলিবে? হীনকবি, বাল্মীকির গান কতক্ষণ ব্যাখ্যা করিবে?

গানের ফল এই হইল, সকলে দস্যু-বেশ ত্যাগ করিয়া বাল্মীকির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। দস্যুদলপতি গুহকচণ্ডাল পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে পা ছুঁইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "আমি দেবতাও নহি, অবতারও নহি, রাজাও নহি, তোমরাও যাহা, আমিও তাহাই। আমার পায়ে পড়িলে কি হইবে, দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, আর করিও না। জীবন পরিবর্ত্তন করিয়া সৎপথে জীবন কাটাও, সুখী হইবে।"

এই বলিয়া সকলকে নিবৃত্ত করিতেছেন, এমন সময়ে নগরবাসীদিগের হতাবশিষ্টগণ কেহ খঞ্জপদ, কেহ চক্ষুকাণা, কাহারও অগ্নিতে গাত্র দগ্ধ হইয়াছে, কেহ বৃদ্ধ পিতাকে কাঁকে করিয়া, কেহ অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় শিশু-সন্তান বুকে করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইল, রাজবংশ রাক্ষসে খাইয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং অরাজক রাজ্যে বাস করা অবিধেয় ভাবিয়া যাহার যেখানে আত্মীয় আছে, সে তথায় যাইতেছে। বাল্মীকি উহাদের দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাদের কীর্ত্তি দেখ;" বলিতে না বলিতে চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। সকলেই অনুতাপে পাপবোধে বিষণ্ণ ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। বাল্মীকি বলিলেন, "যাও, উহাদের ফিরাইয়া লইয়া এস।" সকলে উহাদের নিকট গেল, যাইবামাত্র নগরবাসিগণ আবার আর্ত্তনাদ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইল। ডাকাইতেরা তখন বুঝিতে পারিল, দুষ্টলোকে সত্যকথা বলিলেও লোকে বিশ্বাস করে না। তাহারা বাল্মীকিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিল; বাল্মীকি যে দস্যু নন, তাহা উহারা জানিবে কি প্রকারে?

যাহা হউক, বাল্মীকি উহাদিগকে ফিরাইলেন, এবারও আপন গানে। বাল্মীকি এমনি মিষ্ট তান ধরিয়া উহাদের নিকট এমনি করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, উহাদের চিত্ত দয়ার্দ্র হইল; উহারা বাল্মীকির কথায় নগরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু অরাজক দেশে বাস করা অন্যায়, এ জন্য উহারা বাল্মীকিকে রাজা হইতে অনুরোধ করিল। বাল্মীকি রাজা হইলেন না, কিন্তু তিনি দস্যুদলপতি গুহক চণ্ডালকে রাজা করিয়া দিলেন। গুহকের রাজ্যে সমবেত সমস্ত ম্লেচ্ছ, যবন, বানর, রাক্ষস একত্র সুখে বাস করিতে লাগিল, আর দস্যুবৃত্তির নামও করিত না। পরদেশ লুণ্ঠনের ইচ্ছা দূরীভূত হইল কিন্তু অন্য কেহ অত্যাচার করিতে আসিলে, উহারা পরাক্রমসহকারে সে উপদ্রব নিবারণ করিত; সুতরাং পৃথিবীমধ্যে একটি শান্তিময় রাজ্য স্থাপিত হইল। কিন্তু এ রাজ্য যে স্থায়ী হইবে, এত দস্যু যে এক হইয়া থাকিবে, বাল্মীকির মনে বিশ্বাস হইল না। বাল্মীকি প্রতিমাসে এক একবার গুহকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, আর অপর সময় আপন হৃদয়ের আদেশমত গান করিয়া পৃথিবী শুদ্ধ বেড়াইয়া বেড়াইতেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

১

বিশ্বামিত্র অপ্রতিহতপ্রভাবে ও অপত্যনির্ব্বিশেষে নিজ নূতন সৃষ্টি পালন করিতে লাগিলেন। যাহাতে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, যাহাতে লোকে জীবনকাল পরম সুখে কাটাইয়া যাইতে পারে, একটুকুও কষ্ট না হয়, তাহার জন্য তাঁহার প্রাণপণ যত্ন, কিন্তু তাঁহার নিজের কি? যত দিন সৃষ্টি-উৎসাহে ছিলেন, নিজের কথা মনে হয় নাই। নিজে তিনি সৃষ্টির ঈশ্বর। যখন মানুষের সঙ্গ না পায়, যখন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে না পায়, তখন সামান্য মানুষ ক্ষেপিয়া যায়। এই প্রকাণ্ড পুরুষ, প্রধান মহারাজা, বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ পদে আরোহণ করিয়া আপনার এককত্ব বুঝিতে পারিলেন। সব হইল, কিন্তু সুখ কৈ? নিজের কি হইল? তিনি নিজ সৃষ্টিস্থ মানুষের সঙ্গে মিশিলেন; কিন্তু যাহাদের সঙ্গে চিরদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন, যাহারা তাঁহার নিজসুখদুঃখ বুঝে, তাহারা কৈ? ইহারা ত সুখী, বিশ্বামিত্র ত মানুষ। দুঃখ-ভোগ ত তাঁহার অদৃষ্টলিপি। তিনি দুঃখিত হইলে, উন্মনা হইলে, তাঁহার মুখপানে তাকায়, এমন লোক কৈ? তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন যায়, শেষ তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, কতকগুলি পৃথিবীর লোক আনিয়া রাখিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি কান্যকুব্জ নগরটি উঠাইয়া আনিবার জন্য প্রকাণ্ড নগর নির্ম্মাণ করিলেন। এ সৃষ্টিতে ত শত্রু-ভয় নাই, নগরে গড় প্রাচীর কিছুই

রহিল না। সুরম্য হর্ম্ম্যে, প্রকাণ্ড প্রাসাদে নগর পরিপূর্ণ হইল। তখন বিশ্বামিত্র পৃথিবীতে উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জ নগরে গেলেন। মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরিবারগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, দেখিলেন, এই সমস্ত আপন লোকের মধ্যে যত সুখ, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে মানুষ যদি ঈশ্বর হয়, তথাপি একাকী তাহার তত সুখ হয় না। একবার ইচ্ছা হইল, পৃথিবীতে থাকি, আবার সেখানকার কর্তৃত্ব ও এখানকার কর্তৃত্ব ও এখানকার ব্রাহ্মণদিগের কথা মনে পড়িল, তিনি স্বজনবর্গকে আপন সৃষ্টিতে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। সমস্ত কান্যকুব্জ নগর শুদ্ধ উঠিতে লাগিল। আস্তে আস্তে উঠিতে লাগিল, পৃথিবীর লোক আশ্চর্য্য হইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। উড্ডীয়মান নগরমধ্যে নানারূপ সুন্দর বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সকলে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই তাহাদিগের সুখ দুঃখরূপে পরিণত হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিশ্বাস বহে না, গলা ফুলিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র পৃথিবী-বায়ু আকর্ষণ করিলেন। তাহা আসিল না। বিশ্বামিত্র মহা বিভ্রাটে পড়িলেন। পৃথিবী-বায়ু সৃষ্টি করিতে গেলেন, তাহা হইল না। ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন, ব্রহ্মা আসিলে তিনি বলিলেন, "তুমি এখনও আমার সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহ, আমি এই আপন স্বজন সঙ্গে নিজ সৃষ্টিতে যাইব, তুমি বাধা দিতেছ কেন?" ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি যে তপের বলে সৃষ্টি করিয়াছ, সে কেবল তাহাতেই ক্ষয় হইয়াছে, তোমার আর তপোবল নাই যে, তুমি কোন নূতন কাজ কর। নূতন কাজ করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টি-নাশ হইবে, আমি তোমায় বলি, তুমি এখনও স্থির হও, বুঝিয়া চল।" "পাষণ্ড, যত বড় মুখ, তত বড় কথা, আমায় বল কি না, বুঝিয়া চল, এই দেখ, নিজ পৃথিবী হইতে বায়ু আনিয়া ইহাদিগকে লইয়া যাইব" বলিয়া বিশ্বামিত্র বেগে প্রস্থান করিলেন। কান্যকুব্জ তথা হইতে বেগে পড়িতে লাগিল। ব্রহ্মা দেখিলেন, তাহা হইলে নিজ সৃষ্টিই নাশ হইবে। নিজে ধীরে ধীরে তাহাকে নামাইয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের অনুচরবর্গ ব্রাহ্মণদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। রাক্ষসদিগের সহিত যোগ দিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিল।

২

বিশ্বামিত্র আপন পৃথিবীর বায়ু শূন্যপথে চালাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; পারিলেন না। তখন ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মার স্মরণ করিলেন। আবার ব্রহ্মা আসিলে, বলিলেন, "আমার বায়ু শূন্যপথে যাইবার পথ ছাড়িয়া দাও।" ব্রহ্মা বলিলেন, "সে তপোবল তোমার নাই, আর তোমার তপোবল না থাকিলে আমার দিবারও ক্ষমতা নাই।" বিশ্বামিত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে কারাগারে রুদ্ধ করিতে গেলেন; পারিলেন না। তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া গদা তুলিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "যে ভাবে আছ, সেই ভাবেই থাক, নূতন কার্য্য করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টিনাশ হইবে।" বিশ্বামিত্র গালি দিয়া ব্রহ্মাকে দূর করিয়া দিলেন। পরে গদা তুলিলেন। গদা একবার হাত হইতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার মহাবেগে গদা উর্দ্ধে উত্থিত হইল; ওদিকেও তাঁহার পৃথিবীতে ফাট ধরিল। তিনি গদা ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা, ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া গদা প্রহার করেন। এই জন্য লক্ষ্য করিতেছেন, আর গদা ঘুরাইতেছেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি সকল আরও বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল, ক্রমে গদা যত ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি নীহারিকারূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িলেন, আর তাঁহার সংগৃহীত নীহারিকাসমূহ যে যে দিক হইতে আসিয়াছিল, ভীমবেগে সেই সেই দিকে চলিয়া গেল। অনন্ত-গর্ভ গহ্বর যেমন ক্ষীণালোকময় ছিল, তেমনি ক্ষীণালোকময়ই রহিল। আর নীহারিকাকুল যে সকল নক্ষত্রাদি টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে নূতন পৃথিবী 'জলের বিম্ব জলের' ন্যায় শূন্যে মিশাইয়া গেল। যে ঈশানকোণ পৃথিবী হইতে নক্ষত্ররাশিতে ভরা ভরা দেখা যাইত, তাহা আবার শূন্যময় হইয়া গেল। বিশ্বামিত্র-পৃথিবীতে নূতন মনুষ্যের যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তাহা আর রহিল না। মানুষও সব আবার অগঠিত-পদার্থরাশিমধ্যে বিলীন হইল। সে সুন্দর পাহাড়-পর্ব্বত-সৌধপ্রাকাররাজপথসমবেত সমস্ত পৃথিবী আবার অগঠিতপদার্থরাশিরূপে পরিণত হইল। যে সমাজবন্ধনে অত্যাচার ছিল না, ছোট বড় ছিল না, যাহাতে কেবল প্রেম আর ঐক্য আর সাম্য, তাহাও অনন্তগর্ভে নিহিত হইল।

৩

আর বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িয়াই মূর্চ্ছিত। কোথায়? স্থান আছে কি? শূন্যমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার নিজ পৃথিবীর আকর্ষণ এতক্ষণ ছিল, এখন তাঁহার মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড আমাদের পৃথিবী আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বড় ভালবাসিতেন, এই জন্যই বারংবার তিরস্কৃত হইয়াও উঁহার নিকট বারংবার যাইতেন এবং উঁহাকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য বারবার উদ্যোগও করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি দেখিলেন, বায়ু অভাবে অচিরাৎ বিশ্বামিত্রের প্রাণনাশ হয়। এজন্য নিজে পৃথিবী-বায়ু আনিয়া তাঁহার নিকট ধরিলেন। বিশ্বামিত্রের প্রাণবিয়োগ হইল না, কিন্তু তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্য পথে মূর্চ্ছিতভাবে পড়িতে লাগিলেন। মুখে রক্তবমন হইতে লাগিল। শরীর ফুলিয়া উঠিল। আর তিনি পড়িতে লাগিলেন, কে জানে, কত কাল ধরিয়া তিনি পড়িয়াছিলেন।

সপ্তম খণ্ড

১

আজি পৃথিবীতে মহাপ্রলয় উপস্থিত। আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া প্রাণী থাকিবে; আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই ব্রাহ্মণাদি-জাতি থাকিবে; আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই সৃষ্টি-রক্ষা হইবে।

আজি কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞ করিবেন, তথায় সমস্ত ভূচর, খেচর, উভচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিবৃন্দ আহূত হইয়াছে। যজ্ঞ সম্বৎসরব্যাপী। কৌশাম্বীর চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। কিন্তু মন কাহারও স্থির নহে। এরূপ অগাধ জনসমুদ্রমধ্যে যখন চারিদিকে এরূপ শক্রতা ও বৈরিতা, তখন একটুতেই প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া উঠিতে পারে। বাস্তবিক বাধিয়াও উঠিল। কৌশাম্বীনাথ সূর্য্যবংশীয় নরপতি ব্রাহ্মণপক্ষপাতী। তিনি বশিষ্ঠকে আপন পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। অমনি বিশ্বামিত্রের দল ও পরশুরামের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী খরদূষণ ও বালী রাজাকে সঙ্গী পাইলেন। তিনি অনেকদিবসাবধি বহুসংখ্যক প্রবলপরাক্রম দস্যুদলপতিকে অর্থ দ্বারা বশ করিয়াছিলেন। তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। বশিষ্ঠপক্ষীয় ব্রাহ্মণ, এবং অযোধ্যা ও মিথিলার রাজগণ যজ্ঞরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। বশিষ্ঠের আশ্রিত পারদ-হূনাদি জাতিও তাঁহার রক্ষার্থ অস্ত্র ধরিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত রহিলেন। এরূপ স্থলে শান্তিরাজ্যপতি গুহকও নিজ দল সঙ্গে উপস্থিত আছেন। তাঁহার প্রথম চেষ্টা, মিটাইয়া দিবেন, শেষ অন্ততঃ যুদ্ধ রহিত করিবেন; না হয়, অন্যায়পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। আর বাল্মীকি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহই তাঁহাকে মানিতেছে না। বাল্মীকির কান্নায় পাষাণ-হৃদয়ও দ্রব হয়। কিন্তু যাহারা রাজনীতিজ্ঞ, যাহারা উচ্চতর জাতি, যাহারা সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করে, যাহারা আপন প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য আপন প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রেরও গলায় ছুরি দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের মন পাষাণ অপেক্ষাও কঠিনতর উপাদানে নির্ম্মিত। মানুষ লইয়া যাহারা খেলা করে, আপন সামান্য কার্য্যসাধনার্থ যাহারা লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্ব্বনাশ, এমন কি, প্রাণনাশ করিতে এতটুকু সঙ্কোচ করে না, তাহাদের কি কান্নায় মন গলে? গলুক আর নাই গলুক, বাল্মীকির বিশ্রাম নাই। তিনি একবার বশিষ্ঠের নিকট যাইতেছেন, একবার খরদূষণের হাত ধরিতেছেন। সেনাগণ, সমবেত লোকগণ তাঁহার কান্নায় অধীর হইতেছে, কিন্তু বড়লোক রাজনীতিজ্ঞ দয়া-মায়া একেবারে শূন্য, দৃক্‌পাতও করিতেছেন না। শেষ বশিষ্ঠ হুকুম দিলেন, বেদীতে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত কর। অধ্বর্য্যুগণ বেদীতে আরোহণ করিলেন। বাল্মীকির ভরসা নির্ম্মূল হইল। তিনি কাঁদিয়া গুহকের সম্মুখে গড়াইয়া পড়িলেন। গুহক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। সকলেই জানে, যজ্ঞাগ্নি জ্বলিলেই রক্তস্রোতঃ চলিতে আরম্ভ করিবে। বেদীতে ব্রাহ্মণ উঠিয়াছে শুনিয়াই বিরোধী দল সজ্জিত হইয়া বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। যাজ্ঞিকদল তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবার জন্য অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল। গুহক ঠিক সম্মুখে যে, প্রয়োজন হইলে একবারে মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িতে পারেন। বাল্মীকি বেদীতে উঠিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অগ্নি কাড়িয়া লইলেন; শেষে নিজে কুণ্ডের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে টানিয়া বেদীর বাহির করিয়া দিল। তিনি আর আসিতে না পারেন, এজন্য তিন শত সদস্য তাঁহার হস্তপদাদি বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। একটা মহাগোলযোগ বাধিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা আবার অগ্নি জ্বালিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু এ কি হইল, অকস্মাৎ কোথা হইতে কয়েক বিন্দু জল ব্রাহ্মণদিগের

গায়ে পড়িল? উপরে মেঘ নাই, অথচ জল পড়িল। জল নিশ্চয়ই অশুচি হইবে, সিদ্ধান্ত করিয়া, ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে অশুচি বিবেচনা করিয়া, স্নানাদি করিয়া শুচি হইবার জন্য প্রস্থান করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মহাপ্রলয় বন্ধ রহিল। সকলেরই মনে কেমন একটা অলৌকিক ভাবের উদয় হইল। কি হইবে, ভয়ে সকলেই ভীত হইল, সকলেই জানিল, শীঘ্রই যাহা হউক একটা ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইবে।

২

ঘুরিতে ঘুরিতে বিশ্বামিত্র পড়িতেছেন। ক্রমে ব্রহ্মার কৌশলে সেই অবস্থায় তাঁহার জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে তাঁহার মনের ভাব কি হইল, মানুষে কি লিখিবে। একবার ভাবিলেন, আমি কোথায়? চক্ষু মেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন, পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত হইল; আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। একবার ভাবিলেন, কোথায় যাইতেছি? একবার মনে করিলেন, বুঝি নরক নিকটে। ভয়ে ভীত হইয়া আবার অজ্ঞান হইলেন।

একবার ভাবিলেন, আমার সৃষ্টি কোথায়? আবার অজ্ঞান। আবার ভাবিলেন, তাহা ত গিয়াছে। তখন ভাবিলেন, যদি পৃথিবীতে থাকিতাম,—আবার অজ্ঞান। কেন দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম,—কেন বড় হইতে গিয়াছিলাম—কেন তপ করিতে গিয়াছিলাম—কেন দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছিলাম—কেন সব হারাইলাম। এখন কোথায় যাইতেছি, জানি না। ফিরিবার শক্তি নাই। চাহিবার শক্তি নাই। ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দরবিগলিত অশ্রুধারা ব্রাহ্মণদিগের গায়ে পড়িল। রোদনে শরীর আরও ক্ষীণ হইল। আবার অজ্ঞান হইলেন। অজ্ঞান হইয়া বোধ হইল, ঋভুগণ গান করিতেছে, আর সব ভাই ভাই গাইতেছে, বলিতেছে মানুষ—যদি মানুষের উপর কর্ত্তা হইতে না চাহিত, তবে কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। রাজা যদি আপন কাজ করিত, কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। এই গান শুনিতেছেন আর মনের ভিতরতলায় যে মন আছে, সেখানে দুরাকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিব না প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এমন সময় চৈতন্য হইল। তখন চেতন অবস্থায় কেবল পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আবার অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন।

৩

ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অগ্নি জ্বালিবার জন্য যে কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড মনুষ্যাকার কি একটা পদার্থ উপর হইতে পড়িতেছে। সকলেই সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে সকলের আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। সমস্ত লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া বাক্‌শক্তি-শূন্য হইয়া রহিল। যাহারা বাল্মীকিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বাল্মীকি দৌড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড পুরুষ তথায় পড়িয়া আছেন। বাল্মীকি অলৌকিক শক্তিবলে জানিতে পারিলেন, কুণ্ডস্থ মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড বিশ্বামিত্র; তখন তাঁহার ক্রন্দনের অবধি রহিল না। তাঁহার বীণা একেবারে অতি করুণস্বরে গান ধরিল। নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, তোরা দেখ্, তোরা তুচ্ছ মানব, তোরা সামান্য—দেখ দেখি, যে বিশ্বামিত্র পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে, যে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মারও উপর হইয়াছিল, দেখ্ রে, নিয়তির বলে তাহার কি হইয়াছে। দেখ একবার সেই বিশাল বীর—সেই প্রকাণ্ড তপস্বী—সেই অদ্ভুত মনুষ্য—তাহার কি দশা হইয়াছে। দেখ দেখি রে? তোরা সামান্য সুখে দুঃখে পাগল। দেখ, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি আজি ধ্বংস হইয়াছে, তাহার ব্রহ্মত্ব গিয়াছে, তাহার যা ছিল, সে যে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছিল, এখন বুঝি তাহাও নাই, এখন বুঝি তাহার জীবনও নাই। ভাব দেখি, বিশ্বামিত্রের কি কষ্ট! যখন বিশ্বামিত্র—তাহারই এই দশা, তখন ভাব দেখি, তোদের কি হইয়াছে। তখন মনে কর্ দেখি, তোদের কি হইবে। ঐ দেখ, ব্রহ্মা আজি বিশ্বামিত্রের জন্য কাঁদিয়া আকুল। যে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের হাতে এত লাঞ্ছনা পাইয়াছে, আজি সেও কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। অতএব তোরা ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ কর্, তোরা স্থির হয়ে থাক্। জীবন দিনকত বৈ নয়।

সকলেই নীরব হইয়া বাল্মীকির সকরুণ বীণা-ঝঙ্কার শুনিতে লাগিল। সকলের মন গলিয়া গেল। সকলেরই মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল; অস্ত্র-শস্ত্র, বিবাদ-বচসা ত্যাগ করিল। ক্রমে তাহাদের মন ফিরিল।

এ দিকে ক্রমে বিশ্বামিত্রের সংজ্ঞা হইতে লাগিল। বীণাঝঙ্কার দূরস্থ সঙ্গীত-ধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণে লাগিতে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত, কত ভীষণ স্বপ্ন

দেখিতেছিলেন। ক্রমে শরীর শীতল হইতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিশ্বামিত্র চক্ষু মেলিলেন। বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। গানের মৃদুমন্দ তিরস্কার ও দয়া-ভিক্ষা বিশ্বামিত্রের মনে শরবৎ বিঁধিতে লাগিল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই সম্মুখে দেখিলেন ব্রহ্মা। ক্রমে সমবেত জনগণমধ্যে ব্রহ্মমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। সঙ্গে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও আবির্ভূত হইলেন। নয়ন-জলে শরীর স্নাত হইতেছে। তিনি যোড়করে ব্রহ্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কোলে করিয়া লইলেন। তাঁহার মুখচুম্বন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আজি তুমি ব্রাহ্মণ হইলে।" বিশ্বামিত্র আবার কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন, বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার দয়ায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেব, আমি কোথায় ?" ব্রহ্মা বলিলেন, "পৃথিবীতে। তোমার যন্ত্রণার আমি অবসান করিয়া দিতেছি" বলিয়া নিজ কমণ্ডলুস্থিত স্বর্গীয় বারিবর্ষণে বিশ্বামিত্রের শরীরে বল প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিলেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রোদন করিতেছে। আর এক জন গায়ক গান করিতেছে। বশিষ্ঠ দৌড়িয়া আসিয়া বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। আজি বিশ্বামিত্রের দুর্দ্দিনে তাঁহার দয়া হইয়াছে। আর সে ভাব নাই। যে ভাবে এক দিন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ হইতে দেন নাই, সে ভাব আর নাই। কঠিনতা গলিয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং স্বহস্তে উপবীত লইয়া মন্ত্রপূত করত বিশ্বামিত্রের গলে দিলেন। বলিলেন, "ভাই রে, আজি তোয় আমায় এক হইলাম। আজি তুই বামণ হইলি। আয়, দুজনে কোলাকুলি করি।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "দেব, আমি না বুঝিয়া সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, অনেক কটূক্তি করিয়াছি। আজি আমার বিপদে তোমার চক্ষুঃ দিয়া জল পড়িতেছে। তোমার দুঃখে কিন্তু আমি এক দিনও কাঁদি নাই। আজি তোমার করুণা দেখিয়া আমার নয়ন-জল প্রথম পড়িল। জানিলাম, ব্রাহ্মণ "বড়ই দয়ালু।" আর ব্রহ্মন্, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমায় কত কটূক্তিই বলিয়াছি, তোমায় কারাগারে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম। আজি আমার বিপদে তুমি আমায় প্রাণ দিলে। তোমার করুণা অপার।" ব্রহ্মা বলিলেন, "বৎস, তোমার ন্যায় প্রকাণ্ড পুরুষকে ক্ষমা না করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার ক্ষমাগুণ বৃথামাত্র।"

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দেখাদেখি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সব যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করিয়া কোলাকুলি করিতে আরম্ভ করিল। সকলে আপনার মনোগত দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। গুহক চণ্ডাল ভয়ানক সমর আশঙ্কা করিতেছিল, তাহার এই শুভ পরিণাম দেখিয়া আহ্লাদে উর্দ্ধনৃত্য করিতে লাগিল। কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞের এই পরিণাম দেখিয়া প্রথমে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন; পরে দেখিয়া শুনিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া ভাণ্ডার-স্থিত যজ্ঞার্থ আহৃত অগাধ সামগ্রী বিশ্বামিত্রের উপনয়ন উপলক্ষে অকাতরে দান করিতে লাগিলেন। আর বাল্মীকি আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন, ভাই ভাই গাইতেছেন, আর যাহাকে পাইতেছেন, গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন,—স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর কিছু জ্ঞান নাই। শেষ নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে আসিয়া ব্রহ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা বলিয়া চিনিতে পারিয়া একটু অপ্রতিভ হইবার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বাল্মীকি! আজি তোমারই জয়।" বশিষ্ঠ দূর হইতে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বাল্মীকি! আজি তোমারই জয়।" বিশ্বামিত্র আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আজি তোমারই জয়।" চারিদিক হইতে "জয় বাল্মীকির জয়" ধ্বনি উঠিতে লাগিল। গুহকের লোক চীৎকার করিয়া উঠিল—"জয় বাল্মীকির জয়। জয় বাল্মীকির জয়।" দিগন্ত হইতে প্রতিধ্বনি আসিল, "জয় বাল্মীকির জয়।"

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল, সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে চলিয়া গেল। মনে মনে সবারই ভরসা রহিল যে, অরাজক শেষ হইল। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াই রাজ্য ত্যাগ করিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কনোজরাজ্য গ্রহণ করিল।

ব্রহ্মা যাইবার সময় ঋষিত্রয়কে বলিয়া গেলেন, "সর্ব্বলোকমধ্যে ঐক্যস্থাপনমানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ।" বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম খণ্ড

১

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি তিন জনে রাম-অবতারের ষাটিহাজার বৎসর পূর্ব্বে রাম কি করিবেন, তাহার যুক্তি করিতে বসিলেন। এ ত শুদ্ধ রামায়ণের রচনাকৌশলনির্ণয় নহে, ইহা জগতীয় জাতিগণের মধ্যে ভাই ভাই সংস্থাপনের যুক্তি; বিশ্বামিত্র নানাবিধ দশাবিপর্য্যয়ের পর মনুষ্যশক্তির ক্ষীণতা বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু ঋভুদত্ত নববৈদ্যুতীবলে তাঁহার যে ভাই ভাই করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি প্রবলই আছে। কৌশাম্বীক্ষেত্রের ব্যাপারে বশিষ্ঠের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, বুদ্ধিবলে, নরজাতির কথা দূরে থাকুক, দুই জন মনুষ্যেরও ঐক্যসম্পাদন হইতে পারে না। কৌশাম্বীক্ষেত্রে বাল্মীকি যেরূপ বিজয় লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের উভয়েরই জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, হৃদয়ই ঐক্যবন্ধনের অমোঘ নিদান। তাঁহারা ইহাও জানিয়াছিলেন যে, এই ঐক্যবন্ধনে বাল্মীকি ব্যতীত আর কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। সুতরাং এই বিষয়ে প্রাণপণে বাল্মীকির সহায়তা করাই তাঁহাদের নিজ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। অতএব বাল্মীকির হৃদয়, বশিষ্ঠের বুদ্ধি ও বিশ্বামিত্রের রাজনীতিজ্ঞতা একত্র হইয়া জগতের ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল।

সকলে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, যদিও আপাততঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে মিল হইয়া গেল, যদিও বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মিত্রতা হওয়ায়, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়ায়, এ উভয় জাতির আর বিরোধ হইবার সম্ভাবনা রহিল না, তথাপি অনেকেরই মনে এই সকল ঘটনার স্মৃতি জাগরূক থাকিবে। যদিও প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহ হইবে না, তথাপি মনোমিল না হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য স্থির হইল, রাম প্রথম আসিয়া এই দুই জাতি একত্র করিবেন। তিনি অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া মিথিলারাজের কন্যা বিবাহ করিবেন ও গুহকচণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিবেন; পরশুরামের নাশ করিবেন। নাশে বাল্মীকি একান্ত অসম্মত। এ জন্য স্থির হইল, পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিবেন। এইরূপ আর্য্যসমাজ একত্র করিয়া অনার্য্যসমাজ একত্র করিতে যাইবেন। বানরদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক দলের সহিত মিলিয়া অধার্ম্মিক দলের বধ করিবেন। আবার এত প্রাণিহিংসায় বাল্মীকি অসম্মত হইলেন, শেষ শুদ্ধ বালীমাত্র বধ করিবেন, স্থির হইল। তাহার পর অত্যাচারকারী রাক্ষসদিগের ধ্বংস করিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণকে রাজা করিবেন। এত রাক্ষসবধেও বাল্মীকি আপত্তি করিলেন, কিন্তু সে আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। কারণ, রাক্ষসেরা সকলেই অত্যাচারী আর উহাদের সংশোধনও অসম্ভব। তাহার পর রামচন্দ্র নিজভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে পারদাদি রাজ্যেও শান্তিস্থাপন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন। স্থির হইলে, বাল্মীকির উপর এই সমস্ত বৃত্তান্ত লইয়া নবরসগ্রথিত মহাকাব্য রচনার ভার হইল।

ভার দিবার সময় বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম যেন ধার্ম্মিকচূড়ামণি হয়েন। তাঁহার শরীরে যেন পাপের লেশমাত্র থাকে না।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, শুদ্ধ তাহা হইলেই হইবে না, রাম ক্ষত্রিয় হইবেন, রাম রাজা হইবেন, সুতরাং রামের বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতা বিশেষরূপ প্রকাশিত থাকা আবশ্যক।

বাল্মীকি বলিলেন, "ব্রহ্মর্ষিগণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি রামকে ধার্ম্মিকও করিব না, বীরও করিব না; রাজনীতিজ্ঞও করিব না। স্বয়ং নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। তাঁহার চরিত্রবর্ণনাক্রমে আমি আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ দম্পতী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা, আদর্শ শাসনপ্রণালী, আদর্শ ভৃত্য ও আদর্শ শত্রু দেখাইব। আপনারা আশীর্ব্বাদ করিলে আমি এই সুযোগে এমন একটি মনুষ্য-চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বকালীন মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।"

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র যুগপৎ কহিয়া উঠিলেন,—তথাস্তু। তোমার রাম যেন চিরদিন নরজাতির আদর্শ-স্বরূপ হইয়া থাকেন।

ভার প্রাপ্ত হইয়া বাল্মীকি অসাধারণ প্রতিভাবলে রামায়ণ রচনা করিয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে শুনাইলেন। শুনিয়া তাঁহারা বাল্মীকিকে শতমুখে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

২

ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি কর্তৃক উদ্ভাবিত নিয়মানুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের প্রতিপালন

করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় শান্তিস্থাপন করিলেন। তাঁহার করতলচ্ছায়ায় পৃথিবী ফলশস্যবতী, ধনধান্যপরিপূর্ণা হইতে লাগিল। যে সকল স্থান বিজন অরণ্য ছিল, তাহা সমৃদ্ধ নগররূপে পরিণত হইতে লাগিল। নদী সকল বাণিজ্য ও বিলাসপোতে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দস্যুতস্করাদির নাম লোপ হইতে লাগিল। মারীভয়, সংক্রামকপীড়া, অকালমরণ প্রভৃতি লোকে বিস্মৃত হইয়া গেল। নৃত্য-বাদিত্রাদি চতুঃষষ্টি কলাচর্চ্চায় লোকে সভ্যভব্য হইতে লাগিল। নানাবিধ শিল্পকার্য্যের উন্নতি হইতে লাগিল। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ কর, দেখিবে—অভ্রভেদী সৌধশিখরে সৌরকর প্রতিফলিত হইতেছে। যে দিকে গমন কর, শ্রুতিমধুর গীতধ্বনি, বাদ্যধ্বনি শ্রবণগোচর হইবে। সর্ব্বত্রই যূথি, জাতি, মল্লিকা, মালতী, বক, কুরুবক, নবমল্লিকা, কাষ্ঠমল্লিকা, নাগকেশর, গন্ধরাজ, বকুলাদি পরিশোভিত উদ্যানরাজি ও ইন্দীবর, কোকনদ, পুণ্ডরীক, কুমুদ, কহ্লার-সমূহ সুবাসিত সরসীসমূহে নাসিকার তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। সর্ব্বদা সুবৃষ্টিতে দীনদরিদ্র জনগণেরও দুঃখ বা কষ্ট কিছুমাত্র রহিল না। লোকসংখ্যা চারিদিক হইতে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বশিষ্ঠের সুশিক্ষায় লোকের মন উন্নত হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্রের রাজনীতিচাতুর্য্যে ও ব্যবস্থাপ্রণয়নপারিপাট্যে দেশে বিবাদকলহাদি একেবারে শেষ হইয়া গেল। বাল্মীকিরও আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার বীণায় বিরতি রহিল না। তিনি সমস্ত পৃথিবীময় প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার বীণার গুণ-গুণ ঝঙ্কার দূর হইতে শ্রবণ করিয়াই নগরবাসীরা দলে দলে শব্দ লক্ষ্য করিয়া বহির্গত হয়। তাঁহার গানের ভাব ও স্বর ক্রমেই গাঢ়, গাঢ়তর, গাঢ়তম হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র এক স্বর—ভাই ভাই ভাই, আমরা সবাই ভাই।

কিন্তু এখনও বাল্মীকির মন স্পষ্ট হয় নাই। পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্য সংস্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যথার্থ ভ্রাতৃভাব জন্মিয়াছে কি না, সে বিষয়ে তাঁহার দারুণ সন্দেহ।

৩

এইরূপে সুখস্বচ্ছন্দে বৎসর কাটিতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর, তাহার পর বৎসর, অযুত বৎসর কাটিয়া গেল। রামচন্দ্রের বৈকুণ্ঠ-প্রতিগমনের কাল উপস্থিত। লক্ষ্মণবর্জ্জন করিয়া, শোকে সন্তাপে রামচন্দ্র সরযূজলে ঝাঁপ দিবেন সংকল্প করিয়া সরযূর বামতীরে প্রকাণ্ড সভা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, চণ্ডাল, রাক্ষস ও বানরাদি সকলে সভা পরিপূর্ণ। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আজি রামায়ণ প্রচারের জন্য বাল্মীকিকে অনুরোধ করিলেন। তখন বাল্মীকি সুশিক্ষিত শিষ্য কুশ ও লব সমভিব্যাহারে করুণবীণাঝঙ্কারে গান আরম্ভ করিলেন।

বাল্মীকি বীণা বাজাইতেছেন। কুশ-লব গাইতেছে। শ্রোতৃবর্গ একেবারে জ্ঞানান্তরশূন্য হইয়া উঠিতেছে। গানে কাঁদিলে কাঁদিতেছে, গানে হাসিলে হাসিতেছে, আনন্দিত হইলে আনন্দিত হইতেছে। পূর্ব্বলীলা স্মরণ হওয়ায় রামচন্দ্রও কখন হর্ষিত, কখন দুঃখিত, কখন রোরুদ্যমান হইতেছেন। আবার পূর্ব্বাবস্থা নবীভূত হইয়া শোক ও মোহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বাল্মীকির আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

এমন সময়ে সহসা ছায়াপথদ্বার দ্বিধা বিভক্ত হইল। আর বাল্মীকির মস্তকোপরি অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঋভুগণ কুশ-লবের সহিত একস্বরে একতানে রামায়ণ গান করিতে করিতে নামিতেছেন। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের গান ও স্বর আরও মিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহাদের মুখে গান শ্রবণ করিয়া প্রজাপুঞ্জ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ এক দিন আশা করিয়াছিলেন, একবার ঋভুগণের সহিত সমস্বরে গান গান। আজি আনন্দে তাঁহাদের কণ্ঠভেদ করিয়া রামায়ণ বাহির হইতে লাগিল। ঋভুগণ, মনুষ্যগণ, ঋষিগণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া দুই হাত তুলিয়া গাইতেছেন, রামচন্দ্রও হিতাহিত-বিবেকশূন্য হইয়া সেই গানে ও নৃত্যে যোগ দিলেন। যদি ব্রহ্মা সেই সময়ে উপস্থিত না হইতেন, বোধ হয়, এ নৃত্যের বিরাম হইত না।

৪

ব্রহ্মা আসিয়াও একবার এই প্রেমদশার উন্মত্ত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নররূপী ভূতভাবনের ভাবে তিনি যে চঞ্চল হইবেন, আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তিনি কষ্টে সে চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়া

রামচন্দ্রকে বৈকুণ্ঠের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র প্রজাবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া, সরযূর জলে ঝাঁপ দিয়া পার্থিব দেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণও তনুত্যাগ করিয়া পূর্ণব্রহ্মে তিরোহিত হইলেন। প্রাচীনবয়া প্রজাবৃন্দ তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়া ঋভুদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ঋভুগণ মহা সমাদরে গাঢ় আলিঙ্গন করত নূতন ঋভুদিগের সম্বর্দ্ধনা করিলেন ও পরম প্রেমভরে আবার সেই গান ধরিলেন—যে গানে একদিন ঋষিত্রয়ের মনে বৈদ্যুতী সঞ্চালন করিয়াছিলেন।

৫

ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে পার্থিব দেহত্যাগ করিয়া সপ্তর্ষিগণের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বশিষ্ঠ সরযূজলে মৃন্ময় দেহত্যাগ করতঃ জ্যোতির্ময় দেহ ধারণ করিয়া প্রত্যহ জগতের কার্য্যপর্য্যালোচনার্থ উদয় হইতে লাগিলেন।

৬

বিশ্বামিত্রও দেহ ত্যাগ করিয়া ঋভুদিগের এক জন প্রধান নেতা হইলেন। এখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে, পার্থিব সাম্রাজ্য অসার, হৃদয়োন্নতিই সারাৎসার।

বাল্মীকিকে স্বর্গযাত্রার জন্য অনুরোধ করিলে, বাল্মীকি বারিধারাপ্লুতনয়নে ব্রহ্মার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবাদিদেব! আমি অতি পাপিষ্ঠ, আমি অতি নরাধম; আমি আপনার কথা রাখিতে পারিলাম না। আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, আজিও ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই প্রভু! আমি পাপপঙ্কে মগ্ন, স্বর্গে যাইয়া কি করিব, দয়াময়! আমি মানুষের যে অপকার করিয়াছি, সব মানুষকে সমান সুখী করিতে না পারিলে আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া হইবে, দীননাথ! এখনও মানুষের অভিমান আছে। এখনও আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র বলিয়া অভিমান আছে। ইহাতে মানুষ সুখী হইল কৈ, ব্রহ্মন্। যখন এই অভিমান যাইবে, তখন সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ স্বর্গে যাইবে। তখন আপনার কথা রাখিব, দয়াময়! আমায় এবার ক্ষমা করুন, দয়াল প্রভু"—

বলিয়া বাল্মীকি রোদন করিতে লাগিলেন। বাল্মীকির ভাবে ব্রহ্মার চিত্ত অস্থির হইল। এ দিকে বাল্মীকির মস্তকে ঋভুগণ-হস্তমুক্ত পুষ্পসমূহ পড়িতে লাগিল।

৮

ব্রহ্মা বলিলেন, "নভোমণ্ডলে নেত্র নিক্ষেপ কর।" বাল্মীকি দেখিলেন, সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সরসিজাসন-সন্নিবিষ্ট কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলধারী কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুঃ শঙ্খচক্রধারী মুরারি বিরাজ করিতেছেন। ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইয়া বাল্মীকি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নারায়ণ বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বাল্মীকি অনেকবাহু, অনেক উদর, অনেকবক্ত্র, অনেকনেত্র, দংষ্ট্রাকরাল অনন্তরূপ দেখিলেন। উঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। শশিসূর্য্যনেত্র, দীপ্তহুতাশবক্ত্র শরীরপ্রভায় দিগন্তপ্রকাশী নারায়ণ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত মধ্যস্থল পূর্ণ করিয়া রহিলেন। দেব-মানব-যক্ষ-রক্ষ-ব্রহ্মাদি সকলে—মানব জীবজন্তু সকলেই সেই বিরাটের মুখে প্রবেশ করিতেছে। উঁহার প্রতি লোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিলীন রহিয়াছে। দেখিলেন, সে বিরাট মূর্ত্তির নিকট দেবাদিও কীট, মানুষ ত তুচ্ছ পদার্থ। দেখিয়া বাল্মীকি স্তব করিতে লাগিলেন—

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব॥"

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "বাল্মীকে! তুমি দেখ, সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও, পৃথিবীময় এই সাম্য, ভ্রাতৃভাব ও একতা গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।"

বিরাটের মুখ হইতে বিরাটস্বরে ধ্বনি হইল "জয়"!

পরিশিষ্ট

(বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বাবুর লিখিত সমালোচনা)

বঙ্গদর্শনে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পুনর্মুদ্রিত হইলে তাহা বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়া থাকে না। "বাল্মীকির জয়" কিয়দংশে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গ্রন্থের অধিকাংশই বঙ্গদর্শনে বাহির হয় নাই। উহার যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এ অবস্থায় আমরা সমালোচ্য গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অতএব পাঠক যদি অনুমতি করেন, তবে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। সম্পাদকের অনুমতি পাইয়াছি।

দুঃখের বিষয়, সমালোচনা আরম্ভ করিয়া আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, এখানি কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা পদ্যে লিখিত নহে,: সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে, আমি নিশ্চিত জানি; কেন না, ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নভেলও বলিতে পারিলাম না, কেন না, ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টসিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কথা আছে, কিন্তু পুরাণ নহে; দিগ্বিজয়ের কথা আছে, কিন্তু ইতিহাস নহে; একটি সৃষ্টির বিবরণ আছে, কিন্তু বিজ্ঞান নহে; নক্ষত্রনীহারিকার কথা আছে, কিন্তু জ্যোতিষ নহে; মনুষ্যকে পশু করিবার কথা আছে, অথচ "Origin of species" নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূত-কিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভাল, গ্রন্থের জাতিনির্ব্বাচন করিতে না পারি, এক রকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে এক প্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "The Three Forces —Physical, Intellectual, and Moral." ইংরেজি ভাষায় শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া থাকি। Force ত কিছু দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাটমূর্ত্তি—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি! যদি বল, এই তিনটিই আমার Force, আমার উত্তর, তোমার Force লইয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দাও, আমি এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা করিব। তোমার মানবদেবী অপেক্ষা আমার দুর্গাঠাকুরাণী অনেক ভাল। দুর্গাঠাকুরাণীকে গড়িতে পারি, তাই পূজা করিতে পারি। মানবদেবী কোথায়?

কথা অনেক দিন হইতে দেশে আছে—কোন্ কথা নাই? তিনটি force—Physical, intellectual, moral. ত্রিগুণ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, অথবা তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব, বহুকাল হইতে আছে। ক্রমে তিন গুণ ত্রিমূর্ত্তিতে পরিণত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তিতে আর কাজ চলে না—ইঁহারা কেবল দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। দুই জন মন্দিরে বসিয়া চাল-কলা মহার্ঘ করেন, আর এক জন কেবল দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্রে। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং—আমরা অন্য ত্রিমূর্ত্তির অনুসন্ধান করি।

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচরব্যাপ্ত, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যে দেখাইবে, সে গুরুদেব এক্ষণে সাগরপারে। ইউরোপ হইতে কর্ণরন্ধ্রে মন্ত্র প্রেরিত হইতেছে, পূজা কর এই ত্রিমূর্ত্তি Physical, Intellectual, Moral! দেখ Physical—আমাদের এই বাহ্য সম্পদ! এই অতুল ঐশ্বর্য্য! এই অসংখ্য অজেয় সেনা। Intellectual—সে এই সেক্ষপীয়রের নাটক, এই গেটের কাব্য, এই কাণ্টের দর্শন, এই ইউরোপীয় বিজ্ঞানসমুদ্র!! আর Moral? বুঝি শুধু খ্রীষ্টধর্ম্ম। এ ত্রিমূর্ত্তিতেও আমাদের মন উঠিল না—আমরা আপনাদের জন্য ত্রিমূর্ত্তি গড়িব। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং! দেখি চল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি কি প্রকার।

তুমি যেই হও না কেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কর কি? তুমি বলিবে—আমি আপনার অন্নবস্ত্রের যোগাড় করি। কে তোমাকে অন্নবস্ত্র দেয়? সমাজ। তুমি যেই হও, তুমি সমাজের খাটিয়া দাও—সমাজ তোমাকে খাইতে দেয়। যেই যাই করুক, সব পরের কাজ।* সকল কাজের শেষ ফল সমাজের উপকার।

এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু সহস্র বৎসর হইতে সমস্ত মনুষ্যবংশ চেষ্টা করিতেছে। সমাজের অনেক উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু এখনও মানুষের মন উঠে না। অনেকেই বলে, সমাজ এখনও বড় অবনত। উন্নতির এক আধটা সোজা উপায় বাহির হয় না কি? সোজা উপায় গোটা কতক প্রথম ফরাসিস রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহার একটার বীজমন্ত্র "Fraternity!" ভ্রাতৃভাব। যখন মনুষ্যে মনুষ্যে দ্বেষশূন্য হইবে, যখন কেহ কাহারও অনিষ্টচেষ্টা করিবে না, যখন সকলেই সকলের উপকারে ব্রতী হইবে, তখন সবাই অপর সবাইকে ভালবাসিবে; যখন মনুষ্যে মনুষ্যে "ভাই ভাই" সম্বন্ধ হইবে, তখনই মনুষ্যসমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইবে। এই "ভাই ভাই" সম্বন্ধ যাহাতে ঘটিয়া উঠে, তাহাই সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

কথাটা বড় পাকা কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। এ দেশের অবস্থা আমরা যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে ভ্রাতৃভাবকে বড় একটা শান্তিময় পদার্থ বলিয়া বোধ হয় নাই। আমাদের ভয় হয় যে, যদি সকল বাঙ্গালীতে ভ্রাতৃভাব ঘটিয়া উঠে—তাহা হইলে ঘরাও বিবাদে আর শরিকী মামলামোকদ্দমায় দেশটা পয়মাল হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে জেলায় জেলায় হাইকোর্ট আর গ্রামে গ্রামে সব জজ নহিলে চলিবে না। আমাদের দেশী পণ্ডিত চাণক্য ঠাকুর ইহার সার বুঝিয়াছিলেন; ভ্রাতৃভাবে হইবে না—আত্মভাব চাই। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু দেখিতে হইবে। আরও মধুর— সর্ব্বভূতেষু!

যাই হউক, আমরা ধরিয়া লই যে, এই গ্রন্থে যেখানে "ভাই ভাই" পড়িব, সেখানে মনুষ্যে মনুষ্যে অবিচল, পবিত্র প্রেম বুঝিব। এই পবিত্র প্রেম, এই ভ্রাতৃভাব কিসে হইবে? কেহ বলেন বাহুবলে। সব জয় করিয়া, একচ্ছত্রাধীন কর, এক খড়্গে শাসিত কর, এক আইনে বদ্ধ কর, সবাই একাচার, কাজেই একপ্রাণ হইবে। সে বৎসর লর্ড সালিসবারি একটা সভায় বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের একচ্ছত্রাধীন সমস্ত ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে একীভূত হইতেছে। বৎসর কত হইল, আমেরিকার দক্ষিণভাগ নিগ্রোকে ভাই বলিতেছে না দেখিয়া, উত্তরভাগ তরবারি লইয়া দক্ষিণকে রক্তস্রোতে ডুবাইয়া ভ্রাতৃমন্ত্র জপাইল। আর এক সম্প্রদায় বলেন, পণ্ডিত হও! আমি যাহা শিখাই শিখ, আমি যে শিকল পরাই পর, সকলে এক অবস্থায় দাঁড়াইবে—সকলেই ভাই ভাই হইবে। মধ্যকালে ইউরোপের রোমীয় পাদ্রীরা এই সম্প্রদায়ের লোক। যাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্ম্ম না বুঝেন, তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণগণকে এই দলভুক্ত করেন। আর এক দল বলেন, "আমাদের বাহুবল নাই, বিদ্যাবল নাই—আছে কেবল বাক্যবল; আমরা পরের জন্য কাঁদিতেছি, তোমরা দাঁড়াইয়া একবার শুন দেখি। তাহা হইলেই তোমরা ভাই ভাই হইবে।" যীশু ও শাক্যসিংহের ন্যায় ধর্ম্মবেত্তা, সোক্রেতিসের ন্যায় নীতিবেত্তা, আর সুকবিগণ এই দলভুক্ত। এই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি—এই তাঁহার বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকি। এই তিনকে Physical, Intellectual এবং Moral নাম দেওয়া ঠিক হইয়াছে—এমত আমাদের বোধ হয় না।

যাহাই হউক, এক্ষণে গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করি। লোকে বলে, পুণ্যবান্ মনুষ্য মরিয়া স্বর্গে যায়, কিন্তু বেদমতে তাহারা স্বর্গে যায় না। তাহারা ঋভু হয়। ঋভুগণ কোন দিব্য লোকে বাস করেন। গ্রন্থের প্রথম দৃশ্য, ঋভুগণ এক রাত্রে সংমিলিত হইয়া পৃথিবীদর্শনে আসিতেছেন। কাব্যাংশে বাঙ্গালা ভাষায় এ দৃশ্যের তুল্য কোথাও কিছু নাই। সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ধিসময়ে এক অমাবস্যার রাত্রে "সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইল—তাহার মধ্য হইতে অগণিতসংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঋভুগণ মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর; কিন্তু যখন তীব্র জ্যোতির্ম্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া—আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিল, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল, ধূমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল, নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে।"

ঋভুগণ হিমালয়ে অবতীর্ণ হইলেন। গ্রন্থারম্ভে হিমালয়ের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না—উহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ জন্য উদ্ধৃত করিলাম না। ঐ বর্ণনা পড়িয়া, যে অদ্বিতীয় হিমালয়-বর্ণনা আজিও সাহিত্যসাগরে অতুল—তাহা স্মরণ কর। দেখিবে, পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে বা গুণে দেশী ক্লাসিকে আর দেশী আধুনিকে কি প্রভেদ! কুমারসম্ভবের কবি,—জগতের কবিকুলের আদর্শ—অতিপ্রকৃত সৌন্দর্য্যের (Ideal) অবতারণায় অদ্বিতীয়, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে

পারে না। কিন্তু আধুনিক কবি প্রকৃতের (Real) বর্ণনায় কি সুচতুর! ইউরোপ হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি। আমাদের চিরমার্জ্জিত পবিত্র অতিপ্রকৃত চরিত্র পরিত্যাগ করিয়া, আমরা ইউরোপীয় আদর্শ দেখিয়া, পার্থিব অপবিত্র প্রকৃত চরিত্রের অনুসরণ করিতেছি। ইহাকে বলে উচ্চশিক্ষা। নীচশিক্ষা কাহাকে বলিব?

ঋভুগণ হিমালয়শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া গান করিলেন। সে গানে বিশ্ব বিমোহিত হইল। গানের ধুয়া "ভাই! ভাই! ভাই! সকলেই ভাই!" গান করিয়া ঋভুগণ আকাশপথে চলিয়া গেলেন।

"কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল, রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল, আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে, দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন যেমন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেই প্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্বসংসার আবার যেমন তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল, পৃথিবীতে প্রভাত হইল; কাক-কোকিল ডাকিয়া উঠিল।"

গান শুনিয়া পৃথিবীস্থ সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিন জনের উপর এই গানের বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল। এক জন বাহুবলে বলী দিগ্বিজয়ী রাজা বিশ্বামিত্র। দ্বিতীয় বিদ্যাবলে বলবান্ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ। তৃতীয় নরহত্যাকারী দস্যু বাল্মীকি।

বিশ্বামিত্র সেই "ভাই ভাই" মোহময় গীত শুনিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি মনুষ্যজাতিকে ভাই ভাই সম্বন্ধে মিলাইতে পারিবেন। "অহং বিশ্বামিত্রঃ। ভুবন জয় ত করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত করি। তার পর মিলাইব। কাণে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন, যদি পৃথিবীতে এক দিন এইরূপ গাওয়াইতে পারি, তবে আমি বিশ্বামিত্র—কিন্তু পারিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?"

বশিষ্ঠ ভাবিতেছেন:—"বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়দিগকে কি ফাঁকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এখন কি অন্য জাতি মিলাইতে পারিব না? * * সর্ব্বশাস্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি। তেজ কি? শাস্ত্রে ত বলে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ", তার আবার মান অবমান কি? পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি। তারও এই মানে। যোগশাস্ত্র, তারও ঐ মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব; পারিব না কি? তেজঃ, সত্য, ধর্ম্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারিব না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন?"

বাল্মীকি ভাবিতেছেন, "কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই। এই যে ঋভু দেখিলাম; এই যে গান শুনিলাম; তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল; আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না! হায়, কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম! কোথায় সব ভাই ভাই হব, না আমায় দেখে সবাই পালায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল!"

গোড়াতেই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রে একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র উভয়ে প্রভাতে হিমালয়-অবতরণ করিতেছিলেন—সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পরে পরিচিত হইলেন—এবং প্রথমে মিষ্টালাপ হইল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন,—আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, বশিষ্ঠের বড় সমারোহে আতিথ্যসৎকার করিলেন, এবং রত্নরাশি তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ বিদায়কালে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের তপোবনে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলেন। গিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষাও বশিষ্ঠের ঐশ্বর্য্য গুরুতর। দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহাশয়, আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিল?"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী, তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তবে অল্প উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গরুটি দিতে হইবে।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "আমি যখন তাহার মা'র কাছ

হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উহাকে কখন কাহাকেও দিব না।”

বশিষ্ঠ গোরু দিলেন না—বিশ্বামিত্র আপনার সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন যে, গোরু কাড়িয়া লইয়া চল। তখন বশিষ্ঠ কি করেন—ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা। কিন্তু নন্দিনীকে কাড়িয়া লইয়া যায়, কার সাধ্য—নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে অগণিতসংখ্যক সেনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইলেন।

বাহুবল বিদ্যাবলের কাছে পরাজিত হইল। তার পর এখন বিদ্যাবল ধর্ম্মবলের কাছে পরাজিত হইলেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়—বাল্মীকির জয় ঘটিয়া যায়। কিন্তু নবীন গ্রন্থকার—অব্যয়িত প্রতিভার বলে মহাবলবান্—এ সোজা পথে যাইতে ঘৃণা করিলেন। আমরা এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে লেখকের গতিকে দৃপ্ত সিংহের গতির সঙ্গে মনে মনে তুলনা করিয়াছি।

বিশ্বামিত্র দেখিলেন, “ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং—ব্রহ্মতেজো বলং বলং”—তিনি তখন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিতে গেলেন—তাঁহার কঠোর তপস্যায় দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ব্রহ্মা বর দিতে আসিলেন। বিশ্বামিত্র চান “ব্রাহ্মণত্ব”। কিন্তু বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রেই হউক, আর যাই হউক, ব্রহ্মা কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব দিলেন না। বিশ্বামিত্র কিছুতেই অন্য বর লইলেন না—ব্রহ্মাকে ও ব্রহ্মর্ষিগণকে তাড়াইয়া দিলেন। বলিলেন :—

“তোমরা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্ব-প্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার।”

তপোবলে বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে দুঃখ রহিল না—ব্রাহ্মণ রহিল না। বিশ্বামিত্র তাহার নিয়ন্তা। পাঠক দেখিবেন যে, গ্রন্থকারের বিশ্বামিত্র এখন আর বিশ্বামিত্র নহেন—এখন তিনি বশিষ্ঠ। এখন তিনি বাহুবল নহেন—এখন বিশ্বামিত্র তপোবল, বিদ্যাবল। নন্দিনীর হুঙ্কারে সাগরবৎ সেনা সকল সৃষ্ট হইয়াছিল—বিশ্বামিত্রের ইচ্ছায় নূতন সৌর জগৎ সৃষ্ট হইল। বিশ্বামিত্রকে বশিষ্ঠ করিয়া, গ্রন্থকার আবার তখনই তাঁহাকে বাল্মীকির পথে আনিতেছেন। বিশ্বামিত্র নূতন জগতের নিয়ন্তা—কিন্তু মনুষ্য। মনুষ্য বলিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিল এক দিন কাঁদিয়াছিলেন, “সব হইল—কিন্তু সুখ কৈ?” বিশ্বামিত্রও এখন কাঁদিলেন, “সব হইল, কিন্তু সুখ কৈ?” সুখের জন্য পৃথিবী হইতে নিজ পুরী ও আত্মীয়-স্বজন সহিত কান্যকুব্জনগর উঠাইয়া লইয়া আপনার সৃষ্টিতে চলিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবল ফুরাইয়া গিয়াছিল, কিছু দূর গিয়া পুরী আর যায় না—পড়িয়া যায়—ব্রহ্মা ধরিয়া নামাইয়া লইলেন। তার পর, বিশ্বামিত্র নিজে স্বীয় সৃষ্টিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অজ্ঞান অবস্থায় শূন্য হইতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন।

এ দিকে বাল্মীকি ঋভুদিগের গান শুনিয়া অবধি দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন তিনি পরের দুঃখে বড় কাতর। পরের দুঃখে কাতর বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে পবিত্রতা জন্মিল। সেই কাতরতাই নীতি,—তাহার প্রকাশ কবিত্ব। পরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া বাল্মীকি হৃদয়ে কবি হইয়াছিলেন—ভারতীর কৃপায় তিনি বাক্যেও কবি হইলেন। যাহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বাল্মীকি-প্রতিভা”—পড়িয়াছেন, বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বাবুর অনুগমন করিয়াছেন।

বাল্মীকি এখন পৃথিবীর নীতিশিক্ষক—প্রথম কবি। তিনি পৃথিবীময় গান করিয়া বিচরণ করেন—সমবেদনা শিখান—তিনি ভাই ভাই মন্ত্রের প্রবর্ত্তক সাধক। সম্প্রতি কৌশাম্বীনগরে রাজা যজ্ঞ করিতেছেন—সেইখানে সমস্ত পৃথিবী আহূত ও সমবেত। একটা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে—এক দল যজ্ঞ করিতে দিবে, আর এক দল দিবে না। দুই দলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। নিবারক একা বাল্মীকি। বাল্মীকির অস্ত্র—অশ্রুজল,—বাণীদত্ত বীণা। এই সময় অনন্ত শূন্য হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চেতনাশূন্য বিশ্বামিত্র আসিয়া সেই যজ্ঞকুণ্ডে পড়িলেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া লোকে ভীত ও বিস্মিত হইল—বাল্মীকির বাক্যবল বাড়িয়া গেল—তাঁহার সকরুণ গানে সমস্ত চরাচর বিমুগ্ধ হইল—লোকের মন ফিরিল—বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়া গেল—বাল্মীকির জয় হইল।

ব্রহ্মার কৃপায় বিশ্বামিত্র জীবন পাইলেন। বিশ্বামিত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মার স্তুতি ও আপনার অপরাধ স্বীকার করিলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকিতে মিল হইল। বাহুবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল একত্রিত হইল। ব্রহ্মা ঋষিত্রয়কে আদেশ করিলেন যে, "সর্ব্বলোকমধ্যে ঐক্যস্থাপনমানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ।" বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তখন তিন জন ঋষি রামায়ণের "plot" নির্ম্মাণ করিতে বসিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "রামকে ধার্ম্মিক কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তাঁহাকে রাজনীতিজ্ঞ কর।" বাল্মীকি বলিলেন, "আমি রামকে আদর্শ মনুষ্য করিব।"

রামায়ণ প্রণীত হইল। তার পর রাম অবতীর্ণ হইলে রামায়ণ অভিনীত হইল। তার পর রামায়ণ গীত হইল—নারায়ণ বৈকুণ্ঠে গেলেন। শেষ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার আদেশে দেহত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিমধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন—বিশ্বামিত্র ঋভুদিগের নেতা হইলেন। ব্রহ্মা বাল্মীকিকেও স্বর্গযাত্রার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বাল্মীকি তখন গেলেন না—তাঁহার কার্য্য শেষ হয় নাই, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব তখনও জন্মে নাই। শেষে ব্রহ্মার আদেশে তিনি নভোমণ্ডলে বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। বাল্মীকি সেই বিরাটমূর্ত্তির স্তুতিবাদ করিলেন।

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"

"তখন ব্রহ্মা বলিলেন, বাল্মীকে! তুমি দেখ, সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও, পৃথিবীময় এই সাম্য ভ্রাতৃভাব ও একতা গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।"

বিরাটের মুখ হইতে বিরাটস্বরে ধ্বনি হইল "জয়!"

পাঠক গ্রন্থের পরিচয় পাইলেন, এখন ইহাকে যাহা বলিতে হয়, তিনি নিজেই বলুন। অনেকে বোধ হয় বলিবেন, এ সকল কেবল পৌরাণিক কথা—আমাদের জানা আছে। যাঁহারা আরও বাহাদুর, তাঁহারা বলিবেন যে, এ কেবল গাঁজা। ছায়াপথ ফাটিয়া দ্বিধা হইল, নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে সহস্র সহস্র সেনা সৃষ্ট হইতে লাগিল, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার ন্যায় দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এ সকল গাঁজা নয় ত কি? যাঁহারা আর একটু সুশিক্ষিত, তাঁহারা বলিবেন, এ রূপক। নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে সৈন্যের সৃষ্টি, ইহার অর্থ সরস্বতীর অনুকম্পায় জড়বলের উপর মনুষ্যের আধিপত্যস্থাপন। নন্দিনীর এক হুঙ্কারে বারুদের সৃষ্টি, আর এক হুঙ্কারে ধূমযন্ত্র ষ্টীমের কল, বাষ্পীয় পোত, রণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদি কেহ রূপক বলিতে চান, আমরা তাঁর সঙ্গে বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করিব না। আমরা বলিব, ইহা যদি রূপক হয়, তবে স্পেন্সরের রূপকের মত, রূপক কাব্যে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার রূপকত্ব কেহ দেখিবে না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অনেক দোষ আছে। কাব্যের গঠন সকল স্থানে কৌশলযুক্ত নহে। যথা বিদ্যাবলের পরাজয়, বশিষ্ঠে নহে, বিশ্বামিত্রে। বাল্মীকির গীতগুলিতে কারিগরি নাই। কিন্তু আমরা এ সকলের কথা বলিব না। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই। ইহার গুণ সকল বলিয়া উঠি, এমন সময়ও নাই। কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ—কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমময়ী। ঋভুদিগের আগমন, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, বিশ্বামিত্রের অধঃপাত, কৌশাম্বীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাটদর্শন,—যাহা দেখ, সকলই মহিমময়ী কল্পনায় সমুজ্জ্বল। সর্ব্বাপেক্ষা এই বিশ্বামিত্রই ভয়ানক মূর্ত্তি। রাবণ বা বৃত্রাসুর যে ছাঁচে ঢালা, এ সে ছাঁচে ঢালা। আমরা রামায়ণের রাবণ বা পুরাণের বৃত্রের কথা বলিতেছি না। মধুসূদনের রাবণ—হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর। সে ছাঁচ বড় ভারি ছাঁচ। কিন্তু মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কাব্যের ধাত্রী ইংরেজি সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের পক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাপা জোঁকা বেড়া গোড়া। রাবণ ও বৃত্র প্রকাণ্ড মূর্ত্তি হইলেও মাপা জোঁকা বেড়া গোড়া। কেবল সেই প্রাচীন পুরাণ-প্রণেতারা অপরিমেয়, অনন্ত বিরাটমূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে জানিতেন। পৃথিবীতে আর কোথাও এমন কোন জাতি জন্মে নাই যে, সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মানসিক শক্তি ধরিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজিতে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে অতিশয় সুপণ্ডিত, তাঁহার মানসিক শক্তির পরিপোষণে পাশ্চাত্য ও আর্য্য উভয়বিধ সাহিত্যই তুল্যরূপে প্রবেশ করিয়াছে; এবং এই বিশ্বামিত্র প্রণয়নকালে তিনি প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের রুচি পাশ্চাত্য

সমালোচকদিগের ব্যবস্থানুযায়ী, তাঁহাদের কাছে এ বিশ্বামিত্রের কোন আদর হইবে না।

যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা। বর্ণনার আমরা অনেক পরিচয় দিয়াছি। ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি। এই বঙ্গদর্শনে অনেকবার এ পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, সুতরাং সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকার এত অল্পবয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।

সমাপ্ত

ভারত-মহিলা

[গ্রন্থকার কর্তৃক সযত্নে সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে পুণর্ম্মুদ্রিত]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই প্রণীত

প্রথম অধ্যায়

আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উৎকর্ষ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে হইলে, প্রথমতঃ তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। যেহেতু, কল্পনাশক্তি যতদূর তেজস্বিনী হউক না কেন, যতই নূতন নূতন পদার্থ নির্ম্মাণে সমর্থ হউক না কেন, উহা কবির সমকালীন সামাজিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। অতএব আমরাও এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। পরে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিব।

সমাজিক অবস্থা জানিবার উপায়

সেই সামাজিক অবস্থা জানিবার নানা উপায় আছে। প্রথমতঃ বেদ, দ্বিতীয় স্মৃতি, তৃতীয় পুরাণ এবং চতুর্থ তন্ত্র। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোন স্থানেই স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থা একত্র বর্ণিত নাই। নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ পুরাণের অধিকাংশ আবার কবিকল্পনাসম্ভূত। সুতরাং উহাকে কোনরূপেই প্রকৃত সমাজচিত্র বলা যায় না। বেদ ও তন্ত্র উপাসনাপ্রণালী ও অন্যান্য ধর্ম্মসংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ। কেবল স্মৃতিসংহিতাসকলেই প্রকৃত সমাজের যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায়। বর্ণধর্ম্ম বর্ণন করাই স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব উহা হইতে আমাদিগের প্রমাণ প্রয়োগ অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবে।

স্ত্রীলোকদিগকে সাবধানে রক্ষা করিতে হইত

প্রাচীন ঋষিগণ স্ত্রীলোককে যাবজ্জীবন পুরুষের অধীন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" ইহা সকল ঋষিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মনু বলেন, "স্ত্রীলোকের অভিভাবকেরা তাঁহাদিগকে দিন-রাত্রি আপনাদের অধীনে রাখিবে। নিয়মমত বিশ্রামসময়েও স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদিগের রক্ষাকর্ত্তার নির্দেশমত কার্য্য করিতে হইবে।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "পিতা-মাতা বাল্যকালে, স্বামী যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ইহাদের অভাব হইলে, আত্মীয়-বান্ধবেরা উহাদিগের রক্ষা করিবে। স্ত্রীলোক কোনমতেই স্বাধীন হইতে পারিবে না।" বৃহস্পতি বলেন, "শ্বশ্রূ অথবা অন্য

কোন প্রাচীন স্ত্রীলোক তরুণবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবে।" নারদ বলেন, "যদি স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হয়, অথবা জ্ঞাতিরা উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নির্ম্মূল হইলে, রাজা স্ত্রীলোকের রক্ষক হইবেন। যদি ঐ স্ত্রীলোক ধর্ম্মবিরুদ্ধপথগামিনী হয়, তবে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন। পৈঠীনসি বলেন, "স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবে।" এই সকল বচন দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ঋষিরা পরম যত্নে ও সাবধানে স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রীলোক অবরোধবর্ত্তী ছিল না।

যদিও স্ত্রীলোকের রক্ষার জন্য ঋষিরা এত ব্যগ্র, কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রীলোক যে অবরোধবর্ত্তী থাকিতেন, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্যুত দেখা যাইতেছে, সীতা রামের সহিত বনগমন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীও পঞ্চপাণ্ডবের অদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যারা ত কখনই অবরুদ্ধ ছিলেন না ও থাকিতেন না। মহাভারতীয় দেবযানী উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। কাব্যগ্রন্থসকলে যে "শুদ্ধান্ত," "অন্তঃপুর," "অবরোধ" ইত্যাদি শব্দ-প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাতে এই বোধ হয় যে, ক্ষত্রিয় রাজাদিগের গৃহিণীরাই অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন। যাহারা ১০০।৮০০ বিবাহ করিবে, তাহাদের অবরোধ সুতরাং প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু আর্য্যগণ প্রায়ই একটিমাত্র বিবাহ করিতেন এবং নির্ম্মল গার্হস্থ্য সুখের অধিকারী ছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তাঁহারা সর্ব্বদাই ভাল ব্যবহার করিতেন। মনু বলিয়াছেন, "যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট থাকে, সেখানে কখনই ভদ্রস্থতা নাই।" স্ত্রীলোক যে অবরোধবর্ত্তী ছিল না, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, অরুন্ধতী সর্ব্বদাই সপ্তর্ষিদিগের সমভিব্যাহারিণী থাকিতেন। রাজাদিগের প্রধানা মহিষী প্রায়ই সিংহাসনার্দ্ধভাগিনী হইতেন। আর "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই এক নিয়ম থাকায় প্রায় সকল ধর্ম্মকর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত সভায় উপস্থিত হইতেন। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন, "স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী পরের বাটী যাইবে না, কোন সমাজ বা উৎসবস্থলে উপস্থিত হইবে না। ক্রীড়া করিবে না, হাস্য করিবে না এবং শরীরসংস্কার করিবে না।" অতএব, স্বামী গৃহে থাকিলে, স্বামীর অনুমতি লইয়া স্ত্রী সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—যেমন পুত্রের শিক্ষাদান আবশ্যক, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগেরও শিক্ষাদান আবশ্যক। এই শিক্ষা কিরূপ? দুরূহ শাস্ত্র বেদ ভিন্ন স্ত্রীলোকে সকল শাস্ত্রেই অধিকারী। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক বেদেও সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়াছিলেন, এবং এক স্থলে দেখা যায়, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীলোকদিগকে বেদে উপদেশ দিতেছেন। বেদ দুই প্রকার ;—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উহার মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড অতি দুরূহ, কিন্তু গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জ্ঞানকাণ্ডেই উপদেশ পাইয়াছিলেন। ভবভূতি-প্রণীত উত্তরচরিত নাটকেও দেখা যায় যে, এক জন তাপসী বেদান্ত অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ড অধ্যয়ন করিবার জন্য বাল্মীকি মুনির আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গমন করিতেছেন। উক্ত মহাকবির আর একখানি নাটকে কামন্দকী ভূরিবসু ও দেবরাত নামক দুই জন প্রসিদ্ধ অমাত্যের সহাধ্যায়িনী ছিলেন। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, কামন্দকী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী, কিন্তু তিনি যে সময়ে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তখন তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বিনী ছিলেন না। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পণ্ডিত কৌষিকী স্বকীয় বিদ্যাবত্তা প্রযুক্ত পণ্ডিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে হিন্দু ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং বোধ হইতেছে, অতি প্রাচীনকালে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই সমানরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন। আমাদিগের দেশে যে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা দৃষ্ট হয়, তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্ব্বতী বাল্যকালেই নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। বিদ্যাবিষয়ে স্ত্রীলোকেরা যে কতদূর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহার কতক অবগত হইতে পারা যায়—

বিশ্বদেবী গঙ্গা বাক্যাবলী নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন। লক্ষ্মী দেবীর প্রণীত মিতাক্ষরার টীকা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী গণিতশাস্ত্রে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। শঙ্করবিজয় গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত

* ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।

আছে, শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মিশ্রপত্নী সারসবাণী তাঁহাদের বিচারে মধ্যস্থ ছিলেন। কর্ণাটদেশীয় রাজার মহিষী কবিত্ববিষয়ে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। বল্লালসেনের পুত্রবধূও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। উহাতে তৎকালপ্রসিদ্ধ কবিগণের ৫টি করিয়া কবিতা উদ্ধৃত আছে। এই কবিবৃন্দের মধ্যে ভাবদেবী, চণ্ডালবিদ্যা, সাটোপা, শিলা, ভট্টারিকা, বিদ্যা, বিজয়া, বিকটনিতম্বা ও ব্যাসপাদা এই কয় জনের নাম আছে। ইঁহারা তৎকালে কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

স্ত্রীলোকের বিবাহ

পিতা উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, ইহাই সকল মুনির মত। কিন্তু কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে যদি পিতা বিবাহ দিবার কোন উদ্যোগ না করেন, তাহা হইলে কন্যা ইচ্ছামত পাত্র মনোনীত করিয়া লইতে পারিবে (মনু)। উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, নচেৎ নরকে যাইতে হয়, এই নিয়ম থাকায় অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান প্রায়ই ঘটিত না। বিশেষতঃ বরের গুণাগুণসম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ কঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেও অপাত্রে কন্যাদান ঘটিয়া উঠা ভার হইত। তিনি বলিয়াছেন,

"নানাগুণবিশিষ্ট বেদবিৎ সমান বর্ণের পুরুষ বর হইবে। তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিতে হইবে, তিনি যেন যুবা, ধীমান্‌ ও লোকের প্রিয় হন।"

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকা মিতাক্ষরাগ্রন্থে এই বচনটির বিশিষ্টরূপ ব্যাখ্যা আছে, যথা "যুবা" অর্থাৎ পিতা অতীতবয়স্ক ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না। "ধীমান্‌" অর্থাৎ জড়মতি বেদার্থগ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তি বিবাহের উপযুক্ত নহে। "জনপ্রিয়" অর্থাৎ কর্কশস্বভাব ব্যক্তিকে কন্যাদান নিষিদ্ধ। এই বচন দৃষ্টে তৎকালে বরপরীক্ষার নিয়ম ছিল, তাহাও জানা যায়। যদি বর সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রসম্মত হয়, তবেই তাহাকে কন্যাসম্প্রদান করিলে পিতার পুণ্যসঞ্চয় হইবে। মনু আরও বলিয়াছেন, যদি শাস্ত্রানুমোদিত বর না পাওয়া যায়, তবে বরং কন্যা যাবজ্জীবন পিতৃগৃহে বাস করিবে, তথাপি অনুপযুক্ত বরে কন্যাদান করিবে না।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার

"পিতা, মাতা, ভ্রাতা পতি, দেবর প্রভৃতি আত্মীয় লোকে যদি ইহলোকে সম্মান ইচ্ছা করেন, তবে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করিবেন, এবং তাহাদিগের বেশ-ভূষা করাইয়া দিবেন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করা হয়, সেইখানেই দেবতারা সন্তুষ্ট হন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগের অমর্য্যাদা করা হয়, তথায় সকল কর্ম্মই নিষ্ফল। যে কুলে স্ত্রীলোকেরা শোক করে, সে কুল শীঘ্র নাশ পায়। যেখানে উহারা সন্তুষ্ট থাকে, সেখানে সর্ব্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব ভূতি-ইচ্ছুক লোকেরা উৎসবে ও সৎকার্য্যে ভূষণ, আচ্ছাদন ও অশন দ্বারা উহাদিগের 'পূজা' করিবে। যে কুলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট, সে কুলে কল্যাণ হয়" ইত্যাদি। মনুর এই সকল বচন পাঠ করিলে বোধ হয়, পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকের প্রতি সকলে সদ্ব্যবহার করিতেন ও তাঁহাদিগকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন। মনু আরও বলিয়াছেন, মাতা পিতার অপেক্ষা সহস্রগুণে পূজনীয়া, ভার্য্যা আপনার দেহ; অতএব ইহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ কোনরূপেই বিধেয় নহে। এদেশীয় কুলীনদিগের মধ্যে কন্যা হইলে, তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাজপুতানার রাজপুতদিগের মধ্যে বালিকাহত্যা-প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মনু বলিয়াছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" আর এক জন বলিয়াছেন, কন্যা-পুত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই, বরং কন্যা সৎপাত্রে দান করিলে পরলোকে মঙ্গল হয়। স্ত্রীলোককে শারীরিক কষ্ট দেওয়া মহাপাপ বলিয়া আজিও গণ্য হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, ইতর প্রাণীদিগেরও স্ত্রীজাতি মনুষ্যের অবধ্য,* মনু বলিয়াছেন, পরপত্নীকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, উহাদিগকে মাতৃবৎ দেখিবে।

উপরিলিখিত প্রবন্ধ পাঠে বোধ হইবে যে, সভ্যজাতীয় লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদের পূর্ব্বপিতামহগণও তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তবে যে নানাস্থানে দেখা যায়, "স্ত্রীলোক অতি হেয় পদার্থ, উহার সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে; হৃদয়ে ক্ষুরধারাভা মুখে মধুরভাষিণী স্ত্রীর অন্ত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায় না, অতএব তাহাকে বিশ্বাস করিবে

* অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যক্‌জাতিগতেষপি।

না" (ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ); এ সকল সংসারবিরাগী যোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি; তাঁহাদের মন অন্যদিকে আসক্ত, স্ত্রীলোক পাছে তাঁহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করে, এই ভয়ে তাঁহারা বনে বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া পূর্ব্বকালের পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণা করিতেন, অথবা তাঁহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেন, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায়। বরং নিম্নলিখিত যাজ্ঞবল্ক্যবচন দৃষ্টে বোধ হইবে যে, প্রাচীন ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে অতি পবিত্র পদার্থ মনে করিতেন। যাঁহারা সতী, তাঁহাদের ত কথাই নাই। "যেখানে যেখানে তাঁহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেইখানেই পৃথিবী মনে করেন যে, আমার আর ভার নাই, আমি পবিত্রকারিণী হইলাম" (কাশীখণ্ড), কিন্তু সামান্যতঃ পাপচারিণী ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। "সোম তাহাদিগকে শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব তাহাদিগকে মধুর বাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করিয়া দিলেন। অতএব যোষিদ্গণ সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হইয়াছে।"

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম

স্ত্রীলোকের পক্ষে কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামী কাণা হউন, খোঁড়া হউন, অকর্ম্মণ্য হউন, দুষ্ট হউন, তথাপি স্ত্রীলোকের তিনিই গুরু, পূজ্য ও ইষ্টদেবতা। তাঁহার চরণসেবা করিলেই স্ত্রীলোকের পরকালে পরমগতি লাভ হইবে। স্বামীর পর শ্বশ্রূ-শ্বশুর, পিতামাতার সেবা, দেবরাদির প্রতিপালন তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি সমস্ত গৃহকার্য্যে দক্ষ হইবেন। ব্যয়ে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হইবেন, স্বামি-পুত্রের বিরহ কখনই কামনা করিবেন না। আপন ইচ্ছাতে কোন কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়। তাঁহার ব্রত, ধর্ম্ম-উপাসনা, উপবাস কিছুই নাই। শিল্পাদিকার্য্যে দক্ষ হউন, সে তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের মধ্যে। তাহার দ্বারা যে ধনসঞ্চয় হইবে, তাহাতে তাঁহার নিজের কোন অধিকার নাই। সে ধন তাঁহার স্বামীর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গৃহকার্য্যে দক্ষ হওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। সে সকল গৃহধর্ম্ম কি, বহ্নিপুরাণে তাহার এক বিবরণ পাওয়া যায়, যথা—

"স্ত্রীলোক প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবে, তাহার পর স্বামী ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া গোময় অথবা জলের দ্বারা উঠান পরিষ্কার করিবে ও গৃহের কাজকর্ম্ম শেষ করিবে। তাহার পর স্নান করিয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পতির পূজা করিয়া গৃহদেবতার পূজা করিবে। সমস্ত গৃহকার্য্য শেষ হইলে অতিথি ও স্বামীর ভোজনান্তে পরমসুখে নিজে ভোজন করিবে।"

এই স্থলে সংক্ষেপে স্ত্রীলোকদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসকলের উল্লেখ করা হইল। ইহা ভিন্ন অনেক কর্ম্ম আছে, তাহা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য নহে, অথচ করিলে তাঁহাদের প্রশংসা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিব। স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করা হইয়াছিল, জানিতে গেলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি কি, জানা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, তাঁহারা ঐগুলি যদি সুন্দররূপে সমাধা করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের চরিত্র উত্তম বলিতে হইবে। তাহার উপর অমায়িকতা, সরলতা প্রভৃতি যে সকল গুণে জগতে মাননীয় হওয়া যায়, সেই সকল গুণ থাকিলেই তাঁহাকে অতি উন্নতচরিত্রা বলিতে হইবে।

স্ত্রীর ধনাধিকার

স্ত্রীলোকের ধনাধিকারবিষয়ে নিয়ম এই;—স্ত্রীলোক নিজে উপার্জ্জন করিলে স্বামীর হইবে। স্বামী যদি দেন, ২০০০ টাকার অধিক দিতে পারিবেন না। তবে পিতামাতা, কন্যার কষ্ট না হয় বলিয়া যে ধন দিবেন, তাহা তাঁহার আপনার। পিতামাতা বা স্বামীর ধনে তাঁহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই, অর্থাৎ দান-বিক্রয়-ক্ষমতা নাই। কেবল যাবজ্জীবন ভোগমাত্র। সে ভোগ আবার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদি দ্বারা নহে। সে ধন কেবল স্বামীর পারলৌকিক কার্য্য ও অন্যান্য সৎকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য। পিতার ধন আবার যদি দৌহিত্র থাকে, তবেই পাইবেন, বন্ধ্যা বা বিধবা হইলে সে ধনে তাঁহার অধিকার নাই। এইরূপে স্ত্রীলোক ধন-উপার্জ্জনে বঞ্চিত হইলেও তাঁহার ধনাধিকারে যথেষ্ট সুবিধা আছে। তাঁহার পিতৃদত্ত যে নিজধন, তাহাতে স্বামীরও অধিকার নাই। সে ধন স্বামী লইলে তাঁহাকে সুদ দিতে হইবে। না দিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের ধনাধিকারবিষয়ে ভারতীয় ঋষিগণ যত সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এত অন্য কোন দেশে আজিও হইয়াছে কি না সন্দেহ।

বিধবার কর্ত্তব্য

মনুর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। স্বামীর ধন পাইলে স্বামীর

পারলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। স্বামিকুলে বাস করিবে। স্বামীর বংশে কেহ থাকিতে পিতৃবংশীয়দিগকে ধনদান করিবে না। স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হইলে, পিতৃগৃহ আশ্রয় করিবে। সহমরণ মনুর অনুমোদিত নহে; কিন্তু মহাভারতের মধ্যে সহমরণপ্রথার বহুল প্রচার দেখা যায়। পাণ্ডুমহিষী মাদ্রী সহগমন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, মৃত বীরেন্দ্রবৃন্দের মহিষীরা অনেকে স্বামীর অনুগমন করেন। বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, এমন কি, মনু ভিন্ন প্রায় সকল ঋষিরাই সহমরণের অনুমোদন করিয়াছেন এবং অনুমৃতাদিগের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। এক জন বলিয়াছেন, "যে স্ত্রী সহমৃতা হয়, সে স্বামীর সহস্র পাপসত্বেও স্বামীর সহিত সার্দ্ধত্রিকোটি বৎসর স্বর্গবাস করিবে।" পরাশর বলিয়াছেন যে, সর্পগ্রাহী ব্যাধ যেমন বলপূর্ব্বক সর্পকে গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করে, সেইরূপ সহমৃতা নারী আপন স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গে আমোদ-প্রমোদ করে। কিন্তু সহমরণ স্ত্রীলোকদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। করিলে পুণ্য ও প্রশংসা হয় মাত্র। আমরা তৃতীয় অধ্যায়েও এ কথার উল্লেখ করিব। সহমরণ ভারতবর্ষ ভিন্ন প্রায় অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। উহা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। সত্য বটে, সহমরণ পরিণামে অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছিল; সত্য বটে, দুষ্টলোকে ষড়যন্ত্র করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেককে জলচ্চিতায় নিক্ষেপ করিত; সত্য বটে, এই প্রথা উঠাইয়া দিয়া ইংরাজরাজ আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, কিন্তু এই প্রথা যাঁহাদের দৃষ্টান্তে প্রথম প্রচলিত হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বামীর জন্য, পরলোকেও যাহাতে স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ না হয়, সেই জন্য, আপনার জীবন স্বামীর চিতায় সমর্পণ করিতেন। কাহারও কাহারও মতে কলিযুগে বিধবারা বিবাহ করিতে পারিবেন, ব্যবস্থা আছে।

দুষ্টচরিত্রাদিগের দণ্ড

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীকে স্বামী সদ্যঃপরিত্যাগ করিতে পারিতেন। স্ত্রী যদি গৃহকার্য্যে অবহেলা করিত বা মুক্তহস্তে ব্যয় করিত, স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। সুরাপায়িনী স্ত্রী পরিত্যাগার্হা। পরিত্যাগ বলিতে গেলে একেবারে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া বুঝাইত না। এই সকল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে হইত। স্ত্রীলোক যদি পিতৃধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া স্বামীকে অবহেলা করে এবং পুরুষান্তরকে আশ্রয় করে, তবে রাজা তাহাকে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন এবং তাদৃশ পারদারিক পুরুষকে পোড়াইয়া ফেলিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধ্বীদিগের শ্রেণীবিভাগ

মুনিরা যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সেই সকল নিয়ম সুন্দররূপে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদিগের প্রথম বর্ণনীয়। যাঁহারা কোনরূপে প্রলোভনে পতিত না হইয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রই আমরা প্রথম পর্য্যালোচনা করিব। তাহার পরে যাঁহারা নানাবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনাবলী বর্ণনা করিব। হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রীস্বভাবের ইঁহারাই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পাণ্ডুবধূ দ্রৌপদী, রামগেহিনী সীতা এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধানরূপে গণনীয়া। সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি মহিলারা চরিত্ররক্ষার জন্য নানাবিধ কষ্ট পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রলোভন-সামগ্রী অল্পই ছিল। তাঁহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর তাঁহারা কেহই নহেন।

স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য-কর্ম্ম পতিসেবা। পতি তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, তাঁহাদিগের দেবতা। পতির সেবাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য গৃহকার্য্য। গৃহস্থের যত কার্য্য আছে, তাহার সমুদয়েরই ভার স্ত্রীলোকের হস্তে। সন্তানপালনও স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য-কর্ম্মের মধ্যে গণনীয়, মনু এক স্থলে বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক হইতে সন্তানের উৎপত্তি ও তাহার লালন-পালন হয়, অতএব স্ত্রীলোকই লোকযাত্রার প্রত্যক্ষ উপায়।"

অতএব পুত্রের পালনভারও স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পিত ছিল। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের আরও একটি কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত ভদ্রপরিবারের মহিলারাই উহা শিক্ষা করিতেন। উহার নাম কলাশিক্ষা। ঋষিদিগের সময়ে লোক সকল

সরল ছিল। বাবুগিরি ব্রাহ্মণদিগের তত মনোগত ছিল না। কালিদাসাদির সময়ে যখন আর্য্যগণ পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাসসুখে মগ্ন হইয়াছেন, তখন নৃত্যগীতাদি ভদ্রমহিলাদিগের নিত্যকর্ম্মমধ্যে গণ্য হইয়াছে। তখনই কালিদাস লিখিলেন, "তুমি আমার গৃহিণী ছিলে, সচিব ছিলে, সখী ছিলে, কথার দোসর ছিলে এবং ললিতকলাবিধিতে প্রিয়শিষ্যা ছিলে, করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমায় হরণ করায় বল, আমার আর কি রাখিয়াছ।*

কিন্তু মহর্ষি ব্যাস স্বকৃতসংহিতায় লিখিয়াছেন, "স্ত্রী ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা পতির অনুগমন করিবে। মঙ্গলকার্য্যে সখীর ন্যায় যত্নবতী হইবে, আদিষ্টকার্য্যে দাসীর ন্যায় তৎপরা হইবে।" †

এই দুইটি বচনের মধ্যে প্রথমটিতে "প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" এই বিশেষণটি অধিক আছে। ইহা দ্বারা বোধ হইল, ঋষিগণ আপন স্ত্রী ও কন্যাদিগের নৃত্যগীত শিক্ষা দিতে তত উৎসুক ছিলেন না।

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল, পতিসেবা, গৃহকার্য্য, এবং নৃত্যগীতাদিও, স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। সংক্ষেপতঃ এই স্থির হইল, কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে গেলে আবার সংহিতাকর্ত্তাদিগের শরণ লইতে হইবে। অষ্টাদশখানি সংহিতার মধ্যে ৮৯ খানি অতি স্বল্পায়তন, তাহাতে স্ত্রীচরিত্রের কোন উল্লেখ নাই। আর কয়েকখানির মধ্যে মনু যেরূপ বৃহৎ গ্রন্থ, উহাতে স্ত্রীধর্ম্ম তাদৃশ বিস্তারক্রমে কথিত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে গৃহস্থধর্ম্মের মধ্যে কয়েকটি মাত্র কবিতা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। দক্ষ, ব্যাস ও বিষ্ণু বিস্তারক্রমে স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই তিনখানির মধ্যে আবার বিষ্ণুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল। বিষ্ণুর বচনে অর্থঘটিত কোনরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দায়ভাগকার জীমূতবাহন বিষ্ণুসূত্র অবলম্বন করিয়াই অতি দুরূহ অপুত্রধনাধিকার-অধ্যায় নির্ণয় করিয়াছেন, আমাদেরও সেই বিষ্ণুবচনই প্রধান আশ্রয়। স্ত্রীধর্ম্মসম্বন্ধে বিষ্ণুর বচন যথা—

স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত একব্রতচারিণী হইবেন।

বিষ্ণুসূত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার নন্দপণ্ডিত লিখিয়াছেন, স্বামী যে সকল বিষয়ে সঙ্কল্প করিবেন, স্ত্রীলোকেরও সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত।

শ্বশ্রূ, শ্বশুর এবং দেবতাদিগের সেবা

টীকাকার লিখিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত গুরুজনের পাদবন্দনাদি দ্বারা সন্তোষসম্পাদনই সেবা বা পূজা শব্দের অর্থ। দেবতা শব্দে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা নহেন। কারণ, স্ত্রীলোক ইচ্ছামত দেবোপাসনা করিতে পারিলে ১ম বচনটির সহিত বিরোধ হয়, অতএব উহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন, দেবতা "সৌভাগ্যদাত্রী গৌরী প্রভৃতি"। সৌভাগ্যই স্ত্রীলোকের গৌরবের বিষয়। যেমন বিদ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা, বলে ক্ষত্রিয়ের, সেইরূপ সৌভাগ্যে নারীর শ্রেষ্ঠতা হয়। যাহার সৌভাগ্য নাই, সে স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে নাই। সৌভাগ্য শব্দের অর্থ স্বামীর ভালবাসা। স্বামী যে স্ত্রীকে ভালবাসেন, তিনিই শ্রেষ্ঠা।

অতিথিসেবা

মনু গৃহস্থের যে সকল প্রধান কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অতিথিসেবা একটি। উহার নাম নৃযজ্ঞ, উহাতে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। কিন্তু গৃহস্থ ত নিজে অতিথিসেবা করিতে পারেন না। উহা তাঁহার গৃহিণীর উপর সম্পূর্ণ ভার। গৃহিণী যদি সুন্দররূপে অতিথিসেবা করিতে পারিলেন, সে তাঁহার অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। পূর্ব্বকালে গৃহস্থমহিলারা প্রাণপণে অতিথিসেবায় নিযুক্তা থাকিতেন। কুন্তী বাল্যকালে অতিথিদিগের সেবা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এক দিন দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া তাঁহার নিকট উত্তপ্ত পায়স ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুন্তী নিতান্ত অতিথিবৎসলা; তিনি সেই উত্তপ্ত পায়সপাত্র হস্তে করিয়া ঋষিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তাঁহার হস্ত দগ্ধ হইয়া গেল, তথাপি তিনি কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। দুর্ব্বাসা বহুতর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

গৃহসামগ্রীর সুসংস্কার

কেশববৈজয়ন্তীকার এই সূত্রের পোষক শঙ্খলিখিত একটি সুদীর্ঘ বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

* গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা
ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং
বদ কিং ন মে হৃতম্। রঘুঃ

† ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ।

সঙ্কলিত শঙ্খলিখিত সংহিতার মধ্যে সে বচনটি পাওয়া যায় না। বচনের অর্থ এই।—

"প্রাতঃকালে পাকপাত্রের সংস্কার। গৃহদ্বার পরিষ্কার করা। অগ্নিচর্য্যার আয়োজন। গ্রাম্যাদি দেবতার পূজোপহারোদ্যোগ। স্বামীর পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শয়নসামগ্রীর যত্নপূর্ব্বক রক্ষা। পাকক্রিয়াকৌশল, পরিবারবর্গকে পরিতোষ করিয়া আহার করান" ইত্যাদি। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বহ্নিপুরাণের একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মার্থও এইরূপ।

অমুক্তহস্ততা ও সুগুপ্তভাণ্ডতা

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকের ধনাধিকার অতি অল্প। কিন্তু স্বামীর সমস্ত ধনই তাঁহার। স্বামিসঞ্চিত ধন তিনিই রক্ষা করিবেন। আয়ব্যয়ের তিনিই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু স্বামীর অনভিমতে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। সকল ঋষিই বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকে ব্যয়কুণ্ঠ হইবেন। "ব্যয়ে চামুক্তহস্ততা" "ব্যয়বিবর্জ্জিতা" "ব্যয়পরাঙ্মুখী" সকল সংহিতামধ্যেই পাওয়া যায়। যদি স্ত্রী অধিক ব্যয় করেন, স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেন। লক্ষ্মী বলিয়াছেন, আমি ব্যয়কুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকের গৃহে বাস করি। সুতরাং ব্যয়কুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণিত হইবে। বাস্তবিকও যাঁহারা অল্প আয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের পক্ষে, শুদ্ধ তাঁহাদিগের পক্ষেই কেন, গৃহস্থমাত্রেরই পক্ষে স্ত্রীলোকের ব্যয়কুণ্ঠিতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

মঙ্গলাচারতৎপরতা

মাঙ্গল্যদ্রব্য হরিদ্রা-কুঙ্কুমাদি ব্যবহার করিবে এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের নিকট যে সকল আচার শিক্ষা করিবে, তাহার পালনে সর্ব্বদা যত্নবতী হইবে। এই আচারগুলি শঙ্খলিখিত বচনে উল্লিখিত আছে। যথা—না বলিয়া কাহারও বাটী যাইবে না। কোথাও যাইতে হইলে উত্তরীয় ছাড়িয়া যাইবে না, দ্রুতপদে কোথাও গমন করিবে না, বণিক্‌, প্রব্রজিত, বৃদ্ধ ও বৈদ্য ভিন্ন পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবে না। কাহাকেও নাভি দেখাইবে না। বিস্তৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনাবৃত শরীরে কখন থাকিবে না ইত্যাদি।

স্বামী বিদেশে গেলে শরীরসংস্কার ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। এ স্থলে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, প্রোষিতভর্ত্তৃকা নারী শরীরসংস্কার, বিবাহ ও উৎসবদর্শন, হাস্য ও পরগৃহগমন পরিত্যাগ করিবে। মনু বলিয়াছেন—

যদি স্বামী কোনরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া বিদেশে গমন করেন, তবে স্ত্রীলোক অনিন্দনীয় শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিবে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় টীকাকার শঙ্খলিখিত একটি সুদীর্ঘ বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে সেটির অনুবাদ করিলাম না। পরগৃহ শব্দে টীকাকার লিখিয়াছেন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশুরাদির গৃহ ভিন্ন অন্য গৃহ বুঝায়। প্রোষিতভর্ত্তৃকাদিগের কি কর্ত্তব্যকর্ম্ম, তাহা যিনি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। পতিপ্রাণা যক্ষপত্নী সংবৎসর পর্য্যন্ত একবেণীধরা হইয়া যে কষ্টে সময় যাপন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে সকলেরই মনে করুণরসের আবির্ভাব হয়। যখন যক্ষ রামগিরিতে মেঘকে বলিতেছেন—

"তুমি দেখিবে যে, তিনি হয় দেবপূজায় ব্যস্ত আছেন, কিংবা বিরহে আমার শরীর কিরূপ কৃশ হইয়াছে, মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহাই চিত্রিত করিতেছেন, অথবা মধুরবচনা পিঞ্জরস্থিতা সারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সারিকে! তুমি তো তাঁহার বড় প্রিয় ছিলে, তাঁহার কথা কি তোমার মনে হয়?" *

তখন বোধ হয় যেন আমরা গবাক্ষপথে দেবারাধনশীলা দ্বারদেশদত্ত-পুষ্প-গণনা-তৎপরা, আধিক্ষামা সেই যক্ষপত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার শরীর কৃশ, তিনি বিস্তৃত শয্যার একপার্শ্বে শয়ানা আছেন; বোধ হইতেছে যেন, পূর্ব্বগগনপ্রান্তে কলামাত্রশেষ সুধাংশুমূর্ত্তি অবস্থিত। উহাতে আকাশের শোভা বিশেষ হইতেছে না, কিন্তু দর্শকের অন্তঃকরণ শোকে আপ্লুত হইতেছে।

কোন কর্ম্মে স্ত্রীলোকের ইচ্ছামত কার্য্য করিবার অধিকার নাই। মনু বলিয়াছেন, বালিকাই হউক, যুবতীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক, কোন কর্ম্মেই স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছামত চলিতে পারে না। স্ত্রীলোক তিন অবস্থায় পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে। কোন কালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।

---

*"আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে হয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, না হয় সহগামিনী হইবে। কিন্তু কাশীখণ্ডকার কহেন, বিধবারা ভূমিশয্যা আশ্রয় করিবে। অসময়ে আহার করিবে। পরিতৃপ্তি করিয়া আহার করিলে তাহাদিগের নরকদর্শন হইবে।

বিষ্ণুসংহিতায় স্ত্রীধর্ম্মনির্ণয়ের উপসংহারে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় দেখা যায়। যথা—

"স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র যজ্ঞ ব্রত বা উপবাস করা কিছুই নাই। স্বামীর শুশ্রূষা করিলেই স্বর্গে তাহার প্রতিপত্তি হয়। যে রমণী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস ব্রত আচরণ করে, সে স্বামীর আয়ু হরণ করে এবং নরকে গমন করে। সাধ্বী রমণী স্বামীর পরলোকপ্রাপ্তির পর, ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে।" *

এই প্রস্তাবের মধ্যে দক্ষ ও ব্যাস ভিন্ন আর সকল সংহিতারই সমালোচনা করা হইল। দক্ষসংহিতায় স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যনির্ণয় নাই। কিসে স্ত্রীলোকের প্রশংসা হয়, তাহা বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে। ব্যাসসংহিতায় বিষ্ণুসংহিতা অপেক্ষা অনেক বিস্তার ক্রমে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা আছে। পূর্ব্ব-প্রবন্ধে কাত্যায়নেরও কোন কথা উল্লেখ করি নাই। কাত্যায়ন সকল সংহিতার পরিশিষ্টস্বরূপ। যে সকল স্থান অন্য সংহিতায় অস্ফুট, কাত্যায়ন তাহার বৈশদ্য সম্পাদন করিয়াছেন। আর অন্য সংহিতায় যাহার উল্লেখ নাই, কাত্যায়ন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যের মধ্যে বিদেশগত স্বামীর অগ্নিরক্ষা একটি প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। কাত্যায়ন বলিয়াছেন, সৌভাগ্য দ্বারাই স্ত্রীলোকে শ্রেষ্ঠতালাভ করে। সেই সৌভাগ্য আবার অগ্নিরক্ষা দ্বারা লাভ হয়। আর সৌভাগ্যবতীর মুখ যদি কেহ প্রাতঃকালে দেখে, তাহার সমস্ত দিন মঙ্গল হয়। দুর্ভাগার মুখ দেখিলে, সে দিন বিবাদ-বিসংবাদে পড়িতে হয়। বিষ্ণুসংহিতার শেষভাগে নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—হে লক্ষ্মি! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে বাস কর? এই প্রশ্নের উত্তর হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কীদৃশ স্ত্রীলোকের গৃহে থাকিতে ভালবাস। তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করিলেন—

উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, অর্থসঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবতাদিগের পূজাপ্রিয়া, গৃহমার্জ্জনতৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, বিলোলুপা, ধর্ম্মকর্ম্মে অভিনিবিষ্টহৃদয়া, দয়ান্বিতা নারীতে আমি বাস করি। যেমন মধুসূদন আমার প্রিয়, ইহারাও সেইরূপ। * অতএব আমরা এই লক্ষ্মীর বাক্যে স্ত্রীচরিত্রের এক অতি সুন্দর চিত্র প্রাপ্ত হইলাম।

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে স্ত্রীলোকের যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিলে ও কলহবিরতা, পুত্রবতী, ইন্দ্রিয়সংযমবতী, দয়ান্বিতা হইলে, লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে চিরদিন বিরাজমানা থাকিবেন। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ যে সময়ে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ সংহিতাকরণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন স্ত্রীচরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল। ঐ ঋষিগণ সত্যমাত্র আশ্রয় করিয়াই স্মৃতিসংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীচরিত্র যতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহার উত্তম উত্তম চিত্র দিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিকগণ অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন।

ব্যাসলিখিত স্মৃতিসংহিতায় আর একটি উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। তাহার সবিস্তার অনুবাদ এই—

"পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি, মাতা অথবা বয়স, বিদ্যা ও বংশে সদৃশ বরে কন্যাসম্প্রদান করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পর পর ব্যক্তিকে দান করিবেন। সকলের অভাবে কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে। * * পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু আপনার দেহকে দ্বিধা পাটিত করেন। অর্দ্ধের দ্বারা পত্নী ও অপর অর্দ্ধের দ্বারা পতির উৎপত্তি হয়, এই শ্রুতি আছে।

যত দিন পর্য্যন্ত বিবাহ না করা যায়, তত দিন পুরুষকে অর্দ্ধকলেবর বলিতে হইবে। * * বিবাহানন্তর অগ্নি ও পত্নীর সহিত, গৃহনির্ম্মাণ করত বাস করিবে। আপনার ধনে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে এবং বৈতান অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে দিবে না। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গলাভে স্ত্রী ও পুরুষ সর্ব্বদা একমন

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপাসনম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসব্রতং চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে পত্যুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।

* নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু।
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু বলিব্যপেতাসু বিলোলুপাসু।
ধর্ম্মব্যপেক্ষিতাসু দয়ান্বিতাসু স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু।

হইবে, এবং একরূপ নিয়ম করিয়া চলিবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ত্রিবর্গসাধনের কোন স্বতন্ত্র পথ নাই। শাস্ত্রবিধির ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়া অথবা অতিদেশ করিয়াও স্বতন্ত্র পথের উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্ত্রী স্বামীর পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার দেহশুদ্ধি করিবে। শয্যা তুলিয়া রাখিবে এবং গৃহমার্জ্জন করিবে। অগ্নিশালা ও অঙ্গনের মার্জ্জন ও লেপন করিবে। তাহার পর অগ্নিপরিচর্য্যার কার্য্য করিবে ও গৃহসামগ্রী সকলের তত্ত্বাবধান করিবে। * * এইরূপে পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া গুরুদিগের পাদবন্দনা করিবে এবং গুরুজনপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার সকল ধারণ করিবে। কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইবে। নির্ম্মলচ্ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত থাকিবে। স্বামীর হিতকার্য্যে সখীর ন্যায়, আদিষ্টকার্য্যে দাসীর ন্যায় নিয়ত তৎপরা হইবে। তাহার পর অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে এবং অন্যান্য ভোক্তৃবর্গকে ভোজন করাইবে। পরে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া, অবশিষ্ট যে কিছু অন্নাদি থাকিবে, স্বয়ং ভোজন করিয়া দিবসের শেষভাগে আয়-ব্যয়-চিন্তায় নিযুক্তা থাকিবে। এইরূপ প্রত্যহ করিবে। স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইবে। আপনি অনতিতৃপ্তরূপে আহার করিয়া গৃহনীতি বিধান করিবে এবং উৎকৃষ্ট শয্যা আস্তীর্ণ করিয়া পতির পরিচর্য্যা করিবে। স্বামী শয়ন করিলে, তাঁহার নিকটে তাঁহারই পদে মনোনিবেশ করিয়া শয়ন করিবে।" এই পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের নিত্যকর্ম্ম গেল। ইহাতে পূর্ব্বপ্রবন্ধ হইতে কিছুই নূতন নাই। কেবল কিছু বিস্তার আছে মাত্র। ইহার পরে স্ত্রীলোকের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় গুণের কথা উল্লেখ আছে। যথা—"স্ত্রীলোকের যেন কোন বিষয়ে অনবধানতা না থাকে। তাহার যেন মনে থাকে, তাহার নিজের কোন কামনা নাই। ইন্দ্রিয়সংযমে তিনি যেন সর্ব্বদা যত্নশীলা থাকেন। তিনি কখনই উচ্চস্বরে কথা কহিবেন না। অধিক কথা কহা, পরুষবাক্য ব্যবহার ও স্বামীর অপ্রিয় কথা বলা তাঁহার পক্ষে দোষাবহ। তিনি যেন কাহার সঙ্গে বিবাদ না করেন এবং নিরর্থক প্রলাপবাক্য ব্যবহার না করেন, ব্যয় অধিক না করেন এবং ধর্ম্মার্থবিরোধী কোন কার্য্য না করেন। সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিকতা, সাহস, চৌর্য্য ও দম্ভ পরিবর্জ্জনীয়। এই সকল পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইলে ইহকালে যশঃ ও পরকালে স্বামীর সহিত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়।"

ব্যাসসংহিতার এই সুন্দর পরিষ্কার দীর্ঘ বর্ণনার পর আমাদিগের আর মন্তব্য প্রকাশ বৃথা। ইহা পাঠ করিলেই স্মৃতিসংহিতাকারেরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী অতি বিরল হইলেও ইহার মধ্যে বহুতর গুণশালিনী রমণী প্রাচীন ভারতবর্ষে, এমন কি, এখনও অনেক দেখা যায়। কতকগুলি অধুনাতন লোকের সংস্কার আছে যে, আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম ছিল না, সুতরাং এতকাল স্ত্রীলোকে কেবল দাসীবৃত্তি ও কলহ করিয়া সময়াতিপাত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের একবার অন্ততঃ ব্যাসসংহিতার বচন কয়েকটি পাঠ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের হস্তে শুদ্ধ দাসীর কর্ম্মমাত্রের ভার ছিল না, তিনি আয়-ব্যয়ের চিন্তা করিতেন, তাহার নাম দেওয়ানী। ব্যাসসংহিতা পাঠ করিয়া বরং মনে হয় যে, স্ত্রীলোক যদি দেওয়ান হইতে দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই কার্য্য করিল, পুরুষের কার্য্য কি? স্ত্রীলোকের মানসিক উন্নতি কিরূপ ছিল, তাহারও কতক প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। ব্যাস স্পষ্ট বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক যেন নাস্তিক না হয় এবং আর এক জন বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক যেন হেতুবাদ শাস্ত্র শিক্ষা না করে। হেতুবাদ করিতে বারণ করায় ও নাস্তিক্য নিষেধ করায়, স্পষ্ট অবগতি হইবে যে, নারীগণ পূর্ব্বকালে হেতুবাদ করিতে শিখিত এবং অতি দুরূহ ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে সময়ে সময়ে চিন্তা করিত। দক্ষসংহিতা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য বা গুণনির্ণয়ে যত্ন করেন নাই। তিনি উহাদের প্রধান প্রধান গুণের প্রশংসা করিয়াছেন এবং সংক্ষেপতঃ উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের একটি উদাহরণ দিয়াছেন। "পত্নী যদি স্বামীর মন বুঝিয়া চলেন এবং তাঁহার বশানুগা হন, তবে গৃহাশ্রমের ন্যায় আশ্রম নাই। তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক দ্বারাই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গফললাভ হয়। যদি বর্ত্তমান সময়ে স্নেহবশতঃ স্ত্রীদিগকে স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার হইতে নিবারণ না করা যায়, তবে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় সে পশ্চাৎ কষ্টের কারণ হয়।" স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার কথা মনুতে উক্ত আছে, আর পুরুষের ন্যায় উহাদিগকে তাড়না করার কথাও শঙ্খসংহিতায় আছে*—এবং এই

* "লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ।
লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতি নান্যথা।"

নিমিত্ত দক্ষও বলিলেন, প্রথম অবধি স্ত্রীলোককে শাসন করা কর্ত্তব্য। "অনুকূলকারিণী মিষ্টভাষিণী দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা জিতেন্দ্রিয়া স্বামিভক্তা নারী দেবতা, সে মানুষী নহে।" যাহার রমণী অনুকূলকারিণী, তাহার এইখানেই স্বর্গ ** এরূপ পরস্পর গাঢ়ানুরাগ স্বর্গেও দুর্লভ। কিন্তু যদি এক জন অনুরাগী ও আর জন অননুরাগী হয়, তাহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। গৃহে বাস সুখের জন্য, সে সুখের পত্নীই মূল। সেই পত্নীর বিজ্ঞা বিনয়বতী ও স্বামীর বশানুগা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি রমণী সর্ব্বদা খিন্না হয় এবং যদি উভয়ের মন এক না হয়, তাহা অপেক্ষা দুঃখ আর নাই। *** জলোকা কেবল রক্ত শোষণ করে, কিন্তু দুষ্টা রমণী ধন, বিত্ত, বল, মাংস বীর্য্য, সুখ শোষণ করিতে থাকে। সে বাল্যকালে সাশঙ্কা, আর যৌবনে বিমুখী হয় এবং আপনার বৃদ্ধপতিকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। অনুকূলা, মিষ্টভাষিণী, দক্ষা, সাধ্বী, পতিব্রতা রমণীই লক্ষ্মী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি নিত্য হৃষ্টমনা হইয়া যথাকালে যথাপরিমাণে স্বামীর প্রীতিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ভার্য্যা। ইতরা জরা।"

(১ম ও ২য় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তার্থ)

এতদূরে স্মৃতিশাস্ত্রীয় স্ত্রীধর্ম্ম-সমালোচনা সমাপন হইল। এই সমুদয় পাঠ করিলে প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল, এবং কি কি গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকে প্রশংসনীয় হইতে পারিতেন, তাহা কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যাইবে। যদিও পিতা, যাহাকে ইচ্ছা কন্যাদান করিতে পারিতেন, তথাপি তাঁহাকেও শাস্ত্রকথিত গুণশালী বরকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হইত। অন্যকে দিলে তাঁহার পাপ হইত ও ইহলোকে অপযশঃ হইত। বর ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের উপর যে কেবল দাস্যকার্য্যমাত্রেরই ভার থাকিত, এমন নহে, গৃহস্থের যে গুরুতর কার্য্য, সাংসারিক আয়-ব্যয়চিন্তা ও ধনসঞ্চয়, তাহার ভারও স্ত্রীর উপর অর্পিত হইত এবং বিদেশগত স্বামীর অগ্নিরক্ষায় কেবল স্ত্রীরই অধিকার ছিল। যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অনেক কম ছিল, তাঁহারা ইচ্ছামত সমাজাদিস্থলে যাইতে পারিতেন।

তাঁহারা যদিও সর্ব্বত্র দায়াধিকারিণী হইতে পারিতেন না, তাঁহাদের নিজের ধন কেহই কৌশল বা বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে পারিত না; করিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। স্বামী যদি স্ত্রীর ধন গ্রহণ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হন, তাহা হইলে সুদ শুদ্ধ টাকা রাজা দেওয়াইবেন। যদিও শাস্ত্রে কোন স্থানে স্পষ্ট লেখা নাই যে, বহুবিবাহ করিও না, তথাপি বহুবিবাহের এত নিন্দা আছে যে, বহুবিবাহ না করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড, এক প্রকার বিবাহকারীকে গালি দেওয়ার জন্য লিখিত বলিলেই হয়। কালিকাপুরাণে চন্দ্রের রাজযক্ষ্মারোগোৎপত্তি বহুবিবাহ-পাপের প্রতিফল। ধ্রুবোপাখ্যানেও বহুবিবাহের দোষ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বিধবাবিবাহ যদিও কলিযুগের জন্য মাত্র, কিন্তু অন্যান্য যুগে ব্রহ্মচর্য্যমাত্র ব্যবস্থা। পৌরাণিক ঋষিরা এবং সংহিতাসমূহের টীকাকার মহাশয়েরা বিধবাদিগের যে কঠোর ব্রত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন ঋষিরা ততদূর করেন নাই। নিষ্ঠুর সতীদাহ মনুসংহিতায় পাওয়া যায় না, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আছে। স্ত্রীলোকেরা যে লেখাপড়া শিখিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাদের উপর অসদ্ব্যবহার করিলে, সে গৃহে লক্ষ্মী থাকেন না। অনেক জাতির মধ্যে যেমন বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য, আর্য্যদিগের মতে তাহা নহে, তাঁহারা সন্তানলাভমাত্রের জন্য বিবাহ করিতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা অবিবাহিত থাকিতেন, কিন্তু অগস্ত্য ও জরৎকারু উপাখ্যান পাঠ করিলে বোধ হয়, ইঁহারা কেবল পিতৃবংশরক্ষার জন্যই বিবাহ করিয়াছিলেন।

স্মৃতিসম্মত উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র

বিবাহপ্রথা প্রচলিত হওয়ার পর অবধি স্ত্রীলোকে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সহবাস করিতে পারিতেন না; করিলে তাঁহার ইহকালে দুরন্ত শাস্তিভোগ করিতে হইত, এবং পরকালে অনন্ত নরকের ভয় থাকিত। স্ত্রীলোকে স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন। স্বামীর গৃহকার্য্য, অতিথিসৎকার, দেবপূজা ইত্যাদিতে তাঁহাদের আসক্ত থাকিতে হইত। স্বামী পতিত বা পলাতক হইলে, অন্য বিবাহ করিবার যদিও বিধি দেখা যায়, সে শুদ্ধ কলিযুগের জন্য। অন্যান্য যুগে স্বামী পতিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেও যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহাকে কুক্কুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া স্ত্রী যদি সরলস্বভাবা দয়ালু গুরুজনে

ভক্তিমতী, পুত্রাদিতে স্নেহশালিনী এবং পতিপরায়ণা হইলেন, তবে তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রধান ও পূজনীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। হেতুবাদ ও নাস্তিক্য স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁহারা ঈশ্বর-পরায়ণা হইবেন। তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং হৈতুকীদিগের অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্মবিষয়ে হেতুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ও যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গ সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কোনরূপ সাহসকর্ম্মে স্ত্রীলোক কখন প্রবৃত্ত হইবেন না। স্বামি-পুত্রাদির হস্ত হইতে আপনাকে স্বাধীন করিতে কখন চেষ্টা করিবেন না। সংস্কৃতে স্বৈরিণী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী এবং ব্যভিচারিণী একপর্য্যায়ের শব্দ। কুলটা শব্দ যদিও এক্ষণে দুই অর্থে ব্যবহার হয়, তথাপি প্রাচীন গ্রন্থে উহার সদর্থেরই বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

অত্যন্ত অভিমান, সকল কার্য্যে অনভিনিবেশ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যাত্যাগ করিলেই স্ত্রীলোক জগতের মাননীয়া হইবেন। বঞ্চনা, হিংসা, অহঙ্কার, স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকারে পরিহরণীয়। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ, পরদুঃখ দর্শনে কাতর হওয়া ও পরের ছন্দোনুবর্ত্তন করা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণনীয়। পরিষ্কার থাকা প্রাচীন ঋষিরা বড় ভালবাসিতেন। ঋষিপত্নীরাও সর্ব্বদা আপন শরীর, গৃহদ্বার ও তৈজসপত্র পরিষ্কার রাখিতেন। অপরিষ্কার ও অশুচি গৃহে লক্ষ্মী কখনই আসেন না, এই তাঁহাদের সংস্কার। স্ত্রীলোক যে অলঙ্কারপ্রিয় হয়, তাহা ঋষিরা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের আত্মীয়-বান্ধব ও অভিভাবকেরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে অলঙ্কারাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবেন। কিন্তু তাঁহারা আরও নিয়ম করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকে নিজে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। ব্যয়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ বলিয়া তাঁহারা নানা স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে স্বামীর ও স্ত্রীর ঐকমত্য অতীব প্রয়োজনীয়। যদি স্বামী শাক্ত হন ও স্ত্রী বৈষ্ণবী হন, তাহা হইলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাহা এদেশীয় কাহারও অবিদিত নাই। এ জন্য ঋষিরা নিয়ম করিয়াছেন, (এমন কি, বিষ্ণুর প্রথম সূত্রই এই) যে, স্ত্রীলোক স্বামীর সমানব্রতকারিণী হইবেন। যেমন অন্যান্য বিষয়েও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, সেইরূপ ধর্ম্মবিষয়েও তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। মুনিরা যেমন সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, লজ্জাশীলা গৃহকার্য্যতৎপরা পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের স্বামী হওয়াও অল্প পুণ্যের বলে হয় না। স্ত্রী যদি বাধ্য বশীভূত হইলেন, তবে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রভেদ কি? যদিও তাঁহারা স্ত্রীলোককে সংস্বভাব শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বলিয়াছেন, "সদ্ব্যবহার দ্বারা যাহাতে স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় আপন আপন কার্য্য করিতে যত্ন করে, তাহাই করিবে। যদি তাহারা আপন ইচ্ছায় না করে, তবে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কে সুনীতি শিক্ষা দিতে পারে?" "কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধা রমণী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিবেন, সখীর ন্যায় হিতকর্ম্মে তৎপরা হইবেন, দাসীর ন্যায় আজ্ঞাপালনে যত্নবতী হইবেন।" কেহ যে বলিয়াছেন, কলহ করা আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকের কার্য্য, সেটি তাঁহার অন্যায় বলা হইয়াছে, যেহেতু, শাস্ত্রে কলহবিরতাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রিয়বাদিনী ও কলহশূন্যা রমণী লক্ষ্মীর আবাসভূমি।

নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়। "অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি" এই শ্রুতি। স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হয়েন, স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের উল্লেখ করা গিয়াছে। যাহারা কোনরূপ প্রলোভনে না পড়িয়া উত্তমরূপে আপনাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিত্র প্রথমতঃ বর্ণনীয়। আর যাঁহারা নানারূপ প্রলোভনে পড়িয়াও আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে অণুমাত্র অনাস্থাপ্রদর্শন করেন নাই, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহাদের চরিত্র অপর এক অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে স্ত্রীচরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

সেটি প্রধানতঃ স্মৃতিশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে তাদৃশ নারীচরিত্রের কয়েকটিতে উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে। স্মৃতিমধ্যে ঋষিরা উদাহরণ-স্বরূপে একটিও স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ, প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত এবং পুরাণাবলী হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস;—পরাশর, অত্রি প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের সমকালবর্ত্তী। সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রন্থেই স্মৃতিসম্মত উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। পুরাণ অনেক পরের লেখা; পুরাণ-রচনা-সময়ে আর্য্যগণের সে তেজস্বিতা ও সেরূপ চরিত্রের ঔন্নত্য ছিল না। পুরাণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচার-ব্যবহার-প্রকাশেই অধিক পটু। ঋষিরা যেখানে বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্য করিবে, পুরাণ সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের যত নিয়ম পাইলেন, তাহা ত দিলেনই, তাহার পর আবার কতকগুলি লৌকিক আচারও তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। শুদ্ধ তাহাতেই তৃপ্ত নহেন, কঠোর ব্রতধারী ব্রহ্মচারীর কঠোর নিয়মও তাহার মধ্যে দিয়া ভয়ানক করিয়া তুলিলেন। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের টীকা করিতে গিয়া স্কন্দপুরাণে বৈধব্য আচরণ যে কিরূপ শোচনীয় ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, যাঁহারা সে পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। পতিসেবা ঋষিদিগের ব্যবস্থা, পুরাণ তাহার বিশেষ করিতে গিয়া যে কত আগ্‌ড়ম্ বাগ্‌ড়ম্ লিখিয়াছেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক, এ স্থলে আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ নারীগণের চরিত্রনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাদিগের মধ্যে প্রাচীন পুরন্ধ্রী অধিক। কয়েকটি পতিপ্রাণা যুবতীও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা আছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে কতকগুলি প্রধানা প্রকৃতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নারায়ণ বলিতেছেন—

রোহিণী চন্দ্রপত্নী চ (১) সংজ্ঞা সূর্য্যস্য কামিনী (২)। শতরূপা মনোর্ভার্য্যা (৩) বশিষ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী (৪)॥ অহল্যা গোতমস্ত্রী চা-(৫) প্যনসূয়াত্রিকামিনী (৬)। দেবহূতিঃ কর্দ্দমস্য (৭) প্রসূতী দক্ষকামিনী (৮)॥ পিতৄণাং মানসী কন্যা মেনকা সাম্বিকাপ্রসূঃ (৯)। লোপামুদ্রা (১০) তথাহূতিঃ (১১) কুবেরকামিনী তথা (১২)। বরুণানী যমস্ত্রী চ (১৪) বলের্বিন্ধ্যাবলীতি চ (১৫)। কুন্তী চ (১৬) দময়ন্তী চ (১৭) যশোদা (১৮) দেবকী তথা (১৯)॥ গান্ধারী (২০) দ্রৌপদী (২১) শৌব্যা সাবিত্রী সত্যবৎপ্রিয়া (২২)। বৃকভানুপ্রিয়া সাধ্বী (২৩) রাধামাতা কলাবতী (২৪)॥ মন্দোদরী (২৫) চ কৌশল্যা (২৬) সুভদ্রা (২৭) কৈটভী তথা (২৮)। রেবতী (২৯) সত্যভামা চ (৩০) কালিন্দী (৩১) লক্ষ্মণা তথা (৩২)॥ জাম্ববতী (৩৩) নাগ্নজিতী (৩৪) মিত্রবিন্দা তথাপরা (৩৫)। লক্ষ্মী চ (৩৬) রুক্মিণী (৩৭) সীতা (৩৮) স্বয়ং লক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা (৩৯)॥ কলা (৪০) যোজনগন্ধা চ ব্যাসমাতা মহাসতী (৪১)। বাণপুত্রী তথোষা চ (৪২) চিত্রলেখা চ তৎসখী (৪৩)॥ প্রভাবতী ভানুমতী (৪৪) তথা মায়াবতী সতী (৪৫)। রেণুকা চ ভৃগোর্মাতা (৪৬) হলিমাতা চ রোহিণী॥

উপরি-উক্ত গণনায় সকল সাধ্বীদিগের নামোল্লেখ নাই, কারণ, শ্রীবৎসপত্নী চিন্তা ও বালিরাজমহিষী তারা প্রভৃতি অনেকের নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আর উহাতে দেবতা ও মানুষীর কোন ইতরবিশেষ নাই; এবং প্রকৃতিখণ্ডে ইঁহাদের সকলের চরিত্র-বর্ণনাও নাই। এ প্রস্তাবে ইঁহাদের কয়েকজনের মাত্র জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইবে এবং তিন বা চারি জনের বিস্তৃত জীবনী সংগৃহীত হইবে।

লোপামুদ্রা। পৌরাণিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে হইলে কাশীখণ্ডস্থ লোপামুদ্রার চরিত্র-কীর্ত্তন পাঠ করা কর্ত্তব্য। এ জন্য আমরা এই বর্ণনাটি সবিস্তার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ঋষিরা নৈমিষারণ্যে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই অন্যান্য ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন, "হে মুনে! তোমার তপোলক্ষ্মী আছে—তোমার ব্রহ্মতেজঃ আছে, তোমার পুণ্যলক্ষ্মী আছে এবং তোমার মনের ঔদার্য্য আছে। এই পতিব্রতা কল্যাণী সুধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা তোমার অঙ্গচ্ছায়াতুল্যা। ইঁহার কথা শুনিলে অন্যে পবিত্র হয়। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনসূয়া, শাণ্ডিল্যা, সতী, খ্যাতরূপা লক্ষ্মী, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা প্রভৃতির ন্যায় ইনিও অতীব পতিপ্রাণা। কিন্তু ইঁহাকে যেমন শ্রেষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা আছে, এমন আর কাহারও নাই। তুমি ভোজন করিলে ইনি ভোজন করেন, বসিলে উপবেশন করেন, নিদ্রাগত হইলে নিদ্রাগতা হয়েন এবং তোমার অগ্রে শয্যা ত্যাগ করেন। পাছে তোমার আয়ুঃহ্রাস হয়, এই ভয়ে তিনি কখন তোমার নাম

গ্রহণ করেন না; পুরুষান্তরের নামও কখন মুখে আনেন না। 'এই কর্ম্ম কর,' বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়া, 'স্বামিন্, ক্ষমা কর' বলিয়া, তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তুমি আহ্বান করিলে গৃহকার্য্য ত্যাগ করিয়া সত্বর গমন করেন এবং বলেন, 'নাথ, কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন? আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন।' দ্বারদেশে অধিকক্ষণ থাকেন না। সর্ব্বদা দ্বারে গমন করেন না, তুমি আজ্ঞা না করিলে কাহাকেও কিছু দেন না, তুমি বলিবার অগ্রে পূজার সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেন। অনুদ্বিগ্নভাবে হৃষ্ট মনে যথাসময়ে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া সমস্ত সামগ্রী তোমার নিকট উপস্থিত করেন। তোমার উচ্ছিষ্ট ফলমূলাদি ভোজন করেন। পতিদত্ত সামগ্রী মহাপ্রসাদ বলিয়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। দেবতা, অতিথি, পরিবারবর্গ, গো-সমূহ ও ভিক্ষুগণকে না দিয়া কিছুই ভক্ষণ করেন না। সর্ব্বদা তৈজসপাত্র পরিষ্কার রাখেন। তিনি সকল কর্ম্মে দক্ষা, সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তা ও ব্যয়পরাঙ্মুখী। তোমাকে না বলিয়া ইনি কখন উপবাসাদি ব্রতাচরণ করেন না। তোমার অনুজ্ঞা ব্যতীত সমাজ ও উৎসবদর্শন ইনি দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। বিবাহদর্শনাদি এবং তীর্থযাত্রাদিতে তোমার অনুমতি বিনা প্রবৃত্ত হয়েন না। তুমি যখন সুখে নিদ্রা যাও বা সুখে উপবেশন করিয়া থাক, তখন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও তিনি তোমাকে কিছু বলেন না। স্নান করিবার পর ভর্ত্তৃবদনমাত্র দর্শন করেন আর কাহারও মুখ দেখেন না। যদি স্বামী নিকটে না থাকেন, মনে মনে তাঁহারই ধ্যান করেন। হরিদ্রাকুঙ্কুমসিন্দূরাদি মাঙ্গল্য আভরণ কখন ত্যাগ করেন না, রজকী হৈতুকী আশ্রমত্যাগীর সহিত কখন বন্ধুতা করেন না। যে স্বামীর দ্বেষ করে, তাহার মুখদর্শন করেন না। কোন স্থানে একাকিনী থাকেন না, উদূখল, মুষল, বর্দ্ধনী, প্রস্তর-দেহলী যন্ত্রক প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ যে যে স্থলে অনেক দুষ্ট স্ত্রীলোক একত্র হইবার সম্ভাবনা, সে সকল স্থলে কখন উপবেশন করেন না। স্বামীর সহিত প্রগল্ভতা করেন না। যে যে দ্রব্যে স্বামীর অভিরুচি, তিনি সেই সেই দ্রব্যেই সর্ব্বদা প্রেমবতী। তাঁহার ধারণা এই যে, স্বামীর বাক্য লঙ্ঘন না করাই স্ত্রীলোকের একমাত্র যজ্ঞ, একমাত্র ব্রত এবং একমাত্র দেবপূজা। স্বামী দুরবস্থ হউন, ব্যাধিত হউন, বৃদ্ধ হউন, সুস্থিত হউন, বা দুঃস্থিত হউন, তাঁহার বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী হৃষ্ট হইলে হৃষ্ট হইবে, বিষণ্ণ হইলে বিষণ্ণ হইবে। সম্পৎ ও বিপদ উভয় সময়েই একরূপই হইবে। ঘৃত-লবণ-তৈলাদি ফুরাইয়া গেলেও স্বামীকে 'নাই' এ কথা বলিবে না; এবং তাঁহাকে আয়াসকর কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। তীর্থস্নানের ইচ্ছা হইলে স্বামীর পাদোদক পান করিবে। স্ত্রীর পক্ষে স্বামী শঙ্কর বা বিষ্ণু সকল হইতেই অধিক। যিনি স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন ব্রতোপবাসাদি করেন, তিনি স্বামীর আয়ুঃ হ্রাস করেন এবং মরিয়া নরকগমন করেন। ডাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর দেয়, সে যদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে, তবে কুক্কুরী হয় এবং বনে জন্মগ্রহণ করে, তবে শৃগালী হয়। স্ত্রীলোকের এই ধর্ম্ম যে, স্বামীর চরণসেবা করিয়া আহার করিবে। কখন উচ্চ-আসনে বসিবে না, পরের বাটী যাইবে না, লজ্জাকর বাক্য ব্যবহার করিবে না। কাহারও অপবাদ করিবে না। দূর হইতে কলহ ত্যাগ করিবে। যে তাড়িত হইয়া স্বামীকে তাড়ন করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যাঘ্রী হয়। দূর হইতে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া যে নারী ত্বরিত-গমনে জল, খাদ্য, আসন, তাম্বূল, ব্যজন, পদসংবাহনা ও চাটুবচন দ্বারা প্রিয়ের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে, সেই ত্রৈলোক্য জয় করে। পিতা অল্পপরিমাণে দেন, ভ্রাতাও অল্পপরিমাণে দেন, পুত্রও অল্প-পরিমাণে দেন, স্বামী যাহা দেন, তাহার পরিমাণ নাই, অতএব এমন স্বামীকে কে না পূজা করিবে? স্বামী দেবতা, গুরু, তীর্থ, ধর্ম্ম ও ক্রিয়া। অতএব সকল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবা করিবে। জীবহীন দেহ যেমন অশুচি হয়, স্বামিহীন স্ত্রীও সেইরূপ অশুচি।

লোপামুদ্রার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল এবং তাঁহাকে এই শ্রেণীর কামিনীগণের আদর্শস্বরূপ বলিয়া গণনা করা যায়। তাঁহা অপেক্ষা অনেক গুণবতী রমণী এই শ্রেণীর অন্তর্গতা, এবং তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্পগুণবিশিষ্টাও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা। কিন্তু তিনিই আদর্শ। তাঁহার চরিত্র রামায়ণেও বর্ণিত আছে। যেমন পুণ্যশ্লোক শব্দটি যুধিষ্ঠিরাদি কয়েক জন ভাগ্যবানের বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ "যশস্বিনী" শব্দটি লোপামুদ্রার বিশেষণ।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান তৎকালীন স্ত্রী-চরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঋষিপালিতা শকুন্তলা রাজার দর্শনাবধি তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। রাজাও গান্ধর্ব্ববিধানে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। রাজার ঔরসে তাঁহার এক পুত্র হইল। রাজা কিন্তু রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুন্তলার কোন সংবাদ লইলেন না। শকুন্তলা

পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিয়া সন্তান ক্রোড়ে করিয়া রাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা শকুন্তলাকে চিনিলেন; কিন্তু দুষ্টামী করিয়া কহিলেন, "তুই কুলটা, আমি তোকে কখন চিনি না"। শকুন্তলা তখন রাজাকে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিলেন। যে প্রতারণা করিতে বসিয়াছে, তাহাতে তাহার স্মরণ কেন হইবে? শকুন্তলা তখন রাজাকে মিথ্যা কথা কহার কতকগুলি দোষ দেখাইয়া দিলেন এবং এরূপ সাহসের সহিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে, সভাস্থ তাবৎ লোকেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল। রাজাও শেষ তাঁহাকে আপন ধর্ম্মপত্নী বলিয়া স্বীকার করিলেন, আর প্রতারণা করিতে পারিলেন না। মহাভারত ও রামায়ণে সাধ্বীগণের এরূপ অপূর্ব্ব সাহস দেখা যায় যে, তাহা পাঠ করিলে তৎকালীন রমণীকুলের চরিত্র অতি উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। শকুন্তলা, দেবযানী, দ্রৌপদী, সীতা সকলেই সাহসসহকারে স্বামীর সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন এবং দুষ্টলোকদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। এরূপ সাহস দূষণাবহ নহে, বরং ইহাকে একটি গুণের মধ্যে গণনা করা উচিত। আমার চরিত্রে পাপস্পর্শ নাই এবং পাপে আমার মন নাই, এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই ওরূপ সাহস জন্মে। মহাভারতে পতিব্রতোপাখ্যান বলিয়া একটি অধ্যায় আছে। স্ত্রীলোকের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাহার যে কিরূপ সাহস হইত, উহাতে তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে।

সাবিত্রী।—এক্ষণে আমরা এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান রমণীর চরিত্র বর্ণনা করিব। তাঁহার নাম সাবিত্রী। তিনি অশ্বপতি রাজার কন্যা। মহারাজ অশ্বপতি কন্যাকে বিবাহের উপযুক্তবয়স্কা দেখিয়া বলিলেন, 'সাবিত্রি! তোমার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে, অতএব তুমি আমার এই বিশ্বস্ত সারথির সহিত গমন কর। তুমি যাহাকে আপন পতিত্বে বরণ করিবে, তাহারই সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি ইহাতে লজ্জিত হইও না, ইহাই আগমোক্ত বিধি, এবং এইরূপেই অনেক রমণী অভিলষিত পতি লাভ করিয়াছে।" সাবিত্রী সেই সারথির সহিত নানাদেশে পরিভ্রমণ করত রাজ্যভ্রষ্ট দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে তপোবনমধ্যে দেখিতে পাইলেন। দ্যুমৎসেনের শত্রুরা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার চক্ষুঃ উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। সত্যবানের গুণের পরিচয় পাইয়া সাবিত্রী তাঁহাকে মনে মনে স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ আসিয়া অশ্বপতি রাজাকে কহিলেন, 'তোমার কন্যা সত্যবান্‌কে বিবাহ করিবার জন্য মনন করিয়াছে; কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে উহার মৃত্যু হইবে।' শুনিয়া অশ্বপতি কন্যাকে বিস্তর বুঝাইলেন যে, তুমি সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি অন্বেষণ কর। তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞা সাবিত্রী কহিলেন, * 'তিনি দীর্ঘায়ু হউন আর অল্পায়ু হউন, গুণবানই হউন, আর নির্গুণই হউন, আমি যাঁহাকে একবার বরণ করিয়াছি, তিনিই আমার ভর্ত্তা; আমি অন্য লোককে বরণ করিব না। লোকে একবার বৈ ভাগ লইতে পারে না, কন্যা একবার বৈ দান করা যায় না, দিলাম, এ কথা একবার বৈ বলা যায় না, এ সকল একবার বৈ দুইবার হয় না।'

তখন রাজা কন্যার মন ঈপ্সিতার্থে কৃতনিশ্চয় জানিয়া সত্যবানের সহিত বিবাহ দিলেন। সাবিত্রী কায়মনোবাক্যে অন্ধশ্বশুরের ও তপোবনগত গুরুজনের সেবায় তৎপরা হইলেন এবং নিরন্তর দেবসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। সর্ব্বদা প্রার্থনা, হয় সত্যবানের মৃত্যু না হউক, না হয় স্বয়ং উহার অনুমৃতা হউন। ক্রমে মৃত্যুর তিথি উপস্থিত। পতিপ্রাণা সাবিত্রীর মন আকুল হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া স্বামীর সহিত ফলমূলাহরণার্থ বনগমনে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সত্যবানের বাধা অতিক্রম করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত দিন নিবিড় বনমধ্যে পর্য্যটন করিলেন। সায়ংকালে সত্যবান্ ফলভার মস্তকে করিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া প্রবল শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, 'প্রিয়ে, তুমি এই স্থানে উপবেশন করিয়া ফল রক্ষা কর। আমি তোমার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করি। শিরঃপীড়ায় আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।' তখন সাবিত্রী অন্তরে বুঝিলেন যে, সেই নিদারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন, স্বামীর অঙ্গ ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিল। তখন একাকিনী শব ক্রোড়ে করিয়া কত যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাহা কে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে? ক্রমে রজনী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সাধ্বীর ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ আনয়ন

* দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽথবা।
সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্।
সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ।

করা যমদূতদিগের কার্য্য নহে। যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, 'সাবিত্রি! তোমার স্বামীর দেহে এক্ষণে আমার অধিকার হইয়াছে। তুমি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে কেন বাধা দিতেছ? তোমার ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিতে আমারও সাধ্য নাই। তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর।' সাবিত্রী তাহাই করিলেন। যমরাজ মৃতদেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মূল শরীর সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী নির্ভীকচিত্তে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাবিত্রি! তুমি কেন আমার অনুবর্ত্তন করিতেছ, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র লাভ নাই। বৃথা পরিশ্রম হইতেছে মাত্র।' তখন সাবিত্রী কহিলেন, "স্বামীর সমীপে আমার শ্রম কোথায়? * স্বামী যে স্থানে গমন করিবেন, আমিও সেইখানে যাইব। হে সুরেশ! আপনি আমার স্বামীকে যেখানে লইয়া যাইতেছেন, আমি তথায়ই গমন করিব।"

কিয়দ্দূর গমন করিয়া যমরাজ বলিলেন, "তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন কি প্রার্থনা কর?" তিনি বলিলেন, "যাহাতে আমার শ্বশুরের অন্ধত্ব মোচন হয়, করুন।" যমরাজ "তথাস্তু" বলিলে সাবিত্রী পুনরায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। যমরাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বরে তাঁহার শ্বশুরের রাজ্যপ্রাপ্তি ও পিতার শত পুত্র হইবে বলিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিলেন। সাবিত্রী তথাপি আসিতেছেন দেখিয়া যমরাজ কহিলেন, "তুমি বাটী ফিরিয়া যাও, সেখানে তুমি রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। তুমি কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছ?" সাবিত্রী তখন পুনরায় কহিলেন, "স্বামীর সহিত গমনে আমার শ্রম কোথায়? আর আপনি যে রাজ্যভোগের কথা কহিতেছেন, আমার স্থির প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন। স্বামী বিনা আমার সুখে কাজ নাই। † স্বামী বিনা আমার সৌভাগ্যে কাজ নাই। স্বামী বিনা আমি স্বর্গেও যাইতে চাহি না। স্বামিহীন জীবন আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।"

তখন যমরাজ জানিলেন, সাবিত্রী সামান্যা রমণী নহেন। তিনি সাবিত্রীর পতিপরায়ণতার বিস্তর প্রশংসা করিয়া তাঁহার স্বামীর জীবন তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। সাবিত্রী পতিদেহে তাঁহার আত্মা সংযোগ করিয়া দিলে সত্যবান্ জীবনপ্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, "উঃ, অনেক রাত্রি হইয়াছে। পিতামাতা আহারাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।" এই বলিয়া সত্বরপদে তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও পূর্ণমনোরথ হইয়া হর্ষদ্বিগুণিতবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, সাবিত্রী প্রাচীনকালের রমণী-চরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র কি না। সাবিত্রী বাল্যকালে পিতার বশীভূতা ছিলেন। পরে পিতার আদেশানুসারে অভিমত পতিলাভ করিবার জন্য পিতার এক জন সারথির সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে বর মনোনীত করেন, তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন। ইহাতে সাবিত্রী লোকবৃত্তান্তবিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শিনী ছিলেন বোধ হয়। তিনি শুদ্ধ ঐশ্বর্য্য, রূপ বা বল দেখিয়া বর মনোনীত করেন নাই। সত্যবান্ তখন এক জন অন্ধমুনির পুত্র, নিজে বন হইতে ফলমূলাহরণ করিয়া পিতামাতার ভরণপোষণ করেন। তাঁহার অবস্থায় এমন কিছুই ছিল না—যাহাতে রমণীর মন আকর্ষণ করে।

একবার সত্যবান্‌কে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সাবিত্রী তাঁহাকে চিরদিনের জন্য পতিরূপে বরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ ও মহারাজ অশ্বপতি কত বুঝাইলেন, শুনিলেন না। বলিলেন, এ সকল কাজ একবার ছাড়া দুইবার হয় না। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া অন্ধশ্বশুরের সেবায় ও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। তিনি যে স্বামীর মৃত্যুতিথি জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা এক দিনের জন্যও কাহাকে জানিতে দিলেন না। কিন্তু সর্ব্বদাই ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ কঠোর নিয়ম ও ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর দিবস উপস্থিত জানিয়া কাহারও কথা না শুনিয়া স্বামীর সহিত বনে গেলেন। সেখানে যাহা যাহা ঘটিল, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যমরাজকে শব দিয়া অবধি তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যমরাজ বর দিতে আসিলে চতুরা সাবিত্রী এই সুযোগে পিতা ও শ্বশুরের শুভবর প্রার্থনা করিলেন। তিনি স্বামিবিয়োগে অধীরা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার

* শ্রমঃ কুতো ভর্ত্তৃসমীপতো মে
যতো হি ভর্ত্তা মম সা গতির্ধ্রুবম্।
যতঃ পতিং নেষ্যতি তত্র মে গতিঃ
সুরেশ........................।

† ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা সুখং
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ম্।
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা দিবং
ন ভর্ত্তৃহীনং ব্যবসামি জীবিতম্।

জ্ঞান ছিল। ওরূপ ভয়ানক সময়ে বর দিতে আসিলে প্রাকৃত রমণীরা কখনই সাবিত্রীর ন্যায় দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন না। স্বামী তাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহা বলিয়া পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য-কর্ম্ম তিনি একবারও বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি যদি শুদ্ধ পতিব্রতা হইতেন, সেই ঘোর রজনীতে স্বামীর মৃতদেহের উপর স্বয়ংও প্রাণত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে তিনি রমণীকুলের শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য হইতেন না। কত শত পতিপরায়ণা রমণী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু সাবিত্রীর ন্যায় কেহই জগতীতলে মাননীয়া হয়েন নাই। সাবিত্রী পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহার সন্দেহই নাই। কিন্তু তাঁহার অনন্যনারীসাধারণ অনেক গুণও ছিল এবং সেই জন্যই এতদ্দেশীয় রমণীরা জ্যৈষ্ঠমাসে সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন। কোন্ রমণী এক বৎসরের মধ্যে পতির মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে তাঁহাকে বিবাহ করেন? কোন্ রমণী বৎসরাবধি সেই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিতে পারেন? কেই বা তাদৃশ ঘোর বিপৎপাতসময়ে হতচেতনা না হইয়া অভিলষিত সিদ্ধিতে দৃঢ়নিশ্চয়া হইতে পারেন? এবং কেই বা তাদৃশ সময়ে আপনার সকল কর্ত্তব্য-কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারেন?

স্মৃতিসংহিতাদিতে যত গুণ থাকা প্রয়োজন বলে, সাবিত্রীর তাহা সকলই ছিল। তাহার উপর তাঁহার পুরুষের ন্যায় নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি নানা গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সাবিত্রীর অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সত্য বটে, তাঁহাকে সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় নানা প্রলোভনে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্র দৃষ্টে বোধ হয়, সেরূপ প্রলোভনে পড়িলে তিনি তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিক যশস্বিনী হইতে পারিতেন। তিনি এই শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টস্বভাবা, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। দময়ন্তী, সীতা প্রভৃতি রমণীগণাপেক্ষাও অনেক বিষয়ে তাঁহাকে উন্নত-চরিত্রা বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

শেষোক্ত শ্রেণীর কামিনীগণের মধ্যে দ্রৌপদী, দময়ন্তী ও সীতা সর্ব্বপ্রধান। শ্রীবৎসমহিষী চিন্তা, ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী প্রভৃতি নারীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূতা। ইঁহাদের চরিত্রের মধ্যে পতিপরায়ণতাই বিশেষ গুণ। গান্ধারীর স্বামী অন্ধ হইলেও তিনি যাবজ্জীবন স্বামিশুশ্রূষা করিয়াছেন এবং তিনি চিরদিন সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শাপে কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি পুত্রাদির মৃত্যুর পর তাহাদিগের রমণীবর্গকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তাহাদের সকলেই সহগমন করিল। তিনি শোকজর্জ্জরিত হইয়াও স্বামীর সেবার জন্য জীবিত রহিলেন এবং পরিশেষে আশ্রমে থাকিয়া পতির সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী স্বয়ংবরে দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নলকে বিবাহ করেন এবং বনমধ্যে তিনি নানাবিধ কষ্ট পাইলেন, এই দুই কারণেই তিনি আমাদিগের দেশে আদরণীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে কলি স্পর্শ করিতে পারে না। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে প্রিয়বাদিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার অন্য কোন গুণের কথা উল্লেখ করেন নাই। উপরি-উক্ত দুইটি কার্য্য দ্বারাই তাঁহার চরিত্রের ঔন্নত্য ও বিশুদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। অহল্যা বিবাহিতা এবং পুত্রবতী হইয়াও, যে প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া নানা কষ্ট পাইলেন, দময়ন্তী অবিবাহিতা বালিকা হইয়াও সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করিলেন।

শ্রীবৎস রাজার মহিষী চিন্তার চরিত্র অনেক অংশে দময়ন্তীর সদৃশ। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে শনির দশা হয় না।

দ্রৌপদী সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি প্রশংসনীয়া কামিনী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যাহাদিগকে বিবাহ করিলেন, তাহাদের রাজ্য নাই। তাহারা অতি দুঃখী, ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট। বিবাহের পর এক কুম্ভকারের গৃহে উপস্থিত। এই তাঁহার শ্বশুরালয়। শেষে তাঁহার স্বামীরা রাজ্য পাইল। তিনি রাজমহিষী হইলেন। রাজসূয়যজ্ঞ হইল, ইহাতে তিনি লোকের সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন যে, সকলেই তাঁহাকে সুখ্যাতি করিতে লাগিল। শেষে যুধিষ্ঠিরের দোষে রাজ্য গেল, ধন গেল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী পর্য্যন্ত হারিলেন, সভার মধ্যে দুরাত্মারা তাঁহার যার-পর-নাই অবমাননা করিল। পরে তিনি স্বামীদিগের সহিত বনগামিনী হইলেন। অর্জ্জুনের আরও ভার্য্যা ছিল, ভীমেরও ছিল, সকলেই আপন আপন বাটী রহিল, কেবল

দ্রৌপদী স্বামিভাগ্যে আপন ভাগ্য মিশাইলেন। বনেও তাঁহার কষ্টের একশেষ। তিনি স্বামীদিগের সেবা করিতেন; যুধিষ্ঠিরের সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন; অনেক রাত্রিতে স্বয়ং ভোজন করিতেন; সর্ব্বদা নীতিশাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। তিনিই পরামর্শ দিয়া অর্জ্জুনকে ইন্দ্রসন্নিধানে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডব-সৌভাগ্যের সূত্রপাত করেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। দ্রৌপদী সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেন। এক দিন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দ্রৌপদীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী আর আছে? যদিও দ্রৌপদী কোনরূপে অসহ্য বনবাসযন্ত্রণা সহ্য করিলেন, তাহার পর আবার দাসত্ব। বনে যেমন জয়দ্রথ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে, বিরাটরাজভবনে কীচকও সেইরূপ অত্যাচার করিল। দুইবারই ভীম তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তাহার পর যুদ্ধের উদ্যোগের সময় তিনি এক জন প্রধান উদ্যোগিনী। যুদ্ধের পর আর তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বভ্রুবাহনহস্তে অর্জ্জুনের পরাভব হইলে তিনি অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়া উঁহার পুনরুদ্ধারসাধন করিলেন পরে স্বামীদিগের সহিত মহাপ্রস্থানে গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই দেহত্যাগ করিলেন।

"দ্রৌপদী সতীলক্ষ্মী ছিলেন। যদিও তাঁহার পঞ্চস্বামী হইয়াছিল, তিনি সেই পঞ্চস্বামীরই মনোরমা হইয়া সতীর মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা দয়াশীলা ছিলেন এবং অধীনগণকে মাতার ন্যায় পালন করিতেন। রাজকন্যা ও রাজভার্য্যা হইয়াও তিনি পতিগণের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এই সকল গুণে তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে।"

সীতা। বাল্মীকির সীতা একটি সুশীলা ও শান্তস্বভাবা বালিকা—তিনি বিবাহের পর সর্ব্বদা স্বামিশুশ্রূষায় ব্যাপৃতা থাকিতেন। রামচন্দ্র এই সময়ে সীতার সহবাসে যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই সেইরূপ বিশুদ্ধ আমোদলাভের জন্য উৎসুক থাকিতেন। রাম কেকয়ীর গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সীতাকে বনগমনের কথা বলিলেন, তখন সীতাও তাঁহার সহগামিনী হইতে উৎসুক হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয় করুণরসে আপ্লুত হয়। সীতা বনবাসে যাইবেন, রাম তাঁহাকে বাধা দিবেন। রাম কত বুঝাইলেন, বনগমনের নানা কষ্ট বর্ণনা করিলেন; গৃহবাসের সুখ বর্ণনা করিলেন; গৃহবাস করিলে নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারা যায় এবং তাহা দ্বারা স্বামীর নানাবিধ কল্যাণসাধন করিতে পারা যায়। সীতা অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, 'আমায় না লইয়া বনে যাওয়া তোমার কোনমতেই উচিত নহে।* তোমার সহিত তপস্যাই করি, আর বনেই বাস করি, সেই আমার স্বর্গ। আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া কিছুতেই ক্লান্তি বোধ করিব না। তুমি আমায় যে কুশ-কাশ-শরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ও কণ্টকীবৃক্ষের ভয় দেখাইতেছ, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার সহিত গমনকালে তাহাদের স্পর্শ তূলা ও অজিনের ন্যায় কোমল হইবে।' এই বলিয়া তিনি রামের গলদেশ ধারণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না, তিনি উঁহাকে বনে লইয়া যাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রামের সহিত শ্বশ্রূ-শ্বশুরদিগকে প্রণাম করিয়া সীতা বসন-ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটা ও বল্কল ধারণ করিতে গেলেন। তিনি নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা। বল্কল কিরূপে ধারণ করিতে হয়, জানেন না। তিনি একখানি চীরবস্ত্র হস্তে ধারণ ও অপরখানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং অপ্রতিভমুখে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, 'স্বামিন্! চীরধারণ কিরূপে করিতে হয়?' রাম তখন সীতার কৌষেয় বস্ত্রের উপরি চীরদ্বয় সংযোগ করিয়া দিলেন। তাহার পর সীতা স্বামীর সহিত বনে বনে নানা কষ্ট পাইয়াছেন। পথগমনে তিনি সর্ব্বদাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। কদর্য্য বনফল মাত্র তাঁহার আহার ছিল; পর্ণশয্যায় শয়ন ছিল; কিন্তু তাঁহার সে সকল কষ্ট কেবল রামমুখাবলোকন করিয়া দূর হইত। চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটীগমনসময়ে সীতা রামকে অকারণ বৈর করিতে নিষেধ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

যখন রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল,

* স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি।
তপো বা যদি বারণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়া সহ॥
ন চ মে ভবিতা কশ্চিত্তত্র পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেম্বিব॥
কুশকাশশরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তূলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥

সে রথের উপরে তাঁহাকে কত বুঝাইতে লাগিল। 'সীতে, আমিই তোমার সদৃশ পতি। তুমি আমার স্ত্রী হও। দেবতারাও তোমার অধীন হইবে। আমার পাটরাণীও তোমার দাসী হইবে। পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে।' সীতা তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তাহাকে বলিলেন, 'রামের সহিত তুলনায় তুমি শৃগালস্বরূপ, দাঁড়কাকস্বরূপ। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তুমি আমায় হরণ করিতেছ, ইহার জন্য তোমায় সবংশে মরিতে হইবে।'

যখন রাবণের অন্তঃপুরে তিনি বন্দী, রাবণ প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করে, তাঁহার পায়ে পড়িয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে; সীতা তাহাকে কেবল বলেন, 'রাম নামে পরম ধার্ম্মিক পুরুষ, তিন লোকে বিখ্যাত, তাঁহার বাহু দীর্ঘ ও নয়ন বিশাল, তিনিই আমার স্বামী ও আমার দেবতা।' *

অনেক দিন এইরূপে গেলে একদিন রাবণ বলিল, 'তুমি যদি আর একমাসের মধ্যে আমায় স্বামী বলিয়া স্বীকার না কর, তোমার মাংসভোজন করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিব।' তখন পতিপরায়ণা সীতা অণুমাত্র ভীতা না হইয়া বলিলেন, 'আমার এ শরীর সংজ্ঞাশূন্য, তুমি ইচ্ছা হয়, ইহাকে রক্ষা কর, ইচ্ছা হয়, ইহাকে নাশ কর, আমি শরীর ও জীবন কিছুই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না।' †

হনুমান্ আসিয়া অশোকবনমধ্যে সীতাকে দেখিলেন। সীতা মজ্জনোন্মুখ নৌকার ন্যায় শোকভারে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত অশ্রুপাত করিতেছেন; রাবণ তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক রাক্ষসী রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা দিনরাত তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছে, ভয় দেখাইতেছে, কখন বা তাঁহাকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে! কিন্তু তিনি আপনগুণে সেই ভয়ানক রাক্ষসপুরীমধ্যেও ত্রিজটা ও সরমা নাম্নী দুই রাক্ষসীকে সখী পাইয়াছেন। তাহারা অবসর পাইলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করে। হনুমান্‌কে দেখিয়া সীতা অনেক দিনের পর আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি হনুমান্‌কে আশীর্ব্বাদ করিলেন, রামকে আপন মনের কথা বলিয়া পাঠাইলেন। তখন তাঁহার ভরসা হইল, রাম তাঁহাকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন।

রাবণবধের পর বিভীষণকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সীতা উপস্থিত হইলে বলিলেন, 'সীতে! আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিয়াছি, শত্রুনাশ করিয়াছি এবং কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছি। আজি বিভীষণাদির শ্রম সফল হইল।' এই সকল কথা শুনিয়া সীতার মুখ বিকসিত হইল; আনন্দাশ্রুতে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গেল। তখন রাম কর্কশস্বরে কহিলেন, 'জানকি! আমার কর্ম্ম আমি করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি পরগৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ। আমি সৎকুলপ্রসূত হইয়া তোমাকে গ্রহণ করিলে কেবল নিন্দাভাগী হইব মাত্র। অতএব তোমায় অনুমতি দিতেছি, তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয়, আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা কর।' সীতা এই পরুষবাক্যে অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, 'স্বামিন্, তুমি আমাকে প্রাকৃত রমণীর ন্যায় ভাবিলে। আমি লঙ্কাপুরীর মধ্যে কি অবস্থায় বাস করিয়াছি, তোমার দূত হনুমান্ সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে। অতএব এক্ষণে আমাকে এরূপে পরিত্যাগ করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে? তুমি যে বাল্যকালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, সে কথা একবার মনেও করিলে না! আমার স্বভাব ও ভক্তির কথা সমস্তই ভুলিয়া গেলে?' *

এই বলিয়া লক্ষ্মণকে চিতাসজ্জা করিতে কহিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহ্নিপ্রবেশসময়ে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "যেহেতু আমার মন কখনও রাম হইতে অপনীত হয় নাই, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন। যেহেতু রামচন্দ্র আমায় শুদ্ধচরিত্রা বলিয়া জানেন, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন। যেহেতু আমি কায়মনোবাক্যে রামচন্দ্রেরই সেবা করিয়াছি, অন্য কাহারও কথা কখন মনে করি নাই, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন।" †

* রামো নাম স ধর্ম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্ম্ম ম।
† ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং রক্ষ বা ঘাতয়স্ব বা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতঞ্চাপি রাক্ষস।

* ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্।
† যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ।

অগ্নিপ্রবেশ করিলে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। সকলে ধন্য ধন্য বলিয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল।

সীতা বহুকাল রামগৃহে অবস্থান করিলে পর ভদ্রক নামে এক জন লোক প্রসঙ্গক্রমে সভামধ্যে বলিল, রাবণগৃহে বহুকাল থাকিলেও রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রজারা অনেকে তাঁহার নিন্দা করে। রাম ক্ষত্রিয়পুরুষ, তাঁহার ধমনীতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়শোণিত প্রধাবিত, তিনি তৎক্ষণাৎ সীতা-পরিত্যাগে সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তুমি আশ্রমগমনব্যপদেশে সীতাকে ভাগীরথীতীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস।" লক্ষ্মণও সীতাকে লইয়া গেলেন। সীতা নিদারুণ পরিত্যাগসংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হতচেতন হইয়া রহিলেন। পরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, নিরন্তর নিতান্ত দুঃখভোগের জন্যই আমার দেহ সৃষ্টি হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বজন্মে যে কি পাপ করিয়াছিলাম, কোন্ পতিপরায়ণা নারীকে অসহ্য পতিবিরহ-যন্ত্রণা দিয়াছিলাম, বলিতে পারি না, নচেৎ নৃপতি আমায় কেন পরিত্যাগ করিবেন?" পুনশ্চ বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমি আর্য্যপুত্রকে বলিও যে, তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনিই আমার পরম গতি। তাঁহাকে সর্ব্বদা আপন কর্ম্মে অবহিত হইতে বলিও।" এরূপ সময়েও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পতিকল্যাণ কামনা করা প্রাকৃত রমণীর কার্য্য নহে। সীতার বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাব এবং অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ পাইতেছে।

অনাথা সীতা আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিলেন এবং ঋষিরা আবার রামকে তাঁহার পুনর্গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রামও আবার সর্ব্বসমক্ষে সীতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নিপরীক্ষা নহে—এবার শপথ। সীতা যখন সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার নয়ন স্বপদে অর্পিত, তাঁহার মনের ভাব কিরূপ, তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। তাঁহার অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় প্রণয় পূর্ব্ববৎই আছে; কিন্তু সভামধ্যে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দেওয়ায় তাঁহার মনে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে; প্রাচীন রমণীসুলভ তেজও বিলক্ষণ আছে। তিনি সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া করুণ স্বরে স্বীয় জননী পৃথিবীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে এবং তাঁহার সকরুণ বচনাবলী পাঠ করিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং সহৃদয়হৃদয়ে গভীর শোকসাগর উথলিয়া উঠে। তিনি বলিতে লাগিলেন, "যে হেতু রাম ভিন্ন অন্য কাহার কথা আমি কখন মনেও করি নাই, অতএব হে দেবি পৃথিবি! তুমি আমায় অবকাশ প্রদান কর। যেহেতু চিরকাল কায়মনোবাক্যে রামেরই পূজা করিয়া আসিতেছি, অতএব হে দেবি পৃথিবি! তুমি আমায় অবকাশ প্রদান কর। যেহেতু আমি সত্য বলিতেছি যে, আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, অতএব হে দেবি! তুমি আমায় স্থান দেও।*

সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইল। ঋষিগণ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সহসা প্রদীপ্ত-জ্যোতিঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধরণীদেবী আবির্ভূত হইলেন এবং সীতাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পাতালমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

শেষোক্ত শ্রেণীস্থ কামিনীগণের মধ্যে জনকতনয়া সীতা সর্ব্বপ্রধানা। সীতা সর্ব্বগুণসম্পন্না ছিলেন; তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে যাদৃশ প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল, কোনকালে কোন নারী তাদৃশ প্রলোভনে পড়িয়াছিল কি না সন্দেহ। অদৃষ্টের দোষে তাঁহাকে নানা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি রাজনন্দিনী ও সসাগরা-ধরণীপতির মহিষী হইয়াও এক প্রকার জন্মদুঃখিনী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বামীর সহিত বনে গেলেন, তথায় রাবণ তাঁহাকে হরণ করিল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তাহার পর স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দায়ে কোনরূপে উদ্ধার পাইলেন। আবার মিথ্যাপবাদভীত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এবার তিনি বনে বনে একাকিনী ভ্রমণ

যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দৃষ্টা জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যথা নাভিচরাম্যহম্।
রাঘবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ॥

* যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রায় যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষকালে তিনি সশরীরে ভগবতী পৃথিবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

তুলনা

সীতা ও সাবিত্রী দুই জনই অদ্বিতীয় রমণী। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবিই স্বীয় কল্পনা-শক্তিবলে উঁহাদের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সীতার স্নেহপ্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পৎ সকল সময়েই স্বামীর প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার স্নেহ সর্ব্বদা সমান। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিলেন, তথাপি তিনি উঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সীতা অপেক্ষা সাবিত্রী কর্ম্মক্ষমতায় অনেক উৎকৃষ্ট। বাল্মীকি কোন স্থলেই সীতার কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। তিনি উঁহাকে সুশীলা ও একান্ত সুধীরস্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাবিত্রীও ধীরস্বভাবা সন্দেহ নাই, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে তিনি কোন শ্রমকেই শ্রম জ্ঞান করেন না; এবং এমন কষ্ট নাই যে, তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের দুই জনেরই মনের তেজস্বিতা আছে। যমরাজও সাবিত্রীর তেজস্বিতা স্বীকার করিয়াছেন। সীতাও দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সময় উহার পরিচয় দিয়াছেন। কর্ম্মক্ষমতা বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই। সীতা ও সাবিত্রীকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতচরিত্রা বলিবার কারণ এই যে, তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি, সমুদয়ই রামায়ণ প্রভৃতি আর্য্য গ্রন্থাবলী হইতে। কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবিগণপ্রণীত গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ না করিলে, এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কখনই বোধ হইবে না। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ ঋষিদিগের অনেক পরের লোক। তাঁহাদিগের সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থাগত অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রচার হইয়াছে ও বিনাশ হইয়াছে। বেদ ও স্মৃতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে, পৌরাণিকদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে, আর্য্যগণ বিলাসী হইয়াছেন, কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছেন এবং অনেকাংশে হীনবীর্য্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা আর ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম পালন করেন না, তাঁহারাও বাণিজ্যাদি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরও চরিত্রগত অনেক ভেদ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের জন্য অন্তঃপুর সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতীয় রমণীগণের ন্যায় তাঁহাদের সে নির্ভীকতা নাই। স্বামীর আর তাঁহারা সখা নহেন, কেবল দাসীমাত্র। রাজারা পূর্ব্বে নিমিত্তাধীনমাত্র বহুবিবাহ করিতে পারিতেন, এক্ষণে তাঁহারা ইচ্ছামত অসংখ্য বিবাহ করিতে পারেন। দশকুমারচরিত পাঠ করিলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে আমাদের দেশের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীগণের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে।

কবিগণ যে সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা দুই প্রকার; হয় তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, না হয় মহাভারত বা রামায়ণ অথবা কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। যে সকলগুলি তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে তাঁহাদিগের সমসাময়িক সমাজের অবস্থা-বিষয়ক অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এইরূপ নাটকের মধ্যে রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটিক ও মালতীমাধব প্রধান। দশ-কুমার-চরিত এবং কাদম্বরীও কোন শাস্ত্রের উপাখ্যান নহে। যেগুলি তাঁহাদের নিজের নহে, তাহাতেও তাঁহাদের আপন সময়ের ভাবই অধিক। বাল্মীকির সীতা ও ভবভূতির সীতা এক প্রকৃতির নহে। বেদব্যাসের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলায় অনেক অন্তর।

মালবিকা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিগণের অতিশয় প্রিয়পাত্রী। তাঁহার চরিত্র অপবিত্র নহে। তিনি রাজনন্দিনী, এক জন সেনাপতি তাঁহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া রাজপরিবারে প্রেরণ করেন। তিনি রাজার সংসারে থাকেন এবং নৃত্যগীত শিক্ষা করেন। তৎকালে লোক অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ছিল। সুতরাং বিলাসপ্রিয় রাজা বা

রাজকর্ম্মচারীকে প্রীত করিতে হইলে যে সকল শিক্ষা আবশ্যক, তিনি তাহাতেই নিপুণা। পরে রাজার প্রণয়িনী হইলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তরেই রহিল। রাজাও যে তাঁহার প্রতি আসক্ত, তাহা তিনি জানেন না। কিছুদিন পরে গান্ধর্ব্ব-বিধানে উভয়ের বিবাহ হইল। মালবিকা কবিগণের প্রিয়পাত্রী; কেন না, তিনি সুন্দরী, নৃত্যগীতাদি কলাভিজ্ঞা। তিনি অভিলষিত লাভের জন্য কত কষ্ট পাইলেন, সমুদ্রগৃহে বন্দী রহিলেন, মহারাণীর বিরাগভাগিনী হইলেন, তথাপি তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইল না। আধুনিক কবিরা হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশে তাদৃশ সমর্থ নহেন, তাঁহারা মালবিকার ন্যায় চরিত্র-বর্ণনে বিলক্ষণ পটু। মালবিকার চরিত্র, নারীগণের উৎকৃষ্ট চরিত্র বর্ণনাস্থলে উল্লিখিত হওয়া অন্যায়, কিন্তু তিনি একটি শ্রেণীর আদর্শ; এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এখানে উল্লেখ করিলাম। যেমন পুরাণকর্ত্তাদিগের লোপামুদ্রা, ঋষিদিগের সীতা ও সাবিত্রী, সেইরূপ কবিদিগের মালবিকা অত্যন্ত আদরণীয়া। যেমন পুরস্ত্রীদিগের লোপামুদ্রা, যুবতীদিগের সাবিত্রী, এবং সর্ব্বাবস্থা নারীদিগের সীতা আদর্শস্বরূপ, মালবিকাও এক সময়ে এক অবস্থার নারীগণের আদর্শ, এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এ স্থলে বর্ণিত হইল।

মালতী ভবভূতির কল্পনাশক্তির প্রথম অঙ্কুর। ভবভূতি তাঁহার চরিত্র অথবা তাঁহার প্রণয় বর্ণনায় অলৌকিক কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এমন কিছুই নাই, যাহাতে তিনি সীতা, সাবিত্রী বা শকুন্তলার সহিত একত্রে স্থান প্রাপ্ত হন। মালবিকার শ্রেণীর মধ্যে তিনিও এক জন। মালতী-মাধবের মধ্যে আর একটি অদ্ভুত স্বভাবের স্ত্রীলোক আছেন। ইঁহার নাম কামন্দকী—ইঁহার সংসারকার্য্য-চাতুর্য্য, বুদ্ধিকৌশল, শাস্ত্রজ্ঞান, কর্ত্তব্যকর্ম্মে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা, সুহৃদ্বর্গের প্রতি অনুরাগ, মালতী ও মাধবের প্রতি অলৌকিক স্নেহ ছিল। ইঁহার সাহস পুরুষের ন্যায়, মনের বল পুরুষের ন্যায়। ইনি দুই জন মন্ত্রীর সহাধ্যায়িনী, বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতিতে তাঁহাদের সমতুল্যা। দুই জনেই তাঁহাকে সম্মান করেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি সংসারে বিরাগিণী, বুদ্ধমঠ আশ্রয় করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রের পণ্ডিত কৌষিকী এবং মালতীমাধবের কামন্দকী, কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। পণ্ডিত কৌষিকীও সংসার ত্যাগ করিয়া কাষায় ধারণ করিয়াছেন। তিনিও এক জন অমাত্যের ভগিনী—তাঁহার মানসিক বল পুরুষের ন্যায়, বিদ্যাবুদ্ধি পুরুষের ন্যায়। রাজা ও ধারিণী সর্ব্বদা তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি গণদাস ও হরদত্তের বিবাদে মধ্যস্থ। তিনি যত দিন আপনাদিগের দুরবস্থা ছিল, কাহাকেও আপন পরিচয় দেন নাই। তাহার পর যখন শুনিলেন, তাঁহার ভ্রাতার শত্রুগণ পরাভূত হইয়াছে এবং তাঁহারই রাজকন্যা রাজার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন, তখন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন। পণ্ডিত কৌষিকী হিন্দু ও কামন্দকী বৌদ্ধ, পণ্ডিত কৌষিকীচরিত্র বিশুদ্ধ, কামন্দকী তাহা হইতেও আবার কর্ম্মকুশল। তিনি আপন কার্য্যে অণুমাত্র অনাস্থা করেন না এবং প্রাণপণে কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্নবতী। কৌষিকী কেবল দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। কামন্দকী সাহস-সহকারে কালকাপালিক অঘোরঘণ্টের সহিত বিবাদ করিয়া তাহার দুরভিসন্ধি নিষ্ফল করিলেন। কৌষিকী দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া রাজবাটী আশ্রয় করিলেন; সমভিব্যাহারিণী রাজকুমারীর কোনরূপ উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু ইঁহারা দুই জনেই এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক এখন নাই, বৌদ্ধের মঠে তাঁহাদিগের উৎপত্তি হয়। হিন্দুর মঠে দুই একটি সংসারবিরাগিণী রমণী দেখা যাইত, কিন্তু এক্ষণে মঠও বিরল, পণ্ডিত কৌষিকীও বিরল।

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী—শৈব্যা যথার্থ পতি-প্রাণা ও রমণীকুলের বিভূষণস্বরূপ। যখন বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে রাজার সর্ব্বস্ব গেল, তিনি দক্ষিণার জন্য আত্মদেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, তখনও শৈব্যা তাঁহার সহায়। রাজা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন। শৈব্যা উত্তর করিতেছেন, "আর্য্যপুত্র, স্বার্থপর হইও না। আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত কর। তোমার প্রণয় কেন বিরূপ হইতেছে?" এই বলিয়া স্বামীর মুখপ্রতীক্ষা করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুজল নির্গত হইল। শৈব্যা তখন বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যগণ! আমায় ক্রয় করুন। পরপুরুষ উপাসনা এবং পরের উচ্ছিষ্ট-ভোজন ভিন্ন আমি সর্ব্বকর্ম্মকারিণী।" যখন এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্রয় করিল, তখন শৈব্যা হর্ষোৎফুল্ললোচনে বলিলেন, "কি সৌভাগ্য! আমি আর্য্যপুত্রকে অর্দ্ধেক প্রতিজ্ঞাভার হইতে উদ্ধার করিলাম।" আর্য্যপুত্রের ঋণের অর্দ্ধেক প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন বলিয়া তাঁহার হর্ষ হইল। চিরকালের জন্য যে দাসী হইলেন, সেটি তাঁহার মনেও হইল না।

কিন্তু ইহাতেও বিধাতার তৃপ্তি হইল না। শৈব্যার একমাত্র সন্তানও কিছুদিন পরে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। শৈব্যা উদ্বন্ধনে দেহত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, সে স্বর প্রস্তরও বিদীর্ণ করিতে পারে। বিধাতা সদয় হইয়া তাঁহাকে স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিলেন।

পার্ব্বতী—ইনিই পূর্ব্বজন্মে স্বামীর নিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এ জন্মেও সেই মহাদেবের প্রতি অনুরাগবতী হইয়াছেন। মহাদেব মনুষ্য নহেন, দেবতা, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তপস্যা আবশ্যক ও পূজা আবশ্যক। পার্ব্বতী প্রথমতঃ পূজা আরম্ভ করিলেন। নিত্যই মহাদেবকে স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমাল্য প্রদান করেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। পার্ব্বতী, বিদ্যাবতী, পিতার প্রিয়পাত্রী এবং রাজার কন্যা; বয়সও অল্প, কিন্তু তখন হইতেই তাঁহার প্রণয় প্রগাঢ়। তাঁহার প্রণয় তারামৈত্রক, বা চক্ষুরাগ নহে, উহার আবাসভূমি হৃদয়ে। এক জন প্রধান সমালোচক বলিয়াছেন, কালিদাসাদি কবিগণ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সে প্রণয় বাল্মীকির ন্যায় নহে; কালিদাসের প্রণয়ে ঐহিকতাই অধিক। কিন্তু যে কবি পার্ব্বতীর প্রণয় বর্ণন করিয়াছেন, তিনি যে বিশুদ্ধ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন না, এরূপ বলা অসঙ্গত। পার্ব্বতী মহাদেবে প্রণয়বতী; মহাদেব যোগী; তিনি অপর উপাসকের যেরূপ পরিচর্য্যা গ্রহণ করেন, পার্ব্বতীর পূজাও সেইরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহার মন টলিবার নহে। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য-বিধানের জন্য স্বয়ং কাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনও চঞ্চল হইল; কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তিনি তখনই সে ভাব সংবরণ করিয়া কোপকটাক্ষে মদনকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন এবং স্ত্রীসন্নিকর্ষ পরিহারের জন্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী ভগ্নমনোরথ হইয়া আপন পিতার নিকট তপস্যা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি কঠিনশরীর ঋষিগণ আজন্ম পরিশ্রম করিয়াও যে সকল নিয়ম পালন করিতে অক্ষম, পার্ব্বতী সেই সকল নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। এক দিন মহাদেব স্বয়ং ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে মহাদেবের বিস্তর নিন্দা করিলেন। যিনি একবার পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ নিন্দা অসহ্য। তিনি সেখান হইয়া উঠিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে মহাদেব নিজদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে! তখন কোপ, প্রণয়, বিস্ময় প্রভৃতি নানা বৃত্তি যুগপৎ সমুদ্গত হইয়া তাঁহার যেরূপ চিত্তবিকার জন্মাইয়া দিল, তাহা কালিদাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন কি না সন্দেহ। তিনি পিতার নিকট আপন প্রণয় ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি সামাজিক অবস্থা জানেন; কিন্তু জানিয়াও ভাবিলেন, বিশুদ্ধ প্রণয় প্রকাশে দোষ কি? তিনি বিদ্যাবতী, গৃহকর্ম্মচতুরা, দেবারাধনায় তাঁহার নিত্য আমোদ। তিনি আতিথেয়ী। তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইবার নহে, মন টলিবার নহে। মেনকা কত বুঝাইলেন, বলিলেন, 'তোমার পিতা দেবতাদের দেশের অধিপতি, যদি দেবতা তোমার কামনা হয়, বল।' পার্ব্বতী মৌনভাবেই তাহার উত্তর দিলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাদেবেই কি তোমার প্রণয়?' পার্ব্বতী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার জবাব দিলেন। পিতার নিকট যখন বিবাহের কথা উঠিল, তখন লীলাকমলপত্রের গণনায় তৎপরা হইলেন। তিনি কুলোকের সংসর্গ ভালবাসেন না, গুরুজনের নিন্দা তাঁহার বিষ। সকল ভূতেই তাঁহার সমান দয়া। যে সকল গুণে রমণীর চরিত্র উৎকৃষ্ট হয়, সে সকলই তাঁহাতে আছে। রমণীকুলের তিনিই গর্ব্বহেতুভূতা। তিনি যে স্থানে তপস্যা করিয়াছেন, তাহা এখনও তীর্থ। তাঁহার নিকট সিতশ্মশ্রু ঋষিগণও ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। তাঁহার চরিত্র তপস্বীদিগের উদাহরণস্থল। তাঁহার চরিত্র প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিলে বিস্ময়মিশ্রিত অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হয়। কুমারসম্ভব গ্রন্থ হইতে আমরা তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত জানি। ইহার মধ্যে ঐহিকতার লেশমাত্রও নাই। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মে ভক্তি, দেবতায় ভক্তি, মনু প্রভৃতি মুনিগণের বচনে আস্থা, বিশেষতঃ তাঁহার সরলতা, পিতৃভক্তি, স্বামিভক্তি, সখীগণের প্রতি ব্যবহার এবং আশ্রমের উন্নতি-চেষ্টা লৌকিক নারীগণের মধ্যে অতি বিরল। নারীচরিত্রবিষয়ে কবিরা যে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন, পার্ব্বতীচরিত্রে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গদর্শনকার স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বাল্মীকির রামায়ণ হইতে আখ্যায়িকা লইয়া যে সকল কাব্য ও নাটক রচনা করা হইয়াছে, তাহাতে রাম ও সীতার চরিত্র উত্তমরূপে বর্ণিত হয় নাই। ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কালিদাসের রাম ও সীতা বাল্মীকির রাম ও সীতা হইতে উৎকৃষ্ট না হউক, তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন

নহে। বাল্মীকির ন্যায় কালিদাসও সীতার শৈশবের কোন কথাই লিখেন নাই। কালিদাস স্পষ্ট জানিতেন যে, বাল্মীকির সঙ্গে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে পরাভূত হইতে হইবে। এই জন্যই তিনি অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড এক সর্গের মধ্যে সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন। ঐ সর্গও নীরস, কিন্তু তাহার বিদ্যুত্ত্বরিতগতিবর্ণনায় একটি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। তিনি চতুর্দ্দশে সীতাচরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সর্গ হইতে তাঁহার সীতার বনবাসের অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। যখন লক্ষ্মণ বনমধ্যে রাজার ভয়ঙ্কর আদেশ সীতাকে অবগত করাইলেন, তখন সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ স্থিরদুঃখভাগী আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বিদায় হইবার জন্য প্রণাম করিলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি সেই রাজাকে বলিও, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, তোমার সমক্ষে এই মুহূর্ত্তেই জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি তাঁহাকে বলিও,* আমি প্রসবের পর সূর্য্যের দিকে নয়ন নিবিষ্ট করিয়া তপস্যা করিব, যেন অন্য জন্মেও রামই আমার পতি হন, কিন্তু যেন এরূপ বিচ্ছেদ কখন না হয়।"

তিনি আবার বলিলেন, "তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে, যদিও ভার্য্যাভাবে আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আমি যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য হই। তিনি সসাগরা পৃথিবীর ঈশ্বর। যেখানেই যাই, তাঁহার অধিকারের বহির্ভূত নহি।" মহর্ষি বাল্মীকি যখন তাঁহাকে আপন আশ্রমে লইয়া রাখিলেন, তখন তিনি নিরন্তর অতিথিসেবা ও স্নানাদি ধর্ম্মকার্য্য করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এত যে নিদারুণ কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু যখন শুনিলেন, আজিও রাম তাঁহা ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না এবং তিনি হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি লইয়া যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার সেই নিদারুণ কষ্টের কতক শমতা হইল।

এক দিন রামচন্দ্র যজ্ঞসমাপনান্তে পৌরবর্গকে সমবেত করিয়া সীতার পরীক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। সীতাও আচমন করিয়া কহিলেন, † "যেহেতু আমি কায়মনোবাক্যে স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা কখনই করি নাই, অতএব হে দেবি বিশ্বম্ভরে! আমায় অন্তর্দ্ধান করিয়া লও।"

ভগবতী বিশ্বম্ভরা সীতার কথা শুনিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ভূগর্ভে অন্তর্হিতা হইলেন। প্রধান কবিরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। কালিদাস সীতাচরিত্রের দুই একটি অতি বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও ভাবপূর্ণ অংশের পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের সংখ্যা অনেক। সেই সমুদায় হইতে স্ত্রীচরিত্র সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রন্থবিস্তার হইয়া পড়ে, সুতরাং অগত্যা নাগানন্দ, রত্নাবলী, বাসবদত্তা, প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখমাত্র করিয়া সংস্কৃত কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস ও ভবভূতির সর্ব্বস্বভূত অভিজ্ঞানশকুন্তলা ও উত্তররামচরিত হইতে শকুন্তলা ও সীতাচরিত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। এই দুইটি রমণীর চরিত্রবর্ণনে কবিরা আপন আপন কল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দুইটি রমণীর অবস্থাগত অনেক প্রভেদ। সীতার বিরহ, শকুন্তলার পূর্ব্বরাগ, সীতা যুবতী, শকুন্তলা বালিকা। সীতা রাজনন্দিনী, শকুন্তলা তপোবনপ্রতিপালিতা, কিন্তু উভয়েই প্রত্যাখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েই নানাবিধ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েরই চরিত্র স্ত্রীচরিত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। দেবতা ও ঋষিরা উভয়কেই দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা করিয়াছেন এবং স্বামীর সহিত মিলন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উভয়েই অনেককাল বনে বাস করিয়াছেন। বনতরু, বনলতা, বনময়ূর, বনমৃগ উভয়েরই প্রিয়পাত্র; উভয়েরই হৃদয় সরল ও প্রগাঢ় প্রণয়বিশিষ্ট; বনবাসসখীদিগের সহিত উভয়েরই সমান সখ্যভাব। সীতা রাবণকর্তৃক পীড়িতা হইয়া এক্ষণে রাজধানীতে প্রত্যাগতা হইয়াছেন, রাজরাণী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুগ্ধস্বভাব পূর্ব্ববৎই আছে। চিত্রদর্শন-প্রস্তাবে তাঁহার সকল ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বিবাহসময়ে সুখের চিত্র দেখিয়া হর্ষিত হইলেন। শূর্পণখাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল, আর্য্যপুত্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অশ্রুপাত হইল, তপোবন দেখিয়া পুনর্ব্বার তথায় ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি রামকে বলিলেন, "তোমাকেও আমার সহিত যাইতে হইবে।" রাম কহিলেন, "অয়ি মুগ্ধে! এ কথাও কি বলিতে হয়?" তিনি রামবাহু আশ্রয় করিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোমল অন্তঃকরণে

---

* সাহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টিরূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।

† বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি মামন্তর্দ্ধাতুমর্হসি।

চিত্রদর্শনজনিত নানা উদ্বেগ এখনও প্রশমিত হয় নাই। তিনি স্বপ্নে বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র, এই তোমার সহিত শেষসাক্ষাৎ।" রামচন্দ্র সেখান হইতে চলিয়া গেলে নিদ্রাভঙ্গানন্তর উঠিয়া বলিলেন, "যাহা হউক, রাগ করিব," তাহার পরই বলিলেন, "যদি তখন মনের সে বল থাকে।" লক্ষ্মণ রথ আনয়ন করিলে আর্য্যপুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে তাহাতে আরোহণ করিলেন। যখন লক্ষ্মণ প্রস্তরবৃষ্টির ন্যায় রাজসন্দেশ অবগত করাইলেন, তখন সীতা অসহ্য শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়কে পৃথ্বী ও ভাগীরথী বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন এবং তিনি ভাগীরথীর সহিত পাতাল-পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিন ভাগীরথী ছল করিয়া তমসার সহিত সীতাকে পঞ্চবটীর বনে পাঠাইয়া দিলেন। যেখানে আর্য্যপুত্রের সহিত নানা সুখভোগ করিয়াছিলেন, যেখানে "সরসী আরসী"তে আর্য্যপুত্রের সহিত আপন মুখাবলোকন করিতেন, আবার সেই স্থানে। রামচন্দ্রও কার্য্যোপলক্ষে পুনরায় পঞ্চবটী আসিয়াছেন, সঙ্গে কেহই নাই। রামের গম্ভীর স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সীতা চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাহার পর যখন জানিলেন, সত্যই তাঁহার আর্য্যপুত্র পঞ্চবটী আসিয়াছেন, তখন সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন, এবং একতানমনে তাঁহারই কথা শুনিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র তাঁহারই জন্য শোক করিতেছেন, তখন বলিলেন, "এ কথা এরূপ ঘটনার অসদৃশ।" তাহার পর বলিলেন, "আর্য্য-পুত্র, তুমি আজিও সেইই আছ।" রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সীতা, পাছে তিনি স্পর্শ করিলে রামচন্দ্র কুপিত হন, এই ভয়েই অস্থির হইলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "যা হবার হউক, আমি উঁহাকে স্পর্শ করিব।" যখন রামচন্দ্রকে বাসন্তী তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তিনি কহিলেন, "সখি! তুমি ভালর জন্য বলিতেছ বটে, কিন্তু দেখিতেছ না কি উহাতে বিষময় ফল ফলিতেছে! সখি, তুমি বিরত হও।" তাঁহার পালিত করিশাবক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে শুনিয়া সীতার মন চঞ্চল হইল, উহাকে হৃষ্ট-পুষ্টাঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধ তাঁহার হর্ষ হইল, এমন নহে, তাঁহার কুশ ও লবকে মনে পড়িয়া গেল। রামচন্দ্র বিদায় হইলে যতক্ষণ তাঁহার রথধ্বজ দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ কাহার সাধ্য সে দিক্ হইতে তাঁহার অন্যত্র নিক্ষেপ করে। তাহার পর "অপূর্ব্ব পুণ্য হেতু আর্য্যপুত্রের দর্শনলাভ হইয়াছে, তাঁহার শ্রীচরণে নমো নমঃ" বলিয়া কষ্টে সৃষ্টে বিনিবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সময় যখন সীতা সভার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার নয়ন স্বামীর চরণে অর্পিত। হৃদয়ে নানা উদ্বেগ। তাঁহার আকৃতিতে স্পষ্টই অনুভব হইতে লাগিল, তিনি বিশুদ্ধ-চরিত্রা। রামচন্দ্র পৌরজানপদবর্গের মত লইয়া পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

সীতার চরিত্র। সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন। তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিত্রে পতিপরায়ণতা-গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা মানবজাতিকে পাতিব্রতা-ধর্ম্মে উপদেশ দিবার জন্যই সীতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না পতি লাভ করিয়া তাঁহার মত দুঃখ-ভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।

শকুন্তলাও সীতার ন্যায় মুগ্ধস্বভাবা। মুনি তাঁহাকে বনমধ্যে কুড়াইয়া পান এবং সন্তানের ন্যায় তাঁহার প্রতিপালন করেন। তিনি অল্পবয়সেই গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছেন এবং লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন, তপোবন-তরুদিগের পরিপালন করিতে তিনি বড় ভালবাসেন। তাঁহার পিতা সোমতীর্থ-গমনকালে বৃদ্ধা গৌতমীকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারই হস্তে অতিথিসেবার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। তপোবনবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে ভালবাসে। তাঁহার সখীদিগের তিনিই সর্ব্বস্ব। তাহারা তাঁহার সেবা করিতেছে, তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে, পুষ্পবৃক্ষের আলবাল পূরণ করিতেছে এবং তাঁহার ভাবিবিরহের আশঙ্কায় কাঁদিতেছে। তাঁহার অদৃষ্টের জন্য তাঁহার অণুমাত্র চিন্তা নাই। তিনি একমনে রাজাকেই ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সখীদিগের ভাবনা তাঁহারই জন্য। তাহারা দুর্ব্বাসার শাপ-মোচন করিল, তাঁহার আশঙ্কিত প্রত্যাখ্যান নিরাকরণের উপায় করিয়া দিল এবং কত যে দুঃখ প্রকাশ করিল, তাহা বলা যায় না। শকুন্তলাও যাইবার সময় পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "সখীরাও আমার সমভিব্যাহারে চলুক।" তিনি তাহাদিগকে আপনার

ভাবিতেন, আপন মনের ভাব তাহাদিগকে বলিতেন এবং তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিতেন। সরলহৃদয়া গৌতমীও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি পিতৃসেবায় তৎপরা ছিলেন বলিয়া পিতাও তাঁহার জন্য কাতর। রাজার প্রথম দর্শনদিনাবধি শকুন্তলা তাঁহার জন্য ব্যাকুলা। তিনি তপোবনবাসিনী, প্রণয় তপোবনবিরোধী ভাব এবং তাঁহার পক্ষে অনুচিত, ইহাও তিনি জানেন। তিনি নানা প্রকারে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তিনি সে বিদ্যা শিখেন নাই। যতই গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন, ততই আরও প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে অপার চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি ম্রিয়মাণা হইলেন। তাঁহার প্রিয়সখীরা তাঁহার কথা রাজাকে জানাইতে উদ্যোগ করিল। রাজা তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিলেন এবং অতি সত্বরই রাজধানী প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার শকুন্তলার প্রতি বাস্তবিক প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু অলৌকিক দৈবদুর্ব্বিপাকে শকুন্তলা তাঁহার হৃদয় হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন। শকুন্তলার কথা তাঁহার আর মনে রহিল না; কণ্ব মুনি শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহে অত্যন্ত প্রীত হইলেন, সত্বর তাঁহাকে দুই জন শিষ্য ও সরলস্বভাবা গৌতমীর সহিত রাজবাটী প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা আসিবার কালে আপন হরিণশিশুটিকেও বিস্মৃত হইলেন না। সকলের নিকট বিদায় লইয়া অশুভক্ষণে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।

বেদব্যাস সাধ্বী নারীদিগের যেরূপ সাহস বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাস সেরূপ পারেন নাই। তাঁহার সময়ে সেরূপ সাহস লোকে ভালবাসিত না। শকুন্তলা মহাভারতে রাজার সহিত যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, কালিদাস ঠিক সেই সকল কহাইবার জন্য তাঁহার সহিত দুইজন লোক পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

রাজা দুর্ব্বাসার শাপে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। শকুন্তলা আসিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু তিনি চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং শকুন্তলার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন। শকুন্তলা যে সকল অভিজ্ঞানের কথা কহিলেন, তাঁহার ন্যায় সরলস্বভাবার উপযুক্ত বটে; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? তিনি রাজাকে হরিণশিশু স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের মিথঃসংলাপ মনে করাইয়া দিলেন। কিছুতেই রাজার স্মরণ হইল না। তাহার পর শার্ঙ্গরব তিরস্কার করিয়া উঠিলে শকুন্তলা ভীতা হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; গৌতমী তাঁহার দুঃখে কাতরা হইলেন। সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ হইল, তিনি পুরোহিতের গৃহে প্রসবকাল পর্য্যন্ত বাস করিবেন। তিনি পুরোহিত-গৃহগমনকালে কেবল আপন ভাগ্যকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি তাঁহাকে লইয়া তিরোহিত হইল। তিনি তাহার পর বহুকাল হিমালয়শৈলে কশ্যপ ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিলেন। তথায় প্রোষিতভর্তৃকাবেশে ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া, পাতিব্রত্যধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া এবং নিজ শিশুর লালনপালন করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। দৈবানুগ্রহে যখন রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজার শকুন্তলাবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে—শাপমোচন হইয়াছে। তিনি উঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন, এবং ক্ষমা প্রর্থনা করিলেন। তখনও শকুন্তলা বলিলেন, "সে সময় আমার অদৃষ্ট আমার বিরোধী ছিল, নহিলে আর্য্যপুত্র এত সদয় হইয়াও এত বিকল হইয়াছিলেন কেন? যাহা হউক, আমার অদৃষ্ট পরিণামে সুখদ হইবে।" রাজা যখন পুনরায় তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয়ক সংযোগ করিতে গেলেন, তখন ভীরুস্বভাবা শকুন্তলা কহিলেন, "আমি উঁহাকে বিশ্বাস করি না" এবং যখন শুনিলেন, শাপপ্রযুক্তই রাজা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না, তাঁহার আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তবে আর্য্যপুত্র অকারণে ত্যাগ করেন নাই।" আর্য্যপুত্রের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়ায় তাঁহার আমোদ হইল। তাহার পর ঋষিদিগকে নমস্কার করিয়া আর্য্যপুত্র সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

কালিদাসের শকুন্তলা ও পার্ব্বতী, ভবভূতির সীতা, বেদব্যাসের সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত পাঠ করিলেই প্রাচীনকালের চরিত্রবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা কতদূর উন্নতিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যাইবে। এই সকল রমণীই নারীকুলের রত্ন। ইঁহারা সকলেই চিরদিন ভারতবর্ষীয়দিগের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, সীতা পতিপরায়ণতাগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী, পার্ব্বতী, শকুন্তলা প্রভৃতি কামিনীরাও তাহাই করিয়াছেন। ইঁহাদের মানসিকবৃত্তি প্রায় সকলেরই সমান। কেবল ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য প্রভৃতি যে সকল গুণ সকল সময়ে সকল জাতীয় মনুষ্যের অলঙ্কার, সেই সকল

গুণ ইঁহাদের সকলেরই অধিক পরিমাণে ছিল। যে প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ে মহার্হ রত্ন, ইঁহারা সেই প্রণয়ের আধারভূমি। স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা যে সকল কর্ত্তব্য স্ত্রীলোকের বলিয়া নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, কবিরা সে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু তাঁহারা স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল গুণ তাঁহারা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন নারীরই প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চন, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা ছিল না। সীতা একবার মনে করিলেন, "যাহা হউক, রাগ করিব," তাহার পরক্ষণেই বলিলেন, "যদি তখন মনের সে বল থাকে।" সাধ্বী রমণীর ঈর্ষ্যা থাকে না। স্বামী ত্যাগ করিলেন বলিয়া সীতা বা শকুন্তলা কাহারও অভিমান হয় নাই। উভয়েই আপন ভাগ্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। যখন আবার স্বামী উপস্থিত হইলেন, শকুন্তলা একেবারেই তাঁহাকে আপনার করিয়া লইলেন। সীতা পাছে স্বামী রাগ করেন, এই ভয়ে ব্যাকুল হইলেন। দক্ষ বলিয়াছেন, সাধ্বী রমণী পাইলে পৃথিবীই স্বর্গ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক সৌভাগ্য না থাকিলে সাবিত্রী বা শকুন্তলার ন্যায় ভার্য্যালাভ হয় না।

সমাপ্ত

বেণের মেয়ে

[প্রথম নারায়ণ মাসিক পত্রে প্রকাশিত]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই প্রণীত

মুখপাত

'বেণের মেয়ে' ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেন না, আজকালকার 'বিজ্ঞান-সঙ্গত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখন হইতেও চাই না। 'বেণের মেয়ে' একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে এ-কালের কথা নাই। সব সেই কালের, যে কালে বাঙ্গলার সব ছিল। বাঙ্গলার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল। বাঙ্গালী এখন কেবল এ-কেলে "গণিকাতন্ত্রের" উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সে-কেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন?

২৬ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,
বড়দিন, ১৯১৯।

গ্রন্থকার

বেণের মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

শকাব্দ ৯২২, সংবৎ ১০৫৭, ইস্ বি ১০০০ বৎসর, মাস বৈশাখ, তিথি পূর্ণিমা, জায়গা সাতগাঁ—গাজনের ভারি ধূম লাগিয়াছে।

তারাপুকুরের রূপা বাগ্দী এখন সাতগাঁয়ের রাজা। তিনি মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরমসৌগত শ্রীশ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ-সিংহ উপাধি লইয়া প্রবল-প্রতাপে সাতগাঁ-সহর ও সপ্তগ্রাম-ভুক্তি শাসন করিতেছেন। অন্ততঃ ১০,০০০ (দশ হাজার) বাগ্দী তাঁহার পল্টনে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাঁহার হাতী, ঘোড়া, রথ বিস্তর আছে। তারাপুকুর গ্রামখানি কুন্তী নদীর ধারে, এখন যেখানে মগরা হইয়াছে, উহারই নিকটে। পূর্ব্বকালে ঐখানে তারাদেবীর এক মন্দির ছিল এবং মন্দিরের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দীঘি ছিল। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন মন্দির পড়িয়া গিয়াছে, দীঘি আছে, সেই দীঘিরই নাম তারাপুকুর। তারাপুকুর গ্রামখানি ঐ দীঘি হইতে ১ মাইল পূর্ব্বে। সেখানেও আজ ভারি ধূমধাম। কারণ, রূপা রাজা ঠিক করিয়াছে, গাজন তাহার বাড়ী হইতেই বাহির হইবে, বাহির হইয়া সাতগাঁএর বড় রাস্তা দিয়া ধরমপুরের বিহারে পৌঁছিবে ও তাহার একটু দক্ষিণে বিহার-প্রতিষ্ঠা হইবে।

এবার বেশী ধূমের কারণ, রূপার এই প্রথম গাজন ও বিহার-প্রতিষ্ঠা, রূপার জীবনে প্রধান সৎকাজ। রূপা লুই-সিদ্ধার চেলা। সে এবার অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া লুই-সিদ্ধাকে ধরিয়াছে, 'গুরুদেব, এই বিহার-প্রতিষ্ঠায় গাজনে আপনাকেই মূল সন্ন্যাসী হইতে হইবে।' সিদ্ধাচার্য্য লুই-পাদ দলবল লইয়া তারাপুকুর গ্রামে ২।৩ দিন হইতে আড্ডা লইয়াছেন। অনেক বড় বড় বৌদ্ধ পণ্ডিত, সিদ্ধপুরুষ, সিদ্ধাচার্য্যও আসিয়া জুটিয়াছে। নাড় পণ্ডিতের সঙ্গে লুইএর বনে না; রূপা তাঁহাকেও আনিয়াছে। নাড় পণ্ডিতের স্ত্রী বা শক্তি নাড়ীও আসিয়াছে। এ নাড়ী বড় কম মেয়ে নয়। ইহার বাপের দেওয়া নাম নিগু এখন প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে। জ্ঞানমার্গে ইঁহার বড়ই প্রতিপত্তি বলিয়া ইঁহার নাম জাহির হইয়াছে—জ্ঞান-ডাকিনী। নাড়া ও নাড়ীর সঙ্গে বহুশত নাড়া ও নাড়ী আসিয়াছে। গ্রাম তারাপুকুর ও দীঘি তারাপুকুরের মাঝখানে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। কেহ তাঁবুতে রহিয়াছে, কেহ তালপাতার কুঁড়ে বাঁধিয়া রহিয়াছে, কেহ খেজুর-পাতার কুঁড়ে বাঁধিয়া আছে। কোথাও বা বড় বড় বাঁশের মেরাপের উপর বড় বড় সামিয়ানা ও পাল খাটান আছে; নীচে অসংখ্য লোক; কেহ ঘুমাইতেছে, কেহ পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ গাঁজায় দম দিতেছে, কেহ বা ধান্যেশ্বরীর উপাসনা করিতেছে। কিন্তু রূপার এমনি দবদবা যে, এত লোকেও কোনরূপ গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা কিছুই নাই। এই সমস্ত লোকের পাহারা দিবার জন্য শএক দু'শ বাগ্দী বড় বড় বাঁশের লাঠি ঘাড়ে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লাঠির প্রত্যেক পাপেই এক একটি গাঁঠ, পাকা তল্লাবাঁশে বহুকাল তেল খাওয়াইয়া লাঠি লাল করিয়া তুলিয়াছে। লাঠিয়ালও খুব জোয়ান, সাড়ে ছ'হাতের উপর লম্বা, মাথায় বাবরিকাটা বড় বড় চুল। তাহাদের লাঠি মাথার উপর আরও দেড় হাত।

হঠাৎ রাত্রি তিন প্রহরের পর চারিদিকে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। কা'ল দুপুরে রাজগুরুর ভোজ। তারাপুকুরে এখন মাছ ধরা হইবে। তারাপুকুরের চারিদিকে প্রকাণ্ড পাড়, সেখানে যত বনজঙ্গল ছিল, সব সাফ করিয়াছে। পাছে মাছ চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাই তারাপুকুরময় কঞ্চিশুদ্ধ হাজার হাজার বাঁশ ফেলা ছিল। আজ সমস্ত বাঁশ উঠাইয়া পাড়ের ওপারে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুন্তী নদী হইতে দুখানি দু'শ-মণী নৌকা আনিয়া তারাপুকুরে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কুন্তী নদী

হইতে তারাপুকুর অন্ততঃ বিশ রশি তফাৎ। মোটা মোটা গরাণের কাঠ ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া, নৌকা দুখানিকে কাছি দিয়া টানিয়া পুকুরে ফেলা হইয়াছে। ভোর হইতে না হইতেই তারাপুকুরের মাছ-ধরার সরঞ্জাম সব প্রস্তুত। পুকুরটি যতখানি চওড়া, ততখানি লম্বা। একখানি জাল, জালের সূতাগুলি বহুকাল ধরিয়া গাবানতে এমন শক্ত হইয়াছে যে, মাছের সাধ্য কি উহা ছিঁড়িয়া পালায়! জালের তলার দিকে ইট ও পাথর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরে গোছা গোছা সোলার ফাতনা ভাসিতেছে। দুই পাড়ের ধারে দুই নৌকায় জেলেরা জালের দড়ি ধরিয়া বসিয়া আছে। এমন সময়ে ভাঙ্গা মন্দিরের ধারে হঠাৎ রূপা রাজা দেখা দিলেন। চারিদিক্ হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—কেহ বলিল, মহারাজের জয়, কেহ বলিল, মহারাজাধিরাজের জয়, কেহ বলিল, রাজার জয়, কেহ বলিল, রূপারাজার জয়। রূপা মুহূর্ত্তের মধ্যে 'জাল টান' হুকুম দিয়াই অন্তর্ধান হইলেন। তখন নৌকা চলিল, সোলার ফাতনা চলিল, জালের দড়ি চলিল, পাড়ের উপর অগণ্য মানুষ চলিতে লাগিল। বড় বড় মাছ ঘাই দিতে লাগিল; এক একটা মাছ দশ পনর হাত লাফাইয়া উঠিয়া আবার জলের মধ্যে পড়িতে লাগিল। একটা একটা ঘাইয়ে জল তোলপাড় হইতে লাগিল। ঘাইয়ে ঢেউগুলি গোল হইয়া ক্রমে বড় হইতে হইতে ডাঙ্গায় আসিয়া লাগিতে লাগিল। একটা ঢেউএর পর আর একটা ঢেউ, একটা ঘোলের পর আর একটা ঘোল, কত শত যে বৃত্ত, বৃত্তার্দ্ধ, বৃত্তখণ্ড জলের উপর দেখা গেল, তাহা জ্যামিতির রেখা-গণিতওয়ালারাই বুঝিতে পারেন। ক্রমে জাল তারা-পুকুরের মাঝামাঝি পৌছিল। তখন সূর্য্যদেবের রাঙ্গা কিরণও আসিয়া তারাপুকুরের জল সোণার রঙ করিয়া দিল। কিন্তু এ কি? জাল যে আর টানা যায় না। জালের তলায় এত মাছ পড়িয়াছে যে, দুই নৌকার জেলেরাই জাল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না। তখন জালের দড়ি নোল করিয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া লাফাইয়া জালের পিছনে গিয়া পড়িল। তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, রূপার মাছ-বৃষ্টি হইতেছে। মাছগুলা রূপার মত সাদা, মাজা রূপার মত চক্-চকে, একটার পর আর একটা পড়িতেছে। চকচকে রূপার রঙের উপর সূর্য্যের সোণালি রঙ পড়িয়া গিয়াছে। সে রঙের মেশামেশিতে এক অপূর্ব্ব শোভা। জাল হাল্কা হইল, আবার জাল টানা আরম্ভ হইল। ক্রমে জাল আসিয়া ওপর পারে পৌছিল। এইবার জাল গুটান আরম্ভ হইল। মাছেদের এইবার মরণ-কামড়। যত জাল গুটাইয়া আনিতে লাগিল, তাহাদের লাফালাফি ততই বাড়িতে লাগিল। রূপার ঝক্‌ঝকানিও ক্রমে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইয়া আসিল। ক্রমে তারাপুকুর যেন এক-পেশে হয়ে দাঁড়াইল। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম পাড়ে কোথাও লোক নাই। যেখানে জাল, সেই-খানেই লোক। একদিকে যেমন মাছের ঘপ্‌ঘপানি, আর একদিকে তেমনই লোকের কলরব। একজন চীৎকার করিয়া উঠিল,—"রাজার হুকুম—মুগ্‌কের নীচে মাছ ধরিবে না।" তখন বাছিয়া বাছিয়া একমণের নীচে যত মাছ ছিল, সব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তথাপি বহুসংখ্যক মাছ জালে বাধিয়া রহিল। এক একটা মাছ ডাঙ্গায় তুলিতে অনেক বড় বড় জোয়ান হিমসিম খাইয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় শ'তুই মাছ ক্রমে তারাপুকুরের ভাঙ্গা মন্দিরের ধারে জড় হইল এবং সেখান হইতে গরুর গাড়ীতে রাজ-বাড়ীতে চালান হইল। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে যে সব লোক মাছ ধরা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহা-দিগকে এক একটি ছোটখাট মাছ দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল! এইরূপে পূর্ণিমার দিন সকাল-বেলায় মাছধরা-পর্ব্ব শেষ হইল।

২

রাজার গুরু মাছের আঁতড়ি খাইতে ভালবাসেন, পোঁটা ও তেল খাইতে ভালবাসেন। সুতরাং এত যে গাড়ী গাড়ী মাছ রাজবাড়ীতে গেল, সে মাছের যত দরকার থাক্ আর না থাক্, মাছের তেল, আঁতড়ি আর পোঁটার বেশী দরকার। বড় বড় পট্-পটি ফুটাইয়া গাদা করা হইতে লাগিল। তাহার পর এই সব জিনিস রাঁধে কে? সাতগাঁর চারি-দিকে ৪।৫ ক্রোশ ধরিয়া রূপা রাজার খুব প্রাদুর্ভাব। যে গ্রামে যিনি যে তরকারী রাঁধিতে ভাল পারেন, তাঁহাকে আনাইয়া সেই তরকারী রাঁধিবার ভার দেওয়া হইল। এক জন মাছের তেল দিয়া নানা-প্রকার বড়া ভাজিতে লাগিলেন, এক জন মাছের তেল দিয়া ছেঁচড়া তৈয়ার করিতে লাগিলেন, চচ্চড়ি নানা রকমের হইল। এ সব খাস রাজগুরুর জন্য। বাকি লোকের জন্য যে প্রয়োজন, তাহার বর্ণনা দরকার নাই।

পাত সাজান হইলে, সন্ন্যাসীর দল বসিয়া গেল,

অতিথি অভ্যাগত সব বসিয়া গেল; বসিলেন না কেবল রাজগুরু লুই-সিদ্ধা। সকলে বসিয়া গেলে, রাজা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া খোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সব পরীক্ষা করিয়া গুরুদেবকে ভোজনের অনুমতি দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গুরু খোলায় একধার হইতে আর একধার পর্য্যন্ত দেখিয়া গেলেন, বলিলেন, "সব উত্তম হইয়াছে, তোমরা আহার করিতে ব'স।" তিনি নিজেও আপনার পাতে বসিয়া গেলেন। আহারের এই বিপুল আয়োজনের জন্য সিদ্ধাচার্য্য রাজাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ধর্ম্মে তোমার মতি হউক।"

বৈকালে গাজন বাহির হইবে। তারাপুকুর হইতে সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত খুব একটা চাটাল রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে। সমস্ত রাস্তা গোবরগঙ্গাজলে ধুইয়া দেওয়া হইল। রাস্তার দুধারে কেবল ফুলের মালা বাঁশের থাম হইতে ঝুলিতেছে; রাস্তার উপর দিয়া ফুলের মালা বাঁশে ঝুলান। রাস্তার মাঝে মাঝে বিচিত্র তোরণ। তোরণের উপর হইতে দিক্‌মালা চারিদিকে ছড়াইয়া ফর্‌ফর্‌ শব্দে উড়িতে লাগিল। দিক্‌মালাগুলি প্রায়ই সোলার পাতে তৈয়ারী, মাঝে মাঝে অভ্রের পাত লাগান। অভ্রের উপর যখন পড়ন্ত সূর্য্যের আলো পড়িল, তখন সে আলো নানা রঙ্‌ ধরিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দিল। দিক্‌মালার মাঝে মাঝে কিঙ্কিণীমালা, দিক্‌মালা যতটা লম্বা, সে মালাও ততখানি লম্বা। বাতাসে ছোট ছোট ঘুঙ্গুরগুলি দুলিতেছে, আর ঝুন্‌-ঝুন্‌ ঝুন্‌-ঝুন্‌ শব্দ হইতেছে। মাঝে মাঝে বড় বড় ধ্বজার উপর নানা-রকমের, নানা-রঙের, নানা-আকারের পতাকা পত-পত শব্দে উড়িতেছে; কোনটি তেকোণা, মুখে ঝালর দেওয়া, সমস্তটাই রেশমের তৈয়ারী; কোনটি চৌকণা, সামনে ও নীচে ঝালর—কাপাসের জমির উপর রেশমের কাজ-করা; কোনটি ছালের কাপড়ের; কোনটি চামড়ার—বিচিত্র বেশে, বিচিত্র আকারে উড়িতেছে। কোথাও বা এক প্রকাণ্ড ধ্বজার চারিদিকে কেবল ছাতা, নীচেরটি সব চেয়ে বড়, যত উপরে উঠিতেছে, ছাতা ক্রমে ছোট হইয়া গিয়া মটকার উপর একটি মোচার আগার মত হইয়া গিয়াছে। সেখান হইতেও ফুলের মালা দুলিতেছে। রাস্তার দুধারে বাঁশের থাম। প্রত্যেক থামের গোড়ায় পূর্ণকলস, তাহার উপর আম্রশাখা, তাহার উপর একটি টাট্‌কা ডাব। কলসীতে সিন্দুর, চন্দন ও হলুদের দাগ। পূর্ণ-কলসের পিছনে এক একটি কলাগাছ।

সরস্বতীর উপর সাঁকো নাই, পুল নাই, খেয়ার নৌকাও নাই। মহাজনী নৌকার ছৈয়ের উপর দিয়া উপর দিয়া পারাপার হয়। কিন্তু লোক-পারাপার এক জিনিস, গাজন-পার আর এক রকম জিনিস। সরস্বতীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত নৌকাগুলি এমন ভাবে সাজান, যেন একটি একটি 'নৌ-সেতু' হইয়াছে। ছৈয়ের উপর দিয়া মানুষ চলিয়া যাইতেছে, পাটাতনের উপর দিয়া হাতী, ঘোড়া, রথ চলিতেছে। আবার আর এক সারি নৌকা, আবার ছৈ, আবার পাটাতন। নৌকার মাস্তলগুলি নানারঙের কাপড় দিয়া মোড়া। মাস্তলের আগা হইতেও দিক্‌মালা ও কিঙ্কিণীমালা। আর সব নৌকাই বেশ সাজান-গোজান। হাতীগুলির যেমন শিঙার করে, নৌকার সেই রকম শিঙার করা হইয়াছে; কোথাও লাল, কাল, সাদা, হলুদের বড় বড় ডোরা, কোথাও হাতী-ঘোড়া আঁকা, কোথাও বা বড় বড় অক্ষরে মহাজনের নাম লেখা,—কোথাও বা লেখা—"ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।"

সাতগাঁএর ভিতর বড় রাস্তার দুধারেই দুতলা তিতলা কোঠা, কোনটি ইটের কোঠা, কোনটি মাট-কোঠা। প্রত্যেক বাড়ীতেই এক একটি 'বাতায়ন'—একটা গোল বারান্দা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; বারান্দায় অনেক জানালা, ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। সাতগাঁএর ধনী বণিক্‌গণ বাড়ীর সম্মুখধার প্রাণপণে সাজাইয়াছে। বাড়ীর ভিতর যেখানে যে ছবি ছিল, বাহিরের দেওয়ালে লাগান হইয়াছে। ছবিগুলি লাগানর জন্য পঞ্চায়েত বসিয়াছিল, পঞ্চায়েত যে ছবিখানি যেখানে যে ভাবে রাখিতে বলিয়াছিলেন, সেখানি সেইখানে সেইভাবেই ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সাতগাঁএর বড় রাস্তার বাহার ছবির বাহার ত নয়, বাতায়নে যুবতীদের মুখের বাহার। এক একটি বাতায়ন যেন এক একটি পুকুর, যেত শত শত পদ্ম ফুটিয়া ঘেঁসাঘেঁসি মেশামেশি করিয়া আছে। সে দিন বড় রাস্তার উপর দোকান-পাট সব বন্ধ। বণিকেরা নূতন কাপড় পরিয়া, নূতন বেশভূষা করিয়া, আপন আপন দোকানের পাশে জটলা করিতেছেন; সমস্ত সহর তোলপাড়। কোন কোন বণিক্‌ দীপমালা সাজাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বড় রাস্তার ধারে বৌদ্ধ-বিহারগুলির আজ অপূর্ব্ব শ্রী। বিহারের যেখানে যা ভাল

জিনিসটি·ছিল, সব বাহিরে আনা হইয়াছে। বিহার-তোরণের সামনে পিতলের বড় বড় দীপগাছা রাখা হইয়াছে। এক একটি গাছায় ১০০।১৫০ করিয়া প্রদীপ জ্বালান যাইতে পারে। রাস্তার উপরের দেওয়ালে শত শত নিশান টাঙ্গান হইয়াছে। নিশানের মধ্যে বৌদ্ধ-দেবদেবীর প্রতিমা যোবাল রঙে আঁকা আছে। এখন আর শুদ্ধ বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘে চলে না; এখন নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি বৌদ্ধবিহারে আসিয়া পড়িয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে গণেশ একটি প্রধান দেবতা। উপাসকের ইচ্ছা অনুসারে গণেশের হাত বাড়িতেও পারে, কমিতেও পারে। তিনি নীচের দিকে শেষ দুটি হাতে একটি জামবাটি ভরা লাড়ু লইয়া বসিয়া আছেন, আর লম্বা শুঁড় দিয়া লাড়ুগুলি টুপ্-টুপ্ করিয়া খাইতেছেন। গণেশের কাছেই মহাকাল—বেঁটে-খেটে, গাঁটা-গোঁটা, মুখখানি মস্ত, হাঁ-টা খুব ডাগর, কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া আছেন। এক পাশে মঞ্জুশ্রী ধীর গম্ভীর, দুটি হাত—এক হাতে কিরীচ আর এক হাতে পুথি। নিকটেই লোকেশ্বর—"সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট", "কেয়ূরবান্", "কনককুণ্ডলবান্", "কিরাটী", "হিরণ্ময়বপুঃ"—দুই হাতে দুই পদ্ম লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হিন্দুর মন্দিরও বেশ সাজান-গোজান হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে যেন প্রাণ নাই। চারিদিকে উৎসব, জোর করিয়াও তাতে মাতামাতি করিতে হইবে, ইচ্ছা থাক আর নাই থাক—নইলে ভাল দেখায় না। হিন্দুর বাড়ীরও দশা তাই—বাহিরচটক ঠিক রাখা হইয়াছে, কিন্তু ছেলেপুলে ছাড়া আর কেহ দরজায় নাই।

৪

সাতগাঁ পার হইয়াও ধরমপুর পর্য্যন্ত তারাপুকুরের মতই সাজানগুজান। তবে ধরমপুরের আলোর কারখানাটা খুব বেশী। সন্ন্যাসাদের সেখানে দু'এক রাত থাকিতে হইবে কি না, তাই এই আলোর ব্যবস্থা। সেখানেও তারাপুকুরের মত কোথাও তালপাতার বড় বড় ঘর, কোথাও তালপাতার মেরাপ, কোথাও তাঁবু, কোথাও শামিয়ানা, কোথাও কাঠগড়া, সব জায়গায়ই আলো, আলো ও বিচিত্র মশালের বন্দোবস্তই বেশী। বড় বড় শামিয়ানার নীচে বাঁশের তেকোণার উপর সরা; তাহাতে সরিষার তেল; তেলের মধ্যে সরিষার পুঁটলী; পুঁটলীর গেরর উপরে যে কাপড় আছে, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সেইটা জ্বলিতেছে। কোথাও মাটীর বা কাঠের বড় বড় দীপগাছা, তাহাতে বড় বড় মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছে। অনেক জায়গায় তেল সাশ্রয় করিবার জন্য প্রদীপের নীচে জল রাখার একটা পাত্র আছে। কোথাও আড়ার বাঁশে দড়ী বাঁধিয়া তাহাতে চার পাঁচমুখো প্রদীপ একটি মাটীর ডাঁটায় চারিদিকে ঝুলিতেছে। প্রদীপের নীচে জল রাখার ডাবা।

ধরমপুরের সঙ্ঘারামের মধ্যে একটি ছোট-খাট বিহার ছিল। বিহারটি দোতালা, চকমিলান; একতলায় ও দোতলায় চারিদিকে বারান্দা; বারান্দার ওপাশে সারি সারি ছোট ছোট ঘর। বারান্দার দিক্ ছাড়া আর কোন দিকে জানালা বা দরজা নাই। এক একটি ঘর এক একটি ভিক্ষুর শুইবার স্থান। রাত্রি ভিন্ন ঘরে কেহ বড় একটা থাকে না। রাত্রেও শোয়ার জন্য হয় একটা মাদুর, না হয় একটা চেটা, না হয় একখানা পুরান গালিচা। খাট-চৌকী একেবারে নাই, বালিসের সম্পর্কও বড় একটা নাই। উঠানে একটি মন্দির ও তাহার সম্মুখে একটি নাটমন্দির। মন্দিরে একটি ছোট চৈত্য থাকে; কিন্তু ধরমপুরের বিহারে শাক্যমুনির একখানি প্রতিমা ছিল। মন্দির-দরজার দুপাশে গণেশ আর মহাকাল; ভিতরে কি আছে, সে কথা আর বলিব না। নাটমন্দিরে প্রকাণ্ড গালিচা পাতা। লুই-সিদ্ধা ও তাঁহার বড় বড় চেলারা এইখানে বসিয়া দুপরে ও সন্ধ্যায় তর্ক বিতর্ক করিবেন। বিশেষতঃ গুরুদেব বলিয়া দিয়াছেন—"আমার 'অভিসময়বিভঙ্গ' লেখা হইতেছে, তাহা লইয়া আমরা কতকগুলি অন্তরঙ্গের সঙ্গে সর্ব্বদা বাদানুবাদ করিব। সেখানে যেন অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক যায় না। উপাসকদিগের যাইবার বাধা নাই।"

৫

৩টার সময় রাজবাড়ীতে গাজনের সাজন হইল। মূল সন্ন্যাসীর মাথা নেড়া, লম্বা দাড়ী, গোঁপ কামান, গায়ে আলখাল্লা, তাহার গায়ে ছোট ছোট নানা রঙের রেশমের, পাটের, বাকলের টুকরা লাগান। তাঁহাকে রাজা আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া একটা একাণ্ড হাতীর হাওদায় তুলিয়া দিলেন। খুব সাজান একটা হাতী, সর্ব্বাঙ্গে শিঙার করা, বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা শাদা শাদা কাল কাল ডোরা দেওয়া, তাহার উপর কিংখাপের হাওদা, হাওদার চারিদিক্ দড়ী দিয়া ঘেরা, খুব ঝাঁকাল,

খুব জমকাল। রাজা গুরুদেবকে সেই হাতীতে চড়িতে ও সেই হাওদায় বসিতে বলিলেন। ক্রমে হাতী আসিয়া গুরুদেবের পদতলে উপুড় হইয়া পড়িল ও শুঁড় দিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। হাতীর পিঠে একটা সিঁড়ি লাগিল; সেই সিঁড়ি বাহিয়া গুরুদেব হাতীতে উঠিলেন। তাঁহার সহিত একটি ছোকরা—তেমন সুন্দর ছেলে দেখা যায় না, যেন সত্য সত্যই রাজপুত্র; মাথাটি মুড়ান; বোধ হয়, প্রায়ই খেউরি করা হয়; গোঁপ নাই, দাড়িও নাই। রঙটি যতদূর ধব্‌ধবে হইতে পারে; চোখ দুটি পটল-চেরা; ঠোঁট দুটি পাতলা অথচ লাল; গাল দুটি বেশ গোলগাল; দাড়িটি ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচাল হইয়া গিয়াছে; কপালখানি ছোট, কম চওড়া; দুই রগের দিকে চুলগুলি একবার ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আবার বাহিরে আসিয়া কোণ করিয়া কানের কাছে জুলপি হইয়া গিয়াছে। সমস্ত মাথাটা খেউরি করায় কেবল একটু কাল ছায়া, কাল দাগ মাত্র আছে। ভুরু দুটি জোড়া নহে, ঠিক কামের কামানের মত নহে, যেন দুই দিকে দুইটা ধনুক উড়িতেছে। ছেলেটির পরা কৌপীন, অন্তর্বাস আর বহির্বাস। এমন ছেলেও ভিক্ষু হয়? ইনি গুরুর সঙ্গে একত্রে হাতীতে উঠিলেন; লোক অবাক্ হইয়া তাঁহার চেহারা দেখিতে লাগিল। তিনি গুরুর সঙ্গে এক হাওদায় বসিলেন। হাতীর মাহুত কিন্তু আর এক রকমের। তার মাথায় সাঁচ্চার জরীর তাজ, গায়ের আঙরাখায় সোনালীর কাজকরা, গলায় মুক্তার মালা; হাতীর যেমন সাজ, মাহুতের সাজও সেইরূপ জাঁকাল। ইঙ্গিতে হাতী উঠিল এবং গুরু ও শিষ্যকে বহন করিয়া দাঁড়াইল।

এইবার গাজন। প্রথম একদল বাজন্দার,—ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাগারা লইয়া যাইতে লাগিল। এ দল লড়াইয়া বাজন্দার; জাতে মুচি—খুব চোটে বাজাইতে লাগিল। তাহার পিছনে একদল পদাতি সৈন্য—ছয় জন করিয়া সারি;—মালকোচা মারা, মাথায় বাবরীকাটা ঝাঁকড়া চুল, তাহার উপর একটা বাঁধা-পাগড়ী, হাতে বাঁশের লাঠি। তাহার পিছনে আবার একদল মুচি বাজন্দার। পিছনে ঘোড়্‌সোয়ার—চারি জন করিয়া এক এক সারিতে; ঘোড়ার উপর দেশী জিন—অর্থাৎ কম্বলে পটি দিয়া ঘোড়ার পেটে বাঁধা। সোয়ারদের গায়ে আঙরাখা, মাথায় মাথা-ঢাকা পাগড়ী ও হাতে লম্বা লম্বা বল্লম; ফলাগুলা খুব শাণান, চক্‌চক্ করিতেছে, তাহার উপর আবার সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দূরে গাছের মাথায় তাহার ছায়া যেন জ্বলিতেছে। তাহার পিছনে আবার বাজন্দার, তাহার পিছনে রথ, এক এক সারথি ও এক এক রথী; নীচে গুপ্ত শস্ত্রাগার; কোনটা এক ঘোড়ায় টানিতেছে, কোনটা দুই ঘোড়ায় টানিতেছে। এই সকল রথের পিছনে রাজা স্বয়ং—একক হাতীতে যাইতেছেন; তাহার পর তাঁহারই সব পাত্রমিত্র ও পরিবার। সঙ্গে সঙ্গে মহিষীরা আছেন, রাজকন্যারাও আছেন। ইঁহাদের পর কয়েকখান গোরুর গাড়ীতে সঙ—বানর, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, মার-সেনা, মার-কন্যা। তাহারও পরে কতকগুলি ‘চৌপাল্লায় নাটক। বিশেষ বেশন্তর নাটক; এই নাটক দেখিলে এখনও তিব্বতীয়গণ উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনকার বাঙ্গালীদের ত কথাই নাই। এ তাহাদের দেশেরই নাটক, তাহাদের দেশেই লেখা, তাহাদের দেশের লোকই সাজে। তাহার পর গুরুদেবের হাতী; তাহারও পিছনে গুরুদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ খোলকরতাল লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে দেহতত্ত্বের গান গাইতে গাইতে যাইতেছেন। তাহার পিছনে নেড়া-নেড়ীর দল—সবাই প্রকৃতি, পুরুষ এক গুরু। আর কেহই নাই। সবাই তাঁহার সেবা করিতেছেন। কেহ তাম্বুল যোগাইতেছেন, কেহ অঙ্গে চন্দন লাগাইতেছেন, কেহ ব্যজন করিতেছেন, কেহ অপাঙ্গবীক্ষণ করিতেছেন, কেহ বা অন্য উপায়ে গুরুর সেবা করিতেছেন। এইরূপে নানা সম্প্রদায়ের গুরু চলিয়া গেলে দেবদেবী আসিলেন; সব এক এক খোলা ঘোড়ার রথে। আসিলেন গণেশ, দুর্গা, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, রাম, নানা রকমের সঙ। তাহারও পিছনে হই-হাই, লোকজন, রঙ্গরস, তামাসা-ফষ্টি।

৬

গাজন প্রায় এক মাইল লম্বা। গাজন চলিল। রূপা-রাজার এমনি দবদবা, সবাই যে যাহার কাজ, তাহাই করিতেছে, কেহই কোনরূপ গোলমাল করিতে পারিতেছে না। গাজন সরস্বতীর ধারে আসিল। দেখা গেল, মাস্তুলে মাস্তুলে লোক একদৃষ্টে গাজন দেখিতেছে; মাস্তুলের মাথার কাছে মাচা বাঁধিয়াছে—শুদ্ধ গাজন দেখার জন্য—হুইএর উপর মাস্তুলের দড়ি ধরিয়া, নদীর পাড়ে গাছের উপর উঠিয়া, অগণ্য লোক গাজন দেখিবার জন্য কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছে। গাজন নৌকায় পৌঁছিলে গাজনের ভরে নৌকা টলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম সকলে একটু

ভয় পাইল, পরে বুঝিল, নৌকা টলিলেও ডুবিবার ভয় নাই। যাহা হউক, একটু ভয়ে ভয়ে রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যে ছোট নদীটি পার হইয়া আবার ডাঙ্গায় পৌঁছিলে সকলেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এবার সাতগাঁএর পথে গাজন। গাঁয়ের পথে ঢুকিবামাত্রই উপর হইতে খই পড়িতে লাগিল, ফল পড়িতে লাগিল, অনেক মাঙ্গল্যদ্রব্য পড়িতে লাগিল। বিশেষ যখন রাজার বা কোন বড় গুরুর হাতী কোন বড় বাড়ীর কাছে গেল, ফুল ও খই পড়ার ধূম দেখে কে? আবার যখন মূল সন্ন্যাসীর হাতী আসে, তখন গুরুদেবের শিষ্যটিকে একটু বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। সকলেরই রোখ সেই শিষ্যটির উপর। হাতী রাম দত্ত, স্বরূপ দে, শ্যাম লাহা, যদু কুণ্ডু, মধু ঘোষ, রাম মিত্রের বাড়ীর সাম্‌নে আসিল; পুরবাসিনীরা—বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই হায় হায় করিতে লাগিলেন—আহা, এমন দুধের ছেলেকেও কি সন্ন্যাসে দেয়? অনেক যুবতী তাহাকে দেখিয়া আপন আপন পতির সহিত তাহাকে তুলনা করিয়া পতিনিন্দা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ফুল ফেলার বিরাম নাই। শিষ্য বেচারা দুইবার উঠিয়া আঁজলা আঁজলা ফুল ফেলিয়া দিয়া হাওদা সাফ করিয়া ফেলিলেন। না করিলে গুরুও চাপা পড়িয়া মারা যান, আর আপনিও মারা যান। কিন্তু আবার রাশীকৃত ফুল জমিল ও তাঁহাদের হাতী বিহারী দত্তের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল—আবার পুষ্পবৃষ্টি। গুরু হাঁপাইয়া উঠিলেন। শিষ্যও হাঁপাইয়া উঠিলেন। কথাটা রূপা রাজার কানে উঠিল। তিনি গুরুর হাওদার উপর একটা খুব শক্ত চাঁদোয়া দিতে বলিলেন। ফুলগুলা আর সব হাওদার ভিতর পড়িতে পাইল না। সকল লোকই কিছু না কিছু দিয়া গাজনের পূজা করিল; নূতন সন্ন্যাসীর পূজা করিল। বিহারী দত্তের কন্যা বিশেষ পূজা করিলেন। তিনি হাতীতে মই লাগাইয়া গুরুর গলায় মালা দিয়া গেলেন আর শিষ্যের গলায়ও মালা দিয়া গেলেন, গুরু ও শিষ্য উভয়ের চরণ বন্দনা করিলেন। সেইখানে হাওদায় চারিটি খুঁটি লাগাইয়া উপরে একটা চাঁদোয়া দিতে দেরী হওয়ায় কন্যাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া গুরুর সেবা করিতে পারিলেন। গুরুও তাঁহাকে 'মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিষ্য যদিও কথা কহিলেন না, কিন্তু মন-প্রাণ খুলিয়া তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন।

বিহারী দত্তের মেয়েটি পরমা সুন্দরী—একেবারে নিখুঁত সুন্দরী। যেমন মুখশ্রী, তেমনই রঙ; যেমন গঠন, তেমনই দেহ-সৌষ্ঠব! কিন্তু তাঁহার মুখে একটা বিষাদের ছায়া দেখিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েই শঙ্কিত হইলেন; আর উভয়েই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"এ মেয়ের যেন কোন অমঙ্গল না হয়।" যাহা হউক, সেবা ও পূজা সাঙ্গ করিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। গুরু একবার শিষ্যের মুখের দিকে চাহিলেন। গাজন চলিতে লাগিল। গাজন যখন ব্রহ্মপুরীর ভিতর দিয়া যায়, তখন ব্রাহ্মণীরা যথেষ্ট আদর করিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা গাজন দেখাও দোষ মনে করিয়া বাড়ীর ভিতর রহিলেন। ক্রমে গাজন রাত্রি নয়টার পর ধরমপুর সঙ্ঘারামে পৌঁছিল। যাহার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান, সকলকে সেইখানে পৌঁছিয়া দিয়া রূপা রাজা সেই রাত্রেই ঘোড়ায় চড়িয়া তারাপুকুর প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

ভোর হইলে সকলে উঠিয়া দেখিল যে, যেখানে তাহারা রাত্রি কাটাইয়াছে, তাহার দক্ষিণে একখণ্ড চৌরস জমী পড়িয়া আছে। জমীখানি প্রায় একশত বিঘা হইবে। তাহাতে কোথাও একটি ছোট বা বড় গাছ নাই। সমস্তটা ঘাসের জমী। বোধ হইল, যেখানে ঘাস ছিল না, সেখানেও সম্প্রতি ঘাস জমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জমীখানির চারিদিকে কোদালি দিয়া দাগকাটা ও তাহার চারি কোণে চারিটা খোঁটাখুঁটি পুতিয়া তাহাতে ধ্বজা ও পতাকা দেওয়া। দেখিয়া বোধ হয়, অনেক দিন ধরিয়া এই জমীখানি শোধন করা হইয়াছে, এবং শীঘ্রই এখানে সম্যক-সম্ভোজন হইবে। উদ্যোগও তাহারই কতক হইয়াছে ও কতক হইতেছে।

এ শোধন করা জমীখানা, তাহারা যেখানে রাত্রি কাটাইয়াছে, তাহার দক্ষিণে, পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা। উহার দক্ষিণ সীমা হইতে কিছু দূরে একটা খাত। খাতের ওপারে মাটীর পাঁচীল। খাতের মাটী তুলিয়া খুব চটালো করিয়া পাঁচীল দেওয়া হইয়াছে। তাহার উত্তর দিকটা বেশ ঢালু হইয়া খাতের মাথায় শেষ হইয়া গিয়াছে। আর সেই

পাচীলের ঠিক মাঝখানে একটা দোর—পাঁচতলা-সই উঁচু, কপাট দুখানাই প্রায় চারতলা। কপাটের দুই পাশে চারিতলা ঘর ও কপাটের উপর আর একতলা। কপাট দুখানি খুব মোটা কাঁটালের তক্তায় তৈয়ারী। আরও মোটা তক্তার বাতা বসান এবং উহার সমস্ত গায় মোটা মোটা পিতলের গুলা বসান। উহা নূতন তৈয়ারী হইয়াছে, এখনও চকচক্ করিতেছে। কপাটের পাশে ও মাথায় যে সব ঘর আছে, তাহাতে রক্ষিপুরুষেরা থাকিবে; সেইখান হইতে তাহারা শত্রুপক্ষের গতিবিধি দেখিবে ও কপাট বন্ধ করিয়া দিবে। শত্রুসেনা নিকটে আসিলে বুকসমান পারাপেট-দেওয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া তীর ছুড়িবে, তাহারও বন্দোবস্ত আছে। আজ কিন্তু সেখানে রক্ষিপুরুষও নাই, তীর, ধনু, ঢাল-তলোয়ারও নাই। আছে কেবল বাজন্দার ও বাজনা—ঢাক, ঢোল, কাঁসী, দামামা, দগড়া, সানাই, শিঙ্গা, ঝাঁজ—বিশেষ কাহল।

কপাটের দুই ধারে দুইটা ভীষণ আংটা; তাহার ভিতর দিয়া দুই শিকল; শিকলে একখানা প্রকাণ্ড লোহার পাত টানিয়া খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। আংটার নীচে মাটীর উপর একটা ঘোরাইবার কল আছে। কল ঘোরাইলে লোহার পাত উঠিয়া পড়ে, আর ছাড়িয়া দিলে পাত পড়িয়া যায়। এখন লোহার পাত খাড়া করাই আছে।

২

যত ফরসা হইতে লাগিল, তাহারা আরও দেখিতে পাইল যে, শোধন-করা জমীতে কপাটের দুই পাশ হইতে কিছু দূর গিয়া দুইটা রেখা টানিয়া তাহার ওপারে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কতকগুলি প্রজ্ঞা-মূর্ত্তি ও অনেকগুলি উপায় মূর্ত্তি দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধদের প্রথম ছিল—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্ন। কিন্তু মহাযানে যখন দর্শনশাস্ত্রের বড়ই আলোচনা, তখন তাহারা বুদ্ধকে বোধির উপায় বলিয়া মনে করেন এবং ধর্ম্মকে প্রজ্ঞা বলিয়া মানিয়া লন, সংঘ বোধিসত্ত্ব হন। কোন কোন মতে ত্রিরত্ন ছিল বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ; আবার কোন কোন মতে ছিল ধর্ম্ম, বুদ্ধ, সঙ্ঘ। মহাযানীরা শেষ মতের লোক; সুতরাং তাহারা প্রজ্ঞাকেই প্রথমরত্ন বলিয়া মনে করিত এবং এখানে পূবের দিকে প্রজ্ঞা-মূর্ত্তিই রাখিয়াছে। কোন কোন প্রজ্ঞা-মূর্ত্তি দাঁড়ামূর্ত্তি;—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, দুই হাত, দুই পা, সর্ব্ব-অলঙ্কার-ভূষিত। সেইগুলিই দক্ষিণদিক্ হইতে আসিতে সকলের আগে পাওয়া যাইত। তাহার পর বসামূর্ত্তি; তাহার পর তারামূর্ত্তি; তাহার পর পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চশক্তি;—লোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্য্যতারিকা। তাহার পর বজ্রতারা, বজ্রবারাহী—শূওরের মত মুখ; তাহার পর বজ্রযোগিনী; তাহার পর বজ্রধাত্বীশ্বরী। সব মূর্ত্তিই তামায় তৈয়ারী, আর সোণার খুব পাতলা পাতে মোড়া। ইহাতে কখনও মরিচা পড়ে না, সর্ব্বদাই চকচক্ করে।

পশ্চিমের সারিতে প্রজ্ঞাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—উপায়মূর্ত্তি অথবা বুদ্ধমূর্ত্তি। কোন জায়গায় বুদ্ধদেব দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন; কোন জায়গায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন; কোন জায়গায় এক হাত মাটীতে দিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে এক একটি প্রজ্ঞার সম্মুখে এক একটি উপায়মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি সব সাতগাঁ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিহার হইতে আনাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্যক্-সম্ভোজনে তাঁহারা যে শুদ্ধ সাক্ষিমাত্র, তাহা নহে, তাঁহারাও এই সম্ভোজনে যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে ভিক্ষা লইবার জন্য চাদর বিছান। যে বিহারে যে ভাল চাদরখানি ছিল, আনিয়া মূর্ত্তির সম্মুখে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রজ্ঞা-মূর্ত্তিগুলির পিছনের সারিতে অনেক দেবীমূর্ত্তি,—ক্রোধ-মূর্ত্তি, শান্তমূর্ত্তি, করুণামূর্ত্তি ইত্যাদি এক এক দেবীরই কত মূর্ত্তি আছে। আর উপায়মূর্ত্তিগুলির পিছনের সারিতে বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, বিশেষ লোকেশ্বরমূর্ত্তি। কোন মূর্ত্তির দুই হাত, কোনটির চারি হাত, কোনটির দশ হাত, কোনটির ছত্রিশ হাত, কোনটির আবার একশ হাত; সাধকের বাসনা-অনুসারে দেবতার হাত, পা ও মাথা যত ইচ্ছা হইতে পারিত। মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তির এক হাতে তলোয়ার ও আর এক হাতে পুঁথি—বীরমূর্ত্তি অথচ শান্ত এবং হাস্যবদন। তাহার পর গগনগঞ্জ, আকাশগর্ভ, ক্ষিতিগর্ভ ইত্যাদি নানা বোধিসত্ত্ব। তাহার পর বজ্রসত্ত্ব চণ্ডমহারোষণ ইত্যাদি অর্দ্ধ-দেব, অর্দ্ধ-অসুর ও অর্দ্ধ-বুদ্ধমূর্ত্তি। সব সোণার পাতমোড়া। সকল দেবদেবীরই মাথায় এক এক প্রকাণ্ড ছাতা, লম্বা সোণায় মোড়া ডাণ্ডার উপর উল্‌টান সানকের মত বড় বড় ছাতা;—কোনটা রেশমের, কোনটা পশমের; সব ছাতা হইতেই ঝালর ঝুলিতেছে; ঝালরে মুক্তা দুলিতেছে। প্রত্যেক সারিতেই চাদর বিছান। সকলেই রূপারাজার ভিক্ষা লইতে আসিয়াছেন।

৩

এই সকল মূর্ত্তির পিছনে পশ্চিম ও পূবে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা চাদর বিছাইয়া বসিয়া আছেন। পশ্চিমে ভিক্ষুই বেশী, ভিক্ষুণী কম। পূবে ভিক্ষু কম, ভিক্ষুণী বেশী। নাঢ় পণ্ডিত নিজেই পূবের দিকে আছেন, তাঁহার ভিক্ষুণী নাঢ়ীও তাঁহার সঙ্গে আছেন। আর তাঁহাদের দল নাঢ়ানাঢ়ীরাও অনেক আছে।

এখনও কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। শোধন-করা জমীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে প্রচুর খাবার জিনিস রাশি রাশি রহিয়াছে। হুকুম হইলেই তৎক্ষণাৎ বিতরণ করিবার জন্য অনেক লোকজনও উপস্থিত আছে।

৪

একটু বেলা হইলে রাজাধিরাজের আগমন হইল। হঠাৎ নহবত বাজিয়া উঠিল, রাজা আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একটি সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি উপস্থিত হইলেন এবং প্রজ্ঞা ও উপায়মূর্ত্তির সারির উত্তর মুড়ায় ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। একখানি গরদের কাপড় পরা, একখানি গরদের উড়ানী গায়—তিনি নামিয়াই সমস্ত বুদ্ধ ও ধর্ম্মমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সারির মধ্য দিয়া দক্ষিণমুখে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিছনে সিদ্ধাচার্য্য লুই ও তাঁহার চেলা। তাহার পিছনে পুরোহিত সাধুগুপ্ত ও শ্রীফলবজ্র। তাহার পিছনে সাতগাঁয়ের বড় বড় রহীস, বড় বড় বণিক্ ও বড় বড় লোক।

প্রজ্ঞা ও বুদ্ধ-মূর্ত্তির মধ্য দিয়া যখন তাঁহারা ও মুড়ায় গিয়া পৌঁছিলেন, তখন দেখা গেল, সেখানে একটা প্রকাণ্ড সামীয়ানার নীচে এক প্রকাণ্ড গালিচা পাতা; সেই গালিচার উপর বসিয়া সকলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। তাহার পর সাধুগুপ্ত ও শ্রীফলবজ্র সমস্বরে তারাদেবীর স্রগ্ধরা-স্তোত্র গান করিলেন। তাহার পর আরও কয়টি স্তোত্রপাঠের পর প্রধান পুরোহিত সাধুগুপ্ত মহারাজাধিরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আজ প্রজ্ঞোপায়স্বরূপ, যুগনদ্ধমূর্ত্তি শ্রীহেরুকের নামে এই মহাবিহার নির্ম্মাণ করাইয়া ইহা কলিযুগপাবন সাক্ষাৎ গৌতমবুদ্ধের ন্যায় সিদ্ধাচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ লুইদেবকে দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনার সে সঙ্কল্প সাধু!" চারিদিক্ হইতে প্রতিধ্বনি হইল "সাধু সাধু।" চারিদিক্ হইতে বাজনা বাজিয়া উঠিল "সাধু সাধু!" বিহারদ্বার হইতে বাজনা বাজিয়া উঠিল "সাধু সাধু!" সাধুবাদ শেষ হইয়া গেলে পুরোহিত আবার বলিলেন, "আপনি সাধুসঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য, ইহার নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য, সর্ব্ব-বুদ্ধ-সর্ব্ব-দেব-দেবী-বোধিসত্ত্ব, সর্ব্ব-যক্ষ-কিন্নর-মহোরগ, সর্ব্ব-ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়, সমস্ত উপাসক-উপাসিকাবর্গের অনুমতি গ্রহণ করুন, যেন আপনার সাধু সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হয়।" রাজা সমস্ত বোধিসত্ত্ব-দেবদেবীগণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি সঙ্কল্প করিয়াছি, শ্রীহেরুকের নামে যে মহাবিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছি, তাহা আমার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীশ্রী ১০৮ সিদ্ধাচার্য্য লুইদেবকে দান করিব; আপনারা প্রসন্নমনে অনুমতি করুন, যেন আমার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হয়।" তখন সকলে "করুন" বলিয়া অনুমতি দিলেন, আবার বাজনা বাজিয়া উঠিল।

গালিচা হইতে নামিয়া রাজা, সাধুগুপ্ত ও সিদ্ধাচার্য্য তিন জনে একটু দক্ষিণদিকে গিয়া তিনখানি গালিচার আসনে বসিলেন। রাজা পূর্ব্বমুখে, তাঁহার বামে সাধুগুপ্ত পূর্ব্বমুখে এবং সিদ্ধাচার্য্য উত্তরমুখে বসিলেন। পুরোহিত দানের উদ্যোগ করিতেছেন, এই অবসরে রাজা বিহারদ্বারস্থ লোকদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা লোহার পাতখানি আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে নামাইয়া মাটীতে লাগাইয়া দিল। সেখানি একটি তোলা ফটক। তখন দ্বারের ভিতর দিয়া মহাবিহারের অনেক অংশ দেখা যাইতে লাগিল। পুরোহিত রাজাকে বলিলেন, "আপনি বামহস্তে ঐ লোহার পাতখানা ধরুন।" রাজা তাঁহাকে একটু দেরী করিতে ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মেঘগম্ভীরস্বরে গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব, আপনি জগতের যে উপকারসাধন করিয়াছেন, স্বয়ং বুদ্ধ গৌতমও তাহা পারেন নাই। তাঁহার নির্ব্বাণ বহুজন্মব্যাপী বহু-আয়াসসাধ্য ধ্যান-ধারণা, তপ-জপ ও কঠোর-সাধনার ফল। কিন্তু আপনার নির্ব্বাণ অতি সহজ, আমার মত মহাপাপীও আপনার উপদেশে অনায়াসে নির্ব্বাণ-পথের পথিক হইতে পারে। আপনার উপদেশে আমার পুনর্জ্জন্মলাভ হইয়াছে, আমি পবিত্র হইয়াছি, বিশুদ্ধ হইয়াছি ও ধন্য হইয়াছি। প্রজার মঙ্গলই রাজার সকলের আগে দেখা উচিত। তাই আমি আমার প্রজারা যাহাতে বিশুদ্ধচরিত্র ও পবিত্র হইয়া নির্ব্বাণপথের পথিক হইতে পারে, সেই উদ্দেশে এবং—আপনার উপদেশ যাহাতে চিরস্থায়ী হয়—সেই উদ্দেশে, এই মহাবিহার নির্ম্মাণ করিয়াছি। ইহার

ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সেবার জন্য ৫০ খানি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি এইগুলি গ্রহণ করিয়া আপনার সেবকানুসেবক এই অকিঞ্চনকে কৃতার্থ করুন।” বলিয়াই রোদন করিতে করিতে গুরুদেবের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। গুরুদেব তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার চখের জল নিজের উত্তরীয়ে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, “উপাসক, আমি ভিক্ষু, আমার এত দান লইবার কি প্রয়োজন? তুমি ইহা সঙ্ঘকে দান কর।” রাজা বলিলেন, “প্রভু, দয়াময়, আমি সঙ্ঘের কিছু জানি না, আমি আপনাকেই জানি, আমি আপনাকেই দিতেছি, আপনি সঙ্ঘকে দান করুন আর যাই করুন, সে আপনার ইচ্ছা।” তখন গুরুদেব বলিলেন, “তবে সহজসঙ্ঘের মঙ্গলকামনায় আমি তোমার দান গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম।” চারিদিক্ হইতে সাধুবাদ হইতে লাগিল।

তখন রাজা বামহস্তে লোহার পাতখানা ধরিলেন। পুরোহিত ভাষায় মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন;—“এই যে মহাবিহার, ইহাতে যাহা কিছু আছে—জল, স্থল, গাছপালা, ঘরবাড়ী, ইহার উপরে বা নীচে যাহা আছে, সে সমস্ত ও সেই সঙ্গে ইহার সংলগ্ন পঞ্চাশখানি গ্রাম, আমার ইষ্টদেব সিদ্ধাচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ লুইদেবকে দান করিলাম।” এই বলিয়া তিনি রাজার হাতে মন্ত্রপূত জল দিলেন, রাজাও সেই জল গুরুদেবের চরণে ফেলিয়া দিলেন। আবার সাধুবাদ, আবার বাদ্য-নির্ঘোষ।

দানকার্য্য যথাবিধি সমাপ্ত হইলে গুরুদেবের দক্ষিণা ও পুরোহিত দুজনের দক্ষিণা দিয়া রাজা তাঁহার এক ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন, সে একটি থলিয়া সোনা লইয়া রাজার পিছু পিছু যাইতে লাগিল। রাজা এক এক খণ্ড সোনা লইয়া প্রজ্ঞাদেবীদের চাদরে দিতে লাগিলেন। প্রজ্ঞাদেবীদের পর উপায়-দেবগণকেও এক এক টুক্রা সোনা দিলেন, তাহার পর কর্ম্মচারীদিগকে ইঙ্গিত করিলেন—“তোমরা দানের সামগ্রী সব বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব দেবদেবী, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের দান কর।” নিমেষমধ্যে চারিদিকে লোক ছুটিল, সকলের চাদরই ভরিয়া গেল। তাহার পর যেখানে যেখানে যত সহজবৌদ্ধ ছিলেন, সকলকেই দান করিতে আরম্ভ করিলেন। দান চলিল—সমস্ত দিন চলিল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিল। ভিক্ষুরা সেইখানে বসিয়াই আহার করিল এবং স্তবপাঠ ও গান করিতে লাগিল; ছড়া কাটাইতে লাগিল এবং নানারূপ গোল করিতে লাগিল।

৬

রাজা দান আরম্ভ করিয়া দিয়াই গুরুদেবের নিকট গিয়া পৌঁছিলেন এবং গুরুদেবকে মহাবিহারে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলের আগে গুরুদেব, পিছনে তাঁহার চেলা, তাহার পর দুজন পুরোহিত, তাহার পর রইস ও বণিকেরা, তাহার পর বিহারের বড় মিস্ত্রী, মন্দিরের বড় মিস্ত্রী, বড় ভাস্কর। সকলের শেষে রাজা। কিছু দূর গিয়া গুরুদেব প্রধান মিস্ত্রীকে দেখিতে চাহিলেন, সে রাজার অনুমতি লইয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিহারের সীমা কত দূর?”

মিস্ত্রী বলিল, “উত্তরদিকে যেমন খাত দেখিয়াছেন, ইহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমেও তেমনি খাত আছে। আর ঐ যে চারিদিকে ঘাসের চাবড়া দেওয়া পাঁচীল দেখিতেছেন, ঐ ইহার সীমা।”

“বিহারবাড়ী কৈ?”

সে বলিল, “বিহারবাড়ীর কথা আমার নয়, তাহার জন্য আর এক জন মিস্ত্রী আছে।”

গুরুদেব তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিবার সময় সেই মিস্ত্রীকে পাঠাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। সে রাজার কাছে গেল, রাজা তাহার মাথায় শালের ফেটা বাঁধিয়া দিলেন এবং একগাছ সোনার হার তাহার গলায় দিয়া দিলেন।

বিহারবাটীর মিস্ত্রীকে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিহারে কতগুলি ঘর আছে?”

সে বলিল, “উপর নীচে চারি শত।”

“মাঝ উঠানে কি আছে?”

“হেরুক-মন্দির—তাহার সম্মুখে বুদ্ধ-মন্দির ও নাটমন্দির।”

“নাটমন্দিরে কত লোক বসিতে পারে?”

“চারিশতই বসিতে পারে।”

“মূর্ত্তি সব প্রস্তুত?”

“সে কথা ভাস্কর বলিবে।”

গুরুদেব তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও ভাস্করকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। সেও ফেটা পাইল, হার পাইল।

ভাস্কর আসিয়া প্রণাম করিলে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীহেরুকের কোন্ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছ ?"

সে বলিল, "যুগনদ্ধ-মূর্ত্তি।"

"বুদ্ধ-মন্দিরে কি আছে ?"

"অশোক রাজার একটি ছোট চৈত্য।"

"কোথায় মিলিল ?"

"মহারাজের প্রতাপেই।"

"শাক্যসিংহের মূর্ত্তি কোথায় ?"

"নাটমন্দিরের বাহিরে।"

"উপরে আচ্ছাদন আছে ?"

"আছে।"

"তোমরা কোথাকার ভাস্কর ?"

"বারেন্দ্রভূমের।"

"বেশ বেশ! সবই ভাল হইয়াছে। এ সকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ?"

"এখন আপনি প্রতিষ্ঠা করিবেন। মহারাজ ত দান করিয়া দিয়াছেন।"

"সাধু সাধু" বলিয়া গুরুদেব ভাস্করকে বিদায় করিয়া দিলেন ও বলিলেন, "বেলা কত ?"

সে বলিল, "দুপর গড়াইয়া গিয়াছে।"

"তবে বেশ হইয়াছে, আজ আমি সংযত হইয়া থাকিব, কালই প্রতিষ্ঠা করিব।"

বৌদ্ধধর্ম্মের নিয়মানুসারে দুপর গড়াইয়া গেলে, গুরুদেব আহারে বসেন না। আজ সে জন্য আহারে বসিবেন না, ফলের রস পান করিয়া থাকিবেন। গুরুদেব আর সকলকে বিদায় দিয়া সমস্ত বৈকালবেলাটা বিহার দেখিয়া বেড়াইলেন—দেখিলেন, সবই মনের মতন হইয়াছে। তিনি, নূতন বিহারে তাঁহার জন্য যে ঘর রাখা হইয়াছিল, তাহাতে বিশ্রাম করিতে গেলেন। তখনও নগরবাসীদের দান বাহিরে চলিতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

গুরুদেব তাহার পরদিন হইতেই প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিলেন। মন্দিরটি ত্রিমালা। প্রথম দিন এক মালার প্রতিষ্ঠা হইল, দ্বিতীয় দিন আর এক মালার, তৃতীয় দিন আর এক মালার। ক্রমে হেরুকমন্দির, বুদ্ধমন্দির, নাটমন্দির, পুষ্করিণী আরাম—সব প্রতিষ্ঠা করিয়া হেরুকমূর্ত্তি, চৈত্য, শাক্যসিংহমূর্ত্তি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইল; প্রতিষ্ঠা করিতে অনেক দিন লাগিল। প্রতিষ্ঠার জন্য যথাশাস্ত্র আয়োজন হইত ও প্রতিদিন একটি একটি সঙ্ঘের ভোজন হইত। আজ সপ্তগ্রাম-বিহারের সঙ্ঘ, কাল বাসুদেবপুর-বিহারের সঙ্ঘ, পরশ্ব শিবপুর-বিহারের সঙ্ঘ, তাহার পরদিন সঙ্ঘনগর-বিহারের সঙ্ঘ। এক এক বিহারে যতগুলি ভিক্ষু থাকে, তাহাদের খাওয়াইলে, সঙ্ঘ-ভোজন করান হয়। গুরুদেবের শেষ সঙ্কল্প—শিষ্যের অভিষেক ও তাঁহারই উপর ধর্ম্মপুর-মহাবিহারের ভার-অর্পণ।

এই গল্পের সব ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, চারি পাঁচ বছর পূর্ব্বের একটি ঘটনা বলা আবশ্যক। ঐ সময়ে সাতগাঁএ বিহারী দত্ত সকলের চেয়ে বড় বেণে ছিলেন। বিহারী দত্ত বড় ঘরওয়ানা হইলেও তাঁহার পৈতৃক বিত্ত বেশী ছিল না। তিনি নিজেই অনেকবার বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্র পার হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে নানারূপ রান্নার মসলা, পাণের মসলা আমদানী করিয়া খুব বড়মানুষ হইয়াছিলেন। এমন কি—জাবা, বোর্ণিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে যত জাহাজ যাইত, সবই তাঁহার ছিল। সেখানকার সব মাল তাঁহার একচেটিয়া ছিল। বেণেদের ভিতর তখন চারিটি আশ্রম ছিল—ছত্তিক-আশ্রম, দেশ-আশ্রম, সঙ্ঘ-আশ্রম ও রাউত-আশ্রম। যাহারা ভিক্ষুদের ধূপধুনা অগুরুচন্দন বেচিত, তাহাদিগকে সঙ্ঘ-আশ্রম বলিত। যাহারা ছাউনিতে আতর, গোলাপ ও অন্যান্য সখের জিনিস বেচিত, তাহাদের আশ্রম রাউত-আশ্রম। যাহারা দশগাঁএ গিয়া রান্নার মসলা ও পাণের মসলা বেচিত, তাহাদিগকে দেশ আশ্রম বলিত। আর যাহারা নগরে বসিয়া ছত্রিশ-জাতিকে নানাবিধ সুগন্ধদ্রব্য বেচিত, তাহাদের আশ্রমের নাম ছত্তিক-আশ্রম। এই চারি আশ্রমের বেণেরাই বিহারী দত্তকে প্রধান বলিয়া মানিত। জাতি ও ব্যবসার সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে, তাহারা বিহারী দত্তের কাছে যাইত ও তাঁহার কথা মাথা পাতিয়া লইত। বিহারী যদিও নিজের জোরেই বড়মানুষ হইয়াছিলেন, তিনি অন্যান্য এক্কাবাহাদুরের মত দাম্ভিক বা অহঙ্কারী ছিলেন না। বরিলে, তিনি লোকের খুব উপকার করিতেন। সাতগাঁএর বেণেরা ও ব্যবসাদারেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

সাতগাঁএর বড় রাস্তার উপর বিহারী দত্তের

খুব বড় বাড়ী ছিল এবং সাতগাঁএর দক্ষিণ-পূর্ব্বে গঙ্গার ধারে গোলীন গ্রামে তাঁহার এক প্রকাণ্ড গুদাম ছিল। সেখানে অনেক লোক কাজ করিত, মসলাপাতি সেইখানেই গুদামজাত থাকিত। গোলীনের ঘাটেই বিহারী দত্তের শত শত ডিঙ্গা বাঁধা থাকিত। দরকার হইলে বিহারী এখনও সমুদ্রে যাইতে রাজী ছিল। বিহারী দেখিতে অতি সুপুরুষ। নেপালে উদাস বলিয়া এক জাতি আছে। উদাসদিগের শরীর-সৌষ্ঠব সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাহাদের নাক বড়, পাতলা, ঠিক বাঁশীটির মত; চোখ ডাগর, উজ্জ্বল, পটলচেরা। তাহারা সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। তাহাদের রঙ খুব উজ্জ্বল নয়, কাশ্মীরি বা আর্ম্মাণীদের মত দুধে-আলতার রঙ নয়, রঙ আর্ম্মাণীদের চেয়ে অনেক মাট, লালের আভা খুব কম, সাদারও যেন মাত্রা। বিহারীকে দেখিলেই উদাস বলিয়াই মনে হইত। বিহারী নিজে খুঁজিয়া একটি পরমা সুন্দরী বেণের মেয়ে বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের সময় সে দেখিয়াছিল রূপ, আর দেখিয়াছিল বংশ। বিবাহ করিয়া অবধি স্ত্রীর সহিত তাহার কখনও ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্য হয় নাই। সে আপনার স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসিত। বেণেরা প্রায়ই বিদেশে গিয়া একটু এ দিক্ ও দিক্ করে। বিহারী কখনও সে কাজ করে নাই। সে একেবারে "স্বদার-সন্তোষী" ছিল। বিহারীর ধর্ম্ম কি ছিল, তাহা ঠিক বুঝান যায় না। শুধু বিহারী কেন?—সে কালের বেণেদের যে কি ঠিক ধর্ম্ম ছিল, বলা যায় না। তাহারা ব্রাহ্মণ দিয়া দশকর্ম্মও করাইত, আবার বুদ্ধের মন্দিরে ধূপ-ধুনাও দিত। তাহারা ব্রাহ্মণ আসিলে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা লইত; বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আসিলেও তাঁহাকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিত। দুই ধর্ম্মের লোককেই তাহারা যথেষ্ট দান করিত। বিহারীর বৌদ্ধধর্ম্মের দিকেই টান বেশী ছিল। কেন না, সাতগাঁবিহারের মহাস্থবির শান্তশীলের আশীর্ব্বাদে তাহার একটি সন্তান হইয়াছিল। সেইটি তাহার একমাত্র সন্তান—সেটি একটি মেয়ে। মেয়েটিকে সে বড়ই ভালবাসিত। সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রী ও মেয়ের কাছে বসিয়া সে সমুদ্রের বর্ণনা করিত। সমুদ্রের ওপারে যে সব দেশ আছে, তাহার বর্ণনা করিত,—দারুচিনির গাছ, লবঙ্গের গাছ কেমন, বুঝাইয়া দিত, ঐ সব দেশের লোকের কথা বলিত। কতবার কত বিপদে পড়িয়াছিল,—তাহার গল্প করিত, একবার তাহার ডিঙ্গা ডুবিয়া যায়—সে গল্প করিত, একবার রাক্ষসেরা তাহাকে খাইতে আসিয়াছিল। কত বড় বড় গাছ দেখিয়াছে, কত বড় বড় ফুল দেখিয়াছে, কতবার কত লড়াই-ঝগড়া করিয়াছে, সে এই সব কথা বলিত। কেমন করিয়া দেশী সামান্য সামান্য জিনিস দিয়া বিদেশী মহামূল্য জিনিস কিনিয়া আনিয়াছে, তাহারও গল্প করিত। স্ত্রী কখন শুনিত, কখন শুনিত না; ঘরকন্নার কাজ দেখিতে চলিয়া যাইত। তাহাকে অতিথ-পথিক দেখিতে হইত, রাতভিখারীদের ভিক্ষা দিতে হইত, চাকর-চাকরাণীদের দেখিতে হইত, একটু অবসর পাইলে তবে সে স্বামীর গল্প শুনিতে পাইত। মেয়েটি কিন্তু খুব মন দিয়া বাবার গল্প শুনিত, নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত, মাঝে মাঝে 'বাবা, আমি তোমার সঙ্গে সমুদ্রে যাব' বলিয়া আব্দার করিত। বিহারী সে আব্দার রাখিতে পারিত না, মেয়েকে অন্য কথা পাড়িয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু মেয়ের যত বয়স হইতে লাগিল, সমুদ্র দেখিবার জন্য জেদও তাহার বেশী হইতে লাগিল। বিহারী ভাবিয়াছিল, তাহাকে ত আর সমুদ্রে যাইতে হইবে না, ব্যবসা এখন লোকজন দিয়াই যেমন চলিতেছে, তেমনই চলিবে। সুতরাং মেয়ে হ'তে তার আর ভয় নাই; সে না গেলে ত আর মেয়ে সমুদ্রে যাইতে চাহিবে না। এ বিষয়ে সে একরূপ নিশ্চিন্তই ছিল।

২

৯৯৫ সালে সে দেখিল, ৩।৪ ক্ষেপে তাহার লোকসানই হইয়াছে, লাভ হয় নাই। কেন এরূপ হয়, সে ভাবিয়া পায় না। যে ব্যবসায়ে শতকরা ২০০৲ মুনফা হয়, সে ব্যবসায়েও লোকসান! এ কেমন কথা? সে সন্ধান লইতে লাগিল। সন্ধান পাওয়াও কঠিন। ব্যাপারটা হয় সাগরের ওপারে। যাহারা যায়, তাহারা সব কথা ঠিক বলে না। কারিন্দার দোষে হয়? কি মাঝিদের দোষে হয়? কি সে দেশের লোক চালাক-চতুর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া হয়? কিছুই বুঝিতে পারিল না। শেষে স্থির করিল, সে একবার সেখানে নিজেই যাইবে; কিন্তু সে মেয়েকে এ কথা কিছুতেই জানিতে দিবে না। সে গোলীনের ঘাটে ডিঙ্গা, নৌকা সাজাইতে লাগিল, লোকজন ঠিক করিতে লাগিল, মাঝি-মাল্লা নিযুক্ত করিতে লাগিল। সে এখন বড়মানুষ হইয়াছে, নিজে সমুদ্রপারে যাইবে,

তাই খুব. সাজ-সরঞ্জাম চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে সেখানে সে সাত-আটবার গিয়াছে, কিসে সুবিধা হয়, কিসে অসুবিধা হয়, সে বেশ জানে। কোন্ লোকটা সমুদ্রে ভয় খায়, কোন্ লোকটার সাহস আছে, কোন্ লোকটার হাতটান আছে, কোন্ লোকটা সে দেশে গিয়া একটু বেচাল করে, সে দেশে কোন্ জিনিস পছন্দ করে, কোন্ জিনিস করে না, কোন্ জিনিসটি পাইলে তাহার বদলে বেশী জিনিস দেয়—এ সকল সে বেশ বুঝে এবং সেইরূপ বন্দোবস্তও করিতে লাগিল।

এ সব সে কেবল লুকাইত মেয়েকে, আর মেয়েকে লুকাইতে গেলে সকলের আগে স্ত্রীকে লুকাইতে হয়, সে স্ত্রীকেও লুকাইত। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এমন একটা ঘটনা লুকাইয়া রাখা অতি কঠিন; বিশেষ বেণেবৌ বহুকাল হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছে যে, সে আর স্বামীকে সমুদ্রে যাইতে দিবে না। যে কাজে এত বিপদ্, এত প্রাণের আশঙ্কা, এত জন্তু-জানোয়ারের ভয়, ঝড়-ঝাপ্টার ভয়, সে কাজে আর সে স্বামীকে যাইতে দিবে না, স্থির রাখিয়া করিয়াছে, সুতরাং পাছে স্বামী আবার যান, তাই সে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিত। সতর্ক থাকার ফলে সে সব জানিতে পারিল, স্বামীকে চাপিয়া ধরিল, "তুমি কিছুতেই যাইতে পাইবে না।" মেয়েও ধরিয়া বসিল, "বাবা, এবার আমিও যাব।" বিহারী প্রমাদ গণিল। উদ্যোগপর্ব্ব প্রায় শেষ হইয়াছে, এখন ফিরিবার যো নাই। সেও খুব শক্তলোক। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর, অনেক কান্নাকাটির পর মেয়েকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিল, তখন স্ত্রীর পরাজয় হইল। তখন স্ত্রী বলিল, "ও মা, আমি মেয়ে ছেড়ে থাকিব কিরূপে? সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটিমাত্র মেয়ে"—বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিহারী অনেক বুঝাইল—"তুমি গেলে, আমার গৃহস্থালী কে দেখিবে? ঠাকুর-দেবতার পূজা কে দেখিবে? অতিথ-পথিকের সেবা কে করিবে? গৃহিণীর গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া উচিত নয়।"

কিন্তু এবার বেণেবৌ নাছোড়বান্দা—"তুমি যাবে, মেয়ে যাবে, আমি কি নিয়ে ঘরে থাকিব?"

বিহারীর বক্তৃতায় কোন ফলই হইল না, অনুরোধ-উপরোধেও কোন ফল হইল না; শেষে স্থির হইল, তিন জনেই যাইবে। বড় বড় বেণেরা আসিয়া ধরিয়া বসিল—"পরিবার সঙ্গে বিদেশে যাওয়া! এ ত আমাদের দেশে কখনও নাই! গেলে ভারী নিন্দা হবে।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আচার্য্য মহাশয় আসিয়া দিন দেখিয়া দিলেন, সেই দিন—কৃষ্ণা প্রতিপৎ তিথি—বিহারী মেয়ে ও পরিবার সঙ্গে লইয়া ডিঙ্গা ভাসাইলেন।

৩

বিহারী দত্তের ডিঙ্গা ভাসিল। ডিঙ্গা একখানা নয়, দুইখানা নয়, এক এক সাজ্যায় সাতখানি করিয়া ডিঙ্গা—এমন সাত সাজ্যা ডিঙ্গা ভাসিল। প্রত্যেক সাজ্যায় এক এক জন বুড়া পাটনী। আর মধুকর নামে যে ডিঙ্গায় বিহারী দত্ত ও তাঁহার পরিবার ছিল, তাহার পাটনী এই সকল সাজ্যার কর্ত্তা। প্রত্যেক সাজ্যার এক একখানি ডিঙ্গায় ১০০ জন করিয়া জোয়ান পুরুষ তীর, ধনুক, ঢাল, তরবাল লইয়া ডিঙ্গারক্ষা করিবার জন্য আছে। সব নৌকার খোলে মাল বোঝাই, এ সব বিক্রীর মাল—ভাল কাপড়, বারাণসী সাড়ী, ঢাকাই মস্‌লিন, খেলনা, গাঁজা, সিদ্ধি, চন্দনকাঠ, পাট, থলে, রেশম, তসর, গরদ, ক্ষীরোদ, এণ্ডী।

প্রত্যেক সাজ্যার এক একখানা নৌকায় কেবল খাবার জিনিস—চাল, ডাল, আটা, লবণ, নারিকেল, চিঁড়া, ছাতু, তেল, ঘি, চিনি। শীতবস্ত্রের বড় দরকার ছিল না। বিছানা-মাদুর যা'র যেমন ইচ্ছা, তেমনই লইল। লোহার ও মাটীর উনুন অনেক লইল। কাঠ, কয়লা, চক্‌মকি, সোলা, টীকাও অনেক লইল।

নৌকাগুলির আকার একরূপ নয়। কতকগুলি হালের দিকে খুব উঁচা, অপর দিকে তত উঁচা নয়। এগুলি প্রায় গোল। ইহাদের খোল ফাঁদাল ও গভীর—অনেক মাল ধরে—প্রায় আগাগোড়া ছইয়ে ঢাকা। ছইগুলি শরকাঠির উপর সরু সরু বাখারির ঘন ঘন বাতা দিয়া বাঁধা। চারিপাশেও ঐরূপ শরকাঠির উপর বাখারির বাঁধন। এক একখানি ছইয়ের নীচে অনেকগুলি কামরা। প্রত্যেক কামরার লম্বায় দু'টি করিয়া জানালা ও আড়ে একটি করিয়া দুয়ার। এই আকারের নৌকা যে সাজ্যায় ছিল, তাহারই একখানিতে বিহারী দত্ত সপরিবারে বাস করিতেন। সেই ছইয়ের উপর একটি প্রকাণ্ড মাচা, মাচার উপর একটি ঘর। বুড়া পাটনী রাতদিন সেই মাচার উপর হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিত। হালখানি দেখিতে মাছের লেজের মত, গভীর জল পর্য্যন্ত গিয়াছে। হালের মাথায় একটি লোহার শিক বাঁধা। মাঝির হাতে সেই শিক।

প্রত্যেক নৌকার দুই ধারে পিতলের দুইটা করিয়া বড় বড় চোখ। মাঝখানে বড় বড় বেণের নাম লিখা।

আর এক সাল্লার নৌকাগুলি লম্বা ছাঁদের। তাহাতেও ঐরূপ ছই, ঐরূপ অনেকগুলি কামরা, ঐরূপ চোখ ও বেণের নাম লেখা। এক এক নৌকায় ৩০।৪০ খানি করিয়া দাঁড়, প্রকাণ্ড মাস্তুল ও অনেকগুলি করিয়া পাল।

নদীর ভিতর নৌকা চালান বিশেষ কঠিন, কেন না, মাঝে মাঝে চড়া আছে। মাঝিদের সে সব জানা-শুনা। তাহারা অনায়াসেই নদী বাহিয়া সমুদ্রে পড়িল। সমুদ্রের কিনারায় ডিঙ্গা লাগাইয়া সমুদ্রের পুজা দিল। সে দিন তীরে আহারাদি করিয়া খাবার জল তুলিয়া লইল। প্রত্যেক নৌকায় অনেকগুলি করিয়া জালা ছিল। এখন সেইগুলি মিষ্টজলে পরিপূর্ণ করিয়া লইল। তখন সকলে বরুণদেবের সারি-গান ধরিল, ক্রমে ডিঙ্গা সমুদ্রে আসিয়া পৌছিল।

যত দূর নদীর জল যায়, জল ঘোলা; তাহার পর খানিক সবুজ জল; তাহার পরই 'কালাপানি'—জল সিউ-কালীর মত কাল। তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ খেলিতেছে। আর ঢেউএর উপর মুক্তার মত সাদা জলের কণা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে বড় বড় ডানাওয়ালা মাছ লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে, দুইচারিটা ডিঙ্গার উপরেও পড়িতেছে। এইরূপে একটি মাছ পাইয়া বিহারী দত্তের মেয়ে ত আহ্লাদে আটখানা। তখন রসুইদারকে ডাকাইয়া মাছটি ভাজাইয়া লইল ও তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলিল। মাঝে মাঝে সমুদ্রের উপর অনেক জলজন্তু ভাসিয়া উঠিত। এমনি ত সে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাবাকে বিব্রত করে; সমুদ্রের মাঝে যে সে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। ভোর হইতে না হইতেই সে ছইয়ের উপর গিয়া মাঝির কাছে বসে, আর মাঝিকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে; দুই এক দিনেই সে বুঝিল যে, সমুদ্রের কথা তাহার বাবার চেয়ে মাঝিই ভাল জানে।

৪

এক দিন ভাত খাইবার সময় সে বাবাকে বলিল, "বাবা,—বাবা, আজ ভোরবেলায় মাঝির কাছে মাচার উপর বসিয়াছিলাম; দেখি কি, সূর্য্য জলের ভিতর থেকে উঠ্‌ছে! সূর্য্য উঠবার আগে আলো-গুলা. বাহির হইতে লাগিল—ঠিক যেন দড়ী। দেশে যে দেখি, সূর্য্যের হলুদ রঙ, দেখিতেও খুব ছোট; কিন্তু এখানে দেখি, যেন একটা প্রকাণ্ড রাঙা জালা। দড়ী দিয়ে কে যেন জালাটাকে উপরে টেনে তুল্‌ছে। সূর্য্য জল থেকে যখন বাহির হইল, তখন ক্রমে ক্রমে রাঙা রঙ ঘুচিয়া যাইতে লাগিল, আর আমাদেরই দেশের মত চক্‌চকে হলুদ রঙ হয়ে দাঁড়াল। আমার চোখও ঝল্‌সে যেতে লাগিল। আমি আর তাকাতে পারিলাম না।"

আবার এক দিন মেয়েটি বলিল, "হাঁ বাবা, মাস্তুল ধ'রে যখন ছইএর উপর দাঁড়াইয়াছিলাম, দেখি কি না, জলটা যেন গোল হয়ে গিয়াছে, আর তাহার ওদিকের জল যেন নামিয়া গিয়াছে, ঠিক যেন একটা খুরা-দেওয়া বাটি উবুড় করিয়া রাখিয়াছে।"

আবার এক দিন বলিল, "আজ সূর্য্যকে ডুবিতে দেখিয়াছি। রাঙা জালাটির মত আস্তে, আস্তে, আস্তে জলের ভিতরে পড়িয়া গেল।"

দুই চারি দিন ত বেশ আমোদে কাটিয়া গেল। ক্রমে যত টাট্‌কা তরিতরকারী ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, শুধু নারিকেল-ভাজা, ডাল আর ডালের বড়া সম্বল হইল, জলখাবারের মধ্যে কেবল হইল শুক্‌না চিঁড়া, শুক্‌না গুড়; তখন ডাঙ্গা দেখিবার জন্য প্রাণ বড় আকুল হইয়া উঠিল। মাঝিকে তখন মেয়েটি কেবল জিজ্ঞাসা করে—"ডাঙ্গা কত দূর?"—আর চারিদিকে চাহিয়া দেখে, গাছপালা দেখা যায় কি না।

পাঁচ সাত দিনের পর এক দিন দূরে দেখা গেল, একটা কাল দাগ যেন জলের ভিতর থেকে উঠ্‌ছে। মেয়ে অমনি জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি?" মাঝি বলিল, "ওটা রাক্ষসের দ্বীপ। ওখানে যারা থাকে, তারা কাঁচা মানুষ খায়।" মেয়ে অমনি পাইয়া বসিল, "তাদের তুমি কেমন করিয়া দেখিলে? দেখিলে যদি, তোমায় তাহারা খাইল না কেন? তাহারা মানুষ রাঁধিয়া খায়, না কাঁচাই খায় ইত্যাদি ইত্যাদি।" মাঝি যাহা যাহা জানিত, সব বলিল। বলিল, "ওদেশে তাহারা প্রায়ই যায় না। ও জায়গাটা তাহারা বাঁয়ে ফেলিয়া সরাসর দক্ষিণদিকে চলিয়া যায়। একবার গিয়াছিল; ঝড়ে নৌকা বাঁধিবার জন্য গিয়াছিল। অনেক রাক্ষস আসিল। তাহারা একেবারে নেংটা থাকে, কেউ কেউ একটা পাতার কাপড় পরে। যেমন সালপাতায় কাঁটা দিয়া খাবার পাত্র হয়, সেই রকম পাতায় কাঁটা দিয়া কাপড় করে, তাই পরে। তাও সকলে নয়। তারা মাছ ধরিয়া খায়, শীকার করিয়া মাংস খায়,

আর একলা-দোক্‌লা মানুষ পাইলেও খাইয়া ফেলে। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল, সেই ভয়ে আমাদের উপর অত্যাচার করে নাই। কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনিয়া লইয়া চলিয়া যায়।" মাঝি সে দিকে নৌকা চালাইল না। মেয়েরও রাক্ষসের দেশ দেখার বড় ইচ্ছা ছিল না। সেও নামিয়া আসিয়া বাবাকে রাক্ষসের দেশের গল্প শুনাইতে লাগিল।

৫

ক্রমে ডিঙ্গাগুলি গিয়া বালীদ্বীপে পঁহুছিল। সেই জায়গাটাকে বড় আড্ডা করিয়া বিহারী সমস্ত দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও সব জায়গাই এক একবার ঘুরিলেন। কর্ম্মচারীদের কাজকর্ম্ম তদারক করিলেন। হিসাব দেখিলেন। বাহাল-বরখাস্ত করিলেন। দেশের লোকের সঙ্গে ব্যবসায়ের পথ ফালাও করিলেন। এইরূপে চারি পাঁচ মাস থাকিয়া ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবার ব্যবসায়ে অনেক লাভ হইল; কারণ, যে সব জিনিস সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সবই বিকাইয়া গিয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছেন, তত ভাল জিনিস, আর তত বেশী জিনিস আর কখনও পান নাই; সুতরাং তিনি খুব খুসী, তাঁহার সংস্কার, মেয়ের পয়েই তাঁহার লাভ বেশী হইয়াছে; সুতরাং মেয়ের উপর তাঁহার ভালবাসা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েও খুব খুসী; বিহারীর সঙ্গে যাহারই কারবার ছিল, সকলেই মেয়েকে খুব আদর করিয়াছে, নানা জিনিস দিয়াছে। রাজারা মেয়েকে কোলে করিয়া তাহাকে খাবার দিয়াছেন, গহনা দিয়াছেন। সে যাহা দেখিতে চাহিয়াছে, সব দেখাইয়াছেন। সব মন্দিরে সে গিয়াছে। সব জায়গায় পূজা দিয়াছে, সময়টা তার খুব সুখেই কাটিয়াছে। তথাপি দেশে ফিরিবার নামে তাহার বড়ই আনন্দ। দেশের এমনি টান, আবার সাতগাঁ যাইবে, আবার পুরান খেলুড়ীদের সঙ্গে খেলা করিবে, গঙ্গায় স্নান করিবে, ঠাকুরদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিবে, তাহার ভারি আহ্লাদ।

ক্রমে ক্রমে উনপঞ্চাশখানা ডিঙ্গা আসিয়া বালীদ্বীপে জুটিল। যার যা মেরামতের ছিল, মেরামত করা হইল। সব ডিঙ্গা আবার বাঙ্গালার দিকে চলিল। অনেক বাঙ্গালী বহু দিন ধরিয়া বিদেশে বিহারীর কাজ করিতেছিল, তাহারা অনেকে ছুটী লইয়া, অনেকে ইস্তফা দিয়া, অনেকে বৃত্তি বার্ষিক লইয়া, অনেকে আবার বরখাস্ত হইয়া দেশে ফিরিল। সবাই বিহারীর অতিথি, বিহারী অতিথিদের সৎকারে মুক্তহস্ত। বিহারীর স্ত্রী এই সব অতিথিদের সেবায় খুব মন দিয়াছেন। তাহাদের কাহারও কোন জিনিসের দরকার হইলে তৎক্ষণাৎ যোগাইতেছেন। আর বিহারীর মেয়ে সবারই সব, সর্ব্বদাই সবার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাহাকেও দাদা মহাশয়, কাহাকেও কাকা, কাহাকেও মামা, কাহাকেও ভাই বলিয়া সকলেরই কাছে যাইতেছে, সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর সকলেরই কোলে উঠিতেছে, সকলেরই আদর পাইতেছে। সেই বুড়া মাঝি কিন্তু তাহার প্রধান সঙ্গী, সে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই কাছে যাইতেছে। এক মেয়েতে ডিঙ্গাগুলিকে মাৎ করিয়া রাখিয়াছে।

সব ডিঙ্গা ভাসিল, কেহ বলিল জয় কালী, কেহ বলিল জয় সাতগাঁয়ের কালী। কেহ বলিল জয় গঙ্গামার জয়, কেহ বলিল জয় বরুণদেবের জয়, কেহ বলিল জয় সমুদ্রের জয়। বেশ আমোদে দিন কাটিতে লাগিল। যাবার সময় স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া পাল তুলিয়া আসিয়াছে। আসার সময়ও ঠিক সেই ভাব। বিহারীর আনন্দ ধরে না! সে এক একবার ছইএর উপর উঠিয়া ডিঙ্গা গণে দেখে, সব ডিঙ্গাই চোখের সামনে আছে। মনে মনে লাভালাভ কষে, আর দেখে যে, এত লাভ তাহার অদৃষ্টে আর কখনই হয় নাই।

৬

কিন্তু সব দিন সমান যায় না। এক দিন সকালে উঠিয়া দেখিল, দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কাল মিসমিসে একখানা মেঘ উঠিয়াছে। মাঝি বলিল, "দত্ত মহাশয়, আজ বড় সুবিধা নয়, ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন, ওখানা ভাল নয়। একটু বাদেই ঝড় উঠিবে। আপনারা আপন আপন কামরায় যান, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবেন। বেশী নড়াচড়া করিলে প্রমাদ ঘটিবে জানিবেন।" বলিতে বলিতে ঝড় উঠিল, প্রথম বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, তাহার পর ঝাপ্‌টা, এক এক ঝাপ্‌টায় নৌকাগুলা যেন উল্টাইয়া পড়ে, কিন্তু বাঙ্গালার পাটনী মাঝি বড় শক্ত মাঝি। হাল চাপিয়া ধরে আর নৌকা ঠিক থাকে। ঝাপ্‌টা আসার পূর্ব্বে মাঝির হুকুমে সব পালগুলি গুটান ও নামান হইয়াছিল; সুতরাং পালশুদ্ধ নৌকা গুঁজড়াইয়া অতল জলে ডুবিবে, সে ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে। ঝড়-ঝাপটা,

ঝড়ের ধাক্কা, গোঁগোয়ানি, এ সকলের চেয়ে আর এক ঘোর বিপদ্ আসিয়া পৌঁছিল, সে হইল সমুদ্রের ঢেউ। জোর বাতাসে ঢেউগুলি জোরে জোরে উঠিতে লাগিল। সিকি মাইল, আধ মাইল, এমন কি, এক মাইল লম্বা এক একটি ঢেউ আসিয়া নৌকায় লাগিতে লাগিল। নৌকা যেন চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল। ছইএর উপর দিয়া ঢেউ গিয়া নৌকার ওপারে পড়িতে লাগিল। ঢেউএর মাঝখানে নৌকা পড়িলে, চড়ন্দারেরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। সকলে ইষ্ট-দেবতার নাম করে; ভাবে, আর রক্ষা নাই। এক মুহূর্ত্ত পরে আবার ঢেউ সরিয়া গেলে, আবার তাহাদের মনটা একটু সুস্থ হয়। কিন্তু সে সুস্থভাব কতক্ষণ? আবার ঢেউ,—আবার ঢেউ। যেন রাশি রাশি, বস্তা বস্তা তুলা—পিঁজা তুলা সমুদ্রের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাতাসে জল প্রথম ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে; দশ হাত, কুড়ি হাত, ত্রিশ হাত পর্য্যন্ত জল ফুলিয়া উঠে; সেই ফুলা জলের মাথায় নৌকাগুলি মোচার খোলার মত উঠিয়া পড়ে; তাহার পর সেই ফোলা জলের মাথাটা ফাটিয়া ফেনা বাহির হয়। ফেনা গড়াইতে থাকে, গড়াইতে গড়াইতে দু-ক্রোশ, পাঁচ-ক্রোশ, দশ-ক্রোশ যাইয়া আবার জলে মিশিয়া যায়। থাকে কেবল দুধের মত দাদাটুকু। কবির বড় আমোদ, তিনি খুব বর্ণনায় সুবিধা পান; কিন্তু যাহারা সেই ফেনার মধ্যে পড়ে, তাহাদের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে। চড়ন্দারেরা মাঝিদের সঙ্গে ঝগড়া করে—"তোরা আপনার দোষে আমাদের ডুবাইলি দেখিতেছি।" তাহারা মাঝিদের গালি পাড়ে। মাঝিমাল্লারা প্রাণপণে নৌকা-রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। সেই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও তাহাদের গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। গালি দিলে তাহারা সহ্য করিবে কেন? তাহারাও গালি পাড়ে; আর বলে—"আমরা কি করিব? তোমাদের বলিতেছি, চুপ করিয়া বসিয়া থাক, নড়িলে চড়িলে নৌকা রাখা ভার হইবে।" তাহারা বলে—"হাঁ রে বেটারা, আমরা কি গুড়ের নাগরী যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? আমাদের কি প্রাণের ভয় নাই? তোদের কি? তোরা পরের প্রাণ লইয়া খেলা করিতেছিস্।" তাহারা বলে—"আমাদের বুঝি প্রাণ নয়? তোমাদেরও যেমন প্রাণ, আমাদেরও তেমনি। আমাদের প্রাণ থাকিলে ত তোমাদেরও প্রাণ থাকিবে।" এক জন বলিল—"বেটারা জানিস্, এই সাঙ্গায় বিহারী দত্ত আছে। সে যদি ডুবে, বাঙ্গালা দেশটা অন্ধকার হইয়া যাইবে।" তাহারা বলিল—"হাঁ হাঁ, জানি; কিন্তু আমাদের নিজের প্রাণটা আমাদের কাছে শত শত বিহারী দত্তের চেয়েও বেশী দরকারী। বিহারী মরিলে তাহার ধন আছে, দৌলত আছে, তাহার পরিবারদের দেখিবার অনেক লোক হইবে। আমাদের স্ত্রীপুত্রকে দেখিবার কে আছে, বল দেখি?" আবার ঢেউ আসিল। সব ঝগড়া-বিবাদ, সব চেঁচামেচি বন্ধ হইয়া গেল। আবার ত্রাহি ত্রাহি ডাক পড়িয়া গেল।

৭

এ দিকে বিহারীর নৌকায় ঢেউ দেখিয়া মেয়েটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দাঁতকপাটি লাগিয়াছে। বিহারীরা স্ত্রী-পুরুষে জলের ঝাপ্টা দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সে কিছুতেই সমুদ্রের গোঁগোঁয়ানী সহিতে পারিতেছে না, আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। এমন সময় বিহারীর স্ত্রীর গা বমি-বমি করিয়া উঠিল, মাঝিরা একখানা কাঠের সেউতি আগাইয়া দিল। বেণেবৌ তাহাতে বমি করিতে লাগিলেন, বমি থামে না। একটু সুস্থ হন, আবার বমি, নৌকা যত দোলে, বমি ততই বেশী হয়। বোধ হয় যেন, পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সে কাতরভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়, আর বমি করে। কথা কহার সামর্থ্য নাই, শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। বেণেবৌ অসাড় হইয়া পড়িল। মেয়ের ও স্ত্রীর এই অবস্থা দেখিয়া বিহারী স্থির থাকিতে পারিল না। বার বার বড় মাঝিকে ডাকিতে লাগিল। মাঝি আসে না। সে বলে, "এখন আমি হাল ছাড়িলে রক্ষা থাকিবে না।" তখন বিহারী পাগলের মত হইয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত। বলিল, "আমার স্ত্রীর এই অবস্থা, আমার মেয়ের এই অবস্থা, আমায় রক্ষা কর।" সে বলিল, "রক্ষাকর্ত্তা আমি নহি, সে ভগবান্! ভগবানের শরণ লও।" বিহারী বলিল, "আমি যে ভগবান্‌কে ডাকিব, সে শক্তি নাই। সম্মুখে আমার সর্ব্বস্ব স্ত্রী ও কন্যা মারা যায়, আমার মনে সে জোর কোথায় যে, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি? তুমি রক্ষা কর।" মাঝি বলিল, "তোমার স্ত্রীর যে ব্যারাম হইয়াছে, জলের ক্ষোভ হইলে অনেকেরই ওরূপ হয়। জল স্থির হইলে উহা আর থাকিবে না। তুমি একটু শান্ত হও। এতবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছ, তুমি উতলা

হও কেন? তোমার মেয়ের প্রাণের কোন ভয় নাই। সে ঢেউ দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, ঢেউ থামিলেই সুস্থ হইবে।" বিহারী বলিল, "আমার আর সয় না, তুমি ইহার একটা বিহিত কর, নহিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব; ঐ শুন, আবার বাতাস গোঁ গোঁ করিতেছে, আবার ঝাপ্টা আসিবে। আবার পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ আসিয়া নৌকাখানাকে উণ্টাইয়া পাণ্টাইয়া ফেলিবে।" মাঝি বলিল, "মশাই, আমি এই ঢেউ থামাইয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আপনার ৭৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে, সহিতে পারিবেন ত বলুন।" বিহারী বলিল, "আমার যথাসর্ব্বস্ব যায়, সেও আচ্ছা, আমার স্ত্রী ও কন্যা যেন প্রাণ পায় ও সুস্থ হয়।" "আচ্ছা, তবে আপনি ঘরে যান, আমি যাহা জানি, করিয়া ফেলি।" বলিয়া মাঝি আর এক জন মাঝিকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিল। সে নৌকার খোলের ভিতর গেল আর সমস্ত মাঝি-মাল্লা ডাকিয়া ৫০টা গর্জ্জন-তেলের পীপা বাহির করিয়া পাটাতনের উপর রাখিল। ঝড় যখন খুব জোরে আসিতেছে, তখন সেই পীপার সমস্ত তেল সমুদ্রের মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। অনেক কষ্টের সংগ্রহ করা তেলের পীপাগুলি এইরূপে নষ্ট করায় বিহারীর মনে একটু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

তেল যত দূর যাইতে লাগিল, সমুদ্র স্থির হইতে লাগিল; বাতাসের যে জোর, সেই জোরই রহিল, কিন্তু সমুদ্রে আর ঢেউ উঠে না। সমুদ্র দর্পণের মত স্থির হইল; নৌকা জোরে চলিতে লাগিল, কিন্তু টলে না। বেণেবৌ একটু সুস্থ হইল, তাহার বমি থামিয়া গেল। মেয়েও সুস্থ হইল; বেণেরও মনটা ঠাণ্ডা হইল, সে মাঝিকে অনেক টাকা পুরস্কার দিবে স্বীকার করিল। মাঝির উপর তাহার বিশ্বাস খুব বাড়িয়া গেল। ঝড় তখনও সমানে বহিতেছে। মাঝি দত্ত মহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া পাঠাইল। বেলা তখন দুপর। বিহারী মাঝির ঘরে বসিয়া দেখিল, তাহার নৌকা স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া বেগে উত্তর-পশ্চিমমুখে যাইতেছে। তাহার সব ডিঙ্গাগুলি দূরে দূরে দেখা যাইতেছে। মাঝি বলিল—"ঝড়ে আমাদের বড়ই উপকার করিয়াছে, আমরা এক বেলায় ৭।৮ দিনের পথ আসিয়া পড়িয়াছি। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হউক বা একটু পরেই হউক, গঙ্গার মোহানায় গিয়ে পৌঁছিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

মাঝি যাহাই বলিল, তাহাই হইল। সন্ধ্যার একটু আগে, চাকি ডুবডুব সময়ে বিহারীর সাঙ্গার ৭ ডিঙ্গা গঙ্গার মোহানায় আসিয়া পৌঁছিল ও একটা প্রকাণ্ড বালির চড়ায় নোঙ্গর করিল। চড়াটা অনেক উঁচা হইতে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া জলের ভিতর চলিয়া গিয়াছে; যেখানটা খুব উঁচা, সেইখান হইতে ওদিকে নিবিড় বন। সুন্দরী-গাছই বেশী। সোঁদাল, পাঁও প্রভৃতি গাছও আছে, দুই চারিটা বড় গাছও আছে। আর তলায় বেত-বন, গোলপাতার গাছ, আর নানা রকম লতাগুল্ম। নোঙ্গর করা হইলে অনেক মাঝি ও অনেক চড়ন্দার মহা আনন্দে নামিয়া অনেক দিনের পর বাঙ্গালার মাটী ছুঁইয়া গেল।

বিহারীর স্ত্রী ঝড় থামিলেই ঘুমিয়া পড়িল। সে বড়ই কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটা কিন্তু ঝড় থামিলেই আবার যে সেই হইয়া দাঁড়াইল, তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। সে আবার মাঝির হাল-ঘরে গিয়া বসিল। "বাঙ্গালার মাটী" ছুঁইবার ইচ্ছা তাহারও হইয়াছিল, কিন্তু মাঝি তাহাকে যাইতে দিল না। কিন্তু সে কেবল দেখিতে লাগিল যে, বালির উপর কত রকমের ঝিনুক ও কড়ি পড়িয়া রহিয়াছে,—ছোট, বড়, লাল, সাদা, ডোরা দেওয়া, দাগ দেওয়া। সে যে কত, তাহার ঠিকানা নাই। ঝিনুক কুড়াইবার সাধ তাহার বড়ই হইয়াছিল; কিন্তু মাঝি বলিল, "সন্ধ্যার সময় এখানে ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীর থাকে। তোমার যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না।" বলিতে বলিতেই কতকগুলি লোক "শিয়াল শিয়াল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আর দেখা গেল, একটা বাঘ ছুটিয়া পলাইতেছে। সুতরাং মেয়ের আর যাওয়া হইল না। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, সে আপনার ঘরে গেল ও ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও সে ঝিনুক স্বপ্নে দেখিয়াছিল। ঝিনুকের উপর তাহার ভারি টান হইয়াছিল।

ভোর হইল। দু এক জন মাঝি উঠিল, উঠিয়া নৌকার সিঁড়ি মাটীতে দিল, নৌকা হইতে নামিল। ডাঙ্গায় উঠিয়া তাহারা নিজের কাজে গেল। বিহারী তখনও ঘুমাইতেছিল। তাহার স্ত্রীও আগের দিনের কষ্টে একান্ত কাতর হইয়া ঘুমাইতেছিল। মেয়ে

কিন্তু সিঁড়ি পড়ার শব্দ পাইয়া আস্তে আস্তে উঠিল, আস্তে আস্তে ঝাঁপ খুলিল, আস্তে আস্তে অন্য কামরা পার হইয়া সিঁড়ির কাছে গেল, সিঁড়ি বাহিয়া মাটীতে নামিল, নামিয়া ঝিনুক খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে নৌকা হইতে কিছু দূরে সমুদ্রের একেবারে কিনারায় সে অনেক ঝিনুক দেখিতে পাইল। সাদা সাদা, ছোট ছোট ঝিনুক কুড়াইবার জন্য সে একটি ঝাঁপী আনিয়াছিল। সেগুলি ঝাঁপীর মধ্যে রাখিল। তাহার পর রঙিন ঝিনুক কুড়াইতে আরম্ভ করিল। খুঁটিয়া খুঁটিয়া কোনটি ডোরা, কোনটি দাগওয়ালা, কোনটি দু-রঙ্গা, কোনটি তিন-রঙ্গা, কোনটি পাঁচ-রঙ্গা ঝিনুক কুড়াইয়া ঝাঁপী প্রায় আধ-পুরস্ত করিয়া ফেলিল। বুড়া লোকও সমুদ্রের ধারে বালির চড়ায় ঝিনুক কুড়াইবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না; বেণের মেয়ের ত ৯।১০ বছর বয়স, সে যে সে লোভ সামলাইতে পারিবে, এরূপ মনে করাও অন্যায়। যাহা হউক, সে একেবারে তন্ময় হইয়া ঝিনুক কুড়াইতে লাগিল। এই ঝিনুক দিয়া সে বাবার গায়ের ঘামাছি মারিয়া দিবে, এই ঝিনুক সে তাহার ব্রাহ্মণ-সখীকে দিবে; এই সব ঝিনুক লাগাইয়া সে ঠাকুরের পীঁড় করিয়া দিবে, এইরূপ ভাবিতেছে, আর কুড়াইতেছে।

২

বিধাতা যে এই সময়ে তাহার ঘোর বিপদ্ আনিয়া দিবেন, সে তাহা মনেও করিতে পারে নাই। সে ঝিনুকই কুড়াইতেছে। এমন সময় দূর থেকে একটা কি গোলমাল শুনা গেল। সে তাহা গ্রাহ্যও করিল না। তাহার পরই "শিয়াল শিয়াল" শব্দ শুনা গেল, তখন তাহার আগের দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল, তবে ত বাঘ এসেছে! সে একবার চারিদিক্ চাহিল, যেমন পিছন ফিরিবে, অমনি দেখিল, প্রকাণ্ড বাঘ! দেখিয়াই ত সে আড়ষ্ট; পরক্ষণেই মূর্চ্ছা। দূরে অনেক লোক ছুটিয়া আসিতেছে; কিন্তু বালির উপর দিয়া ছোটা আর স্বপ্নে ছোটা একই রকম। যতই ছোট, আগাইয়া যাওয়া যায় না। যাহারা ডাঙ্গায় নামিয়াছিল, সকলেই মেয়েকে রক্ষা করার জন্য ছুটিতেছে—উত্তর, পশ্চিম, পুব হইতে ছুটিতেছে; কিন্তু কেহই নিকটে আসিয়া পৌঁছাইতে পারিতেছে না। "গেল গেল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। "বিহারী দত্তের মেয়েকে বুঝি বাঘে নিলে! আমাদের মায়াকে বুঝি বাঘে নিলে!" শব্দটা বেহারীর কানে গেল। সে উঠিয়া দেখিল, মায়া বিছানায় নাই। চীৎকার করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল, এই পড়ে ত এই পড়ে করিয়া নৌকা হইতে লাফাইয়া ডাঙ্গায় পড়িল, সিঁড়ি কোথায়, তাহার খোঁজও লইল না। বিহারীর বৌ লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া স্বামীর পিছনে পিছনে ছুটিল। ছুটিয়া কি করিবে? বালিতে কি পা উঠান যায়? প্রাণপণে ছুটিতেছে অথচ যেখানকার, প্রায় সেইখানেই আছে। বাঘ ধীরে ধীরে মেয়ের কাছে গিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাবা গাড়িয়া বসিয়া রহিল। আর রক্ষা নাই। লোকে কতই চেঁচামেচি করিতে লাগিল, বাঘের তাহাতে লক্ষ্যই নাই; সে একদৃষ্টে মেয়ের দিকে চাহিয়া আছে।

৩

চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, এমন সময়ে দূরে একখানি পান্সী দেখা গেল, পান্সী তীরবেগে যেখানে বাঘ, সেই দিকে আসিতেছে। ডাঙ্গা হইতে দশ বারো হাত তফাতে হঠাৎ থামিয়া গেল। আর এই পান্সী হইতে একটা প্রকাণ্ড তীর আসিয়া বাঘের সামনের দিকে এমন জোরে বিঁধিল যে, বাঘের বুকে বিঁধিয়া পীঠের দিকে তাহার ফলা বাহির হইয়া পড়িল। বাঘ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ফিরিল। দাঁড়াইবামাত্র যে দিকে তীরের পাখা, সেই দিক্‌টা মাটীতে লাগিয়া যাওয়ায় বাঘ প্রথম পলাইতে পারিল না। পরে এমন জোরে লাফ দিল যে, শরের তীর বই ত নয়, তীরটা ভাঙ্গিয়া গেল, বাঘ হালুম হালুম করিয়া ছুটিল। বালি অতিক্রম করিতে তাহারও খুব কষ্ট হইয়াছিল এবং দেরীও হইয়াছিল। তথাপি লোকে তাহার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে বনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে তাহার আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। কতকগুলা বানর একটা গাছে ঝুলিতেছিল, বাঘ ঐ অবস্থায় গাছের তলায় আসিলে তাহারা গাছ হইতে লাফ দিয়া তাহার পীঠে পড়িল, আর কেহ বা তাহার লোম ছিঁড়িতে লাগিল, কেহ বা ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিতে লাগিল, কেহ বা সেই তীরের ফলাটা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। বাঘ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িয়া গেল, অমনি সে মরিয়া গেল। তীরের আঘাতে একটা বানরও জখম হইল। ... এক

বিষম রোগ আছে। সে নিজের রক্ত দেখিতে পারে না। সে দেখিল, তাহার গা দিয়া রক্ত পড়িতেছে; অমনি এক হাত দিয়া রক্ত মুছে, হাতটা দেখে আর ছুটে—এইরূপে বনের ভিতর একটা মহা কাণ্ড হইয়া গেল।

বাঘ ও বানরের খেলা কিছু এ গল্পের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং মায়া ব'লে বিহারী দত্তের যে মেয়ে ছিল, আমরা চলুন, তাহারই কাছে যাই। সে ত এখনও নিঃসাড় নিস্পন্দ। পান্‌সীখানা তীরে লাগিয়াছে, আর তাহার উপর থেকে একটি ১৮।১৯ বছরের ছোকরা লাফাইয়া তীরে পড়িয়াছে; তীর ধনুক ফেলিয়া দিয়াছে এবং দৌড়িয়া আসিয়া মেয়েটিকে কোলে করিয়া, তাহার যাহাতে জ্ঞান হয়, তাহাই করিতেছে; নাকের গোড়ায় হাত দিয়া দেখিতেছে—নিশ্বাস পড়িতেছে কি না; লোণাজল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইতেছে, তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। ক্রমে বিহারীর দল আসিয়া পৌছিল, কবিরাজ মহাশয় আসিয়া পৌছিলেন। বিহারীর স্ত্রী ছেলেটির কোল থেকে মেয়েটিকে নিজের কোলে লইয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। জাঁতী আনিয়া দাঁতকপাটী খোলা হইল। ঠাণ্ডাজলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে মেয়ের চক্ষু খুলিল। চক্ষু খুলিয়া সে মাকে দেখিল না, দেখিল সেই ছেলেটিকে, তাহার দিকে চাহিয়া সেও বলিল, "কেমন, আমায় চিনিতে পার, মায়া?" সকলেই এতক্ষণ মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সে ছেলের দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। ছেলেটি কথা কহিল। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সে ছেলেটি সাতগাঁয়ের প্রসিদ্ধ বেণে সাধু ধনীর একমাত্র পুত্র জীবন ধনী।

৪

সাতগাঁয়ের বেণেদের ভিতর ধনি বংশ অতি-প্রাচীন, তাহারা সপ্তগ্রামের বণিক্। এই বেণেরা সপ্তের নিকট গন্ধদ্রব্য ও পূজার উপকরণ বেচিয়া জীবন নির্ব্বাহ করে। মধু তাহারাই বেচিত, মধুর বিস্তর কাজ ছিল। সপ্তের লোকে প্রায়ই কবিরাজী করিত। ঔষধপত্রে ত মধুর বড় দরকার। আরও অনেক কাজে মধু লাগিত। মোমবাতীও সপ্তে লাগিত, মন্দিরে বাতী দেওয়া তখন একটা ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে ছিল। ধুনা, গুগ্‌গুল, ধূপের কাঠ, নানা রকম তৈয়ারী ধূপ, চন্দনকাঠ, সাদাচন্দন, রক্তচন্দন, হরিচন্দন, কর্পূর, গন্ধতৈল, অনেক রকম পাণের ও রান্নার মসলা সপ্ত-আশ্রমের বেণেরা বেচিত। এই আশ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ধনিবংশ। সাধু ধনী, তাহার উপর, সুন্দর-বনে বছর বছর মহাল করিতে যাইতেন। কালুরায় ও দক্ষিণরায় তাঁহার পূজায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন যে, বাঘে ও কুমীরে তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। সুতরাং সুন্দরবনের সর্ব্বত্রই সাধু ধনীর গতিবিধি ছিল। তিনি সুন্দরবন তন্ন তন্ন করিয়া ঘুঁটিয়া বাঘের ছাল, বাঘের নখ, কুমীরের হাড়, চামড়া, সুন্দরী-কাঠ, গরাণ-কাঠ, গোলপাতা, মেলান্দার মাদুর একচাটিয়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার মত তীরন্দাজ তখন আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার টিক অদ্ভুত ছিল, এক রকম অব্যর্থ। ছেলে অল্পবয়স হইলেও প্রায় বাপের মতই তীরন্দাজ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার তীরে কেমন করিয়া বিহারী দত্তের মেয়ে মায়ার জীবনরক্ষা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। সাধু ধনী ও তাহার ছেলে সুন্দরবনে মহাল করিতে গিয়াছিল। ঝড়ের সময় তাহারা এক নিরাপদ্ স্থানে ছিল। সন্ধ্যার সময় তাহারা ঐ বালির চড়ার আর এক পার্শ্বে নঙ্গর করিয়াছিল। নিকটে আর কয়েকটি সাজ্বার ডিঙ্গা রহিয়াছে দেখিয়া সাধু ছেলেকে খবর লইবার জন্য পাঠাইয়াছিল। ছেলেও বালির উপর দিয়া শীঘ্র যাইতে পারিবে না বলিয়া পান্‌সী করিয়া আসিতেছিল। দূর হইতে বাঘে একটা মেয়েকে আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া, সেই দিকে পান্‌সী চালায় ও বাঘকে একটা তীর মারে।

মেয়ে একটু সুস্থ হইলে বিহারী জীবনের কাছে আসিয়া তাহার সঙ্গে নানা কথা কয় এবং জানিতে পারে যে, সাধু ধনী নিকটেই আছে। সে মেয়েকে নৌকায় লইয়া যায় এবং তাহার সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। জীবনকেও আপনার নৌকায় বসাইয়া তাহাকে যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা করে। "তোমার বাবা যে তোমার জীবন নাম রাখিয়াছিল, আজি তাহা সফল হইল। তুমিই আজ আমার মায়ার জীবন দিয়াছ। তোমার ঋণ আমি কখনও শোধ করিতে পারিব না।" বেণে-বৌও জীবনকে খুব করিয়া খাওয়াইলেন এবং অনেক করিয়া আদর করিলেন। মেয়েটাও জীবনকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইল। সে আর জীবনকে কি বলিবে, কেবল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, আর চোখের চাহনিতে আপনার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল। জীবনের

জন্য তাহার প্রাণে যে একটা বিষম টান হইয়াছে, সে তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

৫

বিহারী নিকটে আছেন, লোকমুখে খবর পাইয়া সাধু ধনী তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সব সংবাদ শুনিয়া সেও আহ্লাদে আটখানা হইল। "আমার ছেলে বিহারীর মেয়ের জীবনরক্ষা করিয়াছে।" বিহারীর সঙ্গে তাহাদের ত খুব আত্মীয়তা ছিলই, তাহার উপর এই ঘটনায় সেই আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় আসিয়া দাঁড়াইল। দুই তিন দিন ধরিয়া চড়ায়ই খুব ধুমধামে খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদ হইল, তাহার পর দুই বণিকের সব সাজ্যা একত্র হইয়া সাতগাঁয়ের দিকে চলিল। দু'তিনখানা ছিপ আগেই গিয়া সাতগাঁয়ে সব ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল। মহা ধুমধামে আমোদ-প্রমোদে বণিকেরা আসিয়া গোলার ঘাটে সাজ্যা বাঁধিল। এইবার যে যাহার গোলায় যাইবে। সকলেই বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত। বিহারীর লোকজন, যাহারা বহু-কাল বিদেশে ছিল, তাহারা আগেই নামিয়া আপন আপন বাড়ী চলিয়া গেল। বিহারীও মালপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। মায়ার কিন্তু মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, জীবন সঙ্গে গেলে ভাল হইত! মাও মেয়ের মন বুঝিলেন; জীবনকে বলিয়া দিলেন, "তোমার মা'র সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আমার ওখানে আসিও! তোমার, তোমার বাবার ও তোমার মা'র নিমন্ত্রণ রহিল।" তখন মেয়ে একটু সুস্থ হইল এবং হৃষ্ট-চিত্তে মা ও বাপের সঙ্গে সাতগাঁর বড় রাস্তার উপর তাহাদের যে বড় বাড়ী ছিল, সেইখানে চলিয়া গেল।

আর অধিক বলিতে হইবে না। ক্রমে যাওয়া-আসায় দুই পরিবারে বেশ সৌহার্দ জমিয়া গেল এবং ছেলে ও মেয়ের বেশ প্রণয়-সঞ্চার হইল। অল্পদিনের মধ্যেই সাধু ও বিহারী বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাইলেন এবং মায়ার সহিত জীবনের বিবাহ হইয়া গেল। সাতগাঁ সহর শুদ্ধ লোক খুশী। দুইটা বড় বড় ঘর এক হইয়া গেল। দিনকতক কেবল 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

ঐ ঘটনার ৪ বৎসর পরে যে দিন রূপা রাজার পাজন বাহির হয়, সেই দিন মায়া আসিয়া রাজার গুরু ও গুরুপুত্রের গলায় মালা দিয়া গেল, তখন তাহার মুখে বড়ই বিষাদের ছায়া। কারণ, সে সময় তাহার স্বামী জীবন ধনী অত্যন্ত পীড়িত। শ্বশুর পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ধনিবংশের বড় ঘরে একটি জীবনমাত্র ভরসা; সেও অত্যন্ত পীড়িত। তাহারই জীবনের উপর আবার দত্ত-বংশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। তাই তাহার মুখ ম্লান। সে মালা দিবার সময়ে মনে মনে প্রার্থনা করিল—"হে গুরুদেব, আপনি ত অন্তর্য্যামী, আমার মনের কথা বুঝিয়া, আমার স্বামী যাহাতে জীবন পান, আশীর্ব্বাদ করুন।" গুরুপুত্রের গলায় মালা দিবার সময় তাঁহারও কাছে সেই প্রার্থনা করিল। দুজনেই আশীর্ব্বাদ করিলেন, সে যেন হাতে হাতে ফল পাই-লাম মনে করিয়া হাতী হইতে নামিল। তাহার পর সে সকল দেবতার কাছেই মানত করিত, "ঠাকুর, আমায় বিধবা করিও না, আমার স্বামীর জীবন দাও।" পূর্ণিমা অমাবস্যায় ব্রাহ্মণবাড়ী সিধাভোজ্য পাঠাইয়া এই কামনাই করিত। বুদ্ধ-মন্দিরে দীপ দিয়াও এই কামনাই করিত। ভিক্ষুসন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিয়াও এই কামনাই করিত। স্বামীর সেবায় তাহার বিরতি ছিল না। যে চিকিৎসক যাহা বলিয়া দিতেন, সে অকাতরে পরিশ্রম করিয়া তাহাই করিত। যে দৈবজ্ঞ যেরূপ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা দিতেন, সে কোনও বিষয়ের ত্রুটি না করিয়া তাহাই করিত। বিহারীরও যত্নের ত্রুটি ছিল না। দেশদেশান্তরের সন্ত্য হইতে বড় বড় বৈদ্য আনাইতেন; দেশদেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ-ভিষক্ আনাইতেন; নিজে প্রায়ই জামা-তার গঙ্গাতীরস্থ গোলায় যাতায়াত করিতেন; সব কাজ নিজের চোখে তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জীবন ধনী দুই বৎসর-কাল ভুগিয়া ভীষণ যক্ষ্মারোগে দেহত্যাগ করিল। বিহারীও জামাইয়ের শোকে কেমন যেন জড়ভরত হইয়া গেল। যাহার এত উদ্যম এবং অধ্যবসায়, সে যেন কেমন হইয়া গেল। বেণে বৌ ত সেই অবধিই শয্যা নিলেন। মেয়েটা স্বামীর পরলোকের জন্য যাহা করা আবশ্যক, সব করিয়া, স্বামীর জুতা, স্বামীর খড়ম, স্বামীর কাপড়চোপড় একটা সিন্দুকের

মধ্যে রাখিয়া তাহারই পূজা করিত, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিত—"ভগবান্, আমায় শীঘ্র করিয়া স্বামীর কাছে লইয়া যাও। একা সেখানে তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। সেই বাঘ মারার দিন হইতে তিনি ত আমায় ছাড়া থাকেন নাই। এখন তাঁহার বড়ই কষ্ট, আমায় তাঁহার কাছে লইয়া যাও।" সে ঘরের বাহির প্রায়ই হইত না। কেবল ঠাকুর-দেবতার মন্দিরে পূজা দিবার জন্য যাইত। ঠাকুরের কাছে তাহার একমাত্র প্রার্থনা—"আমায় তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দাও।" মহাবিহারেও সে পূজা দিতে গিয়াছে। সেখানেও তাহার সেই প্রার্থনা; হেরুক মূর্ত্তির কাছেও তাহার সেই প্রার্থনা; বুদ্ধমূর্ত্তির কাছেও তাহার সেই প্রার্থনা; বিষ্ণুমূর্ত্তির কাছেও তাহার সেই একই প্রার্থনা; শিবের মন্দিরেও তাহার সেই একই প্রার্থনা। সে আর বাড়ী বড় যাইত না, গোলাতেই থাকিত। গোলা গঙ্গার ধারে। সে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিত আর সেই এক প্রার্থনা করিত। কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত দেখিলেই তাহার সেই প্রার্থনা; ভিক্ষু দেখিলেও তাহার সেই প্রার্থনা; যোগী দেখিলেও তাহার সেই প্রার্থনা; সিদ্ধপুরুষ দেখিলেও তাহার সেই প্রার্থনা; সিদ্ধাচার্য্য দেখিলেও তাহার সেই প্রার্থনা—কেমন করিয়া আবার পরলোকে স্বামীর সহিত গিয়া মিলিব। সে ত এইরূপে কায়মনচিত্তে মৃত স্বামীর সেবায় নিযুক্ত, ওদিকে কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

২

মায়া বিধবা হওয়ার পর হইতেই কয়েক জন ভিক্ষুণী সর্ব্বদাই তাহার বাড়ী আনাগোনা করিত। তাহাদের কেহ বুড়ী, কেহ আধাবয়সী, কেহ কেহ বা যুবতী ছিল। বুড়ী যিনি, তাঁহার গাল তুবড়াইয়া গিয়াছিল, চক্ষু কোটরগত, মাথাটি প্রায়ই নেড়া, যে দু চারগাছা চুল উঠিত, তাহাও শণের নুড়ীর মত কোঁকড়া আর পাকা। হাড়গুলি প্রায় গণা যায়, হাতগুলি নলি-নলি, পা সরু সরু, পেটটি কিন্তু গজেন্দ্রের মত নহে, যেন খোলে পড়িয়া আছে। চামড়া প্রায় কুঁচকাইয়া আসিয়াছে। বুড়ী টুক্নী হাতে করিয়াই আসিত—মুষ্টিভিক্ষা লইবার জন্য। সে কিন্তু যেখানে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানেই যাইত না, একেবারে যেখানে মায়া আপনার মনের দুঃখে একাকী বসিয়া থাকিত, সেইখানে গিয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িত। সে হাড় কখানাতে কিন্তু ধপাস্ শব্দ না হইয়া ঠক্-ঠক্ শব্দই হইত। সে বসিয়াই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িত আর বলিত, "আহা মা, এত কাঁচা বয়সে তোর এ দশা হ'ল, দেখলে পাষাণও গলিয়া যায়। আহা, রক্তমাংসের শরীর ত বটে, কেমন ক'রে সারা জীবনটা এইভাবে হাহুতাশ ক'রে কাট্‌বে? তোর কথা মনে হ'লে, মা, আমি চোখের জল সামলাইতে পারি না।" বলিয়াই বুড়ী আঁচল দিয়া,—আহা, সে কাপড়ের আঁচলই কি আছে ছাই,—আপনার চোখদুটি মুছিয়া ফেলিত; জানাইত, মায়ার দুঃখেই সে কাঁদিতেছে। মায়া কথা কহিত না। তার যে দুঃখ, তা ত আর কথার দুঃখ নয় যে, সে কথা কহিয়া প্রকাশ করিবে। বুড়ী বলিয়া যাইত, "এ অবস্থায় কেবল ধর্ম্মকর্ম্ম। ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিলে অনেকটা ভুলিয়া থাকা যায়, সারবার ত আর নয়, কেবল ভুলে থাকার জন্য। ধর্ম্মকর্ম্ম নানারকম আছে, যেমন—সংসারে থাকিয়াই দানধ্যান কর, পূজা-পার্ব্বণ কর, স্বামীর স্বর্গার্থে শ্রাদ্ধতর্পণ কর, ব্রাহ্মণ খাওয়াও, সম্যক্ সংভোজন দাও, সঙ্ঘভোজন করাও, পুকুর খোঁড়াও, রাস্তা বাঁধাও, মন্দির তৈয়ার কর, কত কাজই আছে। তা মা, তোর ধন-দৌলত আছে, তোর তা করিলেই সাজে। কিন্তু আমি বলি মা, এ সবও ত সংসার, এ সবও ত মায়ার বন্ধন, এর চেয়ে সঙ্ঘে যাওয়া ভাল। ভিক্ষুরা কেমন নিশ্চিন্ত থাকিয়া ধর্ম্ম করে। সংসারের টান তাদের একেবারেই নাই। আপনার মনপ্রাণ ভগবানেই সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকে। ভিক্ষুণীরাও ত তাই করে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, সংসার অসার, সংসারে থাকিয়া, মৃত্যুর সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, নির্ব্বাণলাভই শ্রেয়ঃ ও তাহাই প্রেয়। তা মা, আমার যদি কথা শোন, সঙ্ঘের আশ্রয় লও। আপনার যা কিছু আছে, সর্ব্বসাধারণকে দান করিয়া নিঃসম্বল, নির্ব্বিকার, নির্ম্মল চিত্তে সঙ্ঘের এক নিভৃত কক্ষে বাস কর; শান্তি পাবে; নির্ব্বাণ আর কিছুই নয়, কেবল শান্তি। দীপ যেমন নির্ব্বাণলাভ করিলে, পৃথিবীতেও থাকে না, অন্তরীক্ষেও থাকে না, কোন দিকেও যায় না, বিদিকেও যায় না, কেবল তৈলক্ষয় হেতু শান্ত হইয়া যায়, মানুষও তেমনি নির্ব্বাণ পাইলে পৃথিবীতেও যায় না, অন্তরীক্ষেও যায় না, কোন দিকেও যায় না, বিদিকেও যায় না, ক্লেশক্ষয় হয় বলিয়া কেবল শান্ত হইয়া থাকে। তা মা, যদি

শান্তি চাস্, এ সংসারে আর তোর কপালে সুখ নাই, এখন সেই শান্তিলাভের জন্য সঙ্ঘের আশ্রয় লও।"

অনেকক্ষণ এইরূপ ঘ্যানর-ঘ্যানর করিয়া বুড়ী উঠিয়া যাইত—মায়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। যাবার সময় বুড়ী বলিত, "দেখ্ মা, তোর জন্য ভেবে ভেবে আমি ত আর পাঁচ দোরে যেতে পার্লাম না, আমার পেট্‌টার মত চারটি চাল আজ তুই দে মা।" মায়া তার টুক্‌নী ভরিয়া চাল দিত, সেও আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইত। বলিয়া যাইত, "সুগতে তোর ভক্তি হউক।"

৩

যিনি আধাবয়সী, তিনি আসিয়া বলিতেন, "তোর তো আর ধন-দৌলতের অভাব নাই, ধর্ম্মে মন দে। ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম,—সুগতের ধর্ম্ম; তাহার একটি একটি কথা একটি রাজার ধন। সাত রাজার ধন এক মাণিক—এমন কত মাণিকই যে সুগতের কথায় আছে, তার কি ঠিক আছে? লোকে বলে, সুগত সংসার ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। তিনি মায়াই ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। তুই উপাসিকা, এখনকার লোক কলির লোক, সব ক্ষীণজীবী, এখন কি আর কেউ ভিক্ষু হ'তে পারে, না, ভিক্ষুণী হ'তে পারে? পুরুষ বরং ভিক্ষু হ'তে পারে, তাদের মনের জোর আছে; আমরা অসার মেয়েমানুষ, আমাদের ভিক্ষুণী হওয়া বৃথা। উপাসিকা হ, আপনার ঘরে ব'সে সৎসঙ্গ কর্, কথা দে, কীর্ত্তন দে, তীর্থযাত্রা কর্, ভগবান্ যেখানে যেখানে পদধূলি দিয়া গিয়াছেন, সেই পবিত্র দেবালয়ে গড়াগড়ি দে, মন্দির দে, ধর্ম্মশালা দে, ঔষধশালা দে, আর সিদ্ধপুরুষের সেবা কর্, সিদ্ধাচার্য্যদের সেবা কর্। হয় ত কোন সিদ্ধপুরুষ তোকে শক্তি করিয়া লইবেন। তুই দেবতা হইয়া যাইবি, ঐ দেখ, আমড়াতলায় ঘোষেদের মেয়ে নিগি নাঢ়-পণ্ডিতের শক্তি হয়েছে, তাকে এখন সকলে নাঢ়ী বলে। যে নাঢ় পণ্ডিতের পূজা করে, সে নাঢ়ী পণ্ডিতেরও পূজা করে। নাঢ়ীর মন্দির হয়েছে, তার মন্দিরেও দীপ জ্বালে, ধূপ দেয়, তারা সংসারী হয়েও সংসারী নয়, ভিক্ষু হয়েও ভিক্ষু নয়, তারা একেবারে দেবতা হয়ে গিয়েছে।"

এইরূপে হাত নেড়ে নেড়ে মাগী কত কথাই বলিত। মায়া শুনিতও না, অন্যমনস্কে বসিয়া থাকিত। হয় ত শুনিতে শুনিতে অন্য কাজে চলিয়া যাইত। সে কিন্তু বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিত; আবার মায়া আসিলে বক্তৃতা জুড়িয়া দিত। সেও যাবার সময় টুক্‌নী ভরিয়া চাল লইয়া যাইত।

৪

এক এক দিন সেই যুবতী ভিখারিণী আসিয়া মায়াকে কতমত বুঝাইত, সে খঞ্জনী বাজাইত, গান করিত, নাচিত; "গুরু ভিন্ন গতি নাই। বজ্রগুরু ভেদাভেদ দেখাইয়া দেন। গুরুর উপদেশ অমৃত-রস। যে হাবা, সে তাহা বুঝিতে পারে না, পান করিতে পারে না, সে তৃষ্ণায় মরে, সে তৃষ্ণায় মরে। শাস্ত্রের অর্থ করিতে গিয়া মরুভূমে তৃষ্ণায় মরে। তুমি গুরু কাড়, গুরুর উপদেশ লও। সংসার সে উপদেশের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তুমি দেখিবে, সব শূন্য, সব করুণা, পাপ নাই, পুণ্য নাই, সব সমান। তখন সমাজের বন্ধন থাকে না। লোকে "ভব আর নির্ব্বাণ" "ভব আর নির্ব্বাণ" করিয়া আপনাকে বদ্ধ করে, কিন্তু গুরুর উপদেশে দেখিতে পাইবে, ভবও নাই, নির্ব্বাণও নাই। সংসারে যাহা পাপ ও পুণ্য, গুরুর অমৃত উপদেশের পর তাহার কিছুই থাকে না। গুরুর উপদেশের পূর্ব্বে পঞ্চকামোপভোগ বড়ই দোষের। কিন্তু গুরুর উপদেশ অনুসারে পঞ্চকামোপভোগে দোষ ত নাই-ই, বরং উহা মহাসুখময় সহজধামে লইয়া যায়। গুরুর উপদেশে দেখিবে, সহজ সমস্ত ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছে। 'অহরহ সহজ ফরন্ত।' সহজতরু প্রকাণ্ড তরু; আকাশে আকাশে তাহার ডাল উঠিয়াছে, তাহার ফুল যখন হয়, তখন সব প্রভাস্বরময় হইয়া যায়। আবার যখন সে ফুল ফোটে, তখন ত্রিভুবন মহাসুখে মত্ত হয়। সে গাছের ফল অমৃতফল। সে ফলের নাম পর-উপকার। মায়া, করুণা কর, করুণা কর, পর-উপকার কর। গুরু কাড়, গুরুর কাছে উপদেশ লও, দেখিবে সব শূন্য, সব ফক্কা, আছে কেবল করুণা, আর পর-উপকার। ভগবান্ তোমায় ধর্ম্মে মতি দিন। তুমি সহজ পথের পথিক হও। তোমার সব যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইবে, তুমি মহাসুখে থাকিবে।" বলিয়াই সে গান ধরিল;—

"ভাব ণ হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহে কো পতিআই।
লুই ভণই বট দুলকখ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা॥

"জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী
সো কইসে আগম বেঁএ বখাণী ॥"

ভাব পদার্থ ত হইতেই পারে না। কোথায় জানিলে, কেমন করিয়া জানিলে, ভাব বলিয়া পদার্থ আছে। ভাবকে পিঁজিয়া পিঁজিয়া দেখ, পিণ্ড নাই, অণু নাই, কিছুরই উপলব্ধি হয় না। অভাব ত নাই-ই। যে অসৎ, সে কেমন করিয়া থাকিবে। এ কথা সহজে কি লোকে বিশ্বাস করিতে চায়? জ্ঞান আর আনন্দে সুন্দর যে আমাদের গুরু সিদ্ধাচার্য্য লুই, তিনি বলেন, এ সব জ্ঞান বড়ই দুর্লভ' যে সে ইহার ধারণাই করিতে পারে না। কায়, বাক্, চিত্ত কোথায়, কিছুই বুঝা যায় না। যাহার বর্ণনা নাই, চিহ্ন নাই, রূপ নাই, তাহা দিয়া কেমন করিয়া আমি আগম ও বেদ বুঝাইয়া দিব? যেমন জলের ভিতর যে চাঁদ থাকে, সে সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু বুঝাইবার যো নাই, তেমনি এ সব কথাও বুঝাইবার যো নাই। করুণাময় গুরু আমাদের বুঝাইতে চান—সব ফাঁকা, সব ফাঁকা, সব ফকা। এই ত লোকে 'চিত্ত চিত্ত চিত্ত' করে, কিন্তু চিত্তটাই বা কি? তলাইয়া বুঝিতে গেলে চিত্তই নাই। সুতরাং গুরুর উপদেশ লও, ধ্যান কর, শুধু মহাসুখ—মহাসুখ আর মহাসুখ। শূন্যও মহাসুখ, বিজ্ঞানও মহাসুখ, সবই এক মহাসুখ। মহাসুখই করুণা, মহাসুখই সহজ, আর সকলেরই এক ফল পর-উপকার। মায়া, গুরুর শরণ লও, তিনিই সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন।"

সেও টুক্নী ভরিয়া চাল লইয়া চলিয়া গেল। মায়া মহাভাবনায় পড়িল। সবাই বলে, সঙ্ঘে যাও; সবাই বলে, গুরুর শরণ লও। এ কেন? এরা কি কোন মতলবে ফেরে, না আমায় নিঃস্বার্থ উপদেশ দেয়? সরলা শেষ কথাই ঠিক ধরিয়া লইল। নিঃস্বার্থ উপদেশই ইহারা দিতেছে।

৮

মায়া অনেক দিন ধরিয়া ভিখারিণীদের এই গায়ে প'ড়ে উপদেশ দেওয়া সহ্য করিল; কিন্তু ক্রমে তাহার বিরক্তি ধরিতে লাগিল। পরামর্শের মাত্রাও চড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম তিন জন ভিখারিণী মাত্র আসিত। এখন তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। অনুগ্রহও ঘন ঘন হইতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে ভিখারী মহাশয়েরাও যোগ দিতে লাগিলেন। মায়া ত কোথাও যাইত না; কেবল মন্দিরে পূজা দিতে, মানত করিতে যাইত; বৌদ্ধ-মন্দিরে গেলে ভিক্ষুরা, পুরোহিতেরা, ভক্তেরা সবাই পরামর্শ দিত। মায়া মহা বিপদে পড়িল; ক্রমে বিহারের কর্ত্তারাও আরম্ভ করিলেন। শেষ মহাবিহারের কর্ত্তা রাজার গুরুপুত্রও মায়াকে এক দিন মহাবিহারে পাইয়া নানারূপ পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তখন মায়ার মনে একটা সন্দেহ হইল। কেন এত লোকে এই পরামর্শ দেয়? ইহার ভিতরে কিছু গূঢ় রহস্য আছে। মায়া যতই হউক, বালিকা ত। সমাজবোধ তাহার নাই বলিলেই হয়; কিন্তু সন্দেহ হওয়ার পর তাহার একটু ভয় হইল। "আমি বেণের মেয়ে, আমি ঘরে বসিয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণের সেবা করিব। আমি কেন সঙ্ঘে যাইতে যাইব? সঙ্ঘে যে সকল মেয়েমানুষ যায়, লোকে ত তাহাদের ভাল বলে না। তাহাদের স্বভাব ভাল থাকে কি না সন্দেহ। তাহারা অনেকটা মদ্দা মদ্দা হইয়া যায়। মেয়েদের মত লজ্জাসরম তাহাদের একেবারেই থাকে না। আমি কেন সঙ্ঘে যাইব? তবে এত লোকে আমার গায়ে প'ড়ে এ পরামর্শ দেয় কেন?"

যখন সন্দেহটা ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে এক দিন তাহার বাবাকে সব কথা বলিয়া ফেলিল। শুনিয়াই বাবা মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। বিহারী যদিও জামাইএর শোকে কতকটা জবুথবু হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি এখনও একটা দেশব্যাপী ব্যবসা চালাইতেছেন; মেয়ের বিষয়-আশয় সব দেখিতেছেন; মেয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য উঠাইয়া কতকটা আপনার কাজের সামিল করিয়া লইয়াছেন, কতকটা ধনীদের দিয়া দিয়াছেন। মেয়ের স্থাবর সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন। মেয়ের ধর্ম্মকর্ম্মে যাহাতে মন হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন। তাহার পূজা-অর্চ্চায় যাহাতে মন যায়, তাহা করিতেছেন; দেবতা-ব্রাহ্মণে যাহাতে ভক্তি হয়, করিতেছেন। কিন্তু সব যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আগের যে আগ্রহ, যে তেজ, যে জোর, সে যেন নাই। তবে কি না, এ সব চিরকাল করিয়া আসিয়াছেন, সেই জন্যই এখনও করিতেছেন। দাঁড় বন্ধ করিয়া দিলেও যেমন নৌকা খানিকটা আপনি চলে, তেমনি বিহারীর কাজও বিহারী নিজে দমবন্ধ হইয়া গেলেও যেন কতকটা আপনি চলিতেছে, কলে চলিতেছে। লোকে বিহারীকে ভয় করে, ভক্তি করে, বিশ্বাস করে। সুতরাং বিহারী যে সে বিহারী নাই, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে নাই। ভাবিতেছে, শোকে বিহারীর খানিকটা কষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু

সে যা ছিল, তাই আছে। সুতরাং তাহার কাজ-কর্ম্মের লাভলাভের বড় ক্ষতি আজও হয় নাই।

৬

মেয়ের কথা শুনিয়া বিহারীর চমক ভাঙ্গিল। সে মেয়েকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। কে আসে? কে কি বলে? ভিখারিণীরা কোন্ দলের? বিহারের কোন্ অধ্যক্ষ কি বলিয়াছেন? গুরুপুত্রের সঙ্গে কয়বার দেখা হইয়াছিল? কোন্‌বারে তিনি কি বলিয়াছেন? সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিহারী গোলা হইতে সাতগাঁয়ে নিজের বাড়ী গেলেন। মেয়ের দরওয়ানদের বলিয়া গেলেন, যেন ভিখারী বা ভিখারিণী বাড়ীর ভিতর যাইতে না পারে। এই ব্যাপারে বিহারীর পূর্ব্বভাব ফিরিয়া আসিল। আসন্ন বিপদ্ দেখিলে অনেকেরই উৎসাহ বাড়ে, মনে দৃঢ়তা জন্মে, শরীরে যেন মত্ত হস্তীর বল হয়। বিষাক্ত ঔষধ খাইলে শরীরে যেমন রক্ত-সঞ্চালন বেশী হয়, কন্যার এই বিপদে বিহারীরও তাহাই হইল। তাহার সব উৎসাহ, সব উদ্যম, সব রোখ, সব ঝোঁক ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সে কিছুই প্রকাশ করিল না। বাড়ী ফিরিল। বেশীক্ষণ ভাবিল না, চিন্তিল না। আপনার মোকামে মোকামে বিশ্বাসী লোক দিয়া কি খবর লইতে লাগিল। কি খবর, আমরা জানি না, সে অতি গোপন কথা।

তবে আমরা জানি, বিহারী রাউত আশ্রমের বেণে। ছাউনিতে ছাউনিতে মসলা বেচা তাহার পৈতৃক ব্যবসা। বাঙ্গালায় তখন অনেক রাজা। সকলেরই দশ বিশটা ছাউনি। বিহারীর মোকামও সব ছাউনিতে। তার বড় গোলা সাতগাঁয়ের গঙ্গার ধারে। সেখানে সে পাহারা বাড়াইয়া দিল, গোলার পাঁচীল মেরামত করাইল। খাদে যাহাতে জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিল। পশ্চিম হইতে বড় বড় চৌহান, রাঠোর, পাঁওয়ার আনাইয়া সাতগাঁয়েও মোকামে মোকামে দরওয়ান রাখিল এবং তলায় তলায় খবর লইতে লাগিল, ব্যাপারখানা কি? তাহার বেশ ধারণা হইল, মায়াকে সঙ্ঘে লইয়া যাইবার জন্য বৌদ্ধদের ভিতরে একটা ষড়্‌যন্ত্র হইতেছে; কিন্তু বিহারীর ভয়ে তাহারা আপনাদের মতলব হাঁসিল করিতে পারিতেছে না। তাদের ভিতরেও আবার দলাদলি আছে। মহাযান, বজ্রযান ও সহজিয়া সকল দলেরই চেষ্টা, মায়া তাহাদের দলে আসে; সে জন্যও তাহাদের মতলব হাঁসিল করিতে দেরী হইতেছে।

আর মায়া—সে আপনার স্বামী ছাড়া আর কাহারও কথা মনেই স্থান দেয় না। যা কিছু করে—স্বামীর স্বর্গার্থ—পরলোকে স্বামীর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহারই জন্য। অন্য কথা সে ভাবে না।

৭

মায়া ভয় পাইল কেন? বিহারীই বা ভয় পাইল কেন? কতকগুলি ভিখারী আর ভিখারিণী মায়াকে ভিখারিণী করিয়া সঙ্ঘে লইয়া যাইতে চায়, না গেলেই হইল। তাতে আবার ভয় কি? আর এত উদ্যোগই বা কেন? বিহারী যেন লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত—এ সব কেন? ইহার কারণ কি? হিন্দুরা যখন কেহ সন্ন্যাসী হয়, তখন লোকে মনে করে, সে মরিয়াছে, সে মরিলে তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা দখল করে। সে যদি ফিরিয়া আসে, তাহার সমাজে স্থান হয় না; সুতরাং সে বিষয়ও ফিরিয়া পায় না। কিন্তু বৌদ্ধদের তাহা হয় না। যে ভিখারী বা ভিখারিণী হয়, সে সমস্ত সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার-স্বত্বাদি লইয়া সঙ্ঘে যায়। সঙ্ঘ তাহার সমস্ত বিষয় সাধারণের কার্য্যে নিযুক্ত করে। এই জন্য তাহারা হিন্দুর সন্ন্যাসকে সন্ন্যাস বলিয়াই মনে করে না। বলে, ওটা উত্তরাধিকারী-দের বিষয় দিবার ফন্দী মাত্র। আমি যদি সন্ন্যাস লইলাম, সাধারণের জন্য জীবনটা উৎসর্গ করিলাম। আমার সম্পত্তি গৃহস্থেরা লইবে কেন? সে ত সর্ব্ব-সাধারণে লইবে। তা এখন যদি মায়াকে সঙ্ঘে টানিতে পারে, মায়ার স্বামীর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্ঘে ত যাইবেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিহারীর উত্তরাধিকারও সঙ্ঘে যাইবে; সুতরাং ধনীদের আর দত্তদের দুটা বড় বড় বিষয়ই সঙ্ঘে যাইবে। তাই, সব দলের ভিখারী-ভিখারিণীরাই লাগিয়াছে মায়াকে সঙ্ঘে লইবার জন্য। যার দলে মায়া যাইবে, তাদেরই জয়-জয়কার হইবে। বিহারী সে কথা বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহার এত ভয়, এত উদ্যোগ। বিশেষ সাতগাঁয়ে এখন বৌদ্ধ রাজা। রাজাও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিবেন না, রাজার সঙ্ঘে উহাকে লইবার জন্য তিনিও যে চেষ্টা করিবেন না, সে কথা কে বলিতে পারে? তাই বিহারীর যুদ্ধের উদ্যোগ। বিহারী ইচ্ছা করিয়া এত বড় দুটা সম্পত্তি ভিখারী-দের দিতে রাজী নহেন; সুতরাং তাঁহার এত ভয় এবং এত উদ্যোগ; কিন্তু বিহারী প্রকাশ্যভাবে কোন উদ্যোগ করিতে পারেন না, পাছে তাঁহাকে রাজার

কোণে পড়িতে হয়। ভিখারীরাও বিহারীকে ভয় করে, কারণ, তখনকার ছোট ছোট রাজাদের চেয়ে বেণেরা যে কম ছিল, তাহা নহে। কারণ, বেণেদের কারবার সকল রাজার দেশেই ছিল, তাহারা ইচ্ছা করিলে এক রাজার দেশ হইতে অনায়াসে অন্য রাজার দেশে চলিয়া যাইতে পারিত এবং গেলে যে দেশ হইতে যাইত, তাহার বিশেষ ক্ষতি হইত। ইচ্ছা করিলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধাইয়া দিতে পারিত। তাহারা বড় কম ছিল না। তাই সাতগাঁয়ের রাজা বা ভিখারীর দল প্রকাশ্যে বিহারীর মেয়ের উপর জোর-জবরদস্তী করে নাই, বা করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহারা চেষ্টা করিতেছিল যে, যদি মায়াকে লওয়াইয়া সঙ্ঘে ঢুকাইতে পারে, তাদের মতলব হাসিল অতি সহজেই হইয়া যাইবে। তাই ভিখারিণীরা এত ঘন ঘন মায়ার কাছে যাইত। মায়া নিজে যদি যায়, তবে বিহারীর আর বলিবার কোনও কথা থাকে না; অথচ বৌদ্ধেরা এত বড় দুটা বিষয় অধিকার করিতে পারে। তখনকার সঙ্ঘে ব্যবসা-বাণিজ্যও করিত। ভিক্ষুরা ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারাও ধন উপার্জ্জন করিয়া কতক নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, কতক বা সঙ্ঘের মঙ্গলের জন্য খরচ করিত; সুতরাং তাহারা যে শুদ্ধ স্থাবর আর অস্থাবর বিষয়ই চাহিত, তাহা নহে, ব্যবসা-বাণিজ্যও হাত করিতে চেষ্টা করিত। বৌদ্ধেরা বুঝিয়াছিল, এটা তাহাদের মাহেন্দ্রক্ষণ। তাদের ভিতর ভিতর খুব উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল।

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

ভুরসুট নগর দামোদরের একটা শাখার উপর। জায়গাটি একেবারে সমতল, ঠিক যেন দর্পণের মত। ঠিক মধ্যস্থলে একটি গড়। গড়ের ভিতর ৬০ বিঘা জমি। গড়ে গভীর জল। দামোদরের সঙ্গে সংযোগ থাকায় বর্ষার সময় এত জল পুরিয়া রাখা হইত যে, সব সময়েই খাইয়ে জল থাকিত। গড়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির বাস নিষেধ। গড়ের মধ্যে লাঙ্গল চালান নিষেধ। অন্য জাতির লোকের হাঁড়ী চড়ান নিষেধ। কাজের জন্য বিদেশ থেকে অন্য জাতির লোক এলে, তাহাদের হয় ব্রাহ্মণবাড়ী প্রসাদ পাইতে হইবে, না হয় গড়ের বাহিরে গিয়া রাঁধিয়া খাইতে হইবে। গড়ের ভিতর বাড়ী-ঘর-দোর সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাগানগুলিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে বোধ হয়, এখানকার মেয়ে ও পুরুষ যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্যই জন্মিয়াছিল। তাহাদের যেন অন্য কাজ নাই, অন্য চিন্তা নাই। বাড়ীগুলি সবই চালা। কেবল মন্দিরগুলিই পাকা, একেবারে চূণ, সুরকী, ইট ও পাথরে তৈয়ারী। সব বাড়ীতেই একটি না একটি মন্দির আছে। সকলের চেয়ে বড় মন্দিরটির নয়টি চূড়া—"নবরত্ন" বলে। মন্দিরটির সর্ব্বত্র ইট ও পাথরের উপর নক্সা কাটা। দরজার দুপাশে দুটি সাপ আঁকা—আঁকাবাঁকা হইয়া উঠিয়াছে, আর দরজার ঠিক মাঝখানে মাথার উপর দুইটি ফণা মিলিয়া আছে। এই সর্প মুখোমুখী করিয়া রাখার নাম কুলকুণ্ডলিনী। দরজার উপরে যে কার্ণিস আছে, তাহাতে দুইটা হাঙ্গর আঁকা। হাঙ্গর দুইটা লেজ জড়াইয়া দুই দিকে মুখ করিয়া আছে। মন্দিরে রোজ পূজা হয়, দেবীর নাম ভবানী।

ঐ মন্দিরের সম্মুখে খানিক দূরে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ। দেখিলে বোধ হয়, কোন সম্পন্ন লোকের বাড়ী। চণ্ডীমণ্ডপটির উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বদিক্ মাটীর দেওয়াল দিয়া ঘেরা—বড় বড় পাট; নয় দশ পাট উঠিয়া পাট শেষ হইয়া গিয়াছে। মাটীর দেওয়ালের উপর খুব যত্ন করিয়া খড়িটি করা। তুঁষ, পাটের কুচা, আর কাদা খুব মিহি করিয়া ছানিয়া তাই দু আঙ্গুল পুরু করিয়া দেওয়ালের উপর বসান, আর বেশ করিয়া পিটিয়া দেওয়া। খড়িটি-করা দেওয়ালের উপর রোজ আগাগোড়া নিকান হয়—দেখিতে তক্-তক্ করে। চণ্ডীমণ্ডপটির দক্ষিণদিকেও দুই ধারে দুই হাত করিয়া দেওয়াল দেওয়া। মাঝে যেটুকু ফাঁক, সেটুকুতে দুইটা মোটা মোটা শালের খুঁটি, তাহার উপর বিচিত্র কাজ করা। কাঠের উপর নক্সা করিতে ভুরসুটের লোক সিদ্ধহস্ত ছিল। খুঁটি দুটির উপর দুইখানি আড়া, আর দক্ষিণের দেওয়াল দুটির উপর দুইখানি আড়া, এই চারি আড়ার উপর চারিখানি প্রকাণ্ড চালা। আড়ার শাল-কাঠেও কাজ করা। আড়ার উপর তীর, তার উপর আবার আড়া, তাহার উপর মাঝখানে একটি তীরের উপর মাথালির বাঁশ। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে, বারান্দার দক্ষিণদিকে সব শালের খুঁটি, পুব-পশ্চিম সব খোলা। বারান্দার পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকের শেষে দুটি মাটীর তাকিয়া করিয়া দেওয়া আছে। কেহ

ইচ্ছা করিলে তাহাতে হেলান দিয়া বসিতে পারেন। চালগুলি পরিষ্কার করিয়া শণের সুতালি দিয়া ছিটান। রোয়াগুলি নানারূপ রংকরা। আর শলা-গুলিও বেশ মাজ-ঘষা ও রংকরা।

ভোর হইল। এক জন চাকর আসিল, সমস্ত চণ্ডীমণ্ডপ বেশ করিয়া নিকাইয়া দিল, তাহার পর ঝাড়ু দিল, তাহার পর কয়েকটি বালান্দা পরগণার মাদুর বিছাইল, মাদুরের উপর একখানি সতরঞ্চ বিছাইল, সতরঞ্চের উপর একখানি গালিচা বিছাইল, গালিচার মাঝখানে একখানি পিতলের কোণ-লাগান পিঁড়ি কাৎ করিয়া দিল, আর তাহার নীচে উৎকৃষ্ট রেশমের ছোট একখানি গদী পাতিল, সেইখানে কতকগুলি খুব মিহি মাজা ও পাকান তালপাতা, একটি দোয়াত ও কলম রাখিল ও সেখান হইতে চলিয়া গেল।

২

কিছুক্ষণ পরে ভবানীর মন্দির হইতে এক জন সুপুরুষ বাহির হইলেন। তাঁহার দেহ বেশ দীর্ঘচ্ছন্দ। রঙটি দুধে আল্তার মত। মুখটি প্রসন্ন, তিলফুলের মত নাকটি, চোখ দুটি পটলচেরা, কপালে চন্দনের তিলক। অস্ফুট-স্বরে ভবানীর স্তব পাঠ করিতে করিতে মন্দির হইতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পায়ে কাষ্ঠপাদুকা ঠক্-ঠক্ শব্দ করিতেছে। বারান্দায় কাষ্ঠপাদুকা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ গালিচার উপর দিয়া সেই ছোট রেশমের গদীটিতে বসিলেন এবং পিঁড়িখানিতে ঠেসান দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। তাঁহার পদশব্দ শুনিয়াই যেন চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দা ভরিয়া গেল। সর্ব্বপ্রথমে আসিলেন এক গৌরকান্তি পাতলা ব্রাহ্মণ। ইঁহার পৈতার খুব বাহার। সরু পৈতা, অনেক দণ্ডী, নিরন্তর পরিষ্কার করায় ধপ্-ধপ্ করিতেছে, আর রোজ জীবলী আটা দিয়া মাজায় চক্‌চক্ করিতেছে। ইনি আসিয়াই বারান্দা হইতে গালিচায় উঠিলেন, আর একেবারে গদীর কাছে গিয়া বসিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই গদীর উপরিস্থিত ব্রাহ্মণটি বলিলেন, "কি শ্রীধর, আজ তুমি যে সকলের আগে?" শ্রীধর বলিলেন, "পাণ্ডু কাকা, কয় দিন ধরিয়া আমাদের কণাদ-সূত্রের সঙ্গে প্রশস্ত-পাদের ভাষ্য মিলাইতে-ছিলাম। একটা আশ্চর্য্য দেখিলাম, তাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।" পাণ্ডুকাকা বলিলেন, "কি বল দেখি, তুমি নহিলে এত খাটে কে কাকা?" শ্রীধর বলিলেন, "৫২টি সূত্রের নামও ভাষ্যকার করেন নাই।"

পাণ্ডু। এত বড় চমৎকার! ভাষ্যকারেরা ত প্রায়ই সূত্র ধরিয়াই ভাষ্য করেন। প্রশস্তপাদ তাহা করেন নাই। তিনি যেন নিজের মতলবমত ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সূত্র তুলিয়াছেন। কখন্ যে কোন্ সূত্র তুলিবেন, বুঝা যায় না। তাই আমি ভাবিতাম যে, কেহ যদি মিলা-ইয়া দেখে, কোন্ কোন্ সূত্র তোলা আছে, তা হ'লে বড় ভাল হয়। তা তুমি বাবা মিলাইয়া দেখিয়াছ। বল দেখি কি রকম?

শ্রীধর। আমি ভাষ্যে যত সূত্র পাইলাম, সূত্র-পাঠে সেগুলি সব দাগ দিলাম; দেখিলাম, ৫২টি সূত্র তিনি একেবারেই ধরেন নাই!

পাণ্ডু। বল কি? বাহান্নটা?

শ্রীধর। আজ্ঞা হাঁ।

পাণ্ডু। তবে কি প্রশস্তপাদ কণাদ-সূত্রের টীকা করেন নাই?

শ্রীধর। তা কেমন করিয়া বলিব? যেগুলি ধরিয়াছেন, সবই ত সূত্রপাঠে আছে।

পাণ্ডু। আচ্ছা, তবে কি নানা রকমের কণাদ-সূত্র আছে না কি? বৌদ্ধদের কাছে শুনিয়াছি, তাহাদের বৈশেষিক নাকি দশপদার্থী—

শ্রীধর। দশপদার্থী! সে ত নূতন কথা। এ সকল ব্যাপারে প্রবেশ করাই কঠিন।

পাণ্ডু। তা বাবা, দেখ ত, কে একটা লোক ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে।

শ্রীধর। সত্যিও ত। এ ত আমাদের দেশের লোক নয়। কাপড়চোপড় দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন রাজপুত।

৩

লোকটা ভবানী-মন্দিরের নিকটেই ঘোড়া হইতে নামিল, ভবানীমন্দির প্রদক্ষিণ করিল, মন্দিরের সম্মুখের সিঁড়িতে ভবানীর উদ্দেশে নমস্কার করিল; তাহার পর সটান চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় উঠিল। সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার পথ ছাড়িয়া দিল। বারান্দার মেঝে হইতে মণ্ডপের মেঝে একটু উঁচা। রাজপুত সেইখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিল ও কোমরপাটা হইতে একখানি চিঠি লইয়া হাত

বাড়াইয়া দিল। শ্রীধর চিঠিখানি তাহার হাত হইতে লইয়া পাণ্ডু কাকার হাতে দিলেন। পাণ্ডু কাকা চিঠিখানি হাতে লইয়া মন দিয়া মোহরটি পড়িলেন। বলিলেন, "বা! এ ত বিহারী দত্তের মোহর দেখিতেছি।" তাহার পর তিনি মোহর ভাঙ্গিলেন, জড়ান তালপত্র খুলিলেন ও আসল পত্র বাহির করিলেন—পড়িলেন; একবার পড়িলেন, দুইবার পড়িলেন, তিনবার পড়িলেন। তাহার পর পত্রখানি শ্রীধরের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়, দেখ, অদ্ভুত ব্যাপার!"

শ্রীধর পড়িতে লাগিলেন, আর পাণ্ডুদাস রাজপুতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, "তুমি কোন্ দেশের লোক?"

রাজপুত। হমি কনৌজয়া পাড়িহার রাজপুত হোঁ।

"এখানে কোথায় থাক?"

"ভুরস্থটমে বিহারী দত্ত বাণিয়াকা মোকাম মে।"

"ভুরস্থটে বিহারী দত্তের মোকামে থাক? তোমায় আমার কাছে কে পাঠাইয়াছে?"

"মোকামদার ত্রিভুবন।"

"এ চিঠি কে লিখেছে?"

"মোকামদারণে লিখা, লেকিন হুকুমসে লিখা।"

"এ ত মোকামদারের পত্র নহে, এ যে সাক্ষাৎ বিহারীর হাতের লেখা।"

"সো মৈঁ নহি জান্তা।"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীধর বলিলেন, "ব্যাপারখানা বুঝিয়াছেন কি? বিহারী দত্ত ব্রাহ্মণপন্থী হইতে চায়, সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের উচিত তাকে সাহায্য করা। সে গন্ধবেণেদের চাঁই, সে এ দিকে এলে ঐ জাতটা বৌদ্ধধর্ম্ম ছেড়ে দেবে। আমাদের দল পুরু হবে।"

"হঠাৎ কেন এমন হলো বল দেখি?"

"তা বল্‌তে পারি না।"

"তবে কেমন করিয়া জানিলে, সে ব্রাহ্মণপন্থী হ'তে চায়?"

"দেখ্‌লেন না, সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে তাদের স্থান কোথায়?"

"এ কথা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে কেন?"

"বাগ্‌দী রাজা গোল বাধাইয়াছে, অথবা বৌদ্ধদের সঙ্গে তাহার ঝগড়া হইয়াছে।"

"বেশ ত, তা যদি হয়, তাকে এই দিকে আন।"

কিন্তু হঠাৎ জবাব দেওয়া উচিত নয়; সব খবর না জেনে যদি একটা জবাব দেওয়া হয়, পরে তাহার জন্য কার্য্য নষ্ট হইতে পারে।"

"তবে এক কাজ কর, তাহাকে বল যে, এত বড় একটা কাজে আমি হঠাৎ জবাব দিতে পারি না। তুমি সিদ্ধল গ্রামের ভবদেব উপাধ্যায়, বাঁকুড়ী গ্রামের বাচস্পতি মিশ্র, মুখুটী গ্রামের রামধন, আর কাজিবিল্পী ধনুর্দ্ধর, আর মহিন্তা মাধবাচার্য্য এই কয় জনকে একত্র কর, আমার এখান হইতেও দুই এক জনকে লও। ইহারা সকলে পরামর্শ করিয়া যাহা বলিয়া দিবে, তাহার উপর কথা কহিবার লোক থাকিবে না। ভবদেব হরিবর্ম্মদেবের প্রধান মন্ত্রী ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। বাচস্পতি মিশ্র স্বনামধন্য ব্যক্তি, তিনি ভবদেবের প্রশস্তি লিখিয়াছেন। আর মহিন্তা মাধবাচার্য্য 'রাঢ়ত্রয়ে দণ্ডধৃক্।' তাহার পর সময় পাইয়া সব খবর লইয়া 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।" এইরূপ স্থির হইলে পাণ্ডুদাস কায়স্থকে ডাকাইয়া তাঁহাকে এই মর্ম্মে বিহারীকে পত্র লিখিতে বলিলেন এবং পড়িহার রাজপুতকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। তখন অন্যান্য লোকের কথা শুনিতে লাগিলেন।

৪

কত লোকের কত প্রকার মামলাই হইতে লাগিল। একটা চোরের শাস্তি হইল। দেনার দায়ে এক জনকে কয়েদ করা হইল। তাহার আত্মীয়েরা দেনা শোধ করিয়া দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল। বাগ্‌দানের পর বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়া এক জন বলিল, "মেয়ের জাতিগত দোষ আছে।" দোষ প্রমাণ না হওয়ায় তাহার বিবাহ স্থির করিয়া দেওয়া হইল। এক জনকে অপালনকৃত গোবধের প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া হইল। ব্যবসায়ার্থ ম্লেচ্ছদেশগমনের জন্য বৈধ গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করা হইল। এক জন ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধমঠে আশ্রয় লইয়া তিন রাত্রি বাস করার জন্য জাতিচ্যুত করা হইল। বৌদ্ধ পণ্ডিতের কাছে রূপাবতার ব্যাকরণ পড়ার জন্য এক জন ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণপ্রায়শ্চিত্ত দেওয়া হইল; বলিয়া দেওয়া হইল, অনুকল্প গোদান বা কড়িদান করিলে হইবে না; তাহাকে প্রত্যহ এক এক গ্রাস অন্ন কমাইয়া অমাবস্যার দিন নিরম্বু উপবাস করিতে হইবে। তাহার পর প্রত্যহ এক এক গ্রাস বাড়াইয়া পূর্ণিমার দিন পূর্ণমাত্রায় পনর গ্রাস আহার করিলে সে নিষ্পাপ হইবে। গড়ভবানীপুরের এক জন বেণে অগুরুচন্দন বলিয়া অন্য কাঠ

বেচায় তাহার দশগুণ দণ্ড দেওয়া হইল। যাহার কাজ হইয়া যাইতেছে, সে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে কত যে এল, আর কত যে গেল, তাহার ঠিকানা নাই। এমন সময়ে বসন্তপুরের রমাই আর তাহার ছেলে নবাই মহাকোলাহল করিতে করিতে পাণ্ডুদাসের চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডুদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া উভয়কে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং উভয়কেই গালিচার গদীর দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। ছেলে বসিল ডান পাশে ও বাপ বাম পাশে।

ছেলে নবাই অমনি বলিয়া উঠিল, "দেখলে ত বাবা, পাণ্ডুকাকার কাছে অবিচার হওয়ার যো নাই। আমায় দিলেন ডাইনে বসিতে, আর তোমায় বামে। তবেই বুঝা গেল, উনি কাহাকে বড় বলেন।"

বাপ বলিলেন, "বটে,—তাই বুঝি, তুই ডাইনে গিয়ে অপনি বসিলি, আমি তোর কাছে না বসিয়া বামে বসিলাম। তাতে আবার ছোট বড় কি রে? যে বাপের চেয়ে বড় হ'তে চায়, তার মত ছোট আর কে আছে? শাস্ত্র বলে, 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ'—তুই কি না সেই বাপের চেয়ে বড় হতে চাস?"

"দেখ বাবা, তুমি যে আমার বাপ, তা ত আমি অস্বীকার করি না, তুমি যে পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্, তোমার যে আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রভৃতি নবগুণের আট গুণ আছে, তাহা আমার চেয়ে আর কে জানে? তোমার প্রতি পিতৃভক্তির কোন অভাব কোনও দিনও আমার দেখিয়াছ কি? তবে কি না, যেটা সত্য, সেটা বলিতেই হইবে। তোমার পিতা আবৃত্তিটা করেন নাই,—পাল্টা ঘরে বিবাহ করেন নাই। তোমার মা ছোট বামনের মেয়ে ছিলেন, আর আমার মা যাঁর কন্যা, তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলমেরু, লোকে কুলাচল বলে, তিনি একেবারে কুলমেরু। আমার মাতামহের নাম করিলে মুখ উজ্জ্বল। আর তোমার মাতামহ? তাঁর নাম কে জানে? যেও বা জানে, সেও বলিবে 'বামন তত ভাল নয়'।"

এইরূপে দুই জনে পাণ্ডুকাকার পার্শ্বে বসিয়াই ঝগড়া করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডুকাকা বলিলেন, "বলি, ব্যাপারটা কি? এত দিন না তত দিন—বাপ-ব্যাটায় আজ জাতি লইয়া ঝগড়া কেন?"

বাপ। কেন জান? রাম শেঠের বাড়ীতে তার বাপের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সভা হয়, সভায় আমরা দু'জনেই উপস্থিত ছিলাম। মাল্যচন্দনের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা আমার গলায় মালা দিতে আসিল। হতভাগা ছেলে আপত্তি করিয়া বলিল, "আমি থাকিতে বাবার গলায় মালা দিলে আমার মাতামহের অপমান করা হয়।"

ছেলে। হয় না কাকা? সে অপমান করা কি উঁহার উচিত? তিনিও ত উঁহারই শ্বশুর। বয়স হয়েছে কি না, তাই শ্বশুরের অপমানটা দেখিতেই পান না।

পাণ্ডু কাকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেষ রাম শেঠ করিল কি?"

বাপ বলিলেন, "সে আর কি করিবে, বাপ রেখে ছেলের গলায় মালা দিবে?"

ছেলে বলিলেন, "সে অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে আমার গলায় ছুঁইয়ে বাবার গলায় মালা দিলে। কিন্তু কাকা, এ রকমটা আর যাতে না হয়, আপনি করিয়া দিন, আমরা বিচারপ্রার্থী। আমার মাতামহের যদি এইরূপ অপমান হয়, আমি আর এ দেশে থাকিব না, মাতামহের দেশে গিয়া বাস করিব।"

পাণ্ডুদাস বলিলেন, "আমি ইহার কি বিচার করিব? ইহার বিচার তোমার মা'র হাতে। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর।"

ছেলে বলিল, "কাকা, আপনিও এই কথা বলিলেন? তাহা হইলে আমার দেশত্যাগই শ্রেয়ঃ, কেন না, শাস্ত্রে বলে, 'দেশত্যাগেন দুর্জ্জনঃ'।"

পাণ্ডুদাস এইবার পথ পাইলেন; বলিলেন, "দেখ নবাই, তোমার বাবাকে বড়ই শ্রদ্ধা করি, উঁহাকে দাদার মত দেখি, তাই এবার তোমায় মাপ করিলাম; নহিলে ভুরসুটের অধিপতি পাণ্ডুদাসকে মুখের উপর দুর্জ্জন বলিয়া গালি দিয়া পার পায়, এমন লোক এ দেশে নাই। যাইতে হয় তুমি যাও, তাহাতে ভুরসুটের কোন ক্ষতি হইবে না।"

নবাই তখন বলিলেন, "আমি কি আপনাকে বলিতেছি,—আমি কি আপনাকে বলিতেছি?"

পাণ্ডুদাস বলিলেন, "আমায় যদি না বলিতেছ, তবে তোমার বাপকে বলিতেছ, বড় পৌরুষই প্রকাশ করিতেছ!"

নবাই গজ-গজ করিতে করিতে উঠিল। এমন সময়ে কায়স্থ বিহারী দত্তের পত্রের জবাব লইয়া উপস্থিত হইল। পাণ্ডুদাস চিঠি পড়িলেন; শ্রীধরকে দেখিতে দিলেন। তিনি দেখিয়া একটু হাসিলেন। পাণ্ডুদাস স্বাক্ষর করিয়া দিলেন এবং পড়িহার রাজপুতকে ডাকাইলেন। সে পত্র লইয়া নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূরস্থট গ্রামের নামে রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের একটি গাঁঞী হইয়াছিল। রাঢ়ীয় শ্রেণীর পঞ্চ গোত্রের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রে শুভ নামে এক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজা ভূরিসৃষ্টিকা ভূরিশ্রেষ্ঠিক গ্রাম দান করেন। তাহা হইতেই ভূরিগ্রামী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। বল্লাল হইতে ভূরিগ্রামীর প্রাধান্য লোপ হইয়াছে। বল্লালের পূর্ব্বে এই ব্রাহ্মণেরা বড়ই পণ্ডিত ও বড়ই দাম্ভিক ছিলেন। এক জন ভূরস্থটের ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—"আমি এক দিন ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তিনি আপন ভূরুদেশ গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া তাহার উপর আপন উত্তরীয় বিছাইয়া আমায় সেখানে বসিতে দিলেন।" যেমন ভূরস্থট হইতে ভূরিগ্রামীর উৎপত্তি, তেমনি সিদ্ধল বা সিধ্‌লা গ্রাম হইতে সিদ্ধলগ্রামীর উৎপত্তি। সিদ্ধলগ্রামীরা, যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বড়ই প্রবল। ঐ গ্রামের ভবদেব ভট্ট হরিবর্ম্ম-দেবের প্রধান মন্ত্রী। সিদ্ধল গাঁখানা সাতগাঁ রাজ্যের সীমার বাহিরে রাঢ় দেশের মধ্যে। দেশটি অতি পবিত্র। তবে রাঢ়দেশে বড় বড় মাঠ; ছোট ছোট গ্রাম। মাটী এঁটেলা, বর্ষায় চলা-ফেরা বন্ধ। গ্রীষ্মে রৌদ্র-নিবারণের জন্য বড় বড় অশ্বত্থগাছ ও বড় বড় বটগাছ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। সাতগাঁয়ের সীমানা ছাড়াইলেই এই সমস্ত দেখা যাইত। সব গ্রামেই বড় বড় পুষ্করিণী আর বড় বড় বাগান, আম-কাঁঠালের গাছ, মাঠের মাঝে বড় বড় বাগান। সেকালের লোক পুষ্করিণী ও বাগান-প্রতিষ্ঠা বড় পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করিত; তাহাদের মধ্যে আবার ভবদেব ভট্ট একটু বিশেষ। তিনি সিদ্ধল গ্রামের চারিদিকে ১০।১২ ক্রোশ ধরিয়া যত গ্রাম ছিল, সর্ব্বত্রই পুকুর ও বাগান দিয়াছিলেন। সিদ্ধল গ্রামের চারিদিক্‌টাই একটা বড় বাগানের মত হইয়াছিল। রাঢ়দেশ বলিয়াই বোধ হইত না। তাহারই ঠিক মাঝখানে সিদ্ধল গ্রাম, কেবল ব্রাহ্মণের বাস। এই ব্রাহ্মণেরা সাবর্ণ গোত্র। এই গোত্রের ব্রাহ্মণেরা শত শত গ্রাম পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সিদ্ধলই সকলের চেয়ে বড় গ্রাম। এই গ্রামের যিনি গ্রামীন, তাঁহার উপরই গ্রাম-শাসনের ভার। পাণ্ডুদাস যেমন ভূরস্থটের অধিপতি বা গ্রামীন, এখানেও এক জন সেইরূপ গ্রামীন ছিলেন। কিন্তু ভবদেব ভট্ট সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার যেমন পদমর্য্যাদা, যেমন অগাধ বিদ্যা, তেমনি তিনি সজ্জন, তেমনি তিনি দাতা, তেমনি তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই অগ্নি অগ্নিশালায় সর্ব্বদাই জ্বলিত। তিনি তাহা নিভিতে দিতেন না। হয় নিজে, না হয় প্রতিনিধি দ্বারা প্রত্যহ সায়ংপ্রাতে হোম করাইতেন; অমাবস্যায় দর্শ ও পৌর্ণমাসীতে পৌর্ণমাস যাগ করাইতেন। এ সকল কিন্তু শ্রৌত-যাগ নহে, এ সকল স্মার্ত্ত-যাগ। ইহাতে তিন অগ্নির দরকার হইত না। আর আর অনুষ্ঠান তাঁহার বাড়ীতে ঢের হইত।

সম্প্রতি তিনি কলিঙ্গের রাজধানী তোষলি নগরের ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিকটে অনন্ত বাসুদেবের এক প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং তাহারই পাশে বিন্দুসরোবর নামে এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুষ্করিণীর ঠিক মাঝখানে নারায়ণের বাসার্থ একটি দ্বীপের উপর একটি মন্দিরও করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অনেক দিন একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বরে থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজা দেশটা দখল করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার শাসন করাও তাঁহার আর এক কাজ ছিল। তিনি সেই সকল কাজ সারিয়া সম্প্রতি কিছুদিন বিশ্রাম করিবার জন্য সিদ্ধল গ্রামে বাস করিতেছেন, আর কয়েক জন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের সঙ্গে বসিয়া স্মৃতিপুস্তক ও রাঢ়ীয় শ্রেণীর বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পদ্ধতিরচনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার নিজের যে রাজ্য বালবলভী বা বাগড়ী, তাহা প্রতিনিধি দ্বারা শাসন করাইতেছেন। ঐ রাজ্যটি গঙ্গা ও পদ্মার মাঝখানে, উহার আকার 'ব'কারের মত, উহার দক্ষিণদিক্‌টা প্রায়ই জঙ্গল—সুন্দরবন। উত্তরদিক্‌টায় কয়েক শত বৎসর ধরিয়া মানুষের বসবাস হইয়াছে। হরিবর্ম্মদেব ঐ দেশ জয় করিয়া আপন প্রিয় সচিব ভবদেব ভট্টকে শাসন করিতে দিয়াছেন। এই ব্যাপার হইতে ভবদেবের উপাধি হইয়াছে "বালবলভী-ভুজঙ্গ" অথবা বাগড়ীর রাজা।

২

ভবদেব যখন সিদ্ধল গ্রামে থাকিতেন, তখন তিনি অন্দরেও থাকিতেন না, বাহিরেও থাকিতেন না। ইহার মাঝখানে একটা ঘেরা জায়গার ভিতরে তাঁহার এক অগ্নিশালা ছিল, সেইখানে

তিনি বসিতেন। সে এক প্রকাণ্ড ঘর। সেই ঘরের এক পাশে একটু আল দিয়া আগুন রাখা হইত। ইহারই নাম স্মার্ত্ত-অগ্নি। তিনি এই অগ্নি নিভিতে দিতেন না। আলোর বাহিরে প্রকাণ্ড গালিচা পাতিয়া ও চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া তিনি নিজে বসিতেন ও পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। গালিচার বাহিরে থাকিত রাশীকৃত তালপাতা। তালগাছের মাজ-পাতা কাটিয়া ছয়মাস পুকুরের পাঁকে পুতিয়া রাখা হইত। ইহার নাম 'পাকান'। পরে এই পাতা দুধে সিদ্ধ করা হইত, শাঁক দিয়া ডলা হইত, তাহার পর কাঠী বাদ দিয়া পাতাগুলিকে সমান করিয়া কাটা হইত, তাহার পর তালপাতার আড়-দাঘ্ বুঝিয়া কোনটির ঠিক মাঝখানে একটি ছিদ্র করা হইত; ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া সরু পাকান দড়ী চালাইয়া দেওয়া হইত, সেই দড়ীতে তালপাতাগুলি বাঁধা হইত। যদি পাতাগুলি লম্বায় বেশী হইত, তবে দুই জায়গায় দুইটি ছিদ্র করা হইত, আরও বেশী লম্বা হইলে তিনটি ছিদ্র করা হইত। পুস্তকবিশেষে ঠিক মাঝখানে ছিদ্র না করিয়া একটু বামের দিকে ছিদ্র করা হইত। বৌদ্ধেরা প্রায়ই বামের দিকে ছিদ্র করিত। পুথি লেখা হইলে, পাঠের পুথির দড়ীতে একটি তালপাতের ময়ূর লাগাইয়া রাখা হইত। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উঠিয়া যাইতে হইলে, ময়ূরটি পাতায় দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতে হইত, নতুবা কোথায় থাকিল, ঠিকানা পাইবে কিরূপে? গালিচার নিকটে মাটীর দোয়াতে কালী, তাহাতে ন্যাক্ড়া দেওয়া। দোয়াতটি একটি কাঠের ফ্রেমে আঁটা। ফ্রেমটি হাতখানেক লম্বা। যতটুকুতে দোয়াত আছে, তাহার বাহিরে কলম রাখিবার জায়গা। কলম অনেকগুলি;—কোনটি কঞ্চির, কোনটি বাকারীর, কোনটি শরের, কোনটি অস্থির, কোনটি কলমাডগার। সবগুলিই বেশ করিয়া পাকান, আর সরু করিয়া কাটা। লিখিতে লিখিতে কলমের মোচ খারাপ হইয়া গেলে, তাহাকে ফের কাটিয়া লইবার জন্য, একখানি ইস্পাতের ছুরীও কলমদানীতে থাকে। দোয়াতদান ও কলমদানের পাশে বালীদান। তাহাতে খুব সরু মিহি বালী থাকিত। সেকালে এই বালীতেই ব্লটিঙের কাজ হইত। ভবদেব অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, আর তাঁহার সহকারী পণ্ডিতেরা লিখিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে আপত্তি তুলিয়া বিচার করিতেছেন।

আজ ভবদেব সামান্য-বহ্নিস্থাপনের পদ্ধতি লিখিতেছেন—বালী চালিয়া, বালীটাকে চৌকোণা করিয়া, একুশ আঙ্গুল বারো আঙ্গুল কুশ দিয়া রেখা টানিবার ব্যবস্থা করিতেছেন; মাঝে মাঝে অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া বালী লইয়া উৎকর প্রক্ষেপের ব্যবস্থা করিতেছেন। এমন সময়ে অগ্নিশালার দরজায় যে দরোয়ান দাঁড়াইয়া ছিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল—"সাতগাঁয়ের বিহারী দত্ত কার্য্যার্থী।" পাছে ভবদেব দরোয়ানের কথা শুনিতে না পান, তাই এক জন সিদ্ধল ব্রাহ্মণ গালিচার উপরে উঠিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল,—"খুড়ামহাশয়, শুনিয়াছেন—সাতগাঁয়ের বিহারী দত্ত কার্য্যার্থী।"

ভবদেব। বিহারী দত্ত—নিজেই আসিয়াছে?

ব্রাহ্মণ। হাঁ।

ভবদেব। বোধ হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন সুবিধা করিয়া লইবে, তা'র জন্যই এসেছে! (খানিক ভাবিয়া) "নাঃ—তা হ'লে নিজে আসিবে কেন?—তুমি বলিতে পার, তাহার সহিত কয় জন লোক আসিয়াছে?"

"পাঁচটি ডুলিবেহারা, তিনটি চাকর।"

"এই আটটি মাত্র লোকের সঙ্গে বিহারী দত্ত এসেছে? ব্যাপার গুরুতর দেখিতেছি। আচ্ছা, তাঁহাকে বেণেদের অতিথিশালায় লইয়া যাও। তাঁহাকে বলিয়া দাও, অদ্য অপরাহ্ণে আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে।"

ভবদেব ঠাকুর সেদিনকার মত কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন, পণ্ডিতেরাও উঠিলেন। যে ব্রাহ্মণ বিহারীর সংবাদ আনিয়াছিল, সে বিহারীকে লইয়া, বেণেদের অতিথিশালায় লইয়া চলিল। বিহারীর ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে আতিথ্যস্বীকার বোধ হয় এই প্রথম। সে অতিথিশালায় গিয়া দেখিল—সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোন জায়গায় একটু ধূলা বা ময়লা নাই। কত কাল যে এই অতিথিশালায় অতিথি আসে নাই (বেণেরা ত বড় একটা অতিথি হয় না), তাহার ঠিকানা নাই। তবু সব ঝর্-ঝর্ তর্-তর্ করিতেছে। একখানি কাঁঠালের তক্তাপোষের উপর সতরঞ্চ বিছাইয়া, বিহারীকে বসাইয়া, পরে ব্রাহ্মণ বলিল, "আপনি এইখানে বসিয়া বিশ্রাম করুন, আমি ডুলিবেহারাদের দেখিয়া আসি।" এই কথা বলিতে বলিতে ডুলি লইয়া তাহারা অতিথিশালার ভিতর আসিল। ডুলি একখানি পরিষ্কার দোচালায় রাখিতে বলিয়া ব্রাহ্মণ বেহারাদের বলিল, "তোমরা ঐ যে অশ্বত্থগাছের তলায় একখানি দোচালা—ঐখানে বিশ্রাম কর। আর এই মাদায় তেল লইয়া

যাও। ঐ অশ্বত্থগাছের পশ্চিমে দীঘি আছে, তাহাতেই স্নান কর।" আর বিহারীকে জিজ্ঞাসা করা হইল—"আপনি কি তোলাজলে স্নান করিবেন?—না গরমজলে স্নান করিবেন?—না পুকুরেই স্নান করিবেন?" বিহারী পুষ্করিণীতেই স্নান করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সেখানে একখানি জলচৌকি, তেল, গামছা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। বিহারীর চাকরেরা তাঁহাকে তেল মাখাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ অন্দরে চলিয়া গেল। সেখান হইতে ব্রাহ্মণ স্নানাহ্নিকের পর বিহারীর জলযোগের জন্য ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ও রাঁধিবার জন্য চাল, ডাল, ময়দা, ঘি, তরীতরকারী ইত্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। বিহারী বলিল, "ও কি করেন মহাশয়! আমি ভবদেব ভট্টের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছি, আমি তাঁহার বাড়ীতে প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইব। চাল-ডাল কেন?" "কি তা জান ভাই! সকল বেণেদের ত ব্রাহ্মণের উপর এমন ভক্তি নাই, তাই বেণেদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা আছে।" "যার নাই, তার নাই, আমার ত যথেষ্ট আছে। আমি প্রসাদই পাইব।" বিহারী স্নান-আহ্নিক সারিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। বেলা ঠিক আড়াই প্রহরের সময় একখানি গালিচার আসন আসিল, একখানি কলার পাত আসিল, একটি মাটীর ভাঁড় আসিল, সঙ্গে সঙ্গে এক জন পাচক-ব্রাহ্মণ অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া আসিল।

ভবদেব পইতার ঘর হইতেই হবিষ্য করিয়া আসিতেছেন, এবং প্রতিজ্ঞা—আজীবন হবিষ্য করিবেন। পাচক ব্রাহ্মণ একদলা ভাত সর্ব্বপ্রথমে কলার পাতে রাখিয়া বলিল—"ভবদেব ভট্টের প্রসাদ"; তাহার পর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত কলার পাতে সাজাইয়া দিল; কলার খোলার ঠোঙ্গায় করিয়া ডাল, ঝোল, অম্বল, পায়স—সব দিল; বিহারীকে বলিল, "আপনি বসুন।" বিহারী আগ্রহ সহকারে প্রসাদ মুখে দিল, দেখিল, উৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ চালের ভাত, তাহাতে সেই দিনেরই তৈয়ারী ঘি মাখান, উৎকৃষ্ট সরু মুগের ডাল ভাতে দেওয়া। খাইতে খাইতে বিহারী বার বার বলিতে লাগিল,—"আমি সত্য সত্যই অমৃত ভোজন করিতেছি, এমন রান্না আর কখনও খাই নাই।"

৩

চারিদণ্ড বেলা থাকিতে ভবদেব ঠাকুর চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বার দিলেন। কার্য্যটি গুরুতর বিবেচনা হওয়ায় আর কাহাকেও তিনি সঙ্গে আসিতে দিলেন না। বিহারীও যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল ও চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিল। ব্রাহ্মণবাড়ীর রান্না যে অমৃত, সে কথা বিহারী বার বার বলিতে লাগিল। সে বলিল, "আজ ঠাকুরের বাড়ীতে অতিথি হইয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও রাখাকেই ব্রাহ্মণত্ব বলে। আপনার দেশটা সব দেখিলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কোনখানে কিছু ময়লা নাই। আপনাদের ভিতরটাও বোধ হয়, এমনই পরিষ্কার। আর ঐ ওদের—দেখুন দেখি? রূপা রাজা এমন একটি মহাবিহার করিয়া দিলে! পড়িলে সিন্দুর তোলা যায়। কিন্তু এই কয় দিনের মধ্যেই ভিখারীরা কি করিয়া তুলিয়াছে,—চারিদিকে ময়লা আর দুর্গন্ধ। কেবল তাহারা নিজের শরীরটিকে পরিষ্কার রাখে, আর শুইবার জায়গাটিও পরিষ্কার রাখে। বাকি কিছুই দেখে না, তাহাদের বিহারের ত্রিসীমানায় যাইতেও ঘৃণা হয়।"

ভবদেব ভাবিয়াছিলেন, বিহারী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তাই বাড়ীতে তাহাকে ভাত না দিয়া, অতিথিশালাতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নহিলে যাহারা ব্রাহ্মণপন্থী, তাহাদিগকে বাড়ীর মধ্যে যাইতে দিতে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। তাহারা পাত কুড়াইয়া লইয়া যাইত,—এইমাত্র।

খানিকক্ষণ এইরূপ শিষ্টাচারের পর ভবদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারী, তুমি যে স্বয়ং আসিয়া হাজির! ব্যাপারখানা কি, খুলিয়া বল দেখি।" "আজ্ঞা—ব্যাপার গুরুতর! আমি আমার জাতি-কুল-মান-ধন সবই হারাইতে বসিয়াছি। আপনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তাই আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছি"—বলিয়াই বিহারী একেবারে দণ্ডবৎ হইয়া বারান্দায় পড়িল। ভবদেব ঠাকুর বিহারীকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া ক্রমে আস্তে আস্তে বিহারীর মুখ হইতে সব ঘটনা শুনিলেন।

সিদ্ধল হইতে সাতগাঁ বেশী দূর নয়। ভবদেব প্রায়ই সেখানে যাইতেন, ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করিতেন। কিন্তু তিনি রূপা রাজার প্রাদুর্ভাবের পর হইতেই আর সে-মুখো হন না। বিহারী ও সাধু ধনীর সঙ্গে ইঁহার বেশ জানাশুনা ছিল। জীবনকেও তিনি জানিতেন, তবে তাহাকে খুব ছোট দেখিয়াছিলেন।

ভবদেব ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখন কি করিবে মনে করিতেছ?" "সেই পরামর্শের জন্যই ত আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি যাহা পরামর্শ দেন, তাহাই করিব। তবে আমি এই জানি,

আমরা পুরুষানুক্রমে সৎপথে থাকিয়া যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছি, কতকগুলি লম্পট, ভণ্ড ভিখারীরা সেই সমস্ত লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে, ইহা আমি প্রাণ থাকিতেও সহিতে পারিব না। আর আমার মেয়ের কথা।"—বিহারী কাঁদিয়া ফেলিল। ভবদেব বিহারীকে আশ্বস্ত করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আর কাহারও পরামর্শ লইয়াছিলে?" "আপনি ত এ দেশে ছিলেন না, তাই ভুরসুটের গাঞী পাণ্ডু-দাসের পরামর্শ লইতে গিয়াছিলাম। তিনি যাহা বলিয়াছেন, এই তালপাতাখানি দেখুন, সব লেখা আছে।"

ভবদেব তালপাতাখানি একবার, দুইবার, তিনবার পড়িয়া দেখিলেন, পরে বলিলেন, "তুমি তাহাকে সব কথা খুলিয়া বল নাই?" "আজ্ঞা না। পত্রে সব কথা খুলিয়া বলিতে আমার ভরসা হয় নাই।" "তুমি বোধ হয় লিখিয়াছিলে, চতুর্ব্বর্ণে তোমাদের স্থান কোথায়?" "আজ্ঞা হাঁ।" "পাণ্ডু তোমাকে ঠিক পরামর্শই দিয়াছেন। তুমি এই সকল লোক একত্র কর। কোথায় করিবে, বল দেখি?" "আজ্ঞা, সে বিষয়ে ত আপনারই বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি হয়। আমি বেণে, আমার ত ও বিষয়ে কোন বোধসোধই নাই।" "দেখ, তোমার রাজার যেটুকু দেশ, তা আমরা ম্লেচ্ছের দেশ বলিয়া মনে করি। সেখানে আমরা ত যাইব না। আমার এখানে সকলে আসিয়া জুটিতে পারেন। কিন্তু আমি এখানে বেশী দিন থাকিতে পারিব না। আমাকে শীঘ্রই বাগড়ী যাইতে হইবে। আমার যদি মত লও, তাহা হইলে বাগড়ীতে দেবগ্রামে বাচস্পতি মিশ্রের টোলে সভা হইলেই ভাল হয়। পাণ্ডুর আসার পক্ষে একটু কঠিন হইবে বটে। কিন্তু তোমার ত ছিপ আছে। যাট্‌দাঁড়ী একখানি ছিপ দিয়া একরাত্রির মধ্যেই তাঁহাকে সাতগাঁএর রাজত্বটা পার করিয়া দাও। সেইখানে বসিয়া আমরা তোমাকে ঠিক শাস্ত্রসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং সুখসাধ্য পরামর্শ দিব। আমরাও কিছুদিন ভাবি।"

ভবদেব আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আচ্ছা,—তোমরা বলিতে পার, বিক্রমণিপুরের সেই রাজার ছেলেটা কোথায় গেল? আমার রাজারও সেই জন্য বড় চিন্তা, আমারও একটু চিন্তা আছে। রাজাকে মারিয়া ত দেশটা দখল করিয়াছি। কিন্তু রাজার ছেলেটা গেল কোথায়?"

"ঠাকুর, আমি ফাঁকা ফাঁকা শুনিয়াছি,—সেটা সঙ্ঘে গিয়াছে। কোন্ সঙ্ঘে—তা ত ঠিক বলিতে পারি না। লুই সিদ্ধার এক চেলা আছে। রূপা রাজা তাহাকে বড়ই মানে। সে দেখিতেও ঠিক রাজ-পুত্রের মত, খুব পণ্ডিত, খুব বুদ্ধিমান্।"

ভবদেব একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা' হবে,—তা' হবে।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা—বিহারী, বল দেখি, তোমার অবর্ত্তমানে তুমি তোমার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করিতে চাও?"

"ঠাকুরের যে রায় হইবে, আমার রায়ও তাই। আপনারা যাহা বলিবেন, আমি নিঃসঙ্কোচে ও নিঃসন্দেহে তাহাই করিব। সধর্ম্মীরা একেই ত ভণ্ড ও লম্পট। তা'র উপর লুই সিদ্ধার যে দল হইয়াছে, তাহারা বেশ্যাবৃত্তিকেও হারাইয়া দিয়াছে। তাহারা যে বেণেদের এত বড় দু'টা সম্পত্তি খাইবে, এটা আমি একেবারেই সহিতে পারিব না! আপনারা বলেন ত আমি সমস্ত সম্পত্তি নারায়ণে সমর্পণ করিয়া দিয়া যাইব। আপনারা বলেন ত দুধের সাধ ঘোলে মিটাইব—দু'টি বেণের ছেলেকে পোষ্যপুত্র লইব। তাহাদের হাতেই দু'টি সম্পত্তি তুলিয়া দিয়া যাইব।"

ভবদেব। না,—আমরাও তোমাকে ভণ্ড-লম্পটদের হাতে সম্পত্তি দিতে দিব না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

মহাবিহারের সব প্রতিষ্ঠা-কর্ম্ম শেষ হইয়া গেল। লুইসিদ্ধা আপন শিষ্যের হাতে মহাবিহারের সব ভার দিয়া প্রায় সমস্ত কীর্ত্তনীয়ার দল লইয়া প্রস্থান করিলেন। অধিকাংশ খোল-করতাল আর খঞ্জনী-ওয়ালা তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল। তিনি দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সহজ-ধর্ম্ম ও মহাসুখবাদের মর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দল খুব বাড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহার ডাক হইতে লাগিল। তিব্বত, পেগু, আরাকানেও তাঁহার দল পুষ্ট হইতে লাগিল। গুরুপুত্রের জন্য কেবল ২।৪ জন ভাল ভাল কীর্ত্তনীয়া মহাবিহারে রহিয়া গেল। তাহারা রোজ রোজ গুরুপুত্রকে বৈকালে কীর্ত্তন শুনাইতে আসিত। তাঁহার অবসরমত তিনি শুনিতেন।

গুরু চলিয়া গেলে গুরুপুত্র কিছু ফাঁফরে পড়িলেন। তিনি নিজেই কর্ত্তা, তাঁহার হুকুম সকলেই মানে। রাজা তাঁহার কাছে যোড়হস্ত। অথচ তাঁহার নিজের কোন বিষয়েই কোন জ্ঞান নাই। কি করিলে কি হয়, তিনি তাহা বুঝেনই না। অথচ তাঁহার পড়াশুনা আছে।

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্ ॥

এ কথা তাঁহার বেশ জানা আছে। যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব আপনা আপনি আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাতে তাঁহার নিজের কোনই হাত ছিল না। সুতরাং অবিবেকিতাটা যাহাতে না আসিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার বেশ যত্ন আছে। তিনি বরং কোন কার্য্য না করেন, সেও ভাল; কিন্তু হঠাৎ কোন কাজ করিয়া বিবেচনার ত্রুটি দেখাইবেন না। তাঁহার আরও মুস্কিল হইয়াছে, তাঁহাকে পরামর্শ দিবার লোক নাই। এক গুরু ছিলেন, তিনি দেশান্তরে। আর যাহারা আছেন, তাঁহাদের গুরু তিনি। তিনি তাহাদিগকে চালাইবেন, তাহারা তাঁহাকে চালাইতে পারে না। গুরুপুত্রটি খুব স্থির, খুব ধীর, নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, অনেক পোড় খাইয়া, অনেক দিন সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া, তিনি বেশ আত্মসংযম করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহাকে হঠাৎ ধরিয়া ফেলিতে পারে, এমন লোক অতি বিরল, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কথা মনে হইলে বড়ই কষ্ট হইত। কি ছিলাম, কি হইলাম, ভাবিয়া তিনি অধীর হইতেন। অতি নির্জ্জনে—অতি গোপনে কেহ কেহ তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেও দেখিয়াছে। তাঁহার গোপনে আরও এক ভাবনা,—সে সেই হাতীর উপরে মেয়েটির মুখখানি। যদিও বিষাদভরা, তথাপি তাহাতে এমন মোহ ছিল যে, গুরুপুত্র আজও তাহা ভুলিতে পারেন নাই। হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়, তাহার তলায় সে ছবিখানি গুরুপুত্র সর্ব্বদাই দেখিতে পান; কিন্তু নিজে সন্ন্যাসী, ও-সকল কথা তাঁহার ভাবিতেই নাই। তিনিও ভুলিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন কৈ? তার মুখখানি ভাবা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এক একবার ভাবেন, "ভাবিই না, ও তো আর কেহ দেখিতে পাইবে না, আপনার মনে আপনিই ভাবিব, তাহাতে দোষ কি?" আবার ভাবেন, "ভাবিতে ভাবিতে যদি আকার-ইঙ্গিতে আর কেহ টের পায়, আমি কি ভাবিতেছি, তাহা হইলে ত ফাঁক হইয়া পড়িবে।"

যাহা হউক, গুরুপুত্র খুব সংযমী। মনের ভাব, মনের কথা বেশ গোপন রাখিয়া গেলেন। পরে শুনিলেন, মেয়েটি বিধবা হইয়াছে। আর সেই সময়ে তিনি বোধিসত্ত্ব-দীক্ষা সমাপন করিয়া বজ্রাচার্য্য-দীক্ষা লইয়াছেন। সহজ-ধর্ম্মে তাঁহার প্রবেশলাভ হইয়াছে, সেটা তাঁহার গুরুর কৃপায়। সহজ-ধর্ম্মের অনেক চর্য্যা তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, সৌগত মতের নির্ব্বাণ—বুদ্ধত্বলাভ—সব বৃথা। নির্ব্বাণ যদি শূন্য হয়, সে ত পাথর হওয়া অপেক্ষাও খারাপ। সুখ-দুঃখ-বোধ থাকিবে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু থাকিবে না, এমন কি, কোন বুদ্ধিও থাকিবে না। সে শূন্য কাহাকেও মজাইতে পারে না।

২

শূন্যের উপর যদি বিজ্ঞান মান, সে আবার কি? সে কেবল শূন্য বুঝাইয়া দিবার জন্য—ভয়ানক অন্ধকারকে আরও ভয়ানক করিয়া দেখাইয়া দিবার জন্য। শূন্য বুঝিয়া কি হইবে? তাহাতে আমার কি? শুনিলাম সবই শূন্য, বুঝিলাম সবই শূন্য, হৃদয়ঙ্গম হইল সবই শূন্য। লাভ কি, আমি আছি শূন্য হইয়া, তুমি আছ শূন্য হইয়া—এ কথাও বলা যায় না; কারণ, জগৎ অদ্বয়,—আমি তুমি দুই-ই নাই, তুমিও শূন্য, আমিও শূন্য, অথচ আমরা দুই নই। আমিই শূন্য, তুমিই শূন্য, দুই শূন্য। শূন্য থেকে শূন্য পৃথক্ করা যায় না। সুতরাং সব এক—কেবল বুঝি সব শূন্য,—এ অবস্থাটা বড়ই খারাপ; —বড়ই ভয়ের কারণ। তাই আধুনিক আচার্য্যেরা একটি নূতন কথা আনিয়াছেন,—সেটা মহা-সুখবাদ।

গুরু চলিয়া গেলে গুরুপুত্রের চর্য্যা খুব কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, এত লোক আমায় দেখিয়া, আমার উপদেশ লইয়া শিখিবে, সুতরাং আমার খুব সাবধান হইতে হইবে। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠেন। তাঁহার ঘরটি বেশ পরিষ্কার, কিন্তু তাঁহার শয্যায় কিছুই আড়ম্বর নাই। উঠিয়া আবশ্যক কার্য্য সমাধা করিয়া, তিনি গঙ্গাস্নানে যান। আগে আগে মহাবিহারের পূর্ব্বদিকের ফটক দিয়া সহজেই গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন। এখন কিন্তু উত্তর-ফটক দিয়া বাহির হন, আর ধর্ম্মপুরের পুরান বিহারের ধার দিয়া পূর্ব্বমুখে যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরিয়া, যেখানে বেণেদের অনেক গোলা আছে, সেইখানে যাইয়া স্নান করেন। সঙ্গে কেহ প্রায় থাকে না। অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তরমুখ হইয়া গুরুপুত্র কি দেখিবার জন্য চাহিয়া থাকেন, তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডুব দিয়া চলিয়া আসেন। সেখানে অনেক-গুলা গোলা। সব বেণেদের। বড় বড় গোলা। দুই গোলার মাঝখানে প্রায় একটি গলি। গুরুপুত্র যে কোন্ দিন কোন্ গলি দিয়া, কোন্ ঘাটে যান, তাহার স্থিরতা থাকে না। স্থির কেবল এক জিনিস,—সেই দীর্ঘনিশ্বাসটি।

৩

স্নান করিয়া আসিয়া গুরুপুত্র প্রথমেই যুগনদ্ধ মূর্ত্তি হেরুকের মন্দিরে যান, সেখানে স্বহস্তে ধূপ জ্বালেন, দীপ জ্বালেন, ফুল দেন, মালা দেন, প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্তব পাঠ করেন। তখন তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত গীতধ্বনির ন্যায় স্তবের ধ্বনিতে লোক মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর দণ্ডবৎ হইয়া হেরুককে প্রণাম করেন। তাহার পর শাক্য মুনির প্রতিমার কাছে স্তব পাঠ করেন। এইরূপে পূজা শেষ করিয়া পাঠে বসেন; সে পাঠ তাঁহার নিজের জন্য, পরের উপদেশের জন্য নহে। হয় নাটমন্দিরে, না হয় দোতলার বারান্দায়, না হয় নিজের ঘরের মধ্যেই বসিয়া পাঠ করেন, অনেক সময় পাঠ করিতে করিতে বারান্দায় পাইচারি করেন। তাঁহার শোবার ঘরে এক কোণে একখানা চৌকির উপর কতকগুলি তালপাতার পুথি সাজান থাকে, পুথিগুলি খুব ভাল ছোবান রেশমের কাপড়ে বাঁধান, আর রেশমের দড়ি দিয়া বাঁধা। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন তিনি বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিলেন। পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও পাইচারী করিতে লাগিলেন,—একটু অস্ফুট, সুতরাং অত্যন্ত মনোহর স্বরে পড়িতে লাগিলেন।—

জয়তি সুখরাজ এষ কারণরহিতঃ সদোদিতো জগতাং
যস্য চ নিগদনসময়ে বচনদরিদ্রো বভূব সর্ব্বজ্ঞঃ।

ঠিক কথা—এই সুখরাজই সারবস্তু, সর্ব্বজ্ঞ এ সুখরাজের কথা বলিতে গিয়া বচন-দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ তাঁহার কথা বাহির হইল না। এ কথা ঠিক, শাক্যসিংহ এ কথা বলেন নাই; তাঁহার এরূপ ধারণাই ছিল না। তিনি জন্ম-জরা-মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার হইবার জন্যই চেষ্টা করিতেন। তাহার পর কি হইবে, সে কথা তাঁহার ভাবনার অতীত ছিল। তাই তাঁহার নিন্দা না করিয়া গ্রন্থকার বলিলেন, "বচনদরিদ্রো বভূব সর্ব্বজ্ঞঃ", এই যে মহাসুখ-বাদ, ইহাতে পরকাল সত্যই মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। অদ্বয় হইলাম, শূন্য হইলাম, শূন্য বুঝিলাম, আমিও শূন্য—বুঝিলাম; কিন্তু যখন বুঝিলাম, সেই শূন্য মহাসুখময়,—তখন শূন্যটাও যেন ভরা ভরা হইয়া উঠিল। শূন্যের শূন্যত্ব, শুষ্কত্ব শেষ হইয়া গেল। মহা-উৎসাহে দ্বিগুণ মনের বেগে সহজ ধর্ম্মের চর্য্যায় নিযুক্ত হইলাম। শূন্যতা তখন দেবী, আমি তখন ভৈরব, আমরা দুজনে এক হইয়া শুদ্ধ যুগনদ্ধ অবস্থায় নহে,—লবণে ও জলে যেমন এক হইয়া যায়, তেমনি শূন্যে ও আমায় এক হইয়া গিয়া, মহাসুখে অনন্তকাল রহিলাম। এই মহাসুখময় ধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে?

৪

গুরুপুত্র এইরূপ ভাবিতেছেন, আর তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া পাইচারি করিতেছেন। হঠাৎ সেই মুখখানি, সেই বিষাদমাখা মুখখানি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। পা-চালি ধীর হইয়া পড়িল। তিনি ভাবিলেন, "এ মুখ আমার মনে পড়ে কেন? আর মনে পড়িলেই এত আনন্দ হয় কেন? আনন্দ না হইলেই বা সে মুখখানি দেখিবার জন্য এত অধীর হই কেন? এত দীর্ঘনিশ্বাস কেন? ইহাকেই কি আচার্য্যেরা বলিয়াছেন স্বসংবেদ্য সুখ—যে সুখ নিজেই বুঝা যায়, অপরকে বুঝান যায় না। এই সুখ, এই ধ্যানই কি তবে মহা-সুখ-সমাধির আরম্ভ? এই সুখকে 'বিগলিত-বেদ্যান্তর আনন্দ' বলে,—যে আনন্দ উঠিলে আর কোন বস্তুর জ্ঞান থাকে না। এ আনন্দ উদয় হইলে বোধ হয় যেন, ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া যায়, চক্ষু বল, কর্ণ বল, জিহ্বা বল, ত্বক্ বল—সব আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে। অধোদেশে বল, ঊর্দ্ধদেশে বল, কেবল আনন্দ—কেবল আনন্দ—কেবল আনন্দ। আচ্ছা—মন দিয়া যখন আমরা কাব্য পড়ি বা নাটক দেখি বা গান শুনি, তখনও এইরূপ বিমল, বিশুদ্ধ, স্বসংবেদ্য, 'বিগলিত-বেদ্যান্তর' আনন্দের উদয় হয়। তবে কেন আমি এই মুখখানিকেই কাব্য করি না? এই মুখখানিকেই নাটক করি না? এই মুখখানিকেই গানের তাললয় করি না? কাজ কি সে আসল মুখে? যে মুখ আমার হৃদয়ে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি কেন মহা-সুখসমাধিতে ডুবিয়া যাই না? তাই ঠিক। আমি সেই মুখই ভাবিব, সেই মুখই ধ্যান করিব, সেই মুখখানি লইয়াই থাকিব। আমি আর বেণেদের গোলার ঘাটে যাইব না। আর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িব না। যাহা চাই, তাহা আমার নিজেরই কাছে আছে। কেন পরের জিনিসে লোভ করি? কেন তাহাকে দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল হই?" গুরুপুত্র যে এইভাবে কতক্ষণ রহিলেন, বলিতে পারি না।

৫

তারাপুকুরের রাজবাড়ীর একটি নির্জ্জন কুঠারীতে রূপা রাজা বসিয়া আছে। সামনে সাধুগুপ্ত

ও শ্রীফলবজ্র—গোপনে তাঁহাদের কি একটা পরামর্শ চলিতেছে—ভারি গোপন ; কুঠারীর সব দরজা বন্ধ।

শ্রীফল। মেয়েটাকে সঙ্গে আনিতেই হইবে। ঐ মেয়েকে আনিতে পারিলে, মহাবিহার বড়মানুষ হইয়া যাইবে। ভিখারিণীরা এত চেষ্টা করিতেছে—তাহারা ত পারে নাই। বরং কথাটা একটু ফাঁস হইয়া গিয়াছে। সেটা ভাল হয় নাই। এখন কিরূপে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় ?

সাধুগুপ্ত। বলপ্রয়োগ।

শ্রীফল। তাহাতে হইবে না। বিহারী দত্ত বেশ সতর্ক হইয়াছে। এখনও বিহারী একাই একশ। বলপ্রয়োগে মহা অনিষ্ট হইবে। কৌশল চাই। কিন্তু সে কিরূপ কৌশল ?

রাজা। আপনারা সম্পত্তিটা হাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমার কিন্তু সে মেয়েটিতে আর একটি প্রয়োজন আছে। তারই জন্য আমাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

সাধুগুপ্ত। (আগ্রহের সহিত) আপনার আবার কি প্রয়োজন ?

রাজা। প্রয়োজন আমার নিজের নাই, সহজ ধর্ম্মের। গুরুদেব আমায় বার বার বলিয়াছেন—"এই ছেলেটি হইতেই সহজ-ধর্ম্মের চরম উন্নতি হইবে। সেই সহজ-ধর্ম্মের ঠিক মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে ও সহজ-সমাধিতে সিদ্ধ হইবে।" কিন্তু সে যোগে একটি যোগিনী চাই। আর আমার বোধ হয়, বিহারী দত্তের মেয়েই আমার গুরুপুত্রের উপযুক্ত যোগিনী। উহাকে তাঁহার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই।

শ্রীফল। তাহা হইলে মহারাজেরও যে কথা, আমাদেরও সেই কথা—মেয়েটাকে সঙ্গে আনা। তাহা হইলে আপনি যে বড় কথা বলিতেছেন, তাহাও হইবে ; আর আমরাও যে সামান্য অর্থের কথা ভাবিতেছি, তাহাও হইবে। কি কৌশলে তাহাকে আনা যায় ?

৬

তাঁহাদের কি পরামর্শ স্থির হইল, কেহই জানিল না। রাজারাজড়ার বাড়ীতে গোপনে পরামর্শ—কার সাধ্য জানিতে পারে ! বিশেষ সেকালে মন্ত্রগুপ্তির বড়ই আদর ছিল। কিন্তু রাজা ঘন ঘন মহাবিহারে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। গুরুপুত্রকে তিনি যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার ভক্তির মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিল। আহারাদির পর যখন গুরুপুত্র উপদেশ দিতে বসিতেন, রাজা প্রায়ই সে সময় উপস্থিত থাকিতেন ও মনোযোগের সহিত সে উপদেশ শুনিতেন। প্রায়ই বড় বড় লোক তিনি সঙ্গে লইয়া আসিতেন এবং যাহাতে গুরুপুত্রের উপর তাহাদেরও ভক্তি হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। বেণেদের অনেককেই তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাঁহাদেরও মধ্যে অনেকেই গুরুপুত্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া আসিত। বাগ্দীদের মধ্যে অনেক বড় লোক রাজার প্রিয় হইবার জন্য গুরুপুত্রের কাছে দীক্ষাও গ্রহণ করিল। বিদেশ হইতে কোন বড় লোক আসিলে, রাজা তাহাকে গুরুপুত্রের উপদেশ শুনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন ও নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন। গুরুপুত্র কোন ভাল কথা বলিলে, লোকের মুখে মুখে যাহাতে তাহার বহুদূর প্রচার হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। মোট কথা, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে তাঁহার গুরুপুত্রের পসার ও প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া উঠে।

একে ত গুরুপুত্রের রূপ আছে, গুণ আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, তপ আছে, জপ আছে, পূজা আছে, ক্ষান্তি আছে, ধ্যান আছে, বীর্য্য আছে, প্রজ্ঞা আছে, পাঠ আছে, শীল আছে, বিনয় আছে, স্মৃতিশক্তি আছে, বক্তৃতাশক্তি আছে, তাহার উপর তিনি বড় মানুষ, পঞ্চাশখানি গ্রামের উপস্বত্ব তিনি পান, তাহার উপর পূজাপার্ব্বণে প্রণামী পান, পালি-পার্ব্বণেও যথেষ্ট আয় আছে। তিনি নিজের জন্য কিছু খরচ করেন না। তাঁহার টাকা নিরন্নকে অন্নদানে খরচ হয়, বিবস্ত্রকে বস্ত্রদানে খরচ হয়, রোগীর চিকিৎসায় খরচ হয়। তিনি অনাথের নাথ, পুত্রহীনের পুত্র, মাতৃহীনের মাতা, পিতৃহীনের পিতা, তাঁহার মিষ্ট কথায় রোগীদের রোগ-শান্তি হয়, ভীতের ভয়শান্তি হয়, পাপীর পাপশান্তি হয়। যাহার সংসারে কোন শান্তিও নাই, সেও যদি একবার দণ্ড তাঁহার কাছে বসে, তাহার সব শান্তি আসিয়া যায়। গুরুপুত্রের পসার-প্রতিপত্তি যত বাড়িতে লাগিল, তাঁহার স্বভাবও ততই সুন্দর হইতে লাগিল, উপদেশও গভীর হইতে লাগিল। রাজারও তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ততই বাড়িতে লাগিল ; শেষ এমনি দাঁড়াইল, যেন রাজাই তিনি, রাজা তাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্যমাত্র। রাজার কিন্তু এখনও ধারণা, যোগিনী না থাকিলে গুরুপুত্র সিদ্ধ হইবেন না, আর সে যোগিনী ঐ বিহারী দত্তের বিধবা কন্যা মায়া। গুরুপুত্র নিজের মনের তলায় যে মন, তাহাতে মায়াকে মহামায়া করিয়া তুলিতেছেন ;

কিন্তু রাজা মায়াকে যোগিনী করিবার চেষ্টায় আছেন।

কিছুদিন পরে সহরে গোল উঠিল যে, এক জন মস্করী আসিয়াছেন। তিনি ছবি দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া গান করিয়া বেড়ান। তাঁহার বেশের ঠিক নাই। কখনও সন্ন্যাসীর বেশ, কখনও রাজার বেশ, কখনও ব্রাহ্মণের বেশ, কখনও চণ্ডালের বেশ, কখনও পাগলের বেশ, কখনও ডাকাতের বেশ। কিন্তু যখন যে বেশেই থাকুন, তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, তাঁহার গলা অতি মিষ্ট, গান গাহিলে বীণা হারিয়া যায়। তাঁহার কথাও বড় মিষ্ট। তিনি থাকেন কোথা, কেহ জানে না। কোন দিন তাঁহাকে ধরমপুরের পুরান বিহারে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন দিন মহাবিহারেও দেখা যায়। তিনি বেণেদের গোলায়ও কখন কখন উদয় হন। কখন কখন ব্রাহ্মণপল্লীতেও উদয় হন। কিন্তু কোনও না কোন ছবি তাঁহার হাতে থাকেই। মানুষের ছবিই বেশী, বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বের ছবিও আছে, তবে কম। কখন কখন কালী-দুর্গার ছবিও থাকে। তাঁহার হাতে ছবি দেখায় ভাল। সময়ে সময়ে মনে হয়, যেন ছবির সত্য সত্যই প্রাণ আছে। সে সব ছবি কে লেখে, জানা যায় না। কিন্তু পাকা চিত্রকরের হাতের ছবিও বুঝি এত ভাল হয় না। সাতগাঁয়ে সব জায়গায়ই মস্করীকে দেখা যায়।

এক দিন জীবন ধনীর গোলায় সে ছবি দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। এক দাসী গিয়া মায়াকে বলিল, মস্করী ছবি দেখাইয়া ভিক্ষা করিতেছে। মায়া ছবি দেখিতে আসিল। সে দিন মস্করীর হাতে সাতগাঁয়ের এক ব্রাহ্মণের ছবি ছিল। মায়া ব্রাহ্মণকে চিনিত। ছবি সে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। দেখিল, ব্রাহ্মণ যেন কথা কহিতে যাইতেছে। মস্করীর উপর মায়ার বড় ভক্তি হইল। মায়া তাহাকে বাবার ছবি দেখাইতে বলিল। দুই তিন দিন পরে মস্করী বিহারী দত্তের ছবি আনিল। বিহারী সমুদ্র হইতে আসিয়া গোলায় উঠিতেছে। ঠিক সেই অবস্থার ছবি। ছবি দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। ঠিক হুবহু বিহারী দত্তের ছবি। যেন নৌকা হইতে নামিয়া গোলার দুয়ারের দিকে যাইতেছে। একটি পা উঠিয়াছে আর একটি নড়িতেছে।

মায়া একা থাকে, সর্ব্বদাই এক জিনিস ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া যায়। এবারও তাহার মনে হইল—মস্করী নাই, ছবি নাই। গোলার দরজায় সে আর তার বাবা। কতক্ষণ এইভাবে থাকিল। তাহার পর মায়ার যেন সব ফিরিয়া আসিল। তখন সে লজ্জিত হইল। মস্করী বলিল, "আচ্ছা—আমি আর এক দিন তোমায় আর এক ছবি দেখাইব।"

এবার সে জীবন ধনীর ছবি আনিল। তীর-ধনুক লইয়া জীবন বাঘ মারিয়া বেড়াইতেছে—সেই ছবি দেখাই। সেই দীর্ঘাকার ছোকরা, আঠার বছর বৈ বয়স নয়। বুক চটাল, বড় বড় চোখ, চওড়া কপাল। মায়া দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল; আকার-ইঙ্গিতে তাহাকে সমুদ্রের ধারের সেই ছবি দেখাইতে বলিল—যে ভাবে জীবন বাঘের মুখ হইতে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। সে আর এক দিন সে ছবিও দেখাইল। মস্করীর উপর মায়ার খুব ভক্তি হইল, খুব বিশ্বাস হইল। সে মায়াকে বলিল, "যে ছবি তুমি রোজ ধ্যান কর, সেই ছবিখানি যদি আমায় দিতে পার, তা হ'লে আমি তাহাতে প্রাণ দিয়া দিতে পারি।"

নবম পরিচ্ছেদ

এক দিন রাত্রে গঙ্গার দু-ধারের লোক চকিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড ঝপ্‌ঝপ্ শব্দ শুনিতে পাইল। শব্দ শুনিতে শুনিতে কোথায় মিশাইয়া গেল,—দক্ষিণ হইতে আসিল, উত্তরদিকে গেল, এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিল। কি শব্দ, কে শব্দ করিল, কিছুই বুঝা গেল না। পরদিন সকালে সকল গাঁয়ের লোকই শব্দের কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু কেন, কি বৃত্তান্ত—কেহই বলিতে পারিল না। এক জন বলিল, ছিপ—ছিপ। অনেক দাঁড়ের ছিপ। আর এক জন বলিল—না না, কোন জানোয়ার জলের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আর এক জন বলিল—না হে না, ঘূর্ণী জল; চলিতে চলিতে শব্দটি মিলাইয়া গেল দেখিলে না। ছিপ হইলে শব্দটা থাকিত না? একেবারে কি কখন ছিপের শব্দ বন্ধ হয়? আমরা কিন্তু জানি, শব্দটি ছিপেরই। যেখানে সরস্বতী গঙ্গায় পড়িয়াছে, তাহারও দক্ষিণ হইতে, অর্থাৎ সাতগাঁর রাজার এলাকার বাহির হইতে ছিপ আসিয়া এক রাত্রের মধ্যেই সাতগাঁ রাজ্যটা পার হইয়া বিক্রমণিপুরের পাশে দেবগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। ছিপে

ছিল আমাদের পুরান বন্ধু শ্রীধর ভূরি। তিনি গাঞ্জী পাণ্ডুদাসের প্রতিনিধি হইয়া দেবগ্রাম যাইতেছিলেন। আগে বিক্রমণিপুর, তাহার পর দেবগ্রাম। ছিপ গিয়া দেবগ্রামে পৌছিল, শ্রীধর ঘাটে নামিলেন। একদল আধা-বয়সী ছাত্র আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। গা-খানি নূতন বসান, গঙ্গায় একটা বাঁওড় পড়িয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বে দেবগ্রাম। বিক্রমণিপুরের ভাঙ্গা বাড়ীগুলা ভাঙ্গিয়া তাহারই মালমসলা দিয়া কতক পরিমাণে দেবগ্রাম বসান। সুতরাং মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি সরস্বতীমূর্ত্তি বলিয়া পূজা হইতে লাগিল। লোকেশ্বরের মূর্ত্তি সূর্য্যমূর্ত্তি বলিয়া পূজা হইতে লাগিল। বাওড়ের নাম হইল দীঘি। অনেক ব্রাহ্মণের বাস হইল। আগে যেমন হইত, এক গ্রামে একই গোত্রের ব্রাহ্মণ—এখানে তাহা হইল না। নানা গোত্রের ব্রাহ্মণ একত্র বাস করিতে লাগিল। গাঞ্জী আর গ্রামের কর্ত্তা নহেন, গ্রামের কর্ত্তা স্বয়ং শ্রীভবদেব শর্ম্মা সিদ্ধল। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহারই আশ্রিত, তাই মিশ্র মহাশয়কে তিনি একটি প্রকাণ্ড চৌবাড়ী করিয়া দিয়াছেন। অসংখ্য ছাত্র চৌবাড়ীতে পাঠ করে।

ছাত্রেরা খুব আদর করিয়া শ্রীধরকে চৌবাড়ীতে লইয়া গেল। চৌবাড়ীর চারিদিকে চারিখানি টোল-ঘর। টোল-ঘরগুলির দাওয়া খুব উচ্চ—প্রায় তিন হাত হইবে। প্রত্যেক টোল ঘরে প্রায় ৫০টি করিয়া দরজা আছে। দুই দরজার মাঝখানে পিলপা। যে দেয়ালে দরজা আছে, তাহার বিপরীত দিকের দেয়ালে একটিও জানালা বা দরজা নাই। দরজার ঠিক সামনেই একটি একটি কুলঙ্গীমাত্র; কুলঙ্গীর নীচে মেঝেতে এক একটি উনান কাটা। যেখানে পিলপা, ঘরের মাঝে সেইখানেই এক একটি বেদী—প্রায় এক হাত উঁচু। বেদীর উপর দুইটি বিছানা হইতে পারে। এক এক বিছানায় এক একটি ছাত্র বাস করে। তাহারা মেঝের উনানে রাঁধে, কুলঙ্গীতে হাঁড়ী রাখে, বেদীতে শোয়; আড়ায় চালি দেওয়া আছে, তাহাতে আপন আপন জিনিসপত্র, পুথিপাজী, কাপড়-চোপড়, চাল-ডাল রাখে। প্রায় সমস্ত দিনই দাওয়ায় বসিয়া তাহারা পড়ে, অথবা চণ্ডীমণ্ডপ বা আটচালায় থাকে, রান্নার সময় এবং শোবার সময় ঘরের ভিতর আসে। রান্নাও যাহাদের পরস্পর ভোজ্যান্নতা আছে, তাহারা এক এক জনে পালা করিয়া রাঁধে, আর সকলে একত্র খায়। যাহার অন্যের সহিত ভোজ্যান্নতা নাই, সে নিজেই রাঁধে। অধ্যাপক চাউল আর কাঠ জোগান, অন্য সামগ্রী তাহারা নিজেই সংগ্রহ করে। অধ্যাপক আরও যোগান এক এক জন পেটেলী, অর্থাৎ পাট করিবার জন্য চাকরাণী। সে উনান গোবর দেয়, ঘর নিকায়, উনান ধরাইয়া দেয়। ছাত্রেরা আপনার কাপড় আপনি কাচে। শরীর অসুস্থ হইলে, পেটেলী সে কাজটাও করিয়া দেয়।

বাচস্পতি মিশ্রের চৌবাড়ীতে এইরূপ চারি পোতায় চারিখানি টোল-ঘর আছে। মাঝখানটা একটা প্রকাণ্ড উঠান। তাহার ঠিক মাঝখানে একখানা বারদুয়ারী আটচালা। তাহাতেই বসিয়া অধ্যাপক পাঠ দেন। এক এক পাঠে দশ বারোটি, কখন কখন ৫০টি ছাত্রও বসে। পুরান ছাত্রেরা বারদুয়ারীর দাওয়ায় বসিয়া নূতন ছাত্রদের পাঠ দেয়, অথবা নিজে বসিয়া পুথি দেখে। চৌবাড়ীতে প্রায় ৪০০ ছাত্রের স্থান আছে। ইহা ছাড়াও ভদ্রলোকের বাড়ীতে অনেকে স্থান পাইয়াছে। ছাত্রদের স্থান দেওয়া খরচ যোগান, বেণেরা নিত্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করে। সুতরাং দেবগ্রাম একটা প্রকাণ্ড বিদ্যাস্থান হইয়া দাড়াইয়াছে।

শ্রীধর উপস্থিত হইলে বাচস্পতি উঠিয়া দাড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পড়ুয়াদের শিষ্টাদধ্যায় হইল। অনেকে হো হো করিয়া বেড়াইতে লাগিল; অনেকে শ্রীধরের সেবায় নিযুক্ত হইল; অনেকে তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিয়া তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীধরও কাহারও বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ বলিয়া, কাহারও বেশ পড়াশুনা আছে বলিয়া, কাহারও বাক্‌চাতুর্য্য বেশ আছে বলিয়া, খুসি করিয়া দিতে লাগিলেন।

৩

এইরূপে দুই তিন দিন গেলে মহাসভার অধিষ্ঠান হইল। বাচস্পতি মিশ্রের চৌবাড়ীর বারদুয়ারী আটচালায় অধিষ্ঠান হইল। শ্রীধর যেমন বাচস্পতির অতিথি হইয়াছেন, অন্যান্য অধ্যাপকগণ তেমনি কেহ বা ভবদেবের, কেহ বা দেবগ্রামের কোন শুদ্ধ ব্রাহ্মণের অতিথি হইয়া আছেন। অধিষ্ঠানের দিন সকলে আসিয়া বারদুয়ারীতে বসিলেন। সভাপতি হইলেন ভবদেব। বাচস্পতির প্রধান ছাত্র ত্রিবিক্রম

প্রতিনিধি হইলেন। বিহারী দত্তের প্রধান কর্ম্মচারী দাওয়ায় বসিয়া তাঁহাকে সব কথা বলিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান কথা চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজে বেণেদের স্থান কোথায়? ত্রিবিক্রম সেই কথা পরিষদে নিবেদন করিলেন। পরিষদ্ বিচার করিতে বসিলেন। প্রথম কথা—তাহারা সদাচারী কি না? চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজে তাহাদের স্থান হইতে পারে কি না? তাহারা দশবিধ সংস্কারে শুদ্ধ হয় কি না? সে সকল কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইল, ত্রিবিক্রমকে অনেকবার বাহিরে আসিয়া বিহারীর লোকের নিকট হইতে খবর লইয়া যাইতে হইল। স্থির হইল, তাহারা সদাচারী বটে, তাহারা দশবিধ সংস্কারও লয়। কেহ কেহ দশবারই সংস্কারের উদ্যোগ করে। কেহ কেহ বা অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও বিবাহের সময় অন্যান্য সংস্কার লইয়া দশ সংখ্যা পূরণ করে। এক জন বলিলেন, উঁহারা বোধমার্গী কি না? তাহাতে আপত্তি করিয়া ভবদেব বলিলেন, সে কথা আমাদের শুনার কিছুই দরকার নাই। সম্প্রদায়ভেদের কথা এ সভায় উঠিতেই পারে না। বৌদ্ধভিক্ষু বাড়ী আসিলে আমরাও ভিক্ষা দিয়া থাকি, বেণেরাও দেয়, তাহাতে ক্ষতি কি? প্রসিদ্ধ বৌদ্ধযোগী বাড়ী আসিলে তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করা সবারই উচিত আর মানতের কথা—রোগী, আর্ত্ত, পীড়িত সকল লোকের কাছে, সকল দেবতার কাছেই শান্তির আশা করিতে পারে। তাহাতে তাহাদের সমাজের কোনও ক্ষতি হয় না। আসল কথা, গৃহ্যসূত্রোক্ত সংস্কারের। সেগুলি রীতিমত হইলেই চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজে সে স্থান পাইবে। এক জন আপত্তি করিয়া বলিলেন, এখন অনেক পাষণ্ডমতাবলম্বীরাও তাদের মনের মত এক রকম সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাতে ভবদেব বলিলেন, গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধানে সংস্কার হওয়া চাই। প্রতিনিধি বাহিরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সংস্কার করায় কে? উত্তর হইল ব্রাহ্মণে। তখন বেণেদের চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজে স্থান আছে, ঠিক হইয়া গেল।

৪

এখন কথা হইল, তাহারা কোন্ বর্ণ? এইবার ঘোর বাদানুবাদ চলিল। ত্রিবিক্রম বার বার গাথাঘর (গ্রন্থাগার) হইতে পুঁথি আনিয়া খুলিয়া পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে লাগিলেন। এক জন বলিলেন,—"নন্দান্তাঃ ক্ষত্রিয়াঃ" ক্ষত্রিয়েরই লোপ হইয়াছে। বৈশ্যের ত লোপ হয় নাই। বেণেরা বৈশ্যবৃত্তি করে, সুতরাং তাহারা বৈশ্যই। বৈশ্য হইলে সে ত ত্রৈবর্ণিক হইবে। তাহার বেদে অধিকার থাকিবে। তাহাদের ত অনেক দিন বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ লোপ হইয়াছে। এখন তাহাদের বেদে অধিকার দিতে হইলে বড়ই মুস্কিলের কথা। তাহাদের বাড়ীতে সকল ব্রাহ্মণকেই অন্ততঃ ফলাহার করিতে হইবে। তখন ত্রিবিক্রম মহা ফাঁফরে পড়িলেন, রাশি রাশি পুঁথি আনিতে লাগিলেন, কিন্তু বচন পাওয়া যায় না। শেষ এক বচন বাহির হইল, "কলাবাদ্যন্তয়োঃ স্থিতিঃ" কলিতে আদি ও অন্ত্যবর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণ নাই। সুতরাং বিহারী দত্ত ও তাহার জাতিভাই সকলেই শূদ্র।

তাহার পর প্রশ্ন হইল, বিহারীর দেহান্তে তাহার ধন কে পাইবে? তাহার এমন কি নিকট সপিণ্ড-জ্ঞাতি নাই? তখন ভবদেব বলিলেন,—সে কথা আমি অনেক দিন স্থির করিয়া রাখিয়াছি, সে পোষ্যপুত্র লউক। তাহার একটি শ্যালক আছে, এখনও তাহার বিবাহ হয় নহে। সে সেইটিকেই পোষ্যপুত্র লউক।

"আর তাহার কন্যা?"

"সাধু ধনীর পুত্রবধূ? সেও ধনিবংশের কোন একটি ছেলেকে পোষ্যপুত্র লউক; ধনিবংশের ছেলের অভাব নাই।"

এই দুই কথায় সকলে সম্মত হইলেন। স্থির হইল, বেণেরা শূদ্র; বিহারী শালাকে পোষ্যপুত্র লউক, আর তাহার মেয়ে ধনিবংশের কোন ছেলেকে পোষ্যপুত্র লউক। ত্রিবিক্রম এই মর্ম্মে ব্যবস্থা লিখিয়া আনিল, সকলে স্বাক্ষর করিলেন। ব্যবস্থাপত্র লইয়া ত্রিবিক্রম বিহারীর কর্ম্মচারীর হস্তে দিল। কর্ম্মচারী তৌলবটস্বরূপ প্রত্যেক পারিষদকে হাজার করিয়া টাকা দিলেন, আর ত্রিবিক্রমকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন। সভাভঙ্গ হইল। অধ্যাপকগণ দুচার দিন নিমন্ত্রণ খাইয়া আপন আপন দেশে চলিয়া গেলেন। শ্রীধরের জন্য আবার ছিপের বন্দোবস্ত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

মঞ্জরী, তুমি করিলে কি?—তুমি কি যাদুবিদ্যা জান? তুমি যে মায়াকে বড়ই বশ করিয়াছ, সে যে

তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে—কখন্ তুমি আসিবে, কখন্ তুমি তাহার স্বামীর ছবি দেখাইবে। সে ছবি দেখিয়া সে যে শিহরিয়া উঠে,—তাহার ভ্রম হয়, স্বামী তাহার জীবিত। তুমি ছবি দেখাইয়া দেখাইয়া তাহার অতিপ্রিয় স্বামীর ছোট ছবিখানি আত্মসাৎ করিয়াছ। সে ছবি পাবার জন্য মায়া বড় ব্যস্ত। সে কখন সে ছবি হাতছাড়া করে নাই। তুমি কোন্ মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া তাহার অতি গোপনীয় ধন সে ছবিখানিও বাহির করিয়া লইয়াছ। সে ছবি লইয়া তুমি করিবে কি? আহা! সে তাহার প্রাণের প্রাণ, তাহাকে সেখানি ফিরাইয়া দাও। তাহা দিয়া তোমার কোনও কাজ হইবে না। কেন এত ভালবাসার জিনিসটি হইতে বেচারাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ? দাও দাও,—তাহার স্বামীর ছবি তাহাকে ফিরাইয়া দাও।

ও কি!—তুমি মায়াকে কি বলিতেছ? ঐ দেখ, সে কান খাড়া করিয়া শুনিতেছে। তুমি বলিতেছ, ওই ছবিখানা তুমি এক জন শিল্পীকে দিয়াছ। সে ঐ ছবি দেখিয়া একটি মূর্ত্তি গড়িবে, তুমি তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাকে কথা কহাইবে। তোমার এ কথায় আর ত কেহ বিশ্বাস করিবে না,—মানুষে না কি মরিয়া গেলে কথা কহে! মূর্ত্তিতে না কি প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়! প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে না কি মূর্ত্তি সজীব হয়! প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে সত্য, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে অনেক লোকে ভাবে, প্রতিমা সজীব হয়; প্রতিমা নড়ে, প্রতিমার ঘাম হইতে দেখা যায়, কিন্তু মানুষের মূর্ত্তির সেরূপ হয় কি? কখন ত এ কথা কেহ ভুলেও বলে না যে, মানুষের মূর্ত্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে সে কথা কহে, তাহা হইলে কত পুত্রহীন পিতা, কত পুত্রহীনা মাতা, কত বিধবা মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিত, কথা কহাইতে চেষ্টা করিত। লোকে যাই ভাবুক, মায়া তোমার কথায় খুব বিশ্বাস করিয়াছে, কিন্তু তাহার দেরী সহে না। তুমি তাহাকে পাগল করিয়াছ,—উন্মাদ করিয়াছ। সে চায়, এখনি তুমি তাহার স্বামীর মূর্ত্তি আনিয়া দাও,—এখনি তাহাকে কথা কহাও। তুমি যত দেরী করিতেছ, সে ততই ব্যাকুল হইতেছে। তুমি ক্রমে তাহাকে এমন বশ করিয়া ফেলিয়াছ যে, তুমি যাহা বলিবে, সে তাহাই করিবে, এবার তুমি কি বলিবে? বলিবে, যদি বিলম্ব না সহে, আমার সঙ্গে চল। যেখানে মূর্ত্তি গড়িতেছে, সেইখানে তোমায় লইয়া যাই, সেইখানেই তোমায় এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইব।

ও কি মায়া!—তুমিও যে রাজী! তুমি কুলকন্যা, কুলকামিনী, তোমার কি এই পরপুরুষের সঙ্গে যাওয়া উচিত? লোকে যে কলঙ্ক রটনা করিবে! তোমার যে ভারি নিন্দা হইবে। আমরা জানি, তুমি নির্দ্দোষ। তুমি স্বামীকে দেখিবার জন্যই যাইতেছ, কিন্তু দুষ্ট লোকে ত সে কথা শুনিবে না,—জানিবে না। তাহারা মনে করিবে ও বলিয়া বেড়াইবে,—যে কারণে অন্য পাঁচটা বালবিধবা ঘরের বাহির হইয়া যায়, তুমিও সেইরূপ যাইতেছ;—অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া কাজ কর। যাইতে হয়, বাবাকে জানাও, তাঁহার অনুমতি লও; মাকে জানাও, তাঁহার অনুমতি লও। তোমার সংসারে মান-মর্য্যাদা আছে, অর্থ সামর্থ্য আছে; উপযুক্ত সাজসজ্জা কর, লোক-জন সঙ্গে লও, তবে যাও। একলা যাইও না,—যাইও না।

এ কথায় মায়া রাজী নয়। বাবাকে বলিলে তিনি যাইতে দিবেন না। মাকে বলিলে তিনি যাইতে দিবেন না। সুতরাং সে স্থির করিল, তাহার নিজের ধাই-মা ও জীবন ধনীর ধাই-মা, এই দু'জনকে সে সঙ্গে লইয়া যাইবে। তাহাদের দু'জনের মায়া-অন্ত প্রাণ। মায়ার সঙ্গেই তাহারা থাকিবে। মায়ার মায়া তাহারা এড়াইতে পারিবে না,—তাহারা যাইবে। কাজ সারিতে বেশী দিন লাগিবে না। মায়া যে দিন বলিবে, সেই দিনই মস্করী তাহাকে তাহার বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া যাইবে। মস্করীর আচার-ব্যবহার আমরাও অনেক দিন জানি। সে কোনও কু-মৎলবে যে মায়াকে লইয়া যাইবে, তাহা ত বোধ হয় না। আর যদি তাই হইত, ধাই-মা দু'টাকে লইয়া যাইবে কেন? সুতরাং যে কু-মৎলবে মেয়ে-ছেলেকে ঘরের বাহির করে, এখানে সেটা নাই। অন্য কিছু আছে কি না, ভগবান্ জানেন।

এক দিন রাত্র দুপরের পর একখানা বড় নৌকা আসিয়া ধনীদের গোলার ঘাটে লাগিল। ধীরে ধীরে মায়া আসিয়া নৌকায় উঠিল। ধাই দু'জন নৌকায় উঠিল, মস্করী উঠিলেন, আরও দু-একটি লোক উঠিলেন, মায়ার দু-একটি বিশ্বাসী চাকরও উঠিল। দুই জন ধাই-ই জিজ্ঞাসা করিল,—কতদূর যাইতে হইবে? মস্করী বলিলেন, "দেখ মা—সাতগাঁয়ে ত বড় ঘন বসতি, ওখানে ত বড় কারখানা থাকিতেই পারে না। সাতগাঁ হইতে ২।৪ ক্রোশের মধ্যেই একখানি গাঁ আছে, সেখানে অনেক ভাল ভাল

কুমার আছে। তা'দের উপরই মূর্ত্তি গড়ার ভার দিয়াছি। গেলেই দেখিতে পাইবে, আমার কথা কতদূর সত্য।" সমস্ত রাত্রি বাহিয়া নৌকা গঙ্গা ত্যাগ করিয়া সরু একটা নদীর ভিতর ঢুকিল। ৫।৭ ক্রোশ বাহিয়া গিয়া সেই ছোট নদীটা দুই ফাঁক হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকের নদীটা সাতগাঁয়ের উত্তর সীমায়। আর একটি নদী—আরও উত্তরে গিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে, সেই নদী ধরিয়া নৌকা চলিল। নৌকায় আহারাদির সব ব্যবস্থা ছিল, কাহারও কোনও কষ্ট হইল না। সন্ধ্যার সময় নৌকা একটা গ্রামে উঠিল, সকলে নামিল। নিকটেই একটি বিষ্ণু-মন্দির ছিল। তাহার পাশেই একটি একতলা পরিষ্কার বাড়ীতে মায়ার বাসের স্থান দেওয়া হইল। মায়া দেখিল, নিকটেই একটা কুমারের কারখানা। তাহার জানালার নীচেই এক জন কুমার তাহার স্বামীর সেই ছবি সামনে রাখিয়া এঁটেলা মাটীতে মূর্ত্তি গড়িতেছে। মূর্ত্তিটি এ দিক্ ও দিক্ করিয়া ঘুরাইতেছে; ছবি দেখিতেছে, আর পাতলা বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়া এঁটেলা মাটী চাঁচিতেছে। কখনও বা চাঁচিতেছে, কখনও বা কোথাও মাটী দিতেছে, আবার চাঁচিতেছে। মূর্ত্তির দিকে বার বার চাহিতেছে। কখনও তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন হইতেছে; কখনও সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেছে। আবার চেঁচাড়ি ধরিতেছে, একবার ছবিখানি দেখিতেছে, আবার মাটীর মূর্ত্তির দিকে চাহিতেছে। এইরূপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সে কারখানার ঘরটি বন্ধ করিয়া ছবিখানি একটি বাক্সের মধ্যে পুরিয়া চলিয়া গেল।

জানালায় বসিয়া মায়া সব দেখিলেন। ধাই দেখিল, ধনীর ধাই দেখিল, তাহাদের বিশ্বাস হইল, মস্করী যাহা বলিয়াছিল, সব সত্য। সত্য-সত্যই মূর্ত্তি গড়া হইতেছে, সত্য-সত্যই মূর্ত্তিতে প্রাণ আসিবে, সত্য-সত্য মূর্ত্তি কথা কহিবে। ঘর হইতে চলিয়া আসায় তাহাদের মনের যে উদ্বেগ হইয়াছিল, দেখিয়া শুনিয়া তাহার অনেকটা দূর হইল।

পরদিন মায়া কুমারকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, সে যত শীঘ্র মূর্ত্তি করিয়া দিতে পারিবে, ততই তাহারা খুসী হইবে এবং তাহাকে বেশ দু-পয়সা বক্সীস্ দিবে। কুমার বলিল, "আমার যতদূর সাধ্য, আমি শীঘ্র শীঘ্রই করিব। কিন্তু এ সব ত কলের কাজ নয়। হাঁড়ী গড়া নয় যে চাকা ঘুরাইয়া দিলাম, আর হাঁড়ী গড়া হইল। কত যে ছোট ছোট জিনিস দেখিতে হয়, কত যে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কত যে চাঁচিতে হয়, তাহার ঠিকানা নাই। আর আমরা যে মূর্ত্তি গড়ি, কোনও জায়গায় যদি এতটুকুও দোষ থাকে, আমাদের ঘুম হয় না। যতক্ষণ মূর্ত্তিটি ঠিক না হয়, ততক্ষণ আমাদের ছাড়িয়া দিবার হুকুম নাই। প্রতিমা গড়াও সহজ, কেন না, তাহার মাপ আছে, অঙ্গপাত আছে, অনুপাত আছে। মানুষের মূর্ত্তিতে ত মাপ পাইবার যো নাই। তার পর যদি মানুষ দেখিয়া মূর্ত্তি গড়া হয়, সে একরকম হয়, যেমন দেখি, তেমনি গড়ি। এ ছবি দেখিয়া গড়া, এ আরও কঠিন। ছবিতে কেবল আড় ও দীর্ঘ আছে। মূর্ত্তির আবার একটা বেধ আছে। সেটা ছবি দেখিয়া ঠিক ঠিক পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের অনেক কষ্ট করিয়া সেটি অনুমান করিয়া লইতে হয়। তা মা, তুমি এখানে আছ, আমায় সময়ে সময়ে সাহায্য করিও। শুনিয়াছি, আমি যাঁহার ছবি গড়িতেছি, তিনি তোমার স্বামী। যদি সময়ে সময়ে মূর্ত্তিটি পরীক্ষা করিয়া আমায় উপদেশ দাও, কাজ একটু শীঘ্র হইতে পারে।" মায়া কিন্তু যতবার উপদেশ দিতে যান, ক্রমেই আরও দেরী হইয়া যায়। অনেক সময় কুমার তাহার কথার ভাব ঠিক বুঝিতে পারে না, উল্টা করিয়া ফেলে; আবার সেটা শোধরাইতে সময় যায়। এইরূপে মায়া স্বামীর মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে সাহায্য করুন, ওদিকে সাতগাঁয়ে কি হইতেছে, আমরা দেখিতে যাই।

৩

মায়ার চলিয়া যাইবার কথা দু-এক দিনের মধ্যেই সাতগাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ক'ড়ে রাঁড়ী বেরিয়ে গিয়েছে। অনেকেই বলিল, বৌদ্ধেরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা একটা খুব দাঁও পটিয়েছে, একবার ভিক্ষুণী সাজাইতে পারিলেই অনেক টাকাকড়ি, ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য হাতে আসিয়া পড়িবে। অধিকাংশ লোকই এই কথা বিশ্বাস করিল। যাহারা বৌদ্ধ নয়, তাহারা বৌদ্ধদের উপর ক্ষেপিয়া উঠিল। রাজা যে বৌদ্ধ, তাহা জানিয়া শুনিয়াও তাহারা বৌদ্ধদের গালাগালি দিতে বিরত হইল না; এবং তাহাদের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। যাহাদের দু'নৌকায় পা ছিল, অর্থাৎ কতক বৌদ্ধ ও কতক হিন্দু যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দুর দিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। সাতগাঁয় ঘোর আন্দোলন,—যেখানে যাও, ঐ কথা।

বৌদ্ধরা টাকার লোভে বিহারী দত্তের মেয়েটাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিহারী দত্তের লোক এখনও দেবগ্রাম থেকে ফিরে নাই। ইহারই মধ্যে এই ঘটনা! বিহারী তাঁহার সমস্ত নৌকা সজ্জিত করিলেন ও তাহাদিগকে সাতগাঁয়ের সীমানায় হুকুমের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সব বেণেরাই বিহারীর মত করিতে লাগিল। দুই তিন দিনের মধ্যে অত যে সাতগাঁয়ে নৌকা ছিল, সব যে কোথায় গেল, কেহই বলিতে পারিল না। পূর্ব্বে নাউপালা, উত্তরে অম্বিকা, দক্ষিণে সরস্বতী-সঙ্গম,—এই সব জায়গায় বেণেদের নৌকা জড় হইতে লাগিল, আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ হইতে লাগিল, গোলায় পণ্টন বসিল। সাতগাঁয় বাজার-হাট বন্ধ হইল। বেগোছ দেখিয়া অনেক লোক সাতগাঁ ছাড়িয়া পলাইল। রাজাও চুপ করিয়া রহিলেন না। রোজ বাগ্দীদের কুচকাওয়াজ হইতে লাগিল। তীরধনু তলওয়ার রাশি রাশি তৈয়ারি হইতে লাগিল। ঠন্ ঠন্ শব্দে সাতগাঁ পুরিয়া গেল। অধিকাংশের ধারণা, বৌদ্ধেরা চুরি করিয়াছে, রাজাও এর ভিতর আছেন। তাঁহার পরিষদ্, সভাসদ্ সবাই জানে। কেহ বলিল, রাজার এই ব্যবহার! গৃহস্থ ঝি-বৌ লইয়া ঘর করিতে পারিবে না! রাজা প্রচার করিয়া দিলেন, বৌদ্ধেরা এ কাজ করে নাই, মেয়েটাই পলাইয়াছে। বৌদ্ধেরা কেহই তাহার বাড়ীর দিকে যায় নাই—প্রায় দুই বৎসর। এ কাজ বৌদ্ধদের নহে। কিন্তু কে শুনে? লোকের মনে একটা ধারণা হইয়া গেলে তাহা দূর করা বড় শক্ত। রাজা যতই বৌদ্ধদের নির্দ্দোষ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, লোকে বলিতে লাগিল,—"ঠাকুরঘরে কে রে?" "আমি ত কলা খাই নি!" প্রজা-বিরাগ বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাতে বেণেদের নৌকা না থাকায় বিদেশী জিনিস কিছুই পাওয়া যায় না। জিনিস-পত্র দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। প্রজা-বিরাগ আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তবে হাহাকার পড়িল না, কারণ, ধান-পান সকলেরই ছিল, গোলা-মরাই সকলেরই ছিল, পেটের ভাতটায় আর কাটি পড়ে নাই।

কেহ বলিল, মায়াকে মহাবিহারে লুকাইয়া রাখিয়াছে। গুরুপুত্রের অনেক দিন ধরিয়া মেয়েটার উপর ঝোঁক ছিল, এ তারই কাজ। গুরুপুত্র এই কথার সূচনা শুনিয়া বিহারী দত্তকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমরা আসিয়া সমস্ত মহাবিহার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া যদি তোমার মেয়েকে পাও, তৎক্ষণাৎ লইয়া যাও। আর আমার কথায় যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আমি বলিতেছি,—মহাবিহারের লোকে এ কাজের জন্য দায়ী নহে।" তিনি স্বয়ং বিহারীর বাড়ী গিয়া তাহাকে এ কথা বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রাজা বুঝাইয়া দিলেন,—সেটা নীতিসঙ্গত হইবে না। বিহারী তাঁহাকে আটক করিতে পারে,—অপমান করিতে পারে। গুরুপুত্র বলিলেন,—"ভিখারীর আবার মান-অপমান কি? একটা প্রলয়ের সূচনা দেখিতেছি। যত শীঘ্র মিটিয়া যায়, ততই ভাল।" কিন্তু রাজার কথা এবার তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইল। তিনি গেলেন না, কিন্তু বিহারীকে স্বয়ং বা লোক দ্বারা মহাবিহার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে অনুমতি দিলেন। যে ভয়ে রাজা গুরুপুত্রকে যাইতে দিলেন না, বিহারীর বন্ধুবান্ধবেরা ঠিক সেই কারণেই বিহারীকে মহাবিহারে যাইতে দিল না। উভয় পক্ষই উত্তেজিত হইয়া রহিল। এমন কি, যুদ্ধের উদ্যোগই চলিতে লাগিল।

৪

সাতগাঁয়ে ত এইরূপ প্রজার বিরাগ হইল, রাজার উপরও রাগ হইল, সধর্ম্মীদের উপরও রাগ হইল। মাঝে মাঝে ঝগড়া-মারামারিও হইতে লাগিল। বাহিরে কি হইল,—সকলেই ছিছি করিতে লাগিল। ছেলেমেয়ে চুরির জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ হইবে বলিতে লাগিল। শত শত লোকে বিহারীর বাড়ী আসিয়া, বিহারীকে পত্র লিখিয়া জানাইতে লাগিল যে, তাহারাও তাঁহার দুঃখে দুঃখী, তাঁহার ব্যথায় ব্যথী; কেহই ত ছেলেমেয়ে লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে পারিবে না। চুরি করিলেই সঙ্ঘের লাভ, তাহারা উত্তরাধিকার পাইবে। সুতরাং এ পাপ সঙ্ঘ যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহাই করিতে হইবে। কেবল এক জন জ্যোতিষী, তাঁহার নাম জোগ্লোক, তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"বিহারী, তোমার ভয় নাই;—ইহার ফল বড় ভাল হইবে। তোমার বিশেষ চিন্তার কোনও কারণ নাই।"

হরিবর্ম্মার রাজসভায় এ কথা উঠিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারী কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?" ভবদেব বলিলেন, "তিনি দশবিধ সংস্কার করেন, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করেন, তিনি হিন্দু, জাতিতে বৈশ্য হইলেও এখন খাঁটি শূদ্র।" তখন হরিবর্ম্মা বলিলেন, "তবে ত উহাকে সাহায্য করা আমাদের আবশ্যক। বাগ্দী রাজা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিবে, আমরা সহ্য করিতে পারিব না।" ভবদেব

বলিলেন, "সে কথা সত্য বটে। কিন্তু বাগ্দীরা বড় রণবঙ্কা। উহাদের সংখ্যাও দশ পনর হাজার —ভয়ানক যোদ্ধা!"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উহার নৌকা কত আছে?"

"জানি না। তবে সাতগাঁয়ে বেশী নৌকা বেণেদের। তাহারা সব সরাইয়া ফেলিয়াছে এবং যাহাও আছে, তাহাও সরাইবে।"

"আমাদের সাতগাঁয়ে যাবার রাস্তা—?"

"জলপথে ত আমরা সব জায়গা দিয়াই যাইতে পারি। স্থলপথে যমুনার ধার দিয়া, বিক্রমণিপুর হইতে গঙ্গার ধার দিয়া যাইতে পারি। আর উৎকল হইতেও আসিতে পারি। কাঁকড়া অনেকগুলা দাড়া দিয়া জন্তু-জানোয়ার ধরে, আমরাও তেমনি করিয়া চারিদিক্ হইতে সাতগাঁকে ধরিতে পারি।"

"মাঝে দক্ষিণ-রাঢ়ের শূর রাজা কি করিবে?"

"কি আর করিবে? মহারাজও যে দিকে যাইবেন, তিনিও সেই দিকে যাইবেন। তিনি বহু বিষয়ে আপনার নিকট উপকৃত, আপনার মিত্রতায় মুগ্ধ এবং আপনার একান্ত অনুরাগী। বিধর্ম্মীদের উপর আপনার যেমন রাগ, তাঁহারও তেমনি। আপনি না থাকিলে বাগ্দীরা তাঁহারও ছোট রাজ্যটি গ্রাস করিয়া ফেলিত।"

"আপাততঃ কোনও কথায় কাজ নাই, কেবল নৌকাগুলাকে সাজাইয়া সাতগাঁ রাজ্যের পাশে পাশে রাখিয়া দাও। পরে দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় মরে।"

দক্ষিণ রাঢ়েও এ কথা প্রচার হইলে, রাজা রণশূর তন্ন তন্ন করিয়া সব খবর লইলেন এবং হিন্দুদের সাহায্য করাই উচিত বোধ করিলেন। তিনি ভুরসুটের বামুনদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—গঙ্গার উপর, বিশেষ ঠিক্ ত্রিবেণীতে একটা বাগ্দী,—তায় বিধর্ম্মী রাজা থাকে, সেটা ঠিক্ নহে। যেরূপ হউক, উহার বিনাশসাধন করিতেই হইবে।

মহীপাল যখন শুনিলেন, সাতগাঁয়ের বিহারী দত্তের মেয়েকে সধর্ম্মীরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তিনি যে বিশেষ খুসী হইলেন, তাহা নহে, বলিলেন,— "এরূপ বোকামীটা এখন না করিলেই হইত। নূতন রাজা, নূতন রাজ্য, এখন কি এত বড় একটা লোককে চটাতে আছে! ওর মোকাম সব দেশে আছে, সব রাজার সঙ্গে ওর কারবার আছে। এক মুহূর্ত্তে বিহারী অনর্থ বাধাইয়া তুলিতে পারে। কাজটা নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। যাই হোক, আমাকে বাগ্দী রাজার দিকেই থাকিতে হইবে এবং বিশেষ উদ্যোগও করিতে হইবে।"

সাতগাঁয়ে এক দিন মন্ত্রণাগৃহে বসিয়া নিভৃতে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সাতগেঁয়ের উপর মামদোবাজী করিল,—এ মস্করীটা কে হে? ওটাকে ত আমরাই লাগাইয়াছিলাম। মেয়েটাকে লইয়া হয় কোন বিহারে, না হয়, তারাপুকুরে আনিবে। কিন্তু সে এ কি করিল?—মেয়েটাকে লইয়া সে কোথায় চলিয়া গেল? ভাগ্যিস্ মস্করীর কথাটা লোকে বড় জানে না, নহিলে আমরাও হাতে নাতে ধরা পড়িতাম। শ্রীফলবজ্র, তুমিই না উহাকে আমার কাছে আনিয়াছিলে?"

"হাঁ মহারাজ, আমিই উহাকে আনিয়াছিলাম। লোকটা তৈয়ার বলিয়াই আনিয়াছিলাম। এখন দেখছি, আমাদের উপর এক কাটি! লোকটা বিহারে বিহারে বেড়াইত, রাত্রে বিহারেই থাকিত, সাজসজ্জা বিহারেই করিত। আমরা জানিতাম, আমাদেরই লোক।"

"কোথায় খাইত বল দেখি?"

"কোনও দিন খাইতে দেখি নাই।"

"আমার সন্দেহ হয়, ওটা বামুনদের চর।"

সাধুগুপ্ত বলিলেন,—"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, আমারও সেই সন্দেহই হইতেছে। কোনও দিন উহাকে কোথাও খাইতে দেখি নাই। তাতে বোধ হচ্ছে বেটা বামুন। কিন্তু বামুনরা মেয়েটাকে নিয়া কি করিবে?"

রাজা। বামুন বেটারা বড় ঝুনো, মেয়েটাকে তারা এখন লুকিয়ে রাখিবে, লোকেরা সন্দেহ করিবে আমাদের উপর। প্রজারা চটিবে আমাদের উপর, আর সধর্ম্মীর উপর। এমন একটা ব'ড়ের চালে কিস্তিমাৎ কখন কি কেহ শুনিয়াছে? যাই হোক, এখন ভিখারিণীদের বলিয়া দেও, তাহারা সাতগাঁয়ের সব জায়গায় ঘুরিয়া মস্করীর সন্ধান লউক। 'সে কার বাড়ী খাইত?' 'কে তাহাকে আশ্রয় দিত?'. 'কেমন করিয়া সে মেয়েটাকে সরাইল?' এ সব খবর পেলে কোন না কোন উপায় করা যাইতে পারিবে। আর যদি চরমেই দাঁড়ায়, রাজা মহীপালের কাছে লোক পাঠান যাক, তাঁহাকে বলা যাক, তিনি যেন দরকার হ'লে আমাদের পক্ষে দাঁড়ান। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, বোধ হয়, বাঙ্গালায় শুভাজু আর দেবভাজুতে শীঘ্রই লড়াই হইবে। সব শুভাজুরা এক না হইলে রক্ষা নাই, সদ্ধর্ম বাঙ্গালা হইতে লোপ হইবে।" আবার একটু ভাবিয়া বলিতে

লাগিলেন;—"অজ্ঞাতকুলশীল লোকের উপর গুরুতর কাজের ভার দিয়া কি অন্যায়ই হইয়া গিয়াছে। শ্রীফলবজ্র, তুমি যে এত কাঁচা, তাহা আমি জানিতাম না। লোকটার পূর্ব্বাপর কোন সংবাদ না জানিয়া তাহাকে লাগান ভালই হয় নাই। অথবা গতস্য শোচনা নাস্তি। আচ্ছা, শ্রীফল, তুমি উহাকে কোথায় প্রথম দেখিয়াছিলে?"

শ্রীফল বলিল—"আজ্ঞে, তাহা আমার ঠিক মনে হয় না। তবে ধরমপুর সঙ্ঘারামেই প্রথম দেখি মনে হইতেছে। ও যে গৃহী, সন্ন্যাসী নয়, সে কথা আমার এখনও মনে লইতেছে না। ছবি হাতে করিয়া ভিক্ষা করিত, সব জায়গায় যাইত।"

শ্রীফলের কথায় রাজা বেশ একটু চটিলেন,—কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। সভা ভঙ্গ করিয়া দিয়া একলা পাইচারী করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন—"বামুনদের লোক,—তা হ'লে সে সাতগাঁয় নাই, সাতগাঁয়ের বাহিরে রহিয়াছে ও মেয়েটাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। শ্রীফল ত লুই-সিদ্ধার দলের উপর চটা; ওই এ কাণ্ডটা বাধায় নাই ত? কিন্তু ঘরের ভিতর আর বিবাদ বাধাইবার সময় নাই। ওর ত বিহারেই জন্ম, বিহারেই কর্ম্ম, বিহারেই লেখাপড়া শিখিয়াছে, পণ্ডিত হইয়াছে। রাজনীতির কোনও ধারই ধারে না। লোকটা নির্ব্বোধও বটে। যাই হোক, এখন যা দেখিতেছি, যুদ্ধ হইবেই। বেণেগুলাকে আটক করা যাক।" বলিয়া কোটালকে ডাকিয়া বেণেদের উপর বেশ নজর রাখিতে বলিলেন,—সে বলিল, "মহারাজ, বিহারী দত্ত ত সাতগাঁয় নাই। সে দুই তিন দিন হইল, কোথায় চলিয়া গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে, দেবগ্রামে যাইব।"

রাজা। বিহারী দেবগ্রামে গিয়াছে,—সেটা ভবদেবের রাজ্য না? কি সর্ব্বনাশ! তবে ত আর ভাবিবার অবসর নাই। আচ্ছা কোটাল, তুমি বাকী বেণেদের উপর নজর রাখ। তাহারা যেন খাবার সামগ্রী সরাইয়া না লইয়া যায়।

"বেণেদের নৌকা সব চলিয়া গিয়াছে, আর আসিতেছে না, যাহা লইবার লইয়া গিয়াছে। আর আসিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, আমি সেটা বেশ দেখিতেছি।"

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কোটালকে কয়েকটি হুকুম দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মায়ার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না; মস্করীর কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না; ধাইদের কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না। খুঁজিতে উভয় পক্ষের কেহই ত্রুটি করিল না। বিহারীও চারিদিকে লোক লাগাইল। রূপা রাজাও চারিদিকে লোক লাগাইল। তাহারা ডাঙ্গা দিয়া গেল কি জল দিয়া গেল, তাহাই ঠিক হইল না। পাল্কীতে গেল, কি ডুলীতে গেল, কি নৌকায় গেল, কিছু স্থির হইল না। যে নৌকায় তাহারা যায়, মস্করী সে নৌকা দূরদেশ হইতে অমনি অমনি ঐখান হইতেই দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে। সাতগাঁয়ের লোকের সাধ্য কি, তাহার কোন সন্ধান পায়। মায়া বেশ মনের আনন্দে আছে। মূর্ত্তি তৈয়ার হইলেই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। মূর্ত্তি নড়িবে-চড়িবে, কথা কহিবে। সে ক্রমাগত দেখিতেছে,—মূর্ত্তিটি দেখিতে ক্রমেই তাহার স্বামীর মত হইতেছে। তাহারও মনে বেশ ফূর্ত্তি হইতেছে। সে বাপ-মা, সাতগাঁ, গোলা সব ভুলিয়া গিয়াছে। ঐ এক চিন্তায়ই সে মগ্ন আছে।

কিন্তু তার জন্য সারা বাঙ্গালা তোলপাড় হইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সব ক্ষেপিয়াছে। প্রলয়কাণ্ড হইবেই হইবে। কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। গুরুপুত্র মিটাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজা মিটামিটির বিরোধী। গুরুপুত্র বিরক্ত, ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মাহত। লুই-সিদ্ধার এখন খবর নাই। তিনি যে কোথায় আছেন, কেহ জানে না। তবে তিনি বাঙ্গালায় নাই। রাজারা সব এক এক দিকে যোগ দিয়াছে; হিন্দুরা হিন্দুর দিকে, বৌদ্ধেরা বৌদ্ধের দিকে। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্রই হিন্দুর পক্ষে; নানা শান্তি, নানা স্বস্ত্যয়ন, নানা উপায়, নানা চেষ্টা করিতেছেন; সাম, দান, ভেদ, দণ্ড সকল রকমেই পরামর্শ দিতেছেন; সময়ে সময়ে যুদ্ধের জন্যও সজ্জিত হইতেছেন; ব্যূহ-রচনা অভ্যাস করিতেছেন; যুদ্ধ-বিদ্যার পুস্তক পড়িতেছেন; মহাদেবের ধনুর্ব্বিদ্যা, বিক্রমাদিত্যের ধনুর্ব্বিদ্যা, চতুরঙ্গবলবিদ্যা পাঠ করিতেছেন। কিসে সধর্ম্মের বিনাশ হয়, তাহার জন্য তাঁহারা প্রাণপণে লাগিয়াছেন। নিজে অস্ত্র-বিদ্যাও অভ্যাস করিতেছেন, দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে শিখিতেছেন। বিহারওয়ালারা সব বৌদ্ধদের পক্ষে, কিন্তু তাহাদের ঘরে ঘরে ঐক্য নাই। আসল মহাযানীরা ত আর

সকলকেই উপেক্ষা করে। মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান সব আপন আপন উন্নতিই খোঁজে। সকলে এক হওয়ার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তবে এবার ব্রাহ্মণ প্রবল, সকল বৌদ্ধেরই সামাল সামাল পড়িয়া গিয়াছে ; সুতরাং মনের দ্বেষ মনেই চাপিয়া সকলে কতকটা পরস্পরের সাহায্য করিতেছেন। তার মধ্যে আবার রূপা রাজা একেবারে ভয়ানক সহজপন্থী, অন্য পন্থা তাঁহার ভালই লাগে না। যা হোক, এবার যেন সব সধর্ম্মী এক হইয়া উঠিয়াছে।

তারাপুকুরে যুদ্ধসভা বসিয়াছে। রাজা বলিতেছেন,—"এই যে বেণেদের বিদ্রোহ, আমি সে বিষয়ে নিরপরাধ। কে যে বিহারী দত্তের মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু সকলেই আমাদের উপর দোষ চাপাইতেছে, আর আমার দেশটা লণ্ড-ভণ্ড করার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা যখন দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে, নৌকা, কিস্তী, মালপত্র সব সরাইয়াছে, তখন আর তাহাদের সঙ্গে মিটামিটির সম্ভাবনা নাই। আমাদের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে।"

বাগ্দী সেনাপতি বলিলেন,—"মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আত্মরক্ষার জন্য আমরা সততই প্রস্তুত ; কিন্তু দেখুন, আমরা নিরপরাধ। তাহারাই অত্যাচার করিতে প্রস্তুত ; সুতরাং আমাদের উচিত যুদ্ধে আত্মরক্ষা না করিয়া, অগ্রসর হইয়া আমরা শত্রুর দেশ আক্রমণ করি।"

রাজা। কিন্তু কে শত্রু, কে মিত্র, এখনও ত সে কথা জানা যায় না।

সেনাপতি। মহারাজ, হিন্দুই শত্রু, বৌদ্ধই মিত্র, এই মনে করিয়া, আসুন আমরা হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করি। হরিবর্ম্মা বড় রাজা ; তিনি বেঙ নদীর ধারে তাঁবু গাড়িয়া বসিয়া আছেন। আসুন, আমরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিই। তিনি গেলেই হিন্দুদের দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে।

অনেক বাদানুবাদের পর তাহাই সিদ্ধান্ত হইল। রাজা পাঁচ হাজার বাগ্দী লইয়া তারাপুকুর রক্ষা করিবেন। সেনাপতি দশ হাজার বাগ্দী লইয়া বেঙ নদীর দিকে যাইবেন। প্রান্তপালগণ প্রান্ত-দুর্গ সজাগ হইয়া রক্ষা করিবেন।

বাগ্দীরা অন্য জাতিকে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য রূপা রাজার সেনায় কেবল বাগ্দী ; বাগ্দীর সংখ্যাও খুব বেশী, দরকার হইলে এক লক্ষ বাগ্দী যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারে। রাজা হুকুম দিলেন, "সব বাগ্দী সাজ।" বাগ্দীরা কেবল লড়ে। কিন্তু রাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি দেখা ডোমদের কাজ, আর ঘোড়সওয়ারও ডোম। দশ হাজার বাগ্দী সাজিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার ডোমও সাজিল। তাহারা আগে গিয়া রাস্তা দেখিতেও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল, ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল—

আগডোম বাগডোম ঘোঁড়াডোম সাজে
ডাল মৃগল ঘাঘর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো সাড়া,
সাড়া গেল বামনপাড়া।

ডোমদের সাড়া বামনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে সাড়া ক্রমে হরিবর্ম্মার তাঁবুতে পৌঁছিল। তাঁহার লোকের—চরের অভাব ছিল না। তিনি চর পাঠাইলেন ; শুনিলেন,—দশ হাজার বাছা বাছা বাগ্দী-যোদ্ধা ও পাঁচ হাজার ডোম লইয়া রূপা রাজার সেনাপতি মেঘা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি জনকতক বিশ্বাসী লোককে বৌদ্ধ ভিক্ষু সাজাইলেন। তাহারা মেঘার তাঁবুতে ভিক্ষা করিতে গেল। মেঘা তাহাদের পাইয়া আহ্লাদে আটখানা। তাহাদের সেতো করিয়া লইলেন, অর্থাৎ তাহারা তাঁহাকে গুপ্ত পথ দিয়া বেঙ নদীর তাঁবুতে পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু মস্করীর ব্যাপারের পর, বাগ্দীরা আর কাহাকেও বিশ্বাস করে না। সুতরাং মেঘাও এই ভিক্ষুদের উপর দুজন বাগ্দীকে চর লাগাইয়া দিলেন। দুই তিন দিনের পর তাহারা খবর দিল যে, এরা ভিক্ষু নয়, ও পক্ষের চর। মেঘা আর কিছু না বলিয়া এক দিন ভোরে তাহাদের ডাকাইয়া বলিয়া দিল, "তোমরা এই দণ্ডেই যদি আমার তাঁবু ত্যাগ করিয়া না যাও, তোমাদের আটক করিব ও বধ করিব।" তাহারা ভয় পাইল না ; বরং ঝগড়া করিতে লাগিল। মেঘা তখন শূল আনাইল, তাহাদের শূলে চড়াইব বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল এবং তাহাদের বাসা-ঘর, কাপড়-চোপড় ঝাড়া দিতে লাগিল। দিতে দিতে দেখা গেল যে, তাহারা ভিক্ষু নহে। তাহারা ভিক্ষুর কাচ কাচিয়াছে মাত্র ; তখন তাহাদের আটক করিয়া কয়েকজন চতুর রক্ষী সৈন্যের অধীনে সাতগাঁয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

মেঘা মনে করিয়াছিল, হঠাৎ আক্রমণ করিয়া

হরিবর্ম্মার ছাউনি ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবে; কিন্তু সে শুনিল, তিনি সব খবর রাখেন, আর বেশ প্রস্তুতও আছেন। তখন বাগ্দীরা তাঁহার দেশ লুঠিতে লাগিল। প্রজারা গিয়া হরিবর্ম্মাকে জানাইল। হরিবর্ম্মা ভৈরব নদীর ধারে আসিয়া তাহাদের সামনা হইলেন। আর ভৈরব নদী দিয়া অনেক নৌকা আসিয়া ক্রমাগত লোক নামাইতে লাগিল। মেঘা বেগোছ দেখিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিতে লাগিল এবং পিছনে যাহা কিছু পাইল, ধ্বংস করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু সকল নদীতেই হরিবর্ম্মার নৌকা আর বেণেদের নৌকা। নৌকায় কেবল লোক আর অস্ত্র-শস্ত্র। নদী পার হওয়া মেঘার পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু বাগ্দীদের সাহস অসীম, তাহাদের সম্মুখে কেহ আসিতে সাহস করে না,—এলেই সর্ব্বনাশ। এক একবার তাহারা তাড়াইয়া যায়, আর হিন্দুদের কিছু সৈন্য ক্ষয় করিয়া দেয়। যাহা হউক, তাহারা ক্রমে আসিয়া যমুনার ধারে দাঁড়াইল। হিন্দুরাও সেইখানে দাঁড়াইল। কেহই কাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না। মেঘা রূপা-রাজাকে আরও সৈন্য পাঠাইতে লিখিতে লাগিল। সৈন্যও আসিতে লাগিল। একটা ঘোরতর যুদ্ধ হইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বাগ্দীদের নৌকা বেণেদের নৌকা তাড়াইতে লাগিল। বেণেরা তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। বাগ্দীরা অনেক খাবার পাইল এবং সেগুলা ডাঙ্গায় তুলিয়া তাঁবুর মধ্যে আনিয়া ফেলিল। কেন না, তাহারা ঠিক জানিত, হরি বর্ম্মার নৌকা আসিয়া জুটলে তাহারা হারিয়া যাইবে;—হইলও তাহাই। হরিবর্ম্মার নৌকা আসিলে নাউপালা হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে বাগ্দীরা মহাতেজে তাহাদের আক্রমণ করিল। তাহারা হরিবর্ম্মার অনেক নৌকা ডুবাইল, অনেক ক্ষতি করিল; কিন্তু দুই তিন দিনের পর হারিয়া পলাইয়া গেল ও নাউপালায় যাইয়া আরও নৌকা সংগ্রহ করিতে লাগিল এবং সাতগাঁর সীমানায় না আসে, তার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। ডাঙ্গায় যুদ্ধের আগে অন্য জায়গায় কি হইতেছে, তাহার খবর লওয়া যাক্।

ও দিকে মহীপাল উত্তর-রাঢ় হইতে ৫০০০এর অধিক সৈন্য পাঠাইতে পারিলেন না; কারণ, কাশীরও অনেক পশ্চিমে তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি যে সৈন্য পাঠাইলেন, তাহাও নূতন, তাহাদের শিক্ষাও ভাল হয় নাই। এ দিকে দক্ষিণ-রাঢ়ের রণশূর রাজা বাউরি, শুকলি, কোল প্রভৃতি জঙ্গলা জাতি লইয়া প্রকাণ্ড একদল সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি সেই সৈন্য লইয়া উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ়ের সন্ধিস্থলে যোগাদ্যার মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করিতেছিলেন। উত্তর-রাঢ়ের সৈন্য নিকটে আসিয়া পৌঁছিলে, তিনি অতর্কিতভাবে উহাদের আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। উত্তর হইতে তখন আর কোনও ভয় রহিল না। তখন ত্বরিত-গতিতে তিনি খড়ী নদী ও বল্লুকা নদী পার হইয়া পড়িলেন। নারিকেলডাঙ্গায় মনসা-মন্দিরের নিকট বাগ্দীরা তাঁহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল;—কিন্তু হটিয়া গেল। মানাদের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রণশূর জয়লাভ করিলেও আর আগাইয়া যাইতে পারিল না। কারণ, বাগ্দীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, আর ক্রমেই তাহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে বিষ্ণুপুরের বাগ্দী রাজা যদি রণশূরের রাজ্য আক্রমণ করেন, তবে সাতগাঁ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজা নাবালক, আর তাঁহার অভিভাবকগণ আপনাপন লাভের চেষ্টায় আছেন। সাতগাঁয়ের সাহায্য করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। রণশূর এই সময়ে এক চাল চালিলেন। তিনি পশ্চিমমুখে গিয়া দামোদর-ধারে পৌঁছিলেন। বাগ্দীরা তাড়া করিয়া আসিল। তাহারা বেশী লোক আনে নাই। তিনি অনায়াসে তাহাদিগকে সমূলে নিপাত করিলেন। বাগ্দীরা কিন্তু মানাদের সব সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। কারণ, ওদিকে নাউপালার খবর ভাল নহে। বরং রাজা পশ্চিম হইতে সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া তারাপুকুর রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। রণশূর যখন দেখিলেন, বাগ্দীরা চারি পাঁচ দিন আর আক্রমণ করিল না, তখন তিনি অগ্রসর হইলেন এবং ক্রমে আসিয়া তারাপুকুরের উত্তর কুন্তী-নদীর উত্তরে তাম্বু গাড়িলেন। নদী পার হওয়া বিষম কঠিন। কারণ, ওপারে বাগ্দীদের অগণিত সেনা, রূপা-রাজা নিজে ও মেঘা দুর্গ রক্ষা করিতেছে। হরিবর্ম্মা কিন্তু এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই। বাগ্দীরা হারিয়া আসিলেও তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে আর নৌকা ও লোক না আসিলে, তিনি আর আসিতে পারিতেছেন না। এই সময়ে উড়িষ্যার বেশ শান্তি ছিল। ভুবনেশ্বরে হরিবর্ম্মার যে সৈন্য ছিল, তাহারা আসিয়া সহসা রণশূরের সঙ্গে যোগ দিল। রণশূর কুন্তী পার হইলেন এবং

তারাপুকুরের উত্তর দ্বার অবরোধ করিয়া তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন;—চেষ্টা বিফল হইল। শেষে বারুদ দিয়া রণশূর দ্বার উড়াইয়া দিলেন। দ্বার চাপা পড়িয়া রূপা-রাজা মারা গেল। মেঘা তখন তারাপুকুর ছাড়িয়া সাতগাঁ রক্ষা করিতে গেল। যেখানে প্রজাবিদ্রোহ, সে জায়গা রক্ষা করা দায়। সে পারিল না। রণশূর অনায়াসেই সাতগাঁ দখল করিলেন। মেঘা তখন মহাবিহারে আশ্রয় লইল।

মেঘা দুই তিন মাস ধরিয়া সদর্পে মহাবিহার রক্ষা করিল। রণশূর ধরমপুর বিহার অধিকার করিয়া, তাহার চারিদিকে তাম্বু গাড়িয়া, উত্তর-দ্বার আটকাইয়া বসিয়া রহিলেন; কিন্তু সে খাই পার হইতে পারিলেন না। দুই তিন মাসের পর হরিবর্ম্মা যখন সদলবলে গঙ্গা বহিয়া পূর্ব্ব-দ্বার আটকাইলেন, তখন মেঘা মহাবিহার শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া বিষ্ণুপুর প্রস্থান করিল। গুরুপুত্র মহাবিহারের চাবি হরিবর্ম্মার হাতে দিলেন। হরিবর্ম্মা প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, ভবদেব তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মস্থানে কোন অত্যাচার না হয়, সেটা আপনার দেখা উচিত। আপনি জানেন, আপনার পনর-আনা প্রজা বৌদ্ধ। এটা তাহাদের ধর্ম্মস্থান। চাবি গুরুপুত্রের হাতে ফিরাইয়া দিন। গুরুপুত্র এতদিন রূপা-রাজার রাজ্যে বিহারের অধিকারী ছিলেন; এখন তিনি আপনার রাজ্যে বিহারের অধিকারী; বিহারের ভার তাঁহার হাতে যেমন ছিল, তেমনি থাকুক।"

এ দিকে মায়া সব ভুলিয়া জীবন ধনীর যে মূর্ত্তি তৈয়ার হইতেছে, তাই দেখিতে লাগিল ও তাহাতেই তন্ময় হইয়া রহিল। ক্রমে পক্ষ মাস অতীত হইয়া গেল, মূর্ত্তি ঠিক জীবন ধনীর জীবন্ত মূর্ত্তির মত দেখাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার গায়ে রঙ দেওয়া হইল। রঙটি ঠিক জীবন ধনীর যে রঙ ছিল,—তাই। কেমন করিয়া কুমার সে রঙ ফলাইল, সেই ত চমৎকার। মায়াও বলিল, "এই রঙ", ধাইরাও বলিল, "এই রঙ"। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হইতে একটু মাট রঙ। যখন রঙ ফলান হইল, চুল বসান হইল, মূর্ত্তি ঠিক হইল, তখন উহাতে ঘাম-তেল দেওয়া হইল। মূর্ত্তি যেন ঘামিয়াছে।

এক দিন মস্করী আসিলেন। মস্করী বেশ ত্যাগ করিলেন; দেখা গেল, তিনি এক জন বেশ সুপুরুষ। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে। শরীর বিলক্ষণ সবল ও হৃষ্টপুষ্ট। তিনি ব্রাহ্মণ, গলায় পৈতার গোছা ধব-ধব করিতেছে। পুরুষটি একটু দীর্ঘচ্ছন্দ। গোঁফ-দাড়ী একেবারে কামান। তাঁহার সঙ্গে আর এক জন আসিয়াছেন,—তাঁহার বয়স আরও অধিক। মাথায় একগাছিও কাল চুল নাই। শরীরের লোমগুলি পর্য্যন্ত পাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু চামড়া এখনও লোল হয় নাই। চক্ষুর দীপ্তি যুবাপুরুষের মত, তবে চক্ষু দুটি একটু বসা। ইঁহার বয়স ৯০ বৎসর হইবে। তান্ত্রিক-কর্ম্মে ইনি অদ্বিতীয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। তাই মস্করী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। বিশেষ এটি ত শূদ্রের কার্য্য। মস্করী ভাল ব্রাহ্মণ, সে তাহা করিবে কেন? তাই তিনি এক জন সাতশতী ব্রাহ্মণ আনাইয়াছেন। ইনি মায়ার পৌরোহিত্য করিবেন। ব্রাহ্মণের নাম বিধুভূষণ। ইঁহার সাতশতী-গাঞী-এর নাম ফরফর; পুরা নামটি বিধুভূষণ ফরফর। লোকে ইঁহাকে ফরফর ঠাকুর বলিয়াই ডাকে। নব্বই বৎসর বয়স হইলেও ইনি ভারী হন নাই; ফরফর করিয়াই বেড়ান। ইঁহার কাজ করিবার ক্ষমতার কিছুই হানি হয় নাই।

মস্করী ইঁহাকে আনিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, জীবন ধনীর যে প্রতিমা গড়ান হইয়াছে, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাইতে হইবে, তাহাকে কথা কহাইতে হইবে, ব্রাহ্মণও তাহারই উদ্যোগে আছেন। প্রথমতঃ কত জিনিসপত্র চাই, তাহার হিসাব হইল। সব জিনিস বিধু-ফরফর নিজে দেখিয়া লইতে লাগিলেন, কোনও জিনিসে কোনও ত্রুটি থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিতেছেন। গব্যঘৃত হোমের জন্য টাট্‌কা আনান হইল। বিল্বদলগুলিতে দাগ থাকিবে না, ছেঁদা থাকিবে না, সবগুলিই ত্রিপত্র হইবে, বেশী পাকা হইবে না, বেশী কচিও হইবে না। এমন বিল্বদল বাছিয়া বাছিয়া এক হাজার সংগ্রহ করা হইল। যজ্ঞডুমুরের এক হাজার আগডাল সংগ্রহ করা হইল। প্রত্যেকটিকে ঠিক বিতস্তিপ্রমাণ করিয়া কাটিয়া লওয়া হইল, আর তাহার আগায় দু-একটি কচি পাতা রহিল। পুষ্পপাত্রে ফুল সাজান হইল। তিন চার রকম চন্দন ঘষা হইল। বেলকাঠ ও তুলসীকাঠ ঘষিয়া চন্দন করা হইল। আলো-চাল, যব, তিল, আপাঙের গাছ, আপাঙের শিকড়, আপাঙের শীষ সংগ্রহ করা হইল।

প্রথম দিন বিধুভূষণ প্রাতঃকাল হইতেই পূজার

বসিলেন; শিবের ও কালীর পূজা করিলেন। সর্ব্বত্রই পূজা নিরুদ্বেগে শেষ হইল। কোন বাধা-বিঘ্ন বা অভাব হইল না। বেলা দুপুরের পর ব্রাহ্মণ হোমে বসিলেন, একটি একটি করিয়া গণিয়া সমস্ত ত্রিপত্রগুলি গাওয়া ঘিয়ে ডুবাইয়া আহুতি দিতে লাগিলেন। এক হাজার আহুতি শেষ হইলে তিনি যজ্ঞডুমুরের পল্লব ধরিলেন। সেগুলি একটি একটি করিয়া গণিয়া হোম করিলেন। যখন সব শেষ হইয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণ মহা আনন্দে উঠিয়া পূর্ণাহুতি দিলেন এবং তার পর মায়ার কপালে হোমের ফোঁটা দিয়া নিজে জলযোগ করিলেন।

আশায়, আনন্দে, ভয়ে, ভরসায় মায়ার দিনটি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে মূর্ত্তির সম্মুখে পূজা আরম্ভ হইল। ষোড়শ উপচারে হর-পার্ব্বতীর পূজা হইল। তাহার পর জীবনের প্রতিমার পূজা আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ ষোড়শোপচারে জীবনের পূজা করিল; তাহার পর তাহার একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ করিল। সে দিন এই পর্য্যন্ত।

তাহার পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাগারা বাজিতে লাগিল। স্নান-আহ্নিক করিয়া ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসিলেন, ২।৩ দণ্ড নিশ্চল-নির্ব্বিকারভাবে ধ্যান করিয়া জপে বসিলেন। জপ শেষ হইলে রাশি রাশি ধূপ-ধুনা আগুনে দিতে বলিলেন। ধূপ ও ধুনার গন্ধে ও ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল, ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, দীর্ঘদেহ গরদের কাপড়ে ঢাকিয়া জীবন ধনীর মূর্ত্তির বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন—

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ—

মায়া নিকটেই বসিয়া ছিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিমা নড়িতেছে।

ব্রাহ্মণ আবার সেইরূপে প্রতিমার বুকে হাত দিয়া বলিল—ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ জীব ইহ স্থিতঃ—

ব্রাহ্মণ আবার সেইরূপে প্রতিমার বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন—ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণাঃ ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা—বলিয়া ব্রাহ্মণ বসিয়া পড়িল। মায়ার মনে হইতে লাগিল, তাহার স্বামী সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন;—তিনি জীবিত। মায়ার ইচ্ছা,—তাহার স্বামী কথা কন। সে ব্রাহ্মণকে কথা কহাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মস্করীর দিকে চাহিল। মস্করী ইসারা করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আবার উঠিয়া দাঁড়াইল; প্রতিমার মুখে হাত দিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। ধূপ-ধুনার ধোঁয়ায় ও গন্ধে ঘর পুরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া মন্ত্র পড়া হইল। প্রতিমার ঠোঁট দুটি তখন খুলিয়া গেল। বোধ হইল যেন, কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল, "এই মায়া তোমার স্ত্রী, এ পতি বৈ আর জানে না। তোমার পূজায়, তোমার স্মরণে জীবন ধরিয়া আছে। ইহাকে কিছু উপদেশ দাও, যাহাতে ও জীবনের অবশিষ্ট অংশ সুখে থাকিতে পারে।" ঠোট আরও নড়িতে লাগিল,—শেষে স্পষ্ট শুনা গেল, "মায়া, পোষ্য-পুত্রে ভাল হবে।" ঠোঁট দুটি বুজিয়া গেল। ধাইরা বলিল, ঠিক যেন জীবনের স্বর, তবে যেন একটু নাকি সুরে কথা কহিল। মায়া ত মূর্চ্ছিত,—সংজ্ঞাহীন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "স্বামীর কথা মাথায় করিয়া" লইলাম। সে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আবার বলিল, "তোমার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" মায়া এমন স্থিরভাবে এই কথাগুলি বলিল, বোধ হইল যেন, তাহার বুকে একটা পাথর বসান ছিল, সেটা সরিয়া গেল; যেন তাহার মাথায় একটা প্রকাণ্ড বোঝা ছিল, সেটা নামিয়া গেল। সে অনেকক্ষণ বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তাহার পর সকলে চলিয়া গেলে মস্করীকে ডাকিয়া বলিল, "আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট করিয়াছেন, আর একটিবার একটু কষ্ট করুন। এটি মাটীর মূর্ত্তি—এইরূপ একটি অষ্ট-ধাতুর মূর্ত্তি করিয়া দিন, আমি তাহা আমাদের গোলাবাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করিব ও স্বামীর আজ্ঞামত একটি পোষ্যপুত্র লইয়া তাহাকে লালন-পালন করিব।" হঠাৎ যেন মায়ার মুখ থেকে সেই পুরাণ বিষাদের ছায়াটা সরিয়া গেল। তাহার মুখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মনে যেন একটা নূতন স্ফূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল।

মস্করী বলিল, "আচ্ছা, আমি তাহাই করিয়া দিব। কিন্তু এখানকার ত কার্য্য শেষ হইয়া গেল; এখন আমরা গোলাবাড়ী ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করি।"

মায়া বলিল,—"অষ্ট-ধাতুর মূর্ত্তি কবে হবে?"

মস্করী বলিল,—"সেইখানেই হবে।"

৬

মহাবিহারের পূর্ব্বদিকে গঙ্গার উপর একটা প্রকাণ্ড পরিষ্কার ঘাসের জমীতে একটা প্রকাণ্ড পাল খাটান হইয়াছে। পালের নীচে দক্ষিণ দিকে ঠিক মাঝখানে একখানা সোনার সিংহাসন, তাহার উপর চাঁদোয়া; আর দুই পাশে দুইখানা রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের নীচে ও তাহার সামনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গালিচা পাতা, গালিচারও উত্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সতরঞ্চি পাতা, তাহারও উত্তরে মাদুর, চট ইত্যাদি পাতা। চারিদিকে পাহারা; ঢাল-তলবার লইয়া অনেক লোক পাহারা দিতেছে। বেলা তিনটার সময় তথায় পাহারাওয়ালা ভিন্ন আর একটিও লোক ছিল না। ক্রমে লোক জুটিতে লাগিল, অসংখ্য লোক নানা দিক্ হইতে আসিয়া কেহ গালিচায়, কেহ সতরঞ্চে, কেহ বা মাদুরে বসিতে লাগিল। বহুসংখ্যক নৌকা গঙ্গার ও-দিকের কিনারায় সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নৌকা নানারূপে ঘোরাল রঙ দিয়া সাজান। সবগুলিতেই ধ্বজা, পতাকা উড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি বড় নৌকা পার হইয়া মহাবিহারের ঘাটে লাগিল। ঘাটে সকলের নীচের ধাপ পর্য্যন্ত লাল বনাত পাতা ছিল। নৌকা হইতে সিঁড়ি বাহিয়া তিন জন লোক নামিয়া বাঁধা ঘাটের ধাপে উঠিলেন। অমনি চারিদিক্ হইতে "মহারাজের জয়" "মহারাজ হরিবর্ম্মার জয়" "বঙ্গাধিপের জয়"-ধ্বনি উঠিল। তাহাতেই বুঝা গেল যে, যাহার মাথায় মুকুট ও যাঁহার গায়ে নানা হীরা-মতি জড়ওয়া-গহনা, ঘোরাল রঙের রেশমী কাপড়, তিনি মহারাজ হরিবর্ম্মা। তাঁহার সহকারী এক জন গরদের ধুতি ও চাদর পরিয়া আসিতেছেন। তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভবদেব ভট্ট। আর এক জন রাজবেশধারী—তিনি দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজা।

রাজা সিঁড়ির ধাপে উঠিবামাত্র সৈন্যগণ দুই ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। ভাটেরা রাজার যশোগান করিতে লাগিল; সকলেই মাথা নোয়াইয়া রাজার অভ্যর্থনা করিল। ঘাটের উপরের চাতালে সাতগাঁবাসীরা সকলে রাজার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়াছিল—সকলে রাজাকে নমস্কার করিল। রাজা কাহারও সঙ্গে একটি কথা কহিলেন, কাহাকেও "ভাল আছেন" জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকেও একটু হাসিয়া আপ্যায়িত করিলেন, কেহ বা প্রণাম করিতে আসিলে তাহার পিঠে হাত দিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিহারী দত্তকে দেখিতে পাইয়া রাজা হাত বাড়াইয়া দিলেন, সে তাঁহার হাত ছুইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল।

এইরূপে সকলকে সম্ভবমত আপ্যায়িত করিয়া রাজা স্বর্ণসিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। ভবদেব ও রণশূর দুইখানি রূপার সিংহাসনে বসিলেন। রাজা ভবদেব ভট্ট মহাশয়কে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। ভবদেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন:—

"মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মদেব এবং তাঁহার মিত্রবর্গ এই সাতগাঁ রাজ্য যুদ্ধে জয় করিয়া লইয়াছেন। মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ দেবের রাজ্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের মহারাজাধিরাজ প্রজাদিগকে অভয়দান করিতেছেন যে, যদি তোমরা শান্তভাবে থাকিয়া আপন আপন জীবন যাপন কর, তোমাদের ধন, মান, দেহ, মন তিনি প্রাণপণে রক্ষা করিবেন। যে সকল বাগ্দীরা যুদ্ধ করার জন্য ভূমি ভোগ করে, তাহারা যদি নূতন রাজার সহিত সেই বন্দোবস্তে চলে, তাহাদের ভূমিতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। যাঁহারা যে ধর্ম্মেই থাকুন, যদি রাজার রাজবিধি মানিয়া চলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে নূতন রাজা হস্তক্ষেপ করিবেন না। মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ যে মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভার যাহাদের উপর আছে, তাঁহাদের উপরেই থাকিবে। তাঁহারা যেমন রূপনারায়ণের অধীনে থাকিতেন, আমাদের মহারাজের অধীনে তেমনই থাকিবেন। তাঁহারা যে ৫০টি গ্রাম ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাই করিবেন; তবে তাহার মধ্যে ৩০টি গ্রাম আমাদের পাট্টা করিয়া দিতে হইবে। আমরা তাহার যথাযোগ্য রাজস্ব মহাবিহারের অধ্যক্ষকে দিব। আর যত দিন মিত্রবর্গের মধ্যে সাতগাঁ রাজ্য ভাগ না হয়, তত দিন শ্রীযুত বিহারী দত্ত এই রাজ্যের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। তাহার পর ভাগ হইয়া গেলেও, আমাদের মহারাজাধিরাজ যে অংশ পাইবেন, তাহার সম্পূর্ণ ভার বিহারীর উপরই দেওয়া থাকিবে। এখন হইতেই তোমরা বিহারী দত্তকে রাজার প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিবে এবং তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান করিবে। মহারাজাধিরাজ ও তাঁহার মিত্রবর্গ টীকা লইবার জন্য শ্রীযুত বিহারী দত্তকে আহ্বান করিয়াছেন।"

পরে কয়েক জন ভাট গিয়া যশোগান করিতে করিতে বিহারীকে দুজন রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রথমে হরিবর্ম্মদেব ও রণশূরদেব উহার কপালে কুঙ্কুম ও চন্দনের টিপ পরাইয়া দিলেন।

বিহারীর রাজ-পদলাভে বেণেরা মহা আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিল। সাতগাঁয়ের সকল

লোকই তাঁহাতে যোগ দিল। সাতগাঁ ভাটেদের প্রধান জায়গা। তাহারাও মহা আনন্দে তাহাতে যোগ দিল।

এমন সময়ে খবর আসিল যে, বিহারী দত্তের কন্যা মায়া তাহাদের গোলায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। খবর শুনিয়া বিহারীর ত আনন্দ ধরে না। তিনি মহারাজাধিরাজ, মহারাজ ও ভবদেব ভট্টের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! মঙ্গলই মঙ্গলের অনুবন্ধী। এত দিনের পর আমার কন্যা আপন বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যদি অনুমতি করেন, আমি গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসি।"

ভবদেব বলিলেন, "সে ত সাতগাঁয়েরই মেয়ে, এই উৎসবের সময় তাহাকে এখানে আনিতে দোষ কি?" সকলেই অনুমতি দিলে মহারাজাধিরাজ তাহাকে সভাস্থলে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সেই মঙ্করী। মঙ্করীকে দেখিয়াই ভবদেব তাহাকে চিনিলেন। সে চতুর্থ-খণ্ডের পাড়া, পিশাচ-খণ্ডের গাঞ্জী। মঙ্করীকে ডাকিয়া তিনি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, মঙ্করী বলিল, "ভিখারিণীরা মায়াকে ভুলাইয়া যখন সঙ্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, রূপা-রাজা উহাকে গুরুপুত্রের শক্তি করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর বিহারী ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে, সে সময়ে আমি সাতগাঁয়ে আসিয়াছিলাম। মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। সে একান্ত পতি-প্রাণা। পতির ছবি সে প্রত্যহ পূজা করে, পতির কাপড়, চাদর, জুতা সে যত্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমি মঙ্করী সাজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। পাছে সন্দেহ করে, তাই বিহারে বিহারেই থাকিতাম। মায়াকে স্বামীর সহিত দেখা করাইব,—কথা কহাইব বলিয়া তাহাকে লইয়া পিশাচ-খণ্ডে লুকাইয়া রাখি। তথায় ভাল ভাল কুমার আনাইয়া তাহার স্বামীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাই;—তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করাই। প্রতিমা কথা কহিয়া বলে,—'মায়া, পোষ্য-পুত্র গ্রহণ কর।' স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি মায়ার বেশ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। আমি এমন পতিভক্তি দেখি নাই!"

মঙ্করী অথবা পিশাচ-খণ্ডের গাঞ্জীর মুখে এই কথা শুনিয়া সকলেই মায়াকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। স্থির হইল, বিহারী সাতগাঁ রাজ্যে শান্তি-স্থাপনের পরই নিজে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবে,—মায়াকেও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাইবে। পোষ্যপুত্র-গ্রহণ ভবদেবভট্টের পদ্ধতিমতে হইবে। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে সভাভঙ্গ হইল। রাজারা নৌকায় উঠিলেন, চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। কেহ বলিল, "মহারাজ হরি বর্ম্মার জয়", কেহ বলিল, "রণশূরের জয়", কেহ বলিল, "বিহারী দত্তের জয়", কেহ কেহ বলিল, "ভবদেবের জয়", কেহ কেহ বা বলিল, "জয় মায়া দাসীর জয়!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মহাবিহার ও গঙ্গার মধ্যস্থলে মহাসভা হইয়া গেল, রূপা রাজার বৌদ্ধরাজ্য নাশ ও হরিবর্ম্মার হিন্দুরাজ্য স্থাপন হইয়া গেল। বিহারী সাতগাঁ রাজ্যের সমস্ত ভার পাইল, লোকে খুব খুসী হইল; কিন্তু অনেকের আবার এই সকল ব্যাপারে মর্ম্মান্তিক হইল। বৌদ্ধ যাহারা ছিল, তাহাদের ত রাজ্য গেল, রাজা গেল, দেশে যে দবদবা ছিল, সেটি গেল, মহাবিহারও গতপ্রায়, তাহারা বড় খুসী হইতেই পারে না। এখন আবার এক সভা হইবে। সেটা রাজার খাস সভা, তাহাতে সাতগাঁ-রাজ্য বাঁটোয়ারা হইবে। যাঁহারা হরি বর্ম্মার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের পুরস্কার দেওয়া হইবে। রাজ্যের যাহাতে সুশৃঙ্খলা হয়, তাহা করিতে হইবে। আর মোট কথাটা, বৌদ্ধেরা যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং অনেক লেখাপড়া চাই, অনেক সন্ধান লওয়া চাই, অনেক পরামর্শ চাই, অনেক বিবেচনা চাই। সুতরাং কিছু দিন সকলকে সাতগাঁয়ে থাকিতে হইবে। এই কিছু দিনের মধ্যে তারাপুকুরের কেল্লাটা নূতন করিয়া গড়া চাই। ছাউনি, রাউতপাড়া সব নূতন করিয়া বন্দোবস্ত করা চাই। চারিদিকে লোক লাগিয়া গেল। সাতগাঁ বেশ সরগরম রহিল।

এই দীর্ঘকাল মহারাজাধিরাজ হরি বর্ম্মা, যদিও বয়স হইয়াছে, মাছ ধরা, কুমীর মারা, হাঙ্গর ধরা, শীকার কর', বাজ পাখীর খেলা করা, এই সব লইয়াই রহিলেন। সাতগাঁ ও মহাবিহারের সম্মুখে গঙ্গা খুব চওড়া, একটা সমুদ্রের খাড়ীর মত, মাঝে মাঝে বালির চড়া। দু'একটা চড়ায় মাটী আছে, আর তার উপর নিবিড় জঙ্গল;—আসসেওড়া, পটপটী, বন-ঝাউ, নানা রকমের লতা, কাঁটাগাছ,

কাঁটানটে, কণ্টিকারী, কালকাসন্দা, চাক্‌চাকন্দা, শ্যালকাঁটা, ফেনী-মনসা, গোয়ালে-লতা। এই সবের মধ্যে পা বাড়ান যায় না। আবার ওপারে দূরে সুন্দরবন—সুঁদরী গাছ, বেত গাছ, গোল-পাতার গাছ, সঙ্গে সঙ্গে নোনা, ভাটুই, গম্ভীরা, জীবন, জিউলী—সেও খুব ঘন, তার নীচেও আবার ঘন বন। মহারাজাধিরাজের ভারি আমোদ—বালির চড়ায় কুকুর ছাড়িয়া দেন, তাহারা খরগোস, শজারু, গোসাপ, গন্ধগোকুলা ধরিয়া লইয়া আসে। খরগোসও ছোটে, পিছু পিছু কুকুরও ছোটে—দেখিতে দেখিতে আর দেখা যায় না। আবার দু'মিনিট পরে কুকুরটা খরগোসটিকে দাঁতে ধরিয়া মহারাজাধিরাজকে পুরস্কার দেয়। মহারাজাধিরাজ কুকুরের গায়ে হাত দিয়া তাহাকে আদর করিলেন, সে আবার আর একটা কি দেখিয়া ছুটিল। তাহার আদর দেখিয়া আর পাঁচটা কুকুরও আপন আপন বাহাদুরী দেখাইবার জন্য ছুটিল। একবার পাঁচ সাতটা কুকুরে একটা নেক্‌ড়ে বাঘকে তাড়া করিয়াছে, সে চারিদিকে ছুটিতেছে। কোথাও পরিত্রাণ নাই দেখিয়া, যে দিকে রাজা ছিলেন, সে সেই দিকে ছুটিল। রাজা ও শীকারীরা তীর, ধনুক, বর্শা, বল্লম লইয়া প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু দূর হইতেই মহারাজাধিরাজের এক তীরেই তাহার জীবন শেষ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গার উপর দিয়া নানা রকমের পাখী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়; কত রকম শব্দ করে, গান করে, খেলা করে; আকাশ যেন ছাইয়া ফেলে। মহারাজাধিরাজ এক এক দিন ঐ সকল পাখী লক্ষ্য করিয়া পোষা বাজ ছাড়িয়া দিতেন। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে পলাইত, বাজ তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিত, চিল্‌ চিল্‌ চিল্‌ চিল্‌ শব্দ করিত, এক একটাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিয়া দিত, আবার আর একটার উপর ধাওয়া করিত। নীচে লোক পাখী কুড়াইবার জন্য ছুটাছুটি করিত। মরা পাখী কতক মাটীতে পড়িত, কতক জলেও পড়িত, কিন্তু একটিও নষ্ট হইত না। কাছে হইলে লোকে জলে পড়িয়া সাঁতার দিয়া ধরিয়া আনিত, আর দূরে হইলে ডিঙ্গি ত ছিলই।

সকালবেলা নদীর ওপার জঙ্গলের নীচে চড়ার উপর বাতী-শালকাঠের মত কি পড়িয়া থাকিত। যাহারা জানে না, তাহারা মনে করে, বাহাদুরী কাঠ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, সেগুলা কুমীর, নানাজাতীয় কুমীর। মহারাজাধিরাজ কুমীর শীকারের জন্য বাহির হইলেন, সঙ্গে বর্শা, বল্লম, কেঁচা আর চতুর কয়েক জন শীকারী। কুমীরের গায় বল্লম বসে না। তাহাদের চোখে না হয় মুখে বিঁধিতে হয়। রাজা অনেক ধস্তাধস্তির পর কুমীরের মুখে বর্শা চালাইয়া দিলেন। প্রকাণ্ড কুমীর এক মোচড়ে বর্শা ভাঙ্গিয়া দিয়া ঝুপ্‌ করিয়া জলে পড়িল; কিন্তু ভাঙ্গা বর্শা বাধিয়া থাকায় তাহার নড়াচড়ার পক্ষে বড়ই উৎপাত হইতে লাগিল। একটু চাড় পাইলেই মুখে লাগে আর যন্ত্রণায় কুমীর অস্থির হয়। শেষে সে ভাসিয়া উঠিল—অমনি প্রকাণ্ড কাছি আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আর টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল। কুমীর মহাশয় মরিলেন, পেট চিরিয়া নাড়ীভুঁড়ি বাহির করা হইল, পেটের মধ্যে তুলা ও বিচালীর কুচি পুরিয়া দেওয়া হইল,—আবার সেলাই করা হইল। তিনি বহুকাল ধরিয়া রাজবাড়ীর দেউড়ীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

শব্দভেদী বাণের তখন খুব চলন ছিল। আর রাজা হরিবর্ম্মা শব্দভেদী বাণে খুব দক্ষহস্ত ছিলেন। নৌকায় বসিয়া যেই শুনিলেন, একটা শুশুক কি ঘড়েল ভুস করিয়া উঠিল, অমনি রাজার বাণ চলিল। সে বাণ অব্যর্থ। শুশুককে মরিতেই হইবে। আর শীকারীরা যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে রাজার সাম্‌নে আনিয়া উপস্থিত করিবে। শুশুকের তেল বাতের বড় ঔষধ ছিল।

হাঙ্গর এক ভয়ানক জন্তু। দেখিতে বড় আড়-মাছের মত, মুখের গোড়া থেকে দু'খানা হাড় বাহির হইয়াছে, হাড় দু'খানার দু'ধারে দু'সারি করিয়া দাঁত; উপর-নীচের চারি সারি দাঁত একত্র হইলে চারখানা করাতের কাজ করে। হাঙ্গরে কাটিলে তাই করাত-কাটার মত পরিষ্কার কাটা দেখা যায়। রাজাধিরাজের শব্দভেদী বাণে অনেক হাঙ্গর আপন হাঙ্গর-লীলা সংবরণ করিয়া, বহুসংখ্যক নিরীহ মনুষ্য ও জীবজন্তুর বাঁচিয়া থাকার কারণ হইয়াছিল।

নৌকায় বাচখেলা মহারাজের আর এক আমোদ ছিল। বড় বড় জাহাজ লইয়া বাচখেলা হইত। এ নৌকা পলাইতেছে, আর একখানা তাহার পিছন লইয়াছে। আর একখানা প্রথমখানাকে রক্ষা করার জন্য যাইতেছে। একখানা ঘুরিয়া মহাবেগে আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়খানার মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রথমখানার পলাইবার পথ করিয়া দিতেছে। জল তোলপাড় হইয়া যাইতেছে! জলজন্তু সব পলাইতেছে ও ভাসিয়া যাইতেছে। জলজন্তুর পিছনে আবার ডিঙ্গী, পান্‌সী, বর্শা, বল্লম লইয়া ধাওয়া করিতেছে।

এই সব লইয়া মহারাজাধিরাজের দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন না। যে কেহ দেখা করিতে আসিত, তাহাকেই আপ্যায়িত করিতেন, তাহার কি বলিবার আছে, শুনিতেন। অনেক সময় ডাঙ্গায় উঠিয়া সিপাহীদের কুচকাওয়াজ দেখিতেন। এক দিন তারাপুকুরে মেরামত দেখিতেও গিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ সর্ব্বদাই সাতগাঁয়ে অলিগলী কুচ করিয়া যাইত। শুধু যে সৈন্যরাই যাইত, এমন নহে। নৌকার মাঝিরা, খালাসীরাও সাজিয়া কুচ করিতে যাইত। যখন ভবদেব আসিতেন, মহারাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেন।

মহারাজ রণশূর সর্ব্বদাই মহারাজাধিরাজের সঙ্গে থাকিতেন। তিনি অতি বলিষ্ঠ, সুপুরুষ ও বেশ মিষ্টভাষী। মুখে হাসিটি লাগিয়াই আছে। শীকারে তিনি খুব মজবুত; কিন্তু সে মজবুতি সাকরেদী—ওস্তাদী নয়। মহারাজাধিরাজ, রণশূরকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি কাছে থাকিলে খুসী থাকিতেন। দু'জনের বেশ ভাব হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ যেখানে যাইতেন, রণশূরও সেইখানেই যাইতেন। যে সব খেলার কথা বলা হইল, সর্ব্বত্রই দু'জনে থাকিতেন। জলে খেলা করা রণশূরের বড় একটা অভ্যাস ছিল না; কিন্তু তাহাতেও তিনি বেশ পাকিয়া উঠিলেন। তাঁহারও বাজ পাখী ছিল, শীকারী কুকুর ছিল। তিনিও তীর-ধনুক লইয়া শীকার খেলিতেন, বর্শা-বল্লম ব্যবহার করিতেন।

২

আর ভবদেব কি করেন? তিনি একখানি বড় বজরা লইয়া ত্রিবেণীর পাশে সপ্তর্ষিঘাটে বসিয়া থাকেন। বজরায় একটি আপিস; এক জন বৃদ্ধ কায়স্থ, তাহার নীচেও অনেকগুলি কায়স্থ, সবাই নিরন্তর ঘাড় গুঁজিয়া লেখাপড়া করিতেছে। ভবদেবের কাছে দিনরাত্রি লোক আসিতেছে। বিহারী প্রায়ই আসিতেছেন ও পরামর্শ করিতেছেন। গঙ্গাস্নান ভিন্ন অন্য কোনও কাজেই ভবদেব বজরা হইতে নামেন না। কেবল এক দিন নামিয়াছিলেন ব্রহ্মপুরীতে নিমন্ত্রণ খাইবার জন্য, এক দিন বিহারীর বাড়ী পায়ের ধূলা দিবার জন্য, আর এক দিন মহাবিহারের ঠাকুর দেখিবার জন্য। ভবদেব বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, হেরুক ও বজ্রবারাহীর মূর্ত্তি অত ভয়ানক, তাই স্বচক্ষে দেখিতে গিয়াছিলেন। আসিয়া "নগ্নদর্শন" অর্থাৎ নেঙ্‌টা লোক দেখিলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সেই প্রায়শ্চিত্ত করেন। স্মৃতিকারেরা বলেন, নগ্ন বলিতে বৌদ্ধও বুঝিতে হয়।

যাহার যাহা বলার আছে, সকলেই ভবদেবের কাছে বলিয়া যাইতেছে। ভবদেব সব কায়স্থের দ্বারা লিখাইয়া রাখিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বড়ই মুস্কিল। অধিকাংশ কায়স্থই বৌদ্ধ। অনেকেই বজ্রযান ও সহজ-যানের বই লিখিয়াছেন। সুতরাং নিজের কায়স্থ লইবার সময়ে ভবদেবকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ের ব্রাহ্মণগাঞীদের গ্রাম হইতে অতি গরীব কায়স্থ আনিয়া মুহুরী করিয়াছিলেন। যাহাদের অন্যরূপে জীবিকানির্ব্বাহের কোনওরূপ সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের একেবারে লয়েন নাই। ইহারাও প্রাণপণে তাঁহার কর্ম্ম করিয়াছে, কখনও গুপ্তকথা ব্যক্ত করে নাই। উঁহাকে তাহারা আপনাদের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা বলিয়া মনে করিত। উঁহা হইতেই তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত। তাহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পায়, ভবদেব তাহাদের এরূপ অর্থ দিতেন না।

ভবদেবের কাছে ব্রাহ্মণেরা আসিতেন বৃত্তির জন্য, দক্ষিণার জন্য, ভাটেরা আসিত ত্যাগ পাইবার জন্য, আচার্য্যেরা আসিতেন পূর্ণপাত্রের জন্য, বেণেরা আসিত ব্যবসার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য, সৈন্যেরা আসিত জমী ও জায়গীরের জন্য, জুগী-জোলা-তাঁতিরা আসিত কাপড় বোনার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য, তেলীরা আসিত ঘানির ব্যবস্থা করিবার জন্য, বৌদ্ধেরা আসিত তাহাদের উপর অত্যাচার না হয়—সেইটা প্রার্থনা করিবার জন্য। তিনি যাহার সঙ্গে যেমন করা উচিত, তেমনি ব্যবহার করিতেন। সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া যাইত যে, ভবদেব তাহাকে ভালবাসেন।

ভবদেবেরও দিনরাত অবসর ছিল না। ত্রিসন্ধ্যা না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাই করিতেন। নইলে তাঁহার খাওয়া-শোওয়ার অবসর ছিল না। যখন অন্য কেহ থাকিত না, তখন তিনি, কায়স্থেরা দিনভর কি লিখিয়াছে, তাহাই শুনিতেন ও তাহার উপর আপনার যা বলার ছিল, লিখাইয়া রাখিতেন।

বিহারীরও অবসর বড় কম। তাহার কাছেও ঢের লোক। তাহার পোষ্যপুত্র লওয়া হইতেছে না। আগামী খাস-দরবারের জন্য সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাহার একটা বেশী কাজ ছিল, তাহাকে ঘুরিয়া খবর যোগাড় করিতে হইত। কেন না, রাজা ও ভবদেব তাহার কথাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

পঁচিশ ছাব্বিশ দিনের পর হরি বর্ম্মার বড় নৌকায় সভা বসিল। মহারাজাধিরাজ, মহারাজ, ভবদেব ও বিহারী এই চারি জনেই সভা। আর লোক আবশ্যকমত আসিতেছে, আপনার কাজ করিয়া দিয়া যাইতেছে। প্রথম উঠিল রাজ্য-ভাগের কথা। হরি বর্ম্মা বলিলেন, "রণশূরের সম্পোষ্যমত দামোদরের ওপারের যত গ্রাম উনি চান, দিয়া দাও। কেমন হে ভায়া, তাতে তোমার মত হবে ত?" রণশূর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত গ্রাম আছে?" উত্তর হইল, "২৩৮ খানা, তাহার মধ্যে তোমাকে ১৫০ খানা গ্রাম দেওয়া যাইতেছে। কেবল কয়েকটা ঘাটী আগ্‌লাইয়া রাখিবার জন্য ৮৮ খানা গ্রাম আমি রাখিতেছি। তোমার সঙ্গে আবার ঘাটী কি? কিন্তু উত্তরে ১১টা ঘাটী আছে। কি ঘাটীতে আটটা করিয়া ৮৮ খানা গ্রাম আমি রাখিলাম। নহিলে জান ত, বিষ্ণুপুর আছে, মহীপাল আছে, এরা যদি ঘাটী খোলা পায়, আমারও ক্ষতি করিবে, তোমারও ক্ষতি করিবে।" রণশূর ইহাতে বেশ খুসী হইয়া গেলেন। তাহার পর রূপা-রাজার পরিবারবর্গের প্রতিপালন। সে একটি বৈ বিবাহ করে নাই, তাহারও সন্তানসন্ততি হয় নাই। রাজা তাহাকে হাজার টাকা মাসিক দিবেন, আর তাহাকে গঙ্গার ওপারে চাকদহের কাছে বাস করিতে দিবেন। সে সেখানে ইচ্ছামত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারে। ভবদেব বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে মহারাণী অধিরাণীর আপত্তি আছে। তিনি বলেন,—তিনি বৌদ্ধক্ষেত্রে বাস করিবেন।" "বেশ ত, তিনি নালন্দা, বিক্রমশীল, বুধগয়া, কুশীনগর, ঋষিপত্তন, যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারেন।" "রাণী বলিয়াছেন, তিনি আপাততঃ হরিহরপুরে থাকিবেন। পরে সেখান হইতে পুরী যাইবেন।" "বেশ ত, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না।

তাহার পর ব্রাহ্মণদের পুরস্কার। "তাঁহারা সকলেই শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়াছেন। অনেকেই যুদ্ধ করিয়াছেন, অনেকে পরিশ্রম করিয়া ব্যূহরচনা দুর্গসংস্কার প্রভৃতি শিখিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাহার বিলক্ষণ পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" "কত জন পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছ?" "এক শত পনর জন।" "বেশ, এক এক জনকে এক একখানি গ্রাম দাও।" "মহারাজ, তাহাতে ত আমার কোনই আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আপনি পাইলেন কি যে, এত দান করিবেন? দেখুন, দামোদরের ওপারে ৮৮ খানা গ্রাম রহিল, তাহাতেও ঘাটী আগ্‌লাইবার খরচ কুলাইবে না। আর এপারে যে সব গ্রাম, তাহার ত ৫০ খানি মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ মহাবিহারকেই দান করিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া প্রত্যেক বিহারই ত ৫।৬ খানা গ্রাম ভোগ করে। আপনি তাহার উপর আবার ১১৫ খানা ছাড়িলে এক সাতগাঁ বন্দর ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।"

"তুমি কি বল?"

"আমি বলি, যিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ ১০ বিঘা হইতে ১০০ বিঘা পর্য্যন্ত ভূমি দেওয়া হউক। আর যেখানেই ব্রাহ্মণের ভূমি দিবেন, তাহার একটা সীমানা যেন একটা বৌদ্ধবিহার বা তাহার জমীর সঙ্গে লাগাও থাকে, এরূপ করিলে ১১৫টা গ্রামের বদলে ১৫।২০টা দিলেই চলিবে। আর ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যৎ উন্নতিরও সম্ভাবনা থাকিবে। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্ম এখন আর উঠ্‌তি-মুখে নাই, উহা ক্রমেই পড়িয়া যাইতেছে।"

"বুঝেছি,—তোমার মতলব বুঝেছি। বৌদ্ধদের জমীগুলা ব্রাহ্মণসাৎ হইয়া যাইবে। কিন্তু পুরাণে লিখেছে যে, দেবোত্তরের কাছে কাহাকেও ব্রহ্মোত্তর দিবে না।"

"সে মহারাজ, আমাদের দেবতাদের কথা। বিধর্ম্মীদের দেবতা আমরা দেবতা বলিয়া মানি না। এই সে দিন মহাবিহারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেখিতে গিয়াছিলাম, কামশাস্ত্রের ছবিতেও অত অশ্লীল মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। এই মূর্ত্তি আমি ত দেবতা বলিয়া মানিতে পারি না। তবে যে ভাঙ্গি না, সে কেবল মিছে একটা গোলযোগ বাধান দরকার কি বলিয়া। নহিলে হেরুক-মূর্ত্তি দেখিয়া আমার সে দিন হইতেই রাগ হইয়াছিল।"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে, বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি নাই, ক্রমেই অধোগতি হইবে?"

"মহারাজ, এত দিন সমাজ হইতে ভিক্ষু সংগ্রহ হইত, সঙ্ঘ পূরিত, এখন উল্টা হইয়াছে। এখন সঙ্ঘ হইতে সমাজে লোক আসিতেছে;—সমাজ তাহাদের লইতে পারিতেছে না। মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। যত দিন সঙ্ঘের আঁট ছিল,—সঙ্ঘে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইতে পারিত না, তত দিন সমাজ হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেণে, তেলি সঙ্ঘে গিয়াছে। সমাজ সঙ্ঘের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। কিন্তু এখন কি হইতেছে? সঙ্ঘে সকলেই শক্তি লইতেছে। বলে—শক্তি নহিলে

সাধনা হয় না। সাধনা যত হউক না হউক, হইতেছে ছেলে-মেয়ে। প্রথম প্রথম সেগুলাকে দশশীল আওড়াইয়া সঙ্ঘে লইত, এখন এত বেশী হইয়াছে যে, সঙ্ঘে আর ধরে না, সেগুলার জন্য নূতন বিহারও আর হইতেছে না। সুতরাং সেগুলা সমাজে আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়? আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজে ত তাহাদের স্থান নাই। বৌদ্ধ-সমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য নাই। সেখানে তাহারা স্থান পাইতে পারে। কিন্তু তাহাদের ব্যবসায় কি হইবে? সকলেরই ত একটা একটা ব্যবসায় আছে। নূতন যাহারা আসিতেছে, তাহারা দাঁড়ায় কোথায়? তাই এক জন বড় রাজা তাহাদের যুগী উপাধি দিয়া তাহাদের মোটা কাপড় বুনিতে দিয়াছেন! তাই বলিতেছিলাম, এখন আর সমাজ সঙ্ঘ পোষণ করে না। সঙ্ঘের লোক আসিয়া ভিড়িতেছে। এই ত ধ্বংসের অবস্থা। ভিক্ষুদের ভিক্ষা সমাজের লোকে দিতে চায় না। তাহাদের যে ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতেও কুলায় না। সুতরাং কাপড়ের ব্যবসা যদি জাঁকিয়া উঠে, সব সঙ্ঘের লোক সেই দিকে ছুটিবে, বিহার পড়িয়া থাকিবে। সে বিহার জঙ্গল হইয়া যাইবে। জঙ্গল না হইয়া যদি ব্রাহ্মণের ভোগে আসে, ক্ষতি কি তাহাতে?”

মহারাজাধিরাজ বলিলেন,—“এ যুদ্ধ বেণেদের জন্য, জয়ও বেণেদের হইবে। বেণেরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের কি পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে?”

কি পুরস্কার দেওয়া উচিত, বিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—“বেণেরা জমী—জমীদারী চায় না, ত্যাগ-দক্ষিণা চায় না। তাহারা চায় বাণিজ্যের একটু সুবিধা। তাহাও তাহারা ভুসী মালের ব্যবসা করে না, দেশী মালেরও ব্যবসা করে না। বিদেশী মাল, বিশেষ সাগরপারের মাল, যাহাতে অবাধে বিনা মাশুলে সাতগাঁ পৌঁছিতে পারে, এইটুকু করিয়া দিলে বেণেদের যথেষ্ট উপকার করা হইবে। সাতগাঁই এ সকল মালের প্রধান আড্ডা। এখানে যা মাশুল আদায় হয়, তাহার উপর ৩।৪টা মুনাফা চড়িয়া মাল মহার্ঘ্য করিয়া দেয়। যদি এ মাশুলটা এক টাকা কমে, তবে মালের দাম দুই টাকা কমিবে, সারা-বাঙ্গালার উপকার হইবে। সারাবাঙ্গালার অর্দ্ধেক ত মহারাজাধিরাজের, উঁহার প্রজাদের অনেক সুবিধা হইবে।”

মহারাজাধিরাজ।—তাহাতে রাজার যে বিস্তর লোক্সান হে! এত লোক্সান দিয়া রাজা রাজ্য চালাইবে কিরূপে?

বিহারী।—প্রজার দুই টাকা লোকসান করিয়া রাজার এক টাকা লাভ,—বড় ভাল কথা নয়। সে দু'টা টাকা প্রজার ঘরে থাকিলে প্রজাও দশের জন্য, দেশের জন্য দশ টাকা খরচ করিতে পারিবে। রাজাও দরকার হইলে মাঙ্গন-মাথট করিয়া যথেষ্ট আয় করিতে পারিবেন।

সকলেই বিহারীর কথায় সায় দিল।

তাহার পরে কথা উঠিল কাপড়ের। ভবদেব বলিলেন, “ব্রাহ্মণেরা বাকলের অথবা রেশমের কাপড় পরেন, তুলার কাপড় অশুদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা পূজা অর্চ্চনা করেন রেশমের কাপড় পরিয়া, রাঁধাবাড়া করেন রেশমের কাপড় পরিয়া, খাওয়া-দাওয়াও করেন রেশমের কাপড় পরিয়া। তবে অন্য সময়ে অনেকে তুলার কাপড় পরেন বটে; কিন্তু তাহাও পরা যায় না। কারণ, সব কাপড়েই ভাতের মাড়। নীচ জাতির এঁটো ছুঁয়ে অশুচি হইতে হয়। তাই আমরা রাঢ়ে ব্রাহ্মণদের গ্রামে জাত-তাঁতি বসাইয়া কাপড়ে খই-এর মাড় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। যুগীর কাপড় একেবারেই পরি না, স্পর্শও করি না। এখন ত হিন্দুর দেশ হইল। এখন এই কাপড়ের যাহাতে দেশে চলন হয়, তাহাই করিতে হইবে। জাত-তাঁতির হাত খুব সাফ। তাহারা খুব সরু কাপড় বুনিতে পারে। সে কাপড়ে খই-এর মাড় যত পরিষ্কার দেখায়, ভাতের মাড় তেমনটা হইতেই পারে না।”

মহারাজাধিরাজ।—আমি তাহার কি করিতে পারি? সে হাত আপনাদের, আর সে হাত বিহারীর। আপনারা যদি মনে করেন, শুচি কাপড়ই চলিবে, অশুচি কাপড় চলিবে না, যাহারা যুগীর কাপড় পরিয়া জল আনিবে, তাহাদের জল আপনারা লইবেন না বা স্পর্শও করিবেন না, ইহাতেই তাঁতির কাপড় চলিয়া যাইবে।

ভবদেব।—ব্রাহ্মণেরা তেলের ব্যবহার খুবই কম করেন। অনেকে সরিষার তেল মাখেন। কিন্তু অধিকাংশই তৈলস্নান করেন না। যাঁহারা তেল মাখেন, তাঁহাদের বড়ই অসুবিধা। এখানে ঘানির মুখে চামড়া দেওয়া থাকে, চামড়ার ঠোঙ্গা বাহিয়া তেল একটি কলসীতে পড়ে। চামড়ার স্পর্শে সে তেল অশুচি হয়। সে তেল কিছুতেই মাখা উচিত নয়। আমরা ব্রাহ্মণের গ্রামে বন্দোবস্ত করিয়াছি, একটা কাঠের কেট্‌কোর ঠিক মাঝখানে ছিদ্র করিয়া ঘানিটি তাহাতে খুব আঁট করিয়া বসান হয়। ঘানি বাহিয়া তেল কেট্‌কোয় পড়ে; কেট্‌কো ভরিয়া গেলে,

নারিকেলের মালা করিয়া তেল একটি কলসীতে তুলিয়া রাখা হয়। যাহারা এইরূপে পবিত্রভাবে তেল তৈয়ারী করিবে, আমরা তাহাদেরই জল আচরণ করিব। চর্ম্ম-তৈলের ব্যবহার এইরূপে কমিয়া যাইবে।

৪

ভবদেব বলিয়া যাইতেছেন :—"যাহারা ফুলের ব্যবসায় করে, তাহাদের আমরা সজ্জাতি বলিয়া লইতে পারি, তাহাদের জল ব্যবহার করিতে পারি, তাহাদের কাছে ফুল লইয়া ঠাকুরদেবতাদের দিতে পারি ; কিন্তু এই বৌদ্ধদেশে একটা বড়ই বিপদ্ দেখিতেছি। এখানকার মালীরা মালঞ্চে শুধু যে ফুলগাছ পোতে, তা নয়, মুরগীও পোষে, আর মুরগীর ডিমগুলাকে ফুলের সঙ্গে ফুল বলিয়া বিক্রয় করে। বৌদ্ধদের পুষ্পপাত্রে যেমন সারচন্দনের বাটি, রক্তচন্দনের বাটি থাকে, তেমনই মুরগী-ফুলেরও একটি বাটি থাকে। এ ফুলও অন্য ফুলের সঙ্গে তাহারা ঠাকুরের উপর চড়ায় এবং অনেক সময় ডিম ভাঙ্গিয়া ভিতরকার তরল পদার্থ ঠাকুরের মাথায় ঢালিয়া দেয়। এই সকল মালীদের আমরা অনাচরণীয় বলিয়া মনে করিব। উহাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই থাকিবে না। রাঢ়ে ব্রাহ্মণদের যে সকল গ্রাম দেওয়া আছে, সেখানে আমরা মালীদের মুরগী পুষিতে দিই না। মুরগীর ডিম ছুঁইতেই দিই না। আমরা তাহাদের জল ব্যবহার করি, তাহাদের ফুল দেবতাদের অর্পণ করি। তাহারা বিবাহের টোপর ও ময়ূর তৈয়ার করে ; ফুলের, শোলার ও তালপাতার গহনা তৈয়ার করে ; ব্রাহ্মণীরা ও ব্রাহ্মণকন্যারা সেই গহনা পরিয়া থাকে।

সেকালে যে সকল নাপিত বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ডে ক্ষৌরী করিত, বিবাহের সময় তাহারা নানা কাজ করিত। সে জাতি আর বাঙ্গালায় দেখিতে পাওয়া যায় না। রাঢ়দেশের জঙ্গলে একদল ক্ষৌরী-করা লোক আছে, তাহাদের দ্বারাই বাঙ্গালী বৌদ্ধেরা কাজ চালাইয়া লইয়া থাকে। ভিক্ষুরা চেষ্টা করে নিজে নিজে কামাইতে, কিন্তু সব সময়ে পারিয়া উঠে না। এই নাপিতেরা তাহাদেরও ক্ষৌরী করিয়া থাকে। কিন্তু এক বিষম সমস্যা আছে ;—এই নাপিতেরা সকলেই কাকের মাংস খায়। সুতরাং উহাদের স্পর্শ করিতে নাই, জল আচরণ করিতে নাই, উহাদের হাতে কোন কাজ লওয়া ব্রাহ্মণের উচিত নয় ; সুতরাং নাপিত আনাইতে হইয়াছে। এই নাপিতের বংশ ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। সাতগাঁয় উহাদের জন্য একটা জায়গা দিতে হইবে। ক্রমে আমাদের নাপিতেরা যাহাতে বাঙ্গালা ছাইয়া ফেলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা কাকখাদক নাপিতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

বাঙ্গালায় বড় বড় গোঠ আছে। গরু চরাইবার এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘাসের জমী আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এখানকার গোয়ালারা খুব প্রবল, দলেও খুব পুরু ; কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহার ভাল নয়। অনেকেই গরু দাগে, দামড়া করে, নানারূপে গরুকে যন্ত্রণা দেয়, ফুকা দিয়া দুধ বাহির করে, গাই দিয়া লাঙ্গল টানায়। এই সকল কদাচারী গোয়ালার দুধ খাওয়াও নিষেধ। কারণ, তাহাদের স্বভাব এত খারাপ যে, তাহারা দুধে জল না দিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের জল আচরণ করা ব্রাহ্মণের কোনমতেই উচিত নয়। ব্রাহ্মণের গ্রামে সেই জন্য আমরা সদ্‌গোপ নামে আর একটি গোপজাতির সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এ সকল কদাচার নাই। তাহারা অনেকটা ব্রাহ্মণের সেবা করিতে শিখিয়াছে, ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার শিখিতেছে। অন্য গোয়ালারা যাহাতে এই দলে মিশে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বাঙ্গালা ত নদীর দেশ, জলের দেশ। মাছ ধরাই এখানকার অর্দ্ধেক লোকের জীবন। নানাজাতির লোক মাছ ধরে—যেমন কৈবর্ত্ত, তীওর, জেলে, মালা ইত্যাদি। ইহারা সকলেই নামে বৌদ্ধ, বলে—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি," কিন্তু কাজে কিছুই নয়। বৌদ্ধদের প্রথম শিক্ষা—"প্রাণিহিংসা করিও না।" তা ত ইহারা দিনরাত করে। সেই জন্য বৌদ্ধস্মৃতিকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহাদের কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তবে যদি ইহারা জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করে, লাঙ্গল চালায় বা অন্য ব্যবসায় করে, তবে বৌদ্ধেরা উহাদিগকে শিক্ষা দিতে রাজী আছে। এইরূপে শিক্ষা পাইয়া অনেক জেলে হেলে হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে আমাদের দলে লইয়া আসা কিছু কঠিন। কারণ, ইহাদের সঙ্গে কোনরূপ আচারব্যবহারই আমাদের চলিবে না। কিন্তু বৌদ্ধদের হাত হইতে উহাদের উদ্ধার করিতে হইবে। নইলে বৌদ্ধরা এই হেলেদের লইয়াই প্রকাণ্ড দল বাধিয়া বসিবে।"

মহারাজাধিরাজ তাঁহার সকল কথাতেই সায় দিলেন। ভবদেব বিহারীকে বলিয়া দিলেন, "তুমিও এইমত চলিবে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

ভবদেব ভট্ট বারংবার মস্করীর কথা তুলিতেছেন। মস্করীকে কি পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে? মস্করী প্রায়ই উপস্থিত থাকিত। সে বলিত, "আমার কথা সকলের শেষে। আপনাদের সমস্ত ব্যাপার শেষ হইয়া যাউক, তাহার পর আমার কথা, আমার কথার পর আর কথা থাকিবে না।" মহারাজাধিরাজ ও ভবদেব তাহাতেই রাজি হইলেন। এইখানে মস্করীর একটুকু পরিচয় দিয়া রাখি।

রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা পাঁচ গোত্র। আদিশূর রাজা ৭৩২ খৃঃ অব্দে কনোজের রাজা যশোবর্ম্মার কাছে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। কারণ, তাঁহার রাজবাড়ীর চূড়ায় বাজপাখী বসিয়াছিল। সেটা তখন বড় অলক্ষণ, উৎপাত বা অদ্ভুত বলিয়া লোকে মনে করিত। সুতরাং ঐ অলক্ষণের শান্তি না হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া আদিশূর রাজা যশোবর্ম্মার কাছে শান্তিযজ্ঞের জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। অনেকে মনে করিতে পারেন, যজ্ঞে ত তিন জন ঋত্বিক্ হইলেই হয়। না হয় এক জন ব্রহ্মা বেশী থাকিলেন। পাঁচ জন কেন হইবে? এ সম্বন্ধে একটা ভারি কথা আছে। দক্ষিণদেশে এখনও তিন জনে যজ্ঞ হয়; কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে যাজ্ঞবল্ক্য পাঁচ জন ঋত্বিক্ ভিন্ন কার্য্য হইবে না, ব্যবস্থা করিয়া যান। যজুর্ব্বেদকে শুক্ল ও কৃষ্ণ করিয়া দুই বেদ ধরিলে ও অথর্ব্ববেদকে বেদের মধ্যে ধরিলে পাঁচখানা বেদ হয়। পাঁচখানা বেদে পাঁচ জন ঋত্বিক্ লইয়া যজ্ঞ হইত। তাই আদিশূর পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চান; যশোবর্ম্মাও পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পাঠান। রাজারা এই পাঁচ জনের সন্তান-সন্ততিকে অনেক গ্রাম দেন। বাৎস্য গোত্রের ব্রাহ্মণদের এক জন কাঞ্জিবিল্বী নামে একখানি গ্রাম পান। সে গ্রামে ব্রাহ্মণদের বংশ-বিস্তারও হয়, বিদ্যাবুদ্ধির যশও খুব হয়। আবার রাজারা সেই গ্রামের নিকটে নিকটে ঐ ব্রাহ্মণদের আরও চারি পাঁচখানি গ্রাম দেন। গ্রামগুলির নাম তালবাড়ী, চতুর্থ খণ্ড (চোটখণ্ড), পিশাচখণ্ড, রাণডলা ও হিজলবন। এই সকল গ্রামেই কুলীন ব্রাহ্মণদের বাস হইয়াছিল। যিনি পিশাচখণ্ড পাইয়াছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র হয়। এক পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় গত হন, আর এক জনের পুত্র আমাদের মস্করী। মস্করী গ্রামের গ্রামীণ বা গাঁঞী; সুতরাং তাঁহার অর্থের অসদ্ভাব নাই। গ্রামে কতকগুলি কুমার, গোয়ালা ও শুঁড়ীর বাড়ী। তাহাদের কুল-কর্ত্তা মস্করী। মস্করীর পৈতৃকসম্পত্তি বেশ ছিল। আর একখানি গ্রাম তাঁহার নিজের। রাজাকে কর দিতে হয় না, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ রাজার। সমস্ত গ্রামের উপস্বত্বই মস্করীর। মস্করী পণ্ডিতও খুব ভাল, শাস্ত্র ও কাব্য দু'য়েতেই তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। তাহার উপর নাচ-গান, এমন কি, চৌষট্টি-কলায় তাঁহার মত নিপুণ লোক খুব কমই দেখা যাইত। তবে তিনি কিছু শ্রাদ্ধানন্দী। গ্রামের মধ্যে অথবা নিকটে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহাদের বড় আনন্দ। তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রাদ্ধের খোলায় উপস্থিত থাকেন; পরামর্শ দেওয়া, সাহায্য করা, খাটা-খাটনিতে তাঁহাদের বিশেষ আনন্দ। সেই জন্য লোকে তাঁহাদের শ্রাদ্ধানন্দী বলে। শব্দটার অর্থ ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে। পরের কাজে, বিশেষ আমোদ-প্রমোদের কাজে যাহার আনন্দ, লোকে তাঁহাকেই শ্রাদ্ধানন্দী বলে। অতি প্রাচীন-কালে বড় বড় সহরে নাগর বলিয়া একদল লোক থাকিত। তাহারা পৈতৃকসম্পত্তি ভোগ করিত, উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখিত, নানা কলায় চতুর হইত, নাচ-গানের আসরে কর্ত্তৃত্ব করিত; বৈঠক-খানা সাজাইত। তবে নাগরেরা একটু স্ত্রীলোক-ঘেঁসা ছিল। তাই এখন নাগর বলিতে একটু লচ্‌পচে স্বভাবের লোক বুঝায়। মস্করীর কিন্তু সে দোষ একেবারেই ছিল না। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও স্বদার-সন্তোষী। তাঁহার মেয়ে নাই, ছেলে নাই, ঢেঁকি নাই, কুলা নাই। তিনি পরের কাজ করিয়াই বেড়ান। যেখানে পাঁচ জন, সেইখানেই আমাদের মস্করী।

সব কাজ শেষ হইয়া গেল। মহারাজাধিরাজ মস্করীকে স্মরণ করিলেন। অমনি মস্করী উপস্থিত।

"মস্করী,—তুমি কি চাও?"

"মহারাজাধিরাজ, আমি এই চাই, আপনি রাজসভা করেন।"

"এখন ত আমরা রাজসভাই করিতেছি।"

"এ মন্ত্রিসভা—মন্ত্রণার সভা,—রাজকার্য্যের সভা—"

"তুমি আবার কিরূপ সভা চাও?"

"আমি চাই, মহারাজাধিরাজ সভাপতি হইয়া বসিবেন; দেশবিদেশ হইতে শাস্ত্রে ও কাব্যে পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আপনি তাঁহাদের কাব্য এবং গ্রন্থ পরীক্ষা করিবেন ও তাঁহাদের পুরস্কার দিবেন। পণ্ডিতদের সঙ্গে সঙ্গে কলাবতেরাও

আসিবেন এবং নানা কলায় আপনাদের নিপুণতা দেখাইবেন, মহারাজাধিরাজ তাঁহাদের কারিগরী পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দিবেন।"

"সে ত আর এক দিনে হয় না।"

"না মহারাজাধিরাজ,—এক দিনে হয় না; অন্ততঃ এক বৎসর লাগিবে। আগামী বৎসরে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই সাতগাঁয়ে,—এই চড়ার উপরে রাজসভা হইবে। সমস্ত গুণিজন আসিয়া উপস্থিত হইবেন। মহারাজাধিরাজ সকলের কার্য্য দেখিয়া পুরস্কার দিবেন। "গুণিজন-খানা" নামে এক নূতন খানা হইবে। তাহাতে নিঃস্ব গুণিজনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরীক্ষায়, মহারাজ, হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আচারী, অনাচারী কোন প্রভেদই থাকিবে না;—কেবল গুণের বিচার হইবে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বড় বড় রাজারা এইরূপ রাজসভা করিতেন। এইরূপ সভা হইতে কালিদাস পুরস্কার পাইয়া বড় হইয়াছিলেন; পাণিনি-পিঙ্গলও বড় হইয়াছিলেন, মহারাজ, স্ত্রীলোকদিগেরও আপনার সভায় পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মহারাজাধিরাজ বলিলেন, "তথাস্তু।" ভবদেব বলিলেন, "পিশাচখণ্ডী, তুমিই যথার্থ ব্রাহ্মণের মত দান চাহিয়াছ।"

২

বৌদ্ধদের অধঃপাতে গুরুপুত্রের বড়ই মর্ম্মান্তিক হইয়াছে। রূপা রাজার মৃত্যুতে তিনি যেন আর একবার পিতৃহীন হইয়াছেন। মেঘা যখন সব সৈন্য লইয়া মহাবিহারে আশ্রয় লয়, তখন গুরুপুত্র প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। বড় বড় গোলাভরা ধান ছিল, সব মেঘাকে দিয়া দিয়াছিলেন; নিজে যুদ্ধেও নামিয়াছিলেন। দুই মাস তাঁহার আহার-নিদ্রা ছিল না। কিন্তু যখন দেখিলেন, আর রক্ষা হয় না, তখন মেঘাকে বলিলেন, "তুমি পশ্চিম-দ্বার দিয়া পলাও, আমি পূর্ব্বদ্বারে গিয়া হরি বর্ম্মার হাতে দুর্গ সমর্পণ করি।" দুর্গের চাবি পাইয়া হরিবর্ম্মা কি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। গুরুপুত্র এখন মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মার বিশাল সাম্রাজ্যে মহাবিহারের অধিকারী। রাজা বিধর্ম্মী। তিনি বিহার রক্ষা করেন বটে, কিন্তু বিহারের উপর তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা নাই। একটি মুখের কথায় ৩০ খানি গ্রাম কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সে ৩০ খানি গ্রামের জন্য মহারাজাধিরাজকে খাজনা কিছু দিতে হয় বটে,—সে কিন্তু নাম মাত্র। বিহারে আর তেমন গোলাভরা ধান থাকে না। ডাল-তরকারী, দুধ-মাখনের যে প্রচুর যোগাড় হইত, তাহাও আর হয় না। শিষ্যদের মধ্যে সকলেই শ্রীহীন হইয়াছে। বেণেরা একেবারেই তাঁহাদের হাতছাড়া। অন্যান্য জাতির ধনী মানী লোক সব ব্রাহ্মণদিগের দিকেই গড়াইয়া পড়িতেছে, বৌদ্ধদিগের দিকে আর বড় কেহ আসিতে চায় না। সুতরাং মহাবিহারের আয়ের পথ চারিদিক্ হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যয়ের ভাগ বরং বাড়িয়া গিয়াছে। কিছুমাত্র কমে নাই। কেন না, বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক বড় বড় দাতা ছিলেন, মহাবিহারও তার মধ্যে এক জন, এখন মহাবিহারই একমাত্র দাতা, তাঁহাকে সকল দিক্ই দেখিতে হয়। যখন মহাবিহারের সম্মুখে মহাসভা হয়, তখন সেই প্রকাণ্ড পালের নীচে ব্রাহ্মণদের বামদিকে ব্রাহ্মণদের গালিচা হইতে তিন হাত তফাতে, ঘাসের ও পিঠে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসিবার স্থান হয়। বলিতে হইবে না, সেখানে গুরুপুত্রের আসন সকলের আগে। তিনিও নিপুণ হইয়া সে দিনকার ব্যাপার সব দেখিতেছিলেন। যখন ভবদেব বলিলেন,—"মহারাজাধিরাজ, রূপ-নারায়ণের রাজ্য লোপ হইয়া গেল", তখন গুরুপুত্রের মুখে যেন কালী মাড়িয়া দিল। যখন মহাবিহারের গ্রামগুলি হিন্দুরা দখল করিয়া লইল, তখন রাগে, ক্ষোভে গুরুপুত্র অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু তাহার পর মায়া যখন মহাসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল, গুরুপুত্র তাহাকে দেখিলেন। তাহার মুখে পূর্ব্বে যে বিষাদের ছায়া দেখিয়াছিলেন, এখন আর তাহা নাই। তাহার মুখ এখন আরও উজ্জ্বল, হাস্যময়, আনন্দময়। গুরুপুত্র এত দিন তাহাকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি মায়ার জন্য আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের আরশীতে মায়ার যে ছবি ছিল, তিনি সে ছবিতে আর তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। এখন হইতে বিহারী দত্তের মেয়ে মায়া আবার তাঁহার জপমালা হইল। কিন্তু হায়, সেকাল আর একাল! তখন তিনি রাজার গুরুপুত্র, এমন কি, গুরু বলিলেও হয়। আর বিহারী এক জন সামান্য প্রজা। বিহারীর মেয়ে তা'র চেয়েও সামান্য। এখন বিহারী রাজা, বিহারীর মেয়ে রাজকন্যা। আর তিনি—এক বিধর্ম্মী, ঘৃণিত, পদ-দলিত সম্প্রদায়ের গুরু। এখন তাঁহার পক্ষে মায়ার

কামনা বামন হইয়া চাঁদে হাত। কিন্তু যৌবনের উদ্দাম বাসনার গতি কে রোধ করিতে পারে? তিনি জানেন, তিনি ভিক্ষু এবং এ সকল কামনা ভিক্ষুর উচিত নয়। "কিন্তু ভিক্ষু হইলেও এখন ত সকলেই শক্তি লয়। শক্তি ভিন্ন ত সাধনাই হয় না। সুতরাং আমারও শক্তি চাই, উপযুক্ত শক্তি চাই। বলপূর্ব্বক শক্তি লওয়া চাই। ইচ্ছাপূর্ব্বক যে আসিবে, তাহাতে আমার শক্তির বিকাশ কৈ? পরকীয়া শক্তি ভিন্ন শক্তিই হয় না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরিয়া না আনিলে, সে শক্তির দ্বারা সাধনা হইবে কিরূপে?"

৩

মায়াদের গোলা গঙ্গার এক বাঁকের মাথায়। যে দরজা দিয়া গোলায় ঢুকিতে হয়, সেটা খুব উঁচা। লোকে হাতীর পিঠে গোলার ভিতর ঢুকিবে, এইমত করিয়া দরজা হইয়াছে। দরজার মাথার উপর দুই-তলা ঘর আছে। প্রথম তলার সামনে গঙ্গার দিকে একটি ঝরকা আছে। ঝরকাটি দেওয়ালের বাহিরে। সেখানে বসিলে তিন দিক্ দেখা যায়। মায়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া এইখানে বসিয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। আবার সন্ধ্যার সময়েও এইখানে বসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড নদী, সমুদ্রের একটা হাতের মত ডাঙ্গায় আসিয়া ঢুকিয়াছে। মায়া গোলায় ফিরিয়া আসিয়া অবধি দু'বেলাই দেখিতেছে, এই প্রকাণ্ড সমুদ্রের খাড়ী নৌকায় ছাইয়া রাখিয়াছে। তাহার মনে হইত, ডাঙ্গায় যেমন একটি প্রকাণ্ড নগর আছে, জলের মধ্যেও তেমনই এক প্রকাণ্ড নগর বসিয়াছে। সম্মুখে, বামে, ডাইনে যে দিকে দেখ, নৌকার সারি। নৌকায়ও অসংখ্য লোক, দিনরাত্রি কাজকর্ম্ম হইতেছে। রাজাদের নৌকা দু'খানি প্রায়ই মায়ার গোলার সামনে থাকিত।

এক দিন সকালে মায়া দেখিল, মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মার নৌকা হইতে মহারাজা রণশূর আপন নৌকায় যাইতেছেন। দুই নৌকার মাঝখানে একটি সিঁড়ি পড়িয়াছে। মহারাজাধিরাজ কোলাকুলি করিয়া রণশূরকে তাঁহার নিজের নৌকায় পৌঁছাইয়া দিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার মাথায় কি একটা উজ্জ্বল জিনিস পরাইয়া দিলেন। রণশূর পঞ্চাঙ্গ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহারাজাধিরাজ তাঁহার হাত ধরিয়া কয়েকটি কথা কহিয়া আপন নৌকায় ফিরিলেন। সিঁড়ি খুলিয়া লওয়া হইল। রণশূরের নৌকা ছাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক নৌকা খুলিয়া দিল। প্রকাণ্ড জলনগরে যেন চারি ভাগের এক ভাগ সরিয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রণশূরের বাহিনী দক্ষিণ দিকে গঙ্গার গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল। আর কিছুই দেখা যায় না। মায়ার চক্ষু ফিরিল। সে শুনিল, নানারূপ বাদ্য একযোগে বাজিতেছে।

ক্রমে হরিবর্ম্মার নৌকাগুলিও ছাড়িয়া দিল। কতক উত্তরমুখে যমুনায় প্রবেশ করিল, কতক দক্ষিণ-মুখে সমুদ্রে যাইতে লাগিল। হরিবর্ম্মার নিজের নৌকা ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময়ে বিহারী দত্তের নৌকা গিয়া সেখানে লাগিল। বিহারী মহারাজাধিরাজের কাছে বিদায় লইতে আসিতেছে, সঙ্গে সেই মস্করী। দুই নৌকাই চলিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া বিহারী ও মস্করী আপন নৌকায় উঠিল ও দুই নৌকায় ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। বিহারী গোলার দিকে আসিতে লাগিল, আর মহারাজাধিরাজ দক্ষিণসমুদ্রের দিকে ভাসিয়া চলিলেন।

মায়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, "এই ত কিছু পূর্ব্বে সম্মুখে এক প্রকাণ্ড নগর দেখিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে সব কোথায় মিলাইয়া গেল। এখন দেখি,—যে দিকেই দেখি, কেবল জল!—কেবল জল! ওপারের গাছপালার রেখামাত্র দেখা যাইতেছে। উপরে কেবল আকাশ, নীচে কেবল জল।"

মায়া এই চিন্তায় নিমগ্ন আছে, এমন সময়ে পিছনদিকে শিশু-কণ্ঠে কে ডাকিল—"মা!" মায়ার ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল, সে পিছন ফিরিয়া দেখে, তাহার সেই হবু ছেলে দু'হাত তুলিয়া তা'র কোলে উঠিবার জন্য ডাকিতেছে—"মা!" মায়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। দুই হাতে তাহাকে নাচাইতে লাগিল, আর বার বার চুমা খাইতে লাগিল। সে যত হাসে, মায়া তত চুমা খায়। তাহার হাসিরও বিরাম নাই, মায়ার চুমারও বিরাম নাই। এমন সময়ে নীচে হইতে জলদ-গম্ভীরস্বরে কে বলিয়া উঠিল—"মা কোথায় গো?" সে শব্দ কয়েক মাস ধরিয়া শুনিয়া শুনিয়া সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। মায়া ছেলেটিকে এক দাসীর কোলে দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

একটা নীচের তলায় এক জনের সহিত দেখা হইল। মায়া তাঁহাকে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তিনি আমাদের মস্করী। তিনি বলিলেন, "মা, আজ বেলা বড় অধিক হইয়া গিয়াছে, বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। তোমায় কেবল একটি কথা বলিয়া যাই। আসছে বছর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায়

মহারাজাধিরাজ সাংগায়ে বসিয়া শাস্ত্র, কাব্য ও শিল্পকলার পরীক্ষা লইবেন। তোমাকে কাব্য পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি শীঘ্র সাংগা ছাড়িয়া যাইব। সকল পণ্ডিত-সমাজেই আমাকে ঘুরিতে হইবে। আমি তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব।"

"সে কি বাবা! আমি কিসে পরীক্ষা দিব? আমি ত বাঙ্গালা বৈ আর কোন ভাষাই জানি না। শিল্পকলাতেও আমার তেমন অধিকার নাই।"

"তুই মা বাঙ্গালায় দু'টা গান লিখে রাখিস্। আর যা হয় কিছু শিল্পকার্য্য করিয়া রাখিস্। এত বড় মহাসভা হবে, তুই সেখানে থাকবি না, আমার তা ভাল লাগিবে না।"

"আপনার আজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইলাম। তবে কি আমার পোষ্যপুত্র লওয়ার সময় আপনি থাকিবেন না? এই যে আমার পোষ্যপুত্র লওয়া—সে ত আপনারই প্রসাদাৎ। আপনি না থাকিলে এ সব শিবহীন যজ্ঞের মত হইবে।"

"আসিব রে আসিব। যেখানেই থাকি, সে দিন ঠিক হাজির হইব। তোর কোলযোড়া ছেলে হবে, আমি দেখিব না ত দেখিবে কে?"—বলিয়াই মস্করী মায়ার গোলা ত্যাগ করিয়া গেলেন।

বিহারী বাহিরে মেয়ের গোলার কাজকর্ম্ম দেখিতেছিলেন। মায়া আসিয়া সেখানে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন—"বেলা অনেক হইয়াছে মায়া, এখনও তোমার খাওয়া-দাওয়া হয় নাই। যাও, তুমি এখন খাও গে।"

"বাবা, আজ ত বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। আপনি কেন আমার এইখানে খাওয়া দাওয়া করিয়া যান না।"

"না রে না পাগ্‌লী, দৌহিত্রের মুখ না দেখিলে কি মেয়ের বাড়ীতে খাইতে আছে? তুই যে দিন পোষ্যপুত্র নিবি, সেই দিন তোর বাড়ীতে খাইয়া যাইব।"

বিহারী চলিয়া গেল। মায়াও বাড়ীর ভিতর আসিলেন—আসিয়া দেখিলেন, সেই অল্পবয়সী ভিক্ষুণী তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে।

৪

বেলা এক প্রহর হইয়াছে। গুরুপুত্র স্নানাহ্নিক সারিয়া পাঠে বসিয়াছেন। তাঁহার হাতে একখানি তালপাতার পুথি, দেখিতে মাঝারি গোছের। তাহাতে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ আছে। সবগুলিই সহজধর্ম্মের মূলগ্রন্থ। সব সংস্কৃতে লেখা, প্রায়ই অনুষ্টুপ্ ছন্দে। গুরুপুত্র বাছিয়া বাছিয়া নিপুণ হইয়া একখানি গ্রন্থ পড়িতে লাগিলেন—তাহার নাম অদ্বয়সিদ্ধি। পুথিখানি এক রাজকন্যার লেখা। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি সহজধর্ম্মের অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কাহারও লেখা পাওয়া যায় না। তিনি সর্ব্বপ্রথম বজ্রবারাহীর পূজা প্রচার করেন। এ আমলের বৌদ্ধদের মধ্যে তাঁহার পসার-প্রতিপত্তি খুব বেশী হইয়াছিল। আমাদের গুরুপুত্র তাঁহারই কন্যার বই পড়িতেছেন—তিনি পড়িতেছেন :—

"ন কষ্টকল্পনাং কুর্য্যাৎ নোপবাসং ন চ ক্রিয়াম্।
স্নানং শৌচং ন চৈবাত্র গ্রামধর্ম্মবিবর্জ্জনম্॥
ন চাপি বন্দয়েদ্দেবান্ কাষ্ঠপাষাণমৃন্ময়ান্।
পূজামস্যৈব কায়স্য কুর্য্যাৎ নিত্যং সমাহিতঃ॥"

"কিছুতেই কষ্ট করিবে না, উপবাস করিবে না, ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার দরকার নাই, স্নান করিবে না, শৌচ করিবে না, 'গ্রাম্যধর্ম্ম' ত্যাগ করিবে না, কাঠ-পাথর-মাটীর দেবতাকে নমস্কার করিবে না। সর্ব্বদা নিপুণ হইয়া দেহেরই পূজা করিবে।"

তিনি আবার পড়িতেছেন :—

"সর্ব্বান্ সমরসীকৃত্য ভাবান্ নৈরাত্ম্যনিঃসৃতান্।
ভাবয়েৎ সততং মন্ত্রী দেহং প্রকৃতিনির্ম্মলম্॥"

"সকল ভাবপদার্থের মূলের অভাব, অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত ভাবপদার্থই এক। তাহাদের রস একই প্রকার। সুতরাং সাধকের উচিত, স্বভাবতঃ নির্ম্মল যে দেহ, তাহারই ধ্যান করা।"

গুরুপুত্র চিন্তা করিতেছেন :—তাই যদি হ'ল, দেহ যদি স্বভাবতঃই নির্ম্মল, তবে আমরা যে ময়লার কথা ভাবি, পাপের কথা ভাবি, সেটা ত দেহের স্বভাবসিদ্ধ নয়। সেটা উঠ্‌কা জিনিস, আসিয়া জুটে। তা'কেই বলে 'বিকল্প।' সে ত আসল জিনিস নয়। আসল জিনিসে ময়লা ধরিতে পারে না। সেই যে নির্ম্মল দেহ, তাহারই ধ্যান কর, তাহারই পূজা কর। সে পূজায় উপবাসাদি কিছুই করিবে না। যাহাতে কোনরূপ কষ্ট হয়, এমন কোন কার্য্যই করিবে না। কাঠ-মাটী-পাথর-দেবতা, এ উঠ্‌কা জিনিস। আসল জিনিস দেহ। তাহারই পূজা কর। এ পূজা,—এ ধ্যান,—কি প্রকার? যাহাতেই কায়ের ও মনের তৃপ্তি হয়, তাহাই করিতে হইবে। তাহাতে বন্ধমুক্তির কথাই কি?

"যেন যেন হি বধ্যন্তে জন্তবো রৌদ্রকর্ম্মণা।
সোপায়েন তু তেনৈব মুচ্যন্তে ভববন্ধনাৎ॥"

"যে সকল ভয়ঙ্কর কার্য্যের দ্বারা লোকে বদ্ধ হয়, কৌশলের সহিত সেই সকল কার্য্য করিলে তাহাতেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়।" সে কৌশল কি?—গুরুর উপদেশ। গুরুর উপদেশ হইলে—

"রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ॥"

"যে আসক্তিতে লোকে বদ্ধ হয়, সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়;—এই যে বিপরীত ভাবনা, এই যে রাগের বিপরীত শক্তি, ইহা বুদ্ধতীর্থিকেরাও জানিতেন না।"

শ্রীসমাজে বলেন:—

"পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্ন চ পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ॥"

"কামনার যে পাঁচটি বিষয় আছে, তাহার একটিকেও ছাড়িও না, তপস্যা করিয়া দেহকে পীড়ন করিবে না, সুখ ভোগ করিতে করিতেই যোগ ও তন্ত্রমতে 'বোধ' লাভ করা যায়।"

তবেই ত সুখ ছাড়া হবে না। সে সুখ আবার কোন অনির্ব্বচনীয় সুখ নয়। এই দেহেরই সুখ। 'পঞ্চকামোপভোগে'র সুখ। পঞ্চকামোপভোগের মধ্যে আবার স্ত্রীই সকলের প্রধান। কেন না, লক্ষ্মীঙ্করা বলিতেছেন:—

"সৈব ভগবতী প্রজ্ঞা সম্বৃত্যা রূপমাশ্রিতা।"

"তিনিই আসল প্রজ্ঞা। অথবা আসল প্রজ্ঞাই তিনি। তাঁহারই এই যে রূপ দেখিতেছ, সেটা উঠ্‌কা জিনিস—বিকল্প—মিথ্যা। ঐ রূপে ডুব দাও, আসল জিনিস দেখিতে পাইবে।" তাই আবার লক্ষ্মীঙ্করা বলিতেছেন:—

"সর্ব্ববর্ণসমুদ্ভূতা জুগুপ্স্যা নৈব যোষিতঃ।"

অর্থাৎ "কোন বর্ণের নারীকেই ঘৃণা করিও না।" ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করা আরও বলিতেছেন:—

"ন চাধ্যাসক্তিং কুর্ব্বীত একস্মিন্নপি যোগবিৎ।
সমতাচিত্তযোগেন ভাবনীয়ো ভবার্ণবঃ॥"

"কিছুতেই আসক্ত থাকিও না। ভবার্ণবে যত কিছু পদার্থ আছে, সব একাকার দেখিও, সমান ভাবিও, সকল পদার্থেই এক রসের আস্বাদ পাইবে।"

"ভগবতী আমাদের ধর্ম্মটাকে কি সুখেরই করিয়া গিয়াছেন। প্রথম বলিলেন, দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে। দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে। সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ, সেই আনন্দই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই আসল আনন্দ। যোষিৎসম্বন্ধে জাতিবিচার নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই।"

গুরুপুত্র এইরূপ ভাবিতেছেন, এবং মনে মনে মায়ার রূপকল্পনা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি ভিক্ষু আসিয়া খবর দিল—মস্করী আসিতেছে। মস্করীর নাম শুনিয়াই গুরুপুত্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—মস্করী?—আমার কাছে?—কেন? প্রকাশ্যে বলিলেন, "তাঁহাকে লইয়া আইস।" কিন্তু মনে মনে তাঁহার একটা বড়ই উৎকণ্ঠা হইল,—বড়ই ভয় হইল।

মস্করী সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইবামাত্র গুরুপুত্র দাড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। দুই জনে আসনে বসিলে মস্করী প্রথমেই আরম্ভ করিয়া দিলেন:—

"আপনি শুনিয়াছেন বোধ হয়, আস্‌ছে বছরে ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমার দিন রাজসভা হইবে। আমার অনুরোধ, আপনাকেও তাহাতে পরীক্ষা দিতে হইবে। আপনি অল্পবয়সেই যেরূপ নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছেন, আপনার গুরুর মুখে আপনার যেরূপ প্রশংসা শুনিয়াছি, তাহাতে আপনি সাতগাঁতে থাকিয়াও যদি আমাদের সভাতে উপস্থিত না হন, আমাদের সভা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"

"আমি কি বিষয়ে পরীক্ষা দিব?"

"কেন? আপনি অনেক ভাষা জানেন। আপনার যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তি আছে। আপনার গুরু বলেন, সহজধর্ম্মে আপনি অতি প্রবীণ। আপনাদের নিজের ধর্ম্মের উপরই যাহা হয় কিছু লিখিবেন। আমি সকলকেই সভায় যাইবার জন্য, পরীক্ষা দিবার জন্য, অনুরোধ করিতেছি। আপনি আমার একটু উপকার করুন। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে যে সকল বড় বড় বাচক, বড় বড় পাঠক, বড় বড় পণ্ডিত আছেন, সেই সকল বিহারের ও সেই সকল পণ্ডিতের নাম দিলে, আমি তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতে পারি।"

গুরুপুত্র, মস্করীর কোন কথাতেই 'না' বলিতে পারিলেন না; নিরীহ ভালমানুষটির মত মস্করীর সব কথাতেই সায় দিলেন। মস্করী যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমি যে শুধু পুরুষদিগকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তাহা নয়, অনেক স্ত্রীলোককেও নিমন্ত্রণ করিয়াছি। রাজকুমারী মায়া স্বীকার করিয়াছেন,

তিনি বাঙ্গালায় কবিতা লিখিয়া রাজসভায় উপস্থিত থাকিবেন। আচ্ছা, আপনাদের জ্ঞান-ডাকিনী-নিগু এখন কোথায়? আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে চাই। আপনাদের মধ্যে আর কে কে প্রতিভাশালিনী রমণী আছেন, জানিতে পারিলে, তাঁহাদিগকেও নিমন্ত্রণ করি।"

গুরুপুত্র বলিলেন:—"আপনি যখন এ অধমের সাহায্য লইতে এত দূর আসিয়াছেন, তখন আমি আমাদের দল হইতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের লইয়া যাইব ও যাহাতে তাঁহারাও পরীক্ষা দেন, তাহা করিব।"

"আপনার জয় হউক"—বলিয়া মস্করী প্রস্থান করিলেন।

গুরুপুত্র পুথিখানি বাঁধিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

১

এক দিন পিশাচখণ্ডী, জন দুই সাতশতী ব্রাহ্মণ ও সেই বিধুভূষণ ফরফরকে সঙ্গে লইয়া মায়ার গোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়া তাঁহাদের বসিবার জন্য ঠাকুরঘরে গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহারা আসিবামাত্র মায়া তাঁহাদের পদধূলি লইল ও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে সেই গালিচায় বসাইল, নিজে নীচে মেজের উপর বসিল।

মায়া বলিল, "আপনারা আসিয়াছেন; আমার দত্তকগ্রহণের একটি দিন করিয়া দিউন। বিশেষ, যখন বাবাঠাকুর আর বেশী দিন এখানে থাকিবেন না, তখন দিনটা কবে স্থির হইল, তাহা তাঁহার জানিয়া যাওয়া উচিত।" মস্করী, ফরফর মহাশয়কে বলিল—"আপনি দিনটা স্থির করুন।" ফরফর মহাশয় বলিলেন—"দিন আর কি স্থির করিব? সংক্রান্তিতে হ'তে পারে, পূর্ণিমায় হ'তে পারে, আর যুগাদ্যা তিথিতে হ'তে পারে। সংক্রান্তির মধ্যে আবার মহাবিষুবসংক্রান্তি প্রশস্ত। যুগাদ্যার মধ্যে সত্যযুগের আদি তিথি অক্ষয়-তৃতীয়াই প্রশস্ত। আর পূর্ণিমার মধ্যে আষাঢ়ী পূর্ণিমাই প্রশস্ত। কেমন হে ভায়া—" বলিয়া তিনি হরেকৃষ্ণ মুল্লুককে জিজ্ঞাসা করিলেন। মুল্লুক মহাশয় দুইবার গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন,—"কি জানেন দাদা মহাশয়, ক্রিয়াকর্ম্মটা করিতে গেলে আষাঢ়-শ্রাবণ মোটেই ভাল নয়; বসন্তকালটা বেশ। তা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে বলি, মহাবিষুবসংক্রান্তিতেই দিন করুন। না হয়, আপনি যা বল্লেন, অক্ষয়-তৃতীয়াতেই হউক। তা তুমি কোন্ দিনটা ভাল বল ধর্‌ধর্ মহাশয়?" তখন দ্বারিক ধর্‌ধর্ মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"আমরা এই দুইটা দিনই স্থির করিয়া দিয়াই যাই। তার পর রাজা বিহারী এই দুইটা দিনের মধ্যে একটা দিন ঠিক করুন। তাঁদের উপরও ত একটা ভার থাকা উচিত। তাঁহাদেরও ত রাজকার্য্যের সুযোগ অসুযোগ দেখা চাই। বিশেষ, তাঁহাকেও ত দিনকতক পরে পোষ্যপুত্র লইতে হইবে।"

এই সব কথা হইতেছে, এমন সময়ে এক লম্বা খাটলি ঠাকুরবাড়ী ঢুকিল। বেহারাদের সঙ্গে সঙ্গেই চোপদার, নিশানদার প্রভৃতি অনেক লোক ঢুকিল। খাটলি হইতে নামিয়া রাজা বিহারী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়াই ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিল। মায়া দাঁড়াইয়া উঠিল, পরে পিতার চরণধূলি গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণেরা বসিয়াই আশীর্ব্বাদ করিল। মস্করী বলিলেন—"আমরা ত মায়ার পোষ্য-পুত্র গ্রহণের দুটি দিন করিতেছি; একটি মহাবিষুব-সংক্রান্তি, অপরটি অক্ষয়-তৃতীয়া। এই দুইটি দিনের মধ্যে কোন্‌টি আপনার পছন্দ বলুন,—কোন্‌টিতেই বা আপনার সুবিধা বলুন। আর আপনারও ত পোষ্যপুত্র লইতেই হইবে, তা এই সঙ্গেই যদি ল'ন ত ইহার একটি দিনে আপনি, আর একটি দিনে মায়া পোষ্যপুত্র লউন। এবারে ঐ দুই দিনে দশ পনর দিন তফাৎ বৈ নয়।" কিছু চিন্তা করিয়া রাজা বিহারী বলিলেন,—"সংকল্পিত অর্থে বিলম্ব ভাল নয়; বিশেষ, যখন শুভ সংকল্প, আর ইহারই উপর দুইটি বেণে-বংশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আপনারা যেমন অনুমতি করিতেছেন, আমরা ঐ দুই দিনেই দত্তক গ্রহণ করি, আমি মহাবিষুব-সংক্রান্তির দিনে, আর মায়া অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে।" ব্রাহ্মণেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—"সাধু সাধু।" তখন রাজা বিহারী বলিলেন—"একটা গোলের কথা আছে। এ ক্ষেত্রে রাজার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন এরূপ কার্য্য হইতেই পারে না। তা তিনি ত সবে সে দিন এখান হইতে গিয়াছেন, ইহারই মধ্যে আবার তাঁহাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে আমি ত পারিব না।"

মস্করী বলিলেন—"ইহার জন্য আপনাকে আর ভাবিতে হইবে না। আমি আপনার জ্ঞাতির একটি

ছেলে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব। তিনি ক্ষত্রিয় রাজা—এক জন ব্রাহ্মণ সঙ্গে না থাকিলে, আপনাদের জাতির নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন, যদি স্বয়ং না আসিতে পারেন, কোন জ্ঞাতির ছেলেকে পাঠাইবেন; অন্ততঃ ভবদেব ভট্টের উপর ভার দিবেন। আপনি বেশ কথা বলিয়াছেন, আপনি এখানকার রাজা, সকলে আপনার অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু আপনার নিজের কার্য্যে ত তাহা হইতে পারে না, মায়ার কার্য্যেও তাহা হইতে পারে না।—সে যা হউক, আমি ত এখানে থাকিব না, আমাকে রাজসভার নিমন্ত্রণের জন্য যাইতে হইবে। আপনার জন্য, ভবদেব ভট্টের জন্য, আর মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের জন্য আমাকে ভাটের কার্য্য করিতে হইবে। আমি তাহাতে আমার লাঘব হয় বলিয়া মনে করি না, বরং গৌরব বলিয়াই মনে করি। আপনাদের ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য আমি এই তিন জন ব্রাহ্মণকে আনিয়াছি। ইঁহারা পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও কর্ম্মঠ। ইঁহাদের শূদ্র যজমান আছে। ইঁহাদের উপর আপনাদের কার্য্যের সমস্ত ভার দিয়া গেলাম। ইঁহারা যেমন বলেন, সেইমত আয়োজন করুন। যদি অন্য ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হয় ত ইঁহারাই আনিয়া দিবেন। এই যে বিধুভূষণ ফবৃফবৃ মহাশয়কে দেখিতেছেন, ইঁহার বয়স ৯০ বৎসরেরও উপর। ইঁহার যেমন ব্রহ্মচর্চ্চস, তেমনটি প্রায় দেখা যায় না। ইনিই জীবন ধনীর প্রতিমায় জীবনদান করিয়া তাঁহাকে কথা কহাইয়া মায়ার পোষ্যপুত্রগ্রহণের অনুমতি দেওয়াইয়াছিলেন। নহিলে শাস্ত্রানুসারে মায়া ত পোষ্য গ্রহণ করিতে পারে না। স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীলোক পোষ্য গ্রহণ করিতে পারে না।"

এই কথা শুনিয়া রাজা বিহারী দাঁড়াইয়া উঠিলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে লইলেন এবং ভক্তিগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন;—"আপনি আমার জামাইয়ের বংশরক্ষা করিয়া দিলেন। আপনাকে আর কি দিব? ফবৃফবৃ গ্রামের পূর্ব্বদিকে হরিপুর গ্রামখানি আপনাকে দান করিলাম। মহারাজাধিরাজের স্বহস্তাঙ্কিত দানপত্র যথাসময়ে আপনাকে আনাইয়া দিব।" "মহারাজের জয় হউক"—বলিয়া ব্রাহ্মণ দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

২

অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন মায়ার গোলায় প্রকাণ্ড উঠানের উপর প্রকাণ্ড পা'ল টাঙান হইয়াছে। পা'লের নীচে সভার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সভারোহণের জন্য উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ে ৫৬ গ্রামী ও সাতসইকা পরগণার চব্বিশগ্রামী সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, বারেন্দ্র, বৈদিক-ব্রাহ্মণও অনেক আছেন। তাঁহারা উঠানের উত্তরদিকে বসিয়াছেন। বেণে চার আশ্রমেরই আছেন, তাহার উপর শঙ্খবণিক্, কংসবণিক্ প্রভৃতিও আছেন। কায়স্থকুলও আসিয়াছেন। বৌদ্ধদের মধ্যেও মাথাল মাথাল লোক সব আসিয়াছেন। গুরুপুত্রও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অনেক ভিক্ষুণীও আসিয়াছেন। সমস্ত উঠানটা যেন জম্‌জম্ গম্‌গম্ করিতেছে। সকলের মধ্যস্থলে মহারাজাধিরাজের স্বর্ণসিংহাসন, দুই পাশে দুই রৌপ্য-সিংহাসন। রাজা বিহারী নিজে থাকিয়াই সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন ও মিষ্টবাক্যে আপ্যায়িত করিতেছেন। উঠানের উত্তরে চণ্ডীমণ্ডপে হোমের জায়গা হইয়াছে।

উঠানের চারিদিকে চারি দেউড়ীতেই বাজনার রোল উঠিয়াছে। কোন দেউড়ীতে ঢাক, ঢোল ও কাঁসি; কোন দেউড়ীতে, দামামা, দগড়া ও বাঁশী; আর এক দেউড়ীতে দুন্দুভি, করতাল ও ঝাঁঝ; আর এক দেউড়ীতে—মৃদঙ্গ, বীণা ও করতাল। যখন সব দেউড়ীতে একত্র বাজিতেছে, তখন শব্দের রোলে আকাশ ফাটিতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপে পোষ্যপুত্র গ্রহণের জায়গা হইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের ঠিক মাঝখানে ঘটস্থাপন করিয়াছে। একটা কলসী, তাহাতে জল পোরা; তাহার উপর আম্রপল্লব, তাহার উপর একটি ডাব ও কলসীর সম্মুখদিকে তিনটি সিন্দুরের রেখা। চণ্ডীমণ্ডপের ডানদিকে হোমের উদ্যোগ হইতেছে ও বাঁদিকে আভ্যুদয়িক হইতেছে। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীমণ্ডপের কর্ত্তা। মুল্লুক মহাশয়, ধবৃধবৃ মহাশয় ও ফবৃফবৃ মহাশয় খুব ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; চাকরদের খুব ধমক দিতেছেন; মায়া সেখানে আছেন, তাঁহার উপরও খুব তম্বী হইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বারেন্দ্র, মিথিলা ও উৎকল প্রভৃতি নানা দেশের কর্ম্মকাণ্ডী পণ্ডিতেরা বসিয়া আছেন ও কি পদ্ধতিতে পোষ্যপুত্র লওয়া হয়, তাহাই দেখিতেছেন। এক জন দক্ষিণরাঢ়ী পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "স্ত্রীকর্ত্তৃক ক্রিয়ায় আভ্যুদয়িকের নিয়ম নাই; এক্ষণে আভ্যুদয়িক কেন হইতেছে?" তখন উভয় পক্ষের পণ্ডিতের মধ্যে খুব বিচার বাধিয়া উঠিল। এক জন বলিয়া উঠিল,—"স্ত্রীর প্রেতশ্রাদ্ধেই অধিকার আছে; আভ্যুদয়িকে তাহার আবার অধিকার কি?" আর এক জন বলিলেন,—

"যদিই করিতে হয়, প্রতিনিধির দ্বারা করিতে হইবে।" এক জন বলিলেন,—"পুরোহিত প্রতিনিধি হইবেন।" আর এক জন বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি? বেণের প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ? এক জন ধনিবংশেরই প্রতিনিধি হইবেন।" ক্রমে বিবাদ এত গুরুতর হইয়া উঠিল যে, মস্করী মহাশয় সমস্ত ব্যাপারটা ভবদেব ভট্টের নিকট বলিলেন। তিনি মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, এখনও বঙ্গভূমির ব্রাহ্মণের জন্য পদ্ধতি লেখা হয় নাই। শূদ্র-পদ্ধতির ত কথাই নাই। সে যে কবে লেখা হইবে, তাহারও ঠিক নাই। আমি যখন ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, পদ্ধতিও লিখিয়া দিব। কিন্তু রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় পারিয়া উঠি নাই; সুতরাং সাতশতীরা আবহমান যাহা করিতেছে, তাহাই করুক; তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না।"

৩

আভ্যুদয়িক আরম্ভ হইয়া গেল। সাতশতীদের আভ্যুদয়িক নূতন রকমের। তাহাতে বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় সর্ব্বপ্রথমে যে ভোজ্য উৎসর্গ হয়, তাহা হইল না ও তাহার দক্ষিণান্তও হইল না; তাহার পর যে চারিটি ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হয়, গঙ্গা, যজ্ঞেশ্বর, বাস্তুপুরুষ ও ভূস্বামীর পিতৃগণের নামে, সে চারিটি ভোজ্য উৎসর্গ হইল না। মায়া দক্ষিণাস্য হইয়া বসিলেন, আচমন করিলেন, পুরোহিত তাঁহাকে দুইটি হস্ত-কুশ দিলেন। বলিলেন, "অনামিকা অঙ্গুলিতে পর।" সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডীরা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল, "একে স্ত্রীলোক, তাহাতে শূদ্র, কুশে উহার অধিকার কি? দূর্ব্বা দিয়া উহার হস্ত-কুশ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।" অনেক গোলমালের পর কুশই রহিয়া গেল। সঙ্কল্পের পর সাতখানি পাত্র সাজান হইল, যত কিছু উৎকৃষ্ট খাবার পাত্রে রাখা হইল। সাত জন সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সকলেই পণ্ডিত, ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠবান্—সাত পাত্রে বসিয়া গেলেন। দেবপক্ষের দুই জন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিলেন; পিতৃপক্ষের তিন জন উত্তরাস্য হইয়া বসিয়াছেন; আর মাতামহপক্ষের তিন জন সেই সারেই বসিলেন। আবার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ভিতর গোল বাধিয়া গেল। অনেকে বলিলেন, "কলিতে পংক্তি-ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণ মিলে না। সে জন্য দর্ভময় ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধ করা প্রথা হইয়া গিয়াছে। সারা বাঙ্গালা, মিথিলা, সরযূপার, নেপাল, উড়িষ্যা সব জায়গায়ই দর্ভময় ব্রাহ্মণ দিয়া শ্রাদ্ধের ব্যাপার চলিয়া গিয়াছে; এখানে এ আবার কি?" তখন বিধুভূষণ ফরুফর্ বলিয়া উঠিলেন,—"প্রতি হাতে এরূপ আপত্তি করিলে ক্রিয়া পণ্ড হইয়া যাইবে যে? আমার নব্বই বৎসর বয়স হইতে চলিল, বরাবর শূদ্রদের যে ভাবে কার্য্য করাইয়া আসিয়াছি, এখনও সেই ভাবেই করাইব. তাহাতে ত্রুটি হয়,—ধর, ঘাড় পতিয়া লইব। অন্য দেশে কি আছে না আছে, তাহা দেখিবার দরকার নাই। আমরা সাক্ষাৎ নুগড়াচার্য্যের শিষ্য, তিনিই বেদের প্রথম টীকা লেখেন। তিনিই আমাদের দেশে আগাগোড়া বেদ মুখস্থ করা বন্ধ করিয়া দিয়া যান। যে জাতির যেরূপে ক্রিয়া করিতে হইবে, তিনিই আমাদের শিখাইয়া যান।" নুগড়াচার্য্যের নামে ও ফরুফরের রাগে অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডীরা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ক্রিয়া চলিতে লাগিল।

এই যে সাত জন ব্রাহ্মণ বসিয়াছেন, ইঁহাদের নাম পংক্তি। পংক্তি এক জনে হয়, তিন জনে হয়, পাঁচ জনে হয় ও সাত জনে হয়। সাত জনের অধিক ব্রাহ্মণ দরকার হয় না। শ্রাদ্ধেই পংক্তির দরকার হয়; অন্য কিছুতে দরকার হয় না; বাছিয়া বাছিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়া পংক্তিতে বসাইতে হয়। কাণা, খোঁড়া, কুরূপ, কুৎসিত, ধবলওয়ালা, কুষ্ঠওয়ালা, কুনখী, কুদন্তী পংক্তিতে লইতে নাই। পংক্তির ব্রাহ্মণ বড় বাছিয়া লইতে হয় বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তে দর্ভময় ব্রাহ্মণ চলিতেছে। কিন্তু দক্ষিণে এখনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, সে জন্য তাঁহারা পংক্তি হন ও ব্রাহ্মণ-পংক্তিতে বসেন। মায়া পুষ্প-চন্দন-বস্ত্র-অলঙ্কার দিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিলেন, তাঁহাদের সৌমনস্যবিধানের জন্য প্রচুর ধূপ-ধূনা পোড়াইলেন এবং গন্ধদ্রব্য তাঁহাদের উপর বৃষ্টি করিলেন। এইরূপ পূজায় যখন তাঁহাদের মন অমল প্রফুল্ল হইল, তখন মায়া তাঁহাদের হস্তে এক একটি ফল তুলিয়া দিলেন। তাঁহারা সেই ফল খাইলেন ও পরে পাত্র হইতে অনেক ফল-মূল ও মিষ্টান্ন লইয়া ভোজন করিলেন। ভোজনে তৃপ্ত হইয়া তাঁহারা পাত্র ছাড়িয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ভোজনের স্থান পরিষ্কার করা হইল। মায়া সেখানে বসিয়া পিণ্ডদান করিলেন ও দক্ষিণান্ত করিলেন। পংক্তির ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা লইলেন ও বলিলেন,—"আমরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমাদের জাত-ভাই আমাদের সঙ্গে খাইবে না, সে জন্য আমাদের কিছু পয়সা দাও। সে জন্য তাঁহাদিগকে কিছু পয়সা দেওয়া হইল,—

তাঁহারাও তাহা যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং 'কল্যাণমস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

৪

ওদিকে যে সকল ব্রাহ্মণেরা হোমের স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মায়ার একহাত-প্রমাণ চৌকা জমী মাপিয়া লইয়া তাহার উপর কয়েক সরা বালি ছড়াইয়া দিলেন, সেই বালির উপর এ দিকে দেড় আঙুল ও দিকে দেড় আঙল বাদ দিয়া একটি ২১ আঙুল রেখা টানা হইল। ব্রাহ্মণেরা যে দিকে বসিয়াছিলেন, সেই দিকেই রেখা টানা হইল। সেই রেখার ডাইন ধার হইতে পূর্ব্বমুখে একটি রেখা সাত আঙুল পর্য্যন্ত টানা হইল। তাহার পর মূল-রেখার সাত আঙুল বাদ দিয়া আর একটি রেখা টানা হইল। যে অস্ত্র দ্বারা রেখা টানা হইল, তাহার নাম স্ফ্য। স্ফ্যখানি কাঠের তয়েরী—ছোরার মত। বাঁট আছে, আগাটি সরু, সামনের দিক্ ধার, পিছনের দিক্ মোটা। আগাটি ঠিক মাঝে না হইয়া একটু পিছনের দিক আছে। পূর্ব্বাগ্র রেখাগুলি টানিতে যে বালিগুলি উঠিল, বৃদ্ধা ও অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা সেগুলিকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর বহ্নিস্থাপন। তিনটি রেখা টানায় দুইটা ঘর হইয়াছে ও বামদিকের ঘরে কাঁসার পাত্রে বহ্নি আনিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইল।

বহ্নি কোথা হইতে আনিবে? এক—যারা অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া বিবাহ করে ও সেই অগ্নি বরাবর রাখে, তাহাদের বাড়ী হইতে অগ্নি আনা যাইতে পারে, অথবা মন্থন করিয়া অগ্নি আনা যাইতে পারে। মায়া স্থির করিল, মন্থন করিয়া অগ্নি বাহির করিতে হইবে।

একখানি শুকনো অশ্বত্থকাঠ আনাইয়া তাহার মাঝে একটি ছেঁদা করাইল। সেই ছেঁদার মধ্য দিয়া একটি শাঁইবাবলার মোটা গোল করিয়া কোঁদা কাঠ অশ্বত্থের সেই ছেঁদায় বসাইয়া দিল। (বাঙ্গালায় শমীবৃক্ষ নাই, সে জন্য শাঁইবাবলার গাছে শমীবৃক্ষের কার্য্য করে)। ব্রাহ্মণেরা সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সেই শাঁইবাবলার কাঠ ঘুরাইতে লাগিলেন্। অগ্নি সমিন্ধানে ব্যবহার হয় বলিয়া এই মন্ত্রগুলির নাম হইয়াছে সামিধেনী। ক্রমে যখন ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেশ একটু সহল হইয়া আসিল, তখন দুই পাশে দুই দল ব্রাহ্মণ বসিয়া দড়ী দিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে সামিধেনী মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। কাঠগুলি ক্রমে খুব গরম হইয়া উঠিল। তাহার পর ধোঁয়া বাহির হইল, তাহার পর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির একখানি আঙরা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বাকীটা কাঁসার পাত্রে করিয়া বালির উপর ঢালিয়া দেওয়া হইল। তখন পুরোহিত আগুনের কাছে বসিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিলেন; অর্থাৎ গাওয়া ঘিয়ে চামচের আকার কাঠের স্রুক্ ডুবাইয়া অগ্নিতে তিনটি আহুতি দিলেন,—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা।

৫

পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদ লইয়া, বহ্নিকে সাক্ষী করিয়া, এইবার পোষ্যপুত্র লওয়া হইবে। হোমের স্থান ও আভ্যুদয়িকের স্থানের মাঝখানে খুব জাঁকাল বিছানা করা হইয়াছে,—মখমলের বিছানা, জরীর কাজ, উপরে চাঁদোয়া। চাদোয়ার ঝালরে মুক্তা ঝুলিতেছে। মধ্যে বসিয়া আছে সাধন ধনী—যিনি পুত্র দিবেন, তাঁহার স্ত্রী ও রাজা বিহারী দত্ত। বহ্নিস্থাপন করিয়া এবার ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "এইবার পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি লও।" তখন বিহারী ও মঙ্করী মায়াকে সঙ্গে করিয়া প্রথমতঃ রাজসিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহারাজাধিরাজ হরি বর্ম্মা আসেন নাই, তাঁহার ভায়ের পৌত্র শ্যামল বর্ম্মা আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিলে, তিনি যে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণসিংহাসনে মহারাজাধিরাজের যে তরবারি ছিল, তাহা মায়ার অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বড় ঠাকুরদাদার নাম উচ্চারণ করিয়া অনুমতি দিলেন। মায়া উঁহাকে কয়েকটি স্বর্ণ-মুদ্রা উপহার দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, একটি দশমণি সিধা তাঁহার বজরায় পৌঁছে। তাহার পর ভবদেব; তিনিও অনুমতি দিয়া কয়েকখানা স্বর্ণ মুদ্রা পাইলেন এবং একটি বড় সিধা পাইলেন। তার পর প্রধান সেনাপতি—তিনিও একটি সিধা ও স্বর্ণ-মুদ্রা পাইলেন। শ্যামল বর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সমারোহ-কার্য্যের অধ্যক্ষ কে?" অধ্যক্ষ ত ভবদেব শর্ম্মা নিজে। বিহারীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই ভবদেব বলিয়া উঠিলেন, "এই কার্য্যে ভবতারণ পিশাচখণ্ডী অধ্যক্ষ।" তখন শ্যামল বর্ম্মা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাথায় এক শালের ফেটা বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর মঙ্করী ও

মায়া এক দিকে অনুমতি লইতে গেলেন, আর এক দিকে গেলেন রাজা বিহারী দত্ত নিজে। আর দুই দিকে অনুমতি লইতে গেলেন দত্তবাড়ীর প্রাচীনেরা ও ধনিবাড়ীর প্রাচীনেরা। মস্করী মায়াকে লইয়া রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল-ব্রাহ্মণদের অনুমতি লইয়া, যেখানে বৌদ্ধেরা বসিয়াছিলেন, সেইখানে গেলেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রধান পুরুষ গুরুপুত্র। মায়া তাঁহার অনুমতি লইতে আসিতেছেন, সঙ্গে মস্করী,—দেখিয়াই গুরুপুত্র থতমত খাইয়া গেলেন। তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া গেল। মায়ার কিন্তু গলা একবারও কাঁপিল না। সে বলিল, "আচার্য্য, মহাপণ্ডিত, মহাস্থবির, ভদন্ত, আমি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিব, আপনারা প্রসন্ন-মনে অনুমতি করুন।" গুরুপুত্র মনে মনে বলিলেন, "কি শীকারই পলাইল!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অনুমতি আছে। সাতগাঁয়ে একটি প্রধান ধনিবংশ রক্ষা হইয়া যাইবে, ইহাতে কে আপত্তি করিবে?" মায়া তাঁহার সম্মানের সিধা ও স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া গেলেন এবং অন্যান্য বৌদ্ধ মঠাধিকারীদেরও সেইরূপ সম্মান করিয়া গেলেন।

যাঁহারা অনুমতি লইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়া সাধন ধনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত যোড় করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "আপনার এই নূতন (পঞ্চম) ছেলেটির আজও চূড়াকরণ হয় নাই। আপনি এইটিকে আমাকে দিন। আমি ইহাকে পোষ্যপুত্র লইব; ইহার দ্বারা আমার স্বামীর নাম ও গোত্র রক্ষা হইবে।" সাধন ধনী ছেলেটিকে কোলে করিয়াছিল, সে ছেলেটিকে মায়ার কোলে দিবার সময় বলিল, "আমি এই ছেলেটিকে তোমায় দিলাম, ইহার দ্বারা তোমার স্বামীর নাম ও গোত্র রক্ষা হইবে। তুমি ইহাকে মায়ের মত প্রতিপালন করিবে।" সাধন ধনী মনে করিয়াছিল, সে বীরের মত পুত্রটিকে দান করিবে, কিন্তু তাহা পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বর বদ্‌লাইয়া গেল; সে কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার মনকে স্থির করিল ও ছেলেটিকে মায়ার কোলে দিল। চারিদিকে বাদ্য বাজিয়া উঠিল সভাস্থ সকলে সাধু সাধু বলিতে লাগিল; চারিদিকে চারি দেউড়ীতে বাজনা বাজিয়া উঠিল; ঘোর রোলে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গানে ও বাজনায় আনন্দের ফোয়ারা উঠিতে লাগিল। এ দিকে দশ জন চাকর ছেলেটিকে সাজাইতে লাগিল,—নানারূপ রেশমের কাপড়ে ও হীরা জহরতে গরীবের ছেলে এক দণ্ডের মধ্যে বড়মানুষের ছেলে হইয়া উঠিল। মায়া তাহাকে কোলে করিয়া হোমের স্থানে উপস্থিত হইলেন; পুরোহিতেরা তাহাকে হোমের ঘি খাওয়াইয়া দিলেন। মায়াও যে গোত্রের, ছেলেটিও সেই গোত্রের; অতএব গোত্রান্তর করিতে আর কোন বিশেষ ক্রিয়ার আবশ্যক হইল না।

মায়া ছেলে কোলে করিয়া বিছানায় আসিয়া বসিলে, সকলেই ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিল। প্রথমে রাজা আসিলেন; তিনি এক ছড়া মুক্তার মালা দিলেন। তাহার পর ভবদেব আসিলেন; তিনি একখানি কেয়ূর দিলেন। ব্রাহ্মণেরা কেহ বা শুদ্ধ ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া, কেহ বা কিছু সোনারূপা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। ধনী বেণে ও অন্যান্য জাতিরা বিস্তর উপহার দিল। ধান্য দূর্ব্বাগুলিতে ছেলেটি চাপা পড়ার মত হইলে সেগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু হীরা-জহরত এত জমিল যে, ছেলের চেয়ে উঁচু হইয়া উঠিল। এমন সময়ে যিনি হোম করিতেছিলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমার হোম হইয়াছে, তোমরা ফোঁটা লও।" সকলের আগে ফোঁটা লইলেন ছেলে; হোমের ঘিয়ে হোমের কয়লা ঘষিয়া প্রথম কপালে, পরে কণ্ঠায়, পরে দুই কাঁধে, পরে বুকে ফোঁটা লওয়া হইল। তাহার পর লইলেন মা; তার পর লইলেন বিহারী দত্ত। তাহার পর যে আসিল, পুরোহিতেরা তাহাকেই ফোঁটা দিতে লাগিল।

ইহার পর শান্তি-জলের ব্যবস্থা। কিন্তু অনেকেই বলিয়া উঠিল, "আমরা এখনও ছেলে আশীর্ব্বাদ করিয়া উঠিতে পারি নাই।" সুতরাং শান্তি-জল স্থগিত রহিল। যে সকল লোক আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধরাই বেশী,—প্রত্যেক মঠধারী আপন আপন মঠের পুষ্প-চন্দন আনিয়াছিলেন ও ছেলেকে কিছু না কিছু মহামূল্য উপহার দিলেন। গুরুপুত্র হেরুকের প্রসাদী এক ছড়া মালা দিলেন আর একটি হীরার মাছ দিলেন। যে আটটি মাঙ্গল্য দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে মাছই সকলের আগে। গুরুপুত্রের মাছটির দুই চোখে দুইটি হীরা, নানা রকম পাথরে এমন ভাবে গড়া যে, মাছটি যেন নড়িতেছে। তিনি মাছটি, একটি সোনার হারে গাঁথিয়া আনিয়াছিলেন; ছেলের গলায় পরাইতে গিয়া তাঁহার দুইটি আঙুল মায়ার গায়ে লাগিল; সহসা যেন গুরুপুত্রের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। গুরুপুত্র যেন হঠাৎ হতচেতন হইয়া গেলেন; কিন্তু অল্পেই আত্মসংবরণ করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। বৌদ্ধস্পর্শে

মায়া যদিও একটু বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার মনে হইল যে, তিনি এক জন বৌদ্ধ-ভিক্ষু, মহাবিহারের অধিকারী, লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানে, তখন তাহার আর সে বিরক্তি রহিল না। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিবার তাহার অবসর ছিল না ;—থাকিলেও সে কথাটা সে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরিত না। সকলে আশীর্ব্বাদ করিলে শান্তি-জল। সভাশুদ্ধ লোক পা ঢাকিয়া বসিল। বিধুভূষণ ফবুরু মহাশয় নারিকেলটি সরাইয়া দিয়া আম্রপল্লব জলে ডুবাইয়া সকলের গায়ে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন ও মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার হাত এমন দুরন্ত ছিল যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সভার সমস্ত লোকের গায়ে শান্তিজল ছড়াইয়া দিলেন এবং সকলেই "শান্তি শান্তি শান্তি—হরি হরি" বলিয়া উঠিল।

৬

তাহার পর ভোজনের পালা। গোলার দোতলার বারন্দায় ব্রাহ্মণদের পাত হইয়াছে। প্রায় ৪।৫ শত ব্রাহ্মণের জায়গা হইয়াছে। সাতশতীরা ফলার করিবেন, অর্থাৎ চূড়া, ছল্লা, মিষ্টান্ন খাইবেন রাঢ়ী-শ্রেণীরা কেহ কেহ দৈ ও দৈয়ের ফলার করিবেন, কেহ বা শুদ্ধ ফল ও সন্দেশ খাইবেন। অনেকেই শূদ্রের বাড়ী জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন না। পাত প্রায় প্রস্তুত, এমন সময়ে গোল উঠিল, ধনাদের গোলা গঙ্গার তিন শত হস্তের মধ্যে,—উহা গঙ্গাতীর। এখানে খাওয়াও যাইতে পারে না, দান লওয়াও যাইতে পারে না। ভাদ্রমাসের চতুর্দ্দশীর দিন যতদূর জল উঠে, ততদূর গঙ্গার গর্ভ ; তাহার পর তিন শত হাত গঙ্গার তীর। তাহার পর গঙ্গার ক্ষেত্র। গর্ভ ও তীরে কাহারও ভোজন করিতে নাই, দানও লইতে নাই। তবে যে মায়া ব্রাহ্মণগণকে সিধা ও স্বর্ণমুদ্রা দিলেন, সেটা অনুমতি দেওয়ার সম্মান। "অদৃষ্টার্থ ত্যক্ত দ্রব্য নহে," সুতরাং দান নহে। গোলায় ত কিছুতেই খাওয়া হইতে পারে না। গোল উঠিলেই রাজা বিহারী গোলা হইতে একটু পশ্চিমে পালধি মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড নাটচালা ছিল, সেইখানে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার লোকবলের অভাব ছিল না, মুহূর্ত্তমধ্যে ৪।৫ শত ব্রাহ্মণের স্থান প্রস্তুত হইল, পরিবেশনও হইয়া গেল। অনেক ব্রাহ্মণ—যাঁহারা শূদ্রান্নং শূদ্রবেশ্মনি খাইতে রাজী ছিলেন না, ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উদ্যোগ হওয়ায় তাঁহারাও বসিয়া গেলেন।

গোলার বারান্দায় অন্যান্য জাতি বসিল। ইহারা, বিহারীর কাজ যে সবই ভাল হইবে, তাহা বেশ জানিত, তাই একটি কথাও কহিল না। তিনি যেমন যেমন বলিলেন, ঠিক তেমনি তেমনি করিতে লাগিল। বৌদ্ধরা একটা প্রবল সম্প্রদায়। তাহাতে অনেক জাতি, অনেক ব্যবসায়ী, অনেক গৃহস্থ, অনেক অর্দ্ধ-গৃহস্থ, অনেক পূরা গৃহস্থ ! বৌদ্ধদের বিকাল-ভোজন নিষেধ। বিকাল শব্দের অর্থ দ্বিকাল। তাহারা দিনে দুবার খাইবে না। সকালে ১২টার মধ্যেই খাইবে। না খাইলে সমস্ত দিন কেবল ফলরস বা দুধ খাইয়া থাকিবে। কোনও কঠিন জিনিস খাইতে পাইবে না। কিন্তু বৌদ্ধেরা এখন আর বিকাল-ভোজন নিষেধ মানে না ;—দুই বেলা খায় ;—অসময়েও খায়। দু'চার জন বিকালভোজন করে না। তাহাদের মধ্যে প্রায় মঠের অধ্যক্ষেরা। আমাদের গুরুপুত্র বিকাল-ভোজন করেন না। কিন্তু মায়া তাঁহারই উপর সমস্ত বৌদ্ধদের খাওয়াইবার ভার দিয়া দিলেন। গুরুপুত্রও কোমর বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। রাজার ভাণ্ডার, ফুরাইবার নহে ; সকলেই পরম তৃপ্ত হইয়া ভোজন করিয়া গেল। তখন মধুশ্রী ও মায়া গুরুপুত্রকে ধরিয়া বসিল, আপনাকে কিছু ফলরস পান করিতে হইবে। যে কয়জন মঠাধিকারী ভোজন করেন নাই, মায়া স্বহস্তে তাঁহাদিগকে আনারস, তরমুজ, ফলসার সরবৎ, দুধ, ঘোল প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়া দিলেন। তাঁহারাও তৃপ্ত হইয়া গেলেন।

যত লোক আসিয়াছিলেন, সকলেই বেশ তৃপ্ত হইয়া গেলেন। কেবল দু'জনের মুখ ভার। এক জন দাদন ধনী ;—পাঁচটি ছেলে থাকিলেও একটি ত আজ থেকে তাঁহার পর হইয়া গেল। তাঁহার মনটা ঠিক প্রফুল্ল নয়। আর গুরুপুত্র আজ যাহা দেখিলেন, সবই অদ্ভুত। এমন মেয়ে ত তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। একদিকে বজ্রাদপি কঠোর, আবার আর একদিকে কত নরম,—যেন মাটীর মানুষ। তাঁহার মনের কথা সব জানি না ; তবে তিনি বড়ই বিচলিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

৭

সমস্ত নিমন্ত্রিত লোক বসিয়া গেলে ছেলের কথা মায়ার মনে পড়িল। সে ছুটিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গেল, দেখিল, বিছানার উপর ছেলে খেলা করিতেছে। ৪।৫ জন চাকর চাকরাণী তাহাকে খেলা দিতেছে।

মায়া গিয়াই ছেলেটিকে কোলে করিল ও মুখে চুমা খাইল; বলিল,—"আমি তোমার কে বল দেখি?" সে বলিল, "নূতন মা।" "তোমার নূতন বাবা দেখিবে?" ছেলে বলিল,—"নূতন মা, নূতন বাবা, দেখিব বৈ কি—কৈ?" মায়া বলিল,—"চল দেখাই গে।" ছেলে কোলে করিয়া সে একলা গঙ্গার ধারেই যে এক সারি ঘর আছে, সেই দিকে গেল। একটা ঘরে ঢুকিয়া সেই ঘরের ভিতর দিয়া আর এক ঘরে গেল। গঙ্গার ধারের বড় জানালা খুলিয়া দিল, আলো আসিলে জীবন ধনীর পিশাচখণ্ডের সেই প্রতিমাখানি দেখা গেল। সে প্রতিমা এখনও ঠিক তেমনি আছে। কেন না, পিশাচখণ্ডের এক জন কুমার আসিয়া প্রতি সপ্তাহে রং চটিলে রং দিয়া যায়, মাটী চটিলে মাটী দিয়া যায়। প্রতিমার সম্মুখে মায়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল, ছেলেকেও বলিল—"নম কর।" ছেলেও মাটীতে মাথা ছোঁয়াইয়া নমস্কার করিল। সে ঘরে ধূপ-ধূনা, ফুল-চন্দন, দূর্ব্বা, আলো চাউল, অগুরু-গুগ্‌গুল সর্ব্বদা তৈয়ারী থাকে। মায়া ফুল-চন্দন ধূপ-ধূনা দিয়া প্রতিমা পূজা করিল, খানিক কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করিল, তার পর হাত যোড় করিয়া বলিল—"তোমারই হুকুমে তোমারই নাম ও গোত্র রক্ষার জন্য তোমারই জ্ঞাতি সাধন ধনীর এই ছেলেকে আমি পোষ্যপুত্র লইয়াছি। এখন ইহার মঙ্গলামঙ্গল তুমি দেখিবে। ইহাকে তোমারই হাতে অর্পণ করিলাম।" মায়া স্তম্ভিত হইয়া শুনিল, কে যেন বলিল,—"পরমায়ু বাড়ুক।" প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া মায়া দেখিল, প্রতিমার ঠোঁট দুটি যেন নড়িতেছে।

স্বামীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া মায়ার মহা আহ্লাদ হইল। সে ছেলেকে আবার বলিল, "নম কর।" ছেলে নমস্কার করিয়া বলিল, "এ কে?" "তোমার নূতন বাবা।" ছেলে বলিল, "পুতুল বাবা,—মাটীর বাবা।" মায়া ছেলে কোলে করিয়া আর একটি ঘর খুলিল ও গঙ্গার দিকে যে জানালা ছিল, তাহা খুলিয়া দিল। সে ঘরে জীবন ধনীর সাঁজোয়া, পাগড়ী, আঙরাখা, তীর, ধনুক, তূণ, জুতা, কাপড় সব সাজান ছিল। মায়া প্রত্যেকটির কাছে গিয়া নমস্কার করিল ও ছেলেটিকে 'নম' করাইয়া বলিল,—"এ সব তোমার নূতন বাবার।" ছেলে বলিল, "মাটীর বাবার?—পুতুল বাবার?"

ছেলে কোলে করিয়া মায়া দূরে একটি উঠানে গিয়া পড়িল;—সে ত উঠান নয়, একটি কারখানা। কামার ও সেকরাদের অনেক যন্ত্রপাতি ছড়ান রহিয়াছে, পাশে একটা বারান্দায় অষ্টধাতুর একটি প্রতিমা তৈয়ার রহিয়াছে। মায়া সে প্রতিমার সম্মুখে গড় করিল, ছেলেকেও 'নম' করিতে বলিল। ছেলে নমস্কার করিয়া বলিল, "এ কি বাবা?" মায়া হাসিয়া বলিল, "এ অষ্ট ধাতুর বাবা।" ছেলে বলিয়া উঠিল, "অট্ট ধাতুর বাবা?" মায়ার সব সাধের সামগ্রীগুলি ছেলেকে দেখাইল, ছেলের মঙ্গলামঙ্গল স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিল। তাহার পর ছেলে কোলে করিয়া যেমন বাহিরে আসিল, ছেলে বলিয়া উঠিল, "মা, ক্ষিধে পেয়েছে।" মায়ার চমক ভাঙ্গিল, বলিল, "তাই ত, ছেলেটা দানের পর অবধি এখনও পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই!" আরও চমক ভাঙ্গিল যে, নিজেরও আজ সমস্ত দিন এক বিন্দু জলও পেটে পড়ে নাই। সুতরাং তাহাকে খাবারের চেষ্টায় যাইতে হইল। ছেলেকে একটু দুধ ও মিষ্ট খাওয়াইয়া নিজে কিছু খাবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে শাঁখ বাজিল। সন্ধ্যা হইয়াছে, আর খাওয়া হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১

পিশাচখণ্ডী ভবদেব ভট্টকে বলিলেন, "রাজা বিহারী ও তাঁহার মেয়ে দুই জনেরই ত পোষ্যপুত্র লওয়া হইয়া গেল। এই ক্ষেত্রে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, অনেকগুলি লোক আসিয়াছেন, অনেক কলাবৎ আসিয়াছেন, অনেক শিল্পী আসিয়াছেন, ইঁহাদের সকলকেই আস্‌ছে বছর ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন রাজসভায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। সকলেই আসিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সকলেই আসিবেন। আপনি উঁহাদের কিছু উপদেশ দিয়া দিন। রাজসভায় কিরূপ জিনিস আনা উচিত, আর কিরূপ জিনিস আনা উচিত নয়, কিরূপ জিনিসের পারিতোষিক দেওয়া উচিত, আর কিরূপ জিনিসের ধিক্কার হওয়া উচিত, তাহা আপনি বুঝাইয়া দিন। আমি উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বারেন্দ্র, কামরূপ, শ্রীহট্ট, সমতট, বঙ্গ—এমন কি, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ নিমন্ত্রণ করিয়া অঙ্গ-রাজ্য, চম্পানগরও নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার আরও কিছু দূর উত্তরে বিক্রমশিলা বিহারে যাইয়া দেখি, সেখানকার পণ্ডিতেরা কালচক্রের আলোচনা করিতেছেন। এ কালচক্র তন্ত্র

নহে—জ্যোতিষ। আমি তাঁহাদের গণনায় জানিলাম, অক্ষয়-তৃতীয়ার আর পাঁচ দিন আছে। সুতরাং মায়ার পোষ্যপুত্র-গ্রহণে আমাকে ত থাকিতে হইবে, আমি একখানি ছিপ ভাড়া করিলাম। আমি তিন দিনের মধ্যে সাতগাঁয়ে আসিলাম; আসিয়া দেখিলাম, এই এক মহা সুযোগ। আপনিও উপস্থিত আছেন। বাঙ্গালার সবগুলি লোক এখানে উপস্থিত আছেন। এখন যদি পাকা মাঝী সাজিয়া ইহাদিগকে ঠিক পথে চালাইয়া দিতে পারেন, তবে রাজসভায় আপনারই কার্য্যের লাঘব হইবে। অনেক সময় বাঁচিয়া যাইবে, অনেক বাজে কাজ করিতে হইবে না।"

ভবদেব ভট্ট বলিলেন,—"বেশ ত। কথাটা তুমি ভালই বলিয়াছ, বিদায়ের দিনে সকলে ত একত্র হইবেন, সেই দিন যাহা হয় করা যাইবে।"

২

তিন চার দিন পরে বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল। রাজা ও সেনাপতি চলিয়া গিয়াছিলেন, কারবারী বেণেরাও অনেকেই চলিয়া গিয়াছিল; বিষয়ী লোকও প্রায়ই চলিয়া গিয়াছিল; ছিলেন কেবল পণ্ডিত, কলাবৎ, কারিকর, শিল্পী ও অন্যান্য গুণী জন। পিশাচখণ্ডীও ইঁহাদেরই চান। বিদায়ের দিন আহারান্তে সকলে উপস্থিত হইলে ভবদেব তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনারা বোধ হয়, ভবতারণ পিশাচখণ্ডী মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়া থাকিবেন, পরম ভট্টারক—পরমেশ্বর—মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী ১০৮ হরিবর্ম্মদেব আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই সাতগাঁএর চড়ায় রাজসভা করিয়া কাব্যশাস্ত্র, কলা, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই গুণিগণের সমাদর করিবেন, তাঁহাদের পুরস্কার ও তিরস্কার করিবেন, দুঃস্থ গুণিগণের জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। এ জন্য মহারাজ যে সমস্ত সাতগাঁএরই এক বৎসরের রাজস্ব ব্যয় করিবেন, এমন নহে, তাঁহার বিশাল বঙ্গ-সাম্রাজ্যের এক বৎসরের রাজস্বই এই একই কার্য্যে ব্যয় করিবেন; তাহাতেও যদি সঙ্কুলান না হয়, তবে তাঁহার বহুকাল-সঞ্চিত রত্নরাশিতেও হস্তক্ষেপ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে হিন্দু সম্রাট্‌গণ পাঁচ বৎসর অন্তর এইরূপ রাজসভা করিতেন এবং গুণী জনের পুরস্কার দিতে দিতে আপন শিরস্ত্রাণ, এমন কি, অঙ্গের মহার্হ পরিচ্ছদ পর্য্যন্তও দান করিয়া একবস্ত্রে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদের অদেয় থাকিত কেবল দুইটি জিনিস,—রাজচিহ্ন ও যুদ্ধের উপকরণ। মহারাজ স্বয়ং, তাঁহার অনুচরবর্গ ও তাঁহার সদস্যবর্গ আমরা সকলে প্রাণপণ যত্নে, যাহাতে এই ব্যাপার মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হয়, তাহা করিব। আমাদের বিশেষ অসুবিধা এই যে, আমরা দুই তিন পুরুষ ধরিয়া এরূপ মহাসভা কোথাও দেখি নাই। আমাদিগকে পুরাতন কাগজপত্র ও পুস্তকাদি দেখিয়া কার্য্যপ্রণালী অবধারণ করিতে হইবে। তাহাতে যদি কোন ত্রুটি হয়, আপনারা নিজগুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

গুণী জনের এই পুরস্কার-ব্যাপারে আমরা সম্প্রদায় বাছিব না, বংশ দেখিব না, জাতি দেখিব না;—দেখিব কেবল কে কেমন কবি, কে কেমন শিল্পী, কে কেমন শাস্ত্রজ্ঞ, কে কেমন কলাবিৎ। আমরা ভাষার বিচার করিব না; সংস্কৃত, বাঙ্গালা, মাগধী, শৌরসেনী যে কোন ভাষাতেই পরীক্ষা গ্রহণ করিব। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদেরও এক বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। আপনারা সকলেই গুণী জন;—গুণহীন, অসার, অপদার্থ কিছুই আমাদের সম্মুখে আনিবেন না। যাহা কিছু আনিবেন, তাহার প্রথম পরীক্ষা আপনাদেরই কাছে। আপনারা ভাল জিনিস না হইলে, কিছুতেই আনিবেন না। কেন না, এরূপ মহাসভায় পুরস্কৃত হইলে আপনাদের যশ যেমন দিগ্‌দিগন্তে বিশ্রুত হইবে, তেমনি তিরস্কৃত হইলে আপনাদের অপযশের আর সীমা থাকিবে না। গুণী জনের পুরস্কার করিতে আমাদের হৃদয় যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তেমনই তিরস্কার করিতে হইলেও আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইবে। অতএব আপনারা বিধিমতে চেষ্টা করিবেন, যেন তিরস্কারের মত কিছু মহাসভায় উপস্থিত না হয়।

৩

"আরও কয়েকটি কথা আপনাদিগকে আমি বলিয়া দিব। এমন যে বিক্রমাদিত্য ছিলেন,—তিনি কত গুণী জনকে কত লক্ষ লক্ষ দান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু—তাঁহারও কলঙ্ক আছে। তিনি আপনার সমক্ষে আপনার স্তুতিবাদ না শুনিয়া দান করিতেন না। শ্রীহর্ষেরও সে কলঙ্ক আছে। আমাদের মহারাজ, সম্মুখে আত্মস্তুতি, বিষবৎ পরিহার করিয়া থাকেন। আপনারা কেহ তাঁহাকে অশোক, বিক্রমাদিত্য বা শ্রীহর্ষের সহিত তুলনা করিবেন না; তাঁহাকে সরস্বতীর বা বৃহস্পতির অবতার বলিয়া সরস্বতীর ও বৃহস্পতির অবমানন' করিবেন না। আপনারা নাটক

লিখিয়া তাঁহার যশোগান করিবেন না বা তাঁহার নামে কাব্যনাটকাদি চালাইবার চেষ্টা করিবেন না। তিনি এক জন খাঁটি মানুষ, তিনি চান খাঁটি জিনিস, ভেজাল দেখিতে পারেন না। আপনারা ভেজাল জিনিস চালাইবার চেষ্টা করিবেন না। গুণের আদর ভিন্ন এত ব্যয়ে এত সমারোহে তাঁহার আর কোনই উদ্দেশ্য নাই। আপনারা মনে করিবেন না যে, তিনি তোষামোদে তুষ্ট হইয়া কাহাকেও পুরস্কার করিবেন। পরম শত্রুরও গুণ দেখিলে তিনি তাঁহাকে আদর করিবেন।

সনাতন ধর্ম্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস। সনাতন ধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠানই তিনি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, সনাতন ধর্ম্ম অপেক্ষাও আর এক উচ্চতর রাজধর্ম্ম আছে,—তাহার নাম গুণের আদর। একটা নির্গুণ পুরুষকে গুণের আদর দিলে তাহার দ্বারা জগতের যত অনিষ্ট হয়, শত শত চোর-ডাকাতেও দেশের তত অনিষ্ট করিতে পারে না। নির্গুণকে গুণীর আদর দেওয়া তিনি পঞ্চমহাপাতকেরও উপর মহাপাতক বলিয়া মনে করেন। এক জন নির্গুণ পুরুষকে গুণীর পদে বসাইলে, সে যত দিন বাঁচিবে, সমস্ত গুণী জনের অবমাননা করিবে। দেশ হইতে একটা গুণই হয় ত লোপ হইয়া যাইবে।

সনাতন ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকিলেও তিনি বৌদ্ধ ও জৈন কবির যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ চিত্রকর, বৌদ্ধ সূত্রধর, বৌদ্ধ স্বর্ণকার তাঁহার বড় আদরের পাত্র। জ্যোতিষীরা ত শাকদ্বীপী; কিন্তু মহারাজ তাঁহাদের কতই না আদর করিয়া থাকেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র এখন ত বৌদ্ধ-মঠে ও জৈন-উপাশ্রয়েই আশ্রয় পাইয়াছে। তথাপি সেখানেও একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে, মহারাজের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না।

সুতরাং আমি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, পবিত্র গুণরাশি লইয়া আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার সভারোহণ করিবেন।"

৪

ভবদেবের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই 'সাধু—সাধু' বলিতে লাগিলেন। দুই এক জনে আবার ভবদেবেরই ভাবাভূত দুই একটা বক্তৃতাও করিলেন। পিশাচখণ্ডী বারংবার বলিতে লাগিলেন,—"আপনারা বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের কথাগুলি সব মনে করিয়া রাখিবেন।" হঠাৎ গুরুপুত্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"মহারাজ মহাশয় ভারতবর্ষের যাবতীয় বৌদ্ধ গুণিগণকে এই সভায় একত্র করিবার ভার আমার উপর দিয়াছেন; আমিও আনন্দের সহিত সে ভার গ্রহণ করিয়াছি এবং কয়েক মাস ধরিয়া এই চেষ্টাতেই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি; বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরাই দেশভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা দেশীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। এক জন জৈন-পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, 'যে কবি ছয় ভাষায় সমান কবিতা লিখিতে না পারে, সে কবিই নহে।' মহামহোপাধ্যায় ভবদেব ভট্ট বলিয়াছেন যে, বৈদ্যশাস্ত্র বৌদ্ধমঠ ও জৈন-উপাশ্রয়কেই আশ্রয় করিয়াছে; শুধু বৈদ্যশাস্ত্র কেন?—সমস্ত শিল্প ও কলা আজিও বৌদ্ধগণের করায়ত্ত। কার্পাস-বস্ত্রই বলুন, ক্ষৌম-বস্ত্রই বলুন, পত্রোর্ণাই বলুন, চিত্রকার্য্যই বলুন, ভাস্করকার্য্যই বলুন, শিলালিপিই বলুন, দেবপ্রতিমাই বলুন, মনুষ্যপ্রতিমাই বলুন, গীতবাদিত্রই বলুন, সবই এখন বৌদ্ধদের হাতে। ইঁহারা যাহাতে আপন আপন উত্তম উত্তম শিল্পকার্য্য রাজসভায় উপস্থিত করিতে পারেন, আমি তাহার চেষ্টা করিব। আমি নিজে রাজসভায় উপস্থিত থাকিব,—পরীক্ষা দিব; প্রয়োজন হইলে রাজার আদেশে পরীক্ষকের আসনও গ্রহণ করিব। শুনিয়াছি, অনেক কুলবালা পরীক্ষা দিতে আসিবেন। আমিও বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী আনাইবার চেষ্টা করিব। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা আপন আপন ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিয়া কবিতা লিখিবেন। মহারাজাধিরাজ যেন বিধর্ম্মীর মত বলিয়া সেগুলি উপেক্ষা না করেন। আহা, ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করা এই সময়ে জীবিত থাকিলে তাঁহার আনন্দ আর ধরিত না। তিনি কলিযুগ-পাবনাবতার মহারাজ ইন্দ্রভূতির কন্যা। তিনি যেমন বিদুষী ও পণ্ডিতা, তেমনই কবি ও সাধিকা। তিনি অল্পদিন হইল দেহ রাখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যার ভিতরে অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি আছেন। আমি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার ভার গ্রহণ করিলাম। আমি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ফাল্গুনী পূর্ণিমার অপেক্ষা করিব ও সাধ্যমত মহাসভার সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিব।"

গুরুপুত্রের বক্তৃতায় সকলেই জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল।

রাজা বিহারী দত্তের কর্ম্মচারীরা প্রচুর অর্থ লইয়া উপস্থিত ছিল। তাহারা ভবতারণ পিশাচখণ্ডীকে

লইয়া তাহাদের মধ্যে বসাইল এবং তাঁহারই হাত দিয়া গুণী জনের পাথেয় ও বিদায় দিতে লাগিল। পাথেয়ের হিসাব করিতে এই কর্ম্মচারীরা দক্ষ—বৃহস্পতি কারণ, তাহারা যাবজ্জীবন ধরিয়া বেণেদের ঠকাইয়া বিস্তর পাথেয় লইয়াছে, সুতরাং তাহার জন্য আর ভবদেবকে অধিক বকাবকি করিতে হইল না। কিন্তু বিদায় লইয়া অনেকে অনেক রকম গোল বাধাইল। কিন্তু পিশাচখণ্ডী হাত একটু দরাজ করিয়া দিয়া সব গোল থামাইয়া দিলেন। তাঁহার সৌজন্যে, সদালাপে ও মিষ্ট কথায় বাঙ্গলা-শুদ্ধ লোক যেন বশ হইয়া গেল। বৌদ্ধেরা কেহ কোনরূপ গোল তুলিলে গুরুপুত্র তখনই ইঙ্গিত করিয়া দিতেছেন,—'গোল করিও না।' বিদায় লইয়া সকলে 'জয়োস্তু' 'কল্যাণমস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সাতগাঁ আবার ১৮ মাসের জন্য যে ভোঁ ভোঁ—সেই ভোঁ ভোঁ হইয়া রহিল।

৬

গুরুপুত্র ইতিমধ্যে অনেক কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি লোক পাঠাইয়া ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা দেবীর দল হইতে বাছিয়া বাছিয়া জনকয়েক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি অনেক অন্বেষণের পর দক্ষিণ-রাঢ়ের এক কোণে এক নিভৃত স্থানে নাঢ়-পণ্ডিতের খোঁজ পাইলেন। নাঢ়ো আবার সেখান হইতে দশ ক্রোশ তফাতে তপস্যা করিতেছিলেন। সেখানে বার বার লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে সদলবলে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। শেষ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে এক মহাবিহার হইতে খবর পাইলেন যে, তিনি বহুসংখ্যক কীর্ত্তনীয়া লইয়া ভোটদেশে গিয়াছেন। তিনি আরও খবর পাইলেন যে, গুরুদেব শীতের পূর্ব্বেই নেপালে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তথাকার রাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি নেপালে ললিতপত্তনে লোক বসাইয়া রাখিলেন,—গুরুদেব যেন শিবচতুর্দ্দশীর পরই যাত্রা করিয়া সাতগাঁ চলিয়া আসেন।

ভাস্কর-কার্য্যে বৌদ্ধদিগের অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। সে খ্যাতি বজায় থাকে, গুরুপুত্রের ইহা আন্তরিক ইচ্ছা। যেখানে যে পাথরের ভাল মূর্ত্তিটি প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তা বৌদ্ধদেরই হউক বা হিন্দুদেরই হউক, আনাইয়া রাখিলেন। সোনার গহনা বৌদ্ধবিহারে ভাল হইত। বিহারের উপর বিশ্বাস করিয়া সকলেই বিহারের সেক্‌রার হাতে সোনা দিত। কি নকাসির কাজে, কি পালিসে, কি হীরা কাটায়, কি ক্ষোদকারীতে বিহারের সেক্‌রারা সিদ্ধ-হস্ত ছিল। অনেক ভাল ভাল গহনা গুরুপুত্রের খাতিরে তাহারা তৈয়ারী করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহারই কাছে রাখিয়া গেল। কাঠের উপর নক্সাও বৌদ্ধেরা খুব করিত। ভাল ভাল নক্সা-করা কাঠের জিনিস মহাবিহারে আসিতে লাগিল।

কিন্তু গুরুপুত্রের ঝোঁক—তিনি কাব্য লিখিয়া পুরস্কার পাইবেন। তিনি সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত। বহুসংখ্যক প্রাকৃতভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন; কিন্তু সে সকলের দিকে তাঁহার ঝোঁক নাই, তাঁহার ঝোঁক বাঙ্গালার দিকে। অল্পের মধ্যে একটি বা দুইটি পদে রস ফুটান তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। যখনই সময় পাইতেন, চক্ষু উপরে তুলিয়া কলম হাতে লইয়া কি ভাবিতেন। দুই মাস তাঁহার ভাবিতে গেল, তাহার পর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লিখেন আর ছিঁড়িয়া ফেলেন। কত তালপাতাই যে ছিঁড়িলেন, তাহার ঠিকানা নাই; তথাপি তাঁহার মনের মত কবিতা হইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১

সাতগাঁয়ের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া পিশাচখণ্ডী নিমন্ত্রণে বাহির হইলেন। বিক্রমশীল পর্য্যন্ত তিনি ত পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন, এবার সেখান হইতে আরও পশ্চিমে চলিলেন। বিক্রমশীল হইতে কয়েক ক্রোশ গিয়াই গঙ্গাতীরে মুদ্গগিরি (মুঙ্গের), অঙ্গ ও মগধের সীমা। গঙ্গার ধার হইতেই পাহাড় উঠিয়া অনেক দূর মাথা তুলিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর দুর্গ,—চারিদিক্ মুর্চ্চা বাঁধা। নিকটেই কষ্টহারিণীর ঘাট। সেখান হইতে কিছু দূরে সীতাকুণ্ড। মস্করী সকল জায়গায় তীর্থের কাজ করিলেন, দুর্গাধিপতির সহিত দেখা করিলেন, আবার পশ্চিমদিকে নৌকা করিয়া চলিলেন।

এখন যেখানে বখ্‌তিয়ারপুর হইয়াছে, সেখানকার ঘাটে নৌকা লাগিল। মাঝীদিগকে পাটনায় গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া মস্করী জনকয়েকমাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া দক্ষিণমুখে যাইতে লাগিলেন।

এইখানটাই মগধের প্রধান জায়গা—বড় বড় মাঠ, বড় বড় গ্রাম, বড় বড় গোচর—প্রচুর ফসল হয়, প্রচুর দই-দুধ পাওয়া যায়, প্রচুর চিঁড়া, প্রচুর মুড়কি, প্রচুর মিষ্টান্ন, প্রচুর খোয়া-ক্ষীর, প্রচুর খাজা। মস্করী সন্ধ্যার পরই কোন গোয়ালার গোয়ালে আশ্রয় লইয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া খান। তাঁহার সঙ্গীরা বাজারের মিষ্টান্ন খাইয়া ও চিঁড়া-মুড়কির ফলাহার করিয়া দিন কাটান। এইখানে বলিয়া রাখি যে, এই বৌদ্ধপ্লাবিত দেশে ভাল ব্রাহ্মণ একেবারেই পাওয়া যাইত না। জ্যোতিষব্যবসায়ী ঘরকতক আচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিল। তাহাদের আচার-ব্যবহার বৌদ্ধদের চেয়ে কোনমতেই ভাল নয়। ভুঁইয়ার জাতির এখনও বোলবোলা হয় নাই। কিন্তু জাতিটা গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উহারা বিহারের জমী ছাপাইয়া খাইতেছে, তাই উহাদের নাম হইয়াছে ভুঁইহার বা ভূমিহারক। উহারা এখনও বৌদ্ধই আছে, কিন্তু 'বাভন' বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। মস্করী তাহাদের বাড়ীতে অতিথি হইতে রাজী নন।

মস্করীর পা খুব চলে। তিনি সকালে বারো ক্রোশ গিয়া কোথাও আড্ডা লয়েন, বৈকালেও ৫।৬ ক্রোশ হাঁটেন। দুই দিনের পর তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, একটা কি যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তিনি সঙ্গীদের দেখাইয়া বলিলেন,—"বল দেখি ওটা কি?" কেহ বলিল স্তূপ, কেহ বলিল মন্দিরের চূড়া। এক জন বলিল,—"না, ওটা গোপুর। দেখিতেছেন না, উহার মাথায় দুইটা চূড়া? মন্দির বা স্তুপ হইলে এরূপ হইত না। বোধ হয়, ও দু'টা কোটের দুয়ার।" পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মগধের রাজধানী ওদন্তপুরী অতি নিকট। ও দু'টা ওদন্তপুরী বিহারের এক দিকের দরজা। মস্করী আগেভাগেই ওদন্তপুরীর রাজার নিকট দূত পাঠাইয়া দিলেন।

দূত গিয়া অল্প চেষ্টাতেই রাজার দর্শন পাইল। দূত রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রীতিমত শিষ্টাচারের পর বলিল,—"বঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মদেব আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রাজসভা করিয়া কাব্যে, শাস্ত্রে ও শিল্পে গুণিজনের পুরস্কার করিবেন, এই জন্য তিনি রাঢ়দেশের ব্রাহ্মণ ভবতারণ পিশাচখণ্ডীকে আপনার দেশে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ, আপনার দেশের সমস্ত গুণিজনকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য পিশাচখণ্ডীকে আপনি সাহায্য করেন, যেন একটিও বাদ না যায়,—ইহাই তাঁহার একান্ত অনুরোধ।"

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিশাচখণ্ডী মহাশয় কোথায়?"

"তিনি নিকটেই আছেন।"

রাজা তাঁহার পাত্র-মিত্রগণের মধ্যে এক জন প্রধান পুরুষকে বলিলেন,—"তুমি গিয়া তাঁহাকে লইয়া আইস।"

২

পিশাচখণ্ডী উপস্থিত হইলে রাজা ও তাঁহার সহিত সভাশুদ্ধ সমস্ত লোক উঠিয়া দাড়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পিশাচখণ্ডীও তাঁহাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং রাজা তাঁহাকে যে আসন দেখাইয়া দিলেন, সেই আসনে বসিলেন। তিনি কথা কহিবার পূর্ব্বেই রাজা বলিলেন,—"বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেব যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা অতি সাধু। তিনি যে দেশভেদ, জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ বিচার না করিয়াই গুণিজনের পুরস্কার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা আরও সাধু। মগধ এককালে গুণিজনের খনি ছিল বলিলেই হয়; কিন্তু এখন মগধের সে দিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রী৺ শ্রীনগর পাটলিপুত্র এখন প্রায় গঙ্গার গর্ভে। আমরা একরূপ মগধের শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছি বলিলেই হয়। এখানে যাহা কিছু আছে, আপনি অনায়াসেই লইয়া যাইতে পারেন। এখানে বিহারে বিহারে এখনও কবি, পণ্ডিত, দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ পাওয়া যায়। এখনও এখানে পাথরের কাজ খুব ভাল হয়, সোনারূপার কাজ খুব ভাল হয়, মিষ্টান্নও খুব ভাল হয়। যত রকম শিল্পী আপনার ইচ্ছা হয়, লইয়া যাইতে পারেন। এমন একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারে তাহারা যদি পরীক্ষা দিয়া পারিতোষিক পায়, তবে ত সে আমারই গৌরব,—আমার রাজ্যেরই গৌরব।" তাহার পর পাত্র-মিত্রবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"আপনারা সকলেই যথাসাধ্য পিশাচখণ্ডীর সাহায্য করুন।"

রাজার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া পিশাচখণ্ডী অনেকক্ষণ তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং সময় সংক্ষেপ, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যটি সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য রাজাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা, পিশাচখণ্ডী যে কয়দিন ওদন্তপুরীতে থাকিবেন, ততদিনের জন্য তাঁহার থাকার ও চাকর-বাকরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি মগধদেশের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, সে জন্য তাঁহার যান-বাহনের

সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কথা হইল, পিশাচখণ্ডীকে পাটনার ঘাটে উঠাইয়া দিয়া যান-বাহন ফিরিয়া আসিবে। সেই দিনই পিশাচখণ্ডী রাজার প্রধান পাত্র বুদ্ধরক্ষিতের সহিত ওদন্তপুরী দেখিতে গেলেন।

নগরের সর্ব্বত্রই দেখিতে লাগিলেন কষ্টি-পাথরের থাম;—থামে কত রকম মালা, কত রকম হার, কত রকম গহনা ঝুলিতেছে; থামের মাথায় প্রায়ই পদ্ম,—কোনটি কুঁড়ি, কোনটি ফুটিয়া উঠিয়াছে; কোন স্থানে থামটিই মানুষের মূর্ত্তি,—মাথায় বালক। নানা রকম কষ্টিপাথরের নানা মূর্ত্তি;—বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি, কত কত দেব-দেবীর মূর্ত্তি। ক্রমে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে গেলেন। এই বিহারের দুয়ারই তিনি বহু ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দুয়ারটি আছে বটে, কিন্তু কখনও বন্ধ হয় না।

ভিতরে গিয়া দেখেন, দুই-তলায় দুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুক থাকিবার স্থান; জায়গায় জায়গায় ভাণ্ডার, বহুতর খাবার জিনিস প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ রহিয়াছে; কোন কোন জায়গায় বা যাত্রার সব সরঞ্জাম, কত কত আসা, কত কত সোঁটা, কত কত নিশান, কত কত খুন্তি, কত কত অর্দ্ধচন্দ্র, রূপার সোণার রাশি রাশি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি;—কাহারও হীরার চোখ, কাহারও পান্নার চোখ, কাহারও নীলার চোখ। যে সময়ের কথা হইতেছে, মহম্মদীয়া ব্যক্তিয়ার তাহার ২০০ বৎসর পরে এই বিহারই লুঠ করিয়া এত সোণা-রূপা-হীরার বৌদ্ধমূর্ত্তি পাইয়াছিল যে, সেগুলি বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য সত্তরটি অশ্বতর লাগিয়াছিল। এই বিহারের ভাণ্ডারে রাশি রাশি তালপাতার পুথি ছিল, সিন্দুক-ভরা কারচুপিকরা রেশমের কাপড় ছিল, শত শত চামর ছিল, আর ধূপদান ও দানপত্র যে কত রকমের কত ছিল, তাহা ঠিক করিয়া উঠা যায় না। তিনি সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন ও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং যাহা যাহা বাঙ্গালায় পাঠাইবার, সমস্ত চিহ্ন করিয়া দিলেন; রাজপাত্র স্বীকার করিলেন, সেগুলি যথাসময়ে সাতগাঁএ পাঠাইয়া দিবেন।

ওদন্তপুরীর বাজারে উপস্থিত হইয়া পিশাচখণ্ডী দেখিলেন, নানারূপ মিষ্টান্নের দোকান। এখানকার লোক প্রায়ই সব বৌদ্ধ। তাহাদের বাজারের জিনিস খাইতে আপত্তি নাই। অনেকে তাই খাইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। সুতরাং বিচিত্র বিচিত্র খাবারের জিনিস তৈয়ারী হইতেছে। খাবারের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট—খাজা, আর সিলাবের চিঁড়া—যেমন ছোট, তেমনি মিষ্ট, আর তেমনি সুগন্ধ। দুধের জিনিস সকল রকমই পাওয়া যায়—দই, দুধ, ক্ষীর, ননী, মাখন, খোয়া—বোধ হয়, দ্বাপরের বৃন্দাবন যেন এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। ওদন্তপুরীতে দিন-কয়েক থাকিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাকে পরদিন প্রত্যূষেই চলিয়া যাইতে হইল; কেন না, সময় সংক্ষেপ, কাজ বেশী।

তিনি নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধরক্ষিত। সে বলিল—"বুদ্ধদেবের প্রথম প্রধান ব্রাহ্মণ-শিষ্য শারীপুত্রের জন্মস্থান—নালন্দায়। তাঁহার মা সশরী জমিদারের মেয়ে। শারীপুত্র পীড়িত হইয়া মায়ের কোলে আসিয়াই মরিলেন। মাও আপনার সমস্ত সম্পত্তি সঙ্ঘে দিয়া যান। সেই সম্পত্তি হইতেই নালন্দাবিহারের উৎপত্তি ও উন্নতি। ৫০০।৬০০ বৎসর হইতে এখানে পণ্ডিতের কিছু বেশী সমাগম হইতেছে। গুপ্তরাজেরা এখানে বড় বড় বিহার দিয়া গিয়াছেন। চলুন দেখিবেন, এখন তাহাদের আর সে শ্রী নাই। মহারাজ যে বলিয়াছেন, তিনি মগধের শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছেন, সে কথাটি ঠিক।"

এই সব কথা হইতেছে, এমন সময়ে দূরে একটি বটগাছ দেখা গেল। বুদ্ধরক্ষিত বলিলেন, "ঐ বটগ্রাম। ওখানে সূর্য্যের একটি কুণ্ড আছে, সূর্য্যের একটি প্রতিমা আছে, তাঁহার পূজা হয়, কয়েক ঘর ব্রাহ্মণও আছেন। চলুন, তাঁহাদের বাটীতে বিশ্রাম করিয়া আপনি নালন্দায় যাইবেন। নালন্দার যদিও এখন সে গৌরব নাই, তবু আপনি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন—কত বড় বড় বাড়ী, কত বড় বড় বিহার, কত বড় বড় স্তূপ, কত ভাল ভাল মূর্ত্তি, কত কত পণ্ডিত, কত কত ছাত্র; আর দেখিবেন—রাশি রাশি পুথি।"

নালন্দায় একটি বড় রাস্তা আছে। রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। উহার এক ধারে বড় বড় বিহার—একটার পর একটা, তার পর একটা, দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে,—আর এক ধারে কেবল স্তূপ; বড়টা ২০০।২৫০ ফুট উঁচা; আর মাঝারি, ছোট যে কত আছে, তার ঠিকানা নাই। এখন বৌদ্ধধর্ম্মের হীনাবস্থায় বাড়ী বা স্তূপ ভাঙ্গিলে আর মেরামত হয় না; কিন্তু এখনও লোকের ধর্ম্মের উপর এতদূর শ্রদ্ধা যে, জায়গাটি তাহারা এতই পরিষ্কার রাখিয়াছে;—সর্ব্বদাই ঝর্-ঝর্ তর্-তর্ করে। বিহারগুলি ও স্তূপগুলির ওপাশে পড়ুয়াদিগের কুটী—একটি একটি কুটী পঁচিশের বন্ধ ঘর,—সামনে দাওয়া। ইহারই মধ্যে পড়ুয়ার খাইবার, থাকিবার, বসিবার ও পড়িবার জায়গা। সবই তাহাকে নিজ-হাতে করিতে হয়। মাঝে মাঝে বড় বড় আটচালা,—সেইখানে বসিয়া

তাহারা পরস্পর আলাপ করে, তর্ক-বিতর্ক করে, পড়া লয়, পড়া দেয়। কোন বিদেশী পণ্ডিত আসিলে তাঁহাকে এইখানেই সংবর্দ্ধনা করে। মাঝে মাঝে ধর্ম্মশালা—বিদেশী লোকের থাকিবার স্থান। তাহারও উঠানে আটচালা—গল্প-গুজব-আমোদ-প্রমোদের জায়গা। নালন্দার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রকাণ্ড এক উঠানের মাঝখানে এইরূপ এক আটচালায় বোধিচর্য্যা ব্যাখ্যা করিতে করিতে শান্তিদেব, মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে শান্তিধামে চলিয়া যান।

রাস্তার ধারে যে সকল বিহার ছিল, তাহার ঠিক মাঝখানে বালাদিত্য বিহার—চারিতলা উঁচা। এখনকার লাট সাহেবের বাড়ীতে যেমন বাহির দিয়া প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি দুতলা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তাহারও ঐরূপ এক সিঁড়ি একেবারে রাস্তা হইতে দু'তালা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দুতলার উপর সিঁড়ির সাম্‌নেই একটা খোলা চাতাল, তাহার বাহিরে বারান্দাটি চারিদিক্ ঘুরিয়া গিয়াছে। বারান্দার ওপাশে সারি সারি ঘর। বারান্দার নীচে একতলায় এক প্রকাণ্ড উঠান, তাহার এক কোণে একটি প্রকাণ্ড ও গভীর কূয়া। কিন্তু বারান্দার নীচে নীরেট পাঁচীল, একটিও দুয়ার বা জানালা নাই। উঠানে নামিবার বা কূয়া ব্যবহার করিবার একমাত্র উপায় একটি সিঁড়ি দিয়া নামা। দুতলার বারান্দার উপর তিনতলার বারান্দা, তাহারও চারিদিকে ঘর। এইরূপ চারতলায়ও বারান্দা ও ঘর। সিঁড়ির সাম্‌নে দুতলায় যেখানে খোলা চাতাল আছে, তাহার উপরে তেতালা ও চৌতলয় অধ্যক্ষের থাকিবার স্থান।

অধ্যক্ষ সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত খুব লম্বা-চওড়া বেশ সুপুরুষ, এখন পচাশী বছর বয়স হইয়াছে, তথাপি দেহের ও মনের বেশ জুত আছে। বিহারের নিয়মমত তাঁহার বারো জন চাকর আছে। পালা করিয়া তিন জন তিন জন দিন-রাত্রি তাঁহার কাছে থাকে। প্রত্যহ সকালে তিনি একবার নামিয়া আসেন, নালন্দার বড় রাস্তায় খানিক পাইচারি করেন, তাহার পর প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া নালন্দার বড় দীঘিতে স্নান করিয়া উপরে উঠেন, উঠিয়াই আহার করেন। আহারান্তে বসিয়া বসিয়া কিছু বিশ্রাম করেন। দিবানিদ্রা ত একেবারেই নাই, রাত্রিতেও "শয়নং যোগনিদ্রয়া।" বিশ্রামের পরই কার্য্য আরম্ভ। তিনি যে কেবল বালাদিত্য বিহারের কর্ত্তা, শুধু তাই নয়; নালন্দার সমস্ত বিহারই তাঁহার কথায় চলে। বিদ্যার্থী বা পড়ুয়াদের যে সন্দেহ আর কেহই মিটাইতে পারিত না, তাঁহার কাছে আসিলেই সে সন্দেহ মিটিয়া যাইত। তিনি পুরা-দস্তর মহাযানপন্থী ছিলেন। মহাযানের মূলগ্রন্থগুলি টীকা-টিপ্পনীর সহিত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

একদিন বিশ্রামের পর বুদ্ধরক্ষিত পিশাচখণ্ডীকে লইয়া সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। পিশাচখণ্ডী চারিতলা হইতে নালন্দার শোভা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সারি সারি বিহার ও সারি সারি স্তূপের পর—যে দিকে চাহেন—কেবল পড়ুয়াদের কুটী। বিহারগুলি যদিও কোথাও কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ও বেমেরামত আছে, কিন্তু পড়ুয়াদের কুটীগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পড়ুয়ারাও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইহাদের অধিকাংশই পাঠে তন্ময়। সমস্ত জায়গাটিই যেন সরস্বতীর লীলাক্ষেত্র। পিশাচখণ্ডী নিজে ব্রাহ্মণ ও ঘোরতর বৌদ্ধদ্বেষী। তিনি উহাদিগকে অনাচরণীয়, অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, নাস্তিক, অতিপাষণ্ড বলিয়াই জানেন। কিন্তু এখানে আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য যেন তাঁহার মনের ভাব বদল হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতকে বলিলেন:—

"ভদন্ত, আমি বঙ্গাধিপতি শ্রীহরিবর্ম্মদেবের দূত হইয়া আসিয়াছি। তিনি আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সাতগাঁয় রাজসভা করিবেন। সেখানে কাব্যে, শাস্ত্রে, শিল্পে ও কলায় পারদর্শী লোকগণকে পুরস্কার দিবেন। আপনি নালন্দা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজন পণ্ডিতকে সেখানে পাঠাইয়া দিবেন।"

সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত।—মহারাধিরাজের সঙ্কল্প অতি উত্তম। আমাদের এখানে বজ্রদত্ত এক জন মহাকবি। তিনি ছয় ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন। তাঁহার লোকেশ্বর-শতক বৌদ্ধদের বড় আদরের জিনিস। তিনি ত যাইবেনই। শিল্পীও জনকতক পাঠাইব। বিশেষ কয়েকজন ভাস্কর যাইবে, কতকগুলি কষ্টিপাথরের কাজ লইয়া যাইবে। তবে শাস্ত্রে প্রবীণ লোক লইয়া খুবই গোল। কারণ, আমরা নালন্দায় তন্ত্রটাকে শাস্ত্র বলিতেই রাজী নই; বজ্রযান, সহজযান আমরা একটা যান বলিয়াই মনে করি না, আমরা বড়জোর মন্ত্রযান পর্য্যন্ত মানিতে পারি। তবে আমার বোধ হয়, প্রজ্ঞাকরমতি এখন এইখানেই আছেন। তিনি যদিও নালন্দার পড়ুয়া নহেন, তিনি অনেক সময়ই নালন্দাতেই থাকেন। বিশেষ, তিনি যে বোধিচর্য্যাবতারের টীকা লিখিতেছেন, তাহার জন্য যে সকল পুথি-পাঁজির দরকার, সে সকল ত এইখানেই কেবল আছে, অন্যত্র পাওয়া যায় না। তাই তাঁহাকে এইখানেই থাকিতে

হইয়াছে। মহাযান শাস্ত্রে তিনি এক জন পণ্ডিত বটেন। আমরা তাঁহাকে পাঠাইবার চেষ্টা করিব।"

সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত এই কথা বলিতে না বলিতেই এক জন বেঁটেখেটে ভিক্ষু দুই জন পড়ুয়া সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত—তিনি আসিবামাত্র সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন—"এই যে, অনেক দিন বাঁচিবে, তোমারই নাম হইতেছে।"

"আমি কি পুণ্য করিয়াছি যে, আচার্য্য ভদন্ত মহাপণ্ডিত পিণ্ডপাতিক মহোপাধ্যায় সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতের স্মৃতিপথে উদিত হইব?"

"তোমার মত পুণ্যবান্ আর কে আছে? যে বোধিচর্য্যা ব্যাখ্যা করিতে করিতে আচার্য্য শান্তিদেব এই নালন্দা হইতে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তুমি সেই বোধিচর্য্যাবতারের ব্যাখ্যা করিতেছ, টীকা লিখিতেছ। তুমি দেশশুদ্ধ লোকের স্বর্গের পথ খুলিয়া দিতেছ।"

প্রজ্ঞাকর।—আমিও আজ সেই বোধিচর্য্যা লইয়াই আসিয়াছি :—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি॥

এ স্থলে 'নিরালম্ব' কথাটার অর্থ কি? ভাব ও অভাবও নাই। তাহা হইলে ত কিছুই রহিল না। তবে 'নিরালম্ব' কে হইল?

সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত।—ও সকল অতি গুহ্যকথা। সে গুহ্যভাব ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না বলিয়া 'নিরালম্ব' বা যা'হক এমনি একটা কথা দ্বারা তাহার কতকটা আভাস দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিভৃতে আর এক সময় আসিও, বুঝাইয়া দিব। এখন তোমার কাছে আমার একটা বিশেষ কাজ পড়িয়াছে। তোমাকে একবার সাতগাঁয়ে যাইতে হইবে।

প্রজ্ঞা।—আমার প্রতি হঠাৎ এ নির্ব্বাসনদণ্ড কেন?

সর্ব্বজ্ঞ।—এ যেমন তেমন নির্ব্বাসন নয় হে—অনেক ভাগ্যে এইরূপ নির্ব্বাসন ঘটে। এই যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরটিকে দেখিতেছ—ইনি সুপণ্ডিত, সুবক্তা, ইনি বঙ্গাধিপের নিকট হইতে আসিয়াছেন। বঙ্গাধিপ কাব্যে ও শাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিতদিগকে পুরস্কার করিবেন। তাই আমাদের ইচ্ছা, তুমিই যাও।

প্রজ্ঞা। আমরা ত ভিখারী। পুরস্কার লইয়া কি করিব?

সর্ব্বজ্ঞ।—ও কথা বলিও না। পুরস্কার অকিঞ্চিৎকর জানি, কিন্তু উহাতে বিদ্যার যে গৌরব, তা'ত অকিঞ্চিৎকর নয়। সেইটার আদর করা উচিত। না করিলে দোষ আছে।

প্রজ্ঞা। প্রভু আদেশ করেন ত যাইতেই হইবে।

সর্ব্বজ্ঞ। শুধু তুমি একেলা যাইলে হইবে না। এখানে যে যে পণ্ডিত ও কবি আছেন, সকলকেই সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।

তাহার পর সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত পিশাচখণ্ডীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন :—"আপনি যে কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ ভার লইলাম। যথাসময়ে আমাদের লোক-জন আপনাদের ওখানে পৌঁছিবে। আপনার যদি সময় থাকে, আমার অনুরোধ, একবার নালন্দাটা বিশেষ করিয়া দেখিয়া যান।"

পিশাচখণ্ডীও বুদ্ধপালিতকে বলিলেন, "আপনি আমাকে নালন্দায় দেখিবার যাহা কিছু আছে, সব দেখান।"

রীতিমত শিষ্টাচারের পর চৌতলা হইতে নামিয়া উভয়ে নালন্দানগরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নালন্দা দেখিয়া পরদিন প্রত্যূষে উভয়ে সিলাও যাত্রা করিলেন এবং তথা হইতে রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন।

৪

রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধরক্ষিত সরস্বতী নদীর তীরে দাঁড়াইয়া বলিলেন :—"এই যে চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে একটু সমান জমি দেখিতেছেন—এই রাজগৃহ। ইহার আর নাম গিরিব্রজ। এইরূপ পর্ব্বতবেষ্টিত স্থান পৃথিবীতে দুর্লভ। ইহাই জরাসন্ধের রাজধানী। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, এই গিরিব্রজের তোরণদ্বার।"

"তোরণের ভিতর দিয়া নদী আসিতেছে।"

"না আসিলে এই সমতলভূমির জল কোথা দিয়া বাহির হইবে? আর কোন দিকেই ত পথ নাই। ঐ ক্ষুদ্র নদীটি সরস্বতী। কিন্তু উহার জলে হাত দিয়া দেখুন, উহা বেশ গরম। তোরণের দুই ধারে অনেকগুলি গরম জলের ফোয়ারা আছে। সরস্বতী ঐ গরম জলের সহিত মিশিয়া ক্রমে চওড়া হইতেছে। উচ্চে তোরণের দুই ধারে ঐ দেখুন, চৌকা করিয়া পাথরে বাঁধান দুইটি বসিবার জায়গা—উহার নাম 'জরাসন্ধকা বৈঠক।' লোকে বলে, জরাসন্ধ না কি ঐখানে বসিয়া শত্রুদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। চলুন—এই রাজগৃহের এককোণে মনিয়ার নামে এক মঠ আছে।

সেখানে এক আশ্চর্য্য কূয়া আছে, উহার গম্বুজ বাঁধান। মঠে ভিক্ষুও অনেকগুলি আছে।"

সেখানে উপস্থিত হইয়া পিশাচখণ্ডী যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সেখানে অনেকগুলি ভিক্ষু আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা এমন ধ্যানে মগ্ন যে, বাহিরের কোন সংবাদই রাখেন না। দুই জন লোক যে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, অনেক ডাকাডাকি করিল, তাঁহাদের উদ্বোধই হইল না।

সেখান হইতে তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রিয়ভূমি গৃধ্রকূটে গেলেন। অনেক দূর উঠিতে হইল। একে ত রাস্তা বড়ই চড়াই, তাহার উপর বেমেরামত—অনেক জায়গাই ধসিয়া গিয়াছে। প্রাণ হাতে করিয়া সেখানে যাইতে হয়। সেখানে গিয়াও দেখিলেন, একই ভাব। অনেকগুলি ভিক্ষু আছেন—সকলেই ধ্যানমগ্ন। ইঁহারা দিনের মধ্যে একবার উঠেন, কিন্তু কখন্—কেহই জানে না।

গিরিব্রজ ছাড়িয়া তাঁহারা দুই জনে নূতন রাজগৃহে আসিলেন। বেশ ডাগর সহর, এখন কিন্তু সবই ভাঙ্গা—সহরের প্রাচীর ভাঙ্গা, বাড়ীগুলা ভাঙ্গা, রাস্তায় যাতায়াত কঠিন। কেবল একটি বিহার আছে, তাহাও বৌদ্ধদের হাতে নয়। শৈব যোগীরা সেটি মেরামত করিয়া বাস করিতেছে। তাহারা হঠযোগ করে, গুরু-পাদুকা পূজা করে, ভস্ম মাখে, জটা রাখে, গেরুয়া-কাপড় ও রুদ্রাক্ষ পরে, আর খুব গাঁজা খায়। তাহারা পিশাচখণ্ডীকে বলিয়া দিল, নাথযোগীদের কেহ কেহ সাতগাঁয়ের রাজসভায় যাইবেন।

সেখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে 'গিরি-এক' নামে একটি পাহাড় প্রায় হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছে। তাহার উপরে বড় বড় ইটে তৈয়ারি একটা প্রকাণ্ড অশোকের স্তূপ, 'গিরি-একে'র প্রায় মাথা হইতে একটা পথ দিয়া আর একটা পাহাড়ে যাওয়া যায়। সেখানেও একটা বড় বিহার আছে। অতি প্রাচীন স্থবিরেরা এইখানে বাস করেন। তাঁহারা সংসারের কোন সম্পর্কই রাখেন না। 'গিরি-এক' হইতে কিছু দূরে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ। হ্রদের মাঝখানে একটি বাড়ী, এখন অত্যন্ত বেমেরামত—কিন্তু অনেক যাত্রী সেখানে যায়। এইখানে শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহার নাম পাবাপুরী।

মস্করী জৈনদের নামই শুনিয়া ছিলেন, জীয়ন্ত জৈন কোন দিন দেখেন নাই। তিনি যাত্রীদের সহিত মিশিয়া গেলেন, বুদ্ধরক্ষিত তাহাতে চটিলেন ও একটু তফাতে থাকিতে লাগিলেন। মস্করী কিন্তু জৈনদের সাথে মিশিয়া—কোথায় কোন্ জৈন মঠ আছে, কোথায় কোন্ পণ্ডিত বা কবি আছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁহার অনেক কাজের খবর যোগাড় করিলেন। তিনি তাঁহাদের কথায় বুঝিতে পারিলেন—মালব, গুজরাট, শাকম্ভরী, মরুদেশ, জঝৌটি, চেদি দেশ—এই সব জায়গায় জৈনদেরই প্রাদুর্ভাব বেশী; বৌদ্ধ নাই বলিলেই হয়। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—"এই সব দেশ না ঘুরিয়া দেশে ফিরিব না।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১

যাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া তিনি বাসায় বুদ্ধরক্ষিতের সঙ্গে মিলিলেন ও সেখান হইতে গয়ায় যাত্রা করিলেন। দুই দিনে গয়ায় পৌঁছিয়া দুই জনে মহাগোলে পড়িয়া গেলেন। বুদ্ধরক্ষিত গয়ায় যাইতে রাজী নহেন। পিশাচখণ্ডী বোধগয়ায় যাইতে রাজী নহেন। পিশাচখণ্ডী বিষ্ণুপদ দেখিতে গেলেন একা। দেখিলেন, ফল্গু নদী হইতে গয়ার পাহাড়ে উঠিতে মাঝে একটি ছোটখাট মন্দির ও পাহাড়ের উপর কয়েকখানি সামান্য গোছের বাড়ী। বাড়ীগুলি গয়ালীদের। গয়ার মাহাত্ম্য এতদিন বেশী লোকে জানিত না। এখন ক্রমে প্রচার হইতেছে, অনেক অনেক গয়ামাহাত্ম্যের বই লেখা হইতেছে। গয়ায় অনেক যাত্রী আসিতেছে। গয়ালীদের প্রতাপ ও প্রভাব বাড়িতেছে। গয়া ছোট হইলেও দেখিলেই বোধ হয়, উঠ্‌তি সহর। দণ্ডপাণি দত্ত উহার সামন্ত রাজা। সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর। এই সময়েই কিছু দিন পরে সামন্ত বজ্রপাণি দত্ত একখানা শিলাপত্রে জাঁক করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি গয়াকে সামান্য গ্রাম দেখিয়াছিলাম, এখন আমি উহাকে অমরাবতী করিয়া দিয়া গেলাম। সকলই মহা-রাজাধিরাজ নয়পালের প্রতাপের ফল।" মস্করী সন্ধান করিয়া জানিলেন যে, দুই জন গয়ালী পুরাণশাস্ত্রে বড়ই প্রবীণ, বিশেষ গয়ামাহাত্ম্যে তাঁহারা দক্ষ বৃহস্পতি। এক জনের নাম মুরারি সেন, আর এক জনের নাম শ্রীহর্ষ নাকফোঁফা। তাহারা বলিল, "আমরা তীর্থস্বামী। আমরা তীর্থ ছাড়িয়া কোথাও যাই না।" মস্করী গোলে পড়িলেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি খুব প্রখর। তিনি বলিলেন, "এরূপ মহাসভায়

গেলে ও আদর পাইলে আপনাদের তীর্থেরই ত গৌরব হইবে। তীর্থস্বামীর কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত হইবে।"

গয়ার কাজ সারিয়া মস্করী ভাবিলেন—বোধগয়ায় না যাওয়া ভাল নয়। পৃথিবীর একটা বড় তীর্থস্থান। সভার উপযুক্ত অনেক জিনিস পাওয়া যাইতে পারে। তাই ভাবিয়া বুদ্ধরক্ষিতকে লইয়া বোধগয়ায় গেলেন। বোধগয়ার মন্দির তখন বড়ই বেমেরামত, যে অশ্বত্থ-গাছের তলায় বুদ্ধদেব বোধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ কাটা পড়ে শশাঙ্কনরেন্দ্র গুপ্তের সময়, সে প্রায় চারি শত বৎসর। এই চারি শত বৎসরে গাছটা প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শিকড়ে বোধগয়ার মন্দির ফাটিয়া গিয়াছে। সেই মন্দিরের পিছনে তাহারই বারান্দার মধ্যে অশ্বত্থগাছ। মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি। যেন গাছতলায় বুদ্ধদেব ধ্যান করিতেছেন। মন্দিরটা রৌদ্রবৃষ্টি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। মন্দিরের হাতার চারিদিকে পাথরের রেলিং, তাহাতে কতই চিত্রবিচিত্র কারিগরি। কিন্তু ফল্গু নদীর বালী পড়ায় হাতাটা প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে, মন্দিরের দরজায় উঠিতে এখন আর পৈঠার দরকার হয় না। চারিদিকে বিহার, সেখানে নানাদেশের ভিক্ষু বাস করে ও তীর্থ করিতে আসে। মস্করী দুই তিন জন নেপালী, দুই তিন জন ভুটিয়া ও দুই তিন জন সিংহলীকে সভায় যাইবার জন্য স্নেদ করিয়া গেলেন; তাহারাও যাইবে স্বীকার করিল। সেখানে আরও অনেক দেশবিদেশের পণ্ডিত পাওয়া গেল। দু'জন পারসী বৌদ্ধেরও নিমন্ত্রণ হইল। নীলা নদীর উত্তরে দু'জন রোমদেশের লোকেরও নিমন্ত্রণ হইল।

২

তখন দু'জনে পাটনা চলিলেন। গয়া হইতে পাটনা যাওয়ার রাস্তা ধরিলেন। রাস্তার ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদা দেবদেবীর প্রতিমা দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। কাউআ-ডোল পাহাড়ে কাক বসিলে দুলিতে থাকে। তাহার একটু পরেই "খলতিক পর্ব্বত" অর্থাৎ পর্ব্বতে চড়িলেই পা হড়কাইয়া যায়। সেই পর্ব্বতে উঠাই মুস্কিল, নামা ত আরও মুস্কিল। পর্ব্বতের উপর গুহা। গুহার ভিতর এমন মাজা, এত পালিস যে, মুখ দেখা যায়। সাদা, কাল, নীল রঙ, আর সুন্দর পালিস। গুহায় ঢুকিলেই মানুষের ছায়া পড়ে। একটা গুহায় এক জন তপস্বী আছেন, তিনি যে কত কাল চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছেন, বলা যায় না। বীরাসনে বসিয়া আছেন, শরীর অস্থি-চর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত, রগ টিপিয়া গিয়াছে, নাকের হাড় নড়-নড় করিতেছে। মস্করী তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অতি কষ্টে খলতিক পর্ব্বত হইতে নামিলেন।

পাটলীপুত্র এখন প্রায় জনশূন্য। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মহাভূমিকম্পে সমস্ত নগর বসিয়া যায়। শোণ নদী পাটলীপুত্রের পশ্চিমসীমা ছিল, সে সরিয়া দশ ক্রোশ তফাতে গিয়া পড়ে। এখনও দু একখান নৌকা পুরাণ পথে সময়ে সময়ে বর্ষাকালে যায়। কিন্তু বিন্ধ্যপর্ব্বতের জলরাশি শোণ দিয়াই গঙ্গা নদীতে পড়ে। বসা নগরের উপর ক্রমাগত পলিমাটী পড়িয়া নগরকে যে কত নীচে নামাইয়া দিয়াছে, কে বলিতে পারে? তবে মাঝে মাঝে স্তূপের, জয়স্তম্ভের ও আকাশভেদী রাজবাড়ীর আগা দেখা যায়। এক জায়গায় অনেকগুলি থামের মাথা জাগিয়াছিল, ক্রমে সেগুলাও জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। পাটলীপুত্রের তিন শত্রু বলিয়া বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকে;—"জল, আগুন আর ঝগড়া।" কাঠের নগর কয়েকবার আগুনে পোড়াইয়া দিয়া যায়। তাহার উপর জলপ্লাবনে অনার পর্য্যন্ত ধুইয়া যায়, ঝগড়ায় নগরের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যায়। কিন্তু পাটলীপুত্র একবার আবার উঠিত, আবার বড় হইত। কিন্তু বৌদ্ধেরা মনেও করিতে পারে নাই যে, উহার আর এক প্রবল শত্রু ছিল, ভূমিকম্প। সমস্ত নগরটা ১০।১২।১৫ হাত বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। পাটলীপুত্রের নাম "নগর"। মগধ-শুদ্ধ লোক উহাকে নগরই বলিত। ইদানীং ভাঙ্গা নগরের নাম শ্রীনগর হইয়াছিল।

৩

কাশী এ সময়ে দুটি ছোট ছোট নগর। একটি মৃগদাব আর একটি অবিমুক্ত ক্ষেত্র। দু'জায়গায়ই লোকজন অনেক, এক জায়গায় হিন্দু আর এক জায়গায় বৌদ্ধ।

হিন্দু নগরটি একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ের চারিধারে। জলাশয়টি জ্ঞানবাপী। তাহার এক দিকে বিশ্বেশ্বরের মন্দির, আর এক দিকে অন্নপূর্ণার মন্দির। সে বিশ্বেশ্বরের মন্দির এখন আদিবিশ্বেশ্বর হইয়াছে। অন্নপূর্ণার মন্দির সেখানকার সেইখানেই আছে। মধ্যে একটা হ্রদ, তাহারই নাম জ্ঞানবাপী। উহারই চারিদিকে সন্ন্যাসীদের বাস ও ব্রাহ্মণদের বাস। হ্রদ ক্রমে মজিয়া গিয়া তথায় নগরপত্তন হইয়াছে। জ্ঞানবাপী ক্রমে ছোট হইতে হইতে এখন একটি বাউড়ী

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাউড়ী মানে সিঁড়িওয়ালা কুয়া। তখনকার প্রধান দেবতা অবিমুক্তেশ্বর, তিনি এখনকার জ্ঞানবাপীর উপরেই বিরাজ করিতেছেন।

মৃগদাবের এক দিকে দুইটি স্তূপ,—দুইটিই প্রকাণ্ড। একটির এখন চিহ্নমাত্র নাই। কেবল সে দিন খুঁড়িয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বের প্রদক্ষিণ ও তাহার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিকে চারিটি সিঁড়ি বাহির হইয়াছে। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ইহা ১৬০ ফুট উঁচা ছিল, ব্যাস ৪০ ফুটের উপর। গায়ে উজ্জ্বল পলস্ত্রা করা। মাথায় বহু সোণার ছাতি। যেখানে ছাতি আরম্ভ, সেখানে একটি কিউবের চারিদিকে চারি জোড়া চোখ, আধ-বুজন্তভাবে ধ্যানমগ্ন, স্তূপগুলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছোট প্রতিমা। সমস্ত বিশ্বই যেন ধ্যানমগ্ন। এই স্তূপের পাশে ধর্ম্মরাজিকা, এখন ধামেক বলে। প্রকাণ্ড স্তূপ, ছাতা নাই, গা-ময় কঠিন পাথরের উপর নানা রকমের কাজ করা। এখন মাথাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মেরামত না করিলে শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। মৃগদাবে বড় বড় বিহার। সব বেমেরামত—সাপ, বেজী ও ব্যাঙের আড্ডা। ইন্দুর ছুঁচাও ঢের। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনা যায়, ভিক্ষু সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে। একটা পুরাণ বিহারের ঢিবির উপর একটা নূতন বিহার হইল, পুরাণ সব জিনিস ঢাকা পড়িল। মানুষের চক্ষেই ঢাকা পড়িল, সাপের চক্ষে ত নয়। সাপ তাহার ভিতরে বসিয়া বেশ বংশ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। নূতন বিহারের যে পাচীলটা পুরাণ বিহারের পাচীলের উপর পড়িল, সেখানটা বেশ রহিল, তাহার এ-পাশ ও-পাশ গোড়া হইতেই বসিতে লাগিল, অল্পদিনেই পাচীল ফাটিল, ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মেরামত করে কে? দেশে ক্রমেই হিন্দুর প্রাদুর্ভাব বেশী হইয়া উঠিতেছে। বৌদ্ধ-মন্দির মেরামতের সময়ে টাকা জুটে না।

এই দুই নগরেই মস্করী অনেকগুলি ভাল ভাল লোক নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহাদের মধ্যে বেদান্তী চিৎসুখাচার্য্য। উদয়নাচার্য্য বৃদ্ধবয়সে কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনিও যাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচর্য্যার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীহীর পণ্ডিত কাশীতে ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীহর্ষও কাশীতে ছিলেন। ইঁহারা দু'জনেই নিমন্ত্রণ পাইলেন।

মৃগদাব ও অবিমুক্তক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে রাজবাড়ী। রাজা স্বাধীন নন, কান্যকুব্জেশ্বরের সামন্ত। কিন্তু তিনি থাকেন স্বাধীন রাজার ন্যায়। হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রের রাজা বলিয়া তাঁহার যে একটা বিশেষ সম্মানও ছিল, তাহা আর কাহারও ছিল না। তিনি সকল দেশের পণ্ডিতের সম্মান করিতেন এবং সকল দেশের লোককেই কাশীবাসের সুবিধা করিয়া দিতেন। মস্করী প্রথম হইতেই রাজার সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং রাজার সাহায্যও সকল বিষয়েই পাইয়াছিলেন। রাজাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিনেই মস্করীর এক মহা বিপদ্ উপস্থিত হইল। পঞ্জাব হইতে এক জন রাজদূত কাশীর রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মস্করীর প্রধান শত্রু হইলেন। দুজনেই আসিয়াছেন লোক নিমন্ত্রণ করিতে। এক জন পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া পূবে লইয়া যাইবেন আর পুরস্কার দিবেন। আর এক জন সিপাহী লইয়া যাইবেন, আর যুদ্ধ করাইবেন। দুই জনের অনেকবার রাজসভায় বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পঞ্জাবের রাজদূত বলেন,—"রাজসভা করিয়া গুণের পুরস্কার দিবার এ সময় নয়। তিনি বলেন,—প্রবল শত্রু হিন্দুদিগের সীমান্তে হানা দিতেছে। পূর্ব্বেও অনেকবার এরূপ হানা দিয়াছে। কিন্তু যাহারা দিয়াছে, তাহারা ঠাকুর মানিত, দেবতা মানিত, ব্রাহ্মণ মানিত, আচার মানিত, প্রতিমাপূজা করিত, আগুনপূজা করিত, সূর্য্যপূজা করিত, জলপূজা করিত, মাটীপূজা করিত, অনেক বিষয়েই আমাদের মতই ছিল। কিন্তু এ এক বিচিত্র জাতি আসিয়াছে। ইহাদের ধর্ম্মও বিচিত্র। ইহাদের মনে দেবতা-মানা মহাপাপ। প্রতিমাভাঙ্গা মহাপুণ্য। জল, মাটী, সূর্য্য জড়পদার্থ;—দেবতা নহে, মানুষ নহে, জীবও নহে। ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাদের জাতি নাশ ক'রে পইতা ছিঁড়ে দেয়। আচার মানে না, বিচার মানে না। পঞ্জাব ইহাদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত। ইহারা বরাবর পঞ্জাব লুঠ করিয়াছে, কাশ্মীর লুঠ করিয়াছে, অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে উৎসন্ন দিয়াছে। অনেকে প্রাণ লইয়া বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। শ্রীহরি পণ্ডিত দেশত্যাগী, তাঁহার পুত্র দেশত্যাগী, কত কত পণ্ডিত যে কাশ্মীর ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অমন যে আমাদের তীর্থ জ্বালামুখী, তাহা লুঠিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে। যে নগরকোটের ব্রাহ্মণেরা আভিজাত্যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অগ্রগণ্য, যাহাদের হাতে ভাত খাইতে কেহই আপত্তি করিতে পারেন না, সেই নগরকোট এখন শ্মশান হইয়াছে। এই কি সময় রাজসভা করিয়া গুণের পুরস্কার দিবার? এ সময় যদি সকলে প্রাণপণে আত্মরক্ষা না করেন, তবে ২।৬ বছরের মধ্যেই আপনারাই কোথায় থাকিবেন,

তাহার ঠিকানা নাই,—আবার আপনাদের গুণ? এখন কেবল সাজসজ্জা, কেবল রণসজ্জা। আমি অনহিল গিয়াছিলাম, শাকম্ভরী গিয়াছিলাম, ধারায় গিয়াছিলাম, ত্রিপুরী গিয়াছিলাম, খাজুরাহা গিয়াছিলাম, দিল্লী গিয়াছিলাম, কনৌজ গিয়াছিলাম, মাণ্ডোর গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার বড় একটা বকাবকী করিতে হয় নাই। পঞ্জাব হইতে, কাশ্মীর হইতে, নগরকোট হইতে, থানেশ্বর হইতে পলাতক সর্ব্বস্বান্ত লোকজন আসিয়া আমার সব কাজ করিয়া দিয়াছে। দু'এক জায়গায় আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে হয় নাই। ইহারাই আমার কাজ সারিয়া রাখিয়াছিল। ওদিকে আপনি আর যাইবেন না, সমস্ত দেশের লোক এক-হাড় এক-প্রাণ হইয়াছে। দেখুন, রাজপুতেরা যদি রক্ষা না করিত, কাসিমের পুত্র মহম্মদ সিন্ধু জয় করিয়া ঐ পথে বরাবর অনেক দূর আসিয়া পড়িত। তাহারা তিন শত বৎসর ধরিয়া এক প্রান্ত রক্ষা করিতেছে। আবার আর এক প্রান্তে বিপদ্ উপস্থিত। এ সময়ে কেবল যুদ্ধ, আত্মরক্ষা, বিপক্ষ-দমন ও বিপক্ষ-নাশন। এটা বারোয়ারীর সময় নয়। বঙ্গাধিপ সাতগাঁ রাজ্য জয় করিয়াছেন—বেশই করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত সামর্থ্য, সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য প্রয়োগ করুন। সশস্ত্রে সমস্ত প্রজার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। নহিলে এ সময়ে উৎসব, আনন্দ, দান-ধ্যান আরম্ভ করিলে সব লোপ হইয়া যাইবে, আর উৎসব করিতে হইবে না, আর দান করিতে হইবে না, আর ধ্যান করিতে হইবে না। আপনি দেশে ফিরিয়া যান, বঙ্গাধিপতিকে সব কথা বুঝাইয়া বলুন। রাজসভা ছাড়িয়া দিতে বলুন। যুদ্ধের সজ্জা করিতে বলুন। আমিও সত্বর তাঁহার সভায় উপস্থিত হইব।"

মস্করী শুনিলেন। রাজদূতের ভাষায় ও ভঙ্গীতে বুঝিলেন, ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে যে কি, তাঁহার ধারণা হইল না, তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। কাশীর লোকেও যে বড় বুঝিল, তাহা নহে। তাহারাও বুঝিল দূরে—কত দূরে তাহার ঠিকানা নাই—একটা বিপদ্ উপস্থিত; কিন্তু তাহাতে আমাদের কি? আমরা কেন এখন তাহার জন্য মাথা ঘামাই, এই ভাবের একটা যেন আধ-সত্য একটা বিপদের ধারণা হইল। তাহারা মাতিল না। দু'চার জন ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে লাগিল, এই মাত্র।

মস্করী কাশীর কাজ সারিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়া কনৌজ যাত্রা করিলেন। মাঝে প্রয়াগ, ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানদান করিয়া গঙ্গা বাহিয়া কনৌজ গেলেন। নৌকা লাগিল ডাঙ্গায় নহে, প্রায় ওপারে একখানা নৌকার গায়ে। সমস্ত নৌকাটা গঙ্গায় ভরা। ওপার ভিন্ন আসা-যাওয়ার পথ নাই। মস্করী নৌকায় ছৈয়ের উপর দিয়া কনৌজের ঘাটে পা দিলেন। সহরটি তিন ক্রোশ দীর্ঘে, গঙ্গার ধারে এবং প্রস্থেও প্রায় তিন ক্রোশ। ঠিক মধ্যস্থলে রাজবাড়ী। রাজপুত-প্রতিহার বংশের মহারাজাধিরাজ রাজ্যপাল রাজা। তাঁহার রাজত্ব শতদ্রু নদী হইতে বিহারদেশ পর্য্যন্ত। কাশী, মথুরা, দিল্লী তাঁহার সামন্তরাজ্য। তাঁহাদের রাজত্ব আরও বিস্তৃত ছিল। যমুনার দক্ষিণধারটা এখন স্বাধীন হইয়াছে। আর প্রতিহারদের আদিভূমি রাজপুতানা ও সেখানকার প্রতিহারেরা কনৌজের অধীন নহে, স্বাধীন হইয়াছে।

মস্করী এত বড় সহর কখনও দেখেন নাই। কনৌজ, একাধারে রাজধানী, বন্দর, ব্যবসায়ের স্থান, বিদ্যার স্থান ও সেনানিবাস। সুতরাং সহর যে বড় হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু সহরে আসিয়া মস্করী দেখিলেন, সকলের মুখেই ঐ এক কথা;— মুসলমান আসিতেছে। সকলেই সাজিতেছে, নিতান্ত শিশু ও বৃদ্ধ, নিতান্ত কাণা, খোঁড়া, আতুর ও অন্ধ ছাড়া সকলেই সাজিতেছে। জাতিভেদও মানিতেছে না। ব্রাহ্মণও সাজিতেছে, ক্ষত্রিয়ও সাজিতেছে, বৈশ্যও সাজিতেছে, শূদ্রও সাজিতেছে, পাহাড়ীও সাজিতেছে। শুনিলেন, পাণওয়ালীরা যাহা উপায় করিয়াছিল, যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল, সব দিয়াছে। তাহাতে প্রায় এক কোটি টাকা হইয়াছে। কনৌজের পাণ খুব বিখ্যাত। প্রায় এক হাজার পাণওয়ালী ছিল; তাহারা যথাসর্ব্বস্ব দিয়াছে। রাজমহিষী বাপের দেওয়া এক জোড়া হীরার বালামাত্র আইওতের চিহ্ন রাখিয়া বাকী সব গহনা দিয়া দিয়াছেন। রাজা এক বৎসরের রাজস্ব—যাহার নাম রাজার সর্ব্বস্ব, দিয়া দিয়াছেন। ব্যবসাদারেরা ছয় মাসের মুনাফা দিয়া দিয়াছে। শিল্পীরা এক বৎসরের আয় দিয়া দিয়াছে। যুদ্ধের উদ্যোগ, উপকরণ রাশি রাশি প্রস্তুত হইতেছে, সংগ্রহ হইতেছে, জমা হইতেছে ও ছালাবন্দী হইতেছে। পঞ্জাবরাজের খবর আসিলেই রওয়ানা হইয়া যাইবে। মস্করীর রাজসভার কথা কেহই শুনিতে চাহে না। শুনিবে কি? পঞ্জাব ধ্বংস করিতে পারিলেই কনৌজ, মাঝে আর কিছুই নাই।

অনঙ্গশ্মাল তাই কনৌজে অনেক লোক পাঠাইয়াছেন। তাহারা কনৌজের লোককে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছে যে, বিপদ আসন্ন। তাই সবাই মাতিয়াছে। আহা! এমন সোনার কনৌজ ছারখারে যাবে গো? এ কথা যাহারই মনে হয়, সেই সর্ব্বস্ব পণ করে, প্রাণপণ করে। মঙ্করীর কথা কেহ শুনে না। শুনিবে কি? তিনি অনেকবার ভাবেন, "ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় রাজসভা করিব, না বলিলেই ভাল হইত। আমিও সাজিতে পারিতাম। আমার আর কে আছে? সনাতনধর্ম্মের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত দিতামই, প্রাণটাও দিতাম। এমন বিপদ্ উপস্থিত জানিলে কি এমন কার্য্য করি? আমাদের দেশে এত কাণ্ডের কোনই খবর নাই, মগধেও ত নাই। এখন করি কি? আরও যাইব কি? যাইয়া ফল নাই, সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখিব। নানা দেশ দেখিবার, নানা তীর্থ করিবার কত বাঞ্ছা ছিল; কিন্তু যদি নিমন্ত্রণই না করিতে পারি, বৃথা অর্থব্যয়েরই বা দরকার কি? বৃথা পরিশ্রমেরই বা কারণ কি? তবে এখান হইতেই ফিরিব কি? এখনও ত দিন আছে? ফিরিব কি?" আবার ভাবিলেন:—"দেখিলাম ত কনৌজ এখন ভারতের প্রাণ। এইখানে বসিয়াই ভারতের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর লই। তাহার পর যাহা বিবেচনা হয়, করিব।"

মঙ্করী মাসখানেক কনৌজে রহিলেন, অনেক দেশের অনেক লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও কহিলেন; কিন্তু সব বৃথা হইল। সকলেই বলিল, রাজসভার এ সময় নয়। পরম শত্রু দরজায় ঘা দিতেছে। ইহারা আসিলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ হইয়া যাইবে। এখন একমনে একপ্রাণে যাহাতে উহাদের হটাইতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। মঙ্করী করেন কি? মথুরা বৃন্দাবন দেখিয়া দেশে ফিরিলেন। ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে ফিরিলেন। রাজসভাটা যে বিশেষ জমিবে না, এই তাঁহার দুঃখ। কিন্তু রাজসভার পর বাঙ্গালাকেও দেশরক্ষায় মাতাইতে হইবে। হয় ত নিজেও যুদ্ধে যাইতে হইবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১

মঙ্করী দেশে ফিরিলেন। তিনি গঙ্গা বাহিয়া আসিয়া অযুরার উত্তরে বল্লুকা নদীর ভিতরে ঢুকিলেন। সেখানে বড়োয়ানে নামিয়া হাঁটিয়া চৌথখণ্ডে গেলেন। সেখান হইতে পিশাচখণ্ড বেশী দূর নয়। নিজের বাড়ী গিয়া তিনি চারি পাঁচ দিন বিশ্রাম করিলেন। এত দিন গৃহিণী অগ্নিরক্ষা করিতেছিলেন। সে ভার তিনি বহুদিনের পর নিজেই লইলেন। এবার কিন্তু ভবতারণ পিশাচখণ্ডীর মনের ভাব বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। পিশাচখণ্ডের উপর তাঁহার বড় মায়া নাই। তিনি চারিদিক্ হইতে হিসাবপত্র গুটাইতে লাগিলেন; সোণা, রূপা, হীরা, জহরত প্রভৃতি বহুমূল্য জিনিস লইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী ইহাতে কিছু ভয় পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলে পিশাচখণ্ডী উত্তর দিতেন,—"আর কি? বিবাহের সময় হইতে আরম্ভ করিয়াছি, এখন ৬০।৬২ বছরের উপর বয়স হ'ল, ৩০ বৎসরের উপর অগ্নিরক্ষা করিয়াছি। এখন অগ্নি-বিসর্জ্জন দিয়া চল আমরা তীর্থ-বাস করি গিয়া। ছেলেপিলে ত হইলই না। বিষয় রক্ষা করিয়াই বা কি হইবে? সংসারধর্ম্ম করিয়াই বা কি হইবে?" ব্রাহ্মণীকে এইরূপ বুঝান; কিন্তু নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোক সংগ্রহ করেন। তিনি তাহাদের তীর-ধনু-ঢাল-তরবাল খেলা শিখান, ঘোড়ায় চড়া শিখান, বল্লম ধরা, কেঁচা ধরা শিখান। এইরূপে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ তিন মাস কাটিয়া গেল। তিনিও বাহির হইয়া দেবগ্রামে ভবদেবের সঙ্গে ও ময়নামতীর পাহাড়ে হরিবর্ম্মদেবের সহিত দেখা করিলেন। আসল কথা এই দুজনের কাছেই ভাঙ্গিলেন, আর কাহারও কাছে ভাঙ্গিলেন না। ইঁহারাও কাশ্মীর, নগরকোট, থানেশ্বর প্রভৃতি দেশের দুর্দ্দশা শুনিয়া একটু ভয় পাইলেন এবং যথাসাধ্য মুসলমানদের বাধা দিবারও চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মঙ্করী সাতগাঁয় আসিলেন, রাজা বিহারীর সহিত দেখা করিলেন, মায়ার সহিত দেখা করিলেন, পোষ্যপুত্র দুটিকে দেখিলেন। তাহারা সম্পর্কে 'মামা-ভাগ্নে' হইলেও মাণিকযোড় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মায়ার ছেলেটি দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে ইহার মধ্যে জলে ঝাঁপাই ঝোড়ে, গাছে উঠে, জন্তু-জানোয়ার তাড়ায়, ছোট ছোট তীর-ধনুক লইয়া খেলা করে। তাহার মামা তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ছেলে যখন তীর-ধনুক লইয়া কাক-বক-শিয়াল-কুকুর তাড়না করে, মায়ের তখন বড় আনন্দ হয়। তখন

সে দু'হাত বাড়াইয়া ছেলেটিকে কোলে লইতে যায়। ছিলে কিন্তু ঘাড় বাঁকাইয়া দূরে সরিয়া যায় এবং আর এক দিকে তীর মারে।

মস্করী মহাবিহারে গেলেন, গুরুপুত্রের সহিত দেখা করিলেন—দেখিলেন, সবার চেয়ে গুরুপুত্রেরই স্ফূর্ত্তি বেশী। তিনি ২।৩ কুঠারী সোণার প্রতিমা দেখাইলেন, ৪।৫টি জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দেখাইলেন—একটি ছোট পায়রার ডিমের মত হীরার বাণলিঙ্গ, একটি পান্নার গৌরীপট্টের উপর বসান, পাটাটি আবার একটি বৈদূর্য্য-শিলার উপর রাখা, বৈদূর্য্য-শিলার পিছন দিক্ হইতে একটি সোণার ডাঁটা উঠিয়া শিবের মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে; ছাতা সোনার তারে গাঁথা, চারিদিকে ঝালোর দেওয়া, ঝালোরে ছোট ছোট হীরা, ছোট ছোট মুক্তা, ছোট ছোট পান্না, ছোট ছোট পলা, ছোট ছোট নীলা দেওয়া। মস্করী ত দেখিয়াই আশ্চর্য্য; বলিলেন, "কারীকর কে?" উত্তর—"সোণার গাঁয়ের সেকরারা।" মস্করী খুব নিপুণ হইয়া জিনিসগুলি দেখিলেন, শতমুখে গুরুপুত্রের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তাহার পর দু'জনে নির্জ্জনে বসিয়া বাঙ্গালায়, মগধে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধদের পাণ্ডিত্য ও শিল্পকলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মস্করী নালন্দার কথা বলিতে বলিতে ভাবে গদগদ হইয়া গেলেন। নালন্দার কথা শুনিয়া গুরুপুত্রও মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—যত শীঘ্র পারেন, একবার বৌদ্ধদের এই পরমতীর্থ দেখিয়া আসিবেন। তিনি আহ্লাদে আট-খানা হইয়া বলিলেন—"আমার গুরুদেবও আসিয়া পৌঁছিবেন। তিনি এখন ললিতপত্তনেই আছেন। আমি আরও কাজ করিয়াছি; লক্ষ্মী-ভগবতীর যতগুলি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বাঁচিয়া আছে, সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি। প্রকটনিতম্বা স্বয়ং আসিবেন।"

মস্করী সেখান হইতে বিহারী দত্তের বাড়ী গেলেন। বিহারী হিন্দুদের অনেক জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে—অনেক পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তন-ওয়ালার পদ সংগ্রহ করিয়াছে, অনেক গায়ন নিমন্ত্রণ করিয়াছে। মস্করী দেখিলেন, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় একটা মহা, সমারোহ হইবে, মহা-আয়োজন হইবে, মহা সাজ-সরঞ্জাম ধূমধাম হইবে, সমস্ত সাতগাঁটা যেন তার জন্য টলমল করিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া মস্করীর আহ্লাদ ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তিনি কিছু দিনের জন্য দেশের ও ধর্ম্মের যে মহাবিপদ্ উপস্থিত, তাহা ভুলিয়া গেলেন; কিছু দিন উহাতেই মাতিয়া রহিলেন।

৩

ক্রমে দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। গোলার সম্মুখে মহাবিহারের সম্মুখে যেখানে গঙ্গার এপার ওপার দেখা যায় না, তাহার ঠিক মাঝখানে—ঠিক বুকের উপর, এক প্রকাণ্ড চড়া পড়িয়াছে। চড়ার চারিদিকে বালি জল হইতে একটু একটু করিয়া উঠিয়া শেষে মাটীতে দাঁড়াইয়াছে। সে প্রায়ই বর্ষায় ডুবে না, জল হইতে প্রায় ৩।৪ হাত জাগিয়াই থাকে। মাটীর উপর ঘাস, বন জঙ্গল খুব হইয়াছে, দুই চারিটা গাছও হইয়াছে। জায়গাটা প্রায় এক শত বিঘা হইবে। চাঁদের আলো যখন জঙ্গলের উপর পড়ে, তার পর বালির উপর, তার পর জলের উপর পড়ে, তখন সে আলোর খেলা বড়ই বিচিত্র হয়, বড়ই মধুর হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন জঙ্গল সাফ হইয়া যাইবে, চড়াটি বেশ করিয়া সাজান হইবে, দক্ষিণ হইতে বাতাস বহিতে থাকিবে, চারিদিকে ফুল ফুটিয়া উঠিবে, তখন এই চড়াতেই চাঁদের আলোর খেলা চমৎকার হইবে। এত বড় একটা রাজসভা হইবে, একবিন্দু তেল পুড়িবে না, একটিও আলো জ্বলিবে না—ভগবানের আলোতেই সব আলো করিয়া রাখিবে। সাতগাঁয়ের লোক উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে বিহারী দত্তের লোক আসিল, জঙ্গল কাটা সুরু হইল। এতটা জঙ্গল সব জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল। সেগুলা যে কোথা ভাসিয়া গেল, ঠিক নাই। ঘাস ত এমনিই ছিল—প্রায়ই দূর্ব্বা-ঘাস, মাঝে মাঝে মুথা, ঘাসের জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইল না। জমীও সমতল ছিল, কোথাও এক কোদাল চাঁচিতেও হইল না। চারিদিকে পতাকা-নিশান উড়িতে লাগিল। রাজার জন্য একটা জমকাল চাঁদোয়া ছাড়া চড়ার উপরে একটা সামিয়ানাও খাটাইতে হইল না। কেবল বসিবার আসন পাতিতে লাগিল, পাতিতে পাতিতে দেখা গেল, দূরের লোক রাজসভার কিছুই দেখিতে পাইবে না—সুতরাং দূরের লোকের দেখি-বার জন্য একটু উঁচা করিয়া, একটু ঢালু করিয়া দেওয়ার দরকার হইল। তাহাও হইল।

ক্রমে নৌকা আসিয়া বালির চড়ায় লাগিতে লাগিল। নৌকা হইতে দেখাইবার জিনিসপত্র তুলিয়া, যেখানে রাজা বসিবেন, তাহার চারিদিকে সাজান হইতে লাগিল। লক্ষ-লক্ষ টাকার জিনিস সাজান হইতে লাগিল। দুই চারি জন প্রহরী চড়াতেই থাকিত, আর সকলে নৌকায় থাকিয়াই পাহারা দিত। চড়ায় পাঠাইবার আগে সমজদারেরা

সমজিয়া লইয়া, গুণ-দোষ পরীক্ষা করিয়া সেগুলি একখানি খাতায় টুকিয়া রাখিত। তাই দেখিয়া পরে পুরস্কারের মাত্রা ঠিক হইবে। পরীক্ষাটা কতক মহাবিহারে হইত, কতক বিহারী দত্তের বাড়ীতে হইত; কিন্তু কাব্য ও শাস্ত্রের পরীক্ষা মস্করী নিজেই করিতেন, কখন কখন ভবদেব ঠাকুরের সহিত পরামর্শও করিতেন। পরামর্শ করার বিশেষ দরকারও ছিল। কারণ, এই দুই বিষয়ে যাহারা পুরস্কার লইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের মাথা। স্বয়ং উদয়ন আসিয়াছেন, শ্রীধর আসিয়াছেন, বাচস্পতি মিশ্র আসিয়াছেন, প্রভাকর-মতি আসিয়াছেন, উদয়নের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীহীর পণ্ডিত আসিয়াছেন, তাঁহার জোয়ান ছেলে শ্রীহর্ষ আসিয়াছেন—তিনি ইহারই মধ্যে এই বয়সেই অনেক রাজা-রাজড়ার কাছে প্রতিপত্তিও লাভ করিয়াছেন। কনৌজের রাজাই তাঁহাকে দুইটি পাণ ও আসন দিয়াছিলেন। তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রকটনিতম্ব আসিয়াছেন—তাঁহারও খ্যাতি বড় কম নয়। কাব্য-শাস্ত্রে তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী। বজ্রদত্ত আসিয়াছেন, তাঁহার লোকেশ্বরশতক ইহারই মধ্যে সহস্রকণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। রত্নাকর শান্তি আসিয়াছেন—তিনি কাব্যেও যেমন প্রবীণ, শাস্ত্রেও তেমনি প্রবীণ। তাঁহার ভাষায় কাব্য আছে, সংস্কৃত কাব্য আছে, ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। শুভাকর গুপ্ত আসিয়াছেন। ইনিই সবপ্রথম বৌদ্ধদের জন্য একখানি স্মৃতি রচনা করিবার চেষ্টা করেন। জৈন পণ্ডিত অভয়দেব মলধারী আসিয়াছেন। নাথযোগী চামরীনাথ আসিয়াছেন। সিদ্ধ সহজিয়া দারিপা আসিয়াছেন, ভাদে আসিয়াছেন, ঢেণ্ঢন আসিয়াছেন, ডুম্বরী আসিয়াছেন, কমলকন্দারি আসিয়াছেন, চিপিল আসিয়াছেন। নাথযোগী চৌরঙ্গীনাথ, চামযনাথ, তন্তিপা, হাড়িপা—ইহারাও আসিয়াছেন। এই সকল লোকের কাব্য ও শাস্ত্র পরীক্ষা করা কি মস্করীর কাজ? মস্করী যত বড় বিদ্বান্ই হউন না কেন, যাঁহাদের নাম করা গেল, তাঁহারা তাঁহাকে গুলিয়া খাইতে পারেন, তাঁহাকে বিশ বছর পড়াইতে পারেন। তবে মস্করী খুব চোকস লোক, সব দিকেই তাঁহার দৃষ্টি আছে, চোখে তাঁহার কিছুই এড়াইয়া যায় না। ভবদেব এ সকলের চেয়েই পণ্ডিত বেশী, বুদ্ধিমান্ বেশী, কাজের লোক বেশী, চোকসও বেশী। ভবদেব কোন কথা বলিলে, ভারতে এমন কেহই ছিল না যে, তাঁহার কথার উপর কথা কয়। তাই মস্করী সর্ব্বদাই ভবদেবের সহিত পরামর্শ করেন।

এইরূপ উদ্যোগপর্ব্বে সকলেই ব্যস্ত। রাতদিন নৌকায় যাতায়াতে সাতগাঁর গঙ্গা তোলপাড়। বড় বড় লোক আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন—আর কেবল ভেরী, শিঙ্গা বাজিতেছে। ভাট-চারণগণ তাঁহাদের যশোগান করিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময় এক দিন রাত্রিতে মহাবিহারের চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। ত্রিমালা মন্দির তিনটা আলোরাশির মত বোধ হইতে লাগিল—একটাকে বেড়িয়া একটা, দুইটাকে বেড়িয়া আর একটা। পাঁচতলা তোরণগুলা আলোময় হইয়া উঠিল। নানারূপ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বহু কালের পর মহাবিহারের অধিকারী লুইসিদ্ধা আবার সাতগাঁয়ে আসিয়াছেন। তাই সহজিয়ারা আজ আনন্দে মাতোয়ারা। রূপা রাজার রাজ্যনাশ হইয়াছে শুনিয়া লুইসিদ্ধা বড়ই দুঃখিত, বড়ই ম্রিয়মাণ, বড়ই বিমর্ষ। তিনি আসিয়া মহাবিহারের দেবদেবীগণকে পূজা করিলেন, নমস্কার করিলেন, সব সহজিয়াগণকে মহাবিহারে ডাকিলেন। ভোটদেশ, মঙ্গলদেশ, নেপাল, সুবর্ণদ্বীপ, হংসদ্বীপ, এই সকল জায়গায় যাহা যাহা করয়া আসিয়াছেন, চেলাদের সব তিনি শুনাইলেন। গুরুদেব এই সকল দেশে পূজা পাইয়াছেন জানিয়া তাহারাও আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিল। অনেকে তাঁহার সোণার ও পাথরের প্রতিমা লইয়াছে, অনেক দেশে তাঁহার অষ্টধাতুর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অনেক দেশে তাঁহার নামে মন্দির দিয়াছে—তাঁহার নামে যাত্রা, মহোৎসবও চালাইয়াছে—ঐ সকল শুনিয়া তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মানিয়া লইল, ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া গেল।

তিনি আসা অবধি সাতগাঁয়ে আবার কীর্ত্তনের ধুম পড়িয়া গেল। খুলীরা অনেক বৎসর ধরিয়া দেশবিদেশে খোল বাজাইয়া হাত এমনি সাফ করিয়াছে যে, খোলে চাঁটি দিবামাত্র রাগ-রাগিণী যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া নাচিতে থাকে। কীর্ত্তনীয়ারা যখন খোলের সহিত গলা তুলিয়া সহজিয়া পদ গাহিতে থাকে আর সেই সঙ্গে খঞ্জনীখরতাল বাজিতে থাকে, শিঙ্গা বাজিতে থাকে, তখন সমস্ত লোক একতান-মনপ্রাণে সেই গান শুনিয়া প্রেমে, সুখে, মোহে আর মোহনীতে মজিয়া যায়, সহজিয়ার সার কথা তাহাদের মনের মাঝে তখন ভাসিয়া উঠে। তাহারা এই ক্ষণিক সুখকে নিত্য সুখ করিয়া লইবার জন্য

ব্যস্ত হয়, তন্ময় হয়, একাগ্র হয়—মনে করে, যদি এই ভাবে চিরদিন থাকিতে পারি, এই ভাবে এই সুর নিরন্তর কাণে বাজে, এইরূপ প্রেম যদি নিত্য হয়, এইরূপ সুখ যদি নিত্য হয়, এইরূপ মোহ যদি নিত্য হয়, এইরূপ মোহিনীও যদি নিত্য হয়, সেই ত নিত্যানন্দ, সেই ত নির্ব্বাণ, সেই ত শূন্যময়, বিজ্ঞানময়, মহাসুখময় নিত্য-বুদ্ধভাব, সেই ভাবের জন্য তাহারা পাগল হইয়া উঠে, উন্মাদ হইয়া উঠে। লুইসিদ্ধার কীর্ত্তনীয়ারা কীর্ত্তন আরম্ভ করিবামাত্রই এইরূপ সুর জমিত, এইরূপ গান জমিত, এইরূপ ভাব জমিত, এইরূপ একাগ্রতা আসিত। আর যতক্ষণ সে গানের বিরামসুর কাণে না লয় হইয়া যাইত, ততক্ষণ একভাবেই থাকিত। অনেকের ভাব লাগিত, তাহারা অজ্ঞান হইয়া যাইত, অনেকরূপ সাত্ত্বিকবিকার তাহাদের দেহে প্রকাশ পাইত।

লুইসিদ্ধা গুরুপুত্রের কাছে সাতগাঁয়ের সব ব্যাপার আগাগোড়া শুনিলেন—বুঝিলেন, দলাদলির ঝোঁকে শ্রীজ্ঞানবজ্র সহজিয়াদের সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি ভাবিলেন—"আজ যদি মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ থাকিতেন, আমরা বাঙ্গালাও মাতাইতে পারিতাম, বাঙ্গালায়ও আমাদের জয়জয়কার হইত। যাহা হোক, যা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর চারা নাই। আমাদিগকেও কিছু দিন স্রোতে গা-ভাসান দিতে হইবে।" লুইসিদ্ধা সেবার সাতগাঁয় বাহির হইয়াছিলেন হাতীর উপর হাওদায় বসিয়া, এবার বাহির হইলেন হাঁটিয়া; সেবার বাহির হইয়াছিলেন রাজসাজে, এবার বাহির হইলেন ভিক্ষুসাজে; সেবার সঙ্গে ছিল রাজার দল, এবার সঙ্গে ছিল কীর্ত্তনীয়ার দল; সেবার সঙ্গে ছিল হাজার হাজার লোক, এবার সঙ্গে কেবল কয়েকটি কীর্ত্তনীয়া। তিনি, যে ডাকিল, তাহারই বাড়ী গেলেন, কিন্তু সকলের আগে গেলেন রাজা বিহারী দত্তের বাড়ী। বিহারী দত্ত তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল, পূজা করিল, ফুল দিল, মালা দিল, চন্দন দিল। মায়াও তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল, পূজা করিল, ফুল দিল, মালা দিল, চন্দন দিল। তিনি ভবদেবের সহিত দেখা করিলেন, ভবদেবও তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া শতমুখে প্রশংসা করিলেন এবং রাজা আসিলে তাঁহারও সম্মুখে কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; বলিলেন,—"মহারাজাধিরাজ আমাদের বড়ই গুণগ্রাহী, তিনি কেবল গুণই দেখেন, জাতি দেখেন না, ধর্ম্ম দেখেন না, কুল দেখেন না, সম্প্রদায় বাছেন না।" লুইসিদ্ধা ঘাড় হেঁট করিয়া ভবদেব ঠাকুরের কথাগুলি শুনিল, আর নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশীর দিন সকালে গোলীন গ্রামের সামনে গঙ্গার যে সব প্রকাণ্ড খাড়ী আছে, তাহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যেখান হইতে যমুনা বাহির হইয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়া গিয়াছে, সেই দিক্ হইতে রণবাদ্য শুনা যাইতে লাগিল। ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা, ঝাঁঝের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। জলরাশির উপর দিয়া সে বাজনা সুদূর গোলীন বা সাতগাঁয়ে যখন পৌছিল, তখন তাহার আর রণ-রণ ভাব নাই; দূরস্থ বাজনার শব্দ যেমন মধুর হয়, তেমনি মধুর শুনা যাইতে লাগিল। প্রথমতঃ কিসের শব্দ বলিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। তাহার পর কাণ পাতিয়া শুনিল, শব্দ ঈশানকোণ হইতে আসিতেছে আর শব্দটা যুদ্ধের বাজনার শব্দ—কুচকাওয়াজের বাজনার শব্দ। তখন তাহারা ভাবিল, রাজা আসিতেছেন। যমুনা বাহিয়া আসাই তাঁহার পক্ষে সুবিধা—তিনিই আসিতেছেন। তখন নগরশুদ্ধ লোক গঙ্গার ধারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। গঙ্গার ধারে যাহাদের বাড়ী, তাহাদের বাড়ীতে আর লোক ধরে না। যাহাদের দুতলা ছিল, তাহাদের ছাদে পর্য্যন্ত লোক উঠিল। সকলেরই মুখ একদিকে—ঐ ঈশানকোণে ঐ দিক্ হইতে বাজনা আসিতেছে।

ঐ দেখা যায়,—ঐ দেখা যায়—ঐ যে রাজার ডিঙ্গী—ওখানা ময়ূরপঙ্খী—দেখ্‌ছ না, ঐ ময়ূরের মুখ দেখা যায়—হাঁ হাঁ, ময়ূরপঙ্খীই বটে—দেখ না, ময়ূরের মাথার তিনটা চূড়া পর্য্যন্ত রহিয়াছে—হাঁ হাঁ, ময়ূরপঙ্খী নিশ্চয়ই—ঐখানাতেই রাজা আছেন—দেখ্‌ছ না নিশান—ঐখানাতেই রাজা—দেখ ত কয়খানা ডিঙ্গা আছে—এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—সাত—এক সাঙ্গা, আট—নয়—দশ—এগার—বার—তের—তেরখানা—দূর চৌদ্দখানা—কিসে হ'ল? আর, ময়ূরপঙ্খীখানাকে ধর্‌লি না—তবে আবার গুণি—এক—দুই—ইত্যাদি চৌদ্দখানাই বটে। দুসাঙ্গা ডিঙ্গায় রাজা আসিতেছেন।

ফাল্গুন মাস—একটানা গঙ্গা—তাহাতে বাঙ্গাল মাঝী—খুব পাকা—হালেই বল, দাঁড়েই বল—খুব শক্ত—তাহাতে আবার আজ একটু উত্তরে বাতাস বহিয়াছে—উত্তরে বাতাসের এই শেষ—বাতাসও মরণ-কামড় কামড়াইতেছে। সাঙ্গা হু হু করিয়া গোলীনের দিকে আসিতে লাগিল—ময়ূরপঙ্খীর মাথাটাই দেখা যাইতেছিল—এখন সবটাই দেখা যাইতে লাগিল—উত্তরে বাতাস পাইয়া পাল তুলিয়া দিয়াছে

—পাল অনেকগুলা; সেগুলা এমন চিত্র-বিচিত্র করা, যেন ময়ূরের পেখম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ময়ূরের পেখমের মত উজ্জ্বল লাল, উজ্জ্বল নীল, উজ্জ্বল জরদা.য় ঠিক বোধ হইতে লাগিল, বসন্তকালেও ময়ূর পেখম ধরিয়া নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। ময়ূরের পেখম ও ঘাড় এ দুয়ের মধ্যে কামরা—কতগুলা গণা যায় না। ময়ূরের রঙে রঙ করা—মাঝখানে তিনটা দোতলা কামর' ও তাহার মাঝখানে একটা তেতলা কামরা। এগুলার রঙ আর একরূপ, এমন করিয়া সাজান যে, বোধ হয়, একটা মানুষ বসিয়া আছে—তাহার গায় রাজবেশ। যেন ময়ূরে চড়িয়া কার্ত্তিক আসিতেছেন।

সাজা যতই কাছে আসিতে লাগিল, লোকের কোলাহল ততই বাড়িতে লাগিল। কে আগে কি দেখিয়াছে, তাহাই লইয়া অনেকে কোলাহল বাড়াইয়া দিতে লাগিল। রাজার জয়, হরিবর্ম্মার জয়, মহা-রাজাধিরাজের জয় শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, প্রথম অল্প, তাহার পর একটু উচ্চ,—যতই কাছে আসিতে লাগিল, তত উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। যখন গোলীনের সামনে দিয়া যাইতে লাগিল, তখন উচ্চতম হইয়া দাঁড়াইল। হাজার হাজার লোক 'রাজার জয়, রাজার জয়' বলিতে লাগিল। শেষ সব শব্দ ডুবিয়া গিয়া এক জয় শব্দ জয়জয়কার করিতে লাগিল।

হরিবর্ম্মার ময়ূরপঙ্খীখানি ধীরে ধীরে পাড়ের অতি কাছ দিয়া যাইতে লাগিল। তেতলায় রাজা ছিলেন। তিনি বাহিরে দোতলার ছইয়ে আসিয়া কিনারায় দাঁড়াইলেন। যতবার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—ঘাড় নোঙাইয়া হাত তুলিয়া জয়ধ্বনির উত্তর দিতে লাগিলেন, নমস্কারের প্রতিনমস্কার করিতে লাগিলেন। কতকগুলা দুষ্ট লোক বলিতে লাগিল—মহারাজকেই এ রাজসভায় প্রথম ও প্রধান পুরস্কার দেওয়া উচিত। এমন করিয়া ময়ূরপঙ্খী আর কেহ কি সাজাইতে পারিত?

হরিবর্ম্মার ময়ূরপঙ্খী স্বপ্নের মত শীঘ্র শীঘ্র সাত-গাঁর লোকের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, আর চড়া ঘুরিয়া চড়ার পূবদিকে গিয়া নঙ্গর করিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, 'এ কি দেখিলাম—অদ্ভুত অদ্ভুত!' লোকে আর ময়ূরপঙ্খী থেকে চোখ ফিরাইতে চায় না—দেখিয়া তাহাদের যেন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। কিন্তু তৃপ্তি না হইলেই বা কি হইবে, ক্রমে যে চোখের বাহির হইয়া গেল, ক্রমে যে চড়ায় আড়াল পড়িল—নিশ্বাস ফেলিয়া লোক চোখ ফিরাইল, যাহারা রাজদর্শনের পুণ্য চায়, তাহারা ছোট ছোট ডিঙ্গা খুলিয়া ময়ূরপঙ্খীর পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল,—প্রায় হাজার ছোট নৌকা খুলিয়া গেল। অনেক লোক তাহাতে উঠিয়া গেল। বাকী লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এক এক করিয়া ফিরিয়া ঘরে গেল।

৬

রাজাধিরাজের নৌকা নঙ্গর করিলেই রাজা বিহারী তাঁহাকে গিয়া নমস্কার করিলেন। রাজা বলিলেন, 'বিহারী, কাল দোল। আমরা যাদব, আমরা দোলটি আমাদেরই উৎসব বলিয়া মনে করি। শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন, তাঁহারই উৎসব। কাল দোলও হইবে, আবার রাজসভাও হইবে। সুতরাং আজি চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দেও যে, কাল সকালেই যেন সকলে দোলের উৎসব সারিয়া বৈকালে উজ্জ্বল বেশে মহাসভায় হাজির হয়। বৈকালে যেখানে যেখানে দোলের মেলা হয়, সেগুলি বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু বন্ধ করিতে গেলেই একটা গোল উঠিতে পারে। বিশেষ বৌদ্ধদের দোল অন্য-রূপ, তাই আমার পরামর্শ এই যে, তুমি বলিয়া দেও যে, যাহারা মেলা—বিশেষ দোলের মেলা—দেখিতে চাহিবে, তাহাদের জন্য রাজসভার দুই পাশে মেলা বসিবে। হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই সম্প্রদায়েরই দোল খাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে ও হাট-বাজার বসিবে।'

বলিতে না বলিতে রাজার রণবাদ্যওয়ালারা দুজন তিনজন করিয়া বাহক হইয়া গেল ও যে যেখানে পাইল, ঢেঁটরা দিয়া রাজার আজ্ঞা প্রজা-দের জানাইয়া দিল। বিহারীর ঢেঁটরাওয়ালারাও চারিদিকে জানাইয়া দিল। সে কালে লোককে রাজার বা বড়লোকের আজ্ঞা জানাইয়া দিবার জন্য চৌমাথায় ও অন্যান্য খোলা জায়গায় একটা করিয়া থাম থাকিত। থামগুলা চৌকোণা, ক্রমে সরু হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গা খুব মাজা পালিস করা। রাজার লোক তাহার উপর খড়ি দিয়া বা কালী দিয়া রাজার আজ্ঞা জানাইয়া দিত। এবারে সব থামেই লিখিয়া দেওয়া হইল। বড় বড় অক্ষরে রাজার আজ্ঞা—'তোমরা সকালে সকলে দোল সারিয়া ফাগ খেলিয়া বৈকালে উজ্জ্বল বেশে রাজসভায় যাইবে। সেখানে মেলা হইবে। নানারূপ দোলের ব্যবস্থা আছে—হাটবাজার আছে, রাজার আজ্ঞা, সবাই

যাবে। কেহই বাড়ী বসিয়া থাকিবে না। ছেলে-মেয়ে সবাই যাবে। কার আজ্ঞা—রাজার আজ্ঞা।'

যতবারই ঢেঁটরা হয়, এইরূপই হয়। থামে লিখিয়া দেওয়া হয়, আর ঢুলি দিয়া দেশের লোককে জানাইয়া দেওয়া হয়। এবার এক নূতন ব্যাপার হইয়াছে। রাজা বিহারী কোন্ দেশ থেকে "কায়-গদ" নামে বড় বড় পাতলা তক্তার মত কি আনি-য়াছে। তক্তার সঙ্গে তার তফাৎ এই যে, সেগুলা গুটান যায়, তক্তা গুটান যায় না। তার উপর বেশ লেখা চলে; এই কায়গদে ছোট করিয়া লিখিয়া থামে মারিয়া দেওয়া হইল। আবার বড় বড় করিয়া লিখিয়া দেওয়ালেও মারিয়া দেওয়া হইল।

রাজা বিহারী তখনই মহাসভার দুই পাশে দোল খাবার ব্যবস্থা করিলেন ও মেলা বসাইতে বলিলেন। সাতগাঁ বেণের দেশ, বিহারীর মুখের কথা খসিবা-মাত্র সব ঠিক হইয়া গেল। উত্তরদিকে হিন্দুদের ও দক্ষিণদিকে বৌদ্ধদের জন্য দোল, নাগরদোল, ঘোড়াদোল খাটাইয়া দেওয়া হইল। মেয়েরাও দোল খাইবে, ছেলেরাও দোল খাইবে। হিন্দুর দেবতারা প্রথম দোল খান, তার পর মানুষে প্রসাদ পায়; বৌদ্ধদের দোল থেরারা আগে খান, তার পর অন্য লোকে প্রসাদ পায়। এখনকার বৌদ্ধরা আবার শক্তি লইয়া দোল খান। প্রথম প্রথম ঘরের মধ্যেই খাইতেন, এখন প্রকাশ্যভাবে খান। এবার কিন্তু হিন্দু রাজা পাছে চটেন, তাই সকলে প্রকাশ্যে শক্তি আনিবে না স্থির করিয়াছে। দু এক দল কিন্তু শক্তি লইয়াই আসিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

৭

দোলটা ঋতুর উৎসব। সুতরাং উহা যে শুধু হিন্দুরই উৎসব, অন্য কাহারও নহে, এ কথা ঠিক নহে। উহা ভারতবাসিমাত্রেরই উৎসব। এমন কি, মানবজাতিরই উৎসব। শীত যায়, বসন্ত আসে, ঠিক সন্ধিস্থলে এই উৎসব। শীত হইল মেড়া অসুর, তাহাকে আগের দিন মারিয়া পোড়াইয়া পরের দিন উৎসব। উৎসব মানে স্ফূর্ত্তি। আর শীতের ভয় নাই, গায়ে কাপড় দিতে হইবে না, উত্তরের বাতাসে গা যেন কাটিয়া দেয়, সে বাতাস আর বহিবে না। দক্ষিণে বহিবে, তাহাতে দেহ ও মনের আনন্দ হইবে। শীতকালের চাঁদের আলোর উপর যেন একটা খুব পাতলা হিমের আবরণ থাকে, আলো ফিকা দেখা যায়। সেটা আর থাকিবে না, চাঁদের আলো ঘন হইবে—উজ্জ্বল হইবে। শীতকালে এক কুঁদ ছাড়া ফুল হয় না। এখন সব গাছের পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, আর তাহার গা হইতে যেন ফাটিয়া ফুল বাহির হইতেছে। পলাশফুল ফুটিয়া চারিদিক্ লাল করিয়া দিয়াছে; পৃথিবী যেন নূতন বৌয়ের মত রাঙা চেলি পরিয়া আছেন। শিমুল লালফুলে লাল হইয়া বসিয়া আছে। সোঁদাল সোণার রঙ চারি-দিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আমের বউল ফুটিয়া গন্ধে আমোদ করিতেছে। সকলের উপর জলপদ্ম ফুটিয়া রূপে, গুণে ও গন্ধে যেন মূর্ত্তিমান্ বসন্তলক্ষ্মী হইয়া আছে।

রাজার ঢেঁটরা বন্ধ হইলে, কিছুক্ষণ পরে ছেলে-দের ভিতর খুব গোল উপস্থিত হইল। রাম শ্যামকে ডাকিল চ-চ-চ; হরি কৃষ্ণকে ডাকিল—আয়, আমরা যাই। বিনোদ কানাইকে, সাধুকে ডাকিল—আয়, আমরা সরস্বতীর ও পারে যাই। সবাই সকলকে ডাকিতেছে, কেহই কাহার জবাব অপেক্ষা করিতেছে না। সবাই সরস্বতীর পশ্চিম পারে যাইতেছে। নৌকা লাগানই আছে, কোথাও কোথাও নৌকার সাঁকো আছে। লোকে হু হু করিয়া পার হইতেছে। ছেলেরাই পার হইতেছে—১২ থেকে ২৪ পর্য্যন্ত বয়সের লোকেই পার হইতেছে, আধাবয়সী যারা, তারা যাইতেছে না। যাহারা পার হইতেছে, তাহাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? পার হইয়া তাহারা মাঠে পড়িল, সেখানে সারি সারি মেড়া অসুর সাজান আছে; বাঁশের উপর খড়জড়ান একটা বিকট মূর্ত্তি। সব হিন্দুর বাড়ীই দোল। সব বাড়ীতেই মেড়া অসুর আছে, সব মেড়াই মাঠে আসিয়াছে। সারি সারি হাজার হাজার মেড়া সাজান। সন্ধ্যাটি হইল, আর ছেলেরা উন্মত্ত হইয়া মেড়ায় আগুন লাগাইতে লাগিল। কতকগুলা ছোট ছোট ঝোপড়ার মত ঘর ছিল, তাহাতেও আগুন লাগাইয়া দিল, আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা নাচিতে লাগিল, গাইতে লাগিল ও হাততালি দিতে লাগিল, আর কত রকম বাঁদরামী করিতে লাগিল, তাহা আর লিখিয়া কাজ নাই। চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিল, আগুন তখনও নিবে নাই। তাহারা চারিদিকে একবার চাহিল, একটা হল্লা করিয়া উঠিল, তাহার পর যে যাহার ঘরে গেল।

পরদিন সকালে দোল। দোলে সবাই মাতে, হিন্দুরা ঠাকুরকে দোল দেয়। আপনারা বড় একটা

খায় না। বৌদ্ধেরা থেরাদের দোল দেয়, তার পর আপনারা খায়। ফাগ সবাই খেলে। শঠীর পালোর গালায় জল দিয়া ফাগ তৈয়ার হয়, তাহাতে বিষাক্ত কিছুই থাকে না। দেদার ছোড়ে, যার তার গায় দেয়, কেউ কিছু বলিতে পারে না। এটা ফাগের দিন। বুড়ো ঠাকুরদা নাতিকে ফাগে বুড়াইয়া দিতেছেন। ছোট ছোট নাতিরা ঠাকুর-দাদার মাথায় ফাগ মাখাইয়া দিতেছে। মেয়েরা ছেলেদের গায় ফাগ দিতেছে। আর ছেলেরাই ছাড়িবে কেন? তাহারাও মেয়েদের গায়ে ফাগ দিতেছে। রাস্তা ফাগে ফাগে ৫ ইঞ্চি পুরু হইয়া উঠিল। তাহার উপর পিচকারী। দূর-দূরান্তর হইতে রঙের জলের পিচকারী ছুটিতেছে। লোককে রাঙ্গা জলে নাওয়াইয়া দিতেছে। সব যেন উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। কাল শুধু ছেলেরা ক্ষেপিয়াছিল, আজ ছেলে, মেয়ে, যুবা, বুড়ো কেউ বাকী নাই। ঠাকুরপূজো নামে। মাতামাতি উৎসব। এ দিন-কার বাঁদরামীর কথা বলিয়া কাজ নাই। সেটা ভ্যাসের মধ্যে থাকিয়া যাউক।

কিন্তু রাজার হুকুম—দুপরের মধ্যেই মাতামাতি থামিয়া গেল। সকলে গা ধুইয়া ফেলিল। সব ফাগ জলে ধুইয়া গেল। গায়ে ফাগের একটা খুব পাতলা ছোপও রহিল না। কাপড়গুলাতে রাঙ্গা-রঙ্গের গন্ধও রহিল না। এ ত ম্যাজেন্টারের তৈয়ারী ফাগ নয় যে, সাত দিন ছোপ থাকিবে। দুপরের পূর্ব্বেই সাতগাঁ আবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল। যে যার বাড়ী গিয়া আহারাদি করিল ও সকাল সকাল পার হইয়া চড়ায় যাইবার জন্য সাজিতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আজ পূর্ণিমা। দুপরের পর হইতেই নৌকা আসিয়া চড়ায় লাগিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে চড়ার দক্ষিণ দিক্ ছাড়া তিন দিকে নৌকা লাগিল। দেখাইতে লাগিল, যেন চড়ার দাড়ী উঠিয়াছে। লোকে বালীর চড়ায় নামিয়া বালীর উপর দিয়া মাটীতে উঠিতেছে, সেখানে ঘাসের উপর দিয়া সভার কাছে পৌছিতেছে। সেখানে পা ধুইয়া সভায় গিয়া বসিতেছে, এখন যেমন জুতা হারানর ভয়ে লোক অস্থির হয়, সে ভয় তখন একেবারে ছিল না। ক্রমে প্রকাণ্ড সভায় লোক থৈ থৈ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা বিহারীর এমনি বন্দোবস্ত, সবাই আপনার আপনার স্থান খুঁজিয়া পাইল এবং তাহাতে কেহই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারিল না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান, ভিন্ন ভিন্ন আসন করা হইয়াছে। দুই স্থানের মাঝখান দিয়া রাস্তা, যে দিকে ইচ্ছা যাও।

বেলা এক প্রহর থাকিতে সভার দুই পার্শ্বে মেলা আরম্ভ হইল। কেনা-বেচা হাস্য-পরিহাস গান-গল্প চলিতে লাগিল। আর দোল—দুটা দাঁড়া কড়ির উপর একটা কড়িকাঠ আড় করিয়া দিয়া তাহাতে আঙটা লাগাইয়া দড়ি ঝুলাইয়া তলায় এক জন দুজন তিন জন চারি জনের পর্য্যন্ত বসিবার জন্য তক্তা লাগান হইল। আর দোলা দুলিতে লাগিল। দুই দিকে ২৫ ডিগ্রী ২৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতে লাগিল। দোলায় বসিয়া লোক নানারূপ ভঙ্গী করিতে লাগিল; বাক্‌চাতুরী করিতে লাগিল। যাহারা মাটীতে ছিল, তাহাদের ঠাট্টা-বট্‌কেরা করিতে লাগিল। আর এক দোল—নাগর-দোলা, চারি মুড়ায় চারিটা বাক্স, এক এক বাক্সে চারি জন করিয়া লোক বসিয়া আছে, আর নাগর-দোলা উঠিতেছে নামিতেছে—এই মাথার উপর, আবার তখনই মাটীর কাছে, এই ডাহিনে, এই আবার বামে। নাগর-দোলায় স্ত্রীও আছে, পুরুষও আছে। আবার জায়গায় জায়গায় এক নাগর-দোলাতেই স্ত্রী-পুরুষ দুই আছে। এদিন আর বড় লজ্জা-সরম থাকে না। তবে এবার একটু ভয়, রাজা কাছেই আছেন। নাগর-দোলাগুলো এক একটি ৩০,৪০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিতেছে। এক জন কবি বলিয়াছেন, বাঙ্গালার মেয়েরা অপ্সরাদের চেয়েও সুন্দরী, তাহারা অনেক সময় অপ্সরাদের সঙ্গে রূপের টক্কর দিবার মনস্থ করে; তাই তারা নাগর-দোলায় চড়িয়া স্বর্গ কতদূর দেখার চেষ্টা করে; একবার নামিয়া ও একবার উঠিয়া উপরে উঠা অভ্যাস করে। কিন্তু যত বেচাল ঐ দক্ষিণদিকে। উত্তরদিকে ব্রাহ্মণ-দের ও হিন্দুদের মধ্যে এ-সব বেচাল হইতে পারে না, তাহারা একটু সমীহ করিয়া চলে।

লোক সব ভাল কাপড় পরিয়া আসিয়াছে। ভাল কাপড় মানে, ঘোরাল রঙের,—ঘোরাল লাল, ঘোরাল কাল, ঘোরাল নীল, ঘোরাল হলুদে। সব ঘোরাল। সাদা কাপড় কেবল ব্রাহ্মণদের, বিশেষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের। তাঁহারা ত তুলার কাপড় বড়

একটা পরেন না, পাটের কাপড় পরেন। গরদ ক্ষীরোদ পরেন, তাহার রঙ ঘোরাল নয় বটে, কিন্তু দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

স্থির হইয়াছিল যে, মহারাজা যখন সভায় আসিবেন, তখন রণবাদ্য বাজিবে না। তাঁহার নৌকা হইতে সভা পর্য্যন্ত লুইসিদ্ধার কীর্ত্তনীয়াদল রাস্তার দুই ধারে দাড়াইয়া কীর্ত্তন করিবে। ময়ূরপঙ্খী হইতে সভা পর্য্যন্ত রাঙ্গা বনাত পাতা হইল, বনাতের দুই ধারে কীর্ত্তনীয়ারা প্রস্তুত হইয়া রহিল, ক্রমে ময়ূরপঙ্খীর সিঁড়ি পড়িল। ভাট ও চারণেরা যশোগান আরম্ভ করিল, কীর্ত্তনীয়ারা খোলে চাটি দিল, তাহারা কেবল ধরিল—

রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুই পাঅপএ দারিক দাদশ ভুঅণেঁ লধা॥

রাজা দাড়াইয়া কীর্ত্তনের গান শুনিলেন, কীর্ত্তনীয়াদের সঙ্গত শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ইঙ্গিত করিলেন—তাহারা পুরস্কারের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কীর্ত্তনীয়ারা রাজার মুখে প্রশংসা শুনিয়া উৎফুল্ল হইল, তাহাদের বাজনা আরও জমিতে লাগিল। রাজা ধীরে ধীরে তাহাদের বাজনা শুনিতে শুনিতে, তাহাদের যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে, সভার কাছে আসিলেন। সেখানে কয়েকটি পাকা ইটের ধাপ ছিল, সেই ধাপে উঠিয়া সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সভার সকলে উঠিয়া দাড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল, দাড়াইলেন না কেবল ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা। রাজা নিকটে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেহ জয়োঽস্তু, কেহ কল্যাণমস্তু, কেহ বা দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া উঠিলেন। সভার ঠিক মাঝখান দিয়া রাজা পশ্চিমমুখে গিয়া, সভার পশ্চিম সীমায় তাঁহার জন্য যে সিংহাসন ছিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন :—

"প্রায় এক শত বৎসর হইল, কনোজে রাজসভা হইয়াছিল। তাহার পর আর কোথাও রাজসভা হওয়ার কথা শুনা যায় না। আমাদের পূজনীয় ভবতারণ পিশাচখণ্ডী মহাশয়ের কথায় আমরা গত বৎসর এই দিনে এইখানে রাজসভা করিব স্বীকার করিয়াছিলাম এবং তিনিই সারা আর্য্যাবর্ত্ত নিমন্ত্রণের ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম-ভারতে মহা-অশান্তি উপস্থিত হওয়ায়, তিনি কনোজের ওদিকে যাইতে পারেন নাই। তাহাতে আমাদের কিছুই ক্ষতি হয় নাই, বরং ভালই হইয়াছে। কারণ, ইহা অপেক্ষা বড় সভা হইলে, আমি ত সামলাইতেই পারিতাম না। আর গুণীজনের উপযুক্তরূপ আদর না হইলে তাঁহাদের ক্ষোভ হইত, তাহাতে গুণের উৎকর্ষ না হইয়া অপকর্ষই ফল হইত। যাহা হউক, যাহা হয়, ভালর জন্যই হয়, মনে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ বলিয়া, যাহা হইয়াছে, তাহাই উত্তম হইয়াছে বলিয়া মাথা পাতিয়া লইলাম। এখন আপনারা এই নিয়মে পারিতোষিক দিন। প্রথম শাস্ত্রে, তাহার পর শিল্পে ও কলায়, তাহার পর কাব্যে। বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্ট মহাশয় শাস্ত্রে প্রবীণ আচার্য্য মহাশয়দের আমার নিকটে উপস্থিত করুন।"

তখন ভবদেব উঠিয়া তাঁহার জন্য যে আসন ছিল, তাহাতে গিয়া দাড়াইয়া বলিলেন :—"মহারাজাধিরাজ, শাস্ত্রে প্রবীণ যত পণ্ডিত এক্ষণে ভারতবর্ষে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তির নাম করিতে গেলেই আচার্য্য উদয়নের নাম করিতে হয়। তিনি নিমন্ত্রণের সময় কাশীতে ছিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিয়া এখানে আনিয়াছেন। তিনি এ সভায় উপস্থিত। আচার্য্য উদয়নের মত প্রবল পণ্ডিত এ সভায় যে উপস্থিত হইয়াছেন, সে মহারাজ ও মহারাজের পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত পুণ্যের ফলে। যাঁহাকে দেখিলে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা উদয়নকে আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি নিজে উদয়নের নিকট গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া মহারাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ দণ্ডবৎ হইয়া উদয়নাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন, সভাশুদ্ধ লোক তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল। মহারাজ বলিলেন :—"আচার্য্য, আপনি শাস্ত্র-গগনে আদিত্য-স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ। আমরা খদ্যোত, আপনাকে কি আলোক দিব, জানি না। আপনার পাণ্ডিত্যে সারা ভারত মুগ্ধ, আপনি সাগর সমান সমস্ত দর্শন অগস্ত্যের মত এক চুমুকে পান করিয়াছেন, আপনি যে এ সভায় আসিয়াছেন, তাহাতেই আমরা কৃতার্থ—সভা কৃতার্থ, সারা বাঙ্গালা কৃতার্থ। এ সভাই যে দণ্ডবৎ করিয়া কৃতার্থ হইল, এমন নহে, ইহাতে সারা বাঙ্গালা—এমন কি, সারা ভারতবর্ষও কৃতার্থ হইল। আমরা যখন আপনার আগমনেই কৃতার্থ, তখন আমরা আপনার কি সম্মান করিতে পারি! তথাপি আপনি আমাদের এই সামান্য পূজা গ্রহণ করুন।" বলিয়া রাজা তাঁহার মাথায় মহামূল্য মুকুট ও গলায় মহামূল্য হার পরাইয়া দিলেন।

উদয়নাচার্য্য বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আপনি অষ্টদিক্‌পালের অংশে নির্ম্মিত। ধরাধামে আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। যে ঈশ্বর-প্রতিপাদনের জন্য বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া ঋষিগণ, মুনিগণ, আচার্য্যগণ চেষ্টা করিতেছেন, আপনি সেই ঈশ্বরের চলৎপ্রতিমা। আমার জন্মজন্মান্তরের পুণ্য ছিল, তাই আপনি আমায় এরূপ সময়ে স্মরণ করিয়াছেন। ইহাতে আমি ধন্য হইয়াছি। আর আপনি যে আমায় এতটা আপ্যায়িত করিলেন, তাহার বিশেষ কোনও কারণ দেখি না। কারণ, এইরূপ রাজসভায় পরীক্ষা দিয়াই পাণিনি, ব্যাড়ি, পিঙ্গল, কাত্যায়ন, বররুচি,বর্ষ, উপবর্ষ, কালিদাস, মন্থ এবং অন্যান্য শাস্ত্র ও কাব্যকারেরা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের তুলনায় আমি ত কোন্ ছার! আমার সম্মান করিয়া আপনি আপনারই উদার হৃদয়ের পরিচয় দিলেন। আমার গুণপনা বড়ই অল্প।"

উদয়ন গিয়া বসিলেন, বাজনা বাজিয়া উঠিল। ডাক হইল রত্নাকর শান্তির। ডাক হইবামাত্র গুরু-পুত্র নিজ আসন ত্যাগ করিয়া রত্নাকর শান্তির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজা-ধিরাজ, ইনি রত্নাকর শান্তি, বিক্রমশীল বিহারের দ্বাররক্ষক। ইঁহার নিকট বিদ্যার পরিচয় না দিয়া কেহ সে বিহারে প্রবেশ করিতে পারে না। ইনি দার্শনিক, ইনি নৈয়ায়িক, ইনি সিদ্ধপুরুষ, ইনি বোধিসত্ত্ব। বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, দিঙ্‌নাগ, বসুবন্ধু ন্যায়শাস্ত্রের যে সকল জটিল অংশ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই, সেগুলি ইনি মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় এক জন অতি সুকবি।"

মহারাজাধিরাজ বলিলেন, "আচার্য্য, ভদন্ত, পিণ্ডপাতিক, আপনার নাম আমি বহুদিন হইতে শুনিতেছি। আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল, আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ হইল। আপনি আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন।" বলিয়া তাঁহার মাথায় মুকুট ও গলায় হার পরাইয়া দিলেন।

তিনি বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি গণপতি, এই সারা বাঙ্গালার গণের আপনি মুখপাত্র। আপনার মুখে আমার দেশ আমায় ভাল বলিতেছে, ইহা অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় মানুষের, বিশেষ আমার মত ভিক্ষুর কি হইতে পারে!"—বলিয়া তিনি আপন জায়গায় গিয়া বসিলেন। আবার বাজনা বাজিল।

তাহার পর ডাক হইল শ্রীধরের, তাহার পর প্রভাকর মতির—এইরূপে একজন হিন্দু ও তাহার পর, এক জন বৌদ্ধের ডাক হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়পক্ষের দশবার করিয়া ডাক হইবার পর হরিবর্ম্মা অবশিষ্ট পণ্ডিতগণের সেবার ভার ভবদেব ও গুরু-পুত্রের হাতে দিয়া মহরাকে সঙ্গে লইয়া সভার আর এক অংশে যেখানে শিল্পকলার বিশেষ নিদর্শন-গুলি সাজান ছিল, সেখানে গেলেন এবং যাহার শিল্প পছন্দ হইল, তাহাকে পুরস্কার দিতে লাগিলেন।

৩

রাজা প্রথম দেখিলেন—একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি তামার তৈয়ারী, তাহার উপর সোণার পাত মোড়া। এই মূর্ত্তি দেশের লোক সোণার মূর্ত্তিই বলে। মূর্ত্তি গরুড়ের উপর বসিয়া আছেন, গরুড় পাথরের। তাহার ঠোঁটটি লাল টুকটুকে পাথরের, পাখাগুলি পাখীর পাখার মত সবুজ পাথরের, চোখ দুটি পান্নার, চোখের কালটুকু নীলার, সাদাটুকু আগে-টের, মূর্ত্তিটির ভাবভঙ্গী চমৎকার, যেন সমস্ত জগৎকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন;—সকলের উপর স্নেহ ছড়াইয়া দিতেছেন। রাজা মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবে গদগদ হইয়া উঠিলেন। এমন কি, প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। শিল্পীকে ডাকাইলেন, তাহার নাম শাক্যসিংহ দেগর। রাজা তাহার মাথায় ফেটা বাঁধিয়া দিলেন ও গলায় হার পরাইয়া দিলেন। সে আহ্লাদে আটখানা হইয়া রাজার, মহরার ও আর আর সকলের পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় হইল।

তাহার পর একটি লোকেশ্বর-মূর্ত্তি, সমস্তটাই শাদা পাথরের—মার্ব্বেলের চেয়েও শাদা, আর খুব পালিশ করা, খুব মাজা। চোখ দুটি কাল পাথরের, তাহার মধ্যে হীরা। দাড়ামূর্ত্তি, গলায় পৈতা, দুই হাত, দুই পা। দুদিক দিয়া দুটা পদ্ম উঠিয়া ডাইনে ও বামে কাণের কাছে ফুটিয়া আছে। দুই ভুরুর মাঝখানে একটি অমিতাভের মূর্ত্তি; অমিতাভ লোকেশ্বরের গুরু। মূর্ত্তিটির ঠোঁট দেখিলেই বোধ হয়, যেন হাসিতেছেন। রাজা দেখিয়া বড় খুসী হইলেন। ভাস্করকে ডাকাইলেন। তাহার নাম লোকনাথ চাকি, বাড়ী বরেন্দ্রভূমি। বৃদ্ধ ভাস্করের কাজ করিয়া পাকিয়া গিয়াছে। রাজা তাহাকে পুরস্কার দিলেন। সে পায়ের ধূলা লইয়া প্রস্থান করিল।

তাহার পর শিবের সেই জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্ত্তিটি।

মস্করী এই মূর্ত্তি মহাবিহারে দেখিয়াছিলেন। মহারাজ দেখিয়াই মূর্ত্তিটি পাইবার জন্য বার বার জিদ করিতে লাগিলেন। শিল্পী বলিল, "সে দিতে অপারগ। কাশীর এক বেণিয়ার আদেশে সে ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি তৈয়ার করিয়াছে। কেবল গুরুপুত্রের জিদে সে দেখাইবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর একটি এইরূপ শিবলিঙ্গ তৈয়ার করিতে কত দিন লাগিবে?" সে বলিল, "দু'বৎসর।" তিনি বলিলেন, "তবে একটি আমার জন্য করিয়া দিবে।" এই বলিয়া শিল্পীকে পুরস্কার দিলেন এবং তাহার গুণের অনেক গরিমা করিলেন।

তাহার পর গহনা। একখানি তাড়,—সোণার। তাড়ের উপর দশ অবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বুদ্ধ (জগন্নাথ), বামন, রাম, রাম, বাম ও কল্কি। রাজা বিশেষ ঠাওর করিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "বুদ্ধের স্থান ত নবম হওয়া উচিত।" মস্করী হাসিয়া বলিলেন, "বুদ্ধকে দশের মধ্যে লওয়াই হইয়াছে অল্পদিন। কিন্তু উঁহার স্থান এখনও ঠিক হয় নাই; যাহারা বুদ্ধকে মানুষ বলিয়া মনে করে, তাহাদের কাছে উনি নবম, আর যাহারা উঁহার আকার-প্রকার দেখিয়া মানুষ বলিয়া মনে করে না, তাহারা বামনের পূর্ব্বেই উঁহার জায়গা করে, অর্থাৎ এখনও উনি মানুষ হয়েন নাই। উঁহার হাত-পা এখনও ঠিক হয় নাই।" শিল্পীকে পুরস্কার দিয়া রাজা অন্যত্র গেলেন।

দেখিলেন—একটি হাতীর দাতের মুখ। ঠোঁট দুটি ফাঁক হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে দুই পাটীতে অনেকগুলি দাঁত দেখা যাইতেছে। দাঁতগুলির উপর কাল রঙের খুব কাজ করা। প্রথম সব দাঁতেই কাল খিলান, খিলানের মধ্যে কোথাও একটা ফুল, কোথাও একটা ফল, কোথাও একটা তারা, কোথাও একটা ঘটী, কোথাও একটা বাটি। দেখিয়াই রাজা বলিলেন—"এ কি?" মস্করী বলিলেন —"উহার নাম দন্ত-অঙ্গরাগ। সেকালে মেয়েরা দাঁতে মিশি দিয়া এইরূপ করিয়া কারিগরী করিত। এখনও করে, তবে সকলে জানে না বলিয়া আমি ফরমাস দিয়া হাতীর দাঁতের উপর অঙ্গরাগ করাইয়া রাখিয়াছি।" রাজা বলিলেন—"বেশ।" রাজা শিল্পীকে পুরস্কার দিলেন।

তার পর একখানি মন্দিরের শিলাপত্র। মার্ব্বেলের ফুলকাটা ধারি, ফুলগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট, সবগুলি পদ্ম। ছোটর মধ্যে কেমন পরিষ্কার করিয়া আঁকা, তাহার মধ্যে পত্র। উপরে হরিবর্ম্মার মুদ্রা। তাহার পর রাজার নাম ও উপাধি ও বিরুদাবলী, তাহার পর দাতার নাম, তাহার পর মন্দিরের দেবতার নাম। তাহার পর মন্দিরের সম্বিদ, দুটি তিনটি ধারা। তাহার পর তারিখ, তাহার পর খোদকারের নাম। সমস্তটি যেন একখানি গালিচা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শিল্পী কে?" উত্তর "বরেন্দ্রের ভাস্কর।" রাজা তাহাকে পুরস্কার দিলেন।

তাহার পর বিধুভূষণ ফরফরের হরিপুর গ্রামের দানপত্র। তামার পাত, কাণা উচা করা ও তাহার উপর সরু কাজ করা। রাজা বিহারী খুব ভাল করিয়াই খোদাই করাইয়াছেন। মাথায় উপর একখানা সিংহাসনে রাজা হরিবর্ম্মদেব, নিজে। তাহার নীচে স্বহস্তোঽয়ং শ্রীশ্রীহরিবর্ম্মদেবস্য। তার পর, পত্র। গোড়ায়ই স্বস্তি, তাহার পর যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণের নমস্কার। তাঁহারই বংশে হরিবর্ম্মদেবের পিতামহ, তাঁহার পিতা, হরিবর্ম্মদেব ও তাহার বিরুদাবলী, তাহার পর "কুশলী"। তাহার পর রাজ-কর্ম্মচারীদিগের নাম করিয়া ইঁহাদিগকে "মানয়তি পূজয়তি সম্মানয়তি আজ্ঞাপয়তি চ।" আমি অমুকগোত্রের সপ্তশতী-প্রদেশবিনির্গত বিধুভূষণ ফরফরকে হরিপুর গ্রাম দান করিলাম, তোমরা ইহার অধিকার মানিয়া চলিবে। তাহার পর তারিখ, তাহার পর দূতকের নাম ও তাহার পর খোদকারের নাম। রাজা একটু হাসিলেন, খোদকারকে পুরস্কার দিলেন।

এবার ছবি। ছবি আঁকা সেকালে একটা বাতিক ছিল। সবাই ছবি আঁকিত। ছোট লোকে অন্ততঃ ঘরের দেওয়ালে দুটা ময়ূরও আঁকিয়া রাখিত। বেণেদের বাড়ীর দুপাশে দুটা টাকার থলি আঁকা থাকিত। আর তাহার সঙ্গে এক পাশে একটা শাঁখ ও আর এক পাশে একটা পদ্ম আঁকা থকিত। লোককে বলিয়া দিত, এ বেণের এক শঙ্খ ও এক পদ্ম টাকা আছে। যে দুখানি ছবি রাজাকে দেখান হইল, তাহার একখানিতে নারায়ণ অনন্ত-শয়নে শুইয়া আছেন, আর একখানিতে দুই শালগাছের মধ্যে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন। দুইটিই শোয়া-মূর্ত্তি। দুইটিই ডানপাশে শুইয়া আছেন; ডান হাতটি গালে। বাঁ হাতটি আজানুলম্বিত, উরুদের উপর অলসভাবে পড়িয়া আছে। রাজা বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই জন শিল্পীকেই সমান পুরস্কার দিলেন। দুই জনের ডাক হইল, এক জনই দুইবার আসিল ও দুইটি পুরস্কার লইয়া গেল। রাজা আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

দুখানি পুথি দেখান হইল। একখানি তালপাতায় লেখা, আর একখানি মোটা কয়গদের উপর কাল রঙ করিয়া তাহার উপর সোণার জলে লেখা। অক্ষরগুলি "সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ"; সুতা চালাইবার জন্য মাঝখানে একটি ছোট চৌকা ফাঁক। ডাইন ধারে কিনারায় অক্ষর দিয়া পত্রাঙ্ক লেখা। আর বাঁ ধারে অঙ্ক দিয়া পত্রাঙ্ক দেওয়া। মাঝে মাঝে ছবি দেওয়া। ছবিগুলি ছোট, পরিষ্কার, আর তার রঙ খুব উজ্জ্বল। একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, আর একখানি চক্রসম্বর তন্ত্র। রাজা দেখিলেন, আর দুজনকেই পুরস্কার দিলেন।

তার পর গান-বাজনা। রাজা পূর্ব্বেই কীর্ত্তনীয়াদের পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন তাহারা সকলে শিরোপা লইয়া গেল। একদল জলের উপর কাঠী বাজাইয়া, তাহাতে অনেক বোল ফুটাইতে লাগিল। ইহার নাম উদকঘাত ও উদকবাদ্য। এক দল বাঁশী বাজাইল। এক দল তারে বাজাইল। এক দল চামড়ায় ঘা দিয়া বাজাইল। আর এক দল ধাতুতে ঘা দিয়া বাজাইল। সবাই সিদ্ধহস্ত। রাজা ও এক জন প্রধান সমজদার, তিনি খুব খুসী হইলেন ও সকলকেই পারিতোষিক দিলেন।

নাচ আসিল। সেকালে সবাই নাচিতে জানিত। ছেলেও জানিত, মেয়েও জানিত। যুবাও জানিত, বুড়াও জানিত। নাচায় দোষ মনে করিত না; বরং গুণ মনে করিত। এখন অনেকে আশ্চর্য্য হন—পুরাতন যাত্রার দলে সবাই নাচে;—কৃষ্ণও নাচেন, রাধাও নাচেন, নন্দও নাচেন, যশোদাও নাচেন, বিদ্যাও নাচেন, সুন্দরও নাচেন, রাজাও নাচেন, রাণীও নাচেন। এখনকার লোক মনে করেন, এটা অসভ্য। কিন্তু সেকালে কেহ এরূপ মনে করিত না। নাচের কায়দা—বড় কায়দা। মনের ভাব প্রকাশের জন্য হাত-পা নাড়া আর অঙ্গভঙ্গী করার নাম অঙ্গহার। এইরূপ তিন চারি অঙ্গহার এক করিয়া মনের গভীর ভাব প্রকাশ করার নাম করণ। করণ হইতে যে গভীর ভাব প্রকাশ হয়, তাহার নাম ভাব। যে সব লইয়া ভাব, তাহার নাম বিভাব। ভাবের কার্য্যকে অনুভাব বলে। এইগুলি সব ফুটিয়া উঠিলে রস হয়, রসের আস্বাদ হইলে নৃত্যে তাহা প্রকাশ হয়; সেই জন্য নৃত্যের এত আদর। ভারতে স্ত্রী-মূর্ত্তি কোথাও অঙ্গহার ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুমূর্ত্তি, বুদ্ধমূর্ত্তি যেমন খাড়া-দাঁড়া—ধীরগম্ভীর, স্ত্রী-মূর্ত্তি সেরূপ দেখিতেই পাইবে না। তাহার সঙ্গে একটা না একটা অঙ্গহার আছেই আছে। রাজা দু'চারি জায়গায় নৃত্য দেখিলেনও পুরস্কার দিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর খেলা। মেড়ার লড়াই, কুকুড়ার লড়াই, পাখীর লড়াই দেখিলেন। কুস্তী দেখিলেন, কত রকম কসরৎ দেখিলেন, লাঠী-খেলা দেখিলেন, তলোয়ার খেলা দেখিলেন, তীর-ধনুকের টিফ দেখিলেন। কত রকম ইন্দ্রজাল দেখিলেন, আগুনের উপর চলিতে দেখিলেন। আতসবাজী দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে পূর্ণচন্দ্র লালচে-আভা ত্যাগ করিয়া একেবারে শাদা হইয়া গেলেন; আর আকাশের পূর্ব্বপ্রান্ত ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। নদীতে যেমন হাঁস চলিয়া যায়, চলাচল কিছুই দেখা যায় না, বোধ হয় যেন ভাসিয়া যাইতেছে, অথচ হাঁস মহাশয় ভিতরে ভিতরে বেশ পা নাড়িতেছেন, আর স্রোতের বিরুদ্ধেই যাইতেছেন—নদীতে হাঁস যেমন চলিয়া যায়, চাঁদ তেমনি আকাশে উঠিতেছেন। কিছু দূর উঠিলে সুধাভাণ্ড হইতে যেমন সুধা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি একটি চাঁদ হইতে শত শত ধারা বাহির হইয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পরিপূর্ণ করিয়া উঠিতেছে। চাঁদের আলো গঙ্গায় পড়িয়া গঙ্গার শাদা জলের সঙ্গে মেশামিশি করিয়া এক অদ্ভুত শাদা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার উপর বালিও শাদা, এ ত সমুদ্রের বালি নয় বা দামোদরের বালিও নয় যে, হলুদে হবে বা রাঙ্গা হবে। এ যে গঙ্গার বালি, তাহার উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে। সেও এক বিচিত্র বোধ হইতেছে—যেন পঙ্খের কাজ করা মেঝেতে দুধ ঢালিয়া রাখিয়াছে। চড়ায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে, ঘাসের উপর চাঁদের আলো খেলিতেছে; আর যত লোক ছিল, সকলের কাপড়ের রঙ বদ্‌লাইয়া দিতেছে. ঘোরাল লালের উপর শাদা পড়িতেছে, ঘোরাল কালর উপর ঘন শাদা পড়িতেছে, ঘোরাল নীলের উপর ঘন শাদা পড়িতেছে, জরদার উপর ঘন শাদা পড়িতেছে। একটা বিচিত্র শোভা হইয়াছে, একটা বিচিত্র আনন্দ, একটা বিচিত্র সুখ হইয়াছে। তাহার উপর সকলেই পারিতোষিক পাইয়াছে, বাহবা পাইয়াছে, সকলেই প্রফুল্ল-উৎফুল্ল। দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। বাতাসের দাঁত নাই; বরং একটু একটু মিঠে মিঠে ঘাম হইতেছে।

রাজা বলিলেন, এইবার কাব্যের পরীক্ষা।

শ্রীহীর পণ্ডিত উদয়নের ঘোর প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। দুজনের বেশ রেষারেষি চলিত। উদয়নের প্রথমেই পূজা হওয়ায় এবং সমস্ত সভাশুদ্ধ লোক দণ্ডবৎ হইয়া

তাঁহাকে প্রণাম করায় ও আপনাকে পাঁচ কি ছ'য়ের পর ডাকায় হীর পণ্ডিত বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। মস্করী অত্যন্ত জিদ করায় তিনি আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া কুকার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। মস্করী এ কথা জানিতেন, ভবদেবও এ কথা জানিতেন। তাই কাব্য-পরীক্ষার প্রথমেই শ্রীহীর পণ্ডিতের পুত্র শ্রীহর্ষের ডাক হইল। শ্রীহর্ষ তখন যুবা পুরুষ। কিন্তু কাব্যে ও দর্শনে গ্রন্থকার বলিয়া তাঁহার খুব সুখ্যাতি হইয়াছে। কনোজের রাজা তাঁহাকে আদর করিয়া সভামধ্যে দুইটি পাণ ও একখানি আসন দিয়াছিলেন। তিনি চিন্তামণি-মন্ত্রে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। স্থির-গম্ভীর পদক্ষেপে তিনি আসিলেন, অথচ কোন দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। তাঁহার সুন্দর গৌর বর্ণ, চক্ষু ও মুখের জ্যোতিঃ, তাঁহার নম্রভাব দেখিয়া সভাসুদ্ধ লোক মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি আসিলে রাজা তাঁহাকে নিজের একটি কবিতা পড়িতে বলিলেন। তিনি পড়িলেন—

নিলীয়তে হ্রীবিজিতঃ স চৈত্র্য
শ্রত্বা বিধুস্তস্য মুখং মুখান্নঃ।
সুরে সমুদ্রস্য কদাপি পুরে
কদাচিদভ্রভ্রমদভ্রগর্ভে॥

শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন,—"কি পাণ্ডিত্য! কি শব্দের লালিত্য! কি অনুপ্রাসের ছটা! আপনি আমার রাজত্বের একখানা কাব্য লিখিয়া দিবেন?" শ্রীহর্ষ বলিলেন,—"আমি গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি নামে একখানি কাব্যের পত্তন করিয়াছি। ঐ কাব্যে মহারাজাই নায়ক হইবেন।" রাজা বলিলেন, "আমি বলার আগেই পত্তন করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন,—"হাঁ, মহারাজ।" রাজা তাঁহার মস্তকে মুকুট ও গলায় হার দিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন; আর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

তার পর আর্য্য ক্ষেমীশ্বর। ইনি পাল-রাজাদের কবি। ইনি হিন্দু কি বৌদ্ধ, বুঝা যায় না। ইনি ভিক্ষু হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর বিবাহ করিয়াছিলেন। যাঁহারা এরূপ করিতেন, তাঁহাদের লোকে আর্য্য বলিত। যাহারা বিবাহ না করিয়া ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের অনার্য্য বলিত। অনার্য্যেরা আর্য্যদের নমস্কার করিতেন না। ক্ষেমীশ্বরের কবিত্ব-খ্যাতি খুব ছিল। তিনি আসিলে রাজা তাঁহাকে নিজের একটি কবিতা পড়িতে বলিলেন। রাজা তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করিয়া তাঁহার মাথায় মুকুট ও গলায় হার পরাইয়া দিলেন। তাহার পর আসিলেন বজ্রদত্ত। তিনি লোকেশ্বরের স্তব পাঠ করিলেন। তাঁহার উচ্চারণের অনেক দোষ ছিল। তিনি 'ড়'কে 'র' ও 'র'কে 'ড়' করিতে লাগিলেন, 'স্ত'কে 'ষ্ট' ও 'ষ্ট'কে 'স্ত' করিতে লাগিলেন। 'দৃঢ়' 'দিঢ়' হইয়া গেল, অচৈতীং 'অচৈতি' হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার গলার স্বর, পাঠের ভঙ্গী ও ভক্তিগদ্‌গদ-ভাব সভাস্থ লোককে মুগ্ধ করিয়া দিল। রাজা তাঁহাকে পুরস্কার দিলেন।

পরে আসিলেন—ধপল ত্রুহু, তিনি এক কবিতা পড়িলেন, তিনি কোন্ দেশের লোক, জানা যায় না; তবে তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণে সকলেই হাসিতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে কিছুই বিরক্ত হইলেন না, বলিলেন, "আমরা বিদেশাবাসী—দেবাবাণী আমাদেরা মুখা হতে সারে না।"

তাহার পর আসিলেন জয়ভদ্র, বাড়ী সিংহলদ্বীপ, বহুকাল বাঙ্গালায় বাস করিতেছেন, দু'চারিখানা তন্ত্রের টীকাও লিখিয়াছেন, সংস্কৃত জানেন বলিয়া অভিমানও করিয়া থাকেন। তাঁহার সংস্কৃত কবিতা শুনিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা হাসিতে লাগিলেন, বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা গদ্‌গদ হইয়া গেলেন। তিনি একটু চটিয়া বলিলেন, "ভগবান্ 'সর্ব্বরুতানুকারিণী' ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন। আমরা ব্রাহ্মণদের মত-'সুশব্দবাদী' নই। কিন্তু আমাদের যা আছে, তোমাদের তা নাই। অস্মাকানাং সৌগতানাং অর্থাৎ তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা। আমাদের 'অর্থশরণতা' তোমাদের নাই।"

সংস্কৃত কবিতা শেষ হইয়া গেলে প্রাকৃত কবিতা আরম্ভ হইল। প্রাকৃত ত একটি ভাষা নয়। তা'র ভিতরে মাগধী আছে, অর্দ্ধমাগধী আছে, শৌরসেনী আছে, মহারাষ্ট্রী আছে, পৈশাচী আছে, ঢক্কী আছে, ঢেক্করী আছে, তাহার উপর অপভ্রংশ আছে, মিশ্রভাষা আছে এক জন দুলিয়া দুলিয়া পড়িতে লাগিলেন:—

সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে
রতিমো প্রিয়া ফুল্লিতপাদপকে।
তর রূপ সুরূপ সুশোভনকো
বশবত্তি সুলক্ষণ বিচিত্রতকো॥
বয়ং জাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ
সুখকারণ দেবনরাণ বসন্ততিকাঃ।

উত্থি লগ্ন পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং
দুর্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকম্॥

সেকালে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, ছয়টা ভাষায় কবিতা লিখিতে না পারিলে, সে মহাকবি হইতেই পারে না। তাই যাহারা শুধু বাঙ্গালাতেই কবিতা লিখিত, তাহাদের কবি না বলিয়া 'পদকর্ত্তা' বলা হইত।

পদকর্ত্তাদের মধ্যে প্রথমে আসিলেন চাটিলপাদ,—আসিয়া অতি মধুর স্বরে পড়িতে লাগিলেন :—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ণ থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥
* * *
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী॥

সভাশুদ্ধ লোক 'ধন্য ধন্য' করিয়া উঠিল। তখন বীণাপাদ আসিয়া মৃদুমধুর সুরে তালে তালে পড়িলেন :—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী বাকী কিঅত অবধূতী॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা॥
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥

তিনি বসিয়া পড়িলেন। জয় জয় শব্দে সভাস্থল ভরিয়া গেল।

তাহার পর আসিলেন সরহপাদ। অতি গম্ভীর মূর্ত্তি, উদাস দৃষ্টি, ধীরে ধীরে অতি-গভীর-স্বরে পড়িলেন :—

আপনে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা॥
অম্ভে ন জনঁহু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।
জইসো জাম, মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেষো॥

সভা নির্ব্বাক্-নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার কবিতা শুনিতে লাগিল।

মস্করী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, মায়া ও গুরু-পুত্র সকলের শেষে আসিবেন। মায়া আসিলেন। তিনি এখন রাজকুমারী। যদিও শাদা সাটী মাত্র পরা, মাথা একরূপ মুড়ানই; কিন্তু এখন তাঁহার মুখে স্বর্গের জ্যোতি,—বিষাদের চিহ্নও নাই। বোধ হয় যেন কি এক স্বর্গীয় বস্তু লাভ করিয়া তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সভামধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার রূপে সভা আলো হইয়া গেল। তাঁহার দৃষ্টি নিজের পায়ের উপর। তিনি একবার আকাশের দিকে চাহিয়া, দুই হাত তুলিয়া কাহাকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর রমণীর কমকণ্ঠে বেশ চড়া সুরে পদ ধরিলেন :—

হিঁওই জগমাঝ সবরা সবরা রে
সবরা পলাএল ন জানমি কঁহি গই পইঠা রে।
ঢুণ্ঢিল চউদ্দ ভুবণ সবরী সবরা রে
সবরা পলাএল ভইল সবরী বিআউলা রে॥
মিলনক নহি আসা সবরী নাম লই রহিলা রে
রূপ ধিয়ানে অহর্নিশি মগণা গুঁডাইলা রে।
নাম সোঙরি, নাম হিঅ ধরি, রূপ ধিয়ানি রে
সবরার নাম রূপ ধারি সবরি মাতেলা রে॥
সুজ সসি জগ তারা নামরূপে ডুবিলা রে
বাম দাহিণ উচ নীচ সমান পিছাই রে।
সব ভরিল রূপ ধিয়ানে তাহে নাম মিলিলারে
নামরূপ ধিয়ানে সবরী ভইল একঠারে॥
মেরু সিহরবর এক ভই দুহু মিলিলা রে
লোণ জল জিম দুহু মিলিলা রে।
এক হোই বারমতি মাঝই দুহু মিলিলা রে॥

সভা নিস্তব্ধ। মায়ার কথা সভার সকল লোকই জানিত, তিনি যে আপনার স্বামীর উদ্দেশে শবরী সাজিয়াছেন, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি যে শবরকে খুঁজিতেছেন, তাহাও কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি যে সুমেরু-শিখরে অর্থাৎ সপ্তস্বর্গের উপরে শবরের সহিত মিলিয়া অনন্তে মিশিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে-ছেন, তাহাও বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। শবর কাছে নাই, তিনি তাঁহার নামরূপ ধ্যান করিতে করিতে অনন্তে নিলীন হইতে চাহেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে শবরের সহিত এক হওয়া চাই। তাঁহার দৃষ্টিতে ক্রমে সূর্য্য-চন্দ্র-তারা-পৃথিবী সব লোপ পাইয়াছে,

আছে কেবল শবরের নামরূপ আর তিনি। ক্রমে নামও রূপে ডুবিয়া গেল, ক্রমে ক্রমে তিনিও সেই রূপে ডুবিলেন। সে রূপ ক্রমে অনন্ত হইয়া অনন্ত ভরিয়া দিল।

কিছুক্ষণ সভাসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল, সকলেরই কাণে তখনও মায়ার সুর লাগিয়া আছে। ক্রমে সুরের মোহ যেমন কাটিতে লাগিল, তেমনি তাহারা ভাবের মোহে ডুবিতে লাগিল। যখন সে মোহও কাটিয়া গেল, তখন সকলে এক স্বরে মায়ার জয়জয়কার করিয়া উঠিল। এ জয়জয়কার দু'পক্ষ হইতেই উঠিল। হিন্দুরাও যেমন জয়জয়কার করিল, বৌদ্ধেরাও তেমনি জয়জয়কার করিল।

সকলের শেষে গুরুপুত্র। গুরুপুত্রের চেহারা ত রাজপুত্রেরই মত। তাহার উপর পরিপাটী করিয়া আজ বেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ-ভিক্ষুরই মত কাপড় পরিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সব রেশমের তৈয়ারী। তাহার আঁচলায় ও পাড়ে সল্‌মাচুম্‌কীর কাজ করা। তিনি ধীরে ধীরে আসিতে লাগিলেন এবং গুন্‌ গুন্‌ স্বরে তথাগতস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার পর একটি পদ ধরিলেন। তাঁহার সুর মেয়েমানুষের মত চড়া ও সরু। পুরুষের গলায় এ সুর মানায় না; কিন্তু তিনি এই সুরে উপদেশ দেন, বক্তৃতা করেন, ব্যাখ্যা করেন, কীর্ত্তনও করেন। সাতগাঁএর লোকের সে সুর বেশ পরিচিত, বাহিরের লোকের তত পরিচিত নয়। তিনি ধরিলেন:—

বহই নাবা মাঝ সমুদারে, দুপ্পহর বেলা।
দারুণ পিআসা, হিঅ মোর বাবই,
কণ্ঠ শোষ গেলা॥
নিঅহি পাণী, পিব ন সকই,
অহ নিসি তিষি বাবই।
চেব ন সকই, লোণ পইসই,
অহণিসি তিষি বাঢ়ই॥
অকট জোই, নিবাণ চাহই,
জোইনী বিনু নাহি পাইব।
জোইনি সত্তি, জোইনি ভত্তি,
তবহুঁ নিবান সাধন॥
জোইনি সাধী রহই, বিমুহি মোরে,
নাহি পাতআই।
নঅনের কোণে কভু মহি হেরই,
বিনু ফল মোর জনু জাই॥

এ গানের অর্থ বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। গুরুপুত্র সমুদ্রের মধ্যে নৌকায় বসিয়া আছেন। তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু জল লোণা। জল খাইবার যো নাই। জল দেখিতেছেন,— তৃষ্ণা বাড়িতেছে। শেষ প্রাণ যায় যায়। যোগী নির্ব্বাণ চাহিতেছেন, কিন্তু শক্তি নাই। যাহাকে শক্তি করিতে তিনি চান, সে সম্মুখেই আছে; কিন্তু সে ফিরিয়াও চায় না। তাঁহার জীবন বৃথায় যাইতেছে।

গান থামিল। বিহারীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। মায়ার মনে হইল—পৃথিবী তুমি দ্বিধা হও। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সাতগাঁএর লোক খুবই বিরক্ত হইল। এমনটা যে হবে, গুরুপুত্র বুঝেন নাই। তাঁহার পুরস্কার হইল। তিনি ফিরিলেন। সভার লোক কেহই সাধুবাদ বা জয়ধ্বনি করিল না। এওটা যে হবে, গুরুপুত্র বুঝিতে পারেন নাই। তিনি আসিয়া লুইসিদ্ধার কাছে বসিলেন। লুইসিদ্ধা দেখিলেন, রাজা ও ভবদেব তাঁহাদের দিকে চাহিয়া কি দু' চারিটা কথা কহিলেন। ভয়ে লুই-সিদ্ধার প্রাণ উড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার চাঁদ ভাসিতে ভাসিতে সভার মাথার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। চাঁদের সে ঘন আলোয় সভাস্থল উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চারিদিকে গঙ্গার জলের উপর যেন দুধ ঢালিয়া দিল। সভা ভঙ্গ হইল। শত শত কীর্ত্তনীয়ার দল খোলে চাঁটি দিল। রাজা উঠিয়া যে ভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে নৌকায় উঠিলেন। যে যাহার বাড়ী যাইবার জন্য নৌকা খুঁজিতে লাগিল। লুইসিদ্ধা গুরুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া একখানি নৌকায় উঠিলেন, সেখানিতে আর কাহাকেও উঠিতে দিলেন না। শত শত নৌকা গঙ্গাবক্ষ আলোড়িত করিয়া সাতগাঁর দিকে ছুটিল।

নির্জ্জনে পাইয়া লুইসিদ্ধা গুরুপুত্রকে বলিলেন, —"তোমার এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নয়। বোধ হয়, তুমি কে, হরিবর্ম্মা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া ভবদেবকে কি বলিলেন। তুমি পলাও।"

গুরুপুত্র। আমিও স্থির করিয়াছি, যুদ্ধে যাইব। কতকগুলি লোকজনও যোগাড় করিয়া রাখিয়াছি। বাগ্দীরা অনেকেই আমার সঙ্গে যাইতে চায়। মঙ্গরীও যাইবে, আমিও যাইব।

লুই। তোমার যুদ্ধে যাওয়া হইবে না। তুমি সঙ্ঘে আসিয়াছ। করুণাই তোমার মূল মন্ত্র। যুদ্ধ বড় নিষ্ঠুরের কাজ। তোমার এখানে থাকা হইবে

না।. আমি ভাবিয়াছিলাম—তুমি সহজপন্থায় সিদ্ধি-লাভ করিবে, কিন্তু তুমি এখনও আত্মজয়ী হইতে পার নাই। তোমার দিনকতক অন্য পন্থা ধরিতে হইবে, মহাযান আশ্রয় করিতে হইবে। মহাযানে সিদ্ধিলাভ করিলে তখন তুমি সহজপন্থার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে, আত্মজয়ী হইতে পারিবে, শূন্য ও করুণার অভেদ বুঝিবে। ভারতবর্ষে মহাযান শিক্ষার এক জায়গা আছে—নালন্দা। কিন্তু নালন্দার লোক বড় দাম্ভিক, সহজপন্থায় দ্বেষ করে। তাহারা তোমাকে লইবে না। তাই আমি স্থির করিয়াছি, তোমায় সুবর্ণ-দ্বীপে যাইতে হইবে। সেখানে গিয়া মহাযান শিক্ষা কর, তুমি অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষা লাভ করিবে। আমি বিহারীকে বলিয়া কালই নৌকা আনাইয়া দিব।"

গুরুপুত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি মহাবিহারে আসিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত

মেঘদূত

[পরিবর্ত্তিত সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই প্রণীত

বিজ্ঞাপন

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত সাহিত্যে অমর কবি। কল্পনার মহিমায় বল, ভাষার ছটায় বল, শিল্পের নৈপুণ্যে বল, বাধুনির কারিগরীতে বল, ইঁহাদের তুলনা হয় না। ইঁহাদের রচনার মধ্যেও আবার পাঁচখানি বই সকলের চেয়ে ভাল, সকলের চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে মহিমাময়। হিমালয়ের যেমন পাঁচটি চূড়া,—গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলাগিরি, মুক্তিনাথ ও গোসাইথান, সংস্কৃত সাহিত্যেও তেমনি রঘুবংশ, উত্তরচরিত, শকুন্তলা, মেঘদূত ও কুমারসম্ভব অতি উচ্চ, অতি গম্ভীর, অতি শোভাময়, অতি পরিষ্কার ও অতি রমণীয়।

পাঁচখানি কাব্যেরই অনেক ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা কিন্তু অধিকাংশই সংস্কৃত বুঝাইবার জন্য। ভাব বুঝান কোন কোন ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হইলেও সৌন্দর্য্য বুঝান কোন ব্যাখ্যারই উদ্দেশ্য নহে; অথচ কাব্যগুলি সৌন্দর্য্যের খনি, ছোটখাট খনি নয়, একেবারে জোহানেসবর্গ। এই সৌন্দর্য্যের কিছু কিছু বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করি, অনেক দিন ধরিয়া ইচ্ছা ছিল। এজন্য ত্রিশ বছর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম। প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি; ক্রমেই ইঁহাদের সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। দৃষ্টির মণ্ডল যতই বাড়িতেছে, সৌন্দর্য্যের চমৎকারিতাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। তাই মনে করিয়াছিলাম, সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা কিছু লিখিয়া রাখা আবশ্যক, সেই জন্যই সকলের ছোট যে মেঘদূত, তাহারই ব্যাখ্যায় প্রথম প্রবৃত্ত হই। প্রবৃত্ত হইয়াই দেখি, মেঘদূত সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাব্য, উহাতে প্রাচীন ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্বের অনেক জটিল কথা আছে। সেগুলি একরূপ মীমাংসা করিয়া লইলাম। লেখা শেষ হইল। ছাপানর ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং ইচ্ছামত লিখিলাম। লিখিয়া ছাত্রবর্গ ও মিত্রবর্গকে দেখাইলাম। তাঁহাদের সমালোচনা শুনিলাম। বদলাইয়া শোধরাইয়া লইলাম। কিন্তু এক কথায় বড় ঠেকিয়া গেলাম। সৌন্দর্য্যের মুখে রুচির উপর বড় একটা ঝোঁক থাকে না। রুচি দেশ কাল পাত্র অনুসারে বদলায়, সৌন্দর্য্য বদলায় না। এখন যাহা কুরুচি, কালিদাসের সময়ে তাহা কুরুচি ছিল না। আমি ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি, আমাকে কালিদাসের বশেই যাইতে হইল। অনেক জিনিস এখনকার রুচিসঙ্গত হইবে না, বেশ বোধ হইল। কিন্তু যখন

ছাপাইব না, তখন তাহার প্রতি আমার লক্ষ্য রহিল না।

যাঁহারা পড়িলেন, তাঁহারা ছাপাইতে অনুরোধ করিলেন, আমি গোলে পড়িয়া গেলাম। কোন্‌টি এখনকার রুচিসঙ্গত, কোন্‌টি নয়, এ কথা কে বলিয়া দিবে? শেষ দুই জন সুপণ্ডিত, সুরসিক, বিচক্ষণ লোকের হাতে রুচিপরীক্ষার ভার দিলাম। এক জন চব্বিশ পরগণার জজ শ্রীযুক্ত এফ ই পার্জ্জিটার সাহেব আর এক জন শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—দুজনেই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া মূলের সহিত ব্যাখ্যা মিলাইয়া আমায় সদুপদেশ দিয়া চিরবাধিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পার্জ্জিটার সাহেব বিলাত যাইতেছিলেন। তিনি আমার প্রুফ লইয়াই জাহাজে আরোহণ করেন এবং জাহাজ হইতে আদ্যোপান্ত পড়িয়া উপদেশ প্রদান করেন। ইঁহাদের উপদেশমত অনেক স্থান উঠাইয়া দিয়াছি ও অনেক স্থান বদলাইয়াছি। সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। কিন্তু সুরুচির অনুরোধে তাহা স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু যাঁহার উৎসাহে আমার এ ব্যাখ্যালেখায় প্রবৃত্তি, যিনি নিরন্তর অকাতরে আমায় সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, যাঁহার নামে এই ব্যাখ্যা উৎসর্গ করিলেও আমার তৃপ্তি হইত না এবং যাঁহার ঋণ আমি কখনই শোধ করিতে পারিব না, তিনি উৎসর্গ গ্রহণ করা দূরে থাকুক্, আপনার নাম প্রকাশ করিতেও দিলেন না; তাঁহাকে নির্ব্বাক্ ধন্যবাদ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

সংস্কৃত কাব্যের বাঙ্গালার ব্যাখ্যা নূতন। ভাষা ছাড়িয়া, ব্যাকরণ ছাড়িয়া, অলঙ্কার ছাড়িয়া, শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা নূতন। সৌন্দর্য্য বুঝাইতে গিয়া ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্বভাব, নরচরিত প্রভৃতির কথা তোলা নূতন। এত নূতন করিতে গিয়া যদি ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে, পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন। প্রথম পথিকের ভুল-ভ্রান্তি অনিবার্য্য। এ পথে আর যদি কেহ অগ্রসর হন এবং মনের মতন ব্যাখ্যা করিতে পারেন, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।

পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট }
১৩০৯ }

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মেঘদূত

পূর্ব্বমেঘ

অগু মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিব। বিশ বছর পূর্ব্বে, একবার বঙ্গদর্শনে এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। পড়িয়া দেখিলাম, মনোমত হইল না—ফিকে লাগিল। তখন পূর্ব্বমেঘ কালিদাসের ভৌগোলিকবিবরণলেখকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এখন সেরূপ করিতে ভরসা হয় না। করিলে মনে হয়, কালিদাসের আদর করিতে শিখি নাই। পূর্ব্বমেঘ মেঘদূতের অর্দ্ধেক, তাই যদি ছাড়িয়াছিলাম, তবে ব্যাখ্যা করিয়াছি কি ছাই? উত্তরমেঘেও অনেক স্থান ভাসা ভাসা ছিল, অনেক স্থানের সৌন্দর্য্য-বোধই হয় নাই। তাই আবার একবার নূতন করিয়া ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব।

ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কয়েকটি কথার মীমাংসা চাই। তাহার মধ্যে মেঘদূতের যে প্রচলিত সমালোচনা আছে, যে কালিদাস গ্রন্থ লিখিয়া এক জন মালিনী কি কুমারণীকে শুনাইতেন, তাহার সম্মতি পাইলে প্রচার করিতেন। সে পূর্ব্ব-মেঘ শুনিয়া বলিয়াছিল, উহা স্বর্গের সিঁড়ি অর্থাৎ উত্তর-মেঘই সারবস্তু, পূর্ব্ব-মেঘ কিছু নয়। এ কথাটা সত্য কি না? একেবারে কিছু নয় অর্থাৎ কেবল সিঁড়ির কাজ করে, এটা বড় অশ্রদ্ধেয় কথা। কিন্তু এই অশ্রদ্ধেয় কথায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আবহমানকাল লোকে পূর্ব্বমেঘের প্রতি অনাদর করিয়া আসিতেছে। মনে করে, ওটা একটা ভূগোলের ইণ্ডেক্‌স্, পড়িলে উত্তর-মেঘ বোঝায় একটু সুবিধা হয়, তাহাই পড়িতে হয়। বাস্তবিকও লোকের অপরাধ নাই, দেশগুলা কোথায়,—জানা ছিল না। একটার পর আর একটা ঠিক কি না, জানা ছিল না।* লোকে এক রকম ভাসা ভাসা পড়িত, বড় বিরক্ত লাগিত। মল্লীনাথের টীকাও এই রকম ভাসা ভাসা; আমিও বিশ বছর পূর্ব্বে এইরূপ ভাসা ভাসা ভাবেই উহা রজনীবাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্ব-মেঘ কালিদাসের কবিত্বের একটি ভাবময় লহর। উহাতে জড়প্রকৃতিকে চৈতন্যময় করিয়া তুলিয়াছে। মেঘ নিজে জড় হইয়াও চৈতন্যময়; মেঘ উপর হইতে যখন জড়প্রকৃতির যতদূর দেখিতেছে, তখন ততদূরই চৈতন্যময় হইয়া যাইতেছে। জড়কে এত সুন্দরভাবে চৈতন্যময় করিতে আর কোথাও দেখা যায় না। কালিদাস আর কোথাও পারেন নাই। কুমারে রতুতে বড় বড় বর্ণনায় জড়—জড়ই। কুমারের ষষ্ঠে হিমালয়কে জড় ও চৈতন্য দুই-ই বলা হইয়াছে, কিন্তু সে দুটি দুরূপ। পূর্ব্ব-মেঘে যে জড়, সেই চৈতন্যময়, ভাবময়, প্রেমময়।

দ্বিতীয় কথা। মেঘদূতকে অলঙ্কারশাস্ত্রে খণ্ডকাব্য বলে; ইংরেজেরা লিরিক বলেন। কোন্‌টি সত্য? খণ্ডকাব্য,—অর্থ যতদূর বুঝা যায়,—টুকরা কাব্য বলিয়াই বোধ হয়, টুকরা কাব্য বলিয়া মেঘদূতের উল্লেখ করিলে জিনিসটার অবমান করা হয়। মেঘদূত টুকরা নহে—পুরা, সর্ব্বাঙ্গে সুশোভিত, সম্পূর্ণ, এবং অপ্রমেয়। সুতরাং মেঘদূত টুকরা কাব্য নহে। ছোটকাব্য বলিতে চাও বল। দৈর্ঘ্যে ছোট, কিন্তু ফলে ছোট নয়। কিন্তু খণ্ড বলিতে ত ছোট বুঝায় না। লিরিক বলিলে যাহা বুঝায়, উত্তরমেঘে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু তথাপি উত্তর-মেঘকে লিরিক বলা যায় না। কারণ, উহা গানে লিখিত নহে। লিরিক গান না হলে হয় না, কাব্যের বাহ্য আকার লইয়াই লিরিক। তবে উৎকৃষ্ট লিরিকের যে ভাবতন্ময়তা আছে, উত্তর-মেঘে সেইরূপ ভাবতন্ময়তা আছে বলিয়া উহাকে লিরিক বলিতে ইচ্ছা কর, বলিতে পার। কিন্তু পূর্ব্ব-মেঘের অবাধ কল্পনার রমণীয় সৃষ্টিকে লিরিক বলিবে কিরূপে, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। তবে যদি কেহ বলে, খণ্ড শব্দের অর্থ খাঁড় গুড়,—তখনকার প্রধান মিষ্টসামগ্রী। আমাদের রাতাবী মনোহরা। তন্ময়কাব্য খণ্ডকাব্য। তাহা হইলে কতক রাজী আছি। সেকালে

খণ্ড শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নৈষধকার খণ্ডনখণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। ষষ্ঠে ব্রহ্মগুপ্ত জ্যোতিষে খণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। আমরা এখন যেমন বলি অমিয় নিমাইচরিত, তেমনি সেকালে খণ্ড-কাব্য অর্থে মধুময় অমৃত-ময় কাব্য। টুক্‌রা স্কুকরা বলিলে জমে না।

তৃতীয়। মেঘদূত যে লিরিক নয়, উহা যে টুকরা বা ছোট কাব্য নয়, এ ত ঠিক। আমি বলি, উহার মত একখানা মহা-মহা-কাব্য আর রচনা হয় নাই। মহাকাব্যে নূতন সৃষ্টি অনেক থাকে, কিন্তু সে কি সৃষ্টি? এই পৃথিবী, এই আকাশ, এই মানুষ, এই মনুষ্যচরিত্র, এই গাছ, এই পালা—এই সব—তবে সাজান গোজান নূতন করিয়া। না হয় একটা দুটা মানুষ নূতন করিয়া গড়া। কিন্তু মেঘদূতে সব নূতন সৃষ্টি, পৃথিবী, গাছ, পালা, বন, জঙ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, সমাজ, সামাজিক, সব ছাড়িয়া নূতন সৃষ্টি। মেঘদূত এক অদ্ভুত নূতন সৃষ্টি, সৃষ্টি-ছাড়া বলিতে চাও বল। কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি-ছাড়া বলিও। কবির সৃষ্টির কথা বলিও না। অলকা এক নূতন সৃষ্টি। এত বড় ভারতবর্ষটা, ইহাতে কালিদাসের কুলাইল না। তিনি ভারতবর্ষ ছাড়া অনেক দেশ জানিতেন। পারস্য জানিতেন, যবনদেশ জানিতেন, যে সকল দ্বীপ হইতে লবঙ্গপুষ্প কলিঙ্গে আনীত হইত, তাহাও জানিতেন; এ সকল দেশে তাঁহার পছন্দমত জায়গা পাইলেন না। তাই তিনি হিমালয়ের তুঙ্গতমশৃঙ্গে—মনুষ্যের অগম্য—কেবল তাঁহার কল্পনামাত্রের গম্য—স্থানে অলকানগর বসাইলেন। তাঁহার নগরে পার্থিব নগরের নিয়মাবলী খাটিবে না। তাঁহার নগর তিনি যত ইচ্ছা সুখময়, আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারিবেন। আর সেই নগরে যাহারা বাস করিবে, তাহারাও কল্পনারাজ্যের লোক, মানুষ তাহাদিগকে দেখে নাই, দেখিবেও না। তাহাদের সমাজনীতি, শাসনপ্রণালী, সব নূতন। সব কালিদাসের অবাধ কল্পনার অমৃতময় ফল। ইয়ুরোপ বহুকাল ধরিয়া সংসার কিসে সুখময় হয়, ভাবিয়াই অস্থির। প্লেটোর রিপব্লিক, মিল্টনের এরিওপ্যাগাইটিকা, সার টমাস মুরের ইউটোপিয়া প্রভৃতি গ্রন্থে মানুষ কিসে সংসারটা সুখময় করিতে পারে, তাহার অনেক চেষ্টা-চরিত্র আছে। কালিদাস মেঘদূতে চেষ্টা-চরিত্র ছাড়াইয়া উঠিয়া সেই আনন্দময়, সুখময়, প্রেমময় সংসার সৃষ্টি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এ ত নূতন সৃষ্টি—কবির সৃষ্টির এত প্রকাণ্ড খেলা—ইহাকে কি লিরিক বলিলে, না খণ্ডকাব্য বলিলে তৃপ্তি হয়? আমি একবার এডিসনের নকলে ইহাকে (mecum sal) "মধুর কবল" বলিয়াছিলাম। ছি! কি ভুলই করিয়াছিলাম। মেঘদূত লইয়া যতই আন্দোলন করিতেছি, উহার অসীম সৃষ্টিনৈপুণ্য, উহার ভাবময়, চৈতন্যময়, উচ্ছ্বাসময়, আবেগময় কবিত্বলহরী যতই মনোমধ্যে গ্রথিত হইতেছে, ততই উহাতে কালিদাসের অদ্ভুত কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি।

যক্ষপত্নী। মেঘদূতের প্রধান আকর্ষণমন্ত্র যক্ষপত্নী। মেয়েটি দেখিতে মন্দ নয়। তন্বী—ক্ষীণাঙ্গী—যাঁহারা দোহারা দোহারা চান, তাঁহাদের পছন্দ হইবে না। শ্যামা—কাল নয়—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা—কাঁচাসোণার মত রঙ। শিখরিদশনা—মল্লীনাথ অর্থ করিয়াছেন কোটিযুক্তদশনা অর্থাৎ ইন্দুরদাঁতী—টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অর্থ করিতেন; দাড়িম্ববীজের ন্যায় দশনযুক্ত—যাহার দাঁতগুলি দাড়িমদানার মত। পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—পাকা তেলাকুঁচার মত দুটি ঠোঁট। মধ্যে ক্ষামা—কোমরটি সরু। সরু কোমর বড় সুন্দর বলিয়া আমাদের কবিদের ধারণা। তাই কেহ কেহ এত সরু করেন যে, দেখাই যায় না, কখন বলেন "পরমাণুমধ্যা," কখন বলেন "সদসৎসংশয়গোচরোদরী"। কালিদাস এত উৎকট বর্ণনার বড় পক্ষপাতী নহেন। "চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা"—হরিণের চোখ, মুখের তুলনায় খুব বড়, পটলচেরা, আর তার উপর ঢলঢল করিতেছে; মানুষের চোখের যে অংশ সাদা, হরিণের সেটুকু জলের মত, কেমন ঢলঢল করে, তাহার উপর যখন আবার সেই হরিণ ভয় পায়, তখন সেই ঢলঢলে চোখ আরও ঢলঢলে হয়; যক্ষপত্নীর চোখদুটি তেমনি। "নিম্ননাভি"; তাহার নাভি গভীর। "শ্রোণিভারাৎ অলসগমনা।" উহার নিতম্ব বড় ভারি বলিয়া উহার গতি অতি মন্থর। চলিলেই বোধ হয়, হেলে দুলে, ঠমকে চমকে, পা ওঠে কি না ওঠে, এমনি ভাবে ধীরে ধীরে যাইতেছে। তাহার উপর আবার "স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্"। স্তনভারে শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাই ব'লে কুঁজো নয়। আর তিনি বড় একটা কথা কন না—যখন কথা কন দুচারিটি। এ রমণীকে আপনারা আহা মরিই বলুন, পাঁচপাচিই বলুন, বা চলনসই বলুন, কালিদাস ইহার এই পর্য্যন্তই বর্ণনা করিয়াছেন। কুবেরের রাজধানীতে, অত ধনের জায়গায়, এই যে নশ্বর ওয়ান, তাহা বলিতে পারি না। কালিদাসও সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যক্ষ বেচারা উহাকে রমণীসৃষ্টির আদ্য বলিয়া মনে করিত। সে মনে

করিত, বিধাতা রমণীসৃষ্টির সমস্ত উপকরণ একত্র করিয়া প্রথম যে-মেয়েটি গড়িয়াছিলেন, সেইটিই যেন এই—আমার বৌটি। সৌন্দর্য্যের কোথাও কিছু ত্রুটি ছিল না, কোথাও বিধাতাকে হাত টান করিতে হয় নাই। বরং সব জিনিস পুরাপুরা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা দেওয়া হইয়াছে। যক্ষ পত্নীকে আপনার দ্বিতীয় প্রাণ বলিয়া মনে করিত। সে ক্রমে উহাকে এতই ভালবাসিতে লাগিল যে, সে আর সব কাজকর্ম্ম ভুলিয়া গেল।

যক্ষ। যক্ষ বেচারা বেশ বড় মানুষ। তাহার টাকা কত জানেন, এক কোটি, দুকোটি নয়। কোটির পর অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদের পর বৃন্দ, বৃন্দের পর খর্ব্ব, খর্ব্বের পর নিখর্ব্ব, নিখর্ব্বের পর শঙ্খ, শঙ্খের পর পদ্ম, তার ধন এক পদ্ম আর এক শঙ্খ ১১০০০০০০০০০ ০০। অলকায় চোর-ডাকাতের ভয় নাকি একেবারেই নাই, তাই যক্ষের দ্বারে একটি পদ্ম ও একটি শঙ্খ আঁকা থাকে। তাহাতেই লোকে জানিতে পারে, ইহার কত টাকা। এখন যেমন লিমিটেড কোম্পানীরা তাহাদের মূলধন বিজ্ঞাপনে দিয়া থাকেন, সেকালেও যক্ষেরা এইরূপে তাহাদের রিজার্ভফণ্ডের বিজ্ঞাপন দিত। এ দেশের মত বিজ্ঞাপনপ্রথা চলিত হয় নাই; হইলে অনেক "অনুসন্ধানের" পর তথ্য বাহির করিতে হইত। শঙ্খ ও পদ্মের পাশে বড় বড় থলে আঁকিয়া সেকালে কেমন করিয়া টাকার পরিমাণ বলিয়া দিত, নূতন যাদুঘরে কল্পবৃক্ষের চেহারা দেখিলেই লোকে তাহা বুঝিতে পারিবে। যক্ষ এত ধনের মানুষ। মানুষের পক্ষে এ ধন খুব ধন, কিন্তু কুবেরের রাজধানীতে—হা মন্দ নয়—খুব যে প্রথম শ্রেণীর, তা বোধ হয় না। কারণ, কুবেরের সরকারে সে একটি চাকরী করিত, খুব বড় গোছের চাকরী বলিয়া বোধ হয় না; কেন না, কাজে অবহেলা করে বলিয়া কুবের তাহাকে শাস্তি দিয়াছেন। সলস্‌বরি, চেম্বারলেন হইলে পারিতেন কি? তবে নিতান্ত ছোট চাকরীও নহে, কারণ, কুবেরের দৃষ্টি তাহার উপর ছিল; এবং কুবের কিছু রেগেই শাস্তি দিয়াছিলেন। তাহাতেই বোধ হয়, তিনি জুনিয়ারদের মধ্যে এক জন। বেশ রাইজিং ও প্রমিসিং অফিসর ছিলেন। কিন্তু কুবের এত রাগ করেন কেন? যেহেতু সেই যক্ষটি বড় কাজে অবহেলা করিত। কেন করিত, কালিদাস লেখেন নাই। কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারি। পয়সা-কড়ি যেমন হোক কিছু ছিল; বয়স ত যক্ষদের যৌবন ছাড়া ছিলই না। তাহার উপর এ বেচারার বয়স কম; বৌটিও সুন্দরী; বেচারা তাহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। মনে করিত, বুঝি পদ্ম-শঙ্খেরও উপর কোন অমূল্য নিধি পাইয়াছে। একটু আসিতে দেরী হইত; কাজে ভুল হইত; প্রথম প্রথম হয় ত কুবের টুকিয়াছিলেন; তার পর ধমকও দিয়াছিলেন; তাহার পর যখন দেখিলেন রোগ অসাধ্য, তখন তাহার প্রতীকার আবশ্যক হইল। অপরাধ ত সাব্যস্তই আছে। কি শাস্তি দেওয়া যায়? যক্ষ-পিনাল-কোর্ডে হুইপিং নাই, কারাবাস নাই, ফাইন নাই, আছে কেবল বিরহ। কুবের সেই সাজাই দিয়া দিলেন। বিরহ, এক বৎসর। উত্থান একাদশীর পরদিন যক্ষ বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে অলকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এক বৎসরের জন্য বাহির হইল। কুবের দেখিলেন, এ ছোঁড়া যে রকম পাগলা, লুকিয়ে চুরিয়ে আসিতে পারে। তাই বাহির হইবার সময় তাহার যত মহিমা ছিল, সব কাড়িয়া লইলেন। সে যে আর দেবযোনির ন্যায় অণু হইয়া, লঘু হইয়া, চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আবার তাহার স্ত্রীর কাছে আসিবে, বা তাহার সঙ্গে দেখা-শুনা করিবে, কুবের সে পথ মারিয়া দিলেন। এখন সে বেচারা যায় কোথায়? ভারতবর্ষের যাবতীয় স্থান বিবেচনা করিয়া দেখা হইল। বড় লোকালয়ে পাঠাইলে যক্ষ পাছে বেণেদের সঙ্গে জুটিয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে। কাশী, কেদারনাথ প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলে যক্ষ পাছে ধর্ম্মকর্ম্মে মন দেয়। তাই দুষ্ট বুড়া কুবের মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসিয়া বলিয়া দিলেন যে, সে রামগিরিতে থাকিবে। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে কয়েক বৎসর রামগিরিতে বাস করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তথায় তাঁহার একটি আশ্রমের কুটীর ভাঙ্গিলে তিনি আর এক আশ্রমে কুটীর নির্ম্মাণ করিতেন। যেখানে জল পাইতেন, সেইখানেই জলক্রীড়া করিতেন; সীতা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। কুবের বলিয়া দিলেন, তুমি রামায়ণ পড়িয়াছ, তুমি রামগিরিতে থাক গিয়া। মনে মনে ভাবিলেন, যেমন দুষ্ট; সমস্ত দিন স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন—খুব হয়েছে, এক বৎসরে একটু বিলক্ষণ জ্ঞানযোগ হইবে। বিরহের সময়ে রামসীতার মিলনের স্মৃতি উহার বিরহবেদনাটা খুব তীব্র করিয়া দিবে।

কাজেও তাই হইল। যক্ষ বেচারা যেখানে যায়, সেইখানেই দেখে রামসীতার আশ্রম—রামসীতার কুঞ্জ—রামসীতার লতামণ্ডপ। বড় বড় ছায়া-বৃক্ষের নিকট যায়, তাহারা রাম-সীতার বনবাসকালের বিবিধ বিশ্রম্ভের সাক্ষী। বড় বড় গাছ কত কাল

বাঁচিয়া আছে ঠিক নাই; হয় ত রাম-সীতা পুঁতিয়াছিলেন, এখন প্রকাণ্ড মহীরুহ। জলে যায়, সেখানেও রামসীতার জলক্রীড়া মনে পড়ে। জলে যাইতে পারে না, স্থলে যাইতে পারে না, বনে যাইতে পারে না, গাছতলায় থাকিতে পারে না, এ অবস্থায় মানুষের কি দশা হয়? মানুষ পাগল হয়। যক্ষ অনেক কষ্টে আট মাস কাটাইল। তাহার শরীর কৃশ হইল, হাতে সোণার বালা ছিল, খসিয়া পড়িল, তাহা সে টেরও পাইল না। তাহার বুদ্ধিশুদ্ধিরও বিকৃতি হইল। সে উত্তরদিক্ হইতে বাতাস আসিলে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিত, ভাবিত, এই বাতাস যখন উত্তরদিক্ হইতে আসিতেছে, তখন এ নিশ্চয়ই প্রিয়ার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। সে প্রস্তরখণ্ডে প্রিয়ার ছবি আঁকিয়া আপনাকে তাহার চরণপতিত করিত। রাত্রে গাছতলায় শয়ন করিয়া স্বপ্নে প্রিয়াকে পাইয়াছে বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিত। হাত-পা ঠিক আলিঙ্গনের ভাবেই থাকিত। কিন্তু প্রিয়া কোথায়? এই ভাবেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যাইত। দেখিত, টপ্‌টপ্ করিয়া শিশির পড়িতেছে। বোধ হইত যেন বনদেবীরা তাহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। এ সকল পাগলামী ভিন্ন আর কি?

এইরূপে আট মাস কাটিয়া গেল। এত দিন ত কষ্টে কাটিয়াছে; আর কাটে না। তাহার উপর আবার মেঘ উঠিল। আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখা দিল। ছোট্‌ট একখানি মেঘ পর্ব্বতের নিতম্বে চড়িয়া আছে দেখা দিল। পর্ব্বত খানিকটা সমতল হইয়া যেখানটায় নামিতে থাকে, তাহাকে সানু বলে; উহার আর এক নাম নিতম্ব। এই পর্ব্বতনিতম্ব ঢাকিয়া মেঘ রহিয়াছে, বাতাসে নড়িতেছে চড়িতেছে। বোধ হইতেছে, যেন একটা তেল-কুচকুচে কাল হাতী পাহাড়ের গায়ে দাঁত মারিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া খেলা করিতেছে। আর পায় কে? যক্ষ একেবারে উন্মাদ; তখন আর চেতন অচেতন জ্ঞান রহিল না, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান রহিল না। এই সময়ে কবি যক্ষের হইয়া একটা কথা কহিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন—মেঘ দেখিলে সকলেরই মন হু হু করে, যাহাদের সকল প্রিয় পদার্থ পার্শ্বে রহিয়াছে, তাহাদেরই মন কেমন কেমন করে; হৃদয় উদাস হয়, কি যেন কি নাই, কি যেন কি নাই, বলিয়া বোধ হয়। সেই প্রিয়বস্তু সব যদি আবার দূরে থাকে, তাহার আর কথা কি? সে ত উন্মাদ হইবারই কথা।

যক্ষের উন্মাদ একটু আলাদা রকমের। যক্ষ আবোল-তাবোল বকে না। উহার উন্মাদে একটু শৃঙ্খলা আছে। সামাজিক বৈষয়িক সকল ব্যাপারের সামঞ্জস্য আছে। নাই কেবল একটি; প্রিয়ার কথা উঠিলে আর ঠিক থাকে না। প্রণয়ের কথা উঠিলে ঠিক থাকে না। সমস্ত জড় পদার্থ চৈতন্যময় হইয়া যায়। আপনিই হইয়া যায়; জড় বলিয়া জ্ঞানই থাকে না।

মেঘ দেখিয়াই মনে হইল, শ্রাবণ আসিতেছে, প্রিয়া বাঁচে কি না বাঁচে। পরের দেশে পড়িয়া, পরের সুখের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া যদি আমার এই দশা হইল, তবে সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই বাগান, সেই বাগিচা, সব আছে, কেবল আমি নাই; আমার গৃহিণীর অবস্থা আরও শোচনীয়। তাই ভাবিয়া যক্ষ মনে মনে সংকল্প করিল, একটা সংবাদ পাঠান যাক। মেঘ উত্তরদিকে যাইতেছে, এই-ই আমার সংবাদ লইয়া যাইবে। যেমন মনে এই কথা উদয় হইল, অমনি—পাগলের মন—সেই দিকেই ছুটিল। অমনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কুরচি-ফুল ফুটিয়াছে, বন আলো করিয়া রহিয়াছে। বর্ষার প্রধান সম্পত্তি কুরচিফুল। কতকগুলা কুরচিফুল তুলিয়া মেঘকে উপহার দিল, এই লও মেঘ, আমার প্রীতি উপহার লও। দিয়াই মনে করিল, আমার উপহার পাইয়া মেঘ বড় খুসী হইয়াছে। অমনি "আস্‌তে আজ্ঞা হোক" বলিয়া মেঘকে সম্বোধন করিল। ভাবিল, এই মেঘের কাছ থেকে কাজ আদায় করিতে হইবে। ইহার খোসামোদ করিতে হইবে। খোসামোদ যত রকম আছে, সকলের চেয়ে বংশের বর্ণনাই বড় খোসামোদ; আপনার টাকা আছে, কড়ি আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, যশ আছে, আপনি দাতা, ভোক্তা, বক্তা, বিবেচক ইত্যাদি কথায় যত ফল হয়, তাহার চতুর্গুণ ফল হয়, আপনি বড়বংশে জন্মিয়াছেন, আপনার পূর্ব্বপিতামহগণ কত বড় বড় কাজ করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি বলিলে। পাগল যক্ষের কিন্তু সে নাড়ীজ্ঞানটুকু টন্‌টনে ছিল, সে মেঘকে দেখিয়াই বলিল, আপনি বড় বংশে জন্মিয়াছেন, পুষ্কর আবর্ত্তক প্রভৃতি বড় বড় মেঘ আপনার পূর্ব্বপুরুষ, আপনার বংশ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এত বড় বংশ কি আর হয়? তাহার উপর আপনি ইন্দ্রের এক জন বড় অফিসার। আপনি ইচ্ছামত দেহপরিবর্ত্তন করিতে পারেন; কখন বড় কখন ছোট হইতে পারেন। ইচ্ছামত বিচিত্র রূপ ধারণ করিতে পারেন। তাই আমি বড় দুঃখী—

প্রিয়াবিরহী—আপনার শরণাগত হইলাম। বড় লোকের কাছে যাচ্ঞা ব্যর্থ হইলেও তাহাতে দুঃখ নাই। ছোট লোকের কাছে যাচ্ঞা সার্থক হইলেও মনটা ছোট হইয়া যায়।

তোমার একটা বড় গুণ আছে। তুমি তাপিতদিগের তাপ নিবারণ কর। ভূলোক ভুবর্লোক বড় গরম হইয়া উঠিলে তুমি তাহাদের ঠাণ্ডা করিয়া দাও। আমি প্রিয়ার বিরহ-অগ্নিতে পুড়িতেছি। আমার প্রিয়াও প্রিয়বিরহ-অগ্নিতে পুড়িতেছেন। অতএব তুমি আমাদের ঠাণ্ডা কর। তুমি আমার সংবাদ লইয়া প্রিয়ার কাছে যাও। কুবেরের শাপে আমাদের বিরহ—মিলনের উপায় নাই। তুমি না দয়া করিলে, খবরটা লওয়ারও উপায়ও নাই। তাই বলি, যাও। সে তোমার তীর্থ-স্থান, সেখানে বাহিরের বাগানে মহাদেব আছেন, তাঁহার কপালের চাঁদের আলোতে চুণকাম করা বাড়ী-ঘর সব আরও চুণকাম করা হইয়াছে। তাহার পর আবার বলিতে লাগিল,—তুমি যখন যাইতে থাকিবে, তুমি যখন আকাশে উঠিবে, তখন যাহাদের স্বামী বিদেশে, তাহাদের মনে কত আশা, কত ভরসা, কত সান্ত্বনা আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকিবে। তুমিই তাহাদের আশার মূল, ভরসার মূল; তাই তাহারা হাঁ করিয়া তোমায় দেখিতে থাকিবে; পাছে ঝাপটার চুলগুলা চোখের উপর উড়িয়া পড়িয়া বিঘ্ন করে, তাই সেগুলাকে উঁচা করিয়া মাথার উপর ধরিয়া রাখিবে। আর তাদের চাঁদপানা মুখখানা পুরাপুরিই দেখা যাইবে। তাহারা ভাবিবে, আমার স্বামী এইবার বাড়ী আসিবে। আমার মত পরাধীন বৃত্তি না হইলে আর কেহ কি তুমি সাঁজোয়া পরিয়া উপরে উঠিলে আপনার প্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে? যক্ষের যত কেন ঐশ্বর্য্য থাকুক না, যত মান, যত মহিমা থাকুক না, পরের অধীন বলিয়া তাহার মনে বড়ই ধিক্কার হইয়াছিল। সে ভাবিল, আমি যদি চাকরী না করিতাম, যদি দাসত্ব না করিতাম, আজ কি আমার এ দশা হয়?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যক্ষের উন্মাদে বেশ একটু শৃঙ্খলা আছে। তাহার এক উদাহরণ দেখুন—মেঘকে সে কৈলাসযাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। যাত্রিক লক্ষণগুলি যে ভাল—তাহা একবার দেখাইয়া দিতে হইবে; যক্ষ এখন সেই কাজেই ব্যস্ত হইল। সে দেখাইল, পবন অনুকূল। আষাঢ় মাসে দক্ষিণ হইতে পবন উত্তরে যাইতেছে, সুতরাং পবন অনুকূল; বামভাগে চাতক উড়িতেছে। এও একটা সুলক্ষণ। বলাকা মালাবদ্ধ হইয়া পথে তোমার সেবা করিবে। বকপংক্তিও সুলক্ষণ। চারিদিকে সুলক্ষণ। এমন মাহেন্দ্র যোগ আর হবে না। এইবার ওড়।

তবে একটি কথা আছে, মেঘ মনে করিতে পারে, "তাকে কি দেখিতে পাব?" যক্ষ তাই বলিতেছে, পাবে বৈ কি? দেখিবে, সে কেবল দিন গুণিতেছে। তাহার স্বামীর সে একমাত্র পত্নী। যদি স্বামীর বহুপত্নী থাকে, সে স্বামীর বিরহটা তত লাগে না, কিন্তু যদি স্বামীর আর না থাকে? পত্নীর ত আর নাই-ই, তবে সে পত্নীর আশা বড় আশা। সুতরাং সে মরিবে না। দেখিবে সে মরে নাই। তোমার যাত্রা বিফল হইবে না। তোমার সে ভ্রাতৃজায়া মরে নাই। সে কি মরিতে পারে? এখনও যে মিলনের আশা আছে। সে কি মরিতে পারে? বোঁটায় যেমন ফুলটি আটকাইয়া রাখে, সেইরূপ আশায় রমণীহৃদয় আটকাইয়া রাখে। বোঁটাটি শুকাইলে যেমন ফুলটি ঝরিয়া পড়ে, আশা ফুরাইলে রমণীর প্রাণ কর্পূরের মত উপিয়া যায়।

"পথ যে বড় দূর, বড় দুর্গম, একাকী এত পথ যাওয়া যায় কি গা?" এ কথা মনে ভাবিও না। তোমার গর্জ্জনে কাণ জুড়াইয়া যায়, সেই গর্জ্জনে মাটী ফুঁড়িয়া ভুঁইচাঁপার ফুল বাহির হয়, বড় সুলক্ষণ, পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। সুতরাং পৃথিবী তোমার অনুকূল। পথ দুর্গম হইবে না। আর তোমায় দেখিয়া মানসসরোবরে যাইবার জন্য হংসগুলা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইবে, তাহারা পথে মৃণালের টুকরা মুখে করিয়া কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত অর্থাৎ তুমি যত দূর যাইবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। তোমার পয়সা খরচ করিয়া লোক লইতে হইবে না, তোমার সবদিকেই সুবিধা, আর দেরি নয়।

এখন চটপট্ এই শৈলরাজকে আলিঙ্গন করিয়া উহার নিকট বিদায় গ্রহণ কর। এ তোমার পরম মিত্র, তোমায় অনেক দিনের পর দেখিলে উহার তাপ দূর হয়; তাই পর্ব্বতগাত্র হইতে ভাব উঠে। আর তোমার শরীরস্পর্শে উহার স্নেহ প্রকাশ হয়, তাই পর্ব্বতগাত্রে শিশিরের ন্যায় জলবিন্দু দেখা যায়। উহাকে আলিঙ্গন করিলে তোমার শরীর পবিত্র হইবে। কারণ, তোমার বন্ধু বড় যে সে লোক নয়; উহার প্রতি নিতম্বে—প্রতি মেখলায় জগৎপাবন রামচন্দ্রের জগৎপাবন পদচিহ্নসমূহ বিরাজ করিতেছে।

এই পর্ব্বতটি সরগুজারাজ্যের মধ্যে। উহা

একটি ক্ষুদ্র সমতল হইতে আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। উহার মাথায় শিখর আছে। শিখরে অনেকটা সমতল ভূমি। যেখান হইতে শিখরটি উঠিয়াছে, তাহার চারিদিকে পর্ব্বতের নিতম্ব। ইহাতে উঠিবার জন্য তিন দিক্ হইতে পথ আছে। উত্তরের পথটি প্রশস্ত, পশ্চিমেরটি বড়ই খাড়াই পূর্ব্বের দিকে আরও একটি আছে। সে নিম্নস্থিত ক্ষুদ্র সমতলের নানাস্থানে আশ্রম ছিল। প্রায় সকল আশ্রমেই রামচন্দ্র কখন না কখন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যক্ষ বেচারা যে কোথায় থাকিত, তাহার ঠিকানা নাই। তবে এ কথা মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি যে, যেদিন সে প্রথম মেঘ দেখিয়া পাগলপারা হইয়া যায়, সে দিন বৈকাল বেলায় সে পাহাড়ের দক্ষিণে এবং একটু দক্ষিণপূর্ব্বে—একটু দূরে উত্তরদিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। রেলগাড়ী চলিয়া গিয়াছে, আর ধমাও দেখা যায় না। তবুও যেমন স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া সেই দিকেই চাহিয়া থাকে, সেইরূপ যক্ষ বেচারা অলকা দূরে হইলেও, দেখা যাবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, সর্ব্বদাই উত্তরমুখে সেই দিকেই চাহিয়া থাকিত।

যক্ষ বলিতেছে:—তাহার পর শোন, রাস্তা বাৎলাইয়া দিতেছি, শোন। যে সে রাস্তায় ত তুমি যাইতে পারিবে না, যেখানে পাহাড়-পর্ব্বত বেশী, যেখানে উঁচ উঁচ পাহাড়, সেখানে ত তুমি ঠেকিয়া যাইবে। প্রশস্ত পথ না পাইলে তোমার বিশাল বপু ত চলিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি কোথাও খাড়াখাড়া যাইতে পারিবে না; তোমায় বাঁকিয়া চুরিয়া যাইতে হইবে। বিশেষ এখন তুমি জলভরা। শরতের মেঘের মত খুব উচ্চে উঠিতে পারিবে না। তোমায় ২।৩ হাজার ফুটের মধ্যেই উড়িতে হইবে। সুতরাং অনেক ছোট পাহাড়েও তোমার বাধিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তাই বলিতেছি, তোমার যাবার মত রাস্তা তোমায় বাৎলাইয়া দিতেছি। তাহার পর তোমায় আমার সখাসংবাদ শুনাইয়া দিব; তোমার কাণ ভরিয়া যাইবে, কাণ জুড়াইয়া যাইবে। তুমি যখন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, পর্ব্বতের মস্তকে বিশ্রাম করিয়া যাইও। যখন বড় কাহিল হইয়া পড়িবে, স্রোতের জল পান করিও। সে জল অতি লঘু, শীঘ্র হজম হইয়া যাইবে; সুতরাং শরীর ভার হইবে না। তুমি যখন সাঁ সাঁ করিয়া উত্তরমুখে চলিবে, তখন সরল-স্বভাব সিদ্ধকন্যারা শিহরিয়া উঠিয়া আগ্রহের সহিত দেখিতে থাকিবে। কারণ, তাহাদের হঠাৎ মনে হইবে, যেন বাতাস পর্ব্বতশৃঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, হিমালয়ের পাদদেশবর্ত্তী বনরাজী ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ-পাদস্থ বনরাজী সিদ্ধগণের নিবাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত। লোকের এখনও বিশ্বাস, অনেক সিদ্ধপুরুষ এখনও এই সকল অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। উঁহারা তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধনামক দেব-যোনিতে পরিণত হইয়াছেন। তাই উঁহাদের অঙ্গনা আছে, পরিবার আছে; নচেৎ তপঃসিদ্ধের পরিবার কিরূপে হইবে? এ স্থানের বেতগাছ দেখিতে বড় সুন্দর। তুমি এখান হইতে উত্তরমুখে আকাশে উঠ গিয়া। দিঙ্‌নাগেরা তোমার গায়ে শুঁড় বুলাইতে আসিলে, সেখান হইতে সরিয়া পড়িবে। মল্লিনাথ এইখানে নিচুল ও দিঙ্‌নাগনামে দুই জন পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিচুল কালিদাসের পক্ষপাতী এবং দিঙ্‌নাগ অতিবিরোধী। তাঁহার মতে উভয়েই কালিদাসের সমকালীন, তাই তিনি নিচুল বেতগাছকে নিচুল কবি, আর দিঙ্‌নাগকে দিঙ্‌নাগ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়াছেন; এবং তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া লোকে কালিদাসকে দিঙ্‌নাগ নামক বৌদ্ধসন্ন্যাসীর সমকালীন ও ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছেন। বৌদ্ধসন্ন্যাসী দিঙ্‌নাগের বাড়ী কাঞ্চী, মেঘ উড়িতেছে রামগিরি হইতে। রামগিরি সরগুজার অন্তর্গত রামগড়, সুতরাং কাঞ্চীর দিঙ্‌নাগ মেঘের গায়ে শুঁড় বুলাইবে কিরূপে? কাঞ্চী রামগড় হইতে ৫০০ মাইল দক্ষিণে। এ দিঙ্‌নাগ-সমূহের সঙ্গে সে দিঙ্‌নাগের কোনও সম্পর্ক আছে, বোধ হয় না। আর যদিই হয়, এ দিঙ্‌নাগ ও বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগ এক ব্যক্তি, ইহাও প্রমাণ-সাপেক্ষ। মনে করি, ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া প্রত্নতত্ত্বের কচ্‌কচি তুলিব না, কিন্তু ক্রনিক রোগ; না তুলিয়া থাকিতে পারি না।

ঐ দেখ, ঐ বল্মীকের অগ্রভাগ হইতে ইন্দ্রধনু উঠিতেছে। পর্ব্বতে ইন্দ্রধনু অনেক নীচু পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, যেন একটা কোন অল্প উচ্চ জায়গা—উইএর ঢিপি হইতে উঠিতেছে। বোধ হইতেছে, যেন নানাবিধ মণিমাণিক্যের রশ্মি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধনুকের আকার হইয়াছে। ঐ ধনু যখন তোমার মাথায় লাগিবে, বোধ হইবে, যেন চিকণ কালার চূড়ায় ময়ূরের পেখম নাচিতেছে।

এখানে একটু বিশেষ কথা আছে। বৈকালবেলা রামধনু উঠিতে পূর্ব্বদিকে উঠিবে। উত্তরায়ণ—একটু

দক্ষিণে হেলিয়া উঠিবে। মেঘ যখন মলয়-মারুত-তাড়িত হইয়া উত্তরে যাইতে থাকিবে, তখন একবার না একবার ঐ বাঁকা ধনুর আগা তাহার মাথায় ঠেকিবে। তখন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামের মাথায় ময়ূরের পেখমের মত নিশ্চয়ই দেখাইবে কারণ, সে পেখম সবাই জানে—তেড়া করিয়া বসান ও বামে হেলা। উত্তরগামী মেঘের মাথায় রামধনু তেমনি তেড়া করিয়া বসান। তফাৎ কেবল এটা ডাইনে হেলা।

সকলেই জানে, বৃষ্টি নহিলে চাষ হয় না। বৃষ্টি তোমার আয়ত্ত, তাই তুমি উঠিলে যত পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা তোমার দিকে প্যালপ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে। তাহাদের সে দৃষ্টিতে হাব নাই, ভাব নাই, চাতুর্য্য নাই, বিলাস নাই, বিভ্রম নাই, আছে কেবল প্রাণ কেড়ে নেওয়া প্রীতি আর চোখ-জুড়ান মধুরিমা। তাহাদের এতই আগ্রহ, এমনি সরলতা, আর হৃদয়ের এতই আবেগ যে, বোধ হয় যেন তাহারা তোমাকে পানই করিয়া ফেলিবে। এইভাবে তুমি উঁচু চষা ভুঁয়ের উপর উঠিবে। নীচু জমীর উপর হইতে পাহাড় উঠে। খানিক পাহাড় উঠিলে তাহার উপর সময়ে সময়ে সমতল বা প্রায় সমতল ভূমি হয়। উহার নাম মালভূমি। অনেক মালভূমি আছে বলিয়া ভারতের অনেক প্রদেশের নাম মালব। মালভূমি সূর্য্যের আতপে বড়ই তাপিত হয়, তাই চাষ করিবার পর এক আছড়া জল হইলে একটা খুব সোঁদা গন্ধ বাহির হয়। তুমি সেই গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে সেই মালভূমির উপর দিয়া খানিক পশ্চিমদিকে যাও, তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইও।

এইখানে কালিদাস একটু চাতুরী খেলিলেন। মেঘকে খানিকটা পশ্চিমমুখে পাঠাইলেন। কারণ, মেঘ যদি বরাবর রামগিরি হইতে উত্তরমুখে যায়, সে আবার সেই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম দিয়া অযোধ্যা দিয়া যাইবে, সুতরাং রঘুবংশের ত্রয়োদশে যে পথে পুষ্পক রথ গিয়াছিল, মেঘকেও সেই পথ দিয়া যাইতে হইবে। কবির প্রিয়ভূমি সকল দেখান হইবে না। তাই কবি কৌশল করিয়া উঁচু জমীর উপর দিয়া মেঘকে খানিকটা পশ্চিমদিকে সরাইয়া দিলেন। পথটা একটু তেরছা হইল, কিন্তু কবির নূতন জগৎ দেখাইবার বড় সুবিধা হইল। কবি ইহার পর উজ্জয়িনী দেখাইবার জন্য পথটা আরও তেরছা করিয়াছেন।

অথবা রামগিরির আকার ও অবস্থান দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা একটি ক্ষুদ্র সমতল হইতে উঠিয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র সমতলের উত্তরপূর্ব্ব ও পশ্চিমে ধনুরাকারে অভ্রভেদিনী পর্ব্বতমালা। রামগিরিকে আলিঙ্গন করিয়া উত্তরমুখে উঠিতে গেলেই মেঘ মহাশয় এই ধনুরাকার পর্ব্বতে বাধিয়া যাইবেন, তাই কালিদাস বলিয়াছেন, উত্তরমুখ উঠিয়াই একটু পিছু হঠিয়া যাইবে, তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইবে। কিন্তু এবারও অভ্রভেদী পর্ব্বত। দক্ষিণ হইতে বাতাস মেঘকে উত্তরদিকে ঠেলিলে পাহাড়ে বাধা পাইয়া মেঘ পশ্চিমে যাইবে। এইরূপভাবে উত্তরমুখে যাইতে গেলেই—এই মালভূমি উঠিতে গেলেই—মালবদেশে প্রবেশ করিতে গেলেই—প্রথমেই আম্রকূট পর্ব্বত—এখনকার অমরকণ্টক। এই বিস্তৃত পর্ব্বতের একটিমাত্র উচ্চ শিখর। পর্ব্বতটি অনেক দূর লইয়া মোচাগ্র আকারে উঠিয়াছে; ইহার এক দিক দিয়া নর্ম্মদা আর এক দিক দিয়া মহানদী ও আর এক দিক দিয়া শোণনদী প্রবাহিত হইতেছে। অনেক দূর লইয়া থব করিয়া মোচাগ্র আকারে আম্রকূটের উচ্চ শৃঙ্গ উঠিয়াছে। সে তোমার কাছে বড় ঋণী, তাহার বন যখন দাবানলে পুড়িতে থাকে, তখন তুমিই ধারাবৃষ্টি করিয়া সে দাহ নিবারণ করিয়া থাক। তাই তোমার কথা মনে হইলে তাহার আনন্দ হয়। সে নিশ্চয় তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবে। এক সময়ে তুমি তাহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ; এখন তুমি যদি পথক্লান্ত হইয়া তাহার নিকট আশ্রয় চাও—সে ত আর ছোট লোক নয়—তাহার মস্তক উন্নত—সে এমন কাজ কখন করিবে না, যাহাতে উচ্চ মাথা হেঁট হয়। সে অবশ্যই তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবে। সেই মোচাগ্র আকার উত্তুঙ্গ পর্ব্বতচূড়ার উপর তুমি বসিবে। তোমার আকার যেন একটি তেল-কুচ্‌কুচে কাল খোঁপা। শিংদার ফিরিঙ্গী খোঁপা নয়, দিশি—সেকেলে—মাথার মাঝখানে থাকা—নীচে মোটা, উপরে সরু ঘন, কৃষ্ণকাল খোঁপা। তোমার নীচে মোচাগ্র-আকার প্রকাণ্ড বিস্তার পর্ব্বত-শিখর, অনেক জমী ব্যাপিয়া আছে, আর রাশি রাশি বনের আম পাকিয়া পর্ব্বতের বাহির দিকটা পাকা আমের রঙে রঙ করিয়া তুলিয়াছে। পাকা আমের রঙে আর রমণী-শরীরের রূপে আলতা রঙে প্রভেদ আছে কি? কিছুই নাই। এখন ভাব দেখি, রূপে আলতার রঙের সেই প্রকাণ্ড মোচাগ্র আকার পাহাড়টির উপর, কাল মেঘ খোঁপার মত হইয়া বসিলে, উপর হইতে দেবতারা যখন যুগলমিলনে মিলিত হইয়া দেখিবে, তখন উহা পৃথিবীর কিসের মত দেখিবে?

সে পর্ব্বত আগাগোড়া গাছপালায় ঢাকা— অনেক জায়গায় কুঞ্জবন আছে, আর সে নির্জ্জন নিভৃত কুঞ্জগুলি বনবাসিনীদের আনন্দের স্থান। তুমি তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবে, অনেক জল বর্ষণ করিয়া দিবে, একটু হালকা হইবে; শীঘ্র শীঘ্র খানিক দূর গিয়া দেখিবে নর্ম্মদা নদী। মনের উৎকট আবেগে রোগা হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কি উৎকট অবস্থা! বিন্ধ্যের পাগুলা কি যেমন তেমন পা, পাহাড়ে, পাথরে, ঢেলায়, ডুমরিতে এবড় খেবড়। যেন কোন গোদা মিন্‌সের পায়ে ধরিয়া নর্ম্মদা আলুথালুভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। নিম্নে স্বচ্ছসলিলা বিস্তীর্ণা নর্ম্মদা, উপরে কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ অবস্থিত বনরাজিবিরাজিত বিন্ধ্যপর্ব্বত। মাঝে মাঝে সাদা ঝরণা পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া নর্ম্মদায় পড়িতেছে, উপর হইতে বোধ হইতেছে, যেন একটা হাতীর শিঙার হইয়াছে। বড় বড় সাদা সাদা লাল লাল কাল কাল ডোরা দেওয়া হাতীর শিঙার যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই এ উপমার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।

তুমি জল ঢালিয়া নর্ম্মদার জল লইয়া প্রস্থান করিবে। এইখানে জাম গাছের নিবিড় বন। জলের বেগ জাম গাছের ঝাড়িতে ঝাড়িতে আটকাইতেছে। গাছে গাছে লাফাইয়া পড়িতেছে, আর মলা কাটিয়া হাল্কা হইতেছে। বিন্ধ্যপর্ব্বত গজের আকর অর্থাৎ হাতীখেদার একটা প্রধান স্থান। পালে পালে হাতী পড়িয়া নর্ম্মদার জলকে তাহাদের মদজলে সুরভি করিয়া তুলিয়াছে। তুমি ঐ জল পেট পূরিয়া লইও, তাহা হইলে বায়ু তোমায় তূলার মত উড়াইয়া দিতে পারিবে না। খালি হইলেই লঘু হয়, পূরা হইলেই ভারি হয়। তুমি জল পূরিয়া ভারি হইও। কথাগুলি সংস্কৃতে এমনি করিয়া সাজান আছে যে, উহার ভিতরে ভিতরে আর একটা অর্থ রহিয়া গিয়াছে। যদি রোগীকে বমন করাইয়া তাহাকে লঘু তিক্ত কষায় জল খাওয়ান যায় এবং ক্রমে তাহার বলাধান হয়, তাহা হইলে বাতে তাহার কাঁপনি জন্মাইয়া দিতে পারে না।

তুমি যেখানে যেখানে যাইবে, কদম্বফুল ফুটিবে। কদম্বগোলের গাত্রস্থিত অসংখ্য কুঁড়িগুলি ফাটিয়া কেশর বাহির হইতে থাকিবে, কতক বাহির হইয়াছে, কতক হয় নাই। এরূপ অবস্থায় উহার বিচিত্র বর্ণবিকাশ হইবে। খানিকটা কাঁচা, সুতরাং সবুজ, খানিকটা পাকা, সুতরাং পাঁশুটে, উভয়ের মিশ্রণে কি বিচিত্র শোভাই হইয়া উঠিবে। তুমি যেখানে যেখানে যাইবে, দেখিবে, জলাভূমে ভুঁইচাপার প্রথম কুঁড়িগুলি বাহির হইতেছে, আর তুমি যেখানে যেখানে যাইবে, ভূমি হইতে বিচিত্র সোঁদা গন্ধ বাহির হইবে। হরিণগুলি কদম্বফুল দেখিয়া, ভুঁইচাপার ফুল খাইয়া, ও সোঁদা গন্ধ শুঁকিয়া, মদভরে লম্ফঝম্প করিবে আর লোককে দেখাইয়া দিবে, এই পথে তুমি বৃষ্টি করিয়া গিয়াছ।

হে সখে, তুমি আমার প্রিয়ার জন্য যাইতেছ। আমার প্রাণও আকুল হইয়াছে, আর দেরি সয় না। তথাপি আমি দেখিতেছি যে, প্রতি পর্ব্বতেই তোমার বিলম্ব হইবে। কুরচিফুল তোমার বড় প্রিয়। পর্ব্বতগুলি টাটকা ফোটা কুরচির গন্ধে ভর ভর করিতেছে, তুমি নিশ্চয়ই একটু গড়িমাসি করিবে; তাহার উপর আবার যখন ময়ূরেরা তাহাদের শ্বেতবর্ণ নয়নপ্রান্ত ঘুরাইয়া সজলনয়নে কেকা উচ্চারণ করিয়া তোমার সম্বর্দ্ধনা করিবে, প্রাণের বঁধু, এস হে এস হে বলিয়া তোমায় আগু বাড়াইয়া লইতে আসিবে, আহা, যাহারা তোমার সাড়া পাইলে নাচিয়া উঠে, তাহারা যখন প্রাণ খুলিয়া ডাকিবে, তোমার সাধ্য কি যে তুমি চট্‌পট্ তাহাদের ছাড়িয়া যাও।

তুমি অধিষ্ঠান হইলে দশার্ণ দেশ অর্থাৎ পূর্ব্বমালবের কি সুন্দর অবস্থা হইবে, জান কি? উহার প্রান্তদেশে নিবিড় জাম গাছের বন। তোমার আগমনে জামের ফল সব একেবারে পাকিয়া উঠিবে, গাঢ় সবুজ জামের পাতা, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জামের ছাল, তাহার উপর কুচকুচে কাল রাশি রাশি ফল, কালয় সবুজে কালয় কালয় কালতর কালতম হইয়া উঠিবে। মালব দেশ ভারতের বাগান, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান, বেড়ায় কেবল কেয়াফুলের গাছ, তুমি গেলে কেয়াফুলের কুঁড়িগুলির ডগার কাঁটা ছাড়িবে। পাপড়ি ছাড়িতে এখনও দেরি আছে, রাশি রাশি ফুল, কেবল সাদা, যেটুকু ফুটিয়াছে, তাহাও সাদা; আবার সাদায় সাদায় সাদা হইয়া যাইবে। তুমি গেলে কাককুল বড় বড় গাছের আগায় বাসা করিতে থাকিবে, আর তাহাদের কলরবে গাছটা শুদ্ধ কলরবময় হইয়া উঠিবে। তুমি তথায় গেলে তোমার সঙ্গে যে হাঁসগুলা মানসসরোবরে যাইতেছিল, তাহারা দশার্ণদেশে কয়েক দিন থাকিয়া যাইবে।

দশার্ণের রাজধানী বিদিশা। উহার যশে ভুবন ভরিয়া আছে। তুমি বিলাসী; তুমি সেখানে গেলে তোমার বিলাসবাসনা সফল হইবে; তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কারণ, তুমি তথায় বেত্রবতীর

জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। বেত্রবতী নদী, সুতরাং তোমার রসরঙ্গিণী; সে বিদিশার পাশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; উহার জল চলিতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে লাফাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন, কোন প্রৌঢ়া কামিনী মুখে ভ্রূভঙ্গি করিয়া তোমায় ডাকিতেছে। সুতরাং সে জল পান তোমার মুখে চুম্বনের ফল হইবে। সুধু কি তাই কেবল, জল গভীর নদীগর্ভে পার্শ্বস্থ উপলে গভীর নাদে আছড়াইয়া পড়িতেছে, দূর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন, বিলাসিনী আবেগভরে না আ আ না আ আ এই অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিয়া "আশা পূরে নাই, আশা পূরে নাই" এই কথা বলিয়া দিতেছে। ভ্রূভঙ্গির সহিত গিরিনদীর তরঙ্গের তুলনা কি মধুর! ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, প্রসারিত হয়, কাঁপে, তরঙ্গের আকারও কোথাও প্রশস্ত, কোথাও কুঞ্চিত কোথাও বা নর্ত্তিত হয়।

সেখানে গিয়া তুমি নীচৈ নামে সহরতলীর পাহাড়ে বাসা লইও। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর পুলকে পূরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে, তাহার পুলক কদম্বফুলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়টি কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ৩০০।৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। ইহা বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ স্তূপ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে এককালে মণ্ডিত ছিল, আর স্থানে স্থানে পাথর দিয়া গাঁথা এক একটা খালি ঘর নির্জ্জনে পড়িয়া থাকিত। এরূপ নগরের বাহিরে নির্জ্জন ঘর দেখিতে চাও, হিমালয়ের সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। ও ঘরে কি হয়?—এমন কিছু নয়—একটা ঢেটরা হয়। কিসের ঢেটরা—এই কথা যে, নগরবাসীদের যৌবন-দড়ি ছেঁড়ে—স্মৃতির লাগামে, ধর্ম্মের বন্ধনে, উপদেশের নাগপাশে, আর বাঁধা থাকে না। মিথ্যা কথা; নির্জ্জন ঘর ঢেটরা দিতেছে—সৎপ্রতিপক্ষ বাক্য—(Contradiction in terms) দূর মূর্খ, দেখিতেছিস্ না—নাক কি নাই? ও কিসের গন্ধ? ও যে পরিমল,—চটকান ফুলের গন্ধ—ঐ ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে—বুঝিতেছিস্ না কে ঐ ফুল চটকাইল—কখন্ চটকাইল, কেমন করিয়া চটকাইল—যদি না বুঝিয়া থাকিস যা—তোর মেঘদূত পড়িতে হইবে না।

নীচু পাহাড়ে একটু বিশ্রাম করিবে। তাহার পর আবার চলিতে থাকিবে। ছোট নদীটি, ধারে ধারে বড় বড় ফুলবাগান, কেবল যুঁই-ফুলের গাছ; কত ফুল ফুটিয়াছে, সেই ফোটাফুলে দুএক আছড়া টাটকা জল দিবে। সেখানে তোমার অনেকের সঙ্গে আলাপ হইবে। তুমি যেমন লোক, তেমনি লোকের সঙ্গে আলাপ হইবে। রসিকারা ফুল তুলিতেছেন—গাল বহিয়া ঘাম পড়িতেছে—আঁচল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। মুছিবার কিছুই নাই, তাই কান হতে যে পদ্মের কুণ্ডল ঝুলিতেছিল, তাই দিয়া ঘাম মুছা হইতেছে, আর পদ্মটি মলিন হইয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় তোমার দেহের নীচে যদি তাহারা একটু ছায়া পায়, আনন্দ-বিস্ফারিত-নেত্রে মুখ উঁচা করিয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তোমায় দেখিবে। সেই নিষ্কলঙ্ক মুখের সঙ্গে তোমার খানিক আলাপ হইবে।

তুমি উত্তরদিকে চলিয়াছ। উজ্জয়িনী বিদিশা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম। সুতরাং উজ্জয়িনী যাইতে হইলে তোমায় বাঁকিয়া যাইতে হইবে। তথাপি আমার অনুরোধ—আমারই কাজে তুমি যাইতেছ—উজ্জয়িনী না দেখিয়া যাইও না। উহার অট্টালিকার ক্রোড়ে না বিশ্রাম করিয়া যাইও না। তুমি যখন উপর দিয়া যাইবে, অট্টালিকার উপরগুলি—ছাদগুলি—ক্রোড়গুলি তোমায় ডাকিবে। তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইও। উজ্জয়িনীর পুরবাসিনীগণের নয়ন বড়ই মনোহর। উহাদের অপাঙ্গ নিরন্তর চঞ্চল, চোখের কোলে নৃত্য যেন লেগেই আছে। সে নৃত্যের চাঞ্চল্যই বা কত! তার কাছে বিদ্যুতের খেলা কোথায় লাগে। তাদের সেই বিদ্যুদ্বিলাসি নয়নের সঙ্গে যদি খেলা খানিক না করিতে পারিলে, তবে তুমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইলে—আত্মবঞ্চনা করিলে—জন্মটা বিফলে গেল।

বিদিশা হইতে একটু পশ্চিমে নির্ব্বিন্ধ্যা। কূর্ম্মপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরমুখে চলিতে পড়িতেছে। নদীর খোলা ঢালু জমীর বশে যাইতেছে। দক্ষিণে উঁচা, যত উত্তরে যাইতেছে, ততই নীচু হইতেছে। নদীটি গিরিনদী, খাদটি বড় বড় পাথরে ভরা। স্রোতের জল যেন পাথরে পাথরে হোঁচট খাইয়া পড়িতেছে। যেখানে পাথর নাই, জল গভীর স্থিরভাবে চলিতেছে, তাহার মাঝে মাঝে ঘোল হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন বিলাসিনী তোমায় নাভি দেখাইতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রে নাভি দেখান নিষেধ। নির্ব্বিন্ধ্যা বড় বেহায়া, তাই নাভি দেখাইতেছে; হোঁচট খাইয়া পড়িতেছে; আর কি করিতেছে জান? চন্দ্রহার-ছড়াটা ঝমঝম্ করিয়া নাড়িতেছে। ও চন্দ্রহার পাইল কোথায়? কেন, ঐ যে হাঁসগুলা সারি দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল, তাহার সারিটি কেমন বাঁকিয়া চন্দ্রহারের মত

অর্দ্ধবৃত্তাকার বইয়া পড়িয়াছে দেখিতেছ না? স্রোতের মুখে কি ও সার ঠিক থাকে? তাহার পর আবার স্রোতের যত ধাক্কা লাগিতেছে, ততই হাঁসগুলা প্যাক্ প্যাক্ করিয়া হাদে শব্দ করিতেছে। চন্দ্রহারের শব্দটি কি ঐ রকম নয়? নির্ব্বিন্ধ্যা যখন তোমার জন্য এত পাগলিনী, তখন তোমার উহাকে বঞ্চিত করা কি উচিত? যদি বল, নির্ব্বিন্ধ্যা আমায় ডাকে কৈ?—আমি বলি, ঐ যে অত রঙ্গভঙ্গী—ও কি ডাক নয়?

স্ত্রীলোকে যাহাকে কামনা করে, সংস্কৃতে তাহাকে সুভগ বলে অর্থাৎ ladies' man. হে মেঘ, তুমি বড় সুভগ—সকল নদীই তোমায় কামনা করে। ঐ দেখ—সিন্ধু কৃষ্ণপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর হইতে উৎপন্ন হইয়া ঠিক সোজা খাড়া খাড়া উত্তরমুখে গিয়া চম্বলে পড়িতেছে। তোমার বিরহে বেচারা রোগা হইয়া গিয়াছে, একটি সরু জলধারামাত্র আছে। এপাশ হইতে দেখিতেছ না, উহা ক্রমে আরও সরু, আরও সরু, আরও সরু হইয়া একটা চুলের বিননীর মত হইয়া শেষে মিলাইয়া গিয়াছে। বিরহে বেচারা পাণ্ডাস হইয়া গিয়াছে—তীরতরু-সমূহের যত রাজ্যের শুকনা পাতা চড়ায় পড়িয়া আছে, বোধ হইতেছে, নদীটাই বিরহে পাণ্ডাস হইয়া গিয়াছে—তোমারই সৌভাগ্য। যাহার বিরহে রমণী এত কাতরা, তাহার চেয়ে সুভগ আর কে? দেখ, সে কত পতি-প্রাণা; এখন সে বেচারার ক্ষীণতা যাহাতে ঘুচে, সেটা করিয়া দাও—সে ত তোমরই হাত।

সিন্ধুনদী পার হইয়াই অবন্তী। সেখানে সকলেই বৃহৎকথা পড়িয়াছে। গ্রামবৃদ্ধেরা বৃহৎকথার গল্প —উদয়নের গল্প লইয়া দিনযামিনী যাপন করে। অবন্তীর রাজধানী বিশালা বা উজ্জয়িনী। এত সম্পদ আর কোথাও নাই। পূর্ব্বেই তোমায় বলা আছে, তুমি উজ্জয়িনী যাও। সে ত পার্থিব নগর নয়—সে যে স্বর্গের একটা খণ্ড—বড় শোভাময় খণ্ড —স্বর্গের খণ্ড পৃথিবীতে আসিল কিরূপে? যে সকল স্বর্গবাসী লোক পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তাঁহা-দের যে পুণ্যটুকু এখনও ক্ষয় হয় নাই, সেই পুণ্যটুকুর জোরে ঐ স্বর্গটুকু পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

সেখানে রমণীরা কেলিলীলায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শীতলস্পর্শ শিপ্রানদীর বায়ু তাহাদের ক্লান্তি দূর করিয়া দেয়। শিপ্রাবায়ু ফুটন্ত পদ্ম হইতে সৌরভ গায়ে মাখিয়া সুরভি হইয়া উঠে, আর সারসেরা সরোবরে যে অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিতে থাকে, সে ধ্বনিকে অনেক দূরে লইয়া যায়; অনেক দীর্ঘ করিয়া দেয়। শিপ্রাবাত যে কার্য্য ক'রে দেয়, তাহা আবার এক জন মাত্র করিতে পারে। সে কে? প্রিয়তম। তিনি কি করিয়া ক্লান্তি দূর করেন? প্রথম অঙ্গানুকূল কার্য্য করিয়া অর্থাৎ গা হাত পা টিপিয়া আর দলিত পুষ্পের পরিমল শুঁকাইয়া এবং অনেক মন-যোগান কথা কহিয়া—অনেক মনরাখা কথা কহিয়া, সে কথাও এত লম্বা ও এত মিষ্ট যে, কোথায় লাগে সারসের কূজন তাহার কাছে? তাঁহার এত খোসামোদের দরকার? এত ক্লান্তি ত তাঁহারই পূজায়, আবার খোসামোদ কেন?—ভবিষ্যতের আশায়—সেও বেশী দূর ভবিষ্যৎ নয়!!!

উজ্জয়িনী গেলে তোমার অনেক উপকার। রমণীরা ধূপ জ্বালাইয়া চুলে বাস দিবে, আর সেই ধূপের ধোঁয়া জানলা দিয়া বাহির হইয়া তোমার গায়ে লাগিবে ও তোমার দেহ পুষ্ট করিয়া দিবে। নিজের দেহটা স্বচ্ছন্দ হবে, Waltair এ যাইতে হইবে না। সেখানে বাড়া বাড়া তোমার অনেক বন্ধু আছে; তাহারা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তোমার সম্মানার্থ নৃত্য করিবে। যেমন বড় লোক আসিলে তাঁহার সম্মানার্থ বাইনাচ হয়, তোমার জন্য সেইরূপ ময়ূরনাচ হইবে। দেখিবে, উজ্জয়িনীর বড় বড় বাড়ীর কত শোভা— ফুলের গন্ধে সব তর—আর সব বাড়ীতেই সুন্দরীদের আলতাপরা পায়ের দাগ—বোধ হয় যেন, লক্ষ্মীপূজার দিনে বাড়ীময় লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পায়ের দাগ দেওয়া রহিয়াছে।

উজ্জয়িনীতে গন্ধবতী নদীর তীরে মহাকালের মন্দির। তুমি যখন সেখানে যাইবে, মহাদেবের প্রমথগণ একদৃষ্টে তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে। কারণ, তাহারা তোমার কুচকুচে কালরঙে মহাদেবের গলার শোভা দেখিতে পাইবে। তাই একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। মন্দিরসংলগ্ন একটি প্রকাণ্ড ফুলবাগান। গন্ধবতীর বায়ু পদ্মের গন্ধ মাখিয়া, পদ্মের রজ সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত করিয়া, আর যুবতীরা যে গন্ধতৈল মাখিয়া নাহিতেছেন, তাহার গন্ধ অপহরণ করিয়া বাগানের প্রত্যেক ফুলগাছ—প্রত্যেক লতা কাঁপাইতেছে।

হে জলধর, যদি অন্য সময়েও মহাকালের মন্দিরে উপস্থিত হও, তাহা হইলেও সূর্য্যদেব যতক্ষণ না অস্তাচলে যান, ততক্ষণ তোমার প্রতীক্ষা করা উচিত; কারণ, আরতির সময় মেঘগর্জ্জন হইলে তাহাতে আরতির ঢাকের কার্য্য করিবে। তোমার গর্জ্জন করা সার্থক হইবে।

আরতির সময় বেশ্যারা চামর ঢুলায়। তালে তালে তাহাদের পা নড়ে, তাহাদের চন্দ্রহারে ঝুন্-ঝুন্ শব্দ হয়। তাহাদের গহনার মণিমাণিক্যের শোভায় চামরের মণিবসান ডাঁটা ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর—স্ত্রীলোক ত—সুকুমার দেহ ত—খানিক চামর ঢুলাইলেই তাহাদের হাত ঝিমাইয়া আসে। যে হাতে রাত্রের নখের দাগ এখন একটু একটু চিড়্ চিড়্ করিতেছে, সেই হাত অবশ হইয়া আসে। সেই সময়ে—সেই মহেন্দ্র-যোগে—তুমি যদি সেই চিড়চিড় করা দাগের উপর দুফোঁটা টাটকা জল ফেলিয়া দিতে পার, তাহাদের শরীর জুড়াইয়া আসিবে। আর তাহারা, তুমি বড় রসিক বুঝিয়া আড়ে আড়ে আড়-নয়নে তোমার দিকে চাহিতে থাকিবে। কাজলপরা চোখের কোলে ঘোরাল কাল তারা দুইটি আসিয়া পড়িবে। প্রতি চাহনিতে বোধ হইবে, একটি কাল ভোমরা বাহির হইয়া গেল; ক্রমে একটা দুইটা করিয়া এক সার ভোমরা সে চোখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই সন্ধ্যার সময় মহাদেব তাণ্ডব-নৃত্য করেন, একটা টাট্‌কামারা হাতীর ছাল লইয়া তিনি নৃত্য করেন। রক্তাক্ত দিক্‌টা নীচের দিকে থাকে, আর শুকনা পিট্‌টা উপর দিকে থাকে। তিনি চার হাত—চার হাতই বলি কেন—হিন্দু ভাস্করেরা ইচ্ছানুসারে ঠাকুরদের হাত জোড়া জোড়া বাড়াইয়া দিতে পারিত—মেলা হাত তুলিয়া সেই চামড়াখান লুফেন আর লাফান। এ নৃত্য পার্ব্বতীর চক্ষুঃশূল—হাজার হোক স্ত্রীলোক ত, অত রক্তারক্তি ব্যাপার তাঁহার বড়ই গরপছন্দ। তাই বলিতেছিলাম, তুমি যদি পার্ব্বতীর প্রতি ভক্তি দেখাইতে চাও, তিনি স্নেহচক্ষে স্তিমিতনয়নে তোমায় দেখিবেন, ইহা যদি তুমি চাও, তবে গর্জ্জন করিও না; ডাকডোক ছাড়িও না। নীচের দিকে টাটকাফোটা জবাফুলের মত সন্ধ্যাকালে লালরঙ মাখিয়া মন্দিরের সামনে থাকিও; মহাদেব হাতীর চাম না লইয়া তোমায় লইয়াই নৃত্য করিবেন, পার্ব্বতী তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবেন।

রাত্রি গভীর হইলে 'পাট্যঞ্চলে বদনাবগুণ্ঠিত' ক'রে যখন মদনমনোমোহিনীরা নিজবাস পরিহার করত "প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা" হতে থাক্‌বেন, যখন রাজপথ নিরেট অন্ধকারে আবৃত, এমনি নিরেট, যে ছুঁচ ফুটান যায়, তখন তুমি একটি কাজ করিও—তোমার সৌদামিনীকে একটু প্রকাশ করিও—তাহাকে চঞ্চলা চপলা হইতে 'বারণ করিও—সে যেন তোমার গায়ে কষ্টিপাথরে স্বর্ণরেখার ন্যায় খানিক নিশ্চল হইয়া থাকে। অভিসারিকারা যেন পথ দেখিয়া লইতে পারে। দেখিও—সে সময়ে জল ঢালিও না—সে সময়ে গুড়্ গুড়্ শব্দে ডাকিও না—তাহারা, তুমি ডাকিলে,—একে অবলা—তাহাতে আবার পাছে কেহ টের পায়, সেই ভয়ে সদাই চকিতা—ভয়ে একেবারে হতবুদ্ধিদিশাহারা হইয়া যাইবে।

সৌদামিনী এরূপ দীর্ঘকাল প্রকাশ হওয়ায়, অনেকক্ষণ ঝিক্‌মিক্ করায়, ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন। আহা, সে ত তোমার চিরসঙ্গিনী রমণী, তাকে ত একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। তাই বলি, সে রাত্রিটা কোন উঁচা বাড়ীর চালে শুইয়া কাটাইয়া দিও। ওখানে কেহ তোমায় বিরক্ত করিবে না; করার মধ্যে পায়রাগুলা, তা তাহারাও ঘুমাইয়া আছে। তাহার পর সূর্য্য দেখা দিলে পুনরায় বাকী পথটুকু চলিয়া যাইবে। বন্ধুর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ভদ্রলোক ত কখন চুপ করিয়া থাকে না।

দেখ, সূর্য্যদেব একটি বড় খারাপ কাজ করিয়াছেন; তিনি তাঁহার প্রিয়রমণী নলিনীকে ফেলিয়া সারারাত কোথায় ছিলেন;—নলিনী বেচারা সারারাত কাঁদিয়া শিশিরের জলে ভরিয়া আছে। সকালবেলা অন্য লম্পট যেমন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দুই হাতে অভাগিনী বিবাহিতা পত্নীদের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া থাকে, আদর করে, সূর্য্যদেবও তেমনি আপনার সহস্রকরে নলিনীর চোখের জল মুছাইতে আসিবেন। তিনি দেবতা, যেমন বুঝিবেন, তেমনি করিবেন, তুমি যেন মাঝে পড়িয়া তাঁহার কর রোধ করিও না, তাহা হইলে সূর্য্যের সঙ্গে তোমার মিছামিছি ঝগড়া বাড়িয়া যাইবে।

এইবার গম্ভীরা নদী—জল কি স্বচ্ছ—তরতর করিতেছে; তলা দেখা যাইতেছে, যৌবনের প্রথম আরম্ভে ভাবুকের—কবির—প্রেমের প্রথম উদ্‌গমে প্রণয়িনী শকুন্তলার—হৃদয় এ জলের তুলনা পায় কি? তুমি ত সুভগ—অঙ্গনার কামনার বস্তু, তুমি ছায়ারূপে একেবারে গম্ভীরার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিবে। সে দেখিবামাত্র তোমায় তাহার নির্ম্মল হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবে। আর অতি চপল পুঁটিমাছগুলাকে উল্‌টাইয়া উল্‌টাইয়া লাফাইতে দিয়া তোমার প্রতি চঞ্চল-কটাক্ষে চাহিতে থাকিবে; এ কটাক্ষে কাল নাই; কুমুদ-ফুলের মত শাদা—সব শাদা; এ কটাক্ষের অর্থ জান ত—দেখিও যেন এই সময় জিতেন্দ্রিয় হইয়া

বসিও না ; দেখিও, তাহার সে উজ্জ্বল চক্ষের সে শাদা চাহনি নিষ্ফল করিও না।

হে সখে, তাহার খাদ অতি সরু ; তাহার খোলা প্রশস্ত ; খাদের জলের দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড বালির চড়া, আর পাড় খুব উঁচা ; পাড় হইতে ঘোরাল নীলরঙের বেতগাছ ঝুলিয়া বালির চড়ায় পড়িয়াছে ; একটু সম্মুখে উচ্চ হইতে চাহিয়া দেখিলে বোধ হইবে, খোলার দুই পাড় ক্রমে সরু হইয়া শেষ মিলিয়া গিয়াছে ; খাদের দুই পাড়ও অল্পের মধ্যেই ক্রমেই সরু হইয়া মিলিয়া গিয়াছে—এখন চড়াটার আকার কিরূপ হইয়াছে, বুঝিয়াছ কি ? আরও বলি, নদীটা কূর্ম্মপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর হইতে উৎপন্ন হইয়া ঢালু জমীর উপর দিয়া নীচু মুখে চলিয়া যাইতেছে আর তুমি সেই বিন্ধ্যের উপর হইতে দেখিতেছ, বুঝিয়াছ কি চড়ার চেহারাটা কি রকম হইয়াছে ? তোমার নদী নায়িকা যেন তাহার পিছনের দিকে জলের নীলাম্বরী হাত দিয়া গুটাইয়া রাখিয়া তোমায় ডাকিতেছে ; আমার অদৃষ্ট মন্দ—আবার দেরি হইবে। তুমি কি ও অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে ?

• -

আমারই অদৃষ্ট মন্দ ;—দেরী হইয়া উঠিবে দেখিতেছি। হা ভগবান্ !

দেবগিরি উজ্জয়িনী হইতে মান্দাশোর যাইবার পথে চম্বল নদের অবিদূরে একটি উঁচা পাহাড়। গম্ভীরার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যখন তুমি দেবগিরি যাইবে, তখন দারুণ গরম লুএর বাতাসের বদলে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকিবে। প্রথম জলের আছড়া পাইয়া পৃথিবী হইতে যে সোঁদা গন্ধ বাহির হইবে, বায়ু সে গন্ধ মাখিয়া মাতিয়া উঠিবে। হাতীগুলা গরমের চোটে অস্থির ; তাহাদের নাকের ভিতর গরমে জ্বলিয়া যাইতেছে ; শুঁড় তুলিয়া ঘড় ঘড় করিয়া সেই প্রথম ঠাণ্ডা বাতাস টানিতে থাকিবে, আর সেই ঠাণ্ডা বাতাসে সুদূর বিস্তীর্ণ যে যজ্ঞডুমুরের বন আছে, তাহার সব ফল পাকিয়া উঠিবে, ঠাণ্ডা মৃদু সুগন্ধে দেশ ভর হইয়া যাইবে। মগজ ভরিয়া যাইবে।

দেবগিরি কার্ত্তিকের চিরবাসস্থান। কার্ত্তিক বড় কম দেবতা নন ; সাক্ষাৎ মহাদেবের সন্তান। তুমি দেবগিরিতে গিয়া ফুলে ভরা মেঘ হইবে ; ফুলগুলি মন্দাকিনীর জলে ভিজাইয়া লইবে আর শ্রাবণের ধারার ন্যায় সেই ফুলের ধারাবৃষ্টি করিয়া কার্ত্তিককে স্নান করাইয়া দিবে।

কার্ত্তিকের একটি ময়ূর আছে। তাহার মত ভাগ্যবান্ আর কি কেহ জগতে আছে ? তাহার যদি একটি পাখ না খসিয়া পড়িল—সেই চাঁদওয়ালা চকচকে পাখ না যদি খসিয়া পড়িল, পার্ব্বতী অমনি—আহা কার্ত্তিকের ময়ূরের পাখা—বলিয়া তাহা কুড়াইয়া পদ্মের সঙ্গে মিশাইয়া কানে তুলিয়া লইলেন। এত ভাগ্য এ ভূভারতে আর কার আছে ? শুধু কি তাই—মহাদেব সে ময়ূরটিকে চখে চখে রাখেন, তাঁহার কপালের চাঁদের শাদা আলোয় তাহার শাদা চোখের একটা আশ্চর্য্য শোভা হয়। এমন যে ময়ূর, কার্ত্তিকের প্রিয়, শিবের প্রিয়, শিবার প্রিয়, তুমি তার—একটু নোটিশ নিও। তুমি গর্জ্জন করিও, সে গর্জ্জন গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইবে, আর সে ময়ূর তালে তালে নাচিতে থাকিবে।

কার্ত্তিকের পূজা সারিয়া তুমি ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকিবে। সিদ্ধ-সিদ্ধা যুগল-মিলনে আকাশপথে বীণা বাজাইয়া গান করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা—পাছে জল লাগিয়া তার বেসুরা মারিয়া যায়, তাই তোমার পথ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। তাহার পর তুমি চর্ম্মণ্বতীর মান রাখিবার জন্য ঝুলিয়া ঝুলিয়া নামিবে। চর্ম্মণ্বতী সামান্য নদী নহে। রন্তিদেব গোমেধযজ্ঞে এত গোবধ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের চামড়া হইতে ঝরিয়া পড়া রক্তে একটি নদী হয় ; চর্ম্মণ্বতী—সেই নদী।

চর্ম্মণ্বতীর প্রবাহ খুব বিস্তৃত ; কিন্তু তথাপি উপর হইতে—দূর হইতে—দেখিলে অতি ক্ষীণ দেখাইবে। দেখিবে, কোথাও বড় বড় পাথরের পাশ দিয়া কড় কড় করিয়া জল যাইতেছে ; কোথাও সড়াৎ করিয়া খানিকটা স্থির জল চলিয়া যাইতেছে ; কোথাও একটু উপর হইতে পড়ায় ফেনময় হইয়া যাইতেছে। ফেন-রাশি উপর হইতে মুক্তার মত দেখাইতেছে—নদীটি একটি মুক্তার হারের মত দেখাইতেছে। তাহারই মাঝখানে তুমি যদি চিকণ কালার রঙ্ চুরি করিয়া জল খাইতে নাম, গগনচারী দেবগণ নীচের দিকে চাহিয়া দেখিবেন—যেন মুক্তার মালায় একখানা বড় নীলমণি বসান রহিয়াছে।

চর্ম্মণ্বতী পার হইয়া দশপুর, এখন উহার নাম মান্দাশোর। দশপুর হইতে দশোর হইয়াছে। মহকুমা দশোর ক্রমে "মন্দ" অর্থাৎ সংক্ষেপ হইয়া মান্দাশোরে দাঁড়াইয়াছে। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা সাভিলাষ দৃষ্টিতে তোমায় দেখিবে। তাহাদের ভ্রূলতা সদাই কাঁপিতেছে—সে ভ্রূভঙ্গীতে কত হাব কত ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহারা উপরদিকে চাহিলে

প্রথম চখের শাদা রঙ, তাহার পর চখের তারার কাল রঙ ছুটিতে থাকে ; বোধ হয় যেন কতকগুলা কুঁদফুল উপরের দিকে ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে ; ভোমরাগুলা সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে।

তাহার পরে—অনেক পরে—ব্রহ্মাবর্ত্ত ; সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যে দেবনির্ম্মিত দেশ। আদিম আর্য্যভূমি—চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের উৎপত্তিস্থান। তুমি তাহার উপর ছায়াপাত করিয়া গমন করিবে। ক্রমে কুরুক্ষেত্র, তথায় আজিও সেই ঘোরতর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের চিহ্ন সকল বিদ্যমান আছে। এখানে, তুমি যেমন কমলবনের উপর জলধারা বর্ষণ কর, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন তেমনি ক্ষত্রিয়গণের মুখোপরি শরবর্ষণ করিয়াছিলেন।

জান ত, বলরাম কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া সরস্বতীতীরে যোগসাধনে মগ্ন ছিলেন। তখন তিনি মদের পিয়ালা ত্যাগ করিয়াছিলেন—যে পিয়ালায় রেবতীর চক্ষু প্রতিফলিত হইত—সে পিয়ালা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন কেবল সরস্বতীর জলই তাঁহার পিপাসা দূর করিত ; তুমিও সেই সরস্বতীর জল পান করিবে, সে পবিত্র জলে তোমার ভিতরটা শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কেবল বর্ণটা মাত্র কাল থাকিবে।

সেখান হইতে কনখল যাইবে। কনখলে দক্ষযজ্ঞ হয়। সে যজ্ঞের কুণ্ড এখনও আছে। পাণ্ডারা পয়সা পাইলে এখনও তথায় হোম করিতে দেয়। কনখলের নিকটেই, ২৩ মাইলের মধ্যেই গঙ্গা হিমালয় ছাড়িয়া সমতলে প্রবেশ করিতেছেন এবং সগরতনয়েরা স্বর্গে যাইবে বলিয়া সোপান-পরম্পরার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। হরিদ্বারের উচ্চতা সমুদ্রের জল হইতে ৫০০।৬০০ ফুট। সেখান হইতে যত উচ্চে যাইবে, দেখিবে, গঙ্গা ধাপে ধাপে উঠিয়াছেন ; ক্রমে ২২০০০ ফুট পর্য্যন্ত গঙ্গা উঠিয়াছেন। এই ধাপে ধাপে সগরতনয়েরা স্বর্গে গিয়াছেন। যেমন ধাপে ধাপে গঙ্গার জল নামিয়াছে, অমনি ধাপে ধাপে ফেনা রাশীকৃত হইয়া আছে। তুমি যখন উপর হইতে দেখিবে, বোধ হইবে, দুধারে উচ্চ উচ্চ পাড়ের মধ্য দিয়া গঙ্গার খোলা—তাহাতে দূরে দূরে রাশি রাশি ফেনা—যেন দুইটা ঠোঁটের মধ্যে কেবল হাসি ; ২২০০০ ফুট হইতে ৫০০ ফুট পর্য্যন্ত নামা পাহাড়ে এই হাসি দেখিলে বোধ হইবে, যেন মা গঙ্গা গাল কাত করিয়া বিদ্রূপের হাসি—সর্ব্বনেশে হাসি হাসিতেছেন। গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গা উপরদিকে—যে দিকে বিষ্ণুর পাদ হইতে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে—কমণ্ডলু হইতে শিবের জটায় এবং তথা হইতে হিমালয়ে পড়িতেছেন—তরঙ্গ-হস্ত বিস্তার করিয়া গঙ্গা মহাদেবের মাথার কেশ ধরিয়াছেন। তরঙ্গ, কপালে যে চাঁদের কলা আছে, তথায় আঘাত করিতেছে, দেখিল সতিনী গৌরী ঈর্ষ্যাকষায়িতলোচনে ভ্রূকুটি করিতেছেন, তাই গঙ্গা গাল কাত করিয়া হাসিতেছেন।

গঙ্গার জল শাদা—নির্ম্মল, ফটিকের মত শাদা। তোমার সহিত সুরগজের বেশ তুলনা হইতে পারে ; তুমি কাল। তুমি শুঁড়ের মত ডগ বাড়াইয়া জল খাও, তুমি যেখানে গঙ্গার জল খাইবার জন্য নামিবে, তথায় তোমার কাল ছায়া সেই শাদাজলে খেলিতে থাকিবে ; বোধ হইবে, প্রয়াগ ছাড়া আর এক জায়গায় গঙ্গা-যমুনার মিলন হইল।

ক্রমে উঠিয়া তুমি হিমাচলে যাইবে। ইনিই গঙ্গার পিতা ; ইনি বরফে সর্ব্বদা আবৃত। এই পর্ব্বতে উঠিয়া তুমি যখন বরফের চূড়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিবে, বোধ হইবে, যেন মহাদেবের ষাঁড়ের শিংএ পাঁক—এঁটেলামাটী লাগিয়া আছে।

তুমি দেখিবে, হয় ত সরল গাছের কাঁধে কাঁধে বেঁষ লাগিয়া দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফুলকি উড়িয়া চমরী মৃগের লেজে পড়িতেছে আর তাহার লেজটি পুড়িয়া যাইতেছে। যদি এরূপ দেখিতে পাও, তবে সহস্র সহস্র বারিধারা বর্ষণ করিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিও। বড় লোকের সম্পদের ফল কেবল বিপন্নগণের বিপদ্-নিবারণ।

সেখানে আটপেয়ে মৃগ আছে। তাহারা যদি লাফাইয়া তোমায় ডিঙ্গাইয়া যাইবার জন্য আসে, শিল, বৃষ্টি, ঝড়, অন্ধকার করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। বিফল কাজে চেষ্টা করিতে গেলে কাহার না অবমান হয় ?

সেখানে দেখিবে, পাথরের উপর স্পষ্ট মহাদেবের চরণচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। সিদ্ধগণ সততই সেখানে পূজা দিতেছে। তুমি ভক্তিভাবে ভোর হইয়া নীচে নামিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিবে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ পাদপদ্ম দর্শন করিলে ভক্তেরা দেহান্তের পর অবিনশ্বর গণপদ পাইবার অধিকারী হন।

সেখানে বড় বড় বাঁশ-গাছ আছে। সেই বাঁশে মাঝে মাঝে ছেঁদা আছে ; সেই ছেঁদার মুখে বায়ু বহিতে থাকিলে পোঁ ওঁওঁ ওঁ করিয়া শব্দ হয়। সেখানে কিন্নরী অর্থাৎ বাঙ্গালায় যাহাদের কান বলে (যথা মধো কান), তাহাদের স্ত্রীলোকেরা একযোগে

মহাদেবের মহিমাঘোষণার্থ ত্রিপুরবিজয় গাহিতেছে। ইহার উপর যদি মেঘ ডাকিতে থাকে—সে ডাক যদি কন্দরায় কন্দরায় প্রতিধ্বনিত হইয়া পাখোয়াজের কাজ করে, তাহা হইলে মহাদেবের গান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে। একেবারে Concert হয়।

হিমালয়ে অনেক দেখার জিনিস আছে। সে সব একে একে দেখিয়া 'ঞীতি পাসে' উপস্থিত হইবে। ১৬০০০ ফুটেরও উপর একটা পাস আছে, অতি উচ্চ দুইটা পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটা ঘুলঘুলি মত আছে, তাই দিয়া তিব্বতে ও ভারতে যাতায়াত চলে। সেই গলির—ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া তোমায় যাইতে হইবে। ঐ গলিই কি আগে ছিল? আগে উহা নিরেট পর্ব্বত ছিল। পরশুরাম বাণ মারিয়া পাহাড় ফাঁড়িয়া ঐ গলিটুকু বাহির করিয়া দেন।

এতক্ষণ তোমার যাবার মত প্রশস্ত অবাধ পথ পাইয়াছিলে, এখন আর তেমন পথ নাই। ঐ গলির ভিতর দিয়া তোমায় যাইতে হইবে। তুমি সহজে ডানা-মেলা পাখীর মত যাইতে পারিবে না। তোমায় কাত হইয়া যাইতে হইবে—আরও কাত—আরও কাত—আরও কাত হইয়া যাইতে হইবে। নারায়ণ বলিচ্ছলনাকালে যেমন একটা পা উঁচা করিয়া—তেরচা করিয়া দিয়াছিলেন, তোমায় তেমনি ভাবে যাইতে হইবে। এই পাস পার হইয়াই দেখিবে কৈলাস। সব শাদা—স্বর্গের রমণীগণের আর এখানে আরসীর দরকার হয় না। স্বচ্ছ বরফাবৃত কৈলাসই তাহাদের দর্পণের কাজ করে। তাহার বড় বড় শিখর—সব বড় বড় বরফাবৃত—শাদার উপর শাদা—গাদা গাদা শাদা—যেন কুমুদ-ফুলের রাশি চারিদিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। যেন মহাদেবের অট্টহাস, দিনকের দিন জমা করিয়া বড় বড় গাদা দিয়া রাখিয়াছে।

কাজলের রঙে চোখ জুড়াইয়া যায়; কাজলের ডেলা যদি ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, ভিতরের রঙ কতই নয়ন-রঞ্জন হয়, তোমার রঙ ঠিক কাজলের ডেলা-ভাঙ্গা রঙ; আর কৈলাসের রঙ কেমন? এইমাত্র যে হাতীর দাঁতটি চেরা হইল, তাহার ভিতরকার রঙের মত চক্‌চকে, চোখজুড়ান প্রাণ-জুড়ান শাদা। এই কাল তুমি যখন এই শাদা চূড়ায় বসিবে, তখন লোকে এক দৃষ্টে দেখিবে, যেন বলরামের বিরাট শাদা দেহে—কাঁধে নীলাম্বরী ফেলা আছে।

এখানে গিয়া যদি দেখ মহাদেব হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন, পাছে পার্ব্বতী ভয় পান বলিয়া সাপের বালা ফেলিয়া দিয়াছেন, আর পার্ব্বতী সে হাত ধরিয়া পদব্রজে ক্রীড়াশৈলে উঠিতেছেন, তবে এক কাজ করিবে। তোমার দেহমধ্যে যে জল আছে, সে জলকে স্তম্ভন করিবে; পর্ব্বত যে ভঙ্গীতে উঠিতেছে, সেই ভঙ্গীতে আপনার দেহটি পর্ব্বতের গায়ে বসাইবে। তুমি যেন একটা গদীপাতা সিঁড়ি হইবে; আর পার্ব্বতীর উঠিতে কোনই কষ্ট হইবে না।

বেদের মতে আর কালিদাসেরও মতে মেঘটা একটা জল-ভরা ভিস্তীর মত। তুমি হাতের কাছে আসিলে সুরযুবতীরা বালার হীরার খোঁচা মারিয়া তোমার গায়ে ছেঁদা করিয়া দিবে, তাহাতে তোমা হইতে সহস্র ঝারার ন্যায় জল পড়িবে। তোমার সঙ্গে যাহারা এরূপ কু-ব্যবহার করিবে, তুমি জল ঢালিয়া তাহাদের জব্দ করিবার চেষ্টা করিবে। যদি সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়, খুব গড়, গড়, গড়, গড়, গড় করিয়া, গর্জ্জিয়া উঠিবে। খেলা করিতে গিয়া তাহারা চাপল্য দেখাইয়াছে বৈ নয়; তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া উঠিবে।

তুমি মানসসরোবরের জল গ্রহণ করিবে। ঐ জলে সোনার শতসহস্র পদ্ম ফুটিয়া আছে। তুমি ঐরাবতের মুখে লাগিবে। মুখে কাপড় দিলে যেমন আনন্দ হয়, ঐরাবতের ক্ষণকাল তেমনি আনন্দ হইবে। যেমন বাতাসে কাপড় নড়ে, তেমনি তুমি কল্পদ্রুমের পাতাগুলি নাড়িবে। এইরূপে নানা প্রকারে—হে জলদ, তুমি সেই পর্ব্বতরাজকে উপভোগ করিবে।

সেই পর্ব্বতের ক্রোড়ে নগরী। পর্ব্বত যেমন উঁচানীচা হইয়াছে, সেই বশে পর্ব্বতগাত্রে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া নগরী হইয়াছে, বোধ হইতেছে, কোন রসিকা প্রণয়ী পর্ব্বতের ক্রোড়ে এলোথেলো হইয়া শুইয়া আছে। পাশ দিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। মেঘ দক্ষিণে একটু দূর হইতে—উচ্চ হইতে—দেখিতেছে, যেন একখানা আঁচলা পড়িয়া আছে। বোধ হইবে, এ আর কিছুই নহে—ঐ কামিনীর কাপড়খান; একটি কোণ মাত্র গায়ে ঠেকিয়া আছে। মেঘের সময়ে এই নগরের বড় বড় বাড়ীতে (যাহার ছাদ খোলার তৈয়ারী চালমাত্র) চালে মেঘ পড়িয়া আছে। খোলা বাহিয়া জলবিন্দু পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন, কামিনীকুলের নিবিড় কৃষ্ণ ঝাপটার কেশে মুক্তার মালা ঝুলিতেছে। এই নগর দেখিয়া তুমি উহাকে যে অলকা বলিয়া চিনিতে পারিবে না—এমত কথাই নহে।

এতদূরে পূর্ব্বমেঘের ব্যাখ্যা শেষ হইল। পূর্ব্বমেঘে সমস্ত জড়পদার্থই চৈতন্যময়। মেঘ চেতন,

রামগিরি চেতন, আম্রকূট চেতন, নর্ম্মদা চেতন, বেত্রবতী, নির্ব্বিন্ধ্যা, গম্ভীরা, গন্ধবতী সবই চেতন। নদীগুলি বিশেষ চৈতন্যময়, প্রেমময়, প্রেমোন্মাদময়। কালিদাস প্রতি কথায় তাহাদের চৈতন্য, বুদ্ধি ও হৃদয় দেখাইয়াছেন; তাহারা সকলেই মেঘের প্রেমে আকুল। প্রেমে আকুল হইলে মানুষে যাহা করিয়া থাকে—তাহারা সে সকলই করিতেছে; আমরা আর তাহাদিগকে জড় বলিয়া বুঝিতেই পারিতেছি না। এইরূপে কালিদাস রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া অলকা পর্য্যন্ত সমস্ত জড় জগৎকে চৈতন্যময় করিয়াছেন; যেন এই সমস্ত স্থানের নদনদী, পর্ব্বত, কন্দর, ভূচর, খেচর, জলচর, এমন কি, পুঁটি মাছটি পর্য্যন্ত যক্ষের দুঃখে দুঃখী,—যক্ষের বিরহে কাতর। যক্ষের দূত হইয়া মেঘ অলকায় যাইতেছে; সকলে মিলিয়া মেঘকে খুসী করিবার চেষ্টা করিতেছে; কেহ শিখরে স্থান দিতেছে; কেহ অট্টালিকার অগ্রদেশে ধারণ করিতেছে; কেহ জল দিয়া উহার দেহে বল জন্মাইয়া দিতেছে। কেহ বা জল বাহির করিয়া উহার গতিলাঘব সম্পাদন করিতেছে। সমস্ত জড় জগতে যেন কেমন একটা একপ্রাণতা জন্মিয়া গিয়াছে। মেঘটি যক্ষের প্রাণ—মেঘ যাইতেছে, আমরা যেন দেখিতেছি, যক্ষের প্রাণই ছুটিতেছে; আর যাহা কিছু দেখিতেছে আপনার উপযোগী করিয়া—আপনার করিয়া লইতেছে; আপনার প্রাণের সহিত—প্রেমময় আবেশময় ভাবের সহিত মাখিয়া লইতেছে। তাই জড়ের এত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। রঘুবংশের ত্রয়োদশে সমস্ত জগৎ, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, কানন যেমন রামসীতার পুনর্ম্মিলনে একটা আনন্দের, সুখের, স্বপ্নের ছায়ায় আনন্দময়, সুখময়, স্বপ্নময় হইয়া উঠিতেছে, মেঘদূতে তেমনি সমস্ত জগৎ যক্ষের বিরহে—যক্ষের ভোগলালসায়—যক্ষের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাইতেছে। রঘুর ত্রয়োদশে রাম আনন্দে বিভোর হইয়া—শত্রুনাশ হইয়াছে—সীতার উদ্ধার হইয়াছে,—জগৎ জুড়িয়া বীরকীর্ত্তি ঘোষণা হইয়াছে,—বংশের কলঙ্ক ক্ষালন হইয়াছে—তাই—আনন্দে বিভোর হইয়া সীতাকে জগৎ দেখাইতেছেন; জগৎও যেন সেই মহা আনন্দে বিভোর। যক্ষ বেচারা পরম আনন্দে ছিল। মনের মত মানুষ পাইয়াছিল, প্রেমে—সুখে—মোহে—আর মোহিনীতে মজিয়াছিল, হঠাৎ তাহার উপর ঘোর দণ্ডাজ্ঞা। সে একেবারে মরমে মরিয়া গেল। উহারা দেবযোনি, মানুষ ত নয় যে, প্রতিহিংসার চেষ্টা করিবে; কুবেরকে শিক্ষা দিবে। সে জানিল, এ শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে—এখন কেবল একটা সংবাদ দিয়া স্ত্রীটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। তাহার আর ভাবনা নাই; কেবল স্ত্রীর ভাবনা, সেই ভাবনা সে জগৎময় ছড়াইয়াছে।

রঘুবংশে রাম ও সীতা সশরীরে যাইতেছেন, তাঁহারা নারায়ণ ও লক্ষ্মীর অবতার; জড় জগৎ তাঁহাদের অনেক নীচে। তাঁহারা উপর দিয়া যাইতেছেন,—কখন মেঘের নীচে দিয়া, কখন মেঘের মধ্য দিয়া, কখন মেঘের অনেক উপর দিয়া যাইতেছেন। দেবতাদেরও যাঁহারা দেবতা, তাঁহাদের যেরূপ সরঞ্জামে যাওয়া উচিত; রামসীতাও সেইরূপ সরঞ্জামে যাইতেছেন। জড় জগৎ হইতে তাঁহারা অনেক দূরে—অনেক উপরে। তাঁহারা চৈতন্যেরও চৈতন্য। জড় জগৎ তাঁহাদের কাছে সামান্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর—খেলার জিনিস। আর মেঘদূতে যক্ষ বেচারা আপনার দুঃখমাখা, বিরহমাখা প্রাণটিকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার জড় দেহ কোথায় পড়িয়া আছে। সে ছুটিতেছে, সে অধিক উঠিতে পারিতেছে না, কিন্তু অনেক নীচে নামিতেছে। নদীর খোলায় পড়িতেছে, খাদে পড়িতেছে, জড় জগতের সঙ্গে মিলিতেছে, মিশিতেছে, এক হইয়া যাইতেছে। দুঃখ-দুর্ব্বলতা-সত্ত্বেও—প্রাণের কান্নাসত্ত্বেও—সে যেন জড় জগৎ উপভোগ করিয়া যাইতেছে। উপভোগ করিয়া যাইতেছেই বা বলি কেন? সে যেন সমস্ত জড় জগতের নিকট সমবেদনার মুষ্টি-ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছে। আর কবির কবি, কবিকুলের গুরু তাহার উপর সেই সমবেদনা ঢালিয়া দিতেছেন; জগৎময় তাহার জন্য সমবেদনার উৎস খুলিয়া রাখিয়াছেন।

উত্তরমেঘ

দেখ মেঘ, অলকায় বড় বড় অট্টালিকা আছে; তাহারা অনেক বিষয়েই তোমারই সমান হইতে পারে। দেখ, তোমার বিদ্যুৎ আছে, তাহাদের আছে রমণী,—বিদ্যুত-বরণী—চঞ্চল চরণে চলিয়া বেড়াইতেছে। যতবার চোখে পড়িতেছে, চোখ ঝলসিয়া যাইতেছে। তোমার রামধনু আছে, কত বিচিত্র রঙ—কেমন উজ্জ্বল, তাহাদের চিত্র আছে, কত বিচিত্র রঙ—কেমন উজ্জ্বল। পাহাড়ীরা ছবি বড় ভালবাসে; সবারই ঘরে ছবি আছে। পেকিন, টোকিও হইতে আরম্ভ করিয়া রোম, পারিস প্রভৃতি সকল দেশের ছবিই ইহারা সংগ্রহ করিয়া রাখে। নেপালে এক একবার 'তসবীর যাত্রা' নামে উৎসব হয়; ঐ উৎসবের দিন, নানাদেশের ছবি, যাহার যাহা আছে, আনিয়া কোন একটা গলির দুধারে টাঙাইয়া দেয়; আর দর্শকেরা দেখিতে দেখিতে গলির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। অধ্যক্ষেরা মন্দ ছবি টাঙ্গাইতে দেন না। তোমার গম্ভীর গর্জ্জন আছে—সে গর্জ্জনে কাহার না কান জুড়াইয়া যায়? তাহাদের আছে পাখোয়াজের আওয়াজ। অনেক সময় পাখোয়াজের আওয়াজ আর দূরস্থ মেঘগর্জ্জনের ইতর-বিশেষ করা যায় না। তুমি মেঘ, তোমার ভিতরে জলভরা, আর তাহাদের মেজেগুলি চন্দ্রকান্ত মণিময়; মণি হইতে অনবরত জলক্ষরণ হইতেছে। তুমি উচ্চ, আর অট্টালিকার অগ্রভাগগুলি—চূড়া—শিখরগুলিও উচ্চ; তুমি তাহাদের উপর উপর দিয়া চলিয়া গেলে বোধ হয়, তাহারা মেঘের তলদেশ লেহন করিতেছে।

শরতে পদ্ম ফুটে; অলকায় রমণীকুলের সবারই হস্তে পদ্ম আছে, তাহারা পদ্ম লইয়া খেলা করে। হেমন্তে কুন্দফুল ফুটে; তাহাদের নিবিড় কৃষ্ণ অলকের মাঝে মাঝে কুঁদফুলের ঝারি। শীতে লোধফুল ফুটে, লোধফুল বড় সাদা; তাহার পরাগ আরও শাদা, সেই পরাগ মাখিয়া উহাদের মুখের শাদারঙ আরও শাদা, চকচকে শাদা করিয়া তুলিয়াছে। বসন্তের একটা ভাল আসবাব কুরুবক—কেমন শাদা ও গোল; খোঁপার দুপাশে দুটি কুরুবক যেন দুটি শাদা প্রজাপতি উড়িতেছে। গ্রীষ্মে শিরীষফুল ফোটে; কেমন মৃদুগন্ধ, কেমন দেখিতে ছোট চামরটির মত; চামরের গোড়াটি একটু লালচে, সূতাগুলি শাদা, একটু হলুদের আভা আছে মাত্র, আর ডগটিতে কেমন একটু মোলাএম সবুজের আভা। শিরীষ কানে পরা; গালের উপর ঝুলিতেছে, আর মৃদুগন্ধে নাক ভরিয়া যাইতেছে। বর্ষার প্রধান সম্পত্তি কদমফুল খোঁপার দড়ি দিয়া সীঁতার উপর আটকাইয়া রাখিয়াছে। বধূরা নিত্যই ছয় ঋতুর ফুলে নিজ দেহ সুসজ্জিত করিতেছে।

অলকার বাড়ীর ছাদগুলি শাদা—চক্‌চকে শাদা—মার্ব্বেল পাথর দিয়া বাঁধান। সেই শাদা পাথরের ভিতরে আকাশের তারাগুলির ছায়া খেলিতেছে। বোধ হইতেছে, শাদা পাথর-বাঁধান ছাদে শাদা ফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে। সেই ছাদে বড় বড় যক্ষ মহাশয়েরা পরম রূপবতী রমণী লইয়া মধুপান করেন। এ যে সে মদ নহে। কল্পবৃক্ষ হইতে ইহার উৎপত্তি। ইচ্ছামাত্র তাঁহারা পাইতেছেন। তাঁহারা মধু পান করিতেছেন, সঙ্গে বরনারী; আর সেই সময় মেঘমন্দ্রে পাখোয়াজ বাজিতেছে। জমাটের পর জমাট হইয়া যাইতেছে।

এখানকার কিশোরীদের রূপই বা কি। দেবতারাও সে রূপের জন্য লালায়িত। এই যক্ষ-রমণীরা মন্দাকিনীর বালির চড়ায় মণি ফেলিয়া দেন, আর তাহার উপর সোণার বালি ছড়াইয়া দিয়া উহাকে লুকাইয়া ফেলেন, তার পর "খুঁজি খুঁজি নারি" করিয়া খুঁজিতে থাকেন। বায়ুদেব মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হন—এবং উঁহাদের সেবা করেন। বড় ক্লান্ত হইলে উঁহারা তীরবর্ত্তী মন্দারবৃক্ষের ছায়ায় ঠাণ্ডায় বিশ্রাম করেন। এই খেলা খেলিতে উঁহাদের সময় কাটিয়া যায়।

যক্ষ-রমণীদের ঠোঁট দুটি ঠিক দুটি তেলাকুঁচার মত। বড় মনোলোভা। সে অধরে দৃষ্টি পড়িলেই যক্ষ বাবুরা আস্তে আস্তে আসিয়া আদর করেন।

রমণী স্বতঃই লজ্জাশীলা; ভয়ে—লজ্জায়—প্রদীপ নিবাইবার চেষ্টা করেন। সম্মুখে যে কোন গুঁড়া জিনিস পান, প্রদীপের দিকে ফেলিয়া দেন; কিন্তু সে প্রদীপ নিভিবে কেন? সে যে রত্নের প্রদীপ, তেল-বাতির প্রদীপ ত নয়। তাঁহাদের সব চেষ্টা বিফল হয়, তাঁহারা সরমে মরিয়া যান; আর—তাঁহাদের কর্ত্তাদের জয়জয়কার।

সততগতি বায়ুর নাম। সেই বায়ু ঠেলিয়া ঠেলিয়া তোমার মত মেঘকে ঐ সকল অট্টালিকার উপরের তলায় লইয়া যায়। ঘরের ভিতর মেঘ ঢুকিলেই ছবিগুলির উপর বিন্দু বিন্দু জল দাঁড়ায়, সুতরাং উহাদের দোষ জন্মে। তখন তাহারা যেন ভয়ে ভীত হইয়াই—ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলিতে ফেলিতে জানালা দিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু গরাদেয় গরাদেয় ভাঙিয়া জর্জ্জর হওয়ায় বোধ হয় যেন ধূঁয়ার আকার ধারণ করিয়াই যাইতেছে। সংস্কৃতে কথাগুলি এমনি করিয়া সাজান আছে যে, তাহার ভিতর ভিতর আরও একটি মানে আছে।

তাহার উপরে উঠিতে পারেন না। চাঁদও এখানে সেইরূপ নীচে ঘোরেন, উপরে উঠিতে পারেন না।

এখানকার সৌখীন লোকের টাকার কমি নাই, তাহাদের বাড়ীর ভিতর এত নিধি আছে যে, তাহার ক্ষয় নাই। প্রত্যহ ইহারা নানারকম গল্প-গুজব করিতে করিতে কুবেরের সহরতলির বাগানে আমোদ আহ্লাদ করে। বাগানের নাম বৈভ্রাজ। এই বাগানে বড় বড় অপ্সরা তাহাদের সঙ্গে থাকে। আর কিন্নরীরা উচ্চৈঃস্বরে কুবেরের যশোগান করে। আহা, তাহাদের গলা কি মিঠা!

এখানে বিলাসিনীদের অঙ্গ-গ্লানি কিসে যায় জান? যখন দৃঢ় বন্ধনের পর—দৃঢ় আলিঙ্গনের পর—প্রিয়তমের হস্ত শিথিল হয়, আলিঙ্গনও ক্রমে ঢিলা হইয়া আসে, তখন রমণীকুলের দেহের ব্যথা কিসে নিবারণ হয় জান? না জান ত বলি, শোন। ঘরে বা খাটে যে চাঁদোয়া খাটান আছে, তাহার চারিদিকে ঝালর আছে; ঝালরের প্রতি সূত্রে চন্দ্রকান্ত মণি আছে। তুমি সরিয়া গেলে সেই মণিতে চাঁদের আলো লাগায় তাহা হ'তে জল পড়িতে থাকে। সেই জলে তাহাদের ক্লেশ নিবারণ হয়। এখানে একটা কথা আছে, যক্ষ যক্ষী শুইয়া আছে কোথায়?—বাহিরে চাদোয়া খাটাইয়া, অথবা ঘরের ভিতরে খাটের মাথায় চাঁদোয়া খাটাইয়া? অত শীতের দেশে প্রথম কথাটা বড় খাটে না। তাহা হইলে খাটের ঝালরে চাঁদের আলো লাগে কিরূপে? কৈলাস বড় উচ্চ, চাঁদ তাহার নীচে ঘুরে; তাই তাহার ঊর্দ্ধগামী কিরণ গিয়া খাটের ঝালরে লাগে। কুমারে এইরূপে পদ্ম ফুটানর কথা আছে। এ ব্যাখ্যাও মনোমত হইল না। কারণ, নিশীথে—চাঁদের আলো নীচে হইতে উপরে উঠিতে পারে না। তবে এক কথা—মহাদেবের মাথায় যে চাঁদের কলা আছে, তাহা হইতে কিরণ আসিয়া ছাদের কাছে যে ঝালর আছে, তাহাতে লাগিতে পারে, কারণ, মহাদেব বাহিরের বাগানে বাস করেন। এ কথাও ঠিক নহে, কারণ, মহাদেবকে দিয়া এ রকম কর্ম্মটা করান ঠিক নহে। তবে উহার ব্যাখ্যা এই যে, কৈলাসের চূড়া সূর্য্যকক্ষ চন্দ্রকক্ষেরও উপরে, সুতরাং উঁহারা যতই কেন উঠুন না, আলো নীচে হইতেই লাগিবে। সূর্য্যদেব সুমেরুর চারিধারে ঘোরেন। কখনও

মদন ঠাকুর মহাদেবের উপর জারি করিতে গিয়া একবার খুব ঠকিয়াছিলেন, সেই জন্যে মহাদেবের ত্রিসীমানার মধ্যে ভয়ে আর ধনুক ওঁছান না। মহাদেব অলকায় নিত্য বাস করেন—সুতরাং অলকায় মদনের সে ফুলধনু—সে গুন্ গুন্ করা ভোমরার ছিলা পড়িয়াই থাকে। তবে সেখানে মদনের এত আধিপত্য কিরূপে হয়? অলকায় প্রেমের ঢেউ—রসের তরঙ্গ—ভাবের লহর—কিছুরি অভাব নাই। এসব কিসে হয়? কিসে হয় বলিব? চঞ্চল সুন্দরীদের ঠমক-চমকওয়ালা হাবে ভাবে। তাঁহারা যখন ভুরু নাড়িয়া নয়ন-বাণ ঝাড়িতে থাকেন, তখন কোন্ সহৃদয় পুরুষ সে বাণে বিদ্ধ হইয়া পাঢুটি গোট করিয়া বাণে বিদ্ধ পক্ষীর মত ভূতলে লুণ্ঠিত না হয়?

কুবেরের দেশ এমনি আশ্চর্য্য দেশ, কিছুরই জন্য খাটিতে হয় না। কল্পবৃক্ষ আছেন। যা চাও, তাই দেন। কেবল চাওয়ার পরিশ্রম। চাহিবামাত্র বোম্বে সাড়ী, বারাণসী চেলি, পার্শী সাড়ী। চাহিবামাত্র সাম্পেন, রোজালিন প্রভৃতি গোলাপী নেশার মদ—যে মদে প্রাণটা খুলে, মনটা ছুটে, চক্ষুটা ঢল ঢল করিতে থাকে, অথচ নেশায় বুঁদ হয় না। চাহিবামাত্র নানা ফুল—একেবারে পাতা দিয়া তোড়াবাঁধা। চাহিবামাত্র সব রকম গহনা। চাহিবামাত্র তরল আলতা, পায় দিলেই হয়, কচলাইবার দরকার নাই; পদ্মফুলের মত পায়ে বুড়া আঙুল দিয়া লাগাইলেই হয়। চাহিবামাত্র যাতে যাতে রমণীর মন খুলে, প্রাণ খুলে, দেহে শোভা হয়, সে সবই এক কল্পবৃক্ষই দিয়া থাকেন।

সেই অলকায়—হায়, আমি এখন কোথায়? আর সে সুখের অলকাই বা কোথায়? সেই সুখের

অলকায়—কুবেরের রাজবাড়ীর একটু উত্তরে—তোষাখানা, পিলাখানা, আস্তাবল, কম্পাউণ্ড ছাড়াইয়া আরও উত্তরে আমার বাড়ী—তুমি অনেক দূর হইতে সে বাড়ী দেখিতে পাইবে। তাহার গেটটি অতি উচ্চ। গেটের দুই থামের উপরে প্রকাণ্ড গোল খিলান। তাহাতে কত চিত্র-বিচিত্র করা, যেন একটি রামধনু। সেই গেট দেখিলেই তুমি চিনিতে পারিবে। যদিই না পার—দেখিবে, দ্বারের পাশে একটি চারা মন্দারের গাছ। সেটি আমার গৃহিণীর পালক পুত্র। তিনি নিজে জল দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন। এখন তাহাতে থোলো থোলো ফুল ফুটিয়াছে। ফুলের ভরে গাছটি নুইয়া পড়িয়াছে। হাত বাড়াইলেই সে ফুল তোলা যায়। এই মন্দারগাছ দেখিলেই আমার বাড়ী তুমি চিনিতে পারিবে।

উহার মধ্যস্থলে একটি দীঘী। দীঘীতে সানবাঁধান সিঁড়ি। কিসের সান জান? সবুজ মণি দিয়া সান বাঁধান—বড় বড় সবুজ মণি। সবুজ মণির বড় বড় পাথর—তাই দিয়া ঘাট বাঁধান। দীঘীতে রাশি রাশি সোণার পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। বৈদূর্য্য নামে নীলমণিতে পদ্মের নাল তৈয়ারী হইয়াছে। হাঁসগুলা এই দীঘীতে এত আনন্দে—এত উল্লাসে—এত প্রেমে ভোর হইয়া বাস করে যে, কাছেই মানসসরোবর—সেখানে যাইতেই চাহে না। সেই দীঘীর পাড়ে একটি ছোট পাহাড়—আহা! সে আমাদের ক্রীড়ার ভূমি—মোলায়েম নীলমণি দিয়া তাহার চূড়া তৈয়ারী হইয়াছে। আর সেই পাহাড়ের চারিদিক বেড়িয়া সোণার কদলীবন। মরি রে—দেখিলে চোখ সেইখানে পড়িয়াই থাকে। তাহার কথা মনে হইলে এই দুঃখের দিনে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সে পাহাড়টি আমার গৃহিণী বড় ভালবাসেন। যখনই দেখি তোমার নীলদেহের পাশ দিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে, আমার সেই নীল পাহাড়ের কথা মনে পড়ে—সেই সঙ্গে গৃহিণীর কথা মনে পড়ে—মনটা উদাস হইয়া যায়। উহারই কাছে কাছে একটি মাধবীলতার কুঞ্জবন। একটি লতা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক জমি ঘেরিয়া একাই একটি কুঞ্জ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চারিদিকে আবার কুরুবকের বেড়া, আর তাহারই নিকটে একটি অশোক গাছ। শাদা ফুলের অশোক নয়—লাল ফুলের অশোক। থোকো থোকো ফুল উচা-মুখ হইয়া ফুটিয়া আছে। পাতার গোড়ায়, ডালের গায়ে, গুঁড়ির উপর লাল থোকো ফুল উচা দিকে মুখ করিয়া ফুটিয়া আছে। তাহার উপর গরদের সাড়ীর মত পাতলা অথচ শাদা, চটাল অথচ ঈষৎ রক্তাভ নূতন পাতাগুলি আসিয়া পড়িয়া ঢাকা দিয়া ফেলিয়াছে। বাতাসে সেই নূতন পাতাগুলি নড়িতেছে আর ভিতর হইতে সেই ফুল এক একবার দেখা যাইতেছে, আর এক একবার লুকাইতেছে। বল দেখি কেমন দেখাইতেছে? বুঝিয়াছ কি, কেন কবিরা রক্তাশোককে উদ্দীপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন? এই রাঙা ফুলের থোলোগুলাকে ঐ ভাবে দেখিলে মনটা খারাপ হয় না কি? মাধবীলতাকুঞ্জের পাশে একটি রাঙা অশোক ফুলের গাছ, আর একটি বকুলের গাছ, চিরদিনই সবুজ—চিরদিনই দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।

যক্ষ বলিতেছেন—ইহার মধ্যে একটি চান যে, তোমার সখী আমার সঙ্গে গিয়া উহাকে বাঁপায়ের লাথি মারেন; আর একটি চান যে, তোমার সখী উহার গায়ে মদের কুলকুচা করিয়া দেন। সংস্কৃত কবিকুল মনে করেন—স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহারা বলেন—যে, যুবক-যুবতী একত্র গিয়া অশোক গাছের কাছে দাঁড়াইলে পর, যুবতী যদি বাঁ পায়ের লাথি মারে, তাহা হইলেই তাহার ফুল হয়। আর মদের কুলকুচা না দিলে বকুলগাছের ফুল হয় না। এ কার্য্য কারণভাবটা ঠিক নয়; তবে কবিরা এ কথা বলেন কেন? সংস্কৃত কবিরা বড় দুষ্ট, বড় বাচাল, তাঁহারা অশোকপাতার লুকোচুরিটি বেশ তারাইয়া তারাইয়া বুঝিয়াছিলেন। এখন বল দেখি, সন্ধ্যার সময় যদি কোন যুবক-যুবতী অশোকগাছের কাছে যায়, আর যুবক যদি ডান হাতের আঙুল হেলাইয়া যুবতীকে ঐ লুকোচুরি ব্যাপারটা দেখাইয়া দেয়, যুবতী কি করেন? আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, তিনি "পোড়ার মুখ আর কি, আর মরণ নাই" বলিয়া গাছটিকে একটি বাঁপায়ের লাথি মারিয়া ছুটিয়া পলায়ন করেন, সে রাত্রে অন্ততঃ যুবকের কাছে মুখ দেখাইতে পারেন না। কবিরা কার্য্যকে কারণ করিয়াছেন আর কারণকে কার্য্য করিয়াছেন মাত্র। কথাটা ঠিকই বলিয়াছেন। বকুলের গন্ধটাও মহুয়ার মদের গন্ধের মত। বোতলে থাকা মদ নহে, পিয়ালায় থাকা মদ নহে, কুলকুচা করা মহুয়ার মদের মত উহার গন্ধ। তাই দুষ্টকবি একটা কার্য্যকারণভাব ঘটাইয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া রাখিয়াছেন।

এই গাছ দুইটির মধ্যে একটি সোণার খোঁটা পোতা। তাহার উপরে একখানি স্ফটিকের তক্তা।

পাছে খোঁটাটি স্ফটিকের ভরে পড়িয়া যায়, তাই সে খোঁটার গোড়াটি বেশ করিয়া বাঁধান। কি দিয়া বাঁধান? মণি দিয়া বাঁধান। মণির রঙ কেমন? বাঁশের কোঁড়ের মত। খুব টাট্‌কা কোঁড়ের রঙ ফিকে, সে রকম নয়। খুব উঠিয়া গেলে কোঁড়ের রঙ বড় ঘোরাল হয়, সে রকমও নয়। ইহার মাঝামাঝি অবস্থায় যখন মোলাএম সবুজ রঙের ছটায় বাঁশবনের কমনীয় কান্তি হয়, সেই সময়ের কোঁড়ের মত রঙ। সেই তক্তায়—

"শিখী যথা কেকাভাষী সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়,
তাহারে নাচায় প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া
রুনু রুনু বাজে তার বালা।
স্মরিলে সে সব কথা মরমে জনমে ব্যথা
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।"

হে মেঘ, বেশ করিয়া মনে গাঁথিয়া লও—আমি যে সকল লক্ষণের কথা বলিলাম—মনে গাঁথিয়া লও। এই সব লক্ষণ দেখিলেই তুমি আমার বাড়ী চিনিয়া লইতে পারিবে। আরও দেখিবে—আমার বাড়ীর গেটের পাশে একটি শঙ্খ ও একটি পদ্ম আঁকা আছে। আমি এখন সে বাড়ীতে নাই, তাহার কি আর সে শোভা আছে? সে কান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য অস্তে গেলে কমলের কি আর কমলের মত শোভা থাকে?

সে বাড়ীতে যাবার সময় তুমি চট করিয়া ছোট হইয়া যাইবে। যেন শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পার। ঠিক যেমন আজ তোমায় দেখিতেছি—তুমি রামগিরির নিতম্বে পড়িয়া আছ—ঠিক এমনইটি হইবে। বরং ইহার চেয়েও ছোটটি হইবে। আমার খেলাবার ছোট পাহাড়টিতে বসিবে। তাহারও কেমন নিতম্ব আছে—তাহার উপর বসিবে। সেইখানেই বসিয়া একটু একটু বিদ্যুৎ ফুটাইয়া, একটু একটু আলো করিয়া বাড়ীর ভিতরে দেখিতে থাকিবে, এমনি ভাবে দেখিবে, যেন এক সারি জোনাকি বসিয়া টিপ্ টিপ করিতেছে। এইরূপ ভাবে দেখিলে আমার পত্নীকে দেখিতে পাইবে। আমি দূরদেশে আসিয়া পড়িয়া আছি, আর যে বেচারা—আহা, আমরা দুটি চকাচকীর মত থাকিতাম—চকা হারাইয়া চকীর মত পড়িয়া আছে। তাহার মন বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে। দুঃখ ঘনীভূত হইয়া তাহাকে দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। শিশির পড়িতে আরম্ভ করিলে পদ্মের ঝাড় যেমন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, তাহার সে পদ্ম, সে গৌরব, সে নীল পাতা, সে শাদা মৃণাল কিছুই ঠিক থাকে না; আমার গৃহিণীও ঠিক তেমনি হইয়া গিয়াছেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে। আহা, সে কান্নার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—গরম নিশ্বাস অবিরাম পড়িতেছে, তাহার অধরোষ্ঠের সে টুক্‌টুকে লাল রঙ আর নাই। ফ্যাকাসে—পাঁশুটে হইয়া গিয়াছে। বাঁহাতে মুখখানি রাখিয়া ভাবিতেছেন। ঝাপটাগুলা লম্বা হইয়াছে—ঝুলিয়া পড়িয়াছে—ডানি দিকের ঝাপটাগুলা মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে মুখ আর তেমন দেখাইতেছে না; তাহার সবটি দেখাই যাইতেছে না। তুমি পিছু লাগিলে চাঁদ বেচারার যেমন দুর্দ্দশা হয়, সে মুখেরও আজি তেমনি দুর্দ্দশা হইয়াছে।

তুমি সেই ছোট পাহাড়টির উপর বসিয়া একটু একটু বিদ্যুৎ খুলিয়া মিট মিট্ করিয়া চাহিয়া যখন ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে দেখিতে থাকিবে, তখন সে তোমার চোখে পড়িবে। কি ভাবে পড়িবে, বলিতে পারি না, হয় ত, সে আমার কল্যাণে ঠাকুরদেবতার পূজা করিবে বলিয়া তাহারই সাজপাট করিতেছে। না হয়—এক জায়গায় নির্জ্জনে বসিয়া একমনে—বিরহ ভুগিয়া আমি কেমন রোগা হইয়া গিয়াছি, তাই ভাবিয়া ভাবিয়া—সেই রকম আমার একখানি ছবি আঁকিতেছে। হৃদয়-পটে চিরাঙ্কিত আমার মূর্ত্তি—কত রোগা হইয়াছে, একমনে ভাবিয়া, একমনে ধ্যান করিয়া—সে রোগা মূর্ত্তিটি চোখের সাম্নে ধরিয়াছে—আর সেইমত ছবি উঠাইতেছে। অথবা পিঁজরায় একটি সারী পাখী আছে—সে খাসা পড়ে,—তাহার কাছে গিয়া—দুঃখের সময় অন্যের কাছে যাইতে ভাল লাগে না, মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে—সারি! তুই ত প্রেমরসের রসিক, তুই ত ভালবাসা ভুলিবার পাত্র নহিস্, সে ত তোকে এত ভালবাসিত, তার কথা কি তোর মনে পড়ে? আহা, সেই নির্বান্ধব পুরী-মধ্যে এ দুঃসময়ে যক্ষিণীর কথার দোসর কেহ নাই, তাই সে সারিকার সঙ্গে প্রাণপতির কথা কহিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে যাইতেছে। কালিদাস সমস্ত মেঘদূতে যক্ষ অথবা তাহার পত্নীর একটা সখাসখীর নামও করেন নাই—এত গভীর বিরহে সখাসখী ভালই লাগে না—তাই বলেন নাই। এ সময়ে একা একা ধ্যানই ভাল,—তাহাতে যেন একটা ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি হয়, যেন দুজায়গায় দুটি মন, দুটি হৃদয়, ফোকস্ করিয়া বসিয়া থাকে, আর খবরাখবর লইতে থাকে

ও পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত করিতে থাকে। অথবা দেখিবে, সে একটি বীণা লইয়া আপনার কোলে রাখিয়াছে। বিরহিণী এক-বস্ত্রা—সে কাপড় -আট-মাসে কাল হইয়া গিয়াছে—ময়লা হইয়া গিয়াছে। সেই ময়লা কাপড়ের উপর বীণা রাখিয়া গলা ছাড়িয়া গান করিতে যাইতেছে। কিসের গান? কে সে গান বাঁধিয়া দিল? কীর্ত্তনের সে পদ কোন্ মহাজন রচনা করিল? সে মহাজন আর কেহ নহে—সে নিজেই। সে গানে আর কিছুই নাই—কেবল আমার নামে পূর্ণ। সে পদে কেবল বলে, "নাথ হায় হায়" আর "নাথ এস এস।" এই গানে এক পালা মস্ত কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়, গান যেমন ধরিল, সুর যেমন উঠিল, অমনি চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল, সে জল গড়াইয়া বীণার তারে লাগিল। তার খ্যাংখেতে হইয়া গেল। কষ্টে সে জল মুছিয়া সে দোষ সারিয়া লইল। ফের গাইতে গেল, কিন্তু সুর আর জমিল না; সে তার কাটিয়া গিয়াছে,—সে মূর্চ্ছনা ভুলিয়া গিয়াছে। আবার চেষ্টা করিল—আবার তাই হইল। আবার তাই—আবার তাই—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল—বীণা রাখিয়া দিল।

কিম্বা দেখিবে—সে কপাটের পাশ হইতে কতগুলা শুক্না ফুল টানিয়া লইয়াছে আর মাটীতে ফেলিয়া তাই গণিতেছে। এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, দশ, কুড়ি, এক শ, দু শ, দু'শ চল্লিশ। যে দিন প্রথম বিরহ হইয়াছে, সেই দিন হইতে সে রোজ একটি করিয়া ফুল ঐ চৌকাঠের পাশে ফেলিয়া রাখে—আর গণে,—গণিয়া দেখে—বিরহের কত দিন হইল—আর কত দিন বা বাকী আছে। অথবা দেখিবে, সে মনে মনে ধ্যান করিতেছে—আমি তাহার কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছি, আর সে একমনে একপ্রাণে আমার সেবায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছে, বলিতেছে, নিষ্ঠুর, আমায় ফেলিয়া এত দিন কোথায় ছিলে? বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমার কণ্ঠে লগ্ন হইতেছে। তুমি যে কি ভাবে তাহাকে দেখিবে, তাহার ঠিক নাই, তবে যেমন বলিলাম, ইহার কোন না কোন এক ভাবে দেখিবেই দেখিবে। কেন না, প্রাণপতি কাছে না থাকিলে রমণীরা এই রকম কাজেই আপনাদের মন ঠাণ্ডা রাখে।

দেখ ভাই, দিনের বেলায় তবু তার কাজকর্ম্ম আছে—কতকটা অন্যমনস্ক হইতে পারে; বিরহের যন্ত্রণা কতক—যৎসামান্য পরিমাণে ভুলিতে পারে। কিন্তু রাত্রে—আহা, তাহার যন্ত্রণার পার নাই—তাহার শোকপারাবার উছলিয়া উঠে—মন কিছুতেই শান্ত হয় না। তাই বলি ভাই, তুমি সেই অট্টালিকার ঝরকায় বসিয়া—গভীর রাত্রে তাহাকে দেখিবে—তাহার সহিত দেখা করিবে—সে সাধ্বী—পতিপ্রাণা—সে মেঝেতে পড়িয়া আছে, আর ঠায় সারারাত্রি জাগিতেছে—একটিবারও চোখ পালটিতে পারিতেছে না। গভীর রাত্রে দেখা করিতে বলিতেছি কেন জান? সে সময়টা না কি বড় যন্ত্রণার সময়, সে সময়ে যদি তুমি তাহাকে আমার সংবাদ দাও—তাহার কতকটা সান্ত্বনা হইতে পারে, তাহার হৃদয়ের ভার কতক লাঘব হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম—জানালায় বসিয়া গভীর রাত্রে তাহার সঙ্গে দেখা করিও।

দেখিবে, মনের কষ্টে সে রোগা, পাতলা, ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। যেমন প্রকাণ্ড কাল ময়লা আকাশে পূবের দিকে—যেখানে আকাশ পৃথিবীতে ঠেকিয়াছে—সেইখানে এক কলা চাঁদ পড়িয়া থাকিলে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিন শেষ রাত্রে সে চাঁদ দেখিয়া সহৃদয় লোকের চোখে জল আসে, তেমনি সেই ময়লা বিছানার—বিরহে ভাল বিছানায় শুইতে নাই—বিছানা বদলাইতে নাই—একধারে পাশ ফিরিয়া ধনুর মতন বাঁকিয়া পড়া সেই শীর্ণা রমণীকে দেখিয়া তুমি শোক সম্বরণ করিতে পারিবে না। হায়, সে তখন কি করিবে? দেখিবে, কেবল কাঁদিতেছে—চোখের জলে বালিস ভাসিয়া যাইতেছে—গরম জল পড়িয়া বালিস হইতে ভাপ উঠিতেছে। রাত্রি আর পোহায় না—ক্রমেই যেন বাড়িয়া যাইতেছে। আর সে ভাবিতেছে, হায়! আমাদের একদিন ছিল সারা-রাত্রেও কুলাইত না, কোথা দিয়া রাত্রি কাটিয়া যাইত, টেরও পাইতাম না। আর এখন এ কি বিপরীত হইয়াছে! এ জ্বালা কিসে জুড়াই?

চাঁদের আলো আমাদের পুরাণ বন্ধু। কেমন ঠাণ্ডা ছিল, বোধ হইত, দেহে যেন অমৃতধারা ঢালিয়া দিত। যাই—তাহার কাছে পড়ি গিয়া—সে হয়ত তেমনি করিয়া শরীর জুড়াইয়া দিতে পারিবে। এই ভাবিয়া—ঝরকা দিয়া যে চাঁদের আলো আসিতেছিল, তাহার উপর গিয়া পড়িল—তখনি ফিরিল—ফল উল্টা হইল। চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, চোখের জলে চোখের পাতাগুলা পুরু হইয়া আসিল। বড় খেদে চক্ষু বুজিবার চেষ্টা করিল, সে চক্ষু বুজিলও না, খোলাও রহিল না, মাঝামাঝি—না এদিক্ না ওদিক্ হইয়া রহিল। সে চক্ষু স্থলপদ্মের মত বিস্তৃত ও বিশাল। দিন হইয়াছে অথচ সূর্য্যদেব মেঘে ঢাকা। এ অবস্থায় স্থলপদ্ম যেমন ফুটিতেও পায় না, মুদিতেও

পায় না, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, আমার গৃহিণীর চক্ষুও চাঁদের আলোর কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই ভাব হইয়া রহিল।

গৃহিণী বিরহে তেল মাখিয়া স্নান করিতে পারেন না, রুক্ষ নাহিয়া নাহিয়া তাঁহার ঝাপটার চুলগুলা শক্ত হইয়াছে ফর্ফরে হইয়াছে—গালের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গরম দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে—ঠোঁট দুটি আউসিয়া যাইতেছে—সেই নিশ্বাসের বাতাসে ঝাপটার ফর্ফরে চুলগুলা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর স্বপ্নে আমার সঙ্গে দেখা হইতে পারে, এই ভরসায় নিদ্রার আরাধনা করিতেছে, কিন্তু নিদ্রা কোথায় আসিবে? চক্ষু ত তাহার স্থান। জল আসিয়া চক্ষু ভরিয়া রহিয়াছে, বরং প্রবাহরূপে বহিয়া যাইতেছে। এ চক্ষে নিদ্রার জায়গা নাই। নিদ্রা আসিয়াও জায়গা পাইতেছে না।

বিরহের প্রথম দিন খোঁপা বাঁধা হইয়াছে। বিনা দড়িতে শুদ্ধ গিরা দিয়া, আর বিননি করিয়া চুল বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে—ভরসা, শাপের অন্তে—বছর পুরিয়া গেলে—আমি গিয়া সেই খোঁপা হাসিতে হাসিতে খুলিয়া দিব। কিন্তু এখন তাহার কি দশা হইয়াছে। তাহাতে জট পড়িয়াছে, শক্ত ঘুঁটের মত হইয়াছে—খস্খসে—এব্ড়ো-খেব্ড়ো হইয়াছে। চুল বাড়িয়া গিয়াছে—সেটা ঝুলিতেছে, ঘুরিয়া আসিয়া গালের উপর পড়িতেছে—তাহার স্পর্শ আর সেরূপ সুখকর নহে, এখন সেটা কাঁটার মত ফুটিতেছে। সুতরাং গালের উপর হইতে সেটাকে সরাইতে হইতেছে। কি দিয়া সরাইবে? হাত দিয়া। সে হাতেও আবার বড় বড় নখ হইয়াছে। বিরহিণীকে কামাইতে নাই। রুক্ষ মাথা, চুলের গোড়াগুলা কুট্কুট্ করিতেছে, চুলের আগায় শক্ত খোঁপা নড়্-নড়্ করিতেছে, সেটি গালের উপর পড়িয়া ছুঁচের মত বিঁধিতেছে—হাত দিয়া সরাইতে গেলে চুল নখে বাধিতেছে, তাহা গোড়া শুদ্ধ টান পড়িতেছে। কি যে একটা সর্ব্বাঙ্গে চিড়্বিড়্ চিড়্বিড়্ করিয়া উঠিতেছে, তাহার আর বর্ণনা করা যায় না।

মেঘ, তোমার ভিতরটা জলে ভরা, বড় ভিজা। যাদেরই অন্তঃকরণ ভিজা, তারাই বড় দয়ালু। তাই তুমিও বড় দয়ালু। তুমি যখন তাহাকে দেখিবে, তাহার একখানিও গহনা গায়ে নাই। সে ননীর পুতলী—এই শোকে, এই দুঃখে, সে আর তার দেহ-ভার বহিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কত দুঃখে—কত কষ্টে সে শয্যার ক্রোড়ে দেহলতা ফেলিয়া রাখিয়াছে। হাতটি নাড়িতে যেন তার বড় কষ্ট। তাহাকে দেখিলে তোমার দয়ালু-হৃদয় গলিয়া যাইবে, আর তুমি চোখের জল ফেলিবে, নূতন জলের বড় বড় ফোঁটা পড়িতে থাকিবে।

আমি জানি, তোমার সখা আমার প্রতি বড় স্নেহবতী—প্রেমবতী—সেটি আমার দৃঢ় সংস্কার—সেই জন্যই প্রথমবারের বিরহে তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। তুমি মনে করিও না, "গৃহিণী বড় ভালবাসেন" বলিয়া আমার মনে মনে বড় গুমর আছে, তাই আমি তোমার সঙ্গে এত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এত বকাবকি করিতেছি। তুমি মনে করিও না, আমি মনে মনে "মনকলা' খাইয়া বসিয়া আছি, কাজে কিন্তু আর একরূপ হইয়া গিয়াছে—অথবা আমি মিছে ফাজিলামী করিতেছি মাত্র। এ সকল কথা তুমি মনে করিও না, কারণ, আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্তই অল্পকাল পরেই তোমার প্রত্যক্ষ হইবে। তখন আপনার চক্ষে দেখিয়া আমার কথায় তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে।

তুমি যখন তাহার নিকটে যাইবে, তাহার চোখের উপর-পাতা নাচিতে থাকিবে। চোখের উপর-পাতা নাচিলে মিলন হয়। তুমি মিলনের দূত—তাই তাহার চোখের উপর-পাতা নাচিবে। আহা, সে চোখের উপর-পাতা নাচিলে বড়ই সুন্দর দেখাইবে। সে চোখে কত কাল যে কাজল পড়ে নাই—তাহার ঠিক নাই। তাহার সে চক্চকে তেলাল ভাব আর নাই। চারিদিকে ঝাপটাগুলা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ পাশের দিকে সেগুলার বড় প্রাদুর্ভাব। তাই আর আড়-নয়নে চাহনি নাই। স্ফূর্ত্তি নাই বলিয়াও আড়-নয়নে চাহনি নাই। মধুপান কত দিন বন্ধ হইয়াছে। তাই মদ খাইলে জ্রর যে খেলা ছিল, যে বিচিত্র ভঙ্গী ছিল, যেরূপ সরস-ভাবে নড়ন-চড়ন ছিল—তাহার কিছুই নাই। সমস্ত চোখটা কেমন একটু স্থির—কেমন একটু গম্ভীর,—কেমন একটু করুণ,—কেমন একটু খসখসে হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আবার যখন উপরপাতাটি নাচিতে থাকিবে, বোধ হইবে যেন ভিতরে মাছ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আর তাহার ধেঁস লাগিয়া পুষ্করিণীর জলে ভাসা পদ্মটি একটু একটু নড়িতেছে। শুধু যে চোখের উপরপাতা নাচিবে, এমন নহে, বামউরুও নাচিবে। বামউরু-স্পন্দন হইলে প্রিয়-সমাগম হয়। তুমি গেলে—আবার যে তিনি আসিবেন, সে ভরসা হইবে, তাই উরু নাচিবে। কলার গাছ দেখিয়াছ? শুকনা বাসনা সব ফেলিয়া দিলে কাঁচা খোলায় ঘেরা কলার গাছ দেখিয়াছ কি?

তাহার রঙ দেখিয়াছ—কেমন চকচকে শাদা; দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়—এমন কলার গাছ দেখিয়াছ কি? তবে তোমার সে উরু কেমন—তাহার কতকটা ধারণা হইবে। * * * মুক্তা-জালে সে উরু বেড়িয়া থাকিত, এখন আর তাহা নাই। বিধি বাম, সব গহনার সঙ্গে সে মুক্তা-জালও চলিয়া গিয়াছে। আহা, পরিশ্রমের পর সে উরু আমি কত দিন স্বহস্তে টিপিয়া দিয়াছি। এখন সে সব কথা মনে হইলে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। তুমি গেলে আবার সে উরুতে স্পন্দন হইবে।

হে মেঘ, সে সময়ে সে যদি একটু ঘুমাইয়া থাকে,—সে যদি একটু সুখে নিদ্রা যায়,—প্রহরখানেক অপেক্ষা করিও, উহার পাশেই বসিয়া অপেক্ষা করিও। গড়্‌-গড়্‌ হড়্‌-হড়্‌ করিয়া ডাকিও না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও। ঘুমাইলেই সে স্বপ্ন দেখিবে। স্বপ্ন দেখিলেই আমায় দেখিবে। আমায় দেখিলেই গাঢ় আলিঙ্গন করিবে। উহার ভুজলতা আমার কণ্ঠে দৃঢ় বদ্ধ হইবে। এই ভাবে প্রহরখানেক থাকিতে দিও। তার পরে জাগাইও। যদি আগে জাগাও, সব বৃথা হইয়া যাইবে।

তাহাকে নাড়িয়া চড়িয়া—ধাক্‌কাধুক্‌কি দিয়া উঠাইও না। আস্তে আস্তে বাতাস চালাইয়া দিও। তোমার জলকণায় সে বাতাস শীতল করিও। ঠাণ্ডা বাতাস—জল ভরা বাতাস লাগিলে যেমন মালতী ফুলের কুঁড়িগুলি আস্তে আস্তে খুলিতে থাকে, আমার গৃহিণীর চক্ষুও তেমনি খুলিবে। দেহে যেন প্রাণ আসিবে। সেই সময়ে তোমার বিদ্যুৎ যেন ঝল্‌সায় না। তুমি আস্তে আস্তে গর্জ্জন করিয়া বলিতে থাকিবে। আর তুমি যে ঝরকায় বসিয়া থাকিবে, সে একদৃষ্টে সেই ঝরকার দিকে তাকাইয়া থাকিবে। তুমি অতি ধীর, বিচক্ষণ, তোমায় বলিয়া দিতে হইবে না। সে অতি অভিমানিনী—কোন অনুচিত কথা যেন তাহাকে বলিও না।

কি বলিতে থাকিবে? প্রথমেই "অবিধবে" বলিয়া সম্বোধন করিবে। এইয়োস্ত্রী বলিলে সে বুঝিবে—তাহার কপাল এখনও ভাঙ্গে নাই। তাহার পর বলিবে—"আমি তোমার স্বামীর প্রিয় মিত্র—আমি মেঘ—অর্থাৎ আমি নিজেও ঠাণ্ডালোক, তোমায় ঠাণ্ডা করিবার জন্য তোমার স্বামী আমায় তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন।" তাহার পর বলিবে —"আমি তোমার কাছে আসিয়াছি। তোমার স্বামীর মঙ্গল-সংবাদ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে; তাই লইয়াই আমি তোমার কাছে আসিয়াছি। আমি তোমার মত বিরহিণীদের বড় বন্ধু। বিদেশস্থ নাগরকুল যখন বাড়ী আসিবার পথে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন আমি গুড় গুড় স্বরে ডাকিতে থাকি, আর সে বেচারারা বিরহিণী গৃহিণীকুলের খোঁপা খুলিবার জন্য অর্থাৎ বিরহব্যথা দূর করিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠে; আর তাহাদের পথে বিশ্রাম করা হয় না। তাহারা তাড়াতাড়ি তল্পি তুলিয়া উধাও হইয়া বাড়ীমুখে ছুটে।

তোমায় আর বেশী বলিতে হইবে না। এই কয়টা কথা বলিলেই সে মুখ উঁচা করিয়া তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে। এক কালে গাছের উপর মর্কট বানরের মুখে রামের সংবাদ পাইয়া সীতা যেমন মুখ উঁচা করিয়াছিলেন, সেও সেইরূপ মুখ উঁচা করিবে। উৎকণ্ঠায় তাহার হৃদয় এত পূর্ণ হইবে যে—যেন সে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। সে তোমায় দেখিবে—তোমার অভ্যর্থনা করিবে—আর তার পর তুমি যা কিছু বলিবে—সমস্ত কান পাতিয়া শুনিবে। কেন না—স্বামীর কোন প্রিয়-সুহৃদের কাছে যদি তাহার কুশলসংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে বড়ই আশ্বাস হয়। স্বামী কাছে আসাও যা, আর এরূপ সংবাদ পাওয়াও প্রায় তাই-ই।—বাস্তবিকও অনেক দিনের উৎকণ্ঠার পর এমন একটা খবর পাইলে হৃদয়ের অনেক লাঘব হয়।

হে মেঘ, আমার কথামত এবং তোমার আত্মীয়-আত্মীয়ার উপকারার্থ তাহাকে এই কথা বলিবে;—"তোমার সহচর এখন রামগিরির আশ্রমে রহিয়াছেন। তিনি প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন। তিনি নিজে বিরহে দারুণ কষ্ট পাইতেছেন। তাই হে অবলে—অর্থাৎ এত যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা তোমার আছে কি না, এই ভয়ে তোমার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। জীবন হইলে মরণের মত সুলভ আর কিছুই নাই; সকলকেই মরিতে হইবে; কখন্ কে মরে, ঠিকানা নাই। তাই সকলের আগে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, 'ভাল আছ ত?'

"আহা, সে কত দূরে পড়িয়া আছে। কত দূরে—ধারণাই হয় না। আসিবে যে—তাহারও যো নাই। বিধি বাম। আসার পথ একেবারে বন্ধ। সে—দিন-রাত—মনে মনে কতই আশা করিতেছে—কতই সংকল্প গড়িতেছে—ভাঙিতেছে—সে মনে মনে আপনার দেহ তোমার দেহে মিশাইয়া দিতেছে; তাহার নিজ দেহ ক্ষীণ, সে মনে মনে তোমার দেহও ক্ষীণ হইয়াছে স্থির করিয়া মানস চক্ষের সামনে তোমার তেমনি একটি ক্ষীণ দেহ

রাখিয়া তাহাতে মিশাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার নিজের দেহ গাঢ় তপ্ত, সে মানসপটে তোমার একটি গাঢ় তপ্তদেহ আঁকিয়া তাহাতে আপনার অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছে। তাহার চক্ষের জলই দিন-রাত্রের সম্বল, সে মনে মনে তোমারও সেইরূপ একখানি ছবি আঁকিয়া আপনাকে তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দিতেছে। তাহার নিজের উৎকণ্ঠার পার নাই, সে ভাবিতেছে—তোমারও উৎকণ্ঠার বিরাম নাই—তাই মনে মনে তোমার উৎকণ্ঠায় আপনার উৎকণ্ঠা মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিতেছে। তাহার দীর্ঘ নিশ্বাস ক্রমাগত পড়িতেছে, সে ভাবিতেছে,—হৃদয়ের আবেগে তোমারও বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, তাই সে মনে মনে তোমার বুকের উপর আপনি পড়িয়া তাহাতে লয় হইয়া যাইতেছে।

"যে কথা অনায়াসে চেঁচাইয়া বলা যায়, সে কথাও সখীদের সামনে তোমার কানে কানে বলিবার জন্য সে চঞ্চল হইত। কারণ, তাহা হইলে কপোলে কপোল স্পর্শ হইবে। এই স্পর্শের লোভে লোক দেখিলেই তোমার সঙ্গে কানে কানে কথা কহিতে যাইত। যতই কাছে আসিতে পারে, ততই আনন্দ, এতটুকু তফাৎও তাহার সহিত না।

"কি বিধির বিড়ম্বনা, এখন সে, যতদূর পর্য্যন্ত কানে শোনা যায়—তাহার বাহিরে—যতদূর চোখে দেখা যায়—তাহারও বাহিরে—কতদূরে গিয়াছে—তাহার ঠিকানাই নাই। বড় উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তাই পদ্যরচনা করিয়া এই সব কথা বলিয়া এতদূর পাঠাইয়াছে। কানে কানে প্রাণে প্রাণে বলিয়াও তৃপ্তি হইত না, আরও ভিতরে যাইতে—দুটিতে এক হইতে ইচ্ছা হইত, এখন তাহারই একটি দূর হইতে—আমি এক জন অপরিচিত,—আমার মুখে তোমায় খবর দিতেছে—এই সকল কথা বলিয়া দিয়াছে, মন দিয়া শোন।"

"যখনি দেখি প্রিয়ঙ্গুলতা দুলিতেছে, পাঁচ ছ হাত উঁচা, না বৃক্ষ, না লতা, না গুল্ম, এমন একটি তরু, ডালগুলি লতাইয়া ঘুরিয়া নীলবর্ণ পাতায় ডুবিয়া বায়ুভরে নড়িতেছে, হঠাৎ মনে হয়, প্রিয়ার হাত-পা দেখিতেছি। চঞ্চলসুন্দরীর অঙ্গলতা হাব-ভাব বিকাশ করিতেছে। যখনই দেখি, হরিণ তাড়া পাইয়া চকিত হইয়া ছুটিতেছে—আর তার ঢলঢলে চোখ আরও ঢলঢলে হইতেছে, হঠাৎ মনে হয়—প্রিয়ার সেই চঞ্চল চক্ষু দেখিতেছি। চাঁদের দিকে হঠাৎ চক্ষু গেলে মনে হয়—সে আমার সেই মুখখানির ছায়ামাত্র—যখন দেখি, ময়ূরের পেখম গুটান রহিয়াছে—আর ভারে ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মনে হয়, সে মাথায় চুলের রাশি দেখিতেছি, গিরিনদী বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট ঢেউগুলি নানা ভঙ্গীতে নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছে, মনে হয়—সে মুখের ভুরু দুটি বার বার নানা ভঙ্গীতে নাচিতেছে। কিন্তু কোথাও সে মুখের—সে শরীরের—সে কমনীয় দেহের একটা আদরা মাত্রও দেখিতে পাই না। মনে হয়—তিনি রাগ করিয়া আছেন, আমায় দেখা দিবেন না, সে প্রেমময় ছবির একটা আব্‌ছায়াও আমায় দেখিতে দিবেন না।

নাই বা দিলেন, আমারও হাত আছে, আমিও ত দেবযোনি, চিত্রবিদ্যা আমার সিদ্ধবিদ্যা, কুবের সেটা ত কাড়িয়া লইতে পারেন নাই, আমি যাতে তাতে তাঁহার একটা ছবি আঁকিব। একটা গেরিমাটীর ঢেলা কুড়াইয়া লইলাম, একখানা বড় পাথরে তোমার একটা ছবি আঁকিলাম, মানময়ী ছবি আঁকিলাম, যেন তুমি রোষভরে চলিয়া যাইতেছ—সেই ভাবে ছবি আঁকিলাম; আর তোমার মান ভাঙ্গিবার জন্য 'দেহি পদপল্লবমুদারম্‌' বলিয়া তোমার পায়ে ধরিবার জন্য পড়িলাম, অমনি চোখে জল আসিল, চোখ জলে ভরিয়া গেল, আর কিছু দেখিতে পাইলাম না; সুখের আশা করিতেছিলাম—ভাঙ্গিয়া গেল। বিধি বাম—এ ভাবেও যে ক্ষণিক মিলন হইবে, তাহার সেটাও সহ্য হইল না, নিষ্ঠুর খল বিধাতা আমায় পাগল করিয়া তুলিল।

ছবিও দেখিতে পাইলাম না। আবছায়াও দেখিতে পাইলাম না। ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, ঘুম আসিল, স্বপ্ন দেখিলাম, স্বপ্নে তোমায় পাইলাম, গলা জড়াইয়া ধরিলাম, গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম। বাহু দুটি উঁচা করিয়া হাত দুটি বাধাইয়া তোমায় বাঁধিয়া বুকে করিয়া রাখিয়াছি, আমি ত স্বপ্নে বেশ আছি, কিন্তু বনদেবতারা—ক্ষেত্রপালেরা—শূন্যে আমার গাঢ় আলিঙ্গন দেখিয়া চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। টপ্‌ টপ্‌ করিয়া শিশির পড়িতেছে। সে ত শিশির নয়—তাঁহাদের চক্ষের জল। সে জল ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া পড়িতেছে।

এমনি ফাকায় ফাকায় তোমার সঙ্গে আমার মিলন হইতেছে। উত্তরদিক্‌ হইতে—বরফের পাহাড় হইতে—যখন বাতাস দক্ষিণমুখে আসিতে থাকে—দেবদারুর রেখাকার পাতাগুলি প্রথম অঙ্কুরের সময় জড়ান ছিল, সেই বাতাসে তাহা একটি একটি করিয়া ছুটিতে থাকে। দেবদারুর আটা পড়ে, তাহার গন্ধ মাখিয়া সে বায়ু মাতোয়ারা হয়,

আর মাতালের মত বহিতে থাকে, আমি দৌড়িয়া গিয়া সেই বায়ু বুকে লাগাই। ভরসা—সে হয় ত তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। লোকে আপনার জনের কত কি তুলিয়া রাখে, বড় দুঃখের সময় এক একবার সেগুলি দেখে—আর সেই কথা মনে করে। কাপড় রাখে, বিছানা রাখে, জুতা রাখে, জামা রাখে, আংটী রাখে, চুল রাখে, কত কি রাখে। আমার প্রবাসে আপনার জনের কিছুই সঙ্গে নাই, তাই ভাবি—যদি গায়ের বাতাসটাও পাই—তাই ছুটাছুটি করিয়া বাতাস ধরিতে যাই, সে বাতাস বড় কন্‌কনে, তবুও তাহি ধরিতে যাই।

তোমার বিরহে আমার বড়ই যন্ত্রণা হইয়াছে, সর্ব্বশরীরে জ্বালা করিতেছে। আমার কেবল প্রার্থনা—রাত্রি কিসে ছোট হয়, কিসে এক ক্ষণের মত সারা রাতটা কাটিয়া যায়। কিন্তু তা ত হয় না, জ্বালায় ঘুম হয় না। তিন প্রহর বৈ রাত্রি নয়, কিন্তু এক এক প্রহর যেন এক এক যুগ হইয়া পড়িয়াছে। আমার কেবল প্রার্থনা—দিনের তাত্ একটু কম হয়, রৌদ্রটা একটু নরম হয়, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত সবকালেই একটু একটু নরম হয়। কিন্তু একে দেহের জ্বালা, তাহাতে ভীষণ রৌদ্রের প্রখর তাপ, দিনের বেলায় আগুন ছুটিতে থাকে, আমার প্রার্থনা কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। ক্রমে অসহায়—হতাশ—উদাস হইয়া পড়ি, কাহার আশ্রয় লইব, কোথায় যাইব, কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারি না—বুক দমিয়া যায়, মন ভাঙ্গিয়া যায়, হাত পা আসে না। আবার মনে হয়, মানময়ী মানিনী আমার, চঞ্চল চক্ষু মিট্ মিট্ করিয়া আড়ে আড়ে আমার দুর্দ্দশা দেখিতেছেন, আর মনে মনে হাসিতেছেন।

আমি ত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দিয়া কোনরূপে এতদিন বাঁচিয়া আছি—কোনরূপে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আছি—মঙ্গলময়ি, তোমার মঙ্গলেই যখন আমার মঙ্গল, তুমি ভালবাস বলিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। তুমিও অত কাতর হইও না, বিরহসাগরে আপনাকে ভাসাইও না। পৃথিবীতে কাহার সুখ চিরদিন থাকে? কাহার সুখের স্রোত একটানা বহিয়া যায়? কাহারই বা দুঃখ চিরস্থায়ী হয়? কাহারই বা সকল রাত্রে অমাবস্যা ঘোর করিয়া থাকে? মানুষের দশা চাকার মত ঘুরে, চাকার যেখানটা এখন সকলের নীচে, এখনি আবার সেইখানটা সকলের উপরে উঠিবে, সেই রকম সুখ আর দুঃখ যেন একটা চাকার উল্টা দিকে বাঁধা আছে, কখন সুখ উপরে উঠে দুঃখ নীচে যায়, কখন বা দুঃখ উপরে উঠে, সুখ নীচে যায়।

দেখ, নারায়ণ শয়ন হইতে উঠিলেই আমার শাপের শেষ হইবে। আর চারটি মাস আছে—চোখ বুজিয়া এই চারিটা মাস কাটাইয়া দাও। তার পর—শয়ন উঠিলে, উত্থান একাদশী শুক্লপক্ষ—শরতের শুক্লপক্ষ—কি চাঁদের আলো—মেঘের লেশমাত্র নাই—জ্যোৎস্নায় দিক্ ভরিয়া যাইবে, যেন পুরু জ্যোৎস্না চারিদিকে ছাইয়া ফেলিবে। সেই শরতের রাত্রে সেই গাঢ় জ্যোৎস্নায়—এক বৎসরের যত ক্ষোভ মিটাইয়া লইব। মনে মনে যত সংকল্প করিয়া রাখিয়াছি—সব সিদ্ধ করিয়া লইব। যত আশা করিয়া রাখিয়াছি—সব পুরাইব। রাশি রাশি আশা করিয়া রাখিয়াছি—সব মিটাইয়া লইব।

মেঘ বলিতে পারে, "আচ্ছা, আমি যে তোমার তরফ হ'তে তার কাছে যাব, তার একটা নিদর্শন দাও, যে সে চিনিবে, নহিলে সে যদি আমায় আমলই না দেয়।" তাই যক্ষ বলিতেছে—পাগলের এমন নাড়ীজ্ঞান—যে যাবার সময় একটা নিদর্শন দেওয়া দরকার। নিদর্শন লইয়া কবি কিছু গোলে পড়িলেন। হনুমান্ রামের আংটী লইয়া গিয়াছিলেন। মেঘ কি লইয়া যাইবে? যক্ষের আছেই বা কি? যক্ষ না হয় একখানা পাথরের উপর দুচারটা অক্ষর লিখিয়া দিতে পারিত, মেঘ ত আর পাথরখানা বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না! তাই কৌশলী কবি একটা নূতন পথ বাহির করিলেন। যক্ষ জানে আর তাহার স্ত্রী জানে, এমন এক রাত্রের ঘটনা নিদর্শনের স্বরূপ তাহাকে এই বলিয়া দিলেন। বলিলেন—শুন মেঘ, তাহাকে গল্পটি করিও, তাহা হইলে সে তোমায় আমার দূত বলিয়া চিনিবে। বলিবে, "একদিন বিছানায় তুমি আমার গলাটি জড়াইয়া বেড়াবেড়ি করিয়া শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলে, হঠাৎ ডুকরিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিলে। আমি বারবার জিজ্ঞাসা করিলে তুমি মনে মনে হাসিয়া উত্তর দিলে, 'ঠক্ জুয়াচোর! আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তুমি আর এক জনের সঙ্গে বিহার করিতেছ।' মেঘ যখন এত খবর বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে, এ নিদর্শনটা ঠিক বহিয়া লইয়া যাইবে। আর এ নিদর্শন পাইলে তাহারও নির্ঘাত বিশ্বাস হইবে।

মেঘ যেন যক্ষপত্নীকে সম্বোধন করিয়া—যক্ষের কথা কোট করিয়া বলিতেছে, "আমি যে তোমায় নিদর্শন দিলাম, তাহা হইতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, আমি ভাল আছি। হে অসিতনয়নে—কৃষ্ণ-আঁখি, আমি জানি,

তোমার চক্ষু কাল বলিয়া তোমার মন কাল নয়। লোকে আমার নামে নানা কলঙ্ক রটনা করিবে, বলিবে—পয়সাওয়ালা লোক—বিদেশে প'ড়ে আছে—বছর ঘুরে আসে—সে কি অমনি আছে?" এ কলঙ্ক রটনা শুনিয়া তুমি আমায় অবিশ্বাস করিও না। বাজে লোকে বলে "অদর্শনে বিষময় ফল ফলে," "প্রেমবন্ধন দৃঢ় করিতে চাও, সূতা খাট কর" ভাবে বিচ্ছেদ হইল, শুধু দিন কত চখের আড় হইলে—বিনা কারণে বা কোন অব্যক্তকারণে হৃদয়ের বন্ধন শিথিল হয়, ভালবাসা উপিয়া যায়, আর স্নেহ শুকাইয়া যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস—গাঢ়প্রণয়স্থলে, বিরহে কেবল ভোগ বন্ধ হয় মাত্র, প্রেম জমা থাকে; জমিয়া জমিয়া জমিয়া ভাণ্ডার ভরিয়া যায়। সে প্রেম কিন্তু আর কাহারও জন্য নহে—সেই তাহারই জন্য—সেই চিরবাঞ্ছিতেরই জন্য। ভোগ না হওয়ায় প্রেম ত জমা থাকেই—আরও একটি উপকার হয়, রস পাক হইয়া জমাট হয়, স্বাদ বৃদ্ধি হয়। যাহারা উল্টা বোঝে বা উল্টা বলে, তাহারা প্রাকৃত জন, তাদের কথায় কান দিও না।

গৃহিণীর আমার এই প্রথম বিরহ—তাই তাঁর যন্ত্রণা বড় বেশী। তাই আগে গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দাও, তাহার পর সে পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিও। সেখানে ষাঁড়ের প্রাদুর্ভাব বেশী, মহাদেবের একটা ষাঁড় তার শিখরগুলা উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। ষাঁড়ের দেশ না হ'লে—এমন প্রেমিক-যুগলের বিচ্ছেদও ঘটায়? সেখানে বেশীক্ষণ থেকো না, চট ফিরে এসো। সে আমায় কি বলে—সেটা আমায় ব'লে যেও। তারও একটা নিদর্শন দিয়া যেও, তার মঙ্গল সংবাদ দিয়া যেও, সকালবেলা কুন্দফুলগুলি যেমন বোঁটা আল্‌গা হইয়া পড়পড় হইয়া থাকে, আমার জীবনও প্রায় তেমনিই হইয়া আছে। একটা মঙ্গল সংবাদ গেলে বোঁটার আবার জোর হয়।

ওহে তেলকুচ্‌কুচে কাল মেঘ, বন্ধুর মত আমার ছোট উপকারটি করিবে বলিয়া স্বীকার করিলে কি? তুমি ধীর, তাই কথা কহিতেছ না, জবাব দিতেছ না, তাহাতে আমি অবশ্য মনে করিব না যে, তুমি আমার কথা কানে তুলিলে না—কারণ, চাতকেরা যখন জল চায়, তুমি কিছুমাত্র শব্দ কর না, অথচ তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, তাহাদের জল দাও। কেহ কিছু চাহিতে আসিলে ভদ্রলোকে তাহার সে কাজটি করিয়া দেয়—তাহার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দেয়—সেই তাহার উত্তর। উত্তর দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি কিছুই নাই।

আমি তোমার কাছে বড় অন্যায় প্রার্থনাই করিলাম, জানা নাই, শুনা নাই, এরূপ প্রার্থনাটা উচিত হয় নাই, তবে যাই হোক ভাই, ভালবাসার খাতিরেই হোক—অথবা "আহা, বেচারা বড় কষ্ট পাইতেছে" এই বলিয়া দয়া করিয়াই হোক, আমার এই উপকারটা করিয়া তোমার যেখানে ইচ্ছা যায়, ভাই, সেই দেশে যাও। বর্ষায় তোমার শোভা বৃদ্ধি হোক। আশীর্ব্বাদ করি—তোমার যেন বিদ্যুতের সঙ্গে একক্ষণের জন্যও—এ রকম—আমার মতন—বিচ্ছেদ না ঘটে।

সমাপ্ত

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই প্রণীত

বাঙ্গালা ভাষা

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা এক জন লণ্ডনী ককনী বা এক জন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেকদিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরাজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল;—একটির নাম সাধুভাষা, অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক্ বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য * গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তক প্রণয়ন সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরাজীতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা

* পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত—এখনও হইতেছে। বোধ হয়, আজিকালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে; চণ্ডীদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য অথবা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং বৃত্রসংহার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা কেবল বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধেই বর্ত্তে। যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্য্যকরী। অতএব পদ্যের রীতি ভিন্ন হইলেও এই প্রবন্ধের প্রয়োজন কমিল না।

লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং ফোঁটা কাটা অনুস্বরবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক বা না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতা হেতু, বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরাজীতে সুশিক্ষিত। ইংরাজীতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্কতরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

সেই দিন হইতে সাধুভাষা এবং অপর ভাষা দুইপ্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা তাঁহাদিগের বড় ঘৃণ্য। মদ্য, মুরগী এবং টেকচাঁদি বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাঁটী সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা; তাহাই গ্রন্থাদিতে ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার করা হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরাজী জানেন না—পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরাজী বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন।* আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি আলালের ঘরের দুলাল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শ-স্বরূপ হইতে পারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেঁচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচ জন বয়স্যের সহিত আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতা-পুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত-মুখে কখনই ও সকল

* যে যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। যিনি এক ছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই—তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন; যিনি এক বর্ণ ইংরাজী জানেন না—তিনি ইংরাজী সাহিত্যের বিচার লইয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দেন। যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন নাই—তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশুন করিয়া হাড় জ্বালান। এ সকল নিতান্ত কুরুচির ফল।

পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালীভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি? বোধ হয় পারিবেন না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালীভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কি না?—আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই-মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তনকরণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।"

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতাপুত্রে বড় বড় সংস্কৃতশব্দে কথোপকথন করা কর্ত্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয় ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, 'হে মাতঃ খাদ্যং দেহি মে' এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, 'ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া।' ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময় লজ্জা বশতঃ দেড়গজী সমাসপরম্পরা-বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন, পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত-মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত-সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্যসম্প্রদায়ের মত-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে একদল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচনজ্ঞাপনে গণশব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি জনৈক লিখিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ যথা একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুইশত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কন্যা, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না।

ভাই, কাল, কান, সোণা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালা ভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা-লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরণ বাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হইয়াছে, যথা গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তরিত হয় নাই। যথা জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, যথা মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, বামনের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা বলি যে, এক্ষণে বামনও যেরূপ প্রচলিত, ব্রাহ্মণও সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। ভাই যেরূপ প্রচলিত, ভ্রাতা ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত।

যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালাদেশে কোন্ চাষা আছে যে, ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্যা হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্যা করা কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাততঃ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে "খেউরী", কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই খেউরি শব্দ। এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরী প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমত অনেকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণে প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে, তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে।

যদিও আমরা এমন বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া কেন সংস্কৃত লিখিবে? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। "হে ভ্রাতঃ" বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; "ভাই রে" বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দই ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। "ভ্রাতৃভাব" এবং "ভাইভাব" "ভ্রাতৃত্ব" এবং "ভাইগিরি" এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃশব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ অনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবু বিশেষ কিছু বলেন নাই, বলিবার প্রয়োজনও ছিল না; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় যে সকল শব্দের

ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে, ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। যদি কোন ধনবান্ ইংরাজের অর্থ-ভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে এবং সেই ইংরাজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথা-ওয়ালা মোহর রাখিয়া ফার্সি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরাজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এই পণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ। এই সম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবু লিখিয়াছেন,—

"Purism is radically unsound, and has its origin in a spirit of narrowness. In the free co-mingling of nations, there must be borrowing and giving Can anything be more absurd than to think of keeping language pure, when blood itself cannot be kept pure? No human language has ever been perfectly pure, any more than any human race has been pure. Infusion of foreign elements do, in the long run, enrich languages, just as infusion of foreign blood improves races. Seeing then that languages, as men speak them, must be mixed, impure, heterogeneous; to reject words like garib (Ar. garib) and dag (Ar. dag) be from books, on account of their lineage would be most unreasonable. Current words of Persian or Arabic origin connect us Hindus of Bengal with Musalman Bengalis, with the entire Hindustani speaking population of India and even with Persians and Arabs. Is it wise to seek to diminish points of contact with a large section of our fellow countrymen, and with kindred and neighbouring races, with whom we must have intercourse, in order that we may draw closer to our Sanskrit speaking ancestors?

Human happiness would seem to be better promoted by increased points of contact with living men than by increased points of contact with remote ancestors. But men are very often swayed in these matters by sentiments more than by reason. The feeling that impels Bengali Hindus towards Sanskrit is prefectly Intelligible. With Sanskrit are associated the days of India's greatest glory, with Persian and Arabic the days of her defeat, humiliation and bondage. The budding patriotism of Hindus everywhere would therefore naturally eschew Persian and Arabic words as badges of slavery. In the long run, however, considerations of utility are sure to over-ride mere sentimental predilections.

It should be understood that I do not advocate any fresh introduction of Arabic and Persian words but insist only on the desirability of giving their full rights to such words, as have already been naturalised in the language and are in everybody's mouth. Persian and Arabic words, those connected with law especially, used by Bengalis ignorant of those languages ought to be accepted as right good Bengali. As a matter of fact, many such words are employed in writing; but the purest spirit is still very active and a disinclination to admit such words into writing is yet but too common."

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূরি ভূরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাবপূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ করিতে হইলে চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে, ইংরাজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? মাধ্যাকর্ষণ বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। গ্র্যাবিটেশন্ বলিলে ইংরাজী যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু

নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ বিষয়ে শ্যামাচরণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"No limit is set in fact to the extent to which words are to be borrowed from Sanskrit, so that every Sanskrit word is considered to have a rightful claim to be incorporated into Bengali. Is this to enrich the language or to overburden it? This indeed is carrying us back into the past with a vengence. In the early flexible stage of Sanskrit, when its fomative powers were active, whole hosts of words were formed to express the same thing. Those words were then as philologists hold, transparent attributive terms, and not the arbitrary symbols that they afterwards became.

Men could not, indeed, be so irrational as to invent more than one arbitrary symbol for one and the same thing. Among the many significant symbols expressive of the same idea, there was a struggle for existence and a survival, in the long run, of the fittest. More terms than one have, in many cases, survived, but on *a priori* grounds it is quite impossible that more than one could survive at the same spot and among the same class of people. Distance of place or peculiarities of social organizasion by limiting intercourse, could alone cause a selection of different names for the same thing. There has further been a differentiation of meaning between words that originally meant exactly the same thing. Our Sanskrit school of writers would, however, undo all this, they would bring back the dead to life. They would restore to Bengali, which is one of the modern developments of Sanskrit, all the imperfections of mother tongue that have been cast off for good. What a terrible legacy would a wholesale appropriation of the Sanskrit vocabulary leave to prosperity? Men of capacity little think of the labour that the acquisition of a language costs; and of this labor the heaviest part is that required in mastering the vocabulary, which, consisting as it does for the most part of arbitrary symbols, is dull, dreary matter to learn. Where arbitrary symbols furnish a key to valuable knowledge, the symbols ought surely to be learnt. In the present case, however, the labors spent on the acquisition of words would be vain meaningless labor. What is the good of learning a new word where one does not learn a corresponding new idea. What is it? Perfection of language requires that no two words should express exactly the same idea and that no two ideas should have the same name. No human language is indeed perfect like this it is true. But this is no reason why we should work the other way and go on sanctioning and accumulating defects."

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয়, কেহ এ উদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকতর লোকের বোধগম্য, তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থের দুই চারি শব্দ পণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই এক জনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকার-কাতর-খল-স্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞান-বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞান-বৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই, অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের

সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলি, আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখনপঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা ও কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের ও লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদি ভাষা হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণ-রসাত্মিকা কবিতায় স্কচ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর ও উন্নত বিষয়ে ইংরাজী ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর ও উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য। সরলতার এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাবধানতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই। নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরাজী, ফার্সী, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না; তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে। লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া এই রীতি অবলম্বন করিলে আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

[বঙ্গদর্শন—৬ষ্ঠ খণ্ড—১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ।

বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা-সাহিত্য

ইদানীং ইংরাজদিগের শাসনাধীনে ভারতবর্ষে নিঃশব্দে যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নূতন ধর্ম্মপ্রচার নাই, বলপ্রকাশ নাই, অথচ আমাদের মন ক্রমশঃ ফিরিয়া আর একরূপ হইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র চলিতেছে; কিন্তু বাঙ্গালায় সেই পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এতদূর আর কোথাও হয় নাই। এই বিপ্লবের প্রধান কারণ ইংরাজি শিক্ষা, ইহার ফল—সমাজ-উন্নতি ও সাহিত্য-উৎপত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যেও বাঙ্গালার সমাজে উন্নতি অধিক ও সাহিত্য প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। আজি সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সাহিত্য আমাদের উপপাদ্য প্রস্তাব। বঙ্গীয় সাহিত্যের বিষয় বলিতে গেলে, আরও অনেক কথা বলিতে হয়, কিরূপে এই বিপ্লব ঘটিয়াছে, কিরূপে লোকের মন পূর্ব্বপথ হইতে ঘুরিয়া নূতন পথে দাঁড়াইয়াছে, তাহা লিখিতে হয়। প্রত্যেক চিন্তাশীল নেতার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তন ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর ইতিহাস লিখিতে হয়, এবং তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীতে সমাজে কেমন করিয়া পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু তাহার সময় নাই। তবে যতদূর পারা যায় চেষ্টা করিব।

১৭৯৯ সালের শেষ দিন অতীত হইল। ১৮০০ সালের প্রথম দিন উপস্থিত। ভারতবর্ষের এমন অদিন বোধ হয় আর কখন হয় নাই। ভারতের কোথাও সুখ নাই, কোথাও শান্তি নাই, সর্ব্বত্র লুঠতরাজ, মারামারি, লাঠালাঠি, কাহাকেও বিশ্বাস নাই, যাহার গায়ে জোর, সেই অন্যের উপর অবিবাদে অত্যাচার করিয়া যায়। সমস্ত দেশে রাজা নাই। যাঁহারা রাজা বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা লুঠেড়ার সর্দ্দার। পরধন অপহরণ, পরপীড়ন, পরের প্রাণনাশ, তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম। এই সময়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্তের কিরূপ অবস্থা, তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

কাবুলের দুরাণীবংশ পতনোন্মুখ, সেখানে দুরাণী ও বেরুকজীদিগের পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মিতেছে, দুরাণীদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের অংশসকলে সুতরাং গোলযোগ চলিতেছে, ভূলোক-স্বর্গ কাশ্মীর, পেশোর প্রভৃতি প্রদেশে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছে। পঞ্জাবে মুসলমানশাসন ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু তথায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন শিখরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে; এই রাজগণ পরস্পরের উপর আপন প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটিতে ব্যতিব্যস্ত। সিন্ধুতে আমীরদিগের রাজ্য এখনও দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই, সেখানেও মারামারি কাটাকাটি যুদ্ধবিগ্রহ। সরহিন্দ প্রদেশে এক জন ইংরাজ এই ঘোরতর অত্যাচারের সময় আপনার জন্য এক রাজ্য করিয়া লইয়াছেন, এবং মুসলমানের ন্যায় বহুসংখ্যক মুসলমান-উপপত্নীতে পরিবৃত হইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছেন। রাজপুতগণের আর সে প্রতাপ নাই, যে প্রতাপে এক দিন তাঁহারা সমবেত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সে প্রতাপ নাই; হিংসা-দ্বেষ তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; সিন্ধিয়া, হোলকার, যখন ইচ্ছা তাহাদের দেশ লুঠ করিতেছে ও যখন ইচ্ছা তাহাদের নিকট হইতে অগাধ টাকা লইতেছে; দিল্লীর বাদশাহের নামের মোহিনী আছে, আজিও সম্ভ্রম আছে। কিন্তু বাদশাহ নিজে বন্দী, শত্রুরা তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছে। তাঁহার দিনের অন্ন কে যোগায়—তাহারও ঠিক নাই। পেরোঁ নামক সিন্ধিয়ার এক জন ফরাসীস সেনাপতি হিন্দুস্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহারও শমরুর মত কিছু নিজ উদ্দেশ্য আছে কি না, কে বলিতে পারে? অযোধ্যা ও রহিলখণ্ড এক-জন নবাবের করতলগত, কিন্তু তাঁহার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি নিজ প্রাসাদে উপপত্নীপরিবৃত হইয়া বাস করেন; সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাসাদসম্মুখস্থ লাল বারদোয়ারী নামক অভিষেক-স্থানও বিদ্রোহীদিগের করকবলিত থাকে, তাঁহার রাজ্য অপেক্ষা অরাজকতা শতগুণে শ্রেয়ঃ। তাঁহার রাজ্যে ওমরাগণ, করদরাজগণ, জায়গীরদার ও তালুকদারগণ যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করে। বিনা যুদ্ধে কেহই খাজনা দেয় না, প্রতিবারই কর আদায়ের সময় আসিলে, ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে

হয়। অনেক টাকা না দিলে সে সাহায্যও প্রায় পাওয়া যায় না। ইংরাজেরা আরও অধিক কিছু আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে রাজ-উপাধি দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। মধ্য-ভারতবর্ষে বুন্দেলখণ্ডে ক্ষুদ্র রাজগণ যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহারও দক্ষিণে গোন্দয়ানায় বড় বড় ডাকাইতের দল তৈয়ারী হইতেছে। ইহারা এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ উলটপালট করিয়া দিবে। সিন্ধিয়া ও হোলকার বড় শান্তিপ্রিয় নহেন। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি নাই, করদলার যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহারা জয়ী ও যাহারা জিত হন, উভয়পক্ষেরই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। নিজাম হারিয়া অবধি হৃদয়মধ্যে ইংরাজ ও মহারাট্টাদিগের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষকে লালনপালন করিতেছেন। মহারাট্টারা করদলা হইতে সেই যে আপন আপন ভবনে গিয়াছে, তার পর আর একত্র হয় নাই, উহারা যে যাহার আপন আপন রাজ্যবৃদ্ধি ও শত্রুনিপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। মহারাট্টাদিগের মধ্যে বড় রাজা আছেন সত্য, কিন্তু শ্রীজীবায় যেখানকার ওমরাহগণের অগ্রগণ্য ও সর্ব্বময় কর্ত্তা, উন্মত্ত যশোবন্ত রায় যেখানকার শাসনকর্ত্তা, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কুসংস্কারাপন্ন অবিমৃষ্যকারী বাজীরাও যেখানকার পেশোয়া, সে রাজ্যে কি সুখ সম্ভব? সেখানে কি শান্তি থাকিতে পারে? সেখানে কি লোকের সাহিত্যানুরাগ থাকিতে পারে? মহারাষ্ট্র-রাজ্যের দক্ষিণে ইংরাজ-রাজত্ব সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম অংশে যেরূপ সর্ব্বনাশ হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, তাহাতে আবার যখন টীপু তৃতীয়বার হারিয়া মরিয়া হইয়াছিলেন, তখন তিনি যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে মহীসুরে গ্রামকে গ্রাম মুসলমান করিয়া দেন, বিনাপরাধে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ করেন। দক্ষিণে অন্যান্য স্থানে ইংরাজদিগের প্রভুত্ব ছিল সত্য, কিন্তু মান্দ্রাজে যে সকল ইংরাজ কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা দেশীয় জঘন্য রাজাও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহারা কর্ণাটের নবাবের দেনা লইয়া যে জঘন্য কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিয়া ইংরাজ নাম কলঙ্কিত করা আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যে হিমালয় প্রদেশে, যে উত্তরাখণ্ডে কখন মুসলমান যাইতে পারে নাই, গোর্খা-দিগের দুরাকাঙ্ক্ষায়, রাজ্যবৃদ্ধির ইচ্ছায় সেখানেও যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, পাহাড়মধ্যেও অরাজক। গ্রামবাসীরা লুঠের ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর।

এরূপ অরাজকসময়ে যখন কালি কি হইবে, কেহই বলিতে পারে না, যখন পরের উপর অত্যাচারই রীতি, যখন কাহার প্রাণ, মান, ধন রক্ষা হয় না, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে পারে, এরূপ ক্ষমতাশালী এক জনও লোক সমস্ত ভারতবর্ষে খুঁজিয়া মিলে না, তখন কি সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে; তখন কি লোকের চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে? যখন ভয়েই লোক অভিভূত, তখন কে লেখাপড়া শিখিবে, কে লিখিতে বসিবে? বাস্তবিক তৎকালে ভারতবর্ষে সাহিত্য-লোপ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথায় ভারতবর্ষের কথা কেন তুলিলেন? বাঙ্গালায় ত তখন সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ত তখন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিভোগ করিতেছিল। এটি লোকের মহাভ্রম, ভারতবর্ষে এরূপ দারুণ গোলযোগ থাকিলে বাঙ্গালীর মনে শান্তি সম্ভবিতে পারে না; বিশেষ বাঙ্গালা সমাজে তখনও শান্তি হয় নাই। প্রথম ইংরাজ-রাজত্ব যে স্থায়ী হইবে, তাহাতে কাহারও বিশ্বাস হয় নাই, তাহার পর আমরা যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, তখন বাঙ্গালা বলিলে ইহা বুঝাইত না। বাঙ্গালার গবর্ণরের কর্ত্তৃত্ব উড়িষ্যায় ছিল না। উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রকরকবলিত ছিল। উড়িষ্যার করদ ও মিত্র রাজগণ নিরন্তর মেদিনীপুর অঞ্চলে লুঠপাঠ করিত, বীরভূম, বরাহভূম সবেমাত্র ইংরাজদিগের অধিকৃত হইতেছে। আসাম, কাছাড় তখনও ইংরাজদিগের নয়। অতি অল্প পরেই মানেরা (ব্রহ্মদেশীয়গণ) অরাজক আসাম দখল করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িয়াছিল। ভুটান শত শত বৎসর ধরিয়া নিরন্তর অরাজকতায় ভুগিতেছিল। ভুটানে সুবেদারেরা তংশো পেন্‌লো, পেরো পেন্‌লো প্রভৃতি সকলে আপন আপন ধর্ম্মরাজা ও দেবরাজা খাড়া করিয়া আপনা আপনি কাটাকাটি করিয়া মরিত। সময়ে সময়ে তাহাদের যুদ্ধ গড়াইয়া রংপুর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িত। যদিও মুসলমানেরা ভিন্ন আর কেহ বাঙ্গালা আক্রমণ করিতেই আসে নাই, তথাপি বাঙ্গালার সীমাপ্রদেশে শান্তি-সুখ একেবারে ছিল না। আর বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অরাজকতা নৃত্য করিত। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ হইতে বাঙ্গালা শ্মশানকালীর রঙ্গভূমি হইয়াছিল। Double Governmentএর সময়ে রণদুর্ম্মদ ইংরাজগণ কাহাকেও মানিত না; তাহারা

না করিয়াছে, এমন কার্য্যই নাই, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, ক্ষমতা, কিছুতেই তাহাদের মন বিচলিত করিতে পারিত না। Double Governmentএর সময়ে যেমন ছিল, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঠিক তেমনই ছিল। ইংরাজেরা তিন চারি বৎসর থাকিয়া অনেক ধনসঞ্চয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেন। আর তাঁহাদের বাঙ্গালী প্রিয়পাত্রগণও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় স্বজাতীয়গণের মুণ্ডপাত করিয়া বড়লোক হইয়া উঠিতেন। ৫৬ হইতে ৯৩ পর্য্যন্ত যাহা ছিল, ৯৩ সালে তাহার চূড়ান্ত হইয়া গেল। দেশের যা কিছু ছিল, কর্ণওয়ালিশ-প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীতে তাহাও গেল। বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বে তিন শক্তি ছিল, এই তিন শক্তির মূল তিন; —মুসলমান গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় জমীদার ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। এই ৩৭ বৎসরে মুসলমান গবর্ণমেণ্টেরও শেষ হইয়াছিল। নবাব বহুলক্ষ টাকা পেন্সন পাইয়া উপপত্নীগণে বেষ্টিত হইয়া নিজপ্রাসাদে বাস করিতেন ও যতদূর তাঁহার সম্পর্কের গন্ধ থাকিত, ততদূর দূষিত বায়ু চরিত্রদোষরূপ সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি করিয়া দিত। বড় বড় জমীদার-গণ সাহেবের শোষণে অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন। মীরকাসিম অনেকগুলির মূলোচ্ছেদ করিয়া গিয়া-ছিলেন। ইজারা বন্দোবস্তে অনেকগুলির উচ্ছেদ হয়। দেশের লোক যাহাদিগকে আপনাদের কর্ত্তা বলিয়া বহুকাল আদর ও ভক্তি, মান্য ও ভয় করিয়া আসিতেছিল, যাহারা প্রথম স্বাধীন, পরে মিত্র, তাহার পর করদ, শেষ অধীন রাজা ছিল, তাহাদিগের এইরূপ পরিণাম হইতে লাগিল। তাহার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল, ইহার সঙ্গত নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নহে; ইহার আসল নাম চির-অস্থায়ী বন্দোবস্ত। কারণ, ইহাতে কেহই বলিতে পারেন না যে, আমার জমীদারী স্থায়ী হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদারগোষ্ঠীর শেষ হইল। বড় বড় রাজপরিবার ঠিক সময়ে টাকা না দিতে পারায় জমীদারীচ্যুত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগর, নলডাঙ্গা, নাটোর, চাঁচড়া প্রভৃতি প্রদেশের জমীদারদিগের সম্পত্তি হুহুস্বরে নীলাম হইতে লাগিল। কিনিল কে? ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রিয় মুহুরী জাতিতে নাপিত, Foreign Departmentএর নায়েব—জাতিতে সদ্গোপ, মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের কেরাণী গোমস্তা ইত্যাদি। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও ক্রেতার সংখ্যা অধিক নহে। জমীদারের কর্ম্ম-চারীরাই এ বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ, তাঁহারা প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিয়া ধনসঞ্চয় করিতেন। দূরস্থ জমীদার তাহা দেখিতে পাইতেন না। তাহার পর জমীদারী খাজনার দায়ে নীলামে উঠাইয়া দিয়া আপনি ক্রয় করিয়া লইলেন। এক স্থানে এমন হইয়াছে যে, জমীদারের খাজনা লইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ নৌকা ডুবি রটাইয়া দিয়া সেই টাকায় গোমস্তা আপনি জমীদারী কিনিয়া লইলেন। এক স্থানে এক জন ডাকাইতের সর্দ্দার গবর্ণমেণ্টের খাজনা লুঠ করিয়া নগদ টাকার জোরে জমীদার হইলেন। অনেক স্থলে লাঠির জোরে জমীদার হইতে লাগিল। এক জনের লাঠির জোর থাকিলে দশ পনর ক্রোশের মধ্যে কাহার রক্ষা থাকিত না। যাহারা সাহিত্য-সংসারের উন্নতি করিত, যাহারা পণ্ডিত প্রতিপালন করিত, যাহাদের কল্যাণে আমরা অনেক উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাইয়াছি, তাহাদের এই দশা হইল। যাহারা তাহাদের স্থান প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা আর এক সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহারা ঘোরতর কুসংস্কারাপন্ন, তাঁহারা গুরু-পুরোহিতের একান্ত ভক্ত হইতে লাগিলেন। শাস্ত্র-কচকচি তাঁহাদের চক্ষুঃশূল।

মুসলমান গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার ভিন্ন বাঙ্গালার আর এক শক্তি ছিল, ব্রাহ্মণপণ্ডিত। এই অরাজকের সময়, ঘোরতর অত্যাচারের সময়, ভয়ানক বিশৃঙ্খলার সময় যদি কেহ দেশের জন্য যথার্থ ভাবিত, তবে সে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ। এই সময়ে তাঁহাদের দ্বারা যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত, অত্যাচারী ইংরাজগণও ধার্ম্মিক ইষ্টনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে আদর করিত, লোকে তাঁহা-দিগকে হিন্দুধর্ম্মের—হিন্দুসমাজের—আর্য্যজাতির চূড়া বলিয়া জানিত। তাঁহারাও আজিকার ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় লোভী, ক্ষমতাপ্রত্যাশী ও স্বার্থপর ছিলেন না। ধর্ম্মবলে তাঁহারা বলীয়ান্ ছিলেন, তাঁহাদের সাহস ও অকুতোভয় ছিল। তাঁহাদের এই সাহসের সূক্ষ্ম হেতুও ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই ৬০।৭০ জন ছাত্র থাকিত ছাত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত, বলিষ্ঠ ও গুরুকার্য্যে আত্মসমর্পণেও কৃতসংকল্প। এই সময়ের জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, গোঁসাই ভট্টাচার্য্য, বলরামশ্চ শঙ্করঃ, মাণিক তর্কভূষণ প্রভৃতি লোকের নাম কাহার অবিদিত আছে? তাঁহারা এই গোলযোগের সময় ব্যবস্থাপক, বিচারপতি, অধ্যাপক ও সময়ে সময়ে সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। কত কত পরিবারকে যে তাঁহারা কত উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে সকল ইংরাজ যথার্থ বিচার

করিতে চাহিতেন, এই ভট্টাচার্য্যগণ যে তাঁহাদের কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি তাঁহাদের ব্যবসায় নহে। তাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী, সাহিত্যব্যবসায়ী ছিলেন না। বিশেষ তাঁহাদের উপর এত কার্য্যভার পড়িয়াছিল যে, তাঁহারা সাহিত্যের উন্নতির ইচ্ছা থাকিলেও করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাদেরই কি পরিণাম হইল! ১৭৯৩ সালে হুকুম হইল, আইন হইল যে, ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। আবার ১৮২৮ ও ১৮৩৩ অব্দে বাজেয়াপ্ত আইন পুনরায় বিধিবদ্ধ হইল। তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইল। যে ব্রাহ্মণকুল নির্ব্বিবাদে স্বাধীন উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহাদের তেজে, সাহসে ও নির্ভীকতায় অত্যাচারী সিরাজউদ্দৌলাও কাঁপিতেন, তাঁহারা এই অবধি বড় মানুষের আশ্রিত হইতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বড় মানুষের সভার শোভাবিধান করিতে লাগিলেন, ক্রমে এক্ষণে তোষামোদ ভট্টাচার্য্যদিগের ব্যবসায়ের মধ্যে হইয়া দাড়াইয়াছে। আমাদের দেশে যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে, তাহাও এইরূপ ব্রহ্মোত্তরভোগীদিগের লিখিত, সুতরাং আর নূতন ব্রহ্মোত্তর হইবে না এবং অনেক পুরাতন ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হইবে, আইন করায় বঙ্গীয় বিদ্যা ও বঙ্গীয় সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে বহুদিন পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্যদিগের প্রাধান্য ছিল সত্য; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সে প্রাধান্য অধিক দিন থাকিবে না। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদির পর যে সকল পণ্ডিত হইয়াছিলেন, সকলেই জানে যে, তাঁহারা উক্ত মহাত্মাদিগের অপেক্ষায় অনেক অংশে নিকৃষ্ট; তাহার পর আরও নিকৃষ্ট, তাহার পর আবও নিকৃষ্ট, শেষ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের ভূমিকায় খ্যাতনামা ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিলেন যে, ভট্টাচার্য্যগণ চারি পাঁচখানি ব্যতীত পুস্তক পড়েন না এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বলেন যে, আধুনিক নৈয়ায়িকেরা ন্যায়শাস্ত্রের ৬৩ ভাগের এক ভাগ মাত্র পড়িয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৯ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ভট্টাচার্য্যদিগেরও সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতচর্চ্চার উচ্ছেদ হইতে লাগিল।

যে তিন শক্তিতে বঙ্গসমাজ চলিত, তিনেরই ক্রমে ধ্বংস হইতে লাগিল, অথচ নূতন সমাজ গঠিত হইল না। সাহিত্য একেবারে রহিল না, ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন, রামপ্রসাদ সেন এই সময়ে পরলোক গমন করেন, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী-প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদও তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী হন। Double Governmentএর সময়েই ৬৫ হইতে ৭২রের মধ্যেই প্রাচীন কবিগণ গত হন। তাঁহাদের স্থান অধিকার করে, এমন লোক একেবারে হইল না, যে দুই এক জন রহিলেন, তাঁহাদেরও প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকাশ হইল না। তাঁহারা নীচ শ্রেণীর কবিতা লইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন মাত্র। আপনারা কি নিধুবাবু, রাম বসু প্রভৃতিকে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের স্থান পাইবার যোগ্য মনে করেন? ইঁহাদের মধ্যে এক জন লোক ছিলেন, তাঁহার অনেক উপাসক আজিও আছেন, তাঁহার নাম হরুঠাকুর। ইনি কবির দল সৃষ্টি করেন; কবির দল স্থায়ী কার্য্য কিছুই করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তৎকালীন হঠাৎ অবতার জমীদার ও বাবুদিগকে প্রীত করিবার জন্য উপস্থিতমত গান বাঁধিতেন। তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ঘোর অত্যাচার, অরাজক ও বিশৃঙ্খলার সময় তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশ না হইয়া ঐরূপেই বাহিত হইয়াছিল। কীর্ত্তন বাঙ্গালায় সৃষ্ট, বাঙ্গালীর গৌরবের ধন, কিন্তু কীর্ত্তনরচয়িতা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কেহই জীবিত ছিলেন না।

আমি অনেকক্ষণ আপনাদিগকে ভূমিকা লইয়া কষ্ট দিয়াছি, বোধ হয়, আপনারা আমায় সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে বোধ হইবে যে, প্রাচীন বঙ্গসমাজ ভাঙ্গিয়া গেল, প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন বিদ্যা লোপ হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইল, এই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় নূতন সমাজের ও নূতন সাহিত্যের সূত্রপাত হইল। কিন্তু সে সাহিত্য কে করিল? সে সূত্রপাত কে করিল? বঙ্গবাসী, এইবার তোমার বড়ই লজ্জার কথা। বিদেশীয়দিগের উৎসাহে বিদেশীয়দিগের উপকারার্থ বিদেশীয়দিগের যত্নে বিদেশীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক তোমাদের সাহিত্য আরম্ভ হইল। সিবিলিয়ান্‌দিগের শিক্ষার জন্য সিবিলিয়ান্‌দিগের উপকারার্থ লর্ড ওয়েলস্‌লি দ্বারা বঙ্গসাহিত্য আরম্ভ হইল, তোমাদের প্রথম গদ্যলেখক সাহেব ফরেষ্টর ও কেরী, আর এক জন তিনি জাতিতে উড়িয়া, তাঁহার নাম মৃত্যুঞ্জয়। উড়ে ও সাহেবে বাঙ্গালায় সাহিত্য আরম্ভ করিল। আরও লজ্জার কথা এই যে, যে দুই এক জন বাঙ্গালী ঐ সময় পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুস্তক কদর্য্য ও জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রায়চরিত্র ও প্রতাপাদিত্যচরিত্র বাঙ্গালীর লেখা দুইখানিই অপাঠ্য।

এইরূপে বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের সূত্রপাত হইল। সাহেবেরা নিজ জাতিস্বভাবসুলভ অধ্যবসায়সহকারে বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গালায় সাহিত্যের উন্নতি হইতে এখনও অনেক বিলম্ব রহিল। ১৮০১ অব্দ হইতে ১৮১৫ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালা ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, যেরূপ শান্তিস্থাপন হইলে সাহিত্য উৎপত্তি হইতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও সেরূপ শান্তি রহিল না। যেরূপ অবস্থা হইলে লোকে কতকটা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর এমন স্থান রহিল না। বাঙ্গালায় অনেক রাজধানী ছিল, বিদ্যাশিক্ষার অনেক স্থান ছিল, ক্রমে সমস্ত আসিয়া কলিকাতায় মিশিতে লাগিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় হইতে সমস্ত বঙ্গদেশের লোক উঠিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, গঙ্গার দুই ধার ক্রমে সভ্যলোকে পূর্ণ হইতে লাগিল; বর্দ্ধমান, যশোহর, ফরিদপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার কত কত পরিবার যে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানে বাস করিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা নাই। ক্রমে এই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানেই সাহিত্যের সূত্রপাত আরম্ভ হইতে লাগিল। এই স্থানে লোকে সর্ব্বদা ইংরাজদিগের সংসর্গে আসিত, সর্ব্বদা নানাদেশীয় লোকের সংসর্গে আসিত, তাহাদের ভাব সকল হৃদগত করিত, ক্রমে এই সকল দেশে সভ্যতার আবির্ভাব হইতে লাগিল; ক্রমে ব্রিটিশদিগের প্রতাপও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, আমরা এই সময়ের নাম Transition period বা পরিবর্ত্তনসময় বলিব। যে দিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতে আসিলেন, সেই দিন হইতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হইল, এই পরিবর্ত্তন এখনও চলিতেছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনসময়ের যে যে দোষগুণ, তাহা আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; এখন আর ঠিক পরিবর্ত্তনসময় নহে, এখন একটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইংরাজেরা এইজন্য অধুনাতন সময়কে ইয়ং বেঙ্গলের সময় বলেন, আমরাও সংক্ষেপে 'ইয়ং বেঙ্গল' বলি।

পরিবর্ত্তনসময়ে বহুসংখ্যক মহাক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেশে যাহাতে জ্ঞানজ্যোতিঃ, ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রকাশ হয়, যাহাতে দেশের কুসংস্কার দূরীভূত হয়, যাহাতে সমাজ নূতন পথে নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে, তাহাই করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গুরুতর কার্য্যে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে; পরিবর্ত্তনসময়ে সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি না হইলেও লেখাপড়ার চর্চ্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই উভয় ভাষায় লেখাপড়া আরম্ভ হয়। যে সকল মহাত্মা এই সময় আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া যান, তাঁহাদের জনকয়েকের নাম না করিয়া, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের নাম করিতে সকল বাঙ্গালীরই মন কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হওয়া উচিত। তাঁহারা আমাদের জাতীয় কৃতজ্ঞতারূপ করলাভের বিলক্ষণ উপযুক্ত। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায়, ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় শত শত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম স্থাপনকর্ত্তা, ইনি সর্ব্বপ্রথম সমাজসংস্কারক, ইনি সর্ব্বপ্রথম ইয়ংবেঙ্গল, ইঁহার ক্ষমতা অপার, ইঁহার বিদ্যা অগাধ, ইঁহার মত দেশহিতৈষী তৎকালে আর কেহ ছিল না। ইনি, সমাজ যে ভাঙ্গিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছিলেন, সমাজ যে পথে যাইবে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন, এবং প্রাণে প্রাণে সর্ব্বপ্রযত্নে সমাজকে সেই পথে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বপ্রথম উৎকৃষ্ট বাঙ্গালী লেখক, ইঁহা হইতে বাঙ্গালা গদ্য বাঙ্গালীর অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ হয়। পদ্য ভিন্ন সাহিত্য হইতে পারে, ইনিই সর্ব্বপ্রথম লোককে বুঝাইয়াছেন।

দ্বিতীয়, গৌরীশঙ্কর—বাঙ্গালায় রামমোহন রায়ের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙ্গালা গদ্যের এক জন শিক্ষাগুরু, রামমোহন রায়ের—তাঁহার মতের এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের—ঘোরতর বিদ্বেষী, এবং হিন্দুসমাজের মহামান্য অগ্রণী। প্রথম নাই হউক, তখনকার একখানি প্রধান বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সম্পাদক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা, লেখনীচালনে অবিশ্রান্ত, তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান সম্বাদপত্রের সম্পাদক, নানারসপরিপূর্ণ কবিতা লেখায় চমৎকার শক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু ইঁহার আর এক গুণ ছিল, লেখকবর্গের সে গুণ প্রায় থাকে না; এ জন্য লেখকদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কীর্ত্তিও প্রায় লোপ হয়।

ইনি অল্পবয়স্ক, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র ভদ্রসন্তানগণকে লেখা শিখাইতে যত যত্ন করিতেন, এত বোধ হয়, কখন কোন দেশে কোন কালে কোন লেখক করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অধিক কি, বঙ্কিম,

দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিলে অসঙ্গত হয় না।

তাহার পর রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদিগের দেশের আজিকার সমাজের নেষ্টর। পরিবর্ত্তনসময়ের মূর্ত্তিমান ইতিহাস। এই প্রাচীন বয়সেও ইঁহার যেরূপ ক্ষমতা, আর কয়জনের তাহা আছে? ইনি যাহাতে ইংরাজী ভাব দেশীয় লোকের মনে প্রবেশ করে, তাহার জন্য যে কত চেষ্টাই করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহার সঙ্কলিত, রচিত ও অনুবাদিত গ্রন্থাবলী একত্র করিলে একটি পুস্তকালয় হয়। ইঁহার বিদ্যাকল্পদ্রুম একখানি Cyclopedia; বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইংরাজী শিক্ষার উন্নতি ইঁহার জীবনের মন্ত্র ইনি সাহিত্যব্যবসায়ী-দিগের সহায়, উৎসাহদাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ।

তাহার পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র; ইঁহার বিবিধার্থ-সংগ্রহ বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বপ্রধান সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা। বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে ইনি নিজে দক্ষা-গ্রগণ্য, বাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য ইঁহার চেষ্টারও কিছু-মাত্র ত্রুটি নাই। ইনি বরণেকুলার লিটরেচর সোসাইটী ও স্কুলবুক সোসাইটীর অন্যতম সভ্য হইয়া কত গ্রন্থকারকে যে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ইনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া এক্ষণে ইংরাজী লইয়া অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন, এত বড় লোক বাঙ্গালার লেখক হইলে বাঙ্গালার যে উপকার হইত, তাহা হইল না। এ জন্য আমরা দুঃখিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি ভারতের প্রাচীনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালার যেরূপ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা আর কোন এক জন লোক বা একটি সোসা-ইটী দ্বারা হয় নাই।

পরিবর্ত্তনসময়ের আর এক জন প্রধান লেখক নীলমণি বসাক; ইঁহার পুস্তকাবলী অদ্যাপি লোকে পাঠ করিয়া থাকে, ইনি সরল গদ্যের জন্মদাতা; যখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না, সেই সময় নীলমণি বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া খাটি বাঙ্গালায় কতদূর ভাবপ্রকাশক্ষমতা আছে, তাহা লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার নবনারী আজিও বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য-গ্রন্থ।

টেকচাঁদ ঠাকুর। ইনি কে, আমি জানি না, জানিবার বুঝি উপায়ও নাই; কিন্তু ইঁহার রচিত পুস্তকাবলী আমরা বাল্যকালে পাঠ করিয়া যে কত উপকার লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। পরিবর্ত্তনসময়ের ইনিও এক জন প্রধান লেখক ও সংস্কারক। ইঁহার সম্বন্ধে মহামতি বীমস্ বলিয়াছেন "He has had many imitators and certainly stands very high as a novelist; his story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language for wit spirit and clever touches of nature."

হুতোম পেঁচাও এই পরিবর্ত্তনসময়ের একটি মহার্ঘ্য রত্ন; ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র আছে, হুতোম হুতোমীয় ভাষার প্রবর্ত্তক এবং বহুসংখ্যক হুতোমী পুস্তকের আদিপুরুষ। বোধ হয়, মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃ-স্থানীয়।

ইঁহাদের পর সংস্কৃতকালেজের দল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর, বহুসংখ্যক উত্তম নাটকের প্রণেতা, অনুবাদক শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি বহুসংখ্যক লেখক এই সময়ে সংস্কৃতকালেজ হইতে বহির্গত হন। ইঁহারা ইংরাজী ভাব বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতেন না। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা বাঙ্গালীকে উপহার দিতেন। ইঁহাদের কত লোকের নাম করিব? সকলেই পূজ্য-পাদ, সকলেরই নিকট বাঙ্গালা নানাকারণে বাধ্য। ইঁহারাই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারত অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে ও সিংহ মহোদয়কে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠককে অগাধ রত্নরাশির অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের দলের সর্ব্বাগ্রণী, এমন কি, পরিবর্ত্তনসময়ের প্রধান নেতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম এখনও করা হয় নাই। ইনি একা একশত, ইনি যে বাঙ্গালীকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালায় শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিবার সময় যে গবর্ণমেণ্টকে কত বিষয়ে সাহায্য করিয়া-ছেন, তাহা সমস্ত খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। ইনি সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিখাইয়াছেন, ইঁহার কথামালা ও চরিতাবলীর ভাষা যদি বঙ্গীয় সর্ব্বপ্রধান লেখকও পড়েন, অনেক উপকার লাভ করেন। তাহার পর ইঁহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা, ইঁহার স্বভাবনির্ভীকতা, স্বাধীনভাব দেশীয় সমস্ত যুবকবৃন্দের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত।

পরিবর্ত্তনসময়ের লোকে যে শুদ্ধ নিজে নিজে সকল কার্য্য করিতেন, এমত নহে, তাঁহাদের সমবেত কার্য্যও ছিল। এই সমবেত কার্য্যের মধ্যে

তত্ত্ববোধিনী সভা প্রধান। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তত্ত্ববোধের জন্য তত্ত্ববোধিনী নামক পত্রিকা প্রচার হয়। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, ও দেশের বহুবিধ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তখন এখনকার মত একটিমাত্র সভার কাগজ হয় নাই, উহা তখন সমস্ত বাঙ্গালায় ইয়ুরোপীয় ভাব-প্রচারের মিসনরি ছিল, উহা ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা যাহারা তত্ত্ববোধিনীর আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। বাঙ্গালীর ছেলেদের মধ্যে ইংরাজী ভাব প্রবেশ করান সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়। তিনিই বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রথম নীতিশিক্ষক, তাঁহার চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থ বিজ্ঞলোকেও পাঠ করিয়া নীত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। বালকেরা এই সকল গ্রন্থ পাঠে কতদূর উপকৃত হয়, তাহা বলা যায় না।

এই সময়ে কবিওয়ালারা, যাত্রাওয়ালারা, বিশেষ পাচালীওয়ালা দাশরথি রায়, বাঙ্গালাভাষার পুষ্টির পক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন।

আমরা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তনসময়ের প্রধান প্রধান নেতৃগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক ও মহৎ, ইংরাজীভাব বাঙ্গালীকে বুঝান; ইংরাজীভাব বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করান। একালের শিক্ষিতসম্প্রদায় এই কার্য্যে এত ক্ষেপিয়াছিলেন যে, এক জন অতি সুশিক্ষিত যুবক—তাঁহার নাম আমার স্মরণ নাই, তিনি ইস্কুলের মাষ্টার ছিলেন, এবং ইংরাজী বিদ্যায় বৃহস্পতি ছিলেন—রাস্তায় চলিবার সময় মুটে, মজুর, মুদী, ভদ্রলোক, যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন, "গোরু খাবি," "গোরু খাবি?" তাহারা গালাগালি দিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "ওরা ত খাবে না জানিই, তবে রোজ রোজ শুনিতে শুনিতে শেষ idea-টা আর অত Shocking হইবে না।" এইরূপে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মগণ ইউরোপীয় ভাব সকল দেশমধ্যে প্রচার করিয়া দিতেন। পরিবর্ত্তনসময়ের লোক আজিও অনেকে জীবিত আছেন, তাঁহারা যদি সেকালের লোকের মনের কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা তাঁহারা অনেক অধিক বলিতে পারিবেন।

তবে স্থূলতঃ পরিবর্ত্তনসময়ের কাজ এইগুলি:—ভাষার সৃষ্টি, গদ্যের সৃষ্টি, হিন্দু কালেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাবের প্রচার ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত-অনুবাদ প্রচার, সমাজকে নূতন পথে চালান, বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ ও উন্নতি, বাঙ্গালা সাহিত্যের কোরকের উৎপত্তি। এখন দেখা যাউক, এই সকলের ফল কি হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরিবর্ত্তন এখনও চলিতেছে; পরিবর্ত্তন-সময়, অনুবাদের সময়, শিক্ষার সময়, জিনিয়সের সময়, বড় বড় চিন্তাশীলগণের সময়, আমরা যাহা হইয়াছি ও হইতেছি, তাঁহাদেরই কৃপায়, তাঁহাদেরই অধ্যবসায়ের গুণে, তাঁহাদেরই উচ্চকামনার ফল। কিন্তু তাঁহারা যে পরিবর্ত্তসাধন করিয়া তুলিয়াছেন, এমন পরিবর্ত্তন কি আর কখন হইয়াছিল? তাঁহারা যে সমাজ, সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এমন কি আর কখন হইবে? যত ভাব তাঁহাদের সমবেত পরিশ্রমে বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এত কি আর কখন কোন দেশে কোন কালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল? অদ্যকার যুবকগণ এই পরিবর্ত্তনসময়ের দরুণ যত উপকার পাইয়াছেন, এত কি কোন দেশে কোন কালে কোন যুবকদল পাইয়াছেন? এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ইউরোপে একবার হইয়াছিল; কিন্তু ইহার সহিত তুলনা করিলে সে অতি সামান্য। যখন ১৪৫৪ সালে রণদুর্ম্মদ ওসমান্ আলি মহম্মদ নূতন রোম দখল করিয়া কাইসরের উত্তরাধিকারিগণকে সাম্রাজ্যচ্যুত করিল, সেণ্ট সফির গির্জ্জাকে মসজীদ করিল, সেই সময়ে যখন নূতন রোমের পণ্ডিতবৃন্দ বিনিস-সাগরপারস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট নিজের বিদ্যা লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন একবার এইরূপ পরিবর্ত্তন ইউরোপে ঘটিয়াছিল, এইরূপ নূতন ভাবে লোকে উন্মত্ত হইয়াছিল, লোকের মনে এইরূপ একটা ভীষণ গোলমাল হইয়াছিল, এইরূপ উৎসাহের সহিত লোকে নূতন বিদ্যা শিখিতে এবং নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের এ পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার তুলনা হয় না। তখন শুদ্ধ গ্রীকদিগের সাহিত্য পুনঃপ্রচার হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এখন বাঙ্গালায় কি হইয়াছে, একবার দেখ দেখি? প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমস্ত বিদ্যা বাঙ্গালীর সম্মুখে আপনাদের গুপ্তভাণ্ডার প্রকাশ করিতেছে। এখনকার ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে তখনকার গ্রীক সাহিত্য তুচ্ছ পদার্থ, তাহার উপর আবার সংস্কৃতসাহিত্যের পুনঃ-প্রচার আছে, বৌদ্ধসাহিত্যের পুনরুদ্ধার আছে। দেখ দেখি একবার কত অগাধ ভাণ্ডারের আমরা একেবারে অধিকারী হইয়াছি। এত সম্পদ কাহার

ভাগ্যে ঘটে? এক দেশে আর এক দেশের সাহিত্য-প্রচারে মহাবিপ্লব ঘটে। ইংলণ্ডের সাহিত্য ফ্রান্সে গিয়া গতশতাব্দীতে এত কাণ্ড করাইয়াছে, আর আজি আমাদের দেশে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, জর্ম্মণীর, ইতালির, প্রাচীন হিন্দুদের ও প্রাচীন বৌদ্ধদিগের সাহিত্য উপস্থিত। আমরা এক এক সময়ে এই অগাধ সাহিত্যরাশি চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়ি। এই সকল সাহিত্যের সকল পুস্তক ভাল করিয়া পড়া অসম্ভব। অতএব প্রত্যেক-দেশের সাহিত্যের যদি চারি পাঁচখানি করিয়া উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বা "মাষ্টার পিস" পড়ি, তাহা হইলে দশ-বৎসর কাটিয়া যায়। বাস্তবিক এত সাহিত্যও কখন একেবারে এক অন্ধতমসাচ্ছন্ন দেশে উপস্থিত হয় নাই, আর এই সাহিত্য লইয়া স্বায়ত্ত করিতে পারে, ইয়ংবেঙ্গল ভিন্ন এমন জাতিও আর কখন হয় নাই। আর এই সকল নানাদেশীয় ভাব এক করিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার বিষয়ে ইয়ংবেঙ্গলের যত সুবিধা, বোধ হয়, আর কোন দেশের লোকের কখন এত হয় নাই। প্রধান সুবিধা, সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপিত আছে, কোথায় কোন গোলযোগ নাই, প্রাণ ও ধন সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে।

যুদ্ধের লেশমাত্রও নাই, জমিদারের অত্যাচার নাই, কুসংস্কারাপন্ন গুরু ও পুরোহিতের প্রাধান্য নাই, স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত দেয়, এমন কিছুই নাই। স্বাধীন দেশে, দেশশাসন, শান্তিরক্ষা, বিচারকার্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত হেতু কত কত মহাপ্রতিভাশালী লোকের প্রতিভাবিকাশ হইতে পারে না। বাঙ্গালীর অদৃষ্টে এ সকল কার্য্যের জন্য ইংরাজ আছেন। বাঙ্গালী ইচ্ছা করিলে নির্ব্বিবাদে নিরাপদে দেশের, সমাজের ও সাহিত্যের উন্নতিতে সমস্ত মানসিক শক্তি ব্যয় করিতে পারেন। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ইংরাজী বিদ্যালয় হইয়াছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশ-মাত্র সভ্য ছিল। এই প্রদেশে মাত্র নূতন সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই স্থানে মাত্র সহিত্যের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সে সভ্যতা, সে নূতন সমাজ, সে সাহিত্য সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে, অতি নিভৃত জঙ্গলমধ্যে নূতন সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, বাঙ্গালী ইয়ংবেঙ্গল এমন সুবিধার কি কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা নূতন সাহিত্য গঠনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নূতন চিন্তাস্রোতঃ কতদূর চলিয়াছে, আর যাহা হইয়াছে, তাহা হইতে কতদূর আশা করা যাইতে পারে।

আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্ব্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব। তিলোত্তমা ১৮৬০ সালে প্রচার হয়, তাহার পর বিশবৎসরমাত্র অতীত হইয়াছে। এই কুড়ি বৎসরে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাকে সাহিত্য বলিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। এই সাহিত্যের যেরূপ বৃদ্ধি, যেরূপ দ্রুত উন্নতি, তাহাতে ইহার পরিণাম সম্বন্ধে অসীম উন্নতি আমাদিগের স্থিরনিশ্চয়। আমাদিগের এই বঙ্গে সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার ও ইহার ভাবী পরিণামসম্বন্ধে নানারূপ আশা করিবার বিশেষ কারণও আছে। এটি শুদ্ধ আমার নিজের কথা নহে, অন্ধবিশ্বাস নহে, বৃথা আশা নহে, যখন আট বৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল, তখন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার সময় হইয়াছে। তাহার আট বৎসর পরে কতই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা সেই সাহিত্যের আরও গর্ব্ব করিব, আশ্চর্য্য কি? ভারতীয় আর্য্যভাষা-সমূহের উপমিতব্যাকরণকার মহামতি বীমস্ সাহেব দশবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সমালোচনান্তে বলিয়াছেন, "That the Bengalis possess the power, as well as, the will to establish a national lterature of a very sound and good character can not be denied" আরও পুষ্পাঞ্জলিপ্রণেতা, চিন্তাশীল, শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইঁহাদিগেরই দেশে পূর্ব্বপিতৃ-গণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

এই কয়বৎসরমধ্যে কত নূতন পুস্তক হইয়াছে, কত নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং এই সকল পুস্তক ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইতেছে, পরিবর্ত্তে ক্রমেই দেশের অধিক মঙ্গল হইতেছে। আমার বোধ হয়, সকলে অধীর হইয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের নিকট ধীরতা ভিক্ষা করি, আমি নিম্নে অনেক কথা ছাড়িয়া দিব স্থির করিয়াছি, যাঁহারা এই দশবৎসর-মধ্যে নানা সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কথা বলিতে পারি না। যাঁহারা নানাবিধ স্কুলবুক লিখিয়া তরলমতি

বালকবৃন্দের মনে নানাবিধ ভাবের উদ্রেক করিতেছেন, তাঁহাদের কথা কিছু বলিতে পারিব না। যাঁহারা ইংরাজী বিজ্ঞান অনুবাদ করিয়া দেশের মহত্তা শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের কথাও বলিতে পারিব না। যাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রের নানা নূতন মত আবিষ্কার করিয়া, অনুবাদ করিয়া ও প্রচার করিয়া দেশীয়দিগকে নানা প্রকার হিতকর এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরনিরপেক্ষ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা বলিতে পারিব না, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি যে সকল মহোদয়গণ বঙ্গীয় সম্বাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁহাদের নামও করিতে পারিব না। কিন্তু যেমন শিব বিষ্ণু ও দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজার পূর্ব্বে "আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ" "ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ" ফুলচন্দন দেওয়া হয়, সেইরূপ তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বক্তব্য বিষয়ে অবতীর্ণ হইব। এরূপ সংক্ষেপ করিবার আরও একটি কারণ আছে। আমি ক্ষুদ্র মানব, আমি তাঁহাদের ও তাঁহাদের কার্য্যের সহিত পরিচিতও নহি; আর আমি তাঁহাদের পূজাপদ্ধতিও বিশেষরূপে অবগত নহি। অতএব তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার নিজ বক্তব্যপথে গমন করি।

আমাদিগের প্রথম লেখক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইঁহার জীবনে ও ইঁহার পদ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বাধীনতা, সমাজের প্রতি সমূহ অবজ্ঞা, গ্রন্থেও তেমনি সমস্ত কল্পনার বন্ধনচ্ছেদ। কবি আমাদিগকে তাঁহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে স্বর্গ, নরক, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, সব দেখাইয়াছেন, উন্মত্ত কল্পনা উদ্দামভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইনি সকল ভাষায় ব্যুৎপন্নকেশরী ছিলেন, ইঁহার মনোমধ্যে নানাজাতীয় ভাবরাশি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইনি তাহারই মধ্যে কতকগুলি ধরিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ বহুকাল কেহ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহার তিলোত্তমা কি কাব্য, না মহাকাব্য, না খণ্ডকাব্য? আমি বলি, উহা স্বর্গীয় কাব্য, না হয় বলি, উহা উন্মাদের কাব্য। তাঁহার পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী অত্যুৎকৃষ্ট নাটক, তাঁহার বীরাঙ্গনা গীতিকাব্য জয়দেবের সমস্থানীয়, তাঁহার বীরাঙ্গনা বীরাঙ্গনা-গণের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ-দেশান্তরাহৃত ভাবরাশি তাঁহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তিনি তাহাদিগের কয়েকটিকে একত্র করিয়াছিলেন মাত্র। সেটি সত্য, কারণ, তিনি সমস্ত কাব্য সবে দুই বৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন, আর কত কত ভাবমালা যে তাঁহার মনে ছিল, কত ভাব যে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার জন্য মনেই মিলাইয়া গিয়াছে, কতই যে তাঁহার অকালমৃত্যু হেতু বিকাশ পায় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য; তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা এক একটি রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল, যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহমধ্যে মহামান্য হয়।

মাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে আর দুই জন কবি বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। মাইকেল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা আজিও জীবিত আছেন। হেমচন্দ্র গীতিমালায় দেশীয় লোকের মধ্যে প্রথম উচ্চতর ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার কবিতাবলী অতুল্য পদার্থ; উহাতে সত্য সত্যই মন গলাইয়া কবির অভিলষিত পথে চালাইয়া দেয়। তাঁহার বৃত্রসংহার স্বদেশহিতৈষণায় পরিপূর্ণ। তিনি মাইকেলের শিষ্য, বৃত্রসংহারে মাইকেল তাঁহার আদর্শস্থল। মাইকেলের মেঘনাদ অপেক্ষা তাঁহার বৃত্রসংহার কোন কোন অংশে নিকৃষ্ট হইলেও উহা বঙ্গবাসীর অধিকতর আদরের জিনিস, উহাতে মাইকেলের উদ্দামকল্পনা না থাকিলেও উহার আদ্যন্ত একভাবে সুন্দররূপে গ্রথিত। হেমচন্দ্রের বৃত্র ও কবিতাবলী বহুকাল বাঙ্গালার প্রধান পুস্তকমধ্যে গণ্য থাকিবে। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত দিন উহাদের মার নাই। হেমচন্দ্র ইংরাজী উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যগুলির অনুকরণ বাঙ্গালায় করিতে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, বোধ হয়, অনেক স্থলে তিনি কাব্যগুণে তাঁহার আদর্শকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার গঙ্গার উৎপত্তি উদ্দাম অথচ সুগঠিত প্রতিভার সুন্দর বিকাশ।

মাইকেলের সমসাময়িক দ্বিতীয় কবি রঙ্গলাল। ইঁহার পদ্মিনী উৎকৃষ্ট উচ্চ অঙ্গের ভাবমালায় পরিপূর্ণ; উহাতে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুমহিলার সতীত্ব ও দেশানুরাগ, পতিব্রতানুরাগ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন; স্বাধীনতার মোহিনীশক্তির ছটা দেখাইয়া দিয়াছেন। ইনি বহুকালাবধি পদ্যাদি আর লিখেন না; কিন্তু ইঁহার

কবিত্বশক্তির ও কাব্যলিখনক্ষমতার কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। ৩।৪ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে ইনি নীতি-কুসুমাঞ্জলি নামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার মত পরিষ্কার ইংরাজীতে যাহাকে Smart বলে, তেমন কবিতা আর কখন দেখি নাই। তাঁহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত। পরিষ্কার টিকল, অথচ সম্যক্ সম্পূর্ণ।

বাবু নবীনচন্দ্র সেন বহুসংখ্যক কবিতা লিখিয়াছেন। ইঁহার পলাশীর যুদ্ধ বীররসপূর্ণ কবিতামালায় পরিপূর্ণ। তাঁহার রাণীভবানীর চরিত্র আমাদিগের হৃদয়প্রস্তরে চির-অঙ্কিত থাকিবে।

ইঁহাদের পর দীনবন্ধু, ইনি ঈশ্বর গুপ্তের ছাত্র। ঈশ্বর গুপ্তের হাতের তৈয়ারী; ইঁহার উপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এত আর কাহার উপর পারেন নাই। সমাজচিত্র অঙ্কনে ইনি অদ্বিতীয়, ইঁহার সধবার একাদশী ও জামাইবারিক সমাজের উৎকৃষ্ট চিত্র। সমাজে দোষ দেখাইয়া সেই দোষকে ব্যঙ্গ করিতে হইলে যত দূর সম্ভব, ইনি তত দূর অতিরঞ্জিত করিতে পারেন। ইঁহার লীলাবতী অপূর্ব্ব পদার্থ। ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজের উৎকৃষ্ট নিয়মাদি অনুকরণে অক্ষম হইয়া অথচ প্রাচীন সমাজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তৎকালের যুবকগণ কিরূপে অধঃপাতে যাইতেন, দীনবন্ধু সে সকল বর্ণনায় অদ্বিতীয়। তাঁহার নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদ, অটল ও নিমে দত্ত কল্পনার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। তাঁহার নীলদর্পণে সমাজের কত উপকার করিয়াছে, কিরূপে অত্যাচারী পাপাশয় নীলকরগণের প্রতি লোকের বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার বিষয় অনেক বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইলে পুঁথি অত্যন্ত বাড়িয়া যায়।

ইহার পর বঙ্কিম বাবু, ইঁহার দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল ও কমলাকান্তের দপ্তর, এক একখানি এক এক অদ্ভুত পদার্থ। ইঁহার গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য যে, বঙ্গীয় পাঠকদিগের সম্মুখে এক একটি উৎকৃষ্ট পুরুষ ও উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র দেখান এবং আরও সৎপথভ্রষ্ট হইলে তাহার যে অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত তাহারও চিত্র দেখান, তাঁহার প্রতাপ পুরুষশিরোমণি, যেমন বুদ্ধি, যেমন বিজ্ঞতা, যেমন কর্ম্মক্ষমতা, তেমনি উচ্চতর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ, আবার তেমনি ধর্ম্মপথে মতিমান্। পূর্ব্বে রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গীয় যুবককে যে সকল শিক্ষা দিত, আজি এই পরাধীন দেশে বঙ্কিমবাবুর পুস্তকগুলি ঠিক সেই শিক্ষা দেয়; তাঁহার কমলাকান্ত আর কেহ নহে, এক জন সুশিক্ষিত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন বঙ্গবাসীর হৃদয়স্থ অনন্ত শোকসাগরের গভীর সমুদ্গিরণ মাত্র; তিনি "এস এস বঁধু এস," এই গীতের ব্যাখ্যাচ্ছলে কমলাকান্তের মুখে যে নানারসপূর্ণ অপূর্ব্ব কাব্যকলাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার সূর্য্যমুখী, আয়েষা, ভ্রমরা, ললিত-লবঙ্গলতা, এমন কি, তাঁহার রূপসী, হীরা, রোহিণী হইতেও আমরা উৎকৃষ্ট নীতিশিক্ষা পাইয়া থাকি। নীতিশিক্ষা কাব্যে অতি অল্প প্রশংসা, উহার রুচি অতি চমৎকার, বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থে সুরুচিবিরুদ্ধ বর্ণনা অতি বিরল, নাই বলিলেও হয়। কিন্তু এই কয়খানি বই লইয়া বঙ্কিম বাবুর সমালোচনা করিলে, তাঁহার উপর শুদ্ধ অবিচার করা হয় মাত্র। তিনি যেরূপ নিজ দেশের জন্য দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এত বোধ হয় আর কেহই করে নাই। তাঁহার বঙ্গদর্শন বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যত উন্নতিসাধন করিয়াছে, এত বোধ হয় আর কেহ কখন করে নাই, ইহাতেও বঙ্কিম বাবুর সব বলা হইল না। ইনিও ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণ করতঃ সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বঙ্গভাষায় লিখাইবার জন্য বিহিত যত্ন করেন। এখনকার লেখকবৃন্দ বঙ্কিম বাবুর নিকট যত ঋণী, এত বোধ হয় আর কাহারও নিকট নহে। এই প্রাচীন বয়সে নানারূপ শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক যন্ত্রণার মধ্যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের গুরুতর পরিশ্রমের উপরও বঙ্গসাহিত্যের জন্য ইঁহার চিন্তা ও পরিশ্রমে বিরতি নাই। বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালী যে ইংরাজী শিক্ষায় কি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালী যে চিন্তাশীলতায়, সুরুচিশীলতায়, কাব্যপ্রসঙ্গে অন্য জাতি অপেক্ষা হীন নহে, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর কথা লইয়া আর অধিক আন্দোলন করা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়। বঙ্কিম বাবু দেশের উপকারার্থ যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, করিতেছেন ও ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দিলে যাহা করিবেন, তাহা অন্যে বলিলে যত সাজিবে, নানা কারণে আমার বলিলে তত সাজিবে না।

বঙ্গদর্শনের দেখাদেখি আমাদের দেশে আর চারি পাঁচখানি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আর্য্যদর্শন কিছুদিন ধরিয়া বাঙ্গালীদিগের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। আর্য্যদর্শনে দেশের মনে পরনিরপেক্ষতাবৃত্তি উদ্দীপনের জন্য নানা প্রকারে যত্ন করা হইয়াছিল। ইহার প্রধান লেখক সম্পাদক

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নিজে এবং পূর্ণচন্দ্র বসু সম্পাদক মিল ও ম্যাটসিনির জীবনচরিত লিখিয়া বঙ্গবাসীকে ইউরোপের দুই জন প্রধান নেতার মনের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র বসু বঙ্কিম বাবুর স্ত্রী-চরিত্রগুলির চরিত্র পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া যথার্থ উচ্চতর সমালোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন; বাঙ্গালায় দ্বিতীয় সাময়িক পত্রিকা বান্ধব, ইহার প্রভাব আমাদের এ অঞ্চলে তত অধিক নাই, কিন্তু ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। ইহার সম্পাদক মনীষা-সম্পন্ন কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে পত্রিকা-সম্পাদন কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজীতে যাহাকে earnest man বলে, আমাদের এ অঞ্চল অপেক্ষা পূর্ব্বাঞ্চলে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক, আর কালীপ্রসন্ন বাবু এই সকল earnest লোকের অগ্রণী, তাঁহার লেখার জীবন্ত ভাব জ্বলন্ত রচনা। তাঁহার সহযোগিগণকে আমরা বিশেষ জানি না, যাহা জানি, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট ভরসা আছে যে, কালীপ্রসন্ন বাবুর সহযোগিগণের মধ্য হইতে অনেক উৎকৃষ্ট লেখক উৎপন্ন হইবেন। আর একখানি সাময়িক পত্র ভারতী, এখানি যোড়াশাঁকস্থ ঠাকুর-পরিবার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ইহার রুচি মার্জ্জিত, ভাষা ললিত। ইহার কার্য্যপ্রণালী সুন্দর, ইহা কখন বাকী পড়ে না, সকল কাগজ এক বৎসর দুই বৎসর বাকী পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতীর বাকী নাই এই পত্রের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইঁহার নিজের গ্রন্থাবলী অতি সুন্দর। স্বপ্নপ্রয়াণে ইঁহার কল্পনাশক্তির অনেক দূর দৌড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারও সহকারী কে কে, আমরা জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি, দ্বিজেন্দ্র বাবুর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। যেখান হইতে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে সরোজিনী, পুরুবিক্রম, বাল্মীকিপ্রতিভা প্রভৃতি দশ বারোখানি সুরুচিসঙ্গত সুললিত পাঠ্য ও উপাদেয় গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অল্প ক্ষমতাশালী বলিয়া বোধ হয় না।

বঙ্গদর্শনে যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে সকলেই উৎকৃষ্ট লেখকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলিও মহীয়ান্ চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ, ইংরাজী সংস্কৃত সাহিত্যে যাহা কিছু মহান্, সমস্ত তাঁহার কবিতায় আছে; তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ, সদ্ভাবাবলী-পরিপূর্ণ। বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী সাধারণীর সম্পাদক, বঙ্গদর্শনে তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। দশমহাবিদ্যা, গ্রাবু প্রভৃতি যে প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের প্রথম অবস্থায় বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে আমোদ ও শিক্ষা দান করিত, তাহার অনেকগুলি তাঁহার লেখনীপ্রসূত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সময়ে সময়ে বঙ্কিম বাবুকে সহায়তা করিতেন, এক্ষণে তিনি বাঙ্গালার একটি মোহিনীময় রচনাপ্রণালীর জন্মদাতা, তাঁহার লিখিত উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম বহুকালাবধি বঙ্গীয় যুবকদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিবে। বঙ্গদর্শনের আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য লিখিয়াছেন, বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার প্রধান সহায় তাঁহার ভ্রাতা বঙ্কিম বাবু আর চন্দ্রনাথ বাবু। * চন্দ্রনাথ বাবু চিন্তাশীল, তিনি বহুকাল কলিকাতা রিবিউয়ের সমালোচক ছিলেন, এক্ষণে ইংরাজী ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় সমালোচনা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। আমরা আর্য্যদর্শনের আর এক জন লেখকের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ইঁহার নাম ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি এক্ষণে সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ইঁহার কল্পতরু ও ভারত-উদ্ধার না পড়িয়াছে, বঙ্গীয় পাঠকের মধ্যে এরূপ লোক অতি বিরল। ইঁহার ভারত-উদ্ধার নামক mock heroic কাব্য অতুল্য পদার্থ। ইনি এক্ষণে পঞ্চানন্দ নামক রহস্যপূর্ণ সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক।

আমার প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু আমি সকলের নিকট আবার একটু ধীরতা ভিক্ষা করি। এই সময়ে আমরা আর কয়েকটি লোকের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাটক দুইখানিতে ইয়ং বেঙ্গলের দোষ ও গুণের অতি সুচারু চিত্র দেওয়া আছে। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লিখিতেছেন, যতদূর আমরা পাইয়াছি, তাহাতে বেশ অনুভব করিতে পারি, বইখানি সম্পূর্ণ হইলে, বাঙ্গালার একখানি অপূর্ব্ব পাঠ্যগ্রন্থ হইবে। তাহার পর বাবু রাজকৃষ্ণ রায় নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া নিজের অসাধারণ ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন ও নিজ ভাষাকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়াছেন,

* প্রস্তাব-লেখকও বটে।—সঃ।

তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা নাই। সাহিত্য-বিষয়ে তাঁহার অসীম মতলবের শেষ নাই, তাঁহার বয়স অল্প বোধ হয়, তিনি অনেক লিখিয়া যাইতে পারিবেন, আর সম্প্রতি কয়েকটি যুবক কল্পনা নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের যেরূপ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দেখিতেছি, তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহার আর বিশেষ সন্দেহ দেখিতেছি না।

বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি তিন চারিখানি উৎকৃষ্ট পদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সম্প্রতি যোগেশ নামক অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা-লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার মন্দা ও নম্মদা স্ত্রীচরিত্রের চরমোৎকর্ষ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর নির্ব্বাসিতের বিলাপ একখানি সুপাঠ্য বাঙ্গালা কাব্য। তাঁহার পুষ্পমালায় বহু-সংখ্যক উৎকৃষ্ট কবিতা আছে, যে কবিতায় তিনি স্বদেশের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় উচ্চতর ভাবপূর্ণ কবিতা [illegible] নাই।

মিষ্টার আর সি, দত্ত চারি [illegible] সুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। তিনি নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট চিত্র লিখিয়া বঙ্গবাসীকে আমোদ ও শিক্ষা দান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট সমাজচিত্র দেখিতে পাই, তাঁহার ভাষা সুললিত এবং তাঁহার গ্রন্থাবলী সর্ব্বজন-মনোরম।

আর দুইখানি গ্রন্থের কথা এ স্থলে বলা আবশ্যক। দুইখানিতে গ্রন্থকার নাম দেন নাই, একখানি বঙ্গাধিপ-পরাজয় আর একখানি স্বর্ণলতা। বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের গ্রন্থকার সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বর্ণনায় যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, উঁহার নরনারী-চরিত্রগুলিও উত্তম। স্বর্ণলতা ইংরাজীতে যাহাকে নবেল বলে, বাঙ্গালায় সেইরূপ সর্ব্বপ্রথম নবেল। বাঙ্গালী সমাজের এরূপ সুন্দর চিত্র অতি বিরল।

হরলাল রায়ের হেমলতা বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যে সকল গুণ থাকিলে নাটক হয়, তাহা উঁহাতে ভূরিপরিমাণে পাওয়া যায়।

আমরা এই বঙ্গীয় লেখক সমালোচনার সর্ব্বশেষে পুষ্পাঞ্জলির সমালোচনা করিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিব। পুষ্পাঞ্জলি বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট মহাগ্রন্থ। ইহার ভাষা সংস্কৃতানুকরণ ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা তাঁহার নিজের। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও ভাষা তাঁহার নিজের। কিন্তু ভূদেববাবুর ভাষা প্রাচীন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতও কথকসমাজে যে ভাষা কথিত হইত, তন্মধ্যে যাহা কিছু মহীয়ান্ ছিল, সে সমুদয়ের সার সংগ্রহ অনুকরণাতীত। ইহার ভাবাবলী বঙ্গবাসীর অস্থিমজ্জায় গ্রথিত থাকা উচিত। পুষ্পাঞ্জলি একখানি অদ্ভুত পদার্থ। ভূদেববাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালায় ইংরাজীওয়ালার লিখিত প্রথম উপন্যাস।

আমরা আর অধিক লোকের গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া সকলের অধীরতা বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে, চিহ্নিত সিবিল সার্ভেন্ট হইতে সামান্য স্কুলমাষ্টার পর্য্যন্ত বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আগে লোকে ইংরাজী লিখিত, কিন্তু আধুনিক যুবকগণ ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিতেছেন। অনেকে ইংরাজী লেখায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও বাঙ্গালা আরম্ভ করিতেছেন। ক্রমে লোকের সংস্কার দাড়াইতেছে যে, নানা ভাষা শিখিব, নানা দেশ দেখিব, কিন্তু লিখিব নিজ ভাষায়। ইহার প্রমাণ ভারতীতে প্রকাশিত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্রখানি। তাঁহার পত্রাদি বাঙ্গালায় লিখিত, তাঁহার মন বাঙ্গালার জন্য আকুল। তিনি সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে যখন বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর জন্য কাঁদিয়াছেন, তখন আর এ কথার বিশেষ প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। যখন সকল অবস্থাপন্ন সকল ব্যবসায়ী লোকের মধ্যেই সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ করিতেছে, তখন সাহিত্যের যে মহতী শ্রীবৃদ্ধি অচিরাৎ সাধিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এখনও একটি কথা বাকি আছে। যে কেহ বাঙ্গালা সাহিত্য লিখিতেছেন, তাঁহারই অন্য ব্যবসায় আছে, কেহ চাকুরী করেন, কেহ জমীদার, কেহ উকীল, কেহ ব্যবসায় করেন অথচ পুস্তক লেখেন। অতএব সকলেই amateur; কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, সাহিত্য একটি ব্যবসায় হওয়া চাই, আজিও তাহা দাঁড়ায় নাই; এখনও শুদ্ধ সাহিত্য ব্যবসায় করিয়া কেহ জীবননির্ব্বাহ করিতে পারেন না। যাহাতে সাহিত্য ব্যবসায় হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমার বোধ হয়, রজনীকান্ত গুপ্ত ও বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ভিন্ন আর কেহই শুদ্ধ সাহিত্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করেন না। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আজিও গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে লাভ আছে, আজিও এক জন ভাল গ্রাহ

গবর্ণমেণ্ট চাকুরীতে যাইবামাত্র অন্ততঃ ৭৫ কি ১০০ টাকা পাইতে পারেন। যত দিন সাহিত্য ব্যবসায় প্রথম হইতেই ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ না দেখাইতে পারে, তত দিন উৎকৃষ্ট শিক্ষিত লোক সাহিত্য ব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিশ্রম করিতে চাহিবে না। এই নূতন সমাজে সমস্ত ইউরোপীয় প্রাচ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যরাশি উদ্ঘাটিত হইয়াও যে বঙ্গীয় সাহিত্যের আজিও আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই, তাহার কারণ স্বাধীন সাহিত্য ব্যবসায় না থাকা। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ যে কেন অনবরত বাহির হয় না, যাহাও বাহির হয়, তাহাও দেরিতে দেরিতে হয়, ইহার প্রধান কারণ এই যে, পুস্তকরচনা ব্যবসায়ান্তরাবলম্বী গ্রন্থকারদিগের খুশী ও অবসরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সাহিত্য জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিবে, কিন্তু যত দিন সাহিত্য ব্যবসায় না হইবে, proffession না হইবে, তত দিন সাহিত্যের বদ্ধমূলতা হওয়া অসম্ভব। সাহিত্য ব্যবসায় করিতে হইলে, আমাদিগের কি করিতে হইবে? কোন ভাল নূতন পুস্তক বাহির হইলেই যদি সেগুলি কতক কতক বিক্রয় হইবার নিশ্চয় সম্ভাবনা থাকে এবং সাহিত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারে, এরূপ বহুসংখ্যক লোক থাকে, যদি গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য গ্রন্থকারগণকে অলস, মৎসর, ব্যঙ্গপ্রিয় সমালোচকের লেখনীর উপর নির্ভর না করিতে হয়, আর বহুসংখ্যক লাইব্রেরী থাকে, যাহাতে সকল প্রকার গ্রন্থই ক্রীত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই সম্যক্ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আমরা এক পরিবারের গুণের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; সে কলিকাতার ঠাকুরবাড়ী। শোভাবাজারের রাজবাড়ী যেমন ভট্টাচার্য্যদিগের উৎসাহদাতা, ঠাকুর-পরিবারও তেমনি এই নবাঙ্কুরিত সাহিত্যের উৎসাহদাতা হইয়াছেন। নূতন সাহিত্য প্রচারের সময় অন্যান্য প্রসিদ্ধ পরিবারগণ যদি উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে স্বাধীন সাহিত্য ব্যবসায় অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সাবিত্রী লাইব্রেরীর ন্যায় লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়িয়া গেলে, লেখকগণ স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত হইলে, বঙ্গীয় সাহিত্যের যে অদ্ভুত উন্নতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের সাহিত্যের প্রকাণ্ড ভাণ্ডার অচিরাৎ প্রস্তুত করিবার যেমন আশ্চর্য্য সুবিধা হইয়াছে, এমন অল্প জাতির ভাগ্যে ঘটে, আমাদের দেশে যে কোন নবোৎসাহ জন্মাক, সকলেই সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে; ব্রাহ্মদিগের নবোৎসাহে সাহিত্যসংখ্যা যে কত বৃদ্ধি করিতেছে, তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে সে সাহিত্যের বিষয় বড় কেহ অবগত নহেন। তাহার পর ইংরাজী আমাদের bread winning language, আমাদের ইংরাজী পড়িতেই হইবে। সুতরাং ইংরাজী পড়ার দরুণ আমাদের সাহিত্যের যে উন্নতি সম্ভাবনা, তাহা একপ্রকার চিরস্থায়ী বলিতে হয়। তাহার পর আমাদের এত বিদ্যানুরাগের সময় সংস্কৃত এখনও অনেকে পড়িবে, প্রাচীন আর্য্যভাষা কোন বাঙ্গালী অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না, সুতরাং সংস্কৃতপাঠ হেতু সাহিত্যের যে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, সেও চিরস্থায়ী। এখন কেবল চিরস্থায়ী সাহিত্যমাত্রব্যবসায়ী একদল লেখক চাই, তাহা হইলে আমরা অল্পদিনে পৃথিবীর আর সমস্ত সাহিত্যকে কাণা করিয়া দিতে পারিব, সকলকে হারাইয়া দিতে পারিব, যাহা এই বিশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে, অন্য দেশে তাহা দুই শত বৎসরে হয় না। আর বিশ বৎসরে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হইবে, নিশ্চয়; কারণ, লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশই অল্পবয়স্ক, ইঁহাদের বয়োবৃদ্ধি সহকারে লেখার গুণও অধিক হইবে, আর সংখ্যাও অধিক হইবে। সাময়িক পত্রিকাগণ প্রতিবৎসরই দুই একটি করিয়া লেখক তৈয়ারী করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে, এই সকল লেখক যাহাতে গবর্ণমেণ্ট বা অন্য সার্ব্বিসে না গিয়া কেবল সাহিত্য লইয়া কাল কাটাইতে পারে, তাহার যোগাড় করিয়া দিলেই বাঙ্গালা সাহিত্যের জয়ধ্বনি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী পৃথিবীমধ্যে এক মহাজাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। অনেকে বলেন, বঙ্গভাষার অবস্থা বড় হীন; কিন্তু এই বঙ্গীয় লেখকমণ্ডলীমধ্যে দাড়াইয়া তাঁহাদের কথায় সায় দিতে পারি না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে। যখন প্রতি তিন মাসে পাঁচ ছয় শত নূতন পুস্তকের রেজষ্টরি হয়, যখন এক কলিকাতায় পাঁচ শত প্রেস অনবরত চলিতেছে, যখন উচ্চ, নীচ, বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলেই বাঙ্গালা লিখিবার ও পড়িবার জন্য উৎসুক, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে।

আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতিশুভকর, বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত ভাবী লেখক ভাবী প্রতিভাশালী লোক উদয়

হইতেছেন, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত মহাকাব্য বঙ্গবাণীকে আনন্দে ভরাইয়া ভাষান্তরিত হইয়া দেশ-দেশান্তরস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে আনন্দে মগ্ন করিতেছে। আমার কর্ণে কত ভবিষ্যৎবাণীর ও বীণার প্রতিঘাত লাগিতেছে, তাহা বলিতে পারি না। এই সকলের পশ্চাতে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, একটি গৌরবান্বিত মহাশক্তিমান্ মহাজাতি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উত্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে বর্ত্তমান পুরুষের মহামহোপাধ্যায়গণের গুণগান করিতেছে; আর মহা আনন্দভরে দেবনির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী মহোদয়দিগকে পূজা করিতেছে।

[বঙ্গদর্শন ৭ম খণ্ড—১২৮৭ ফাল্গুন।

নূতন কথা গড়া

যে কেহ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি জানেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় অনেক ভাব সহজে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। ঐ সকল ভাব ব্যক্ত করিতে গেলে, কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্দ গঠন করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, অন্যান্য ভাষা হইতে নূতন শব্দ আমদানী করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, চলিত কথা দিয়া যেরূপে হউক ভাব প্রকাশ হইলেই যথেষ্ট হইল। ইংরাজীতে যে ভাব এক কথায় ব্যক্ত হয়, বাঙ্গালায় যদি তাহাই ব্যক্ত করিতে তিন ছত্র লিখিতে হয়, সেও স্বীকার, তথাপি নূতন শব্দ গঠন বা ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়ন উচিত নহে। আমরা এ তিনটির কোন মতেরই সম্পূর্ণ পোষকতা করিতে পারি না। কখন কখন নূতন শব্দ গঠনের প্রয়োজন হয়; কখন ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়নের প্রয়োজন হয়; কখন অনেক কথায় ভাবটি ব্যক্ত করিতে গেলে, লেখার বাঁধনী থাকে না, এবং ভাবটিও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না।

একটি উদাহরণ দিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। "উকিলীতে আজকাল বড়ই compition", এখন compition শব্দে যে ভাব ব্যক্ত হয়, বাঙ্গালা ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবার কোন কথা নাই। আমরা কি করিব? ঐ শব্দটি কি বাঙ্গালা করিয়া লইব, না উহার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত ধাতুপাঠ খুঁজিয়া "সজ্ঘর্ষ" শব্দ গড়িয়া লইব? না বলিব উকিলীতে আজকাল অনেক লোক হইয়াছে, অতএব উহাতে পসার করা বড়ই শক্ত।

এই তিন উপায়েই দোষ-গুণ উভয়ই আছে। সজ্ঘর্ষ শব্দটি হয় ত একেবারেই নূতন, যদি সংস্কৃতে থাকে, এরূপ অর্থে কখন ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং সজ্ঘর্ষ বলিলে, যিনি শব্দটি গড়িবেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু উহার এক গুণ আছে। উহা সংস্কৃতমূলক; সুতরাং অনেক লোক উহা ইংরাজী কথা অপেক্ষা ভাল বলিবেন, আর উহা যদি চলিয়া যায়, তবে ইংরাজের কাছে উহার জন্য দেন্দার থাকিতে হইবে না। কিন্তু এ কথা চলিবে কি?

যাহারা ইংরাজী জানে না, compition কথাটি তাহারা বুঝিবে না; কিন্তু সজ্ঘর্ষ বলিলে যত লোকে বুঝিবে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোকে বুঝিতে পারিবে।

উকিলীতে অনেক লোক হইয়াছে, অতএব পসার করা শক্ত বলিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে, কিন্তু অল্প কথায় বলা না হওয়ায় কেমন একটু ভাসা ভাসা লাগে। হয় ত যে প্রণালীতে রচনা হইতেছে, অত কথায় বলিলে সে প্রণালীর সহিত সংচার বিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

আমরা যে এই কথা বলিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, নূতন ভাব প্রকাশ করিতে গেলে প্রকাশকের বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। হঠাৎ যাহা হয়, একটি করিয়া ফেলা উচিত নহে। কারণ, এরূপ দুরূহ কার্য্যে হঠাৎ কিছু করিলে ভাল না হইয়া বরং মন্দ হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমরা বলি, নূতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বা নূতন জিনিসের নাম দিতে হইলে, বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া, সংস্কৃত প্রভৃতিতে যে সকল কথা চলিত আছে, সেগুলি প্রণিধান পূর্ব্বক দেখা উচিত। যদি তাহার মধ্যে কোন কথায় ভাব প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সেই ভাষার কথাই প্রচলিত করিয়া দেওয়া উচিত। অনেক সময় চলিত ভাষায় এবং ইতর ভাষায় এমন সুন্দর কথা পাওয়া যায় যে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে।

প্রথম উদাহরণ।

কাচ সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। সহজে ভাঙ্গা গুণ প্রকাশ করিবার জন্য ইতর ভাষায় একটি শব্দ আছে "ঠুন্‌কো"; কিন্তু যাহারা স্কুলের বই লেখেন, তাঁহারা ঐ কথাটি না জানিয়া অথবা উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন—কাচ ভঙ্গপ্রবণ। যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার নাম সংস্কৃতে ভঙ্গুর, সুতরাং ভঙ্গপ্রবণ শব্দটি না বাঙ্গালা, না ইংরাজী, না সংস্কৃত। অথচ বাঙ্গালায় প্রায় দশ লক্ষ ছাত্র গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে শিখিল—কাচ ভঙ্গুর নহে, ঠুন্‌কোও নহে, উহা ভঙ্গপ্রবণ।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

"দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান" বাঙ্গালায় নাই; সুতরাং উহার নামও বাঙ্গালায় নাই: কিন্তু আমার প্রয়োজন ঐ স্থানটির নাম দেওয়া। হিন্দীতে ঐ স্থানকে "দূন" বলে। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ ঐ কথাটি না জানিয়া অথবা উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন কি না—উপত্যকা। উপত্যকা সংস্কৃতে চলিত শব্দ; কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই যে, উহাতে পর্ব্বতের আসন্ন ভূমি বুঝায়, দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান বুঝায় না। সুতরাং গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে দশ লক্ষ বালক একটি "ভুল" শিখিল।

তৃতীয় উদাহরণ।

যেখানে বসিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি গণনা করেন, তাহার হিন্দী নাম মানমন্দির বা তারাঘর। কিন্তু অনেকে উহার ইংরাজী নাম observatoryর তর্জ্জমা করিয়া নাম রাখিলেন, পর্য্যবেক্ষণিকা। কেহ বুঝিল না, অথচ কেতাবে কেতাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ উদাহরণ।

ভারতবর্ষের উত্তর অংশের পর্ব্বতময় প্রদেশকে লোকে উত্তরাখণ্ড বলে, কিন্তু ইংরাজীতে উহাকে Himalayan negious বলে বলিয়া বাঙ্গালা পুস্তকে উহার নাম হিমালয় প্রদেশ হইয়াছে। এরূপ উদাহরণের অভাব নাই, যথেষ্ট আছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, নূতন ভাব প্রকাশ করিতে গেলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। কিন্তু দুঃখের কথা, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে কাহারই সে বিবেচনা নাই। তাঁহারা পড়েন ইংরাজী, ভাবেন ইংরাজীতে, সুতরাং লিখিবার সময়ে ইংরাজীতে ভাব আসিয়া যোগায়। জাতীয় স্বভাব আলস্যবিশেষ অনুসন্ধান করিতে দেয় না। অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও বিদ্যায় কুলাইয়া উঠে না। যাঁহারা বেশী অলস, অথচ একটু বুদ্ধি আছে, তাঁহারা ইংরাজী ঠিক রাখিয়া দেন। যাঁহাদের উহাদের মধ্যে একটু হিতাহিতজ্ঞান আছে, তাঁহারা যাহা হয় একটা তর্জ্জমা করিয়া পরেই বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজী কথাটি রাখিয়া দেন, অর্থাৎ দেশ শুদ্ধ লোককে বলিয়া দেন, আমি তর্জ্জমা করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার বিদ্যায় কুলাইয়া উঠিল না। অনেকে আবার শুদ্ধ তর্জ্জমা করিয়াই রাখিয়া দেন, ইঁহাদের লেখা সময়ে সময়ে বড়ই মিষ্ট। Bear the Responsibilaty থাকিলে ইহার তর্জ্জমা করেন, জবাবদিহি বহন। Is appointed a Lectureor তর্জ্জমা করেন বক্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। He seconded my proposal, আমার প্রস্তাব দ্বিতীয় করিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরস্বতীর বরপুত্র বা ভিক্ষাপুত্র * বলিয়া পরিচিত—হইবার বাসনা বড়ই প্রবল। মনে মনে সকলেই অহম্—উত্তম পুরুষ। জ্ঞান—আমি জিনিয়স। সুতরাং খাটিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। ইংরাজী পুস্তক যেমন দেখিলেন, অমনি তখনি তর্জ্জমা করিয়া ফেলিলেন। প্রায় পূর্ব্বকালের মাছি-মারা কেরাণীদিগের মত যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং করিয়া ফেলিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের পুস্তকে দেশী নামগুলি চিনিয়া লওয়া ভার হয়। তাঁহারা মল্লার রায়কে 'মলহর' রায় লেখেন। রাঘবকে 'রাঘোবা' লেখেন। তাঁহাদের গ্রন্থে রাজপুতকুল-ধুরন্ধর সংগ্রামসিংহকে আমরা আর চিনিতে পারি না। তাঁহার নাম হয় রাণা সঙ্গ। জয়জী রাও জিজি-রায় হন। তাঁতীয়া রায় টান্টিয়া টোপী হন। পবিত্র-তীর্থ বারাণসী—"বেনারস" হইয়া যায়। লাহোরের একটি নগর আছে, তাহার নাম গুজরান-ওয়ালা। কিন্তু বাঙ্গালা ভূগোলে উহাকে চিনিয়া উঠা ভার, উহার নাম গুজন্বার্লা হইয়াছে।

যাহারা দেশীয় নামের বানান পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া লইতে অনিচ্ছুক, তাহারা যে নূতন শব্দ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব। ইচ্ছামত নূতন শব্দগঠনের, বড় বড় ইংরাজী কথা প্রবেশনের এবং জবাবদিহি বহন গোছ, তর্জ্জমার ফল এই যে, বাঙ্গালা পুস্তক প্রায়ই অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে, বরং সংস্কৃত বা ইংরাজী বুঝা যায়, তথাপি বাঙ্গালা বুঝা যায় না। ইহারই জন্য শিক্ষিত মহলে বাঙ্গালার তাদৃশ আদর হয় না। ইহার এক ভয়ানক দোষ এই যে, ভাষার কিছু স্থিরতা থাকে না। অধিকাংশ বাঙ্গালা-লেখক বাঙ্গালা পড়েন না, কেবল লেখেন। নূতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে তাঁহারা নিজের মনোমত নূতন শব্দ গড়িয়া দেন। পূর্ব্বে অন্যলোক সেই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কি কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সন্ধান লয়েন না। এইরূপে একটি ভাব

* যাঁহারা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগকে লোকে সরস্বতীর ভিক্ষাপুত্র বলে।

প্রকাশের জন্য রাশি রাশি নূতন কথা সৃষ্টি করা হয়। অথচ আমরা দেখিতে পাই, হয় চলিত ভাষায়, না হয় পার্শ্বস্থ দেশের চলিত ভাষায় অথবা চলিত সংস্কৃতে একটু খুঁজিলে উৎকৃষ্ট শব্দ পাওয়া যাইত।

দুই এক জন লোক এমনি আহাম্মক আছে যে, ঘরে টাকা থাকিতে ধার করে। আমাদের বাঙ্গালী লেখকও ঠিক সেইরূপ হইতেছে। বৃথা অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে, অথচ ভাষার কিছুমাত্র উন্নতি হইতেছে না এবং বাঙ্গালা ভাষা কি, তাহাও ঠিক হইতেছে না। বাঙ্গালা যে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃত হইতে ইহার সত্তা স্বতন্ত্র, জীবন স্বতন্ত্র, উৎপত্তি স্থিতি এবং লয় এই তিনই স্বতন্ত্র, এ কথা বর্ত্তমান লিখিত বাঙ্গালা ভাষা দেখিলে কাহারও বোধগম্য হয় না। যে পারস্যভাষায় প্রায় ৭০০ শত বৎসর ধরিয়া দেশের প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, ভদ্রসমাজে কথিত বাঙ্গালাভাষায় শতকরা ৫০টি কথা যে ভাষা হইতে গৃহীত, বাঙ্গালা ব্যাকরণের হাড়ে হাড়ে যে ভাষা বিন্ধিয়া আছে, যে ভাষার কথা ব্যবহার করিলে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝিতে পারে, আমরা প্রাণপণে সে ভাষার কথাগুলি লিখিতভাষা হইতে দূর করিবার চেষ্টা করি। নালিশ বলিলে সকলে বুঝিতে পারে; কিন্তু তাহা ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকারেরা অভিযোগ লেখেন। অথচ সংস্কৃত অভিধান খুঁজিলে অভিযোগ শব্দে আর এক অর্থ বুঝায়, নালিশ বুঝায় না। এইরূপে আদালতে প্রচলিত সমস্ত পারসী কথা লিখিত বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সেই সকলের পরিবর্ত্তে অতি দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ সকল অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

উদাহরণ—রফা বলিতে গেলে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলাকে বলে, মীমাংসা বলিলে সে অর্থ বুঝায় না, কিন্তু রফার জায়গায় অনেকেই মীমাংসা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পাট্টা কবুলতি চলিত কথা, সকলেই বুঝিতে পারে, কিন্তু অনেকে উহার পরিবর্ত্তে ভোগনিয়োগপত্র না এমনি কি একটা কথা ব্যবহার করেন, তাহা আমাদের মনে থাকে না। কেহ তাহা বুঝেও না।

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃতাধ্যাপকগণ প্রথম বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন পারস্য কথার প্রতি এরূপ বিদ্বেষ থাকা কতক সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন লেখকগণের মধ্যে সংস্কৃত পণ্ডিত অতি বিরল। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, এ বিষয়ে উঁহাদের অপেক্ষাও ইঁহারা অধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ইঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে গিয়া প্রায়ই অর্থবিষয়ে ভয়ানক ভুল করিয়া ও নানারূপ গোলযোগ করিয়া বসেন।

যে সর্ব্বদা উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্রতত্ত্ব ভাবিয়া থাকে, তাহার নাম ইংরাজীতে Thoughtful, বাঙ্গালা লেখকেরা উহার নাম রাখিয়াছেন চিন্তাশীল। চিন্তা বলিলে বাঙ্গালায় দুর্ভাবনা বুঝায়, চিন্তিত, চিন্তাযুক্ত, চিন্তাশীল বলিলে যে সর্ব্বদা দুর্ভাবনাগ্রস্ত অর্থাৎ মনমরা, তাহাকেই বুঝায়, সুতরাং চিন্তাশীল শব্দে গ্রন্থকার যাহা বুঝিলেন, পাঠক ঠিক তাহার উল্টা বুঝিল।

উপন্যাস বলিতে গল্প বুঝায়, কিন্তু ইংরাজীতে একপ্রকার উপন্যাস আছে, তাহার নাম নবেল, তাহাতে এবং উপন্যাসে প্রণালীগত একটু ভেদ আছে, সেই জন্য বাঙ্গালী লেখকেরা উপন্যাস শব্দ ত্যাগ করিয়া নবেলের নাম নবন্যাস রাখিয়াছেন। নবন্যাস বলিতে গেলে সংস্কৃতে নূতন গচ্ছিত ধন বুঝায়, কারণ, ন্যাস মানে গচ্ছিত ধন, অতএব নবন্যাস কথাটি সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য।

এক এক দল সৈন্যের নাম আছে column; কিন্তু column বলিতে থাম বুঝায়, আর থামের সঙ্গে সৈন্যদলের ইংরাজের চক্ষে কোনরূপ সৌসাদৃশ্য থাকায় বোধ হয় ইংরাজে উহাকে column বলে, আমাদের সে সৌসাদৃশ্য চক্ষে লাগে না, তথাপি আমাদের লেখকেরা অনায়াসে সৈন্যস্তম্ভ বলিয়া উহার তর্জ্জমা করিয়া থাকেন।

তাই আমরা বলিতেছিলাম, লিখিতে বসিয়া ভাব প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যে কথাগুলি ব্যবহার করিতে হইবে, বিশেষরূপ তদন্ত করিয়া তাহাদের অর্থ ঠিক করা উচিত এবং নূতন শব্দ গঠনের পূর্ব্বে বিশেষরূপ সতর্ক হওয়া উচিত।

এ সকল অপেক্ষা আর একটি সহজ পরামর্শ আছে। যত দিন পর্য্যন্ত মনোমধ্যে ভাব ইংরাজীতে উদয় হয়, তত দিন যেন কেহ বাঙ্গালা লিখিতে না বসেন। বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যেন বাঙ্গালায় ভাবিতে শিখা হয়, তাহা হইলে অনেক সময় নূতন ভাব আপনা আপনিই বাঙ্গালায় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহার জন্য মাথা কুটাকুটি করিতে হইবে না।

[বঙ্গদর্শন ৮ম খণ্ড—১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ।

বাঙ্গালা ভাষার পরিণতি

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে গেলে প্রথমতঃ রচনা-প্রণালী লইয়া বড়ই গোল বাধে। একদল—জনমেজয় যেমন সর্প দেখিলেই আহুতি দিতেন, সেইরূপ পারসী কথা দেখিলেই তাহাকে তাঁহারা আহুতি দেন। আর একদল আছেন, তাঁহারা সংস্কৃত কথার প্রতি সেইরূপ সদয়। কেহ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার কথা দেখিলেই চটিয়া উঠেন, প্রবন্ধের মধ্যে হাজার ভাল জিনিস থাকুক, আর পড়েন না। আবার কেহ আছেন, যেই দেখিলেন, দুই পাঁচটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, অমনি সে গ্রন্থ অপাঠ্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। এখন আমরা গরীব দাঁড়াই কোথা? আমরা ইংরাজী পড়ি, আমাদের অর্দ্ধেক ভাবনা ইংরাজীতে। আমরা কলম ধরিলেই ইংরাজী কথায় ইংরাজী ভাব আসে। সংস্কৃত আমরা যা পড়ি, তাতে সে ভাব ব্যক্ত হয় না। বাঙ্গালার বিদ্যা বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, আর বঙ্কিম বাবুর নভেল কয়খানি। তাতেও ত কুলায় না, নূতন কথা গড়ি, এমন ক্ষমতাও নাই, তবে আমাদের কি হইবে? হয় কলম ছাড়িতে হয়, না হয়, যেরূপে পারি, মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া দিতে হয়। নিজের কথায় নিজের ভাব আমি ব্যক্ত করিব, তাহাতে অন্যের কথা কহার স্বত্ব কতদূর আছে, জানি না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই দলের লোক দুই দিক্ হইতে কুঠার লইয়া তাড়া করেন। সুতরাং এক এক সময়ে বোধ হয় "* * * তত্র মৌনং হি শোভতে"; কিন্তু আবার যখন অঙ্গুলী-কণ্ডুয়ন উপস্থিত হয়, তখন না লিখিয়াও থাকিতে পারি না। বিশেষ এই যে, যখন কর্ত্তব্য-বোধে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন পাঁচ জনের কথায় তাহা হইতে নিরস্ত হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কাজ যে কোন ভাষাই হউক, যে কোন রচনা-প্রণালীতেই হউক, যদি দুটা ভাল কথা বলিতে পারি, পাঁচ জনের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিব কেন?

তবে ভাল কথা বলিতে যদি মন্দ কথা বলি, তাহা হইলে পাঁচ জনের গালাগালি দিবার বাস্তবিক অধিকার আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণ কথাটা ভাল কি মন্দ, সে দিকে লক্ষ্যও করেন না। নাই করুন, কথাটা ভাল করিয়া বলা হইয়াছে কি না, তাহাও দেখেন না। দেখেন কেবল লেখার মধ্যে বড় বড় সংস্কৃত কথা আছে কি পারসী ও ইংরাজী শব্দ আছে। মারামারি করেন কেবল তাহাই লইয়া। সুতরাং আমার মত ক্ষুদ্র লেখকবর্গের সেই বিষয়েই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। তাহাতেও গোলযোগ। যখন দুই দল দুই দিক্ ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন, তখন উভয় দলের মন রক্ষা করা অসম্ভব। অথচ যে দলের মনরক্ষা না হইবে, তিনিই কুঠার উত্তোলন করিয়া লেখকের প্রতি ধাবমান হইবেন। এ অবস্থায় লেখকবেচারা বিষম সমস্যায় পড়িয়া যায়।

এ সমস্যার কি পূরণ হয় না? এ সঙ্কট হইতে কি পরিত্রাণের উপায় নাই? বঙ্গীয় লেখককুল কি এই প্রতিকূল বাত্যায় ভগ্নপোত হইয়া অপার সমুদ্রে ভাসিবেন? তাঁহারা কি কূলে উঠিতে পারিবেন না? সমালোচকদিগের এই বিষম রোগের কি উপশম হইবে না? উপশম নাই হউক, ইংরাজীতে বলে রোগের নির্ণয় অর্দ্ধেক উপশম। এ রোগের কারণ নির্ণয়ের কি কিছু চেষ্টাও হইবে না?

অনেকগুলি সুচিকিৎসকের সহিত বিশেষ পরামর্শ করিয়া আমরা ইহার কতক কারণ ঠিক করিয়াছি। ঠিক করিয়াছি বলিতে পারি না, কতক অনুভব করিয়াছি। যাহা বুদ্ধিস্থ হইয়াছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। এ স্থলে কুঠারের ভয় করিলে চলিবে না। যদি আর কেহ অন্য হেতু প্রদর্শন করিতে পারেন, নিরতিশয় আনন্দ সহকারে শ্রবণ করিব।

কথাটি এই যে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাভাষায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। হয় ইংরাজী পড়িয়াছেন, না হয় সংস্কৃত পড়িয়াছেন, পড়িয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। কতকগুলি অপ্রচলিত সংস্কৃত ও নূতন গড়া চোয়ালভাঙ্গা কথা চলিত করিয়া দিয়াছেন। নিজে ভাবিয়া কেহ বই লেখেন নাই, সুতরাং নিজের ভাষায় কি আছে না আছে, তাহাতে তাঁহাদের নজরও পড়ে নাই।

এখন তাঁহাদের বই পড়িয়া যাঁহারা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের যথার্থ মাতৃভাষার জ্ঞান সুদূরপরাহত

হইয়াছে। অথচ ইঁহারাই যখন লেখনী ধারণ করেন, তখন মনে করেন যে, আমার বাঙ্গালা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাঙ্গালা তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ বুঝিল, আর কেহ বুঝিল না। কেমন করিয়া বুঝিবে? সে ত দেশীয় ভাষা নহে। সে অনুবাদকদিগের কপোলকল্পিত ভাষার উচ্ছিষ্ট মাত্র। দেশের অধিকাংশ লোকই উচ্ছিষ্টভোজনে জাতিপাতের ভয় করে, অথচ লেখকমহাশয়েরা তাহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ বলিয়া উপহাস করেন। এই গেল এক দলের কথা :—

আবার যখন অনুবাদকদিগের এইরূপ দীর্ঘ ছন্দ সংস্কৃতের "নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্দের" নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দরের অসম্ভব বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, যখন সংস্কৃত, ইংরাজী পড়া অপেক্ষা বাঙ্গালা পড়ায় অভিধানের অধিক প্রয়োজন হইয়া পড়িল, তখন কতকগুলি লোক চটিয়া বলিলেন, এ বাঙ্গালা নয়। বলিয়া তাঁহারা যত চলিত কথা পাইলেন, তাহাই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু ইঁহারা সংস্কৃতের সং পর্য্যন্ত শুনিলে চটিয়া উঠেন। এমন কি, ইঁহারা সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহার করিতে রাজি নন। অপভ্রংশ শব্দ, ইংরাজীশব্দ, পারসীশব্দ ও দেশীয় শব্দের দ্বারা লিখিতে পারিলে সংস্কৃতশব্দ প্রাণান্তেও ব্যবহার করেন না। এই গেল আর এক দলের কথা। সুতরাং এই উভয় দল যে পরস্পর বিরোধী হইবেন, এবং বঙ্গীয় লেখকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন, আপত্তি কি?

আমরা যে পূর্ব্বে লিখিয়াছি, বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা এ পর্য্যন্ত লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই, ইহা অতি সত্য কথা। আমরা ইতিহাস দ্বারা এইটি সমর্থন করিব।

সকলেই জানেন, অতি অল্পদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যগ্রন্থ ছিল না, কিন্তু পদ্য প্রচুর ছিল। ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সকল পদ্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। কৃত্তিবাস কাশীদাস অনুবাদ করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাদের গ্রন্থে দু পাঁচটি অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ থাকিলেও উহা প্রধানতঃ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কবিগণের লেখা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। গদ্য না থাকিলেও ভদ্রসমাজে যে ভাষা প্রচলিত থাকে, তাহাকেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা কহে। আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিনপ্রকার বাঙ্গালা ভাষা চলিত ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাঙ্গালায় অনেক উর্দ্দু শব্দ মিশান থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহুসংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাঙ্গালায় উর্দ্দু ও সংস্কৃত দুই মিশান থাকিত। কবি ও পাঁচালীওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত। মোটামুটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বিষয়ী লোক ও আদালতের লোক এই তিন দল লোকের তিন রকম বাঙ্গালা ছিল। বিষয়ী লোকের যে বাঙ্গালা, তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাঙ্গালা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত।

ইংরাজেরা এ দেশ দখল করিয়া ভাষার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা বহুসংখ্যক আদালত স্থাপন করায় এবং আদালতে উর্দ্দুভাষা প্রচলিত রাখায় বাঙ্গালাময় পারসী শব্দের কিছু অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল মাত্র। সাহেবেরা পারসী শিখিতেন, বাঙ্গালা শিখিতেন। দেশীয়েরা দেশীয় ভাষায় তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেন। সুতরাং ইংরাজী কথা বাঙ্গালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। যাহারা ইংরাজী শিখিতেন বা ইংরাজের সহিত অধিক মিশিতেন, দেশের মধ্যে প্রায়ই তাঁহাদের কিছুমাত্র প্রভুত্ব থাকিত না।

কথক মহাশয়েরা বহুকালাবধি বাঙ্গালায় কথা কহিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সংস্কৃতব্যবসায়ী, কিন্তু তাঁহারা যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ বিষয়ী লোকের ভাষা। কেবল বর্ণনাস্থলে ও সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতী ভাষার অনুসরণ করিতেন।

আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে যে সময়ে ইংরাজ মহাপুরুষেরা বাঙ্গালীদিগকে বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, সেই সময়ে যে সকল পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল, তাঁহারা সংস্কৃত কালেজের ছাত্র। তখন সংস্কৃত কালেজ বাঙ্গালায় একঘরে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে যবনের দাস বলিয়া সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। তাঁহারা যে সকল গ্রন্থাদি পড়িতেন, তাহা এ দেশমধ্যে চলিত ছিল না। এমন কি, দেশীয় ভদ্রসমাজে তাঁহাদের কিছুমাত্র আদর ছিল না। সুতরাং তাঁহারা দেশে কোন্ ভাষা চলিত, কোন্ ভাষা অপ্রচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না। হঠাৎ তাঁহাদিগের উপর বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়নের ভার হইল। তাঁহারাও পণ্ডিতস্বভাব-সুলভ দাম্ভিকতাসহকারে বিষয়ের গুরুত্ব

কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন।

পণ্ডিতদিগের উপর পুস্তক লিখিবার ভার হইলে তাঁহারা প্রায়ই অনুবাদ করেন। সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতেরাও তাহাই করিলেন। তাঁহারা যে সকল অপ্রচলিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহারই তর্জ্জমা আরম্ভ করিলেন। রাশি রাশি সংস্কৃত শব্দ বিভক্তি-পরিবর্জ্জিত হইয়া বাঙ্গালা অক্ষরে উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়া পুস্তকমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। যিনি কাদম্বরী তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, তিনি লিখিলেন, "একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানসসরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলী-বৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।" আমরা পূর্ব্বে যে তিন ভাষার উল্লেখ করিয়াছি, ইহার সহিত তাহার একটিরও সম্পর্ক নাই।

এত গেল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ। ইংরাজী হইতে অনুবাদ একবার দেখুন। "পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নিম্মাণ করিতেন। একদা তিনি একটা পুরান বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নিম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু বাক্সমধ্য হইতে অনবরত বিনির্গত জলবিন্দুপাতের দ্বারা নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে পরিচালিত হইত; বেলাববোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।" ইংরাজী পড়িলে বরং ইহা অপেক্ষা সহজে বুঝা যাইতে পারে।

এই শ্রেণীর লেখকের হস্তে বাঙ্গালা ভাষায় উন্নতির ভার অর্পিত হইল। লিখিত ভাষা ক্রমেই সাধারণের দুর্ব্বোধ ও দুষ্পাঠ্য হইয়া উঠিল। অথচ এডুকেশন ডেস্প্যাচের কল্যাণে সমস্ত বঙ্গবাসী বালক এই প্রকারের পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল।

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের দেখাদেখি ইংরাজী-ওয়ালারাও লেখনী ধারণ করিলেন। বাঙ্গালায় সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা যেমন একঘরে ছিলেন, ইংরাজীওয়ালারাও তাহা অপেক্ষা অল্প ছিলেন না। তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বাঙ্গালা ভাষার কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের ভাব ইংরাজীতে মনোমধ্যে উদিত হইত, হজম করিয়া নিজ কথায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। নূতন কথা তাঁহাদের গড়ার প্রয়োজন হইত। গড়িতে হইলে নিজভাষায় ও সংস্কৃতে যেটুকু দখল থাকা আবশ্যক, না থাকায় সময়ে সময়ে বড়ই বিপন্ন হইতে হইত। উৎপিপীড়িষা, জিজীবিষা, জিঘাংসা প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইত। "তুষারমণ্ডিত হিমালয়, গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্তচমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্নসম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিগ্দাহকারী দাবদাহ, বসুমতীর তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চল শিখা-নিঃসারিণী, লোলায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতিসহস্র জনের সন্তাপনাশক বিস্তৃত-শাখা-প্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদনাদে নিনাদিত বিবিধ বিভীষিকাসংযুক্ত জনশূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকার তরঙ্গবিশিষ্ট—প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশাসংহারক হৃৎকম্প-কারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়শঙ্কাসমুদ্ভাবক ভীতিজনক ভূমিকম্প, প্রখররশ্মিপ্রদীপ্ত নিদাঘমধ্যাহ্ন, মনঃ-প্রফুল্লকরী সুধাময়ী শারদীয়া পূর্ণিমা, অসংখ্য তারকামণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগনমণ্ডল ইত্যাদি ভারতভূমি-সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দুজাতীয়-দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ-সমুদায়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন।" এ ভাষার উপর মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। আমরা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক দেখিয়াছি যে, যে বালকেরা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করে, তাহারা অতি সত্বরেই এই সকল কথা ভুলিয়া যায়। কারণ, এরূপ শব্দ তাহাদিগকে কখনই ব্যবহার করিতে হয় না। আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বে লোকের সংস্কার এই ছিল যে, চলিত শব্দ পুস্তকে ব্যবহার করিলে সে পুস্তকের গৌরব থাকে না। সেই জন্য তাঁহারা বরফের পরিবর্ত্তে তুষার, ফোয়ারার পরিবর্ত্তে প্রস্রবণ, ঘূর্ণীর পরিবর্ত্তে আবর্ত্ত, গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তে নিদাঘ প্রভৃতি আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া গ্রন্থের গৌরব রক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতেও তত চলিত নহে, কেবল সংস্কৃত অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে

যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত ছিল, তাহা গ্রন্থকারেরা জানিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে সে সকল কথা মিলেও না। শুনিয়াছি, গ্রন্থকারদিগের মধ্যে দুই পাঁচ জন হয় একখানি অভিধান, না হয় এক জন পণ্ডিত সঙ্গে লইয়া লিখিতে বসিতেন।

এই সকল কারণ বশতঃ বলিয়াছিলাম যে, যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভাল বাঙ্গালা লিখেন নাই। লিখিত বাঙ্গালা ও কথিত বাঙ্গালা এত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে যে, দুইটিকে এক ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। দেশের অধিকাংশ লোকেই লিখিত ভাষা বুঝিতে পারে না। এই জন্যই সাধারণ লোকের মধ্যে আজও পাঠকের সংখ্যা এত অল্প। এ জন্যই বহুসংখ্যক সম্বাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াই আবার জলে মিশিয়া যায়।

গ্রন্থকারেরা বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়া বাঙ্গালা লিখিতে বসিয়া এবং চলিত শব্দ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় লইয়া ভাষার যে অপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিবিধান করা কঠিন। যদি তাঁহাদের সময়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালার বহুল প্রচার—চর্চ্চা না হইত, তাহা হইলে অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের ন্যায় তাঁহাদের নামও কেহ জানিত না। কিন্তু তাঁহাদের সময়ে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহাদিগেয় প্রভাব কিছু অতিরিক্ত প্রমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এই কয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজীর অতিরিক্ত চর্চ্চা হওয়ায় বহুসংখ্যক ইংরাজী শব্দ ও ভাব বাঙ্গালাময় ছড়াইয়া পড়ায় বিষয়ী লোকের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে উহা কিরূপ ছিল, তাহা আর নির্ণয় করিবার যো নাই।

ভট্টাচার্য্য ও কথকদিগের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা এখনও কতক কতক নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর লোক এত অল্প হইয়া আসিয়াছে যে, সেরূপ নির্ণয় করাও সহজ নহে। গ্রন্থকারদিগের বাঙ্গালা বাঙ্গালা নহে। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় আমাদের মত লেখকের গতি কি? হয় ইংরাজী পারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতময়—যে ভাষায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনাদি প্রসিদ্ধ ভদ্রসমাজে কথাবার্ত্তা চলে, সেই ভাষায় লেখা, না হয় যাহার যেমন ভাষা যোগায়, সেই ভাষায় নিজের ভাব ব্যক্ত করা। এই সিদ্ধান্তের প্রতি যাহাদের আপত্তি আছে, তাঁহারা কিরূপ ভাষাকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা বলেন, প্রকাশ করিয়া বলিলে গরীব লোকের যথেষ্ট উপকার হয়। যত দিন না বলিতে পারেন, তত দিন কুঠার-আঘাত বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই।

[বঙ্গদর্শন অষ্টম খণ্ড—১২৮৮ শ্রাবণ।

মুসলমানী বাঙ্গালা

গুজ্জু উজালবিবির কেচ্ছা

বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় অর্দ্ধেক। বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন দেশে যত মুসলমান আছে, সমস্ত তুর্কের সাম্রাজ্যে তত আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের মধ্যে হিন্দুরা মুসলমানদিগের বড় একটা খবর রাখেন না। এই সকল মুসলমানেরা কিন্তু বাঙ্গালা, বাঙ্গালার উপর হিন্দুদিগের যত টান, মুসলমানদিগের তদপেক্ষা কোনও মতেই কম নহে। অনেক মুসলমানলেখক বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। মুসলমানেরা দুইতিনখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র চালাইয়া থাকেন, তাহার বাঙ্গালা অন্যান্য বাঙ্গালা সংবাদপত্রের বাঙ্গালা হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। মীর মশারফ হোসেন "বিষাদসিন্ধু" নামক যে পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার একখানি মহারত্ন। উহার মোহরম-পর্ব্ব ও উদ্ধার-পর্ব্ব পাঠ করিলে মহম্মদের পরবর্ত্তী মুসলমানগণের ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি সুন্দররূপে জানিতে পারা যায় ও মুসলমানেরা সেই সময়ে নবধর্ম্মের উত্তেজনায় পড়িয়া যেরূপ উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও কিয়দংশ পাঠকগণের মনে সংক্রামিত হয়। মীর মশারফ হোসেনের বসন্তকুমারী নাটকও উৎকৃষ্ট বাঙ্গালায় লিখিত।

যে সকল মুসলমানলেখক এই সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ বা বাঙ্গালা সংবাদপত্র রচনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই সুশিক্ষিত লোক। কিন্তু অশিক্ষিত মুসলমানেরাও বাঙ্গালাভাষায় বহুতর পুস্তক লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের পুস্তক যে ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে, তাহাকে মুসলমানী বাঙ্গালা কহে। মুসলমানী বাঙ্গালাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে পারা যায় না। উহা বাঙ্গালা ভাষার একটি অবান্তরভাগ মাত্র। মুসলমান লেখক যে জেলায় বাস করেন, সেই জেলার অনেক প্রচলিত কথা তাঁহার গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয়। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উর্দ্দু, আরবী ও পারসী মিশ্রিত হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে অনেকগুলি মুসলমানী বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। শ্রীহট্টের পুস্তকগুলি 'কাটনাগরী' নামক অক্ষরে লিখিত। শিয়ালদহ হাজিপাড়ায় কাটনাগরীর একটি প্রেস আছে, প্রতি বৎসর সেই প্রেস হইতে অনেকগুলি পুস্তক প্রচারিত হয়;—সাধারণতঃ মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক। বাঙ্গালা পুস্তক যেখানে শেষ হয়, সেইখান হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু দুইএকখানি পুস্তক বাঙ্গালা পুস্তকের ন্যায় আরম্ভ হইতেও দেখিয়াছি। উর্দ্দু ও পারসী যেরূপ প্রতিছত্র ডাইন দিক হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিকে যায়, মুসলমানী বাঙ্গালার সেরূপ নহে। মুসলমানী বাঙ্গালার ছত্রগুলি বামদিক হইতে ডাইন দিকে যায়। কেবল কেতাবখানি আমরা যাহাকে শেষদিক বলি, সেই দিক হইতে আরম্ভ হয়। মুসলমানী বাঙ্গালা গ্রন্থ অধিকাংশ কলিকাতা, ঢাকা ও কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহ জেলারও কোন কোন স্থানে মুসলমানী বাঙ্গালার ছাপাখানা আছে।

মুসলমানী বাঙ্গালায় বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক নাই। মুসলমানদিগের আইন ও ধর্ম্মের পুস্তকের সংখ্যাও অতি অল্প। এই ভাষায় যত পুস্তক বাহির হয়, তাহার অধিকাংশই গল্পের বহি এবং পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে লিখিত। এই সকল গল্পের বহি বা কেচ্ছার কেতাবে যেমন বাঙ্গালা ও পারসী শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ হিন্দুদেবদেবীর সঙ্গে মুসলমান পীর-ফকিরের কথাও একত্রে লিখিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, হাসেন, হোসেন আলি একত্রে জড়িত হইয়া একরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এই ভাষার একখানি পুস্তকের নাম গুজ্জু উজাল বিবির কেচ্ছা। এই পুস্তকের গোড়ার কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিতেছি:—

"আল্লা আল্লা বল ভাই যত মমিনগণ,
গুর্জ্জু উজাল বিবির কিছু শুনা দিয়া মন।

"গুর্জ্জু উজাল বিবি যদি শুজ্জু পানে চায়,
দেখিয়া আশমানের গুর্জ্জু সেই লজ্জা পায়
শুজ্জ উজাল বিবিএর ছাই অঙ্গনাল
আছমানের চন্দ্র দেখে হয় ময়লাহাল।"

গল্পটি অতি সুন্দর।

মহম্মদের জামাতা আলি মহম্মদের কন্যা ফতেমা বিবির এন্তেকালের পর হনুফা বিবি নামক আর একটি কন্যা বিবাহ করেন। হনুফা বিবির পুত্রের নাম হানিফা। হানিফার পাঁচ বিবাহ।

"পহেলা করেছে সাদি মল্লিকা আকার,
তার পরে করে সাদি জৈগুণ সুন্দর।
সোম্‌বওভানে করে সাদি জোরে পাইলওয়ান,
তার পরে করে সাদি বিবি সোণাভান।
পবনকুমারী বিয়া করে আপনার জোরে,
এই পঞ্চ বিবি দেব হানিফার ঘরে।"

একদিন হানিফা পাঁচ বিবির সঙ্গে বসিয়া হাস্য-পরিহাস করিতেছেন, এমন সময়ে হানুফা বিবি বলি-লেন, "আজি আমার ঘরে তোমাদের খানা খাইতে হইবে।" সকলে খানা খাইতে বসিয়াছেন, হানিফা বিবিদের রূপ দেখিয়া এমত মোহিত হইয়াছেন যে, তাঁহার হাতের গ্রাস পাতে পড়িয়া গেল, মুখে আর উঠিল না। ইহা দেখিয়া সাদোয়ান (খানার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) আল্লার নিকটে গিয়া ফরিয়াদ করিল যে—

"ফরিয়াদ আমার এই শুন পাক সাই,
হুকুম কর আমি আজ দুনিয়া ছেড়ে যাই।
যাইয়া যে নিজপুরি রহি ছাপাইয়া,
মরুক হানিফা তবে মোরে না চিনিয়া।
আমাকে ভুলিয়া দেখে নারীর ছুরত,
আমি বিনে ছরাত রহে কেয়াছা ভাত।
আল্লা বলে সাদোয়ান থাকহ সংসারে,
সবার কেছমকে খাক মার হানিফারে।
এত যদি কহিলেন আপনি নিরঞ্জন,
জৈগুন বিবি জানিল গায়েরে তখন।"

জৈগুন বিবি আল্লা দরবারের কথা জানিতে পারিয়া কাণে কাণে সোণাভানকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় হানিফা বলিলেন, তোমরা কি বলাবলি করিতেছ? তখন জৈগুন বলিলেন যে, তুমি আমাদের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছ, কিন্তু আমাদের অপেক্ষাও সুন্দরী এক বিবি আছে—

'এমনি ছুরত তাহে দিন বারিতালা,
চন্দ্রকে জিনিয়া তার ছুরত উজালা'

শুনিয়াই হানিফা সেই বিবির জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, কিছুতেই তাঁহার নিবৃত্তি হইল না। তিনি সেই রমণীর অন্বেষণে যাইতে উদ্যত হইলেন। বিবি-গণ কান্দিয়া বলিতে লাগিল—

'কলেমা পড়িনু মোরা জাত মজাইয়া,
আকবত পাব বলি ভরসা করিয়া।
তাহাতে করিলে তুমি সবারে নৈরাশ,
আর না যাইব মোরা মা বাপের পাস।'

কিন্তু হানিফার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, হানিফা আহার ত্যাগ করিল। হানুফা এক দিন খানা পাকাইয়া সাম্‌নে ধরিলেন, কিন্তু সাদোয়ান ফুল হইয়া উড়িয়া গেল, সকলে কান্দিয়া আকুল হইল। হানিফা বলিলেন,—

'হানিফা বলেন আমি দানা নাহি খাব,
আল্লার নামেতে তবে ফকীর হইব।
তছ্‌বি হাতে নিল মর্দ্দ ত্যজিছিল ছেবে,
ফকীর হইল মর্দ্দ আল্লার রাহা পরে।'

তখন হানিফা বারকোটে গিয়া শুর্জ্জ উজাল বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। আট দিন অনাহারে নিরন্তর ভ্রমণে একান্ত ক্লান্ত হইয়া হানিফা নদীতীরস্থ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করত আল্লার নাম লইতে আরম্ভ করিলেন। আশাবৃক্ষ নদীগর্ভে পতিত হইয়া তাহার জীবলীলা সাঙ্গ করিবেন। জিবরিণ তখন অত্যন্ত কাতর হইয়া আল্লার নিকট হানিফার দুর্দ্দশার কথা বর্ণন করিলেন, তখন—

'আল্লা বলে জিবরিন শুন দিল দিয়া,
ঘোড়া খেতুর পাখী আছে আন বোলাইয়া।
হানিফার দোসর হউক যাইয়া নিকটে,
পাইবে খাইতে খানা গেলে বারকোটে।'

স্মরণমাত্র ঘোড়া খেতুর উপস্থিত হইল।

আল্লাতালা তাহাকে হানিফার পথপ্রদর্শক হইয়া বারকোটে লইয়া যাইতে বলিলেন। আজ্ঞামাত্র ঘোড়া খেতুর হানিফার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বারকোটে লইয়া যাইবার কথা বলিল। বারকোটের নাম শুনিয়াই হানিফা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ বারকোট? যেখানে শুজ্জু উজাল বিবি আছেন? ঘোড়া খেতুর বলিল, হাঁ। তাহা শুনিয়া হানিফা হৃষ্টচিত্তে পক্ষীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া হানিফা ঘোড়াখেতুরকে বলিলেন, ভাই, তুমি একটু ডালের উপর বইস। আমি নমাজ পড়িয়া লই। হানিফার নমাজের এক অংশ উদ্ধৃত হইল।

'এলাহি আলয়ামীন আল্লা গোন কর মাপ,
আর না সহিতে পারি সাদোয়ানের তাপ।
মাপ কর আল্লাতালা আমার তছবির,
থোড়া খানা দিলাও আল্লা আমার খাতির।"

তখন খোদা হানিফার কাতরতায় কাতর হইয়া জিবরিণকে স্মরণ করিলেন এবং বলিলেন, জিবরিণ, তুমি হানিফাকে মেবামতপুরে লইয়া যাও—যেখানে আজি মেহমানি যজ্ঞ হইতেছে। তথায় উহাকে খানা খাওয়াও। জিবরিণ ফকীরের বেশ ধারণ করিয়া হানিফার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মেহমানিতে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক ফকীর উপস্থিত ছিলেন। জিবরিণ তাঁহাকে বিছানার উপর বসাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। যথাসময়ে আদিমগণ (পরিবেশনকারিগণ) খানা লইয়া আসিল। হানিফা বলিলেন, তোমাদের কল্যাণে আজি আমি ছয় মাসের পর খানা খাইলাম—বলিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু খোদার নাম লইলেন না, অমনি খোদার আজ্ঞায় সমস্ত অন্ন উড়িয়া গেল। অমনি সমবেত ফকীরগণ বলিয়া উঠিল, এই দুষ্ট ফকীর ভূতের সাহায্যে আমাদের অন্ন উড়াইয়া দিয়াছে। বলিয়া হানিফাকে বাঁধিয়া মারিতে উদ্যত হইল। তখন হানিফা আপন পরিচয় দিলেন, যেরূপে সাদোওমানের ফরিয়াদে তাঁহার অন্ন বন্ধ হইয়াছে, তাহাও বিবৃত করিলেন। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে দুধ ও অন্যান্য খাবার আনিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না, সমস্ত খাদ্য দ্রব্য উড়িয়া গেল। হানিফা কাঁদিয়া ঘোড়া খেতুরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে বারকোটে গেলেন। তথায় গুজ্জু উজাল বিবি যে মসজিদে নেমাজ পড়েন, সেই মসজিদে গিয়া বসিয়া রহিলেন। বিবি নেমাজ করিয়া হানিফাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? হানিফা আপন পরিচয় দিল। বিবি বলিলেন, তুমি যে নবীর খান্দান, তাহার পরিচয় কিসে পাইব? আমি তোমায় কতকগুলি সওয়াল করি, তুমি তাহার জবাব দাও। বলিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া হানিফা পরদিন প্রত্যুষে জবাব দিবেন স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইল। তখন ঘোড়া খেতুর আসিয়া বলিল, হানিফা, তুমি বড় বিপদগ্রস্ত হইয়াছ। এই সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া তোমার কর্ম্ম নয়। তুমি এক কর্ম্ম কর, একগাছা পালক দিয়া যাইতেছি, তাই লইয়া থাক, গুজ্জু উজাল সকালে আসিয়া—তুমি জবাব দিতে না পারিলে, আওয়াজে তোমায় ভস্মরাশি করিয়া ফেলিবে। তুমি যদি এই পালক সম্মুখে ধর, তোমার কিছুই হইবে না। আমি আল্লার নিকট তোমার জন্য দরবার করিতে যাই। বলিয়া ঘোড়া খেতুর আল্লার দরবারে গমন করিল এবং বলিল, সাদোয়ান বিহনে হানিফার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তাহাকে হানিফের নিকট না পাঠাইলে বিপদ উদ্ধার হয় না। আল্লা তখন সাদোয়ানকে কহিলেন, আর অভিমান করিয়া থাকিলে চলিবে না, তুমি যাও, হানিফের নিকট আবির্ভাব হও। সাদোয়ান অগত্যা তাঁহার মুখে উঠিল। হানিফার ধড়ে বুদ্ধি আসিল

পরদিন যখন গুজ্জু উজাল উপস্থিত হইলেন এবং মনোমত জবাব না পাইলেন, তখন ঘোরতর আওয়াজ করিলেন। পালকের বলে হানিফার কিছুই হইল না।

এ দিকে জৈগুণ সেই আওয়াজ শুনিতে পাইলেন এবং স্বামীর বিপদ জানিতে পারিয়া শাশুড়ী হানিফা বিবিকে বলিলেন। হানিফা কাঁদিয়া গিয়া মক্কায় ফতেমা বিবি তাঁহার সপত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বারকোটে যাইতে বলিলেন।

ফতেমা রাজী হইলেন এবং আলির অনুমতি অনুসারে বারকোটে যাত্রা করিলেন।

'অতএব ফতেমাজান বারকোটে দেশে,
গুরুজ করিল বন্ধ আপন বাতাসে।
গুরুজের জেত বন্ধ করিলেন আপনি,
ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়িলেন পবন তাহা জানি।
মাসেকের পথ মাতা আইল তিলেকে,
তবে নিজ মূর্ত্তি মাতা হন আপনাকে।'

যখন জগন্মাতা ফতেমা বারকোটে উপস্থিত হইলেন, তখন গুজ্জু উজালের আর সন্দেহ রহিল না, তিনি হানিফাকে নবীরে খানদান জানিয়া তাহার সঙ্গে বিবাহ করিলেন, হানিফা তাঁহাকে কলমা পড়াইয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন এবং গুজ্জু উজাল আপনার সমস্ত ধনসম্পদ পাড়াপড়সীকে বিলাইয়া দিয়া শ্বশুরবাড়ী গেলেন। মুসলমানী বাঙ্গালার একটি কেচ্ছা পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া অদ্যকার মত বিদায় হইলাম।

[বিভা—১২৯৪, ফাল্গুন।

কবি-পরিচয়

কবি কৃষ্ণরাম

বঙ্গদেশের বড় দুর্ভাগ্য। আমরা দেশের লোক চিনি না। আমরা পোপ, ড্রাস, ওয়েবষ্টার, বোমণ্ট, ফ্লেচার, ডেবেনাণ্ট ফারকুহার, কনগ্রীব সাডওয়েল, টমসন, জর্জ্জ উইদার, জন চলখিল, জন ক্লেবলাণ্ড প্রভৃতি পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর কবির কাব্য পাঠ করিয়া ও তাঁহাদের জীবনচরিত পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করি, অথচ আমাদের নিজের দেশের কবিদের কথা কিছুই জানি না। দেশের মধ্যে কয় জন লোক বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস, নরোত্তম দাস, যদুনন্দন দাস, চূড়ামণি দাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈষ্ণব কবিগণের নাম অবগত আছেন? দুই চারি জন বরং বৈষ্ণব কবিগণের দুই পাঁচটি নাম জানিতে পারেন; কিন্তু অবৈষ্ণব কবিগণ এদেশে চিরকালই বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন।

অবৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের নাম বড় নাম। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজকবি ছিলেন। তাঁহার ভাষা অনুকরণের অতীত, ধীশক্তি প্রখর, এবং প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। বিদ্যাসুন্দর তাঁহার প্রধান কাব্য, তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ ও তাঁহার অমৃত-ভাণ্ড। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর তাঁহার নিজের নহে, ধার-করা জিনিস। ধারও আবার মূল সংস্কৃত হইতে নহে। মূল সংস্কৃত হইতে যদি বিদ্যাসুন্দর ধার করা হয়, তবে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে অন্য লোক তাহা ধার করিয়াছিল, তিনি ধার করা জিনিস আবার ধার করিয়াছেন। যথেষ্ট সুদ সমেত শোধ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু জিনিসটা ধারের ধার। তিনি কাহার নিকট বিদ্যাসুন্দরের গল্পটি গ্রহণ করিয়াছেন? রামপ্রসাদ সেনের নিকট নহে। কারণ, উভয়েই এককালের লোক,—প্রায় এক সময়েই বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, দুই জনেই আর এক জনের নিকট বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশে যে মাননীয় মহাপুরুষের নাম দৃষ্ট হইতেছে, তিনি বাঙ্গালায় বিদ্যাসুন্দর প্রথম প্রচারিত করেন। কিন্তু তাঁহার নাম জানা যায় না। এখন এক প্রকার লোপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থও পাওয়া যায় না। তিনি কয়খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমরা অতি কষ্টে দুইখানি সংগ্রহ করিয়াছি। তাই বাসনা, বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহাদের হস্তে কিছু উপহার দিই।

কৃষ্ণরামের কথা আমরা কেহ কিছু জানি না, অথচ তিনি আমাদের প্রতিবাসী ও বিশেষ আত্মীয়। কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে, বেলঘরিয়া ষ্টেশনের অর্দ্ধ-ক্রোশ পূর্ব্বে, নিমিতায় কৃষ্ণরামের বাড়ী। তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কারণ, এখনও নিমিতা গ্রামে দুই এক জন লোক কবি কৃষ্ণরামের নাম করে, এবং তাঁহার ভিটা দেখাইয়া দেয়। সে ভিটায় এক শত বৎসরেরও অধিক কাল কেহ বাস করে না, অথচ প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন—উহা কৃষ্ণরামের ভিটা! কৃষ্ণরামের বংশ নাই, কিন্তু তিনি নিজে নিঃসন্তান ছিলেন কি না, কেহ বলিতে পারে না।

তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, তাঁহার উপাধি দাস। সুতরাং তিনি কুলীন ছিলেন না। মৌলিক কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভগবতী দাস। তাঁহার প্রণীত রায়মঙ্গল ও কালিকামঙ্গল গ্রন্থে আমরা পাঁচবার এই কবিতাটি প্রাপ্ত হইয়াছি:—

"নিমিতে গ্রামেতে বাস, নাম ভগবতী দাস,
কায়স্থ-কুলেতে উৎপত্তি।
হইয়ে একচিত, রচিয়া রায়ের গীত,
কৃষ্ণরাম তাঁহার সন্ততি।"

কোথাও একটু আধটু পাঠভেদ থাকিলেও, পাঁচ জায়গাই ঐ এক কথা। কবি মহাশয়ের ভিটা ৺অক্ষয়কুমার দত্তের জামাতা মিত্রজ মহাশয়ের বাটীর অতি নিকটে অবস্থিত।

কৃষ্ণরাম কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং কোন্ সময়ে কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের কৌতূহল হইতে পারে। আমরা তাঁহার প্রণীত কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের যে পুথি পাইয়াছি, তাহার শেষ ভাগে এই কয়টি কথা আছে:—

"ইতি সমাপ্ত। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ বাবুজির, ইহা জানিবা, স্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম ঘোষ কায়েস্ত সাং কলিকাতা সুতানুটী চড়কডাঙ্গার পশ্চিম। ইতি সন ১১৫৯ সাল মাহ শ্রাবণ। ২৭ রোজ শুক্রবার দিবসে সাঙ্গ হইল। ইহার দক্ষিণা এক জোড়া কাপড় আর দুই তঙ্কা আস্থা চ॥"

শেষ তিনটি অক্ষর বড় জড়ানে। আত্মারামের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর। ঠিক মুক্তার মত, সমস্তই কাল কালীতে লেখা। কেবল দাঁড়িগুলি, ছেদগুলি হেডিংগুলি লাল কালীতে। এখন লেখাইতে গেলে ৪৲৫৲ টাকা পড়িত, কিন্তু অমন সুন্দর লেখা এখন পাওয়া যায় না। মুদ্রাযন্ত্রের দৌরাত্ম্যে আর হাতের লেখার—বিশেষ নগণ্য বাঙ্গালা ভাষায় হাতের লেখার কিছুমাত্র আদর নাই।

আত্মারাম ঘোষ ১১৫৯ সালে কলিকাতায় বসিয়া গ্রন্থখানি নকল করেন। ১১৫৯ সাল ইংরাজী ১৭৫২।৫৩। তখনও বাঙ্গালা ইংরাজের হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধ হইতে ৪।৫ বৎসর বিলম্ব আছে। হলওয়েল সাহেব ছয় মাসের জন্য কোম্পানীর জমীদারীর ভার পাইয়া, "ব্ল্যাক জমীদার" গোবিন্দরাম মিত্রের সঙ্গে জমীদারীর হিসাব লইয়া গোল বাধাইয়াছেন। আর বর্গীরা উড়িষ্যায় রাজত্ব ও বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ লইতে স্বীকার করিয়া, বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তখন ভারতচন্দ্র কোথায়? তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ। প্রত্যহ একটি করিয়া কবিতা লিখিয়া রাজাকে শুনান ও মাসহারা খান। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর লেখা হইয়াছে কি? সকলেই জানেন, ১৬৭৪ শকে অর্থাৎ ১৬৭৪+৭৮=১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, সুতরাং আত্মারাম যখন চড়কডাঙ্গায় বসিয়া কৃষ্ণরামের প্রসিদ্ধ কালিকামঙ্গল নকল করিতেছেন, তখনও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর শেষ হয় নাই।

কিন্তু কোন্ বৎসর যে কালিকামঙ্গল রচিত হয়, তাহার কিছু ঠিকানা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণরাম যখন "শিশু", তখন এক দিন তিনি খাসপুর পরগণায় বড়িশ্যা গ্রামে এক গোয়ালার গোয়ালঘরে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, এক প্রকাণ্ডকায় মহাপুরুষ বাঘের উপর সোয়ার হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমি দক্ষিণের রায়। আমার রাজত্ব আঠারভাটী। তুমি আমার মঙ্গলগীত গাও, আমি তোমার ভাল করিব। মাধব আচার্য্য আমার যে মঙ্গল রচনা করিয়াছে, তাহা আমার পছন্দ হয় না।" কবি কহিলেন, "আমি শিশু, আমি আপনার মহিমার কি জানিব?" তাহাতে রায় মহাশয় আপনার মাহাত্ম্যটা কীর্ত্তন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। এই স্থানে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শুনহ সকল ধীর অপূর্ব্ব কথন।
যে মতে হইল এই কবিতা রচন॥
খাসপুর পরগণা নামে মনোহর।
বড়িশ্যা তাহার এক তপ বিশ্বাম্বর (?)
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোলঘরে॥
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপীঠে আরোহণ এক মহাজন॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারভাটীর মধ্যে হইব প্রচার॥
পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য॥
মসান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা॥
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্য গীত করাইয়া গায় জাগরণ॥
কাকুটী নাকুটী করে আর রঙ্গিভঙ্গি।
পরম কৌতুকে শুনে মউন্যাম লঙ্গি॥
তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবা বাঘে॥"

স্বপ্ন দিয়া গীত লেখানটা দেবতাদের সাধারণ রোগ। অনেক পঞ্চমশ্রেণীর কবি স্বপ্নের দোহাই দিয়া হস্তকণ্ডুয়ন-সুখানুভব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রায় মহাশয়ের রোগটা কিছু বেশী। যে তোমার কবিতা পছন্দ না করিবে, তাহাকে সবংশে বাঘে খাইবে! আমায় যদি কেহ এমন পাকাপাকি এক-রার দেয়,—নিশ্চয় বলিতেছি,—আমি ২০ ভলম কোয়ার্টো কবিতা একমাসে লিখিয়া দিতে পারি! কেহ যদি না শুনে, তাহাকে সবংশে বাঘে খাইবে। সুতরাং পাঠক ও শ্রোতারও অভাব হইবে না।

এইরূপে কৃষ্ণরামের কবিত্বশক্তির সূত্রপাত হইল। কবি বলিতেছেন, তখন আমি অতি শিশু। কত শিশু, তাহা জানি না। নিমিতে হইতে বড়িশ্যা যাইয়া গোয়ালার ঘরে বাসা করিয়া আছেন,

নিতান্ত শিশু না হওয়াই সম্ভাবনা। আমরা বছর ২০ বয়স ধরিয়া লইব।

সেটা কোন্ বৎসর কবি বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতুচয় শকের বৎসর॥"

"বলয়োরভেদঃ" এই সূত্র অনুসারে এখানে 'ল' ও 'র'এ মিল হইয়াছে। এখন বসু শূন্য ঋতুচয়, ৮০৬১; অঙ্কস্য বামা গতিঃ; সুতরাং ১৬০৮ হইল। ১৬০৮ শকে ১৬০৮+৭৮= ১৬৮৬ খৃষ্টীয় অব্দ হইল। রায়মঙ্গলে দুই জায়গায় কবি এই বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং, আরঙ্গজীবের রাজত্ব-কালে, যে বৎসর ইংরাজেরা হুগলী হইতে তাড়িত হন, তাহার পূর্ব্ব-বৎসরে, শিবজীর মৃত্যুর ৫ বৎসর পরে, কবি কৃষ্ণরাম স্বপ্নাদেশমত রায়মঙ্গল লিখিয়া আপন কবিত্বখ্যাতির সূত্রপাত করেন।

তাঁহার কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর ইহার পরে রচিত। কারণ, ও বইখানি নেহাত শিশুর লেখা নহে। আর উহাতে একটি কথা আছে, তাহাতেও কিছুদিন পরে গ্রন্থরচনা হয় বলিয়া অনুমান হয়। কারণ, বন্দনার শেষভাগে কবি লিখিতেছেন,—

"ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর অপরূপ নাম।
কলিকাতা বন্দিনু নিমিতা জন্মস্থান॥"

কলিকাতা অনেক দিনের জায়গা, তাহার সন্দেহ নাই। ১৪৯৫ সালে বিপ্রদাস কবি উহার নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তখন কলিকাতা বন্দনার যোগ্য নহে। ইংরাজের কুঠী হওয়ার পর হইতেই উহা বন্দনার যোগ্য হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৬৯৮ সালে কলিকাতায় ইংরাজ-সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। ঐ সালে পুরাতন দুর্গটি নির্ম্মাণ হয় ও কলিকাতা সহর হয়। ১৬৮৬ সালে রায়মঙ্গল লিখিয়া, ১৬৯৮ সালের পর কালিকামঙ্গল লেখা কিছুই বিচিত্র নহে। যেরূপেই হউক, কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের অপেক্ষা অন্ততঃ ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, বিদ্যাসুন্দর গত শতাব্দীতে চারিবার বাঙ্গালা ভাষায় ও একবার উর্দ্দুতে লিখিত হয়। বাঙ্গালায় প্রথম লেখা কৃষ্ণরামের; দ্বিতীয় রামপ্রসাদের; তৃতীয় ভারতচন্দ্রের; চতুর্থ পূর্ব্ববাঙ্গালার কবি প্রাণরামের। প্রাণরাম তাঁহার গ্রন্থে এই কয়টি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। উহা হইতে বিদ্যাসুন্দরের গ্রন্থকর্ত্তা কে কে, তাহা জানা যায়।

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমিতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপন্যাস প্রসঙ্গের ছলে॥"

প্রাণরামের মূল গ্রন্থ আজিও আমরা দেখি নাই। বঙ্গসাহিত্যের ভাবী ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এই কবিতা কয়টি আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোর শাক্ত ও ঘোর চৈতন্যদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার পারিষদ ভারতচন্দ্রও শাক্ত ছিলেন। রামপ্রসাদ শাক্ত ভক্তিতে সিদ্ধ হইয়া মুক্তিকে ভক্তির দাসী বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কালীমহিমাখ্যাপনের জন্য বিদ্যাসুন্দর লিখিতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণরাম কোন্ কল্পাবলম্বী ছিলেন, এবং তিনি কালিকামঙ্গল লিখেন কেন? এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা অত্যন্ত কঠিন।

কালিকামঙ্গলে একটি সুদীর্ঘ বন্দনা আছে। তাহাতে গণেশ, সরস্বতী, কালী, কৃষ্ণরাধা, চৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং মহাদেবের বর্ণনা আছে, অন্য দেবতার বন্দনা যতই থাকুক, চৈতন্যনিত্যানন্দের বন্দনাটি কিছু ঘোরঘটা করিয়া লিখিত হইয়াছে,—

"নবদ্বীপে চৈতন্য গোঁসাই অবতার॥"
"নিত্যানন্দ ঠাকুর অপার পারিসাদ।
বন্দিনু পরম ভক্ত সকলের পাদ॥
যথায় কীর্ত্তন হয় চৈতন্য-চরিত্র।
বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র॥
তাহে গড়াগড়ি দেয় (যেবা) প্রেমে নৃত্য করে।
জীবন সুকৃত তার ধন্য দেহ ধরে॥
হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত।
তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত॥
শ্রীকৃষ্ণ-গুণ শ্রবণে পুলক যেবা হয়।
তাঁরে গুণবান বলি বেদ মিথ্যা নয়॥"

উপরি-উক্ত কবিতাটি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কৃষ্ণরাম চৈতন্যমতাবলম্বী ছিলেন। তবে তিনি কালিকামঙ্গল লিখেন কেন? যাহারা বিল্বপত্রকে তেফড়কার পাতা বলে, জবাফুলকে ওড় পুষ্প বলে, "কাটাকে" "বানান" বলে, যাহারা দুর্গানাম শুনিলে কাণে হাত দেয়, তাহাদের মধ্যে এক জন যে কালিকামঙ্গল লিখিবে, ইহা আপাততঃ বড়ই বিচিত্র বোধ হয়।

কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্য পড়িয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ত্রিবেণীনিবাসী পরাশরের পুত্র মাধবাচার্য্য চৈতন্য-মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার প্রধান পুস্তক ভাগবত-সার। কিন্তু কীর্ত্তন করা তাঁহার ব্যবসায় ছিল। তিনি সকল দেবতার কীর্ত্তন লিখিতেন। তাঁহার রচিত দুর্গামাহাত্ম্য বা চণ্ডীর গান অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আর এই রায়-মঙ্গল পাঠে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, তিনি দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করেন, আর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া, কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। অনুমান হয়, কীর্ত্তনব্যবসায়ীরা সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন। তবে ব্যবসায়ের খাতিরে তাঁহারা অবৈষ্ণব গ্রন্থও রচনা করিতেন, এবং গানও করিতেন।

একটি নূতন কথা আছে। কৃষ্ণরামের বিদ্যা-সুন্দরে বিদ্যা আছে, সুন্দর আছে, কালীস্তব আছে, চোরপঞ্চাশতের কবিতা আছে, মশান আছে, কালী আছেন, বীরসিংহ আছেন, গুণসিন্ধু আছেন, নাই কেবল বর্দ্ধমান। বর্দ্ধমানের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর-ঘটিত কলঙ্কের যোগাযোগ কুটিল, মুখুটীবংশীয় ভারতচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত। ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি এই উপাধিতে বিভূষিত আছেন। মুখুয্যেরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বড়ই কুটিল। কথাই আছে, "মুখুটী কুটিল বড় বন্দ্যঘাটী সাদা"। এ কবিতা আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। ভারত জাতিতে মুখুয্যে, বর্দ্ধমানরাজ তাঁহার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত করেন, এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সুতরাং তাঁহার রাগ বাড়িয়া যায়, তাই বিদ্যাসুন্দরের কেলেঙ্কারী বর্দ্ধমানরাজের ঘাড়ে চাপাইয়া ভারত তাহার অনেকটা প্রতিশোধ লয়েন। বর্দ্ধমানরাজ যে ভারতচন্দ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই আছে এবং সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই পূজ্যপাদ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় মালিনীর বাটী অন্বেষণার্থে বর্দ্ধমান সহরে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সুড়ঙ্গ দিয়া এখনও রাজবাটী যাওয়া যায় কি না, দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কৃষ্ণরামের বর্দ্ধমানরাজের উপর ক্রোধ ছিল না। সুতরাং তিনি আর বর্দ্ধমান লইয়া তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ-সূচনা এই :—

"উর মাতা আসরে হও অধিষ্ঠান ॥
সুন্দর সুন্দর নাম রাজার নন্দন।
পূজিয়া পরমদেবী করিল গমন ॥
স্বপনে শিবার কথা সত্য মনে লয়ে।
পাইবে রমণীমণি আনন্দ হৃদয়ে ॥
জনকেরে না বলিল না জানে জননী।
একাকী করিল গতি কবি-শিরোমণি ॥
জয়পত্র-যুকত বিচিত্র ছত্র ধরি।
দিব্যবস্ত্র ভূষণ দ্বিজেরে দান করি ॥
কবি পণ্ডিতের বেশে প্রতাপের শূর।
সারদা সহায়ে যায় বীরসিংহপুর ॥
ছাড়াইল নিজ রাজ্য চলি দিন ছয়।
সম্মুখে অরণ্য ঘোর দেখে লাগে ভয় ॥
বরাহ মহিষ বাঘ তাহাতে সকল।
ভয় পাইয়া ভাবে কালীচরণ-কমল ॥
শিরে মণি জ্বলে ফণী বেড়ায় চরিয়া।
পাইলে গণ্ডার চণ্ড গিলয়ে ধরিয়া ॥
যেই দিকে চাহে কবি সেই দিকে বন।
ফিরিয়া না যাব ঘরে করিয়াছি পণ ॥
প্রবেশে অরণ্যমাঝে ভাবিয়া সারদা।
সঙ্কটে তারিয়া লও হরের প্রমদা ॥
ব্যাঘ্র আদি দেখিয়া ফিরিয়া নাহি চায়।
পশ্চাতে করিল বন তবে পথ পায় ॥
চলিতে না পারে আর ক্ষুধায় আকুল।
রম্যস্থান দেখিয়া বসিল তরুতল ॥
অকস্মাৎ পাইল দিব্য নানা উপহার।
দেবযোগ্য মনোহর কি বলিব আর ॥
সকলি দেবীর মায়া শুন সর্ব্বজন।
কত রঙ্গ করেন বুঝিতে তার মন ॥
হেন কালে দেখিল সম্মুখে ঘোর নদী।
কূল নাহি তরঙ্গ যেমন নিরবধি ॥
ক্ষেণে ভাসে ক্ষেণে ডুবে হাঙ্গর কুম্ভীর।
নাহিক কাণ্ডারী তরি বড়ই গভীর ॥
নারিব হইতে পার দাঁড়াইল সার।
বুঝান না যায় মাতা চরিত্র তোমার ॥
আপনি কহিলা পথে কোনও দুঃখ নবে।
সম্মুখ সমুদ্র ঘোর কি উপায় হবে ॥
ফিরিয়া সদনে যাই হেন মনে লয়।
সবে দুঃখ তোমার বচন মিথ্যা হয় ॥

বলিতে বলিতে কবি অপরূপ দেখে।
মহাযোগী এক জন আইল সম্মুখে॥
রক্তবস্ত্র পরিধান শুখায়ল তনু।
যোগবল কিরণ তপন যেন ভানু॥
সুন্দরেরে বলে শুন রাজার নন্দন।
যদি মনে লয় ধর আমার বচন॥
কালীমন্ত্র জপ তুমি না করিও আর।
করিতে না পারেন তিনি সঙ্কটে উদ্ধার।
মহেশের মন্ত্র আসি লহ মোর ঠাঁই।
যাহার সমান আর তিন লোকে নাই॥
যোগবলে যাহা চাহ নিকটে মিলিবে।
এ পাচ মাসের পথ এক দণ্ডে যাবে॥
শুনিয়া সুন্দর বলে তুমি মূঢ় জন।
সহনে না যায় মোর তোমার বচন॥
হরগৌরী এক অঙ্গ দেব পরমাণ।
ইহাতে করিলে ভেদ রৌরবে হয় স্থান
যোগী মহাশয় তুমি জগৎ-পূজিত।
শিব শিবা ভেদ কর নহে ত উচিত॥
ফিরিয়া সুন্দর দেখে যোগী নাহি তথা।
ঘুচিল মায়ার নদী অপরূপ কথা॥
হইল আকাশবাণী শুন কবিবর।
কুতূহলে যাহ বীরসিংহের নগর॥
পাইয়া প্রসাদ-পুষ্প আনন্দ হৃদয়।
গমন করিল গুণসিন্ধুর তনয়॥
পঞ্চমাসের পথ বীরসিংহের দেশ।
দশম দিবসে গিয়া করিল প্রবেশ॥
অমরাবতীর তুল্য মনোহর স্থান।
ধরণী বলিতে নাহি যাহার সমান॥
নৃত্য-গীত আনন্দিত যত প্রজালোক।
অকাল-মরণ নাহি নাহি দুঃখ-শোক॥
নৃপতি উত্তম দাতা নাহি অবিচার।
চাঁদেরে মলিন কৈল যশেতে যাহার॥
বাহুবলে অধিকার করিল অনেক।
অধিকার ধরাতলে কহিব কতেক॥
কমলার দয়া তারে কভু নাহি টুটে।
ভূপতি ভকত সদা ভাবে করপুটে॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীপদযুগ।
দেখিয়া সুন্দর দেশ সুন্দরের সুখ॥

[সাহিত্য ৪র্থ বর্ষ—২য় সংখ্যা

সমাপ্ত

সাহিত্য-সমালোচনা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই প্রণীত

কালিদাস ও সেক্ষপীয়র

পাঠকেরা তুলনায় সমালোচনা বড় ভালবাসেন। সেই জন্য অদ্য আমরা কালিদাস ও সেক্ষপীয়র এই দুই জন বড় বড় কবিকে তুলনায় সমালোচনা করিব স্থির করিয়াছি। ছোটখাট বটতলার ও গ্রব ষ্ট্রীটের বহুসংখ্যক কবি থাকিতে এত বড় দুই জন কবির উপর হস্তক্ষেপ করা কেন? এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিব, "মারি ত হাতী, লুঠি ত ভাণ্ডার।" এঁদের দুজনের একজনেরও ভাল করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে সেই সঙ্গে আমারও কিছু হইতে পারে, এই এক ভরসা। আমরা কালিদাস ও সেক্ষপীয়র মধ্যে কে কেমন লিখিয়াছেন, দেখাইতে চেষ্টা করিব। কোন একটা বিষয় লইয়া দেখিব, কে জিতিয়াছেন, কে হারিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের দুজনের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, কাহার কবিত্ব-শক্তি অধিক, কাহার অল্প, তাহা নির্ণয় করা বড় শক্ত; বিশেষতঃ আমার মত ক্ষুদ্রজীবী লোকের পক্ষে। যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির পার নাই, তাঁহারাই হঠাৎ বলিতে পারেন, সেক্ষপীয়র—ছ্যা—কালিদাসের ছাঁইচ পর্য্যন্ত মাড়াইতে পারে না।

কালিদাস এক জন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ ফলাইতে অদ্বিতীয়। সেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরী সাজানতে আর বাছিয়া লওয়াতে। কোন্ কোন্ জিনিস বাছিয়া লইতে হইবে, আর কেমন করিয়া বসাইলে সে সবগুলি ভাল করিয়া খুলিবে, এই দুটি বুঝিতে তাঁহার মত ওস্তাদ মিলিয়া উঠা ভার। তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে লিখিতেন। প্রকৃতিতে যা কিছু আছে, সবই সুন্দর অথবা লিপিচাতুর্য্যে সব সুন্দর করিয়া তুলিব, এ ভাব তাঁহার মনে কখন উদয় হয় নাই। তিনি স্বভাব-শোভা কাহাকে বলে, জানিতেন, চিনিতেন এবং সেগুলা বাছিয়া লইতে ও সাজাইতে খুব মজবুদ ছিলেন।

সেক্ষপীয়রের পক্ষে বাছিয়া লইবার কিছু দরকার ছিল না। তাঁহার দুই চক্ষে যাহাই পড়িত, তাহাই লইতেন, কিন্তু কাজের সময় সেগুলিকে ছাঁটিয়া পরিষ্কার করিয়া নিজ ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতেন। সৌন্দর্য্য বাছিয়া লইবার তাঁহার দরকার ছিল না, যেহেতু, অসুন্দরকে সুন্দর করিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। পরের লেখা ছাই-ভস্ম পরিষ্কার করিয়া তিনি শিক্ষানবিসি সাঙ্গ করেন, সুতরাং পরের জিনিস কিরূপে আপন করিতে হয়, সেটুকু তাঁহার খুব অভ্যস্ত ছিল। অসুন্দর বস্তুর উপর কালিদাসের এমনি বিতৃষ্ণা যে, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থমধ্যে

কোথাও পাপের বর্ণনা বা কোন বীভৎস রসের বর্ণনা নাই। কিন্তু সেক্ষপীয়রের পাপের ছবিই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। আমরা কালিদাসের শ্মশান-বর্ণনা পাই না, নরকবর্ণনা পাই না, ম্যাক্‌বেথ পাই না, ইয়াগোও পাই না। কিন্তু সেক্ষপীয়রের অদ্ভুত পাপসৃষ্টি কালিবান্‌কে প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। কালিদাস হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া কোথায় হিমালয়ের প্রকাণ্ডতা দেখাইবেন, প্রকাণ্ড বস্তুর বর্ণনে পাঠকের শরীর কণ্টকিত করিবেন, তাহা না করিয়া হিমালয়ে অপ্সরাগণের মতিভ্রম দেখাইতে বসিলেন; সূর্য্যকিরণ বক্র করিয়া পুষ্করিণীর পদ্ম ফুটাইতে বসিলেন; আরও কত সুন্দর বস্তু দেখাইয়া হিমালয়কে বিলাস-কাননবৎ করিয়া তুলিলেন। কালিদাসের এইরূপ উৎকট সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা হেতুই তাঁহার পুস্তকাবলীতে এত রমণীয় বর্ণনা দৃষ্ট হয়, এই জন্যই তিনি কটমট ছন্দঃসূত্র লিখিতে গিয়াও সেগুলিকে প্রিয়া বিশেষণ পদপ্রয়োগে ললিত করিয়া তুলিয়াছেন।

পৃথিবীতে বর্ণনীয় জিনিস দুই—অন্তর্জ্জগৎ—মনুষ্যের মন; আর বাহ্য জগৎ। নির্ম্মল আকাশ, সুদূরবিস্তৃত অরণ্যশ্রেণী, মেঘমালাবৎ প্রতীয়মান পর্ব্বতশ্রেণী ইত্যাদি। কালিদাসের বই পড়িলে বোধ হয়, এই দুইএর মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, সবই তাঁহার একচেটে। মনুষ্যজাতির মধ্যে সুন্দর রমণীগণ, রমণীহৃদয়ে পবিত্র প্রণয়, পরম সুন্দর। কালিদাস সেই প্রণয়ই নানা প্রকারে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হৃদয়ের অন্যান্য প্রবৃত্তির মধ্যে যেগুলিতে লোকের মন আকর্ষণ করে, সেগুলি সব তাঁহার পুস্তকে আছে। বাপ ছেলেকে কোলে লইয়া চুম্বন করিতেছে, বাপ বনে যাবেন শুনিয়া ছেলে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাইবে, বুড়া বাপ কাঁদিতেছে, প্রিয়তমার অকালমৃত্যুতে পতি শোকে অভিভূত হইয়াছে, স্বামীর অকালমৃত্যুতে নববিধবা মোহপরায়ণা হইয়া পড়িয়া আছে, প্রিয়ার হঠাৎ বিরহে প্রিয় উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, আর যাহাকে পাইতেছে, প্রিয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে; কোথাও লতা, কোথাও ময়ূরকে প্রিয়া বোধে আলিঙ্গন করিতেছে—এ সব মনুষ্যহৃদয়ের মোহিনীময় ভাব। এ ভাবের প্রকৃত ওস্তাদ কালিদাস। কিন্তু যেখানে দশ পনরটি পরস্পরবিরোধী ভাব যুগপৎ উদয় হইয়া অন্তরাকাশকে অন্ধকার করে, যেখানে হৃদয়ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত, যেখানে ভাবসন্ধি ভাবসবল হইবার কথা, সেখানে কালিদাস আসিবেন না, সেখানে সেক্ষপীয়র ভিন্ন গতি নাই। একদিকে দুর্জ্জয় দুরাকাঙ্ক্ষা রাশি রাশি পাপকার্য্যে রত হইতে বলিতেছে, আর এক দিকে স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা বাধা দিতেছে; এক দিকে পাপের স্মৃতি অনুতাপের ভরে হৃদয় ভারাক্রান্ত করিতেছে, আর তখনই সেই পাপ ঢাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, তখনই সে ভাব গোপনের জন্য কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যেন সে নয়, এইরূপ দেখাইতে হইতেছে;—এ সব হৃদ্বৃত্তির জটিলতা মনুষ্যস্বভাবের অস্থিরতা, পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহের যুগপৎ বিকাশ, সেক্ষপীয়র ভিন্ন আর কেহ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারেন নাই, পারিবেনও না। সেক্ষপীয়র মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন। তুমি যেমন মানুষ চাও, সেক্ষপীয়র তেমনি মানুষ তোমায় দিবেন। তুমি শকুন্তলার মত সরলা মুগ্ধহৃদয়া সামাজিক কুটিলতানভিজ্ঞা বালিকা চাও, মিরন্দা দেশদিমোনা লও। পাকা গিন্নী ঘরকন্নায় মজপুত, ভাঙ্গে না, মচ্‌কায় না, এমন মেয়ে চাও, আচ্ছা, তোমার জন্য ডেম কুইকলি আছে। পতিপরায়ণা পতিব্রতা যুবতী চাও, পোর্সিয়া আছে; জগৎ মোহিত করিবার জন্য মায়াজাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, যে জালে পা দিতেছে, তাহারই সর্ব্বনাশ করিতেছেন, এমন দুর্ব্বুদ্ধিশালিনী ভুবনমোহিনী চাও, ক্লিওপেট্রা আছে। দুরাকাঙ্ক্ষায় জর্জ্জরিতহৃদয়া, লোকের উপর আধিপত্য করিবার ইচ্ছায় পাষাণবৎ দৃঢ়সংকল্পা, পুরুষকে পাপে প্রেরণ করিবার জন্য শয়তানরূপিণী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও, লেডি ম্যাকবেথ আছে। দেখিবে, এগুলি সব মানুষ। অমন যে পাষাণহৃদয় ম্যাকবেথপত্নী, যে রাজ্যলোভে ক্রোড়স্থিত স্তন্যপায়ী আপন শিশুকে আছড়াইয়া মারিতে ক্ষুব্ধ হয় না, সেও স্ত্রীলোক। রাজার মুখ আপন পিতার মুখের মত বোধ হওয়াতে স্বহস্তে রাজহত্যা করিতে পারিল না।

কালিদাস এরূপ মনুষ্য সৃষ্টি করিতে অক্ষম। তিনি মনুষ্যহৃদয়ের সুন্দর অংশ দেখাইতে পারেন। উদাহরণ—তিনি কণ্বমুনিকে শকুন্তলার ঠিক যাত্রার সময় বাহির করিলেন। যেহেতু, কন্যা-প্রেরণের সময় পিতার কান্না বড়ই সুন্দর। সেটি দেখান হইল, অমনি কণ্বমুনি ডিস্‌মিস্। কালিদাস তাঁহাকে একেবারে লুকাইয়া ফেলিলেন, আর বাহির করিলেন না। শকুন্তলার চিত্রটি পরম সুন্দর, এই জন্য আগাগোড়া শকুন্তলা-চরিত্র আমরা পড়িতে পাই। ওরূপ মুগ্ধ বালিকার প্রথম প্রণয় সুন্দর। সেই প্রণয়ের অনুরোধে দারুণ কষ্ট হইলেও পিতা-মাতা, সমদুঃখসুখ সখী, চিরপালিত হরিণশিশু, চিরবর্দ্ধিত নবমালিকা লতা ত্যাগ করিয়া

যাওয়া সুন্দর। রাজা প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহাকে হাবা মেয়ের মত লুকাইবার চেষ্টা সুন্দর। সে সময়ে একটু রাগ (এ রাগে বাহবা নাই) সুন্দর। এত অপমানের পর নিশ্চয় মিলনের আশা সুন্দর, কাশ্যপ-তপোবনে দেখিবামাত্র সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া একেবারে পামর প্রণয়ীর হস্তে আত্মসমর্পণও সুন্দর। কালিদাস বড় কবি, এত সৌন্দর্য্য কে দেখাইতে পারে! আবার একটি সুন্দর মনুষ্যের চিত্র দেখিবে? বিক্রমোর্ব্বশী খোল। রাজার স্বভাবটি কেমন সুন্দর। রাজা সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া সূর্য্যলোক হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, হঠাৎ অপ্সরাদিগের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। রাজা শুনিলেন, দৈত্যকেশরী অপ্সরা চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি কেশরী-হস্ত হইতে উর্ব্বশীর উদ্ধার করিলেন। বীরত্বে যেমন মেয়েদের চিত্ত সহসা আকর্ষণ করে, এমন আর কিছুতেই নয়। রাজার বীরত্বে উর্ব্বশীর তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মিল। ওরূপ অনুরাগ সুন্দর নয়? সুন্দরী অপ্সরা বিদ্যাধরীর অনুরাগ প্রায় নিষ্ফল হয় না। রাজারও মন কেমন হইয়া উঠিল, তিনি ক্রমে ধারিণীর প্রতি বীতস্পৃহ হইলেন। কিন্তু ধারিণী তাঁহাকে অপমানের শেষ করিলেও তিনি ধারিণীকে একটি উচ্চ বাক্যও বলেন নাই। শেষ ধারিণী প্রিয়-প্রসাধন ব্রত করিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-দেবতা সাক্ষী করিয়া বলিল যে, যে অদ্যাবধি আমার স্বামীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইবে, আমি তাহাকে ভগিনীর মত দেখিব। কেমন এটি সুন্দর নয়?

উর্ব্বশীর সহিত রাজার মিলনের কিছু দিন পরে হিমালয় পর্ব্বতে রম্য স্থানে সকলে বিহার করিবার জন্য উভয়ে প্রস্থান করিলেন। সেখানে বসন্ত-সময়ে পুষ্পবন-মধ্যে নির্জ্জন প্রদেশে নির্ঝরিণীতটে সান্ধ্যসমীরে শিলাপট্টে পরস্পরের সহবাসে পরম সুখে কালযাপন করেন। এক দিন উর্ব্বশী কার্ত্তিকের বাগানে উপস্থিত। কার্ত্তিক চিরকুমার, তাঁহার বাগানে স্ত্রীলোক গেলে পাছে দেবকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, এই জন্য শাপ ছিল, স্ত্রীলোক সেখানে গেলেই লতা হইয়া যাইবে। উর্ব্বশী লতা হইয়া রহিলেন, রাজা তাঁহার বিরহে উন্মত্ত। মেঘ দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি দৈত্য আবার উঁহাকে চুরি করিয়াছে। মেঘকে কতকগুলা গালাগালি দিলেন। মেঘ তাঁহার মাথার উপর জলধারা বর্ষণ করিল। রাজা বলিলেন, রে পাপ দৈত্য, আমারই সর্ব্বনাশ করিয়াছিস, আবার আমারই উপর বাণ-বর্ষণ? সে ভয়ে থামিল। একটা গাছের উপর ময়ূর গলা বাড়াইয়া কি দেখিতেছে, রাজা বলিলেন, অনেক দূর দেখিতেছ, আমার প্রিয়াকে দেখিতেছ কি? ময়ূর বলিল কক্ কক্। রাজার মহারাগ, আমি মহারাজ পুরূরবা, আমায় চেন না? বল কি না "কঃ কঃ" বলিয়াই চিল, ময়ূরও উড়িয়া যাক। রাজা অনেক কষ্টের পর গৌরীপাদভ্রষ্ট অলক্তক মণিসংযোগে উর্ব্বশীর উদ্ধারসাধন করিলেন। উর্ব্বশী বলিলেন, মহারাজ, আর না। আপনি রাজধানী চলুন। রাজা বলিলেন, তুমি মেঘ হও, উর্ব্বশী মেঘ হইলেন, রাজা তদুপরি আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে প্রয়াগে উপস্থিত। ইহা অপেক্ষা চিত্তবিনোদন আর কি আছে? যে কেহ কালিদাসের গ্রন্থ পড়িয়া রাজার সহিত কার্ত্তিকের প্রমোদকাননে ভ্রমণ করে নাই, তাহার সংস্কৃত পড়াই অসিদ্ধ।

আমরা এতক্ষণ নাটকের কথাই কহিতেছিলাম, আরও কিছুক্ষণ কহিব। নাটক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র লইয়াই ব্যস্ত। সে চিত্রে অনেক সৌন্দর্য্য কালিদাস দেখাইয়াছেন, কিন্তু আরও অনেক বাকী আছে। সেগুলি কালিদাসে মিলিবে না, তাহার জন্য সেক্ষ-পীয়রের শরণ লইতে হইবে। কালিদাসগ্রথিত সৌন্দর্য্য সেক্ষপীয়রেরও আছে। কালিদাসের পুরূরবা, কালি-দাসের শকুন্তলা অন্যত্র মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু সেক্ষপীয়রের প্রস্পেরো আর কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রস্পেরোর স্বভাব মনুষ্যহৃদয়গত সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। যে শত্রু তাঁহাকে জীর্ণ-শীর্ণ ডিঙ্গিমাত্রে চড়াইয়া অগাধ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে, যাহার জন্য বারো বৎসর রাজ্য হারাইয়া একাকী জনশূন্য দ্বীপে বাস করিতে হইয়াছিল, তাহাদের ক্ষমা করা সামান্য ঔদার্য্যের কথা নহে। প্রস্পেরোর গুণে সকলেই বাধ্য। কন্যা পিতার একান্ত বশম্বদ। নেপলসের রাজা উঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। ফর্দ্দিনান্দ উঁহাকে দেবতা মনে করে। প্রস্পেরো সংসারের কার্য্যে কেমন দক্ষ, সমস্ত নাটকে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। প্রস্পেরো মূর্ত্তিমান শান্তি, পরোপকার ক্ষমা তাঁহার আভরণ। কলিবানকে শত অপরাধ সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতা দিলেন, যেহেতু, সে তাহাই চায়। এরিএলের সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অন্তোনিওর দোষ প্রমাণ করিয়া দিলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়, তিনি কেবল একবার ভয় দেখাইয়া ক্ষান্ত হইলেন। তিনটা মাতাল তাঁহার ঘর লুঠ করিতে আসিয়াছিল, তাহারাও ক্ষমা পাইল। প্রসপেরো ক্ষমা করিলেন, কিন্তু সকলকেই এক একবার জব্দ করিবার পর। প্রসপেরোর চরিত্র পাঠ করিলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ও

ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এ একরকম সৌন্দর্য্য। আবার যখন ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধিতে বিবাদ হয়, সে সময়ের বর্ণনা কি সুন্দর নয়? ব্রুটস এণ্টনি, হ্যামলেট, এমন কি, ম্যাক্‌বেথ এই বিবাদহেতু কোন কাজই করিতে পারিতেছে না, একবার এ দিকে একবার ওদিকে করিয়া দোলাচলচিত্তবৃত্তি হইয়া রহিয়াছে, ইহা কি সুন্দর নয়? উহাদের জন্য কি আমাদের ক্ষুদ্রজীবী মনুষ্যের সহানুভূতি হয় না? ওরূপ সৌন্দর্য্য কালিদাসের কোথায়?

তাহার পর আর এক কথা। শুদ্ধ সৌন্দর্য্য হইলেই কি কাব্যের চরম হইল? সৌন্দর্য্য ছাড়া আরও অনেক জিনিসে কাব্য হয়। তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি। পণ্ডিতেরা বলেন, তিন পদার্থে কল্পনাজনিত আনন্দের উৎপত্তি হয়, প্রকাণ্ড বস্তু দেখিলে, নূতন বস্তু দেখিলে, আর সুন্দর বস্তু দেখিলে। এই কথাটি যেমন বাহ্যজগতে খাটে, তেমনি অন্তর্জ্জগতে। অন্তর্জ্জগতে যখন আমরা কাহাকেও লোকাতীত ক্ষমতাশালী দেখিতে পাই, যখন দেখিতে পাই যে, জিনদেব ব্যাঘ্রী জন্য স্বদেহ অর্পণ করিলেন, যখন দেখি যে, রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ বনগমন করিলেন, তখনই আমরা প্রকাণ্ড বস্তু দেখি। তখনই আমাদের মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয় এবং সেই বিস্ময়বিমিশ্রিত এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও ভক্তির উদয় হয়। কালিদাস এরূপ পুরুষপ্রকাণ্ডের চিত্র দেখাইতে পারেন নাই। রঘু রাজা যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ "মৃৎপাত্রশেষা-মকরোৎ বিভূতিম্;" পার্ব্বতী যখন মদনদহনের পর কঠোর তপস্যায় তনু অঙ্গে তাপ দিতে লাগিলেন, তখন যেন এইরূপ প্রকাণ্ড চিত্র দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে বোধ হয়; কিন্তু এক পার্ব্বতীর তপস্যা ভিন্ন আর কোথাও বিস্ময় উদয় করণে তিনি সমর্থ হয়েন নাই। সেক্ষপীয়রের এরূপ বিস্ময়-উৎপাদক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র অসংখ্য। এরূপ উজ্জ্বল চিত্রের সংখ্যা নাই। সর্ব্বপ্রধান লেডী ম্যাক্‌বেথ, একবার অনুতাপ নাই, বরং প্রতিজ্ঞা, একবার যখন নামিয়াছি, তখন দেখা যাক পাতাল কত দূর।' একবার হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ নাই, কেমন প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব! যখন সভামধ্যে ব্যাঙ্কোর প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া ম্যাক্‌বেথকে বিহ্বল করিয়া তুলিল, যখন ম্যাক্‌বেথ ভয়ে অনুতাপে জড়ীভূত হইয়া অতি গোপনীয় কথা সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন লেডী ম্যাক্‌বেথের কেমন ক্ষমতা! অন্য মেয়ে হইলে, "ওগো আমার কি হোলো" বলিয়া কাঁদিয়াই অস্থির হয়। লেডী ম্যাক্‌বেথ সভা শুদ্ধ লোককে বুঝাইয়া দিলেন যে, রাজার ঐরূপ মূর্চ্ছা মাঝে মাঝে হয়, এ সময়ে কাছে কেহ আসিলে তিনি বিরক্ত হন। এই বলিয়া নিজে ম্যাক্‌বেথের কাছে বসিয়া তাহার দুর্ব্বল মনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এরূপ চরিত্র পাঠ করিলে কাহার মনে বিস্ময়ের উদয় না হয়?

কল্পনাজনিত আনন্দের আর এক কারণ নূতনতা, অর্থাৎ আজগবি জিনিস বর্ণনা করা। আরব্য উপন্যাসে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। এরূপ নূতন জিনিস কালিদাস বা সেক্ষপীয়র কাহারই নাই। তবে সেক্ষপীয়রের স্পিরিট ওয়ারল্ড বা পরীস্থান; সেটি যেমন নূতন, তেমনি সুন্দর। সবই মনুষ্যের মত, কিন্তু কেমন পবিত্র আনন্দময়, কোনরূপ শোক-দুঃখ নাই। শোক-দুঃখ যে বৃত্তি দ্বারা অনুভব হয়, সে বৃত্তিও তাহাদের নাই। অথচ মানুষের কষ্ট দেখিলে মনটা কেমন কেমন হয়।

Ariel.	Your charm so strongly works them That if you now behold them your affection Would become tender.
Pros.	Dost thou think so, spirit?
Ari.	Mine would sir, were I human.

যদি আরিয়াল মানুষ হইত, তবে লোকের দুঃখ দেখিয়া তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইত। ওবেরণের অধীন দেবযোনিগণ মনুষ্যের অদৃষ্ট লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, মানুষের কাণে একপ্রকার পাতার রস ঢালিয়া দিয়া এর প্রাণটি ওর ঘাড়ে, ওর পিয়ারেব লোক তার ঘাড়ে দিয়া কেমন আমোদ করিতেছে; পড়িলে নূতন জগৎ, নূতন আমোদ, নূতন পরিবর্ত্ত বলিয়া বোধ হয়, পাঠক নিজেও যেন পরীগণমধ্যে বিলীন হইয়া যান; কালিদাসের চিত্রলেখা, সহজন্যা, মিশ্রকেশী, এমন কি, উর্ব্বশী, সেক্ষপীয়রের পরীস্থানে স্থান পান না।

সেক্ষপীয়রের হাস্যরসাকর চরিত্রবর্ণনা এক আশ্চর্য্য জিনিস। এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ফলষ্টাফ কতবার অপ্রস্তুত হইল, কিন্তু সে অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নহে। যতবার তাহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ততবারই সে নূতন নূতন চালাকি বাহির করে, ঠকিবার পাত্র

ফলষ্টাফ একেবারেই নহে। প্যারোনস ফলষ্টাফের সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাসের বিদূষকগুলি কোন কর্ম্মেরই নহে। জীবনশূন্য প্রভাশূন্য খোসামুদে বামুন মাত্র।

এত দূরে আমরা কালিদাস ও সেক্ষপীয়র তুলনার এক অংশ কথঞ্চিৎ শেষ করিলাম। বিষয় এত বিস্তৃত, সমালোচনায় এত আমোদ যে, সংক্ষেপ করিতে গেলেই কষ্ট হয়। যে অংশ সমালোচিত হইল, ইহাতে হৃদয়ের প্রবৃত্তি বর্ণনায় কাহার কত বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কল্পনাজনিত সুখ তিন কারণে জন্মে;—প্রকাণ্ডতা, সৌন্দর্য্য ও নূতনতা। প্রকাণ্ডতা—বিস্ময়কর হৃদয়ভাবের ঔজ্জ্বল্য-বর্ণনায় সেক্ষপীয়রের অনুকরণেও কেহ সমর্থ নয়। অতি নৈসর্গিক পদার্থসৃষ্টিতে সেক্ষপীয়র অতীব মনোহর, হাস্যরসের বর্ণনায় তাঁহার বড়ই ওস্তাদি। সৌন্দর্য্যবর্ণনা ও যেখানে হৃদয়বৃত্তির জটিলতা, গভীরতা, সেখানে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে অনেক ন্যূন। যে চরিত্র পাঠে মনের ঔদার্য্য জন্মে, যে চরিত্র অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গন্ধও কালিদাসের নাটকে নাই। তবে যেখানে সহজ অবিমিশ্র হৃদয়ভাবের বর্ণনা আবশ্যক, সেখানে কালিদাসের বড়ই বাহাদুরী। কালিদাসের নাটক পড়িয়া গেটের সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা করে—"যদি কেহ বসন্তের কুসুম, শরতের ফল, স্বর্গ ও পৃথিবী একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলে তোমায় দেখাইয়া দিব।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা দেখা গেল, তাহাতে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু কালিদাসের আর এক মূর্ত্তি আছে, সে মূর্ত্তিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহও নাই। বাইরণ জাঁক করিয়া বলিয়াছেন, Discription to my forte, কিন্তু সেই বাহ্য জগদ্বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। সেক্ষপীয়র বাহ্যজগদ্বর্ণনায় হাত দেন নাই, তিনি বাহ্যজগৎ বড় গ্রাহ্যও করিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য সর্ব্বতোমুখী। তাঁহার যেমন অন্তর্জ্জগতের উপর, কালিদাসের তেমনই বাহ্যজগতের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। যখন স্বয়ম্বরস্থলে ইন্দুমতী উপস্থিত হন, তখন কালিদাস দুই চারি কথায় কেমন জমজমাট করিয়া দিলেন। একেবারে কল্পনানেত্র উন্মীলিত হইল। দেখিলাম, প্রকাণ্ড উঠান, বহুসংখ্যক মঞ্চ, অর্থাৎ কথকঠাকুরদিগের মত বেদী, নানা কারুকার্য্যখচিত মহার্ঘ্য বস্ত্রাস্তরণোপপন্ন, তদুপরি পৃথিবীর রাজগণ বিচিত্র বেশভূষা করিয়া স্বীয় সঙ্গিগণ-সমভিব্যাহারে বসিয়া আছেন।

তাসু শ্রিয়া রাজপরম্পরাসু
প্রভাবিশেষোদয়দুর্নিরীক্ষ্যঃ।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্বিভক্তঃ
পয়োমুচাং পংক্তিষু বিদ্যুতেব॥

যেমন মেঘমালায় একটি বিদ্যুৎ হইলে সমস্ত মেঘ উদ্দীপ্ত হয় এবং সেই নিবিড় নীলনীরদমালার মধ্যে সেই বিদ্যুৎ যেমন গাঢ়োজ্জ্বলদীপ্তি বিকাশ করে, তেমনি রাজারা সব মঞ্চোপরি আসীন হইলে রাজসভার কেমন এক গভীরতামিশ্রিত লোকাতীত শোভা হইল। সব জমজম করিতে লাগিল। এমন সময়ে বন্দীরা স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল—রাজাদের বংশাবলীবর্ণনা সমাপন হইল।

অথ স্তুতে বন্দিভিরন্বয়জ্ঞৈঃ
সোমার্কবংশ্যে নরদেবলোকে।
প্রসারিতে চাগুরুসারযোনৌ
ধূপে সমুৎসর্পতি বৈজয়ন্তীঃ॥
পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং
কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাতশঙ্খে পরিতো দিগন্তান্
তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে॥
মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযান-
মধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তররাজমার্গং
পতিম্বরাক্লৃপ্তবিবাহবেশা॥*

কালিদাস রাজসভার কবি, তিনি নিজেও হয় ত এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি পুস্তক লিখেন—সভাস্থ ওমরাহদিগের তৃপ্তির জন্য; তাঁহার নিকট আমরা রাজসভা, বিবাহসভা, দরবার প্রভৃতি বড়মানুষি জিনিসের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পাইব, ইহা এক

* চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজগণের বংশাবলী পাঠ হইলে পর উৎকৃষ্ট অগুরুচন্দনের ধূম চারিদিকে প্রসারিত হইল। সে ধূম ক্রমশঃ অত্যুচ্চ পতাকা আক্রমণ করিতে লাগিল। মঙ্গলসূচক তূর্য্যধ্বনি সবলে ধ্বনিত হইল। তাহার সঙ্গে শঙ্খ প্রধ্মাত হইয়া, শব্দ আবর্ত্ত ঘন গাঢ় হইয়া দিগন্ত পরিপূর্ণ করিল। নগরের প্রান্তবর্ত্তী যে ময়ূরেরা ছিল, তাহারা মেঘগম্ভীর তূর্য্যমিশ্রিত শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া, উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এমন সময়ে স্বয়ংবরা রাজকন্যা বিবাহবেশ ধারণ করত মনুষ্যবাহ্য চতুষ্কোণ যান আরোহণ করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বভাব-বর্ণনায়ও তাঁহার সমান্তরাল কেহ নাই। বাহ্য জগদ্বর্ণনায় তিনি যে শুদ্ধ সৌন্দর্য্য মাত্র বর্ণন করিয়াছেন, এমন নহে। হিমালয়বর্ণনস্থলে যাহাই করুন, তাঁহার অনেক বর্ণনা এত গভীর যে, ভাবিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব-সৌন্দর্য্যবর্ণনাই আমরা বড় ভালবাসি এবং তাহাই অধিক।

কালিদাসের আরও একটি নিসর্গ বর্ণনা এখানে দেখাইতে হইল। এটি কালিদাসের রঘুর ত্রয়োদশ সর্গ হইতে। রাবণবধ ও বিভীষণের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে। রাম-সীতার অনেক হাঙ্গামের পর পুনর্ম্মিলন হইয়াছে। পুষ্পকরথ প্রস্তুত। সকলে আরোহণ করিল। পুষ্পক আকাশপথে উড্ডীন হইল। রাম সীতাকে দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমেই সমুদ্র—

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্ন-
মাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥
তাম্তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং
স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়-
মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা॥

সমুদ্রে প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যসমূহ রহিয়াছে।

সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ
সম্মীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ-
অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈঃ
ঊর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্॥

প্রকাণ্ড অজগরগণ সমুদ্রতীরে জলতরঙ্গের সঙ্গে একাকার হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গা
মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জ্জথুনির্ব্বিশেষাঃ।
সূর্য্যাংশুসম্পর্কসমৃদ্ধরাগৈ-
র্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ॥

দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের কূল দেখা গেল।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

রথ রামের যেমন অভিলাষ, তেমনি চলিতেছে। মুহূর্ত্তমাত্রে সমুদ্রতীরে উপস্থিত। রাম দেখাইলেন, সীতে, দেখ,—

এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি-
পর্য্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ।
প্রাপ্তা মুহূর্ত্তেন বিমানবেগাৎ
কূলং ফলাবর্জ্জিতপূগমালম্॥

আকাশ-নীরধির স্বৈরগামী প্রমোদনৌকার ন্যায় রামের পুষ্পকরথ জনস্থান, মাল্যবান্, পঞ্চবটী, পম্পা, শরভঙ্গাশ্রম প্রভৃতি পার হইয়া, প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমস্থলে উপস্থিত। এখানে নির্ম্মল শ্বেত-কান্তি গঙ্গাপ্রবাহ কৃষ্ণকান্তি যমুনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে।

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ
মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানা-
মিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং
কাদম্বসংসর্গবতীব পংক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভি-
শ্ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি! বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

এত মিষ্ট, এত সুন্দর, এমন হৃদয়োন্মাদকর বর্ণনা, প্রকৃতির এত সুনিপুণ অনুকরণ, কল্পনার এমন স্নিগ্ধ দীপ্তি আর কোথায় মিলিবে? আমার ইচ্ছা ছিল, আরও উৎকৃষ্ট বর্ণনা উদ্ধার করি, কিন্তু বঙ্গ-দর্শনের স্থান বড় অল্প; সবই যদি ভাল জিনিসে পুরাইয়া দিই ত আর সব ছাই-ভস্ম কোথায় যাইবে?

যখন নাটক ছাড়িয়া মহাকাব্যে উপস্থিত হইয়াছি, তখন কালিদাসের হইয়া আর একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। নাটকে কালিদাস মনুষ্য-হৃদয়ের যেমন একই রকম চিত্র দেখাইয়াছেন, মহা-কাব্যে সেরূপ নহে। মহাকাব্যে মনুষ্যচরিত্র-বর্ণনায় তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক কারুগরী প্রকাশ করিয়া-ছেন। কিন্তু তথাপি মনুষ্যহৃদয়ের উদারতা, বিশালতা,

জটিলতা, অহম্মুখতা চিন্তাপ্রিয়তা প্রভৃতি বর্ণনে তিনি সেক্ষপীয়রের ছাত্রানুছাত্রবৎ। তাঁহার কেবল একটি মনুষ্যচিত্র অনুকরণের অতীত। সেটি কুমার-সম্ভবের পার্ব্বতী। কেন? ভারতমহিলাপ্রস্তাবে লিখিত আছে, পাঠকমহাশয়ের ইচ্ছা হয়, একবার খুলিয়া দেখিবেন, আমাদের আর স্থান নাই।

সেক্ষপীয়র মহাকাব্য লিখিতে গিয়া যেরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন, কালিদাসকে সেরূপ হইতে হয় নাই। প্রত্যুত তাঁহার মহাকাব্যই তাঁহার মহাকবি-খ্যাতিলাভের মূল কারণ। এ সকলের উপর তাঁহার মেঘদূত। সমস্ত সাহিত্যসংসারে মেঘদূতের মত সারবান্ কাব্য অতি বিরল। আডিশন পোপের রেপ অব দি লক্‌কে "Merumsal the delicious little thing" বলিয়াছেন। তিনি যদি মেঘদূত দেখিতেন, তবে Merumsal এ নাম রেপ্ অব্ দি লকের দুষ্পাপ্য হইত। মেঘদূতের সঙ্গে তুলনায় অন্য কাব্য আতরের তুলনায় গোলাপজলের মত। একটি উৎকৃষ্ট পদার্থের সার অংশের উৎকৃষ্ট ভাগসংগ্রহ, আর একটি গন্ধ করা জল মাত্র।

এতক্ষণ আমরা কাব্যের বিষয় লইয়া কালিদাস ও সেক্ষপীয়রের তুলনা করিতেছিলাম। তাহাতে এই দাঁড়াইল যে, কালিদাসের বাহ্যজগতে যেরূপ অসীম আধিপত্য, সেক্ষপীয়রের অন্তর্জ্জগতে তেমনি। অন্তর্জ্জগতেরও এক অংশে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন নহেন। যেখানে হৃদয়ের সুন্দর ও কোমল ভাবগুলি বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে বোধ হয়, কালিদাস অনেক অধিক মিষ্ট লাগে। কিন্তু অন্য সর্ব্বত্র সেক্ষপীয়র উপমাবিরহিত।

বিষয়ের কথা শেষ হইল, এখন কাব্যের আকার লইয়া তর্ক হইতে পারে। এ তর্কেও কাহার কি দাঁড়ায়, দেখা উচিত। কাব্য তিন প্রকার;—শ্রব্য, দৃশ্য আর গীতিকাব্য। ইহার মধ্যে গীতিকাব্যে দুজনেই সমান। কেহই গীতিকাব্য লিখেন নাই, কিন্তু সেক্ষপীয়র তাঁহার নাটকমধ্যে যে সমস্ত গান দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট গীতিলেখক বলা যাইতে পারে। কালিদাসও কয়েকটি গান দিয়াছেন। বিক্রমোর্ব্বশীর পাহাড়িয়া ভাষায় গানগুলি বড় মিষ্ট। তাহার উপর কালিদাসের মেঘদূত। মেঘদূতকে দেশীয় আলঙ্কারিকেরা খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য বলিয়া কাব্যভেদ করা তাঁহাদের গায়ের জোর মাত্র। মেঘদূত সার ধরিতে গেলে একখানি গীতিকাব্য, এবং উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে উহাকে গীতিকাব্যই বলিয়া থাকেন। যখন হৃদয়ে আনন্দ বা শোক ধরে না, তখন তাহাকে কাব্যাকারে বাহির করিয়া দেওয়াই গীতিকাব্য। তবে মেঘদূত গীতিকাব্য কেন না হইবে?

সেক্ষপীয়রের শ্রব্যকাব্য প্রায় লোকে পড়ে না। কালিদাসের শ্রব্যকাব্যগুলি রঘু, কুমার, ঋতুসংহার সকলই পণ্ডিতসমাজে বিশেষ আদরের বস্তু।

দৃশ্যকাব্য নানারূপ। তন্মধ্যে নাটক প্রধান। সংস্কৃত অলঙ্কারে নাটকের আকার লইয়াই বাঁধা-বাঁধি, পাঁচ অঙ্ক, নয় সাত অঙ্ক হইবে, রাজা নায়ক হইবে। মন্ত্রী হইলে হইবে না। নাটকের যেটুকু নহিলে নয়, সেটুকুর উপর তত নজর নাই। কথাচ্ছলে বিচ্ছিত্তি পূর্ব্বক হৃদয়ের ভাব প্রকাশ ও সেই ভাব দ্বারা পরহৃদয়ের ভাব আকর্ষণ—এই দুইটি নাটকের সার। নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য কোন উন্নত নীতির শিক্ষা। আমাদের কবিদের এদুটিতে নজর বড় নাই। এমন কি, যে বীজ লইয়া নাটক, অনেক সময় বাজে কথায় ৬ অঙ্ক কাটাইয়া ৭ম অঙ্কে সেই বীজের অবতারণা করা হয়। (অভিজ্ঞান শকুন্তলায় ১ম ২য় অঙ্ক না থাকিলে নাটকের কোন হানিই ছিল না, নাটকের বীজ ৩য় অঙ্কে। চতুর্থ অঙ্কেও নাটকের কোন উপকার নাই। নাটকের জন্য দরকার রাজার প্রণয়, প্রত্যা-খ্যান, অভিজ্ঞান ও মিলন। কিন্তু কালিদাস ত নাটক লিখিতে যান নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য এই আদরার উপর এই কাঠামতে তাঁহার কাব্য-গ্যালারি হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখান। তাহা তিনি খুব দেখাইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। শকুন্তলার মত বালিকার প্রথম প্রণয়ে আড়নয়নে চাহনি বড় সুন্দর? না? কালিদাস সেইটি দেখাইবেন। অনেক চেষ্টা হইল, এক অঙ্ক পুরিয়া গেল, সেটা আর দেখান হয় না, ক্রমে একঘেয়ে রকম হইয়া দাঁড়াইল। কালিদাস বিনা প্রয়োজনে একটা হাতী হাতী বলিয়া গোল (নেপথ্যে) তুলিয়া দিলেন। রাজার গল্প ভাঙ্গিবার উপায় হইল, শকুন্তলারও আড়ে আড়ে দেখিবার সুবিধা হইল, সে হাতী কালিদাসের উপকার করিল বটে, কিন্তু নাটকের কিছুই করিল না। সেক্ষপীয়র কিন্তু একটি সিন, একটি উক্তিও বিনা প্রয়োজনে সন্নিবেশিত করেন নাই। অনেক অবুঝ লোকে মনে করিত যে, ম্যাকবেথে ঐ যে দরজায় ঘা মারা আছে, ওটা কেবল সকাল হইয়াছে, জানাইবার জন্য, সুতরাং উহাতে নাটকের কোন উপকার নাই। কিন্তু ডিকুইনসি দেখাইয়া দিলেন যে, ঐ

দ্বারে আঘাতে অনেক উপকার হইয়াছে। পাপিষ্ঠ দম্পতি হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিয়া পাপচিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিল; তাহাদের মন তাহাদের ছিল না, তাহারা আপন পার্থিব অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছিল। দ্বারে আঘাত হইবামাত্র তাহাদের বজ্রধ্বনিবৎ বোধ হইল, তাহাদের মন আকাশ-ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আবার দেহপিঞ্জরে প্রবেশ করিল। অন্য কবিরা বার বার বজ্রধ্বনি করিয়া যে গাম্ভীর্য্য উৎপাদনে অক্ষম, সেক্ষপীয়র সময়মত বার কত দরজায় ঘা মারিয়া তাহার দশগুণ করিলেন। যে বুঝিল, তাহার পর্য্যন্ত হৃৎকম্প হইল।

এক্ষণে কালিদাস ও সেক্ষপীয়র এই উভয়ের তুলনায় সমালোচনা শেষ হইল। সেক্ষপীয়র Brince of the Dramatists এ কথা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু কালিদাস সকল প্রকার কাব্যই লিখিয়াছেন এবং বোধ হয়, নাটক ভিন্ন সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহাকাব্যে তিনি বাল্মীকির সমান নহেন সত্য, কিন্তু তিনি ফেলা যান না। নাটকেও তিনি যে ভারতবর্ষের কোন কবি অপেক্ষা হীন, এমত বলিতে পারি না। কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণনাময় কাব্য ঋতুসংহার লিখিয়াছেন, এ কথা বলিলে "ভারতের কালিদাস জগতের তুমি" এই যে অতি অন্যায় সমালোচনা প্রচলিত আছে, তাহারই সপক্ষতা করা হয়। সেক্ষপীয়রও যেমন জগতের, কালিদাসও তেমনি জগতের। জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার কবিতার সমান সমাদর। তবে তিনি ভারত ছাড়া কোন কথাই লিখেন নাই। ভারতের কথাই তাঁহার কাব্য।

আমাদের উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, সেক্ষপীয়র মেনকা হইতে পারেন, বাল্মীকি উর্ব্বশী হইতে পারেন, তোমার রম্ভা হইতে পারেন, কিন্তু কালিদাস স্বর্লোকদুর্লভা তিলোত্তমা। সকলেরই উৎকৃষ্টাংশ তাহাতে আছে, কিন্তু অল্পপরিমাণে প্রবন্ধ শেষ করিবার সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

"কালিদাসকবিতা নবং বয়ঃ,
মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ।
এণমাংসমবলা চ কোমলা
সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মনি॥"

সেই সঙ্গে পাঠক মহাশয়দেরও যেন ফাঁক না যায়।

[বঙ্গদর্শন—১২৮৪ বৈশাখ।

শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন ?

বঙ্গদেশে বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার নাই, এজন্য বঙ্গদেশে শঙ্করাচার্য্যের মত লোকে বিশেষ অবগত নহে। বঙ্গদেশে তাঁহার প্রভাবও বড় অধিক নহে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষ দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্যকে লোকে দেবতা বলিয়া পূজা করে; তাঁহার গ্রন্থাবলী আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করে; তাঁহার মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে এবং অনেকে তাঁহার মত অনুসারে সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে। মধ্যসময়ে ইয়ুরোপে আরিস্ততলের যেমন প্রভুত্ব হইয়াছিল, আধুনিক ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্যেরও প্রায় তেমনি প্রভুত্ব। তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত উপন্যাস শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, তিনি ৩২ বৎসর বয়সে সমস্ত বেদ-বেদান্তের টীকা লিখিয়া কাশীতে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ "অপরস্যা ভবিষ্যতি" বিষয়ক অদ্ভুত গল্পটি তাঁহার জীবনীতে প্রয়োগ করেন। কেহ আবার বলেন, শঙ্করাচার্য্য মহীশূরে স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণ পাইয়া টেপু সুলতান ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই হারিয়া যায়।

হিন্দুরা শঙ্করাচার্য্যকে শঙ্করের অবতার মনে করেন এবং শৈবধর্ম্মের মিশনরী মনে করেন। ওদিকে আধুনিক ইংরাজীওয়ালারা বলেন, শঙ্করাচার্য্য এক জন সমাজসংস্কারক, তিনি বৌদ্ধদিগকে এদেশ হইতে দূর করিয়া দেন। তাঁহা হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রচার হয়; তিনি লুথর, লয়োলা প্রভৃতি সংস্কারকদিগের ন্যায় উচ্চদরের লোক। যাঁহার বিষয়ে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত চলিয়া আসিতেছে, যাঁহার কথা এখনও বেদ বলিয়া কোটি কোটি লোক মানিয়া আসিতেছে, তাঁহার কার্য্যকলাপ, তাঁহার জীবনচরিত ও তাঁহার মত বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গ কিছু জানিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে উপস্থিত প্রস্তাবের অবতারণা হইল।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত-বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ।

আমরা শঙ্করাচার্য্যের বহুসংখ্যক জীবনচরিতের নাম শুনিয়াছি। এমন কি, অনেক বৈদান্তিকের বিশ্বাস, তাঁহার সকল শিষ্যই তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে থাকুক। আমরা এক্ষণে দুইখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানি শঙ্করাচার্য্যের এক জন প্রধান ছাত্র আনন্দ গিরির লিখিত, অপরখানি মাধবাচার্য্যের। প্রথমখানির নাম শঙ্করবিজয়, দ্বিতীয়খানির নাম শঙ্করদিগ্বিজয়। প্রথমখানি গদ্য, দ্বিতীয় খানি মহাকাব্য—ষোড়শ সর্গে সম্পূর্ণ। বর্ত্তমান প্রস্তাব প্রধানতঃ দুইখানি গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইবে। আনন্দ গিরি ও মাধবাচার্য্যের এ স্থলে বিশেষ পরিচয় আবশ্যক করে না, উভয়েই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথিতনামা। এক জন শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যদিগের মধ্যে পদ্মপাদাচার্য্যের পরই প্রধানতম বলিয়া গণ্য এবং স্বীয় আচার্য্যের বহুসংখ্যক ভাষ্যের টীকাকার। অপর জন বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরের ছাত্র, প্রসিদ্ধ বেদার্থপ্রকাশনামক বেদব্যাখ্যার রচয়িতা।

শঙ্করবিজয়ের প্রাধান্য।

মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ অপেক্ষা শঙ্করবিজয়ের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক অধিক। আনন্দ গিরি আচার্য্যের সমসাময়িক লোক। মাধবাচার্য্য অন্ততঃ তাঁহার ছয় শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আনন্দ গিরি গদ্যে ইতিহাস লিখিব প্রতিজ্ঞা করিয়া লিখিয়াছেন। মাধব মহাকাব্য লিখিতে গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাঁহাকে রাজা নব কালিদাস উপাধি দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কথায় আমরা অধিক বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু কল্পনা যতই ক্ষমতা বিস্তার করুক না, ধর্ম্মভয়ে আচার্য্যের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় মাধব ও আনন্দে বড় ইতরবিশেষ নাই।

শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন ?

শঙ্করাচার্য্য-বিষয়ে কতকগুলি লোকায়ত কুসংস্কার আছে। তাঁহার জীবনী লিখিবার পূর্ব্বে সেইগুলি দূর করা আবশ্যক। প্রথম কুসংস্কার এই যে, তিনি এক জন সমাজ-সংস্কারক, কেহ তাঁহাকে বুদ্ধের সহিত, কেহ চৈতন্যের সহিত, কেহ লুথরের সহিত, কেহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংস্কারকদিগের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তিনি সমাজসংস্কারক ছিলেন না। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের সহিত তুলিত হইবার তাঁহার কোন

অধিকার নাই। তাঁহার হৃদয় অতি ক্ষুদ্র, স্বার্থপর ও উদারতাবিরহিত। তিনি বুদ্ধিমান্, বিচারপটু, অগাধবিদ্যাসমুদ্রপারযায়ী, যে ক্ষমতাবলে অনেক লোক আয়ত্ত হয়, অনেকে দেবতা, গুরু, অবতার বলিয়া মান্য করে, সেই ক্ষমতা তাঁহার অপর্য্যাপ্ত ছিল। তাঁহার ন্যায় বক্তৃতাশক্তি, তাঁহার ন্যায় রচনার গভীরতা প্রাচীন ভারতবর্ষে দুর্লভ। কিন্তু তথাপি তিনি সমাজসংস্কারক নহেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি চারি জাতি এক করিয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিব, সকলকে সম্প্রীতি, সৎকার্য্য, সদ্ধর্ম্মে আনিয়া নূতন সভ্যতার ভিত্তিপাত করিব, এ সকল তিনি পারিতেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ সকল উদারভাব তাঁহার অনুদার হৃদয়-কন্দরে স্থান পায় নাই। সংস্কারবিষয়ে তিনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা এই,—তিনি ব্রাহ্মণদিগকে শিব, শক্তি প্রভৃতি নানা উপাসনা হইতে বিরত করিয়া শুদ্ধাদ্বৈত মত গ্রহণ করিয়া মঠাশ্রমী হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এইটুকু তাঁহার সংস্কারকার্য্য। ইহাতে ভারতবর্ষের দুই প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রথম হিন্দুদিগের মধ্যে মঠাশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এবং অন্যান্য বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সহানুভূতি হ্রাস হইয়াছে। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, তিনি যখন উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেছেন, সেই সময় শূদ্রজাতীয় উন্মত্তভৈরবনামা কাপালিক তাঁহার সহিত বিচার করিতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "গচ্ছ কাপালিক, স্বচ্ছন্দে বেড়াও গিয়া; দুষ্টমতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে দমন করিবার জন্যই আমার আগমন। অগ্রজাতিপাদসেবাই অন্ত্যজাতির কর্ম্ম। অতএব শিষ্যগণ, উহাকে দূর করিয়া দেও।"

বলিবামাত্র শিষ্যেরা কশাঘাত পুরঃসর কাপালিককে দূর করিয়া দিল।* এই তাঁহার সমাজসংস্কার।

বিরুদ্ধ মতখণ্ডন।

অনেকে বলিবেন, শঙ্করাচার্য্য যে সময়ের লোক, সে সময়ে শঙ্করাচার্য্যের ব্রাহ্মণদমনকার্য্য দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। সত্য হইয়াছিল। তাঁহার পর ব্রাহ্মণদিগের যথেষ্ট বিদ্যোন্নতি হয়। তিনি স্বীয় মনের অগ্নিময় তেজোবলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটি নূতন সাহসের আবির্ভাব করেন, তাহার ফল আমরা আজিও অনুভব করিতে পারি। তাই বলিয়া তাঁহাকে আমরা রিফরমর বা সমাজ-সংস্কারক বলিতে পারি না। যদি বলিতে হয়, তিনি উচ্চদরের সংস্কারক ছিলেন বলিতে পারিব না। তাঁহার কৃত সংস্কার ব্রাহ্মণ জাতিতে পর্য্যবসিত। বুদ্ধদেবের আগে হইলে তাঁহার ঐ সংস্কারেই বাহাদুরী হইত বটে, কিন্তু বুদ্ধদেবের পর ওরূপ অল্পায়ত সংস্কার তাঁহার অনুদার মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় মাত্র।

তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়ান নাই।

তাঁহার বিষয়ে দ্বিতীয় কুসংস্কার এই যে, তিনি বৌদ্ধদিগকে এ দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। শঙ্করবিজয় গ্রন্থের নির্ঘণ্টপত্রে নয়ন নিক্ষেপ করিলেই জানিতে পারা যাইবে, এইটি ভ্রমাত্মক সংস্কার। তিনি বৌদ্ধ জৈন মত নিরাকরণ করিয়া তন্মতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন। এই নব দীক্ষিত বৌদ্ধেরা তাঁহার শিষ্যদিগের পদসেবা প্রভৃতি কার্য্য করিত ও তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট আহার করিত। জৈনেরা এই অবধি বণিক্ হইল, সৌগতেরা দাস হইল, বৌদ্ধেরা বন্দী অর্থাৎ স্তুতিপাঠক হইল। এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি যেমন বৌদ্ধমত নিরাকরণ করেন, তেমনি বৈষ্ণবমত, শৈবমত, সৌরমত, কাপালিকমত, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডমত এবং ঔপনিষদিক সাংখ্যমতও নিরাকৃত করেন, অতএব তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়াইলেন কিরূপে? পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের যেমন প্রভুত্ব ছিল, তাঁহার সময়ে তেমন ছিল না। তাঁহার সহিত বিচারে উহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হয়, কিন্তু তিনি উহাদের তাড়াইলেন কৈ? আর যদিই তাড়াইলেন, তবে তাহার পরে লোক আবার বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে যায় কেন?

তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রচার হয় নাই।

তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়ান নাই, বৌদ্ধেরা তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ পৌত্তলিক উপাসনার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। পৌত্তলিক উপাসনাপ্রবর্ত্তক পৌরাণিকগণই ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের পুনঃ সংস্থাপক। তাহাদের নিকট হইতেই আবার লোকে ব্রাহ্মণকে ভয় করিতে, ভক্তি করিতে, ভূদেব বলিয়া প্রণাম করিতে শিখে—তাহাদের দ্বারাই বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি বৈদিক অবৈদিক দেবতাদিগের উপাসনা প্রচারিত হয়। ইহার পর এই সকল পৌত্তলিক ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিকধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করা

* শঙ্করবিজয় ২৪ প্রকরণ

হয়। আবার বৈদিকধর্ম্মের পুনঃ প্রচার হয়। সে প্রস্তাবও শঙ্করাচার্য্যের নহে। যখন বৈদিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আবার চলিতেছে, সেই সময়ে তিনি উপস্থিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড হইতে উঁহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডে অধিকতর মনোযোগ দিতে আজ্ঞা করেন। ইহারই নাম দুষ্ট ব্রাহ্মণ-দমন।

তিনি শৈবমতপ্রচারক ছিলেন না।

যাঁহারা মনে করেন, শঙ্করাচার্য্য শৈবমত-প্রচারক, তাঁহারা একবার শঙ্করবিজয় খুলিয়া দেখিবেন। উঁহার নির্ঘণ্টপত্রেই পাইবেন, "শৈবমত-নিরাকরণম্"। বাস্তবিকই শঙ্করাচার্য্যকে—শুদ্ধা-দ্বৈতমতের পোষক, অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী পুরুষকে—শৈবমতপ্রচারক বলিলে তাঁহাকে গালি দেওয়া হয় মাত্র।

সংক্ষিপ্তার্থ।

এতক্ষণ শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন না, তাহাই দেখাইতেছিলাম। তিনি সমাজসংস্কার ছিলেন না। বৌদ্ধদিগকে তিনি তাড়ান নাই। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম তিনি পুনঃ প্রচার করেন নাই। শৈবমতের তিনি সংস্থাপক নহেন। তবে তিনি কি ছিলেন? তাঁহার এত প্রভুত্ব কেন? এত লোকে তাঁহাকে মানে কেন? যে সকল মহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহার নাম ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হওয়া উচিত, এক্ষণে সেই সকলের কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। সবিস্তারে লিখিতে গেলে বিস্তর হয়, এই জন্য সংক্ষেপে কয়েকটি সার কথা মাত্র বলিবার চেষ্টা করিব।

তাঁহার যশের প্রধান কারণ বিদ্যা।

তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি-প্রভুত্বের প্রধান কারণ তাঁহার বিদ্যা। অতি অল্পবয়সেই তিনি তৎকাল-প্রচলিত সমস্ত সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পাঠসমাপ্তির পূর্ব্বেই গুরুর আসনে উপবেশন করিয়া সমস্ত সহাধ্যায়ীদিগকে দুরূহ দুর্ব্বোধ শাস্ত্র-সমূহের বিশদ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন। "চতুঃষষ্টি কলা, চতুর্দ্দশ বিদ্যা, সমস্ত বেদ, সূত্র, ইতিহাস, তাপনীয়, আগম, মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র সমস্ত বিষয়ে তিনি কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্বপর্ব্বতে যেমন বালভানু, বিদ্যা অদ্রিমালায় তিনি তেমনি, ব্রহ্মাণ্ড গোলকীলকে তিনি ধ্রুবের ন্যায়, যজ্ঞবিদ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়, (ইত্যাদি) উপবিষ্ট হইয়া তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন।" ইহাতেও তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হইল না। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ শাঙ্করভাষ্য পাঠ করিলে জানা যাইবে, তাঁহার বিদ্যার পার ছিল না। ব্রাহ্মণগ্রন্থ, বৌদ্ধগ্রন্থ, জৈনগ্রন্থ, কাপালিক-গ্রন্থ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণমধ্যে ছিল। যিনি এত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তিনি যে জগদ্বিখ্যাত হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

২য়—রচনা।

শঙ্করাচার্য্যের রচনা তাঁহার প্রতিপত্তির দ্বিতীয় কারণ। সরল মিষ্ট সুললিত পদবিন্যাস করত তিনি দুরূহ, দুর্ব্বোধ, অতি জটিল শাস্ত্রসমূহের অতি কঠিন, অতি সূক্ষ্ম অতি নীরস অংশ সকলের অতি বিশদ মূঢ়জনেরও সুবোধ্য অর্থ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন লেখনী ধারণ করিতেন, বোধ হয়, তাঁহার হৃদয় লেখনীর অনুসরণ করিত। ভাষা তাঁহার ভাবপ্রকাশে কাঁদিত। যখন লেখনী ধরিতেন, কোথাও যে বিশ্রাম করিতে হইত, ভাবিয়া ভাবসংগ্রহ করিতে হইত, মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতে হইত, একেবারে বোধ হয় না। বোধ হয়, অস্তস্থ বিদ্যাসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া তীব্রস্রোতে অজস্র লেখনী-মুখে নির্গত হইত। কখন স্তুতি, কখন নিন্দা, কখন হৃন্মর্ম্মভেদী শ্লেষবাক্য, কখন ভক্তি, কখন জটিল শাস্ত্রার্থ, সমান বেগে, সমান তেজে, সমান ওজস্বিতার সহিত বহির্গত হইত। শঙ্করাচার্য্যের মত কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে, প্রাচীন বলিয়া দূরীকৃত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার রচনা, তাঁহার ওজস্বিনী লেখনীমুখনিঃসৃত বাক্যপরম্পরা, তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ শাঙ্করভাষ্য, কখনই বিস্মৃতি-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে না।

আচার্য্য শুদ্ধ নিজেই লিখিতে পারিতেন, এমন নহে, তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহার অনুকরণ করিয়া ভাষাজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কেবল স্বয়ং অদ্বিতীয় লেখক নহেন, তিনি এক অদ্বিতীয় লেখকসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। আনন্দ গিরি, শ্রীধর স্বামী তাঁহার শিষ্য-পরম্পরামধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। শুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণ কেন, যে কেহ তাঁহার পর লেখনী ধরিয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে অনুকরণ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার রচনা অনুকরণের অতীত।

৩য়—বিচারপটুতা।

বিচারপটুতায় তাঁহার অপেক্ষা বড় অতি অল্প লোক আছেন। তিনি দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া তত্তৎস্থানস্থ পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করিয়া স্বমত গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্ব্বধর্ম্ম বিরোধী চার্ব্বাক ও কাপালিক, হিন্দুধর্ম্মবিরোধী বৌদ্ধ, সৌগত, জৈন, হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতর দেবধর্ম্ম-বিরোধী পৌত্তলিক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদির উপাসক, বৈদিকদিগের মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড-বিরোধী কর্ম্মকাণ্ড-আশ্রয়ী মীমাংসক, জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয়ীদিগের মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈতমত বিরোধী সাংখ্যাদি, এই সমস্ত পণ্ডিতদিগকে স্বীয় মনীষাপ্রভাবে যিনি জয় করিয়াছেন, তিনি কি অদ্বিতীয় নহেন? তিনি হিন্দুমনে এমনি একটি শীলমোহর মারিয়া গিয়াছেন যে, এখন আর শুদ্ধ সাংখ্যমত, শুদ্ধ পৌত্তলিক মত দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায়ই সকলে অদ্বৈতমত বজায় রাখিয়া আপন আপন মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। পুরাণ, তন্ত্র, নূতন স্মৃতি, সর্ব্বত্র অদ্বৈতমতই চলিতেছে। যে পুরাণ সাংখ্যমতে লিখিত, সেও শেষ বলে, প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে মিলিয়া অদ্বৈত ঈশ্বর। কেবল বঙ্গীয় নৈয়ায়িকেরা শঙ্করাচার্য্য হইতে আপনাদিগের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাদের বিলক্ষণ বাহাদুরী আছে।

গ্রন্থ ও টীকার সংখ্যা।

শঙ্করাচার্য্য যে কত গ্রন্থ ও টীকা রচনা করিয়াছেন, বলা যায় না, সকল এখনও ছাপা হয় নাই। বাদরায়ণ-প্রণীত বেদান্তসূত্রের তিনি ভাষ্য করেন। যদিও টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি এই ভাষ্য টীকা নহে। এখানি শঙ্করাচার্য্যের নিজমত প্রচারের উপায়। সূত্রগুলি এমনি প্রহেলিকার ন্যায় যে, উহা হইতে যে যেরূপ ইচ্ছা অর্থ করিতে পারে। ঐ এক সূত্রমালা হইতে নানা দর্শনের, নানা প্রস্থানের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ সূত্র হইতেই একখানি বৈষ্ণব-দর্শন ও পূর্ণপ্রজ্ঞ নামে আর একখানি দর্শন হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রগুলিকে দ্বার মাত্র করিয়া তাঁহার গভীর অন্তরমধ্যে শিষ্যগণকে প্রবেশ করাইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভগবদ্গীতার ভাষ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আনন্দ গিরি সেই ভাষ্যের টীকা করিয়াছেন এবং শ্রীধর স্বামী তাহার সংক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে যে সকল উপনিষৎ চলিত ছিল, শঙ্করাচার্য্য সে সমস্তেরই টীকা করিয়াছিলেন। অনেক উপনিষৎ তাঁহার পরে লিখিত, ইহাতে তাঁহার টীকা নাই। অনেক উপনিষদের টীকা তাঁহার লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু বাস্তবিক সেগুলি জাল। শঙ্করাচার্য্য সমস্ত বেদের টীকা করেন, সেটি মিথ্যা কথা। তাঁহার জ্ঞানকাণ্ডে প্রয়োজন, তিনি জ্ঞানকাণ্ডেরই টীকা লিখিয়াছেন। সমস্ত বেদের ব্যাখ্যা তাঁহার পরে লিখিত হয়।

স্বমত-প্রচার।

শুদ্ধাদ্বৈতমতপ্রচারই শঙ্করাচার্য্যের প্রভুত্বের প্রধান কারণ। "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি উপনিষৎবাক্যের তিনি অদ্বৈত-মতে অর্থ করেন। তাঁহার মতে জগতে যা কিছু দেখি, সমস্তই ভ্রম, তুমি, আমি, বাড়ী, ঘর, নদ, নদী, পর্ব্বতাদি সমস্তই ভ্রম। কেবল এক ঈশ্বরই সত্য। তিনিই সব, তিনি ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে। তবে আমাদের যে তুমি আমি জ্ঞান হইতেছে, সে অধ্যাস (যেটা যে জিনিস নয়, সেইটাতে সেই জিনিস বলিয়া জ্ঞান)। শঙ্কর এই মত কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করেন। লোকে বৈষ্ণবাদি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করে। তিনি কোন্ কোন্ মত খণ্ডন করেন, পরে লিখিত হইবে।

মঠ-স্থাপন।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী—তিনি বহুসংখ্যক লোককে সন্ন্যাসী করেন। পূর্ব্বকালে সন্ন্যাসী ছিল কি না, ঠিক বলা যায় না। মনুতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া একদল লোক আছে। তাহারা বাল্যকাল হইতে গুরুর আলয়ে বাস করিয়া লেখাপড়া ও ধর্ম্মকর্ম্ম করিত—তাহারা বিবাহ করিত না, কিন্তু তাহারা সন্ন্যাসী ছিল না। চতুর্থ আশ্রমই সন্ন্যাসাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ আশ্রম কাটাইয়া লোকে সন্ন্যাসী হইত, যোগাদিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। শঙ্করাচার্য্যের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে একটি মত ক্রমে প্রবল হইতেছিল যে, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" যে দিন সংসারে বিরক্তি হইবে, সেই দিন হইতেই সন্ন্যাসী হইতে পারিবে। শঙ্করাচার্য্য এই মত অনুসারে ব্রহ্মচারী অবস্থাতেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতেই সন্ন্যাসী মোহান্তের কিছু বাড়াবাড়ি। এখানকার সকল সন্ন্যাসীই শঙ্করকে আপনাদের গুরু বলিয়া স্বীকার

করে। শঙ্করাচার্য্য আপন শিষ্য সন্ন্যাসীদিগের জন্য 'ভারতী' নামক সম্প্রদায় স্থাপন করেন। অনেকে বলেন, তিনি গিরি, পুরী, ভারতী তিন সম্প্রদায়ের মোহান্তদিগেরই সংস্থাপক, শঙ্করবিজয়ে কিন্তু আমরা ভারতী ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাই না।

এই ভারতী সম্প্রদায়ের মোহান্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তারকেশ্বরের মোহান্ত গিরি, কিন্তু তাঁহার দশনামার মধ্যে দুই তিন জন ভারতী আছেন। শঙ্করাচার্য্য স্বশিষ্য সন্ন্যাসীদিগের জন্য তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে মঠ-স্থাপন করেন। ঐ মঠ এখন সিংহারি নামে খ্যাত। কাঞ্চী নগরে তাঁহার দুই পুরী বা মঠ ছিল। এখন আছে কি না বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন, কিসের জন্য তাঁহার এত মান্য, এক প্রকার উক্ত হইল। তাঁহার জীবনচরিত বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

[বঙ্গদর্শন—৫ম খণ্ড ১২৮৪ আশ্বিন।

ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার

(বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা)

পূর্ব্বকালে ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর দেশে অনন্তবর্ম্ম নামে এক জন প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ বাস করিতেন। তিনি এক জন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র নামক এক জন অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন সংস্কৃত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সংস্কৃত-সাহিত্যে বৃহৎকথা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র নামক এক জন কবির নাম শুনিতে পাই। অনন্তবর্ম্ম দেবের সমকালবর্ত্তী ক্ষেমেন্দ্র ও "বৃহৎকথা"-রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র এক ব্যক্তি কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। "বৃহৎকথা" গ্রন্থ এক্ষণে লোপ হইয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে, উহা গদ্যে লিখিত। সোমদেব ভট্ট এই গদ্য গ্রন্থ হইতে "কথাসরিৎসাগর" নামক যে কবিতাময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাই এ দেশে প্রচলিত আছে।

আমাদের ক্ষেমেন্দ্রের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নক্ক নামে এক বন্ধু ছিলেন। কাব্যরচনায় ক্ষেমেন্দ্রের যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইলে নক্ক বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার সহচরবর্গের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য কীর্ত্তি সকল বর্ণনা করিয়া জাতক ও অবদান নামে বহুসংখ্যক গল্প প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মনীষিগণ এই সকল গল্প একত্রিত করিয়া বহুসংখ্যক সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহামতি হজসন্ সাহেব নেপাল হইতে এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ইউরোপীয় ও এদেশীয় পণ্ডিতসমাজে সমর্পণ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃত হইলেও উহাতে অনেক প্রকার ব্যাকরণদোষ দৃষ্ট হয়। উহার রচনাপ্রণালী অতি কর্কশ ও বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দে পরিপূর্ণ। নক্কের সময় এইরূপ সংগ্রহ-গ্রন্থ অনেক ছিল, কিন্তু তাহাদিগের ভাষার কাঠিন্য, লালিত্যশূন্যতা প্রভৃতি কারণে সেগুলি লোকশিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া নক্কের ধারণা হইয়াছিল। তিনি ক্ষেমেন্দ্রের রচনার লালিত্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অসাধারণ কবিত্বদর্শনে মনে করিতে লাগিলেন, যদি ক্ষেমেন্দ্র দ্বারা জাতক ও অবদানগুলিকে কাব্যাকারে লিখাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহা পণ্ডিতসমাজে আদরণীয় হইবে ও লোকশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিবে। এইরূপ মনে করিয়াই তিনি ক্ষেমেন্দ্রকে অবদান রচনার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষেমেন্দ্র ব্রাহ্মণধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং তিনি প্রথমে এই কার্য্যে সম্মত হন নাই। কিন্তু হৃদয়বান্ধবের অনুরোধ লোকে কতক্ষণ উপেক্ষা করিতে পারে? অনেক তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে তিনি বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র ত বৌদ্ধদিগের অবদানাবলী অবগত নহেন, তিনি কেমন করিয়া বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করিবেন? নক্ক তখন তাঁহাকে এক একটি করিয়া অবদান বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন এবং ক্ষেমেন্দ্র সেই অবদানগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যাকারে লিখিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপ তিনখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা হইলে ক্ষেমেন্দ্র কহিলেন, আর পারা যায় না, আমি যে শাস্ত্র জানি না, শুদ্ধ তোমার নিকট শুনিয়া সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে কিরূপে কাব্য লেখা যাইতে পারে? তার পর আবার, ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরাধিপতির মন্ত্রিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বিশিষ্ট সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। পরের জন্য তিনি দীর্ঘ কাব্য রচনার পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিবেন কেন? তিনি বৌদ্ধ কাব্য রচনার আশা পরিত্যাগ করিলেন। কথিত আছে, ক্ষেমেন্দ্র বিরত হইলে এক দিন ভগবান্ বুদ্ধ স্বপ্নযোগে ক্ষেমেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই পুণ্যকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন এবং এই পুণ্যে পরিণামে তাঁহার যে সকল পারলৌকিক উন্নতিলাভ হইবে, তাহা বর্ণনা করিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর ক্ষেমেন্দ্র দেখিলেন, সৌগতধর্ম্মাবলম্বী সৌগতবিদ্যাবারিধি বীর্য্যভদ্র নামক আচার্য্য তাঁহাকে জিনশাসন শাস্ত্রে শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে তিনটি মাত্র অবদান লিখিত হইয়াছিল, এক্ষণে ভগবানের প্রসাদে, বীর্য্যভদ্রের সাহায্যে, পণ্ডিতমণ্ডলীর উৎসাহে এক

এক করিয়া একশত সাতটি অবদান লিখিত হইল। এই একশত সাতটি অবদান লিখিতে এত দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল যে, সপ্তোত্তরশততম অবদান শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই ক্ষেমেন্দ্র জ্ঞানবজ্রের দ্বারা সৎকায় দৃষ্টিরূপ শৈলকে ভেদ করত অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একশত আটটি অবদান হইলে মাঙ্গলিক সংখ্যা পূর্ণ হয়। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র ত আর জগতে নাই। তিনি যে পুণ্যকার্য্য আরব্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কে শেষ করিবে? সেই ভাষায়, সেই ছন্দে, সেই অলৌকিক কাব্যরসে, সেই নব নব ভাবমালায় বিভূষিত করিয়া কে আর একটি অবদান রচনা করিয়া অষ্টোত্তরশত সংখ্যা পূর্ণ করিবে? কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র কালকবলে পতিত হইলেও কাশ্মীরের কবিসিংহাসন শূন্য হয় নাই। নরেন্দ্র নামক কাশ্মীরাধিপতির জয়াপীড় নামক মন্ত্রীর বংশ এখনও কবিশূন্য হয় নাই। যে বংশে ভগীন্দ্র ও সিন্ধু অবতীর্ণ হইয়া বহুকাল ধরিয়া কাশ্মীররাজ্য শাসন করিয়া আসিয়াছিলেন, সে বংশ অদ্যাপি কবিশূন্য হয় নাই। ক্ষেমেন্দ্রের দীর্ঘকাব্য-রচনাকালে তাঁহার পুত্র সোমেন্দ্র নিজেই এক জন প্রধান কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার পুণ্যকার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিতে তাঁহার মন সরিল না। তিনি জীমূতবাহন অবদান নামে একটি সুদীর্ঘ অবদান রচনা করত অষ্টোত্তরশত সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিলেন। যে কারণে পিতৃদেব গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিলেন এবং বৈদিক সময়ের পর ভারতীয় গ্রন্থকারমধ্যে যে অনুক্রমণিকা প্রণয়ন লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, পিতৃদেবের বিরচিত গ্রন্থের সেইরূপ একখানি অনুক্রমণিকা প্রণয়ন করিলেন। গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে দৃষ্ট হইল যে, বৌদ্ধদিগের মধ্যে এরূপ গ্রন্থ আর কখন রচিত হয় নাই। গ্রন্থক নিজেই বলিয়াছেন, আচার্য্য গোপদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ যে সকল অবদানমালা রচনা করিয়াছেন, তাহার কোথাও পদ্য, কোথাও গদ্য। গদ্য পদ্য লিখিবার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, যেখানে গদ্যে লেখা উচিত, হয় ত সে স্থলে পদ্যে লেখা হইয়াছে, আর যেখানে পদ্যে লেখা উচিত—সেখানে গদ্যে লেখা হইয়াছে। অবদানগুলি সাজাইবার কিছুমাত্র নিয়ম নাই, যে অবদানের পর যে অবদান লিখিত হইলে সুন্দর হইত, সেটি হয় ত দূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সকল অবদানই এক প্রণালীতে রচিত হওয়ায় অধিকক্ষণ সে গ্রন্থ পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ হয়। ভাব স্থানে স্থানে এত গভীর যে, বৌদ্ধদর্শন-সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অবগত না থাকিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ভাষা-রচনা-প্রণালী অত্যন্ত কর্কশ এবং বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং পুনরুক্তিদোষে একান্ত দূষিত। এই সকল গ্রন্থের পরিবর্ত্তে যখন সোমেন্দ্রের গ্রন্থ প্রচলিত হইল, তখন বোধ হইল, বৌদ্ধ-সাহিত্যগগনে সমুজ্জ্বল কিরণাবলীমণ্ডিত সূর্য্যদেবের আবির্ভাব হইল। এই অভিনব গ্রন্থের ভাষা এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল যে, গ্রন্থকার ও পাঠকের মধ্যে ভাষারূপ একটি ব্যবধান আছে, এরূপ অনুভবই হয় না। উহার ছন্দ পাঠকালে কখন বা কালিদাসের ছন্দ পাঠ করিতেছি, কখন বা বাল্মীকির ছন্দ পাঠ করিতেছি, কখন বা ভবভূতির ছন্দ পাঠ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। ইহার শ্রুতিমধুর ছন্দ পাঠে হৃদয় আর্দ্র হইয়া মধুরতর ধর্ম্মবীজ ধারণার্থ প্রকৃষ্ট উর্ব্বর ভূমিরূপে পরিণত হয়। অবদানগুলি এরূপ সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে যে, প্রথমটি পাঠ করিলে দ্বিতীয়টি পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়, দ্বিতীয়টি পাঠ করিলে তৃতীয়টি পাঠ না করিয়া থাকা যায় না, এইরূপে সমগ্র গ্রন্থ বার বার পাঠ করিলেও তৃপ্তিলাভ হয় না। যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পরম সৌগতমণ্ডলীমধ্যে ক্ষেমেন্দ্র-প্রণীত অবদানকল্পলতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মন ভগবান্ বুদ্ধের প্রেমে আপ্লুত ও নির্ব্বাণলাভ-লালসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

অল্পদিনমধ্যেই গ্রন্থ চারিদিকে প্রচারিত হইল। ক্রমে তিব্বত প্রভৃতি দেশেও বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার প্রচার হইল। তিব্বতীয় ভাষায় উহা অনুবাদিত হইল।* তিব্বত হইতে উহা দেশদেশান্তরে। ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু যে গ্রন্থপ্রণয়নকালে ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যে গ্রন্থপ্রণয়নের জন্য হিন্দু-বৌদ্ধে, ধনি-দরিদ্রে, গৃহস্থ-ভিক্ষুকে মিলিত হইয়াছিল, যে গ্রন্থের উৎসাহদাতা কবি, শিক্ষাদাতা, এমন কি, প্রথম লেখকের নাম পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ ভক্তিসহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা এসিয়ার সমস্ত মধ্য অংশে আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় নিত্য অধীত ও গীত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষবাসী

* লাসা নগরীর মহামান্য শাক্যভদ্রের আজ্ঞায় পণ্ডিত লক্ষ্মীকর লামা শোণ্ডতোন্ দরজে শান্তিসজ্ঞ নামক বিহারে ১২৭৯ খৃঃ অব্দে ইহার অনুবাদ করেন।

কেহই তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। এ স্থলে বলা যাইতে পারে, বৌদ্ধদিগের কোন্ গ্রন্থই বা ভারতবর্ষের লোক জানিত যে, অবদানকল্পলতার নাম না জানায় তাহাদিগকে দোষ দিতে হইবে?

ভারতবর্ষের সকল লোক জানিত না সত্য, কিন্তু হিমানীবেষ্টিত শিখরাবলীপরিবৃত নেপাল রাজ্যে অনেকেই বৌদ্ধ এবং তাহারা গ্রন্থাবলীর আদর জানুক, আর নাই জানুক, বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিকে তাহারা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে যে এক কালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, জগৎকে সেই সংবাদ প্রচার করিবার জন্যই যেন নেপাল-দেশীর বৌদ্ধ মঠগুলি বহু শতাব্দী ধরিয়া আপন বক্ষঃস্থলে জরাজীর্ণ তালপত্রলিখিত গ্রন্থগুলি ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। যেন উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহারা এই রত্নগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে সত্যপ্রচারাভিলাষী ইংরাজমনাষিগণ প্রার্থনা করিবা-মাত্র সমস্ত গ্রন্থ তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। নেপাল রেসিডেন্ট্ শ্রীমান্ হজ্সন সাহেব ভারতের এই নিভৃত কোণে অপ্রচলিত ধর্ম্মের অপ্রচলিত বহুসংখ্যক গ্রন্থাবলী দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং প্রাণপণে সেইগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পর শ্রীমান্ রাইট সাহেবও সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। যদি এই দুই মহাপুরুষ গ্রন্থসংগ্রহে ব্রতী না হইতেন, তাহা হইলে অনেক গ্রন্থ একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইত। একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। যখন শ্রীমান্ রাইট সাহেব নেপালে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন একটি মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ আবশ্যক হয়। নেপালে এখন হিন্দু রাজা। তিনি সেই মন্দির-মধ্যে যে সকল বৌদ্ধপুস্তক পাইলেন, তাহা একেবারে ফেলাইয়া দিলেন। রাইট সেইগুলি সংগ্রহ করিলেন, শ্রীমান্ বেণ্ডল সাহেবের পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উহার মধ্যে একখানি গ্রন্থ খৃঃ পূঃ ৮৫৯ সালে লিখিত হইয়াছিল এবং উহা পরমেশ্বর তন্ত্র নামক বৌদ্ধদিগের একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ। এমন মহামূল্য গ্রন্থ ভারতবাসীর মূর্খতা প্রযুক্ত নষ্ট হইতেছিল, কেবল এক জন ইংরাজ রাজপুরুষের চেষ্টায় রক্ষিত হইল।

হজ্সন ও রাইট অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া-ছেন; অনেক পুস্তক লেখাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও ক্ষেমেন্দ্র-কৃত বোধিসত্ত্বাবদানকল্প-লতা পাওয়া গেল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হজ্সন সাহেব যেখানি পাইলেন, তাহা ৫৯ পল্লব হইতে আরম্ভ। রাইট সাহেব যে দুখানি পাইলেন, তাহার একখানি পরীক্ষায় ৫১ পল্লব হইতে আরম্ভ-বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। নেপালাধিপতি অনন্ত মল্লদেবের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ১৩০২ শতাব্দীতে মঞ্জুভদ্র সুধী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। যখন লেখা হইয়াছিল, তখন গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে উহার ১৭৪ পৃষ্ঠা কোথায় গিয়াছে, তাহার এ পর্য্যন্ত ঠিকানা হয় নাই। সে পুথিখানি ১৭৫ পৃষ্ঠা হইতে এবং একচল্লিশ পল্লবের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ। পূর্ব্বে যে দুখানি পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে, পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, সে দুখানি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে এই পুথিখানিরই নকল। একখানির শেষে লিখিত আছে, এতৎ ক্ষেমেন্দ্রকৃত অবদানশতকগ্রন্থস্য পরার্দ্ধমেবাস্যং পূর্ব্বার্দ্ধং কুত্রচিৎ ন প্রাপ্তং শুভম্।

এতদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হইল যে, ক্ষেমেন্দ্রকৃত অপূর্ব্ব গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধ নেপালদেশেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজগণ বিশেষ যত্ন-পুরঃসর সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, ক্যাম্বোডিয়া, চীন, জাপান, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশে যত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার তালিকা প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু কোথাও অবদানকল্পলতার পূর্ব্বা-র্দ্ধের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা ইংরাজগণ পারেন নাই, যাহা ফরাসীগণ পারেন নাই, যাহা উদ্যমশীল জর্ম্মাণ জাতিতে পারে নাই, এক জন বাঙ্গালীর যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়বলে সেই কর্ম্ম সমাহিত হইয়াছে।

বাবু শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতভ্রমণকালে ডালর লামার রাজধানী লাসা নগর হইতে বহুসংখ্যক তিব্বত অক্ষরে লিখিত কাষ্ঠযন্ত্র-মুদ্রিত সংস্কৃত ও তিব্বত ভাষার গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। লাসা নগরে অবস্থিতিকালে তিনি লিখিয়াছিলেন, আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ, মহাভারত প্রতিগৃহে পঠিত, গীত ও সর্ব্বত্র অভিনীত হয়, তিব্বতদেশে সেইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রতিগৃহে পঠিত গীত ও অভিনীত হইয়া থাকে। আমরা যেমন প্রতি কথায় রামায়ণ ও মহাভারতের দোহাই দিয়া চলি, তিব্বতবাসীরাও সেইরূপ উক্ত গ্রন্থের দোহাই দিয়া থাকে। গ্রন্থখানির নাম বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, গ্রন্থকারের নাম ক্ষেমেন্দ্র। এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন, ডালক নামক মুদ্রাযন্ত্রে ক্ষোদিত কাষ্ঠখণ্ড-সমূহে এই

গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছিল * এবং কাষ্ঠখণ্ড সকল অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান আছে। তখন তিনি অনেক যত্ন সহকারে কাষ্ঠযন্ত্রে মুদ্রিত একখানি তিব্বত অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত ও তিব্বত ভাষায় উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন।

গত বৎসর তিনি যখন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য মহোদয়গণকে তিব্বতীয় ভাষার অনুবাদ সহিত উক্ত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে অনুরোধ করেন। সভ্যগণ সংস্কৃতভাষার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ হইবে দেখিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন। যাঁহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার ভার আছে, প্রবন্ধলেখক তাঁহাদের মধ্যে এক জন। তিনি বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা নাম শুনিয়াই শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাসকে উক্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগ পাওয়া গিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু শরচ্চন্দ্র দাস রোমান অক্ষরে লিখিত সমগ্র পুস্তক পাঠাইয়া দিলেন। পরীক্ষায় দৃষ্ট হইল, গ্রন্থের যে অংশ ১৩০২ খৃষ্টাব্দের পর বিলুপ্ত হইয়াছে, যে অংশ এ পর্য্যন্ত অনেক অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই প্রথমাবধি উক্ত পঞ্চাশ পল্লব শরৎ বাবুর গ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ ঘুচিল না। সোমেন্দ্র পিতৃকৃত গ্রন্থের শেষভাগে যে পদ্যময় সূচীপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সহিত পল্লবগুলি মিলাইয়া দেখিলেন, সমস্তই মিলিয়া গেল। তখন প্রবন্ধলেখক সোসাইটীর সভ্যমহোদয়গণকে এই বহুকাল-বিলুপ্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার সংবাদ প্রদান করিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাসের উপর তাঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল। ভারতের একখানি লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইল।

[বিভা—১ম খণ্ড—৯ম সংখ্যা—১২৯৪ আষাঢ়।

* ডালর লামা সুমতী বাগীশ্বর ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক ও ইহার অনুবাদ কাষ্ঠযন্ত্রে মুদ্রিত করেন। পোতাল নামক রাজপ্রাসাদে এই কাষ্ঠযন্ত্র সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে, দুই শত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি উহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি

ইস্কুল ছাড়িয়া কালেজে ঢুকিবামাত্র ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তিন ভাষার রাশি রাশি সাহিত্য বঙ্গীয় যুবকের সম্মুখে বিস্তারিত হইল। চসার, স্পেনসার, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ, শেলী, বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন্‌, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, নৈষধ, ভট্টি, বাল্মীকি, বেদ-ব্যাস, বেদপুরাণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবি; এডিসন, গোল্ড-স্মিথ, স্কট, লিটন, ডিকুইন্সি, থ্যাকারী; দণ্ডী, বানভট্ট, বিষ্ণুশর্ম্মা; হুতোম, দীনবন্ধু, বঙ্কিম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থে তাঁহার প্রবেশ অধিকার হইল। দিনকতক তিনি এই অগাধ সাহিত্যকাননে যদৃচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যতই যান, কাননের শেষ নাই, সকল বৃক্ষই সুমিষ্ট, সকলেই আনন্দিত। যুবকহৃদয়—সংসারের ভাবনা নাই। জগতের সৌন্দর্য্য মাত্র তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত। হৃদয়ের বৃত্তি সকল এখনও বিকৃত হয় নাই—এখনও পাকিয়া শক্ত হয় নাই—তিনি ক্রমে সকলপ্রকার সাহিত্যেরই আস্বাদ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু এই অগাধ সমুদ্রমধ্যে তিন জন লোকই তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইল। এই তিন জনই তাঁহার চরিত্র-নির্ম্মাণে—নীতিশিক্ষাদানে তাঁহার সহায়তা করিল। ধর্ম্মপ্রচারকের রাশি রাশি বক্তৃতা, শিক্ষকের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ, পিতামাতার লালনপালন ও তাড়ন এই সমস্ত একত্র হইয়া যাহা না করিতে পারিয়াছে, তিন জন লোক (যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার কোন উপায় নাই) সেই নীতিশিক্ষাদান কার্য্য সম্পন্ন করিল। তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার মন ফিরিল, তাঁহার চিত্ত মথিত হইল, তিনি মানুষের জন্য ভাবিতে, দুঃখ করিতে, সহানুভূতি করিতে শিখিলেন; কলেজের চারি পাঁচ বৎসরে এই তিন মহাত্মার স্পিরিট তাঁহাকে যেরূপ গড়িয়া পিটিয়া দিল, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাহাই থাকিবেন। সংসারে কত যন্ত্রণা পাইতে হইবে, কত কত কষ্টে পড়িতে হইবে, তাঁহার কত পরিবর্ত্ত হইবে, কিন্তু আদত তিনি যাহা ছিলেন, তাহাই থাকিবেন।

ভারতবর্ষে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতি হইবার আগে, রামায়ণ ও মহাভারত যুবকদিগের চরিত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিত। কথকের মুখ হইতে, গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে, বঙ্গীয় যুবক যে উপদেশ পাইতেন, তাহা তাঁহার অস্থিমজ্জায় বিঁধিয়া থাকিত। আমরণ তিনি রাম বা যুধিষ্ঠিরকে দেবতা বলিয়া মনে মনে উপাসনা করিতেন ও উঁহা-দিগেরই চরিত্র অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বৃদ্ধবয়সে পুত্রপৌত্রদিগকে নিজ উপাস্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দিয়া যাইতেন। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে দেবতা-ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করিতে, ভাইকে ভালবাসিতে, প্রচলিত ধর্ম্ম যে পথে চালায়, সেই পথে চলিতে শিখিতেন। এই দুই অগাধ সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া আপনার কার্য্য-প্রণালী নিরূপণ করিতেন। আজিকার বঙ্গীয় যুবক রামায়ণ ও মহাভারত পড়েন না। যদিও পড়েন ত রাম বা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে দেন না। যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে একাধিপত্য করেন, তাঁহাদের নাম বায়রণ, কালিদাস ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র। তিন জনই যুবকদিগের চিত্ত-আকর্ষণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিশেষ; তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠকালে যুবকহৃদয় এমনি গলিয়া যায় যে, শেষে তাঁহারা যে পথে উঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করেন, সেই পথেই উঁহা ধাবিত হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল, তখন পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল। এই জন্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান উপদেশ সৌভ্রাত্র ও পারিবারিক প্রেম। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকালে মনুষ্য দৌরাত্ম্যময় অসভ্যা-বস্থা হইতে সবেমাত্র স্থির সামাজিক অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং তৎকালীন সমাজের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের দ্বিতীয় উপদেশ, তৎসমাজের বিঘ্নকারীদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব তৃতীয়। মনুষ্যগণের দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণের দমন করিয়া শান্তিভাব ধারণ করানই উক্ত কাব্যরত্ন-দ্বয়ের মূলমন্ত্র। বাল্মীকি ও বেদব্যাস অথবা তাঁহা-দের অনুবাদক কাশীদাস ও কৃত্তিবাস আপন আপন উদ্দেশ্যসাধনে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে,

বঙ্গীয় যুবক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদের একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। অসভ্যতা পশ্বাচার তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহারা তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী থাকিতে ভালবাসিতেন। দেবতা-ব্রাহ্মণের তাঁহারা গোলাম হইয়াছিলেন। পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব ভয়ানক প্রবল ছিল। পরধর্ম্মের লোক তাঁহার শান্তিময় সমাজের যত কেন উপকারী হউক না, তিনি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু পশ্বাচার ও অসভ্যতা কমিতে তাঁহাদের শক্তিরও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। যাহা দমন করিবার জন্য বাল্মীকি বেদব্যাস হৃদয়বিদ্রাবণী উন্মাদিনী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সেই পদার্থ, সেই শক্তি লোপ হইয়াছিল। দৌরাত্ম্যপ্রিয় উৎপাতপ্রিয় তেজস্বী আর্য্যযুবক কবিতার মোহিনী-বলে মেষশাবকবৎ নিরীহ হইয়াছিলেন, বঙ্গদেশের শক্তি স্বাধীনতা তেজ গিয়া উহা কারখানার একটি একটি কলের মত হইয়াছিল। যেমন বাষ্পীয় বলপ্রভাবে সহস্র সহস্র নলী একই ভাবে সকাল ছয়টা হইতে সায়াহ্ন ছয়টা পর্য্যন্ত চলে, তেমনি বঙ্গীয় সহস্র সহস্র লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একই ভাবে চলিত। চালাইত কে? কোন্ বাষ্পীয়-যন্ত্রের এরূপ অসীম শক্তি? হিন্দু-সমাজের দমন শক্তি। যেমন মধুর সঙ্গীতে বনের মত্তহস্তী পোষ মানিয়া চালকের বশে চলে, তেমনি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের মনোমোহিনী বীণার বশ হইয়া দুরন্ত শূরজবংশীয়েরাও দমন হইয়াছিল; বাঙ্গালী ত কোন্ ছার।

আদিম অবস্থার সমাজ-শাসনের প্রধান বিঘ্ন এই যে, মনুষ্য কেহ কাহার অধীন হইতে চাহে না এবং সকলেই যাহা খুসী, তাহাই করিতে চায়, সমাজবন্ধন করিতে গেলে Obedience প্রথম প্রয়োজন। এই জন্য যাঁহারা প্রথম সমাজবন্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐটি শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করেন। এক পুরুষে সকল উদ্ধতস্বভাব লোককে শাসনাধীন করা যায় না, এই জন্য ১০।১৫ পুরুষ পর্য্যন্ত এক নিয়মে থাকিয়া সমাজমধ্যবর্ত্তী সমস্ত লোককে বশ্যতা স্বীকার করান চাই। রামায়ণ ও মহাভারত এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্ম্মিত। বহুকাল অবধিই হিন্দুরা রাম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রানুকরণ করত সমাজশাসনের অধীন হইয়াছেন। সমাজও উত্তমরূপে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ সমাজবন্ধনই ত মনুষ্যের উদ্দেশ্য নহে, সমাজবন্ধন পথ। এই পথে মনুষ্য সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিবে; ক্রমে জড় জগতের উপর আধিপত্য করিবে, আপন জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে। প্রথম আপন জাতির, ক্রমে আপন দেশের, তাহার পর সমস্ত মনুষ্যের, তাহার পর সমস্ত জীবলোকের উপকার করিবে। যাহাতে জীবলোক জড়ের সহায়তায় দীর্ঘকাল আনন্দ অনুভব করিয়া বিনাক্লেশে দেহত্যাগ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিবে, তবে ত পথ সার্থক হইবে; নচেৎ বনমধ্যে পথ কাটিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ কি?

সমাজ বদ্ধ হইল, কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য কিছু রহিল না। যেমন রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন দেখিয়া মনুষ্য শান্ত হইল, সেইরূপ শান্ত হইয়া কি করিবে, বুঝিতে পারিল না। তাহাতে এই হইল যে, কতক লোক ভোগে আসক্ত হইল, আর কতক এ জন্মের ভোগ ত্যাগ করত পরলোকের ভোগের জন্য ব্যস্ত হইল। কতক সুন্দরী রমণী-সহবাসে বিচিত্র সুরা-পানে রত হইয়া শীতে উষ্ণগৃহমধ্যে, গ্রীষ্মে প্রমোদ-কাননে, নির্ঝরগৃহে, জ্যোৎস্নায় ছাদোপরি, রৌদ্রে পুষ্করিণীর মধ্যে বিহার করাই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিল। আবার অনেকে অগ্নিকুণ্ডোপরি ঊর্দ্ধপদে অধঃশিরে তপঃ করত পরলোকে নন্দনকাননে উর্ব্বশী-মেনকা-পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে অনন্তকাল কাটানই মনুষ্য হওয়ার সুখ ভাবিলেন। কেহ দানে স্বর্গ, কেহ স্নানে স্বর্গ মনে করিলেন। ইন্দ্রিয়সুখই সকলের উদ্দেশ্য হইল—কাহারও ইহলোকে, কাহারও পরলোকে। কেহই এ কথা বুঝাইয়া দিল না যে, মনুষ্য সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য জড়জগতের উপর মনুষ্য-জাতির আধিপত্য বিস্তার, তুমি আমি, এমন কি, আমার সম-সাময়িক যে কোন ব্যক্তি হউন, সমাজ ছাড়িয়া ধরিলে কেহ কিছুই নহেন। যে আমরা আমাদের একপুরুষ আগেকার লোকে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভোগ করিতেছি, এইরূপ আমাদের পরে যাহারা আসিবে, তাহাদের জন্য আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী রাখিয়া যাওয়া অর্থাৎ জড়জগতের কিছু আধিপত্য বিস্তার করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। মনুষ্য-সমাজ বৃক্ষের পত্র। যেমন পত্র আকাশস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের আয়তন বৃদ্ধি করে, পরে আপনার সময় আসিলে পড়িয়া যায় এবং পরবর্ত্তী পত্রসকল যাহাতে একটু উচ্চ ও পুষ্ট হয়, তাহা করিয়া যায়, সেইরূপ মনুষ্য সমাজ বিস্তার করিয়া সমাজ পরিবর্ত্ত ও সমাজসংস্কার করিয়া নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া দেহত্যাগ করে। তাহাদের সন্তানেরা এই

সকলের ফলভোগ করত আরও অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করে।

এ কথা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে কেহ বুঝাইয়া দেন নাই, সুতরাং সেই শান্তভাবে এই রামায়ণ ও মহাভারত শুনিয়া একই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের উদ্দেশ্য-সাধন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহাদের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা যায়, এমন কোন গ্রন্থ হয় নাই ; এই জন্য উহারাই জাতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইংরাজী বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তখন অবধি রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিশিক্ষা সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। সমালোচকেরা বাল্মীকির অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তির প্রশংসা করুন, প্রত্নতত্ত্ববিদেরা রামায়ণ হইতে তৎসাময়িক বৃত্তান্ত রচনা করুন, রামায়ণ পাঠ করিয়া শত শত লোক আনন্দসাগরে মগ্ন হউক, কিন্তু রামের চরিত্র আর কেহ অনুকরণ করিতে যাইবে না। যুধিষ্ঠিরের ত কথাই নাই। পূর্ব্বে লোকে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে যে শিক্ষা পাইত, এখন শিক্ষিত যুবকগণ কতক পরজাতীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কতক ইতিহাস পড়িয়া, কতক নানা পুস্তক ও ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া সেই শিক্ষা লাভ করেন। সুতরাং এরূপ সভ্য অবস্থায় এক জন লোকের বা একখানি পুস্তকের যুবকচরিত্র নির্ম্মাণে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা হইতে পারে না। তথাপি কোমলহৃদয় যুবকের মনে যে পুস্তক ভাল লাগে, তাহা হইতেই তিনি কিছু না কিছু ভাল জিনিস চিরকাল মনে করিয়া রাখেন। যে কিছু জিনিস চিরকাল মনে থাকে, তাহা অনেক সময়ে কার্য্যে প্রকাশ পায়, তাহাই তাঁহার চরিত্রনির্ম্মাণে সহায়তা করে।

বঙ্গীয় যুবক যে সমস্ত রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহার মধ্যে সেক্সপীয়র সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার চরিত্র-নির্ম্মাণে সেক্সপীয়রের কোন হাত নাই। কারণ, সেক্সপীয়রের উদ্দেশ্য কেবল "to please", তাঁহার সৎলোকও যেমন সুন্দর, অসৎও তেমনি সুন্দর। এই দুই প্রকার চরিত্র পাঠ করিয়া যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহা পরস্পরকে কেন্‌সেল (Cancel) করিয়া দেয়। মিল্টনে Puritanic Spirit এত অধিক যে, উহা কোন কালে লোকে অনুকরণ করিতে সাহস করিবে না। অনেকে বরং সয়তান হইতে চাহিবে ত কেহ যীশুখ্রীষ্ট বা সামসন হইতে চাহিবে না। ড্রাইডেন ও পোপে অনুকরণীয় কিছু নাই। Essay on Criticism প্রভৃতি পুস্তক হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা উপদেশ মাত্র। স্কুল-মাষ্টারের উপদেশ যেমন এ কাণ দিয়া ঢুকে ও ও কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ। চসার ও স্পেন্সারের বানান এত উল্টারকম যে, কাহারও সাহস হয় না যে পড়ে, যদিও কেহ পড়ে, ত চসার সেকেলে গল্প, একেলে লোকের ভালই লাগে না। যাহারা বৃদ্ধ, তাহাদের বরং ভাল লাগিতে পারে—যুবকের কখনই লাগিবে না। স্পেন্সারের যে Ideal, তাহাও ইউরোপের অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মধ্য-সময়ের, এখনকার লোকে তাহা ভালবাসে না। বিশেষ রূপকের দ্বারা যে শিক্ষালাভ হয়, সে শিক্ষা সভ্য সময়ের নয়। সেলি চমৎকার, কিন্তু সেলির লেখা এত জটিল ও উহার লেখার idealism এত উচ্চ যে, তাহা অনুকরণের অতীত। টেনিসনের উদ্দেশ্য পুরাণ জিনিস ভাল করিয়া দেখান, সুতরাং তাহাতে চরিত্র-নির্ম্মাণের সহায়তা করে না। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ভালই হউক আর মন্দই হউক, নিঙ্গড়িয়া তিত করিয়া দেন। একটি ফুল যদি তিনি ধরিলেন ত তাহার প্রতি পাপড়ি বর্ণনা হবে, তার কেশরের বর্ণনা হবে, তাহার রেণুর বর্ণনা হবে, তবে ছাড়িবেন। বাকী বায়রণ, তিনি পীড়িতের বন্ধু, পীড়কের শত্রু, প্রণয়ের আধার, যৌবন মূর্ত্তিমান, মহা তেজস্বী, সর্ব্বদা চঞ্চল, আলস্যের, জনসমাজের অত্যাচারে একান্ত চটা। যৌবনের মন আকর্ষণে যা কিছু চাই, বায়রণের সব আছে। সুতরাং ইংরাজী সাহিত্যে এক বায়রণই বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র-নির্ম্মাণে অংশী।

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত ত সেকেলে। বেদ-পুরাণের চর্চ্চা নাই। থাকিলেও এখন আর কেহ গর্গ বিশ্বামিত্র অগস্ত্য হইতে চাহিবে না। এ এক প্রকার ঠিক। সে সমাজ নাই, সে কালও নাই। কালেজের ছাত্র দূরে থাক, ভট্টাচার্য্য-দিগের টোলের ছাত্রেরাও আর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বেদব্যাস হইতে চাহে না। ভারবির অর্জ্জুন, মাঘের কৃষ্ণ, নৈষধের নল, বাণভট্টের তারাপীড়, শ্রীহর্ষ সব সেকেলে, একটিও আমাদের মনের মত নয়। ভারবি, মাঘ, নৈষধ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনা-প্রণালী সমালোচকেরা ভাল বলিতে পারেন, স্থানে স্থানে ভালও আছে, কিন্তু সব সেকেলে। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, উহাদের রসবোধ করিয়া উঠিতে পারি না। করিতে পারিলেও আমাদের চরিত্র পরিবর্ত্তন বা শোধন ভারবি পড়িয়া হয় না। বঙ্গীয় যুবক ভবভূতিকে ভালবাসেন। ভবভূতি তাঁহাদের ভালও লাগে, উহা তাঁহার চরিত্রেও কতক প্রকাশ পায়,

কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্পবিষয়ে, কাজেই এ স্থলে গৃহীত হইল না। দশকুমার-চরিতের মধ্যে অপহার বর্ম্মার চরিত্র সুন্দর, বড় চমৎকার; কিন্তু চোর ডাকাত ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি অপহার বর্ম্মার চরিত্র হইতে বঙ্গীয় যুবক নিজে কিছু লইয়া থাকেন, তাহা তিনি মানের খাতিরে লুকাইয়া রাখিবেন—কখনও প্রকাশ করিবেন না। বাকী কালিদাস, কালিদসের লেখা এমনি মধুর যে, পড়িবামাত্র মন আকৃষ্ট হয়। তার পর কালিদাসের অনেকগুলি পাত্র (character) লোকে এত ভালবাসে যে, খানিকটা সেই রকম হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের যুবকগণের উপর কালিদাসের ক্ষমতাও অনেক অধিক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক গ্রন্থকারেরই কিছু কিছু অংশ আমরা পাইয়া থাকি। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বঙ্কিম বাবু। বঙ্কিম বাবুর পুস্তকাবলী এত লোকে পাঠ করে ও এত আদরের সহিত পাঠ করে যে, তাঁহার সকল পুস্তক হইতেই কিছু না কিছু লোকের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করে। লোকে দীনবন্ধুর ইয়ারকি মুখস্থ করে, হুতোমের গানগুলি কণ্ঠস্থ করে, মাইকেলের কতক কতক অনুকরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ আজ-গবি কথা লইয়া ভিরকুটি করে। হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীত সকলের কণ্ঠস্থ আছে, বৃত্রসংহার পাঠে চরিত্র-পরিবর্ত্তন কতদূর হইবে, আজি জানিবার উপায় নাই। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ দূরে থাকুক, এক্ষণে অনেকে লজ্জায় তাহা পড়িতেই পারে না। আরও অনেক গ্রন্থ-কার আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা অতি সামান্য।

এখন দেখিতে হইবে, এই তিন জন কবির কে কতদূর ও কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা গ্রন্থকারদিগের দোষগুণ পর্য্যালোচনা করিতেছি না, কেবল শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র-নির্ম্মাণে ইঁহারা কে কি প্রকারে ও কি পরিমাণে মালমসলা দিয়া থাকেন, তাহাই দেখিব। ইঁহারা এক জন ইংলণ্ডের, এক জন মালবের আর এক জন বঙ্গের। এই তিন জনের মধ্যে এক জন ফরাসী বিপ্লবের সময় শিক্ষিত, এক জন হিন্দুদিগের গৌরব-সময়ের ব্যক্তি আর এক জন ভারতবর্ষে ইংরাজরাজ্যকালীন ইংরাজীরূপে শিক্ষিত। এক জন সমাজ ভাঙ্গিতে, সমাজের অত্যা-চারী নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিতে শিক্ষা দেন, সমাজ ছাড়িয়া গেলে কিরূপ সুখ হয়, তাহাই দেখান। এক জন সমাজে থাকিয়া কতদূর সুখভোগ করা যাইতে পারে, তাহাই দেখান; আর এক জন সমাজের সহায়তায় ও উহার বিরোধে কিরূপ আনন্দ অনুভব করা যায়, দেখাইয়া শেষ করেন।

তিন জনেই প্রণয়ের কবি, প্রণয়গত অবশ্য তারতম্য আছে, তাহা আমাদের এখানে বলার প্রয়োজন নাই। তিন জনেই স্বভাবের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে শিক্ষা দেন। তিন জনেই নিজে স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ এবং তিন জনেই লোককে আপন আপন মুগ্ধতার অংশী করিতে পারেন। বাঙ্গালায় পর্ব্বত নাই, পাহাড় নাই, কেবল এক হরিদ্বর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আর মাঝে মাঝে বিশাল-নিতম্বা স্রোতস্বিনী আর নির্ম্মেঘ ও সমেঘ আকাশ। হঠাৎ মনে হইতে পারে, বাঙ্গালায় স্বভাবসৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর প্রতি ছত্রে সেই সৌন্দর্য্য প্রকটিত। বাঙ্গালায় সৌন্দর্য্য তিনিই সর্ব্বপ্রথম কবির চক্ষে দেখিয়াছেন ও আমাদের সৌভাগ্য ছিল বলিয়া আমরাও তাঁহার হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আরও সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইয়াছি। সেকেলে স্বভাবের শোভানুভবের নাম দেবতার আরাধনা ছিল। প্রসন্ন-পুণ্যসলিলা গঙ্গা দেবতা, আকাশ ঋষিপূর্ণ, চন্দ্র দেবতা, সূর্য্য দেবতা, বঙ্কিম বাবু দেবতাদিগকে অন্তরিত করিয়া শুদ্ধ সৌন্দর্য্য মাত্র দেখাইয়াছেন ও দেখিতে বলিয়াছেন। বাঙ্গালার যে কিছু সৌন্দর্য্য, তাহার প্রায় কিছুই বঙ্কিম বাবু দেখাইতে ছাড়েন নাই। হীরার বাড়ীর দেওয়ালে পাখী আঁকা হইতে সূর্য্যমুখীর বিচিত্র চিত্র-বর্দ্ধিত গৃহ পর্য্যন্ত সবই দেখাইয়াছেন। তাঁহার চিত্রে অপরিষ্কার কিছুই নাই। সব পরিষ্কার ঝরঝরে।

কালিদাসের বর্ণনা ভারতময়। সিংহল দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাসপর্ব্বত পর্য্যন্ত সব কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা শুদ্ধ পরিষ্কার নয়, বড় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়, যেন ইলেকট্রিক আলোকে (electric light) প্রতিফলিত। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ভারতবর্ষ জগতের অনুকৃতি, আর কালিদাস এই সমস্ত খুঁটিয়া ফেলিয়াছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখান তাঁহার কর্ম্ম নয়, সেজন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ চাই। তাঁহার দেখান বাছিয়া বাছিয়া, ভাল ভাল বস্তুগুলি। তাঁহার বর্ণনায় শুদ্ধ সৌন্দর্য্য নয়, কিছু না কিছু অলৌকিক উহার সঙ্গে মিশ্রিত আছে। যথা রামের পুষ্পকরথ, মেঘের দৌত্য। তাঁহার ঋতুসংহারে স্বভাবের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। এখনকার বর্ণনায় অলৌকিকতা নাই এবং পরিষ্কার অপরিষ্কার জ্ঞানও বড় বেশী নাই। কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু পরিষ্কারই হউক আর অপরিষ্কারই হউক, বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহিত্ব সমানই আছে।

বায়রণের বর্ণনীয় ইউরোপ।

সমস্ত ইউরোপে যা কিছু বর্ণনযোগ্য—আল্পসের চূড়া, রাইনের বিশাল জলপ্রবাহ, গ্রীসের দ্বীপমালা, মাইকেল এঞ্জিলোর চিত্র; ভিনিস ও রোমের ভগ্নাবশেষ;—শিল্পে ও স্বভাবে যে কিছু মহান্ ও মনোহর, সকলই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার বর্ণনামধ্যে এক জিনিস আছে, যাহা প্রায় আর কাহারও নাই। ঐতিহাসিক দৃশ্য বর্ণনে বায়রণের অসাধারণ ক্ষমতা, ওয়াটরলুর যুদ্ধ, রুষের নিবাসস্থান বগেুরেব গির্জ্জা বর্ণনায়, বায়রণ তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনার পর তাঁহার উপদেশগুলি যুবকমণ্ডলীর অন্তঃকরণে এরূপ অঙ্কিত হয় যে, তাহা আর অপনীত হইবার নহে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যুবকদিগের চরিত্রনির্ম্মাণের কথায় স্বভাবের বর্ণনা আসিল কেন? এ ধান ভানিতে শিবের গীত কেন? তাহার উত্তর এই, স্বভাব-বর্ণনায়ও নীতিশিক্ষা আছে, আর সেটি দেখানও বড় সহজ, এই জন্য আগে স্বভাবের শোভা বর্ণিত দেখিয়া কি শিক্ষা পাই দেখাই, তাহার পর অন্য প্রকার শিক্ষা যথাশক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম কালিদাসের বর্ণনায় সব শান্তিময়, সব সুখময়, পড়িলে মনের শান্তিময় ভাব জন্মে। যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা, পাদরী সাহেবরা ও ব্রাহ্মমিশনরীগণ দিনরাত জগৎ দুঃখময়, পাপের ভরে ডুবলো ডুবলো বলিতেছেন, তখন ওরূপ পুস্তক পড়িলে বাস্তবিক জগৎ দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়। এ বড় সামান্য শিক্ষা নহে। বঙ্কিম বাবুর স্বভাব-বর্ণনায় শুদ্ধ শান্তি নয়, তাহার উপর যেন কিছু আছে, যেন যে আনন্দ যৌবনের বড় প্রিয়, সেইরূপ আনন্দ যেন বেশী আছে। বায়রণের বর্ণনায় শান্তি নাই, কেবল পরিবর্ত্ত হইতেছে, অসংখ্য পরিবর্ত্ত, এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে সেটা, যেন তৃপ্তি হইতেছে না, যেন একটু চটা চটা ভাব উদয় হইতেছে, যেন যাহার অন্বেষণে স্বভাবের শোভা দেখিতে আসিয়াছি, সে সুখটুকু পাইতেছি না, কেবল কৌতূহল-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া যাহা কিছু সুন্দর দেখিতেছি, দেখিতে যাইতেছি, দেখিতেছি, তৃপ্তি হইতেছে, কিন্তু সে তৃপ্তি বেশীক্ষণ থাকিতেছে না।

সংক্ষেপে তিন জনের বর্ণনায় তিনরূপ উদ্দেশ্য আর একপ্রকারে দেখান যায়। কালিদাস উপরে বসিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত নীচেকার শোভা দেখিতেছেন, আর দেখাইতেছেন। নিজে মনুষ্যের উপর উঠিয়া বসিয়া মনুষ্যের কার্য্য, আচার-ব্যবহার, নৃত্যগীত দেখিতেছেন। পাহাড়-পর্ব্বত কেমন ছোট ছোট দেখাইতেছে, নদীটি কেমন একছড়া হারের মত পড়িয়া আছে, তাই দেখিতেছেন আর কাছে কোন্ ভালবাসার জিনিস আছে, তাহাকে দেখাইতেছেন। যেন সাঙ্খ্যমতে পুরুষ নির্লিপ্ত বসিয়া প্রকৃতির রঙ্গ দেখিতেছেন। কালিদাস বলিতেছেন, আগে মানুষের চেয়ে উচ্চ জীব হও, তাহার পর স্বভাবের শোভা দেখিও, কত আনন্দ পাইবে। তাঁহার আশা বড় উচ্চ। বঙ্কিম বাবুর স্বভাব-শোভার কেন্দ্র মনুষ্য, নগেন্দ্রনাথই হউন আর অমরনাথই হউন, আর গোবিন্দলালই হউন বা স্বয়ং বঙ্কিম বাবুই হউন, তাঁহারও নির্লিপ্ত দেখা, স্বভাব-শোভা-মধ্যে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখ, আর কাছে যদি কেহ থাকে, দেখাও। কেমন সুন্দর, কেমন গভীর। পৃথিবী ও আকাশ দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেমে শরীর পুলকিত হউক। বায়রণের তা নয়। স্বভাবের শোভা দেখিতে চাও, ঘরদোর ছাড়িয়া বাহির হও, যা তোমার সম্মুখে পড়িবে, তাই দেখিয়া বসিয়া থাকিবে? তা নয়। চল, যেখানে সুন্দর বস্তু, সেইখানে যাইতে হইবে। তুমি নির্লিপ্ত থাকিলে সব দেখিতে পাইবে কেন? ঘরে বসিয়া দুনিয়ার কারচুপি দেখিয়া শান্তিসুখ ভোগ করিবে কেন? মনুষ্যের জীবন অল্প, ইহাতে সব দেখিয়া শুনিয়া লও, যত দেখিবে, ততই জ্ঞান বাড়িবে, আনন্দ অধিক হইবে। এই আনন্দই আনন্দ আর সব কেবল দুঃখ আর অত্যাচার, সমাজ অত্যাচার, প্রণয় অত্যাচার, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে ভালবাসে। সবই কষ্ট, কেবল স্বভাবের আনন্দই পরমানন্দ।

এক জন উপর হইতে স্বভাব দেখিতেছেন, এক জন মধ্য হইতে দেখিতেছেন, আর এক জন মাতিয়া বেড়াইতেছেন। এক জনের মতে মনুষ্যজীবন অপেক্ষা অন্য জীবনে সুখ অধিক। আর এক জনের মতে এ জগতেও যথেষ্ট আনন্দ। তৃতীয়ের সবই এ জগতে। বায়রণের জন্ম ১৯ শতাব্দীর প্রজাবিপ্লবে। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বর্ত্তমান সমাজে অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট মনুষ্যচিত্রগুলি সমাজের বাহিরে। সেগুলি সকলেই সমাজের উপর চটা; কেহ কেহ আবার সমাজের শত্রু; হয় দস্যু, নয় মনুষ্যবিদ্বেষী (Misanthrope)। সমাজের যতগুলি নিয়ম আছে, সবগুলিই তাঁহার চক্ষুঃশূল। কনরাড, লারা, ডনজুয়ান

প্রভৃতি পাত্রগণের বাক্যেও এই সমাজবিদ্বেষভাব প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইতেছে।

কালিদাসের সমাজ মনুর সময় হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে। চুলমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মতে এরূপ সমাজে সকলই সুখ।

বঙ্কিম বাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইয়াছেন, সমাজের বিরোধী কাজ করিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না এবং করিলেই শেষ আত্মকৃতের জন্য সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রণয়ের ফল তাঁহার ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার; শৈবলিনীর অবৈধ অনুরাগের ফল পর্ব্বতগুহায় প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর যেরূপ অন্ত হইল, তাহাতেও ঐ কথা দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।

বায়রণেরও একটি মানুষ সুখী নহে, তাহাদের মধ্যে মধ্যে অলৌকিক অতিমানুষিক হৃদয়প্রমাদক আনন্দ আছে বটে, কিন্তু দুঃখই সকলের স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু তাহারা ঠিক জানে যে, যত দিন বর্ত্তমান সমাজ এইভাবে চলিবে, তাহাদের দুঃখের অবসান হইবে না। সুতরাং তাহারা অনুতাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতে চাহে না। তাহাদের আমোদ সমাজের উপরে অত্যাচারে। কেহ দিবারাত্র লুঠপাট করিতেছে, কেহ নির্জ্জন কারাগৃহমধ্যে উচ্চে রোদন করিয়া সমাজধ্বংসের জন্য শাপ দিতেছে, কেহ সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য দিনরাত্রি ফিরিতেছে। তাহারা দুঃখী বটে, কিন্তু দুঃখে কাতর নহে। তাহাদের দুঃখের কারণ মনুষ্যসমাজ, সুতরাং মনুষ্যসমাজ ও যাহারা সেই সমাজ চালায়, তাহাদের উপর দাদ তোলা চাই। বায়রণের মানুষ মনুষ্য-সমাজের উপর চটা। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি, দুর্ব্বলের প্রতি, স্ত্রীলোকের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি বিলক্ষণ আছে। তাহারা মানুষ ভালবাসিতে চায়, কিন্তু সমাজের অত্যাচারী নিয়ম আপনার মনের মত করিয়া ভালবাসিতে দেয় না; সুখে তাহারা ঘোর চটা। কালিদাসের মানুষ মানুষ হইতে কিছু উচ্চ। সব দেবতার অংশ, কেহ দেবতার অবতার, কেহ দেবতা স্বয়ং, কেহ অপ্সরা, কেহ অপ্সরার কন্যা, কেহ ঋষি, কেহ রাজা। ঋষি ও রাজা মানুষ, কিন্তু বায়রণের মানুষ অপেক্ষা তাহাদের অতিমানুষিক ক্ষমতা অধিক। এই স্বর্গে যাইতেছে, মুহূর্ত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, সমস্ত পৃথিবী মুহূর্ত্তে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেবতার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করিতেছে, অপ্সরার সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সকলেই সেই মনুপ্রণীত সমাজের নিয়ম যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেছে। মানুষের অসীম ক্ষমতা, কিন্তু যথেষ্টাচার নাই।

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তে, ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ।

এই শ্লোকে তাহাদের চরিত্রের কতকটা আদর্শ পাওয়া যায়। তাহাদের যেমন ক্ষমতার পার নাই, মনের জোরও তেমনই অধিক। সেই ক্ষমতা তাঁহারা সৎপথে চালাইতে জানেন, সুতরাং তাঁহাদের জীবনে কষ্ট নাই, দুঃখ নাই, ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। যেমন স্বভাবের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, তেমনি তাঁহাদের মতে সমাজের নিয়মও অলঙ্ঘনীয়। লঙ্ঘনের চেষ্টাও নাই, পীড়াও নাই, অনুতাপও নাই।

বঙ্কিম বাবুর লোক সব সমাজের লোক, শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক। শিক্ষিত যুবকের জীবন কেবল অনন্ত বিবাদসঙ্কুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। এক প্রকার বাড়ীতে, আর এক প্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিরোধী। এই জন্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবুর পাত্রগুলিতেও এই বিরোধীভাব কতক কতক প্রকটিত আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। যেখানে আছে, সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিম বাবুর মানুষগুলি দেশী বাঙ্গালী, নিরীহ ভাল মানুষ। বাঙ্গালীরা যে স্বভাব ভালবাসে, তাহারা সকলেই ঠিক সেই স্বভাবের লোক। বুদ্ধিমান্, চতুর, দয়ালু, সামাজিক ও গুণগ্রাহী, তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব গভীর। এরূপ লোকের হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হয়। বঙ্কিম বাবু ইহাদিগের সেইরূপে দেখাইয়াছেন।

রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রাচীন পুস্তকাবলীর প্রথম শিক্ষা এই যে, পিতামাতার বশ হইবে, ভাইকে স্নেহ করিবে, জ্ঞাতিদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যে কবিত্রয় আধিপত্য করেন, তাঁহাদের পিতামাতার সঙ্গে খোঁজ নাই। বঙ্কিম বাবু একবার বঙ্কিম বাবুর মাকে বাহির করিলেন, কিন্তু পাছে কোনরূপ গোল ঘটে, চট্‌পট্ উদ্যোগ করিয়া তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিলেন। বঙ্কিম বাবুর কোন নায়ক বা নায়িকার ভাই নাই। দুই একটি ভগিনী আছে। গোবিন্দলালের পিতৃব্য-পুত্র হরলাল—সেও কলিকাতায় থাকে। বায়রণেরও বাপ-মা ভায়ের সঙ্গে বড় সম্পর্ক নাই। ডনজুয়ানের মুখে ডপাইনেজের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। আজ পারিসানার কথার উল্লেখই আর প্রয়োজন

নাই। কালিদাসের পুস্তকেও পিতামাতা বড়ই অল্প, কিন্তু অপরদ্বয়ের ন্যায় লোপাপত্তি নাই। অনেক অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মধ্যে দুই একবার বিশুদ্ধ সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বড় অল্প।

এই সকল পারিবারিক অনুরাগের পরিবর্ত্তে আমাদের কবিরা প্রতিনিধি দেন দাম্পত্যপ্রণয়; দাম্পত্যই বা কেন বলি? বায়রণ ত দাম্পত্যের কোন ধারই ধারেন না। শুধু প্রণয় বলি। সুতরাং বায়রণের পারিবারিক অনুরাগের কিছুই নাই। বঙ্কিম বাবুর পুস্তকে পারিবারিক অনুরাগের মধ্যে শুদ্ধ দাম্পত্য-প্রণয় আছে। অন্যান্য অনুরাগের পরিবর্ত্তে বঙ্কিম বাবুর স্বদেশানুরাগ, বায়রণের মানবজাতির প্রতি অনুরাগ। এক জন অত্যাচারপীড়িত স্বদেশের জন্য কাঁদিতে শিখাইয়াছেন, আর এক জন অত্যাচারপীড়িত মনুষ্যজাতির উদ্ধারের জন্য অস্ত্রধারণ করিতে শিখাইয়াছেন। যাহার ক্ষমতাবলে অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি পায়, তাহাদিগকে বাহবা দিতে শিখাইয়াছেন।

কালিদাসের সমাজ ঠিক মনু হইতে এক আকারে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার যাহা কিছু আছে, সকলই শাস্ত্রসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত, অণুমাত্র তফাৎ নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে প্রলোভন নাই। পাপ-পুণ্যের মধ্যে পাপ বড় কম, সবই পুণ্য। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ কেবল সুখের ছবি, নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আমোদের ছবি। বায়রণ পাপ পুণ্য বলিয়া দুইটি পদার্থ স্বীকার করিতে চান না। সুতরাং লোকে যাহাকে প্রলোভন বলে, সে বস্তু তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় যাহা করে, তাহাই ঠিক, আপন ইচ্ছায় যাহাকে ভালবাসে, সেই প্রণয়ের পাত্র। সুতরাং মনুষ্য আপন সুখের জন্য আত্মইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কখন কৃতকার্য্য হয়, কখন অকৃতকার্য্য হয়, পরের কথায় কিছুই করিতে চাহে না, সমাজের যে সকল নিয়ম আছে, মানিতে চাহে না। বর্ত্তমান সমাজের যেরূপ গঠন, তাহাতে সমাজ এরূপ স্বেচ্ছাচারীদিগকে দমন করিতে চায়, সুতরাং উহারা সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। যে সমাজে ইচ্ছার প্রতিরোধ না থাকে, তাহারা সেইরূপ নূতন সমাজ চাহে, তাহা পায় না বলিয়া ঘোরতর সমাজদ্বেষী হইয়া পড়ে।

বঙ্কিম বাবুর এক হাতে কালিদাস আর এক হাতে বায়রণ, কিন্তু কালিদাসের আধিপত্য তাঁহার উপর অধিক। তিনি সমাজ সেই প্রাচীন রীতিতে চালাইতে যান। সেই জিতেন্দ্রিয় ভাব—সেই সুখ, সেই শান্তি, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি এক এক সময়ে দুর্দ্দম হইয়া উঠে। এইটি বায়রণের। তিনি লাগাম ছাড়িয়া দিয়া দেখান যে, ইন্দ্রিয় বশ করিতে না পারিলে লোকের পদে পদে বিপদ ঘটে। তিনি একবার প্রলোভন লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেন; দেখান—সকলেই প্রলোভনে ভুলে, কিন্তু কেহ অন্তরের ভাব অন্তরেই রাখে, দমন করে। ইহারাই জিতেন্দ্রিয়, যথা প্রতাপ। কেহ বা রাখিতে পারে না, দমন করিতে পারে না, যথা শৈবলিনী ও নগেন্দ্রনাথ। যেই জিতেন্দ্রিয় সেই সুখী, সাহসী, সর্ব্বত্র প্রশংসাপাত্র। যে অজিতেন্দ্রিয়, সেই দুঃখী, সাহসশূন্য এবং আত্মগ্লানিপূর্ণ।

কালিদাসের প্রলোভন নাই। বায়রণের সবই প্রলোভন, কিন্তু তাহা হইতে উঠিবার ইচ্ছা নাই। বঙ্কিম বাবুর প্রলোভন আছে; তাহার দুঃখ আছে ও তাহা হইতে উদ্ধার হইলে সুখও আছে। সুতরাং আধুনিক সমাজে আমরা বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ হইতে উচ্চতর নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

বায়রণ হইতে আমরা মানবজাতির প্রতি অনুরাগ করিতে শিখি বটে, কিন্তু তিনি স্পষ্ট শিক্ষা কোথাও দেন নাই। তিনি বর্ত্তমান সমাজের অনেক নিন্দা করিয়াছেন। অত্যাচার-পীড়িতদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার মতলব টের পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ হইতে আমরা যে স্বদেশানুরাগের উপদেশ পাই, সে আর একরূপ। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি মূর্ত্তিমান স্বদেশানুরাগ আছে; যথা রামানন্দ স্বামীর। এই সকল লোকের কি আশ্চর্য্য গঠন। তাঁহারা যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার নাম পরহিতব্রত। পীড়িত যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, মুসলমান হউক, হিন্দু হউক, খ্রীষ্টিয়ান হউক, তাহার উপকারের জন্য সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত। ইহারা নিজ জীবন পরের উপকারের জন্য তৃণবৎ ত্যাগ করিতে কাতর হন না। নৈতিক উন্নতির বোধ হয় রামানন্দ স্বামীই পরাকাষ্ঠা। কালিদাস হইতে আমরা আর এক প্রকার উপদেশ পাই, তাহার নাম সর্ব্বভূতানুরাগ। এ অনুরাগ বৌদ্ধধর্ম্মের ফল। কালিদাসের সময়ে যদিও উক্ত ধর্ম্মের লোপাপত্তি হইয়াছিল, তথাপি উহা অনেক অংশে হিন্দুদিগের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় মাংসাশী যুবকবৃন্দ সর্ব্বভূতে

দয়ার বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। তাঁহাদের মতে মানবজাতির প্রতি অনুরাগই মুখ্য ধর্ম।

কালিদাসের শকুন্তলার লতা, পাতা, হরিণ, মৃগ প্রভৃতি সোদরস্নেহ। আমরাও ফুলগাছ পুতি, গোরু-বাছুর পুষি, কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের সোদরস্নেহ হয় না। কিন্তু কালিদাসের হৃদয় পশুদিগের জন্যও কাঁদিত, আমাদের কাঁদে না। বঙ্কিম বাবুর নগেন্দ্রনাথ প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। আমাদের স্নেহ ঐ পর্য্যন্ত নামে। বায়রণ সকল মানুষেরই প্রতি স্নেহ করেন। তাহার সাক্ষী তাঁহার গ্রন্থে দুর্দ্দশাপন্ন গ্রীকদিগের জন্য গভীর রোদন ও তাহাদের দুর্গতিনাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লোকের মন আকৃষ্ট করা।

আর একটি কথা। ইঁহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী একরূপ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, বেদ হইতে যে উপদেশ পাই, তাহা আজ্ঞা, পুরাণ হইতে যে উপদেশ পাই, তাহা বন্ধুর উপদেশের ন্যায় সুপরামর্শ, কিন্তু কাব্য হইতে যে উপদেশ পাই, তাহা কান্তার উপদেশের ন্যায়। কান্তা যেমন নানা প্রকার গল্পগুজব করিয়া মনটি লওয়াইয়া শেষ উপদেশটি বাহির করেন, যেটি বাহির করেন, সেটি কিন্তু অমোঘ। কবি রামরাবণের যুদ্ধ বর্ণনা করিলেন; নানারূপ বিচিত্র পদার্থ দেখাইলেন; কখন হাসাইলেন, কখন কাঁদাইলেন, শেষ একটি উপদেশ দিলেন যে, ইন্দ্রিয়-অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিলে অনেক নাতানে পড়িতে হয়, শেষ রাবণের ন্যায় সপুরী বিনাশও হইতে পারে। ইঁহাদের তিন জনেরও শিক্ষা-প্রণালী মূলতঃ তাই, কেবল কিছু তারতম্য মাত্র আছে।

কালিদাসের উপদেশপ্রদানপ্রণালী ঠিকই এই-রূপ। তিনি কোথাও Preach করেন না। তাঁহার কাব্যের মুখে যাহা পড়ে, তাহাই বলিয়া যান, কখনও উপদেশ দিব বলিয়া দোকান খুলিয়া বসেন না। বায়রণের প্রত্যেক চিত্রেই কিছু না কিছু উপদেশ আছে। তাঁহার যেখানে একটি সুন্দর বর্ণনা, তাহার নীচেই দুটি বর্ত্তমান সমাজের অত্যাচারের নিন্দা। যেখানে যাও, দু পাঁচটি ব্যঙ্গাত্মক উপদেশ নিশ্চয়ই পাইবে। যেমন কোন গোরস্থানে ভ্রমণকালে গোরস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার নীচে যে সকল খোদা অক্ষর দেখিলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে, সেইরূপ বায়রণের খোদা কথা অন্তরের সঙ্গে গাঁথা থাকে। রাইনের ধারে রাইনের শোভা দেখিতে দেখিতে বা আল্পসের চূড়ায় আল্পসের শোভা দেখিতে দেখিতে অথবা হাইদী ও জুয়াণের নিশীথ প্রণয় দেখিতে দেখিতে, বায়রণ যে সকল গভীর নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠক-হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। বায়রণের মাঝে মাঝে Preachingও আছে। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর Preaching বড় উচ্চ। তাঁহার কমলা-কান্তের দপ্তর একটি Preachingএর খনি।' কত নীতিশিক্ষা উহা হইতে লাভ করা যায়, তাহা বলা যায় না। তাঁহার Preach করার লোকও আছে, তাঁহার সন্ন্যাসীগুলি সব নীতিশিক্ষার প্রচারক। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বাগতবাণীগুলিও প্রচারক ভিন্ন কিছুই নহে। হরদেব ঘোষালের পত্র অনেক মনোবিজ্ঞান-তত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব সত্য আবিষ্কার করিয়াছে।

লোকে মনে করেন যে, বায়রণ হইতে আবার কি নীতিশিক্ষা, বায়রণ অতি অশ্লীল কবি। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের বায়রণ নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহাদের নীতি সেকেলে, বায়রণ একেলে নীতিশিক্ষা দেন। তিনি রুসোর স্কুলে তৈয়ারী হইয়াছেন। মানুষ সব সমান সমাজবন্ধন শুদ্ধ পাঁচ জন লোকের হাতে, অত্যাচারের ও যথেচ্ছা-চারের ক্ষমতা দিয়া তাহারা অবশিষ্ট মানবমণ্ডলীকে নির্ব্বীর্য্য ও নিস্তেজ করে। এ অবস্থায় পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। তাঁহার কাব্যেও এই ভাব নিরন্তর প্রকাশিত। তাঁহার নিজের ও তৎকল্পিত মানবগণ যদিও দেখিতে মনুষ্যবিদ্বেষী, যদিও তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যুবক ও অনেকে এই ভাবই বিলক্ষণ প্রাপ্ত হয়, তথাপি একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এটি বাহিরে মাত্র, তাঁহার শুদ্ধ বর্ত্তমান সমাজের উপর; কিন্তু উহার নীচে মনুষ্যের জন্য সহানুভূতি পরিপূর্ণ।

বঙ্কিম বাবুর পুস্তকের পরহিতব্রত যদিও বায়রণের পরহিতব্রত অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন, কিন্তু উহা তাঁহার পুস্তকে অধিকাংশ স্থলেই স্বদেশানু-রাগেই পর্য্যবসিত। এই জন্য আমরা তাঁহার পুস্তকের উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগই বলিলাম।

উপসংহারকালে সংক্ষেপে বলি, বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ, কালিদাসের ভূতানুরাগ ও সামাজিক সুখ, বায়রণের মনুষ্যানুরাগ (Humanelarianism) ও সামাজিক নিয়ম-লঙ্ঘনের সুখ।

[বঙ্গদর্শন—৬ষ্ঠ খণ্ড—১২৮৫ পৌষ।

বেদ ও বেদব্যাখ্যা

বেদপ্রকাশিকা ঋগ্বেদসংহিতা ভাষা, সংক্ষিপ্ত টীকা, বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টিপ্পনীর সহিত শ্রীরমানাথ সরস্বতী এম্ এ কর্ত্তৃক বিশদীকৃত ব্যাখ্যাত, ভাবান্তরীকৃত ও প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড।

বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে বাঙ্গালা টীকা বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত বেদের প্রকাশ এক নূতন জিনিস। বাঙ্গালা তন্ত্রময়, বাঙ্গালা পুরাণময়, বাঙ্গালা অনার্য্যজাতিপরিপূর্ণ—বাঙ্গালা হইতে প্রায় পাঁচ শত বৎসর বেদের চাষ উঠিয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গালায় যিনি আর্য্যজাতির গর্ব্বহেতু বেদের প্রকাশ, বেদের চর্চ্চা, বেদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতে চাহেন, তিনি বঙ্গীয় আর্য্যাদিগের এক জন প্রধান বন্ধু, তাঁহার নিকট আমরা আপনাদিগকে বাস্তবিকই ঋণী বলিয়া বোধ করি। রমানাথ সরস্বতী এই দুরূহ কার্য্যের ভার লইয়াছেন, এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আজি আমরা রমানাথ সরস্বতীর বেদপ্রকাশিকা উপলক্ষ করিয়া বেদের বিষয় কিছু লিখিব বাসনা করিয়াছি। বেদ জিনিসটা কি, বেদের কিরূপে অর্থ করিতে হয়, বেদের উপর কত ব্যাকরণ, কত অভিধান, কত ছন্দোবোধ, কত দর্শন লেখা হইয়াছে, বেদের উপর দেশীয় লোকের ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের কিরূপ আদর, এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিব ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদের দেশের লোক বেদ পুরাণ ইত্যাদি বড় একটা পড়েন না। তাঁহারা যদি বেদ ও বেদব্যাখ্যার উপর দুই ফর্ম্মা আর্টিকেল দেখেন, অমনি বঙ্গদর্শনের গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম তুলিয়া লইবেন, এই জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব, যত অল্পে পারি, গোটাকত মোটা কথা বলিয়া বেদপ্রকাশিকা বঙ্গীয় পাঠকসমাজে পরিচিত করিয়া দিব।

বেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে ভয়ভক্তিসম্বলিত কেমন একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। বেদ যে পড়িল, সে এক জন ক্ষণজন্মা পুরুষ—যে বেদ ব্যাখ্যা করিল, সে শঙ্কর বা নারায়ণের অবতার। বেদ পড়িতে হইলে শরীর ও মন উভয়কে পবিত্র করিয়া পড়িতে হইবে। যে বেদ পড়িল, সে মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। বিশ্বামিত্র মন্ত্র পড়িলেন, অমনি দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টির পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখান হইতে মন্ত্র পড়িলাম, দিল্লীতে আমার শত্রুনিপাত হইল। বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব মোচন বেদমন্ত্রে হয়, রোগী আরোগ্য হয়, নির্ধনের ধন হয়, লোকে মৃত্যুমুখ হইতে মন্ত্রবলে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কোন প্রমাণ দিতে হইলে "বেদের বচন" বলিলেই আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি নাই। এইরূপ অজ্ঞলোকের সংস্কার, বেদ মোহিনীময়, উহা দ্বারা অসাধ্যসাধন হয়, কিন্তু উহা দুর্ব্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য। সরস্বতীর বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে, পূর্ব্বজন্মের বিশেষ পুণ্যবল না থাকিলে বেদ কাহারও আয়ত্ত হইবার নহে।

কিন্তু বাস্তবিক বেদ কি জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ মাত্র। আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভরসা করি, যাহারা কেবল সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন, বেদ ব্রহ্মার প্রণীত, তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন। প্যালগ্রেভস গোল্ডন ট্রেজারী অফ সংস এণ্ড লিবিস (Palgrave's Golden Treasury of Songs and Leaves.) হইতে এই জিনিসের প্রভেদ নাই। পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী গ্রন্থ ও ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কবিতা ও গান সংগ্রহ মাত্র। অনেক ঋষি-প্রণীত সূক্ত বেদে গ্রথিত আছে। যদি গোল্ডন ট্রেজারীর সহিত তুলনা করিতে কষ্ট বোধ হয়, স্কান্দিনেভিয় সাগা সংগ্রহের সহিত ঠিক তুলনা হইবে। আজি লডব্রক ভূগর্ভস্থ কারাগৃহে শত্রুপুরীমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার এক সাগা মৃত্যুগীত রহিল, কালিমার্টন যুদ্ধে জয়ী হইল, আর এক সাগা হইল, এইরূপ সাগা একত্র সংগ্রহ করিলে যাহা হয়, বেদও প্রায় সেইরূপ; কিন্তু সাগা সংগ্রহ হইতে বেদের আদরগত এত তারতম্য কেন? গীত সংগ্রহ গীতেরই সংগ্রহ, তাহার ধর্ম্মের উপর এত আধিপত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত মাথাব্যথা কেন?

প্রধান কারণ বেদের প্রাচীনত্ব। পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন,—তাহার আর সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় সময়-তালিকাকারদিগের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয় সময়-তালিকাকারগণকৃত সময়নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক, আমরা যাহাকে বহু বৎসরের পুরাণ বলি, তাঁহারা উহাকে ১৫০০ বৎসরের বলিতে চান। আমরা বেদ-সংগ্রহকে ৪৯৭৭ বৎসরের পুরাণ বলিতে চাই, উঁহারা বলেন, যীশু খ্রীষ্টের পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদ সংগ্রহ হয়। তাহাই স্বীকার, তথাপি বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ। বাইবেল উহা হইতে নূতন। যদিই তুরাণীয় বা অন্য

জাতীয় অন্য কোন প্রাচীনতম গ্রন্থ থাকে, তবে তাহা অপেক্ষাও আর্য্যজাতির বেদ যে সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর এক কথা এই যে, যে কালে বেদ রচনা হয়, সে কালের কথা জানিতে হইলে, আমাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় নাই, অথচ মানবজাতির বাল্যাবস্থার ভাব কি ছিল, জানিবার জন্য লোকের বড়ই ঔৎসুক্য। সুতরাং বেদ ভাল করিয়া পড়া আবশ্যক। মনে করুন, ৩০০০ বৎসর পরে ইংরাজদিগের সকল পুস্তক নষ্ট হইয়া গেল, কেবল গোল্ডন ট্রেজারি রহিল। তখন গোল্ডন ট্রেজারিরও এইরূপ মান হইবার সম্ভাবনা, কারণ, উহা ভিন্ন ইংরাজ জাতির চিন্তাশক্তি, কবিত্বশক্তি, সমাজপ্রণালী ইত্যাদি জানিবার আর উপায় থাকিল না।

ইতিহাসলেখক ও প্রত্নতত্ত্বব্যবসায়িগণ বেদের প্রাচীনত্ব ও বেদের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য মাত্র দেখিবেন। কিন্তু যিনি কবি, তিনি দেখিবেন, বেদের তুল্য কাব্য জগতে আর নাই। বেদ হোমারের একখানি মহাকাব্য মত নহে, কিন্তু বেদের এক একটি সূক্ত এক একখানি মহাকাব্য। মানবজাতির তখন শৈশবকাল, বাহ্যজগতে এখন তাহাদিগের যেরূপ অসীম আধিপত্য জন্মিয়াছে, তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। তখন অগ্নি বায়ু মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ বাত্যা সকলেই দেবতা। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি নহে, অগ্নিই দেবতা। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সম্বন্ধে সংস্কার জন্মিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন। শৈশবে সে চিন্তার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকেই শিশুর চক্ষে দেখিতেন, সকলই উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত দেখিতেন। কবির চক্ষে দেখিতেন। অথচ হোমারের ন্যায় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনায় যে জ্ঞান, যে পরিশ্রম, অন্তর্জ্জগতের উপর যে আধিপত্য প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কেবল হৃদয়ের গভীর ভাব ভয় ভক্তি স্নেহ আশঙ্কা আশা ভরসা ইত্যাদি মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই ভাবগুলি ব্যক্ত তাঁহারা কিরূপে করিয়াছেন? সে ভাব প্রকাশে চাতুরী নাই, শ্রম নাই, চিন্তা নাই। কোন ভাব ভয় কি ভক্তি মনে উদয়মাত্রেই তাঁহা সমস্ত অধিকার করিয়াছে, আর অমনি তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সে বাক্য সরল, প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্, ভাবও সরল প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্, অলঙ্কারের দোষ, পরিচ্ছদের ভয় নাই, সুরুচি কুরুচি চিন্তা নাই, আর পাঁচ জনকে ভুলাইবার জন্য ভাব প্রকাশের চাতুরী নাই। তাঁহাদের ভাষা ও ভাব এক, এবং একরূপ মহত্ত্বসম্পন্ন। বেদের সূক্ত অধ্যয়নকালে হৃদয়ের সংপ্রসারণ হয়, প্রকাণ্ড সুন্দর ও নূতন পদার্থ পর্য্যালোচনায় কল্পনার আমোদ, কল্পনার বিকাশ ও কল্পনার উৎকর্ষ হয়। সেকালে তাঁহারা যাহাই দেখিতেন, তাহাই তাঁহাদের কাছে প্রকাণ্ড, তাহাই সুন্দর ও তাহাই নূতন। আমরা আজি হিমালয় পর্ব্বত দেখিয়া যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া আনন্দিত হই, তাঁহারা সামান্য পর্ব্বতমালা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে আনন্দিত হইতেন। সময়ে সময়ে সামাজিক বন্ধন-ভয়ে আমরা মনের অনেক ভাব ফুটিয়া বলিতে পাই না, তাঁহারা সেই ভাব শতগুণে অধিকতর গভীর ও সহজ ভাষায় বলিতেন। যে বিস্ময় কবিহৃদয়ের সর্ব্বব্যাপী ভাব, তাঁহারা সেই বিস্ময়ময় ছিলেন। তাহাতেই কবি ছিলেন—আধুনিক কবিরা তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় নীরস বিষয়ী লোক।

বেদের ধর্ম্মগ্রন্থত্ব সম্বন্ধেই অধিক আদর, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই জন্য বেদ পড়েন। যে হিন্দুরা এতকাল যে বেদকে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে, সে বেদ কি? লক্ষ লক্ষ লোক যে গ্রন্থকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সে গ্রন্থ কি? আমাদের এখন দেখান চাই যে, কতকগুলি গান ও কবিতা কিরূপে ধর্ম্মগ্রন্থ হইল। ইহা জানিতে হইলে "সেকেলে লোক নির্ব্বোধ ছিল" বলিয়া চুপ করিয়া থাকা নির্ব্বোধের কার্য্য। বাস্তবিক উহাতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি গূঢ়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। যাঁহারা ঐ গান লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা কোন স্বর্গীয় দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে, লেখকেরা ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ। তুমি কবি, আমি অকবি, দুই জনেই একত্র থাকি, একত্র বাস করি। তুমি কল্পনাবলে জগৎসংসার কত সুন্দর দেখ, আমি অকবি, মাটীকে মাটীই দেখি—আকাশকে আকাশই দেখি। তোমায় আমায় এই প্রভেদ। আমরা জানি যে, আমাদের দুই জনের মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা মাত্র। কিন্তু সেকালের লোক তাহা জানিত না। কবি যখন গান করিতেন, অন্য অবস্থায় তাঁহার অন্তরের যেমন ভাব থাকে, তখন তাহা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্বেলিত হইতে দেখিতেন। কেন হইল? যেমন সর্ব্বত্র কবিরা দেবতা দেখিতেন, এখানেও সেইরূপ দেবতা দেখিলেন, বলিলেন, দেবতা আমায়

প্রণোদন করিয়াছেন। অন্য লোকেও দেখিল, আমরা যাহা পারি না, এ পারে কেন, অবশ্য এ দেবতা সহায় পাইয়াছে।

এই যে মনের চঞ্চলতা, ইহাকেই সাহেবেরা inspiration বলেন। পরে কবির নাম লোপ হইতে লাগিল, কবি যে দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন, সেই দেবতাই বেদরচক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দেবতাই রচক, কবি কেবল দেখিলেন মাত্র। এই জন্য মাধবাচার্য্য লিখিলেন, যিনি মন্ত্র দেখিলেন, তিনিই ঋষি। ঋষ ধাতুর অর্থ দর্শন। এই জন্যই কালিদাসের "মন্ত্রকৃতাং" লেখা দেখিয়া ভবভূতি যেন চটিয়াই লিখিলেন, মন্ত্রকৃতাং নহে, মন্ত্রদৃশাং। ঋষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রধান মত দাঁড়াইল, দেবতার বেদপ্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিত্য, বেদও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাতে মিথ্যা নাই; উহা সত্যময়, ধর্ম্মময়, জ্ঞানময়; এইরূপে কতকগুলি গান ধর্ম্ম-পুস্তকরূপে পরিণত হইল।

বেদ কি জিনিস, কেন উহার এমন সম্মান, এক প্রকার বলা হইল। কিন্তু আমরা এখন বেদ বলিতে ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ যে কেবল বুঝি, তাহা নহে। প্রথম বুদ্ধ-বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে সম্ভবতঃ আমাদের ইতিহাস দুই ভাগে বিভক্ত;—প্রকৃতি উপাসনা ও যজ্ঞবাহুল্য। প্রকৃতি উপাসনা ঋগাদি বেদত্রয়ে বর্ত্তমান, যজ্ঞকার্য্য-প্রণালী ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে উক্ত। এই দুই সময়ের সাহিত্য—সংসারের যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা সেই সমস্তকেই 'বেদ' এই সাধারণ আখ্যা দিয়া থাকি। বেদ বলিতে গেলে বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া যায়।

বেদ হইল। এখন বেদব্যাখ্যার কথা কিছু বলা চাহি। কারণ, রমানাথ সরস্বতীর বেদব্যাখ্যাই আমাদিগকে আজি এত কথা কহাইতেছে।

প্রথম ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে। প্রকৃতি-উপাসনা যে সময়ে হয়, তাহার অনেক পরে ভারতভূমি যজ্ঞ-প্রধান হইয়া উঠে। বেদের অনেক পরে ব্রাহ্মণ লিখিত হয়, ভাষাই তাহার প্রধান সূচিকা। পাণিনি ছান্দস প্রকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্র দিয়াছেন। প্রকৃতি-উপাসনাসময়ে যে যজ্ঞ ছিল না, তাহা নহে, দেবতার উদ্দেশ্যে খাদ্য-পুষ্প-চন্দনাদি দান সকল সময়েই ছিল। কিন্তু তখন এত বাড়াবাড়ি ছিল না। যখন যজ্ঞবাহুল্য হইল, তখন কি বলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতে হইবে, এই লইয়া গোল বাধিল। পূর্ব্বে ঋষিরা আপন আপন মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতেন, ইহারা এখন কি বলিয়া দিবেন, কাজেই বেদের মন্ত্রই ইঁহাদের অবলম্বন হইল। বাস্তবিকও আমি যখন ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া ঈশ্বরকে ডাকি, তখন আমার ভাষা যদি বাহির হয়—কেমন শুনায়, যেন আমার ভাব প্রকাশ হইল না। কিন্তু যদি এক জন মহৎ কবির বচন ধরি "Father of life and light" অথবা "These are Thy glorious work Father of light" বলিয়া ধরি, কত যেন অধিক ভাব প্রকাশ হয় যে কবির বচন উদ্ধার করিলাম, তাঁহারা পার্থিব কবি। যদি আবার সেই কবি ঈশ্বরপ্রেরিত হয়, অথবা সেই বচন ঈশ্বরের নিজের বচন হয়, আরও অধিক ভাবপ্রকাশ হইল বোধ হয়। এই অনুমানে ব্রাহ্মণ-সময়ের লোক যজ্ঞকাণ্ডে বেদমন্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা চাহি; ব্রাহ্মণগ্রন্থে ভূরি ভূরি ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যাই বেদের প্রথম ব্যাখ্যা। বেদ-রচনার অল্প পরেই ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই অনেক কথার অর্থ লোকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন আমরা যেমন বিদ্যাপতির গ্রন্থের অনেক ভাব—অনেক কথা বুঝিতে পারি না, ইংরাজেরা যেমন এখন চসরের অনেক কথা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাও সেইরূপ বেদের অনেক কথা—অনেক ভাব বুঝিতে সমর্থ হন নাই। অনেক স্থানে কথার অর্থ করিতে গিয়া আজগবি গল্প তৈয়ারি করিয়াছেন; আজগবি ধাতু প্রত্যয় ব্যবহার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রথম বুদ্ধ-বিপ্লবের সময় হয়। এই সময় বেদের উপর ব্যাকরণাদি লিখিত হয়। স্বরপ্রক্রিয়া, ধাতুপ্রক্রিয়া, আদি অভিধান, ছন্দোবোধাদি পুস্তক লিখিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রয়োজনমত মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ইহারা সেই ব্যাখ্যার জন্য বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ যে প্রণালী আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার পরিশিষ্ট হইল। নিগম নিরুক্ত ব্যাকরণই এই ব্যাখ্যা।

এই সময়ের পর বৌদ্ধধর্ম্মোৎপত্তি। পৌরাণিক-ধর্ম্ম দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নাশে, পৌরাণিক ধর্ম্ম-নাশের জন্য শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক অদ্বৈত ধর্ম্ম প্রচারে, প্রায় ১৫০০ শত বৎসর গত হইল। বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয়। প্রচারকগণ বেদব্যাখ্যার তত চেষ্টা করেন নাই। কেবল যাগযজ্ঞের যাহা প্রয়োজন, তাহার জন্য আধুনিক সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়া ও বেদমন্ত্র কেবল

মুখস্থ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য দেখিলেন, লোকে কেবল মুখস্থ করিয়াই কার্য্য শেষ করে, এই জন্য তিনি বিজয়-নগরের রাজার সাহায্যে সরল সংস্কৃতে ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মুখস্থ মাত্র করার প্রথার তৎকালে যে বহুল প্রচার ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, ঋক্‌বেদ অনুক্রমণিকায় মাধবাচার্য্য একটি মত খণ্ডন করিয়াছেন। সে মতটি এই যে, "বেদমন্ত্র যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন, মুখস্থ থাকিলেই যথেষ্ট হইল, বেদের অর্থ হয় না, অর্থ জানার আবশ্যকতাই নাই।" এই মত খণ্ডন করিয়াছেন, আর শুদ্ধ মুখস্থ-মতাবলম্বীদের বিলক্ষণ গালি দিয়াছেন।

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ
অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।

যে বেদ পড়িয়া অর্থ না বুঝে, সে কেবল গোঁড়া মাত্র; সে কেবল ভার বহন করে। মাধবাচার্য্যের টীকার এক প্রধান দোষ—তাঁহার টীকা তাঁহার নিজের লেখা নহে; তাঁহার ছাত্রদিগের লেখা; তাঁহার কেবল তত্ত্বাবধারণ মাত্র। উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কোথাও বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কোথাও হিন্দি তর্জ্জমা সংস্কৃত, কোথাও দ্রাবিড়ী তর্জ্জমা সংস্কৃত। আর এক প্রমাণ আরও গুরুতর। বেদের প্রথম ঋক্‌টি তিন চারি পাতা ধরিয়া সব ব্যাকরণের সূত্র দিয়া লেখা হইল। তাহার পর বরাবর খানিক দূর ঐ ঋকের টীকায় বরাত দেওয়া হইল। দুই তিনটি সূক্তের পর আবার প্রথম ঋকের টীকা। তিন চারি পাত টীকায় সব ব্যাকরণের সূত্র দেওয়া আছে, কিন্তু অনেক কথার বরাত দিলে বিলক্ষণ চলিত। তাহা নাই। এইরূপে এক স্থানের যে কথার যে অর্থে যেরূপে ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে, আর এক স্থানে সেই কথার সেই অর্থে অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি। আবার তামাসা এই, প্রথমটি হয় ত যথার্থ ব্যুৎপত্তি, দ্বিতীয়টি ভুল। যাঁহারা বৈদিক ব্যাকরণ উত্তমরূপ পড়িয়াছেন, তাঁহাদের উচিত—এই সকল ভুল সংশোধন করিয়া লন। রমানাথ সরস্বতী মহাশয় সে ভুল সংশোধন করিয়া লইতে যেন বিশেষ যত্ন করেন।

চতুর্থ ব্যাখ্যা রোথ সাহেবের। রোথ সাহেব ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু এই সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেটি এই, যে কালে যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহাতে এমত অনেক বিষয় আছে—যাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের উচিত, ঔপমিক ভাষাতত্ত্বের সাহায্য লইয়া সমগ্র বেদ নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। যে সকল সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, তাহা ত ভিন্ন আকারে ভাষান্তরে থাকিতে পারে। সেই ভাষা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেদব্যাখ্যা করিতে হইবে, এ কথায় অনেক সত্য আছে বটে, কিন্তু কোন্‌টি ঠিক অর্থ, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। হয় ত বেদে যে কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, গ্রীকে সেইটি অন্য অর্থে আছে, এ স্থলে নিশ্চয়তার সম্ভাবনা নাই।

ম্যাক্সমুলার রোথ-মতাবলম্বী, তাঁহার নূতন মত এই;—তিনি ঋক্‌বেদ হইতেই ঋগ্বেদের অর্থ করিতে চান; এবং এই উদ্দেশ্যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে ঋগ্বেদের একখানি নির্ঘণ্ট করিয়াছেন। উহাতে এক একটি শব্দ ঋগ্বেদের কোথায় কোথায় ব্যবহার আছে, সব ধরিয়া দেওয়া আছে। মাধবাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ এক কথার সতের জায়গায় সতের প্রকার অর্থ করিয়াছেন। এরূপ গোলমাল অনেক এবার সংশোধন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সংস্কৃত এক কথার যে একই অর্থ হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এক কথায় নানা অর্থ হয় বলিয়াই সকল অভিধানে নানার্থকোষ বলিয়া এক এক অধ্যায় দেওয়া আছে।

রেভারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সায়নাচার্য্য ও প্রাচীন টীকা পরিত্যাগ করা অন্যায় বটে, কিন্তু যেখানে যেখানে ভিন্নদেশীয় বিষয়ের কোন উল্লেখ আছে, সেখানে সেখানে এ টীকা গ্রাহ্য নহে। অনেক কথা, সায়নাচার্য্য যাহার অর্থে মেঘ, জল বা অন্য জড়পদার্থ বলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার মধ্যে পারস্য-রাজার বা সেনাপতির নাম দেখেন। তিনি বলেন, শরফলাকৃতি যে সকল শাসন পারস্যের পশ্চিমাংশে পাওয়া গিয়াছে, তাহা বেদব্যাখ্যায় বিশেষ উপযোগী। এক স্থানে পণিশব্দে সায়ন গো লিখিয়াছেন; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে আসিরীয় সেনাপতি অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে কতদূর উপকার হইবে, আমরা বলিতে পারি না।

কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে সকল মতামতের কথা কহিতেছিলাম, সে ত সামান্য। সায়ন ও প্রাচীন টীকাই সকলের মূল। কেহ কোথায় সায়নের সঙ্গে মিলেন, কেহ কোথায় মিলেন না, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু বেদের যে আর যথার্থ ব্যাখ্যা কোন কালে হইবে না, তাহার এক সম্ভাবনা হইয়াছে। দয়ানন্দ সরস্বতী এক জন এখনকার লোক, তিনি সমাজসংস্কারক,

তিনি, হিন্দুসমাজ "ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে চান।" তিনি যদি বলেন, তোমরা এই এই ভাবে এই এই কার্য্য কর, এই এই কর্ম্ম করিও না, কে তাঁহার কথা শুনিবে? এই জন্য তিনি বেদের শরণ লইয়াছেন। বেদ গান মাত্র; উহাতে তাৎকালিক সমাজের রীতিনীতি কতক কতক জানা যায় বটে, কিন্তু সব জানা যায় না। তিনি বলেন, বৈদিককালে জাতিভেদ ছিল না, স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ যাহা কিছু ইউরোপ হইতে আনিতে চান, তিনি বলেন, সে সবই বেদে আছে। বিশেষ তিনি বলেন, বেদ একেশ্বরবাদী। শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ একেশ্বরবাদী বলিয়া গিয়াছেন; দয়ানন্দ তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক সাহসী; তিনি গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বেদ একেশ্বরবাদী বলিতে চান। তিনি অগ্নি শব্দের অর্থ ঈশ্বর বলেন। অগ্রে নীয়তে—এই ব্যুৎপত্তিতে সায়ন অগ্নি শব্দের অর্থ আগুন করিয়াছেন, দয়ানন্দ সেই ব্যুৎপত্তিতেই উহার অর্থ ঈশ্বর করিতে চান। তাঁহার মতে ধান্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর; ধা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, যিনি ধারণ করেন, তিনিই ধান্য। ঈশ্বর পৃথিবী ধারণ করেন; অতএব ঈশ্বর ধান্য, তাঁহার মত এই—সায়নাচার্য্য ভ্রান্ত। মহাভারতের পূর্ব্বে যে টীকা লিখিত হয়, সেই টীকা সেই প্রমাণ। নিগম নিরুক্তাদি সেই টীকা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সায়ন নিজের মত কোথাও দেন নাই। সর্ব্বত্র নিগম নিরুক্তের কথায় চলিয়াছেন। তথাপি দয়ানন্দ তাঁহাকে ঠেলিলেন। দরকার এমনি জিনিস!

বেদের সময়ের লোক অতি সরল ও সোজা ছিল। তাহাদের মনের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করা অতি দুরূহ। যদি অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আমরা একবার আমাদিগকে বৈদিক জগতে কল্পনাবলে লইয়া যাইতে পারি, আমরা বেদ অনেক ভাল বুঝিব। তৎকালীন লোকের কার্য্যকলাপ রাজনীতি প্রভৃতির মধ্যে অনেক প্রবেশ করিতে পারিব, তাহাদের কথা অনেক বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই জগতে প্রবেশ বড় সহজ কথা নহে। প্রাচীন জগতের অনেক কথা জানিতে হইবে, প্রাচীন লোকের মন কেমন ছিল, সেইটি বিশেষ জানা চাহি—শুদ্ধ ভারতবর্ষ নহে, যেখানে যেখানে আর্য্যজাতি, সেই সেইখানেই প্রাচীন জগতের ইতিহাস জানা চাহি।

রমানাথ সরস্বতী বেদ অনেক পড়িয়াছেন, বেদের ব্যাকরণ তাঁহার সুন্দররূপ জানা আছে, ইংরাজী বেশ জানা আছে। আপনাকে সাধ্যমত বৈদিক আর্য্য-সমাজে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদব্যাখ্যা-বিষয়ে তাঁহার মত এই যে, ব্যাকরণ অভিধান কোনরূপে বজায় রাখিয়া সহজ অথচ মহান্, সরল অথচ উচ্চপ্রকৃতির মনোগত ভাব বা প্রকৃতি-চিত্র দেখাইতে পারিলেই বেদের ব্যাখ্যা করা হইবে।

রমানাথ সরস্বতী বেদের ব্যাকরণখানি তাঁহার বেদপ্রকাশিকায় ক্রমশঃ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা অতি কটমট অথচ কথায় কথায় তর্জ্জমা নহে। তাঁহার অনুক্রমণিকা পাঠ করিয়া আমাদের কিছুই তৃপ্তি হইল না। অনুক্রমণিকায় তিনি পুরাণ শাস্ত্র হইতে অনেক বচন তুলিয়াছেন। কিন্তু সেই বচনগুলি পরিপাক করিয়া সুন্দররূপে কল্পনার মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে কেন রাশি রাশি বচন উদ্ধার হইয়াছে, সহজে অনুমান করা যায় না। তিনি প্রথম বারেই আপনার কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে ষষ্ঠ সূক্তব্যাখ্যাস্থলে ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হওয়ায় "ম্যাক্সমূলার আমাদের দেশের কথা কিছু বুঝেন না" বলিয়া গালি দিয়াছেন। ম্যাক্সমূলার মধ্যে মধ্যে গুরুতর ভ্রমে পতিত হন বলিয়া ঋগ্বেদের প্রথম প্রকাশক, বেদব্যাখ্যা বেদপাঠে—ক্ষয়িতজীবন মহাপুরুষকে সরস্বতী মহাশয়ের "কিছু বুঝেন না" বলিয়া গালি দেওয়া বড় অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার উচিত ছিল, ভূমিকায় ম্যাক্সমূলারের নিকট কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করা। যদি ম্যাক্সমূলারের ঋগ্বেদ না বাহির হইত, তবে সরস্বতী মহাশয়ের বেদপ্রকাশিকা কোথায় থাকিত?

যখন মহাভারত অনুবাদ তিন চারিবার মুদ্রিত হইয়া গেল, তখন বেদ যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই, সে কেবল বাঙ্গালার কলঙ্ক। সরস্বতী মহাশয় সে কলঙ্ক অপনয়ন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বঙ্গীয় প্রতি কুটীরে বেদপ্রকাশিকা থাকা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের একান্ত উচিত ইঁহার উৎসাহ দেওয়া। তাঁহাদের নিজের দলের ত কেহ পারিল না, শেষ এক জন কায়স্থ বেদ প্রকাশ করিল। তাঁহাদিগকে ধিক্! কিন্তু তাঁহাদের উচিত ইঁহাকে সাহায্য করা। তাঁহাদের কার্য্য আর এক জন করিল, ইঁহার সহায়তা না করিলে, তাঁহাদের কলঙ্ক ধুইলেও যাইবে না। সন্ধ্যা, গায়ত্রী, জপ, হোম, সর্ব্বত্র যে বেদের দরকার, সে বেদ তাঁহাদের গৃহে থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

— [বঙ্গদর্শন—৫ম খণ্ড—১২৮৪ পৌষ।

সমাপ্ত

ঐতিহাসিক নিবন্ধ-মালা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই প্রণীত

গৌরবের দুই সময়

উপক্রমণিকা

সময়তালিকা উদ্ধারের চেষ্টা বিফল।

যে দিন হইতে সর উইলিয়ম্ জোন্সের অনুবাদিত শকুন্তলা য়ুরোপে প্রচারিত হইল, সেই দিন হইতে ভারতবর্ষের ক্রনলজি বা সময়তালিকা নির্ণয়ার্থ চেষ্টা হইতেছে। সর উইলিয়ম্ জোন্স নিজে, উইল্‌সন্, কোলব্রুক, ম্যাক্সমুলর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ কেহ জ্যোতিষগণনা, কেহ পুরাণ, কেহ ভোজপ্রবন্ধ, কেহ বা তাম্রফলকাদি লইয়া এই সময়তালিকা উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। আজি এক জন মহামহোপাধ্যায় "অমোঘযুক্তি" "অভ্রান্ততর্ক" এবং "অকাট্য প্রমাণ"বলে "এ বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না, ইহাতে কোনরূপ ভ্রম নাই", এইরূপ জোরে জোরে লিখিয়া এক পূর্ণ তালিকা দিয়া গেলেন; কালি আর এক জন উঠিয়া সেই অমোঘযুক্তি, অভ্রান্ততর্ক ও অকাট্য প্রমাণবলে সেইরূপ জোর জোর কথায় তাহার সব উল্টাইয়া দিলেন। অথচ উভয়েরই যুক্তি এক, প্রমাণ এক ও তর্ক এক। এইরূপ ১০।৮০ বৎসর চলিয়া আসিতেছে। কত মত যে প্রচারিত হইল, বলা যায় না। কিন্তু যাহা হইবার নয়, তাহা তুমি আমি চেষ্টা করিলেও হইবে না, দিগ্‌গজ পণ্ডিতে চেষ্টা করিলেও হইবে না। গ্রীক সময়তালিকানির্ণয়চেষ্টা ২০০০ বৎসর পরে বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয়-চেষ্টাও বৃথা।

ইঁহাদের মধ্যে এক দল আর দিন, মাস, বৎসর নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন না, কেবল পৌর্ব্বাপর্য্য অর্থাৎ কে কাহার পরে বা পূর্ব্বে নির্ণয় করিবার জন্য মাত্র প্রয়াস পান। ইঁহাদের দ্বারা কতক উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইঁহাদেরও নির্ণয়-প্রণালী অপূর্ব্ব। আজি কালিদাসের মধ্যে ভবভূতির ভাবের একটি কবিতা পাইয়া এক জন বলিলেন, "কালিদাস ভবভূতির পর।" কালি আর এক জন (যিনি আগে কালিদাস পড়িয়াছেন) বলিলেন—"ভবভূতিই ও স্থলে কালিদাসের অনুকর্ত্তা।" কে সত্য, কে মিথ্যা, জানিবার কোন উপায় নাই। অথচ উভয়েই প্রাণ দিবেন, সেও স্বীকার, মত ত্যাগ করিবেন না। যেমন কাব্যাদিতে, তেমনি দর্শনেও। আমি গৌতম-সূত্রে বৌদ্ধদিগের

শূন্যবাদ নিরাকরণ দেখিয়া বলিলাম—গৌতম আগে, বুদ্ধ পরে; কালি হয় ত বৌদ্ধ-সূত্রে ন্যায়শাস্ত্রের পরমানুবাদ নিরাকৃত দেখিব। সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় প্রভৃতি প্রাচীন সূত্রসমূহে পরস্পর মতের খণ্ডন মুণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় কিরূপে হইবে?

মতোন্নতি—পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয় সম্ভব নহে।

আর এক দল একটু ঘুরাইয়া বলেন যে, গ্রন্থকার ও গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় না হউক, মনুষ্যের মানসিক উন্নতি, মতের উন্নতি লইয়া কতকটা সময়-তালিকা নির্ণয় হইতে পারে। তাঁহারা য়ুরোপের মানসিক উন্নতির ইতিহাস জানেন। ভারতবর্ষে সেই সকল নিয়ম প্রয়োগ করিয়া সময়তালিকা উদ্ধার সম্ভব, এই তাঁহাদের বিশ্বাস। কিন্তু য়ুরোপের নিয়ম ভারতবর্ষে খাটিবে কি?

এইরূপ নির্ণয়-চেষ্টায় কি উপকার দর্শিয়াছে।

এইরূপে প্রায় এক শত বৎসর পৃথিবী শুদ্ধ লোক সময়তালিকা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। কেহই কিছু করিতে পারিতেছে না, কিন্তু বিধাতার এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম যে, একেবারে নির্গুণ ও নিষ্প্রয়োজন জগতে কিছুই নাই। এই নির্ণয়-প্রস্তাবে অনেক নূতন সংবাদ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঈশপের গল্পে যেমন ক্ষেত্রমধ্যে স্বর্ণ না পাওয়া গেলেও প্রচুর শস্য লাভ হইয়াছিল, সেইরূপ সময়-নির্ণয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও উহাতে সুধাময় ফল উৎপাদন করিয়াছে।

আমরা জানিয়াছি, আমাদের দুইটি
গৌরবের দিন ছিল।

এই সমস্ত নূতন খবর ও পুরাতন যাহা ছিল, একত্র সংগৃহীত হইলে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষের মনের গতি কোন্ দিকে ধাবিত। সমাজের গতি, রীতি-নীতি কোন্ পথে চলিয়া আসিয়াছে। বরাবর কোন একটা সময়তালিকা ধরিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের দেশে শাস্ত্রচর্চ্চা কোন কালেই একেবারে বন্ধ ছিল না, ইহাদের বুদ্ধির চালনা কখন রহিত হয় নাই। হয় দর্শন, নয় স্মৃতি, না হয় পুরাণ—কিছু না হয়, কাব্য, ব্যাকরণ, গণিত বরাবর রচিত হইয়া আসিয়াছে। কেবল দুই সময়ে এইরূপ শাস্ত্রচর্চ্চা অত্যন্ত প্রবল হয়। ঐ দুইটিই ভারতবর্ষের প্রধান সময়, ইহাই আমাদের গৌরবের দিন। একটি হিন্দুস্থানের, আর একটি দক্ষিণের। একটিতে মৌলিকতা পরিপূর্ণ, অপরটিতে প্রকৃষ্টরূপ চর্চ্চা মাত্র, মূলের দোহাই অধিক; কিন্তু মৌলিকতারও কমি নাই! একটির প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ কম্পিত হয়, আর একটির প্রভাব ভারতবর্ষীয় জাতিমাত্রে পর্য্যবসিত। একটির চরম ফল উন্নতি, আর একটির ফল অধোগতি। তথাপি প্রথমটি দ্বিতীয়টির মূল, প্রথমটি না হইলে দ্বিতীয়টির নামও শুনিতে পাইতাম না। জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তবে কিরূপে ফল দুই প্রকার হইল? উত্তর, সমাজের অবস্থায়। কতকটা দৈবই বল, আর অদৃষ্টই বল, আর অনুল্লঙ্ঘনীয় সামাজিক নিয়মই বল, একটি হইতে সুধাময়, অপরটি হইতে বিষময় ফল জন্মিয়াছে। প্রথমটি প্রবল অর্থাৎ সামাজিক উন্নতিই মূল, পরমার্থ তত প্রবল নহে। অপরটিতে হাই চর্চ্চ টোরি মত; উন্নতির গন্ধও নাই। সবই পরমার্থ, ইহলোকের নামও নাই।

এই দুইটি সময়ের বিশদ সবিস্তার বর্ণনা প্রদান করিলে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের দুইটি অতি জটিল অংশ পরিষ্কার হইতে পারে। যে আর্য্য আর্য্য করিয়া দেশ শুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত, যে আর্য্য নাম বঙ্গীয় যুবকের মুখে দিবানিশি ধ্বনিত, সেই আর্য্যগণের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং যে গৌরব তাঁহাদের উপর দিয়া আমরা তাহার অংশ আদায় করি, সে গৌরবের তাঁহারা কত দূর অধিকারী ছিলেন, জানা যাইতে পারে। কোন জাতির ইতিহাস ধারাবাহিক পাঠ অপেক্ষা কোন বিষম বিপ্লবের সময় তাহাদের ইতিহাস উত্তমরূপে দেখিতে পারিলে তাহাদের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝা যায়। বিপদের সময় নহিলে মনুষ্যের কত ক্ষমতা, জানিতে পারা যায় না।—সে কত দূর কাজ করিতে পারে, কত দূর চিন্তা করিতে পারে, কত দূর সহ্য করিতে পারে, বলা যায় না। জাতীয় স্বভাবও ঠিক সেইরূপ।

সম্ভবতঃ এই দুইটি বুদ্ধিবিপ্লবের একটি খ্রীষ্ট খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ৯০০ বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়া ৪০০ বৎসর সমান তেজে সুফল প্রদান করে। অপরটি খৃষ্ট-জন্মের ৩০০ বৎসর পরে আরম্ভ হইয়া ৩০০ বৎসর ধরিয়া ভারতের পুনঃসংস্কার করে। প্রথমটিতে বৈদিক উপদ্রবের শেষ হয়। দ্বিতীয়টিতে পৌরাণিকদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়। প্রথমটির প্রভাবে সমস্ত ভারতে বিদ্যুৎসঞ্চার হয়; দ্বিতীয়টিতে এক জাতির একাধিপত্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়, অথচ দুইটিতেই আমাদিগের সমান গৌরব। আমাদের সমান সম্মান। প্রথম

বিপ্লবের কথা অনেকে বলিয়াছেন, এ জন্য এখানে সংক্ষেপে মাত্র বলিব। দ্বিতীয়টির বর্ণনায় বিস্তার আবশ্যক, যে হেতু সে কথায় এ পর্য্যন্ত কেহ উল্লেখ করেন নাই।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বিপ্লবের প্রাধান্য ও প্রয়োজন।

প্রথম বিপ্লবটি য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। উহার প্রভাব অসীম, বহুকালস্থায়ী ও জগদ্ব্যাপী। উহার প্রভাব ভারতবর্ষবাসীদিগের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া আছে। তিন সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি উহার শক্তির অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ভারতচরিত্রে অনেক মলা পড়িয়াছে, অনেক উন্নতিও হইয়াছে। অনেকে যে বলেন, কেবল অধঃপাতে গিয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করি না; কিন্তু আদত আজিও ঠিক আছে। উপরি-উক্ত বিপ্লবে আমাদিগকে যাহা করিয়াছে, আমরা আজিও তাহাই আছি। ভারতচরিত্রে, ভারত-অদৃষ্টে সেই সময়ে যে শিল পড়িয়াছে, সেই মোহরের অঙ্ক আজিও বর্ত্তমান আছে। শুদ্ধ ভারত নয়, এসিয়াও এই বিপ্লবের ফলভাগী। এসিয়ার অদৃষ্টও উহা হইতে ফিরিয়াছে, এসিয়ার সভ্যতাও ঐ বিপ্লবের ফল। এসিয়ার দুরবস্থাও ইহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইতে পারে। এমন কি, এই তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া য়ুরোপও অনেক অংশে উহার নিকট ঋণী এবং এই যে উনবিংশ শতাব্দী উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া য়ুরোপ এত জাঁক করেন, সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কার কি সেই উনবিংশ শতাব্দীর মহীয়সী উন্নতির অন্যতম উদ্দীপন কারণ নহে? যেমন ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়ুরোপে গ্রীক বিদ্যার প্রথম প্রচারে ও প্রথম আলোচনায় একটি প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কার, সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনাও তত দূর হৌক আর নাই হৌক, ইয়ুরোপীয় উন্নতিকে দ্রুত গতি প্রদান করিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত বিজ্ঞান, সংস্কৃত দর্শনও উপরি-উক্ত বিপ্লব হইতে উৎপন্ন। অতএব সেই বিপ্লবের নিকট পৃথিবী শুদ্ধ ঋণী, এ জন্য উহার কারণ, স্থিতি, উৎপত্তিফল ও প্রভাব সংক্ষেপে অবগত হওয়া আবশ্যক।

বিপ্লবের পূর্ব্বতন অবস্থা

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খৃষ্টের ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়দিগের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করার পূর্ব্বে তাহার আগে আর্য্যসমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, জানা উচিত। জানিবার কিন্তু কোন উপায়ই নাই। কেবল অনুমান মাত্র। অনুমানে বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে আর্য্যজাতি পঞ্জাবে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্যবসায়গত বিভিন্নতা ছিল বটে, কিন্তু জাতিভেদ ছিল না। কেহ পুরোহিত ছিলেন, কেহ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কেহ কৃষিব্যবসায়ী ছিলেন, কেহ বা অন্যান্য ব্যবসায় করিতেন। প্রথম পঞ্জাব আধিপত্য। আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মের প্রভাববৃদ্ধি হইল। পুরোহিতদিগের ক্ষমতা-বৃদ্ধি হইল। আর্য্যভূমি যাগযজ্ঞময় হইয়া উঠিল। রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয়, সোমযাগ, শ্যেনযাগ, কারীরযাগ প্রভৃতি বড় বড় যজ্ঞ হইতে লাগিল। পুরোহিতেরা ক্রমে এক দল, ক্রমে এক জাতি, ক্রমে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। রাজারা কেবল যুদ্ধের সময় প্রাণ দিবার জন্য রহিল। ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নূতন দেশ অধিকার আবশ্যক হইল। আর্য্যগণ পঞ্জাবসীমা অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইলেন। দিনকতক শতানীরা তাঁহাদের পূর্ব্বসীমা হইল। শেষ তাহারও পূর্ব্বপারে আর্য্যগণের বাস হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণ মিথিলায় পূর্ব্বে যে কখনও আসেন নাই, তাহা এক প্রকার স্থিরই। কারণ, ব্রাহ্মণাদি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামও শুনা যায় না। ব্রাহ্মণেরা এই নূতন দেশে আধিপত্য করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সকল দেশ ক্ষত্ররুধিরে অর্জ্জিত; তাহারা বিরোধী হইল। এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবের একটি কারণ। ব্রাহ্মণেরা যেমন একটি দল—জাতি হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়েরাও নূতন দেশে তাহাই হইলেন। আর্য্যগণ তিন জাতিতে বিভক্ত হইল। পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণ, যোদ্ধগণ ক্ষত্রিয়, অবশিষ্ট বিশ্ অর্থাৎ প্রজা। তাহার নীচে পরাজিত অনার্য্যগণ ছিল। চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ হিন্দুস্থানেই হয়। পঞ্জাবে এরূপ বিভাগ ছিল কি না, সন্দেহ। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, আর্য্যগণ প্রথমে যে দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেন, তথাকার আদিম অধিবাসীদিগকে সমূলে বিনাশ করিতেন। পঞ্জাবেও বোধ হয়, তাহাই হইয়াছিল। চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ যে হিন্দুস্থানে

হয়, তাহার আর এক কারণ এই, মনুর বর্ণ-ধর্ম্মগ্রন্থে (মনুসংহিতায়) হিন্দুস্থানেরই প্রাধান্য অধিক। আমরা যে অনার্য্যদিগের নাম করিলাম, তাহারাও নিতান্ত নির্ব্বিরোধী ছিল না। তাহাদের ধর্ম্ম ছিল, রাজ্যশাসনপ্রণালী ছিল, সভ্যতা ছিল। তাহাদিগের দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বজ্ঞতার প্রতি লোকের সন্দেহ হইতে লাগিল। এই অনার্য্যজাতির সম্পর্কই উপরি-উক্ত বিপ্লবের দ্বিতীয় কারণ। ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি অনুসারে অনেকে পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়া জ্ঞানোন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য উপাধ্যায় হইতে লাগিলেন। ঋষি মুনি হইতে লাগিলেন। আর এক দল ব্রাহ্মণ অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মনুতে ব্রাহ্মণদিগকে কৃষি-বাণিজ্য ও কুসীদ গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দেওয়া আছে; যিনি যে ব্যবসায়ই করুন, সকলেই স্বজাতির প্রাধান্য-রক্ষায় বদ্ধপরিকর। ক্ষত্রিয় রাজাদের অনেকেও ব্রাহ্মণদিগের পক্ষ। বিশেষ পঞ্জাবস্থ ক্ষত্রিয়গণের ত ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী হইবার কোন উপায়ই ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের একটি প্রকাণ্ড দল হইল। অপর দিকে হিন্দুস্থানের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ, উৎপীড়িত অনার্য্যগণ আর এক দল একেবারেই আর্য্য অধিকারের প্রতি দ্বেষবান্। বিশেষ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অভক্তি।

বিপ্লবের কারণ।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য ও অনার্য্য সভ্যতার সম্পর্ক, এই দুইটিই উপরি-উক্ত মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। ঋষিদিগের কোন প্রণালীবদ্ধ শাসন ছিল না, সেও একটি কারণ। ঋষিরা আপন আপন তপোবনে আপন আপন মতানুযায়ী উপদেশ দিতেন। তাঁহাদের উপরে কাহারও তত্ত্বাবধারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যেও আবার অনেকে স্বজাতিদিগের অত্যাচারে অত্যন্ত ক্ষোভ করিতেন এবং অনেকে প্রকাশ্যভাবে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যোগ দিতেন। জাবালি মুনি যে উপদেশ দিতেন, তাহা এক প্রকার চার্ব্বাকদর্শন বলিলেও হয়। বশিষ্ঠাদি দশরথের সহিত, রাম পরশুরামের সহিত বিবাদ করেন, তাহাও পুরাণাদিতে শুনা যায়। পুনশ্চ লেখাপড়া শিখিবার কোন বাধাই ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই দুই একটি বিষয় ভিন্ন প্রায় সমান শিক্ষা পাইত। সুতরাং তিন জাতিরই মানসিক উন্নতি যথেষ্ট হইত। কেবল যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগেরই হস্তে থাকিত। জনক রাজা তাহাও করিতে দিতেন না। তিনি স্বয়ং সকল কার্য্য করিতেন, তিনি নিজে ঋষিদিগের ন্যায় শিক্ষা দিতেন। এইরূপ অনেকগুলি ক্ষত্রিয় রাজর্ষিও ছিল। সুতরাং যাগযজ্ঞাদি ভিন্ন সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অন্ততঃ একপ্রকার শিক্ষাই পাইতেন। অনার্য্যগণ যাহারা নূতন অধিকৃত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই আর্য্যদিগের দলে ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং অধিকাংশ শূদ্র নামে একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। অনেকে বনদুর্গ, জলদুর্গ ও গিরিদুর্গমধ্যে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। শূদ্রদিগের মধ্যে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ জাজ্বল্যমান ছিল। উহাদের অনেকেই ব্রাহ্মণদিগকে, এমন কি, সমস্ত আর্য্যজাতিদিগকে ঘৃণা করিত। উহারা স্বতন্ত্র আইনে শাসিত হইত। এমন কি, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আজিও শূদ্রেরা আমাদের আইন অনুসারে চলে না। দায়ভাগে শূদ্রের উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। উহাদের মধ্যে প্রবীণেরা অনেকেই কেবল অবসর প্রতীক্ষায় ছিল। যে সকল অনার্য্যেরা অধীনতা স্বীকার করে নাই, তাহারাও স্বজাতীয়দিগকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিত না। তাহারা আপন ধর্ম্মে রত থাকিয়া ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মকর্ম্মের নানা ব্যাঘাত করিত এবং উপহাসাদি করিত। প্রতি বনে, প্রতি পর্ব্বতে, প্রতি দুর্গে অনার্য্যদিগের স্বাধীনতা ছিল। ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ সমাজনিয়ম, তাহাতে বৃহৎ রাজ্যস্থাপন এক প্রকার অসম্ভব। আর্য্যভূমি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রায় দেখা যায়, ক্ষুদ্র রাজ্যে সভ্যতা ও সুনিয়ম প্রবেশ করিলে শীঘ্র তাহার উন্নতিলাভ হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবের প্রকৃতি।

এইরূপ মিশ্রিত সমাজে স্বাধীনভাবে চিন্তা প্রবল হওয়া একান্ত সম্ভব। তাহাতে আবার দুই সভ্য জাতির বহুকাল ধরিয়া একত্র বাস। তুলনা-সামগ্রী লোকের চক্ষে দুই বেলা। এইখানে অনার্য্যগণ আমাদের অপেক্ষা ভাল, এইখানে মন্দ। এই এই স্থলে আমাদের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই এই স্থলে আমাদের নিয়ম অনার্য্যগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই তুলনা একবার আরম্ভ হইলেই লোকের মানসিক প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বৈরিভাব হেতু সেই পরিবর্ত্তন সত্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে হিন্দুস্থানের আর্য্যগণ পঞ্জাব ও কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আপনাদিগকে নিকৃষ্ট মনে করিতে লাগিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা

ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন! আমরা আর্য্যগণের তৎকালীন ইতিবৃত্ত ভাল জানি না, কেবল নানা শাস্ত্রীয় কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া অনুমান করি মাত্র। কিন্তু অনার্য্য সমাজের কোন সম্বাদই জানি না; জানিবার উপায়ও নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, দুই জাতির সংঘর্ষে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরিবর্ত্তন-সময়ে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়। সে কাণ্ড পরে লিখিব। এখন সেই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত পুরোহিত, অধ্যাপক ও অন্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সপক্ষ ও বিপক্ষ ক্ষত্রিয়, সংক্ষেপে সমস্ত আর্য্য এবং অনার্য্য সমাজ কি আকার ধারণ করে, তাহাই লিখিতেছি। এক জন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন—সভ্যতার লক্ষণ দেওয়া বড় কঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, সভ্যতার দুই মূর্ত্তি আছে;—(১) আন্তরিক, (২) বাহ্যিক। উপরি-উক্ত ভারতবর্ষীয় বিপ্লবে দুই মূর্ত্তিরই উন্নতি হয়।

(১) মানসিক বৃত্তির উন্নতি দুই প্রকার;—(ক) বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও (খ) হৃদয়বৃত্তির উন্নতি।

(ক) বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি দর্শনগণে প্রকাশ আছে। সময়তালিকামাত্রেই দর্শনগুলিকে এই বিপ্লবকালে রচিত স্থির করা হইয়াছে। এই কয় শতাব্দীতে উহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংগ্রহ। যুগপৎ সমস্ত হিন্দুস্থানে নানা মতের উৎপত্তি হয়। আজি এক জন জগৎ শূন্যময় বলিলেন; কালি আর এক জন বলিলেন,—ক্ষণিক জ্ঞান মাত্র সত্য। পরশ্ব এক জন প্রত্যক্ষবাদ সৃষ্টি করিলেন। আজি এক জন বলিলেন,—চক্ষের জ্যোতিঃ-পদার্থে পড়িয়া পদার্থের উপলব্ধি হয়। কালি আর এক জন ঠিক বিপরীত মত চালাইয়া দিলেন। এক অঞ্চলে আত্মার অনাদিনিধনত্ব প্রমাণ হইল, আর এক অঞ্চলে আত্মা অনিত্য বলিয়া দেহের সহিত ভস্মসাৎ হইয়া গেলেন। একেবারে শত শত মতের উৎপত্তি হইল। ক্রমে এই সকল মতের সংগ্রহ আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণপক্ষীয়দিগের মত ছয় জনে সংগ্রহ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা এই ষড়্-দর্শনের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন; গৌতমাদি নিজে সংগ্রহকার মাত্র। তাঁহাদের নিজের মতও তাঁহাদের পুস্তকে অনেক আছে। বিশেষ অনেক চলিত মতের তাঁহারা সমলোচনা করিয়া সমুদায় পুস্তকে এরূপ মৌলিকতা ও চিন্তাশীলতা প্রকাশ করিলেন যে, পরবর্ত্তী লোকে জানিল যে, ঐ সকল মত তাঁহাদের নিজেরই। তাঁহারা নানা মতের সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা সকল গ্রন্থেই সকল মতের খণ্ডন-মুণ্ডন দেখিতে পাই। সুতরাং তাহা দেখিয়া সাংখ্য ন্যায়ের পর বা ন্যায় সাংখ্যের পর, এরূপ বিবেচনা হইতে পারে না। এমন হইতে পারে, ন্যায়সূত্রকার মিথিলায় বসিয়া বুদ্ধির নিত্যতা খণ্ডন করিলেন। সাংখ্যসূত্রকার পঞ্জাবে বসিয়া বুদ্ধিনিত্যতার উপর সমস্ত সাংখ্যশাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। বুদ্ধিনিত্যতা মত তাঁহাদের কাহারই নিজের নয়। অথচ তৎকালে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণবিরুদ্ধপক্ষীয়দিগের মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত-রূপ সংগ্রহ হইল। ব্রাহ্মণবিরুদ্ধ মতে কয়খানি দর্শন সংগ্রহ ছিল ও তাহাদের কি প্রকার ভাব, জানিবার উপায় নাই। অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের দর্শনাবলী অধ্যয়ন করিলে অনেক দূর বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল দর্শন আজিও মুদ্রিত হয় নাই। এখন এই পর্য্যন্ত বলা যায়, বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা আর না করা ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণবিরোধী দর্শন নির্ণয়ের উপায়। তোমরা যত দূর স্বাধীনভাবে চিন্তা কর না, বেদের প্রামাণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিলেই ব্রাহ্মণেরা তোমাকে আপন দলভুক্ত করিয়া লইবে। নচেৎ তোমাকে নাস্তিক বলিয়া বাহির করিয়া দিবে, মনু এ বিষয়ে সাক্ষী।

যোঽবমন্যেত তে মূলে (শ্রুতি-স্মৃতি) হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

(যে কেহ হেতুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের মূল শ্রুতি ও স্মৃতিকে অপমান করিবে, সে নাস্তিক, বেদ-নিন্দক। তাহাকে সাধুরা সমাজচ্যুত করিবেন।) বেদের বিরুদ্ধে হেতু প্রয়োগ করিলেই নাস্তিক ও সাধুদিগের বহিষ্কার্য্য হইল। নচেৎ সকল মতেই ধর্ম্ম। এক্ষণে প্রমাণ হইল, ষড়্দর্শন, ষড়্দর্শনের মূল উপনিষৎ ও ব্রাহ্মণবিরোধী দর্শন এই কালের।

(খ) হৃদয়বৃত্তির উন্নতিও এই সময়ে যথেষ্ট হয়। বিস্তারে তৎকালীন সমাজের হৃদয়বৃত্তির উন্নতি বর্ণন করিতে গেলে "পুথি বেড়ে যায়।" এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, এই কালে ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি যাহা ছিল, তাহা যাগ-যজ্ঞ লইয়া এবং নারশংস, পুরাকল্প প্রভৃতি পুরাণ ও গল্প লইয়া ব্যস্ত থাকিত। এই কালে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হয়, তাহাতে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি, পুত্রের পিতামাতার প্রতি, গৃহস্থের অতিথির প্রতি, রাজার প্রজার প্রতি, শিষ্যের গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বিস্তাররূপে বর্ণিত আছে। মনুষ্য মনুষ্যের

প্রতি অনেক অধিক পরিমাণে সদ্ব্যবহার করিতে শিখে। এমন কি, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন মনুষ্যের প্রতি, তেমনি পশু-পক্ষীর প্রতি ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। যাহা আজিও কোন ধর্ম্মে কোন দেশে হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই, সেই সর্ব্বভূত প্রতি দয়া প্রচার হয় এবং কার্য্যে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণেরাও সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজের স্বার্থরক্ষার্থ উহার অনেক বিশেষ নিয়ম করিয়াছিলেন। সেই সকল বিশেষ নিয়মও এত অধিক যে, সাধারণ নিয়ম কথায় মাত্র পর্য্যবসিত হয়। তাঁহাদের বিরোধী সর্ব্বভূতে দয়া যেমন মুখে প্রচার করিতেন, বিশেষ নিয়মও তেমনি অবজ্ঞা করিতেন। সুতরাং বাক্য ও কার্য্য উভয় প্রকারেই তাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে প্রধান বলিতেন, অবশিষ্ট মনুষ্যের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিতেন, শূদ্রদিগকে দাস বলিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রাণিহিংসা করিতেন। তাঁহাদের বিরোধীরা সর্ব্বমনুষ্যকে সমানাধিকার প্রদান করেন ও অহিংসা প্রচার করেন। এই পর্য্যন্ত আন্তরিক উন্নতি। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই হৃদয়বৃত্তিগত উন্নতি বিশেষ দৃষ্ট হয়,—সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু যত দিন বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পর্য্যাপ্তপরিমাণে প্রচার না হয়, তত দিন বলা যায় না, সে উন্নতি কত দূর দাঁড়াইয়াছিল। মনু এক স্থানে লিখিয়াছেন, যাগ-যজ্ঞ, সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিয়াও যদি লোকে সত্য, শৌচ, দয়া, আর্জ্জব, দশধা ধর্ম্ম আচরণ করে, তবে সে স্বর্গলাভ করিবে অর্থাৎ তিনি সমাজধর্ম্মকে পারত্রিক ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) বাহ্যিক উন্নতি সমাজবন্ধনকে বলা যায়। এই সময়ে আইনের * সৃষ্টি হয়। রাজনীতি, দণ্ডনীতির সৃষ্টি হয়, ঋণাদান প্রভৃতি অষ্টাদশ বিবাদ-পদের সৃষ্টি হয়। সমাজ আইনতন্ত্র হয়—আইনই প্রবল, আইনের রক্ষক ব্রাহ্মণ, রাজা নহেন। রাজার ক্ষমতা অসীম। কিন্তু তাঁহাকে আইনমতে চলিতে হইবে, নচেৎ নরকে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে রাজা অত্যাচারী হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ স্পষ্টাক্ষরে উপদিষ্ট নাই, প্রত্যুত দোষ বলিয়া লেখা আছে। কিন্তু তাহারই পরে লেখা আছে, অমুক অমুক অত্যাচারী রাজার অদৃষ্টে অমুক অমুক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, সুতরাং যদিও প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ প্রচার করুন, আর না করুন তাঁহারা অত্যাচারী রাজাকে অধিক দিন রাজত্ব করিতে দিতেন না। বৌদ্ধদিগের রাজ্যশাসনের বিষয় ঠিক বলা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধসমাজ ব্রাহ্মণসমাজ হইতে অনেক অংশে উন্নত ছিল। এক জন ইংলণ্ডীয় ইতিহাসবিৎ বলেন,—আর্য্যজাতির রাজ্যশাসন অতি প্রাচীনকালে সর্ব্বত্রই একরূপ ছিল। কি গ্রীস্, কি জর্ম্মণী, কি হিন্দুস্থান, সর্ব্বত্র এক জন রাজা, তাঁহার পর কতকগুলি জ্ঞানী বড় লোক, তাহার নীচে আর্য্যজাতীয় সাধারণ লোক, তাহার নীচে দাস (আর্য্য ও অনার্য্য)। দাস ভিন্ন সকলেরই রাজ্যমধ্যে কথা থাকিত। এরূপ সমাজে বৃহৎ রাজ্যস্থাপন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণসমাজে ঠিক এইরূপ ছিল। বৌদ্ধসমাজে বোধ হয়, গোড়া হইতেই চীনের মত কোমল প্রাকৃতিক যথেচ্ছাচার প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ঐহিক ক্ষমতা গ্রহণার্থ প্রসারিতহস্ত ছিলেন না: কিন্তু বৌদ্ধদিগের কথা আজি আমরা কিছু বলিলাম না।

সামাজিক ব্যতীত সাংসারিক উন্নতি-বিষয়ে অনেক লেখা হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে চর্ব্বিতচর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজন। মন্বাদি গ্রন্থে জলপাত্র, ভোজনপাত্র, আহারীয় দ্রব্যাদি সকল কথাই আছে। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক দূর উন্নতি হইয়াছিল। খাদখননাদি কার্য্য, পথনির্ম্মাণ ধর্ম্মকর্ম্মমধ্যে গণিত থাকায় রাজার আর পবলিক-ওয়ার্কস্ বলিয়া একটি সর্ব্বভুক্ ডিপার্টমেণ্ট রাখিতে হইত না। এ বিষয়েও হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদিগের উন্নতি অধিক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে তদানীন্তন হিন্দুস্থান-সমাজকে কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। বুদ্ধিবিপ্লব উপলক্ষে সে সকলই উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সকল দলেরই লিখিত পুস্তক আছে। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ হইতে আমরা কল্প, গৃহ্য প্রভৃতি সূত্র পাই। উহা পারত্রিক ধর্ম্মে, যাগযজ্ঞ, সন্ধ্যাবন্দনাদিবিধানে নিযুক্ত। অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে ষড়্‌দর্শন, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র

* আমাদের স্মৃতিতে পারত্রিক ধর্ম্ম (Religion) লৌকিক ধর্ম্ম (Morals) ও দণ্ডনীত্যাদি তিনই উক্ত হইয়াছে। আধুনিক সভ্যসমাজে তিনটির জন্য তিন প্রকার শাস্ত্র আছে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদিতে পারত্রিক ধর্ম্মের উপদেশ আছে; লৌকিক ধর্ম্ম ও দণ্ডনীত্যাদি এই সময়েই রচিত।

পাই। ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের নিকট কোন গ্রন্থ পাইয়াছি কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাদের দ্বারায় স্বীয় অবলম্বিত ব্যবসায়ে পুস্তক লেখা হইয়াছিল, বলিতে সাহস করা যায়। আয়ুর্ব্বেদ, অশ্বশাস্ত্র, হস্তিশাস্ত্র, কৌটিল্য, কামন্দকীয়, মূলস্বরূপ রাজনীতি এবং অর্থশাস্ত্র উঁহাদের দ্বারাই রচিত হয়। অর্থাৎ এই কালীন ব্যবসায়ীদিগের রচিত গ্রন্থাদি পরসময়ে সংগৃহীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদাদিরূপে পরিণত হয়। বৈদিক ব্যাকরণ, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও প্রাকৃত ব্যাকরণের দুই একখানি গ্রন্থ এই কালে লিখিত হয়। ব্রাহ্মণপক্ষীয় ক্ষত্রিয় হইতে আমরা মোক্ষশাস্ত্র প্রাপ্ত হই। জনক রাজা উহার অধ্যাপক। ব্রাহ্মণবিরোধী ক্ষাত্র হইতে আমরা বুদ্ধাদি শাস্ত্র প্রাপ্ত হই। অনার্য্যদিগের রচিত কোন পুস্তক আমরা পাই নাই। পূর্ব্বাঞ্চলীয় অনার্য্যেরা ব্রাহ্মণবিরোধী মতপ্রচার বিষয়ে অনেক সাহায্য করে। এমন কি, বোধ হয়, অনার্য-সম্পর্ক ব্যতিরেকে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইত কি না, সন্দেহ। এতৎকালীন অনার্য্যেরা ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মকেও যথেষ্ট পরিমাণে কলুষিত করে। ব্রাহ্মণেরা অনেক স্থলে উহাদের দেবতাদিগকে বৈদিক দেবতার সহিত একাকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধিবিপ্লবের ফল—পূর্ব্বপ্রস্তাবের সংক্ষিপ্তার্থ।

আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবের প্রথম বুদ্ধিবিপ্লবের পূর্ব্বতন সামাজিক অবস্থা, উহার কারণ, প্রকৃতি এবং উহা দ্বারা আন্তরিক ও বাহ্যিক যে সকল উন্নতি হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আর্য্য ও অনার্য্য সমাজের একত্র বাস বিপ্লবের কারণ। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিবাদ তাহার উদ্দীপক। বিপ্লবকালের সকল সম্প্রদায়ের লোক হইতেই আমরা গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সময়ে দর্শনের সৃষ্টি, আইনের সৃষ্টি ও সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা পরম ধর্ম্ম প্রভৃতি উন্নত নীতির সৃষ্টি হয়। এক্ষণে উহার ফলগুলি একটু বিস্তারক্রমে বর্ণনা করিব।

প্রথম ফল যাগযজ্ঞের বিরল-প্রচার।

বিপ্লবের পূর্ব্বে লিখিত ব্রাহ্মণ নামক বেদের অংশগুলি নানারূপ যজ্ঞকাণ্ডের নিয়মে পরিপূর্ণ। উহাতে মাসব্যাপী, বৎসরব্যাপী, দ্বাদশবৎসরব্যাপী বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের কথা আছে। ব্রাহ্মণ সকল ছাপা হয় নাই। যাহা হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই, জগতের যাবতীয় দ্রব্যই যজ্ঞের প্রয়োজনে লাগিত। এক স্থানে দেখিয়াছি, ইন্দুরমাটীও কাজে লাগিয়াছে। বিপ্লবের পর যাগযজ্ঞ ক্রমে কমিয়াছে। ইহার পর আর অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি বড় বড় যজ্ঞের নাম একটা শুনিতে পাই না। যদিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত বাজপেয়াদি যজ্ঞ হইয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণকালের তুলনায় বিপ্লবের পর যজ্ঞ আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যজ্ঞতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইবার এক কারণ এই যে, ব্রাহ্মণকালে যজ্ঞ ভিন্ন মুক্তি ও ভূতিলাভের উপায় ছিল না। বিপ্লবের সময় জ্ঞানই মুক্তির উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ক্রমে আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য মুক্তিপ্রদায়ক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং যাগ-যজ্ঞের আর শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি।

সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, যজ্ঞের অসংখ্য পশুবধ দেখিয়া শুদ্ধোদন রাজার পুত্র মহামতি বুদ্ধদেব দয়াপরবশ হইয়া "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এবং জ্ঞানই মুক্তির উপায়, এই দুইটি মতের প্রচার করেন। উহাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র। আমরা দেখিতে পাই, উপনিষৎসমূহেও এই দুই মত আছে। সুতরাং বোধ হয়, উহারা এই বিপ্লবকালে উদ্ভাবিত বহুসংখ্যক নূতন মতের অন্যতম। পূর্ব্বাঞ্চলে বুদ্ধদেব ঐ মতদ্বয়ের প্রচার করেন। পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণবিরোধী সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক ছিল ও তাঁহার মত সেখানে সাদরে গৃহীত হয়। দেখিতে দেখিতে মিথিলা, মগধ, কোশল, কাশী প্রভৃতি স্থানের রাজারা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হয়েন। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা যে ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সেই ধর্ম্মেরই শ্রীবৃদ্ধি। রাজদরবারের লোক রাজার অনুগমন করে; ছোট লোকের কোন ধর্ম্মই নাই, তাহারা কিছুই বুঝে না, তাহারাও প্রায় রাজারই পশ্চাদ্গামী হয়। এইরূপ নূতন ধর্ম্ম অবলম্বিত হইলে, কেবল প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত পুরোহিতগণ রাজার বিরোধী হয়েন। সৌভাগ্যক্রমে মগধ, মিথিলা প্রভৃতি প্রদেশে প্রথম হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভালরূপে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। তথাকার পুরোহিতগণ যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহা অনায়াসেই

উপশমিত হইল। শেষ অনেক ব্রাহ্মণও বুদ্ধদেবের শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে গণ্য হইল, বৌদ্ধধর্ম্মের জয় জয়কার হইল।*

বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত একটি কথা।

অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইবামাত্র দেশের সকল লোক তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হয়। এই একটি সম্পূর্ণ ভ্রম। অশোকরাজার নিজ অধিকারকালেও সমস্ত মগধ বৌদ্ধ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কোন স্থান হইতেই ব্রাহ্মণ নির্ম্মূল হয় নাই। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধী রাজারা উক্ত মত অবলম্বন করায় ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার অনেক খর্ব্বতা হইয়াছিল। বস্তুতঃ যেমন হিন্দু মুসলমান, তেমনি বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের সকল দেশে, সকল নগরেই বাস করিত। ব্রাহ্মণেরা এখন যেমন চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগকে ঘৃণা করেন, বৌদ্ধদিগকেও সেইরূপ করিতেন। বিশেষের মধ্যে, এই চৈতন্যসম্প্রদায় কখন রাজকীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই, বৌদ্ধেরা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি যে উপরি-উক্ত বিপ্লবের একটি সুধাময় ফল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

মগধসাম্রাজ্যের উৎপত্তি।

বুদ্ধদেবের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এমন কি, এক মিথিলা ও মগধেই দশ পনর জন রাজার নিকট বুদ্ধদেব আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, শুনা যায়। তার পর দুই শত বৎসরের ইতিহাস জানি না। সেকেন্দরের আক্রমণকালে শুনিতে পাই, মহানন্দ নামে এক জন নন্দবংশীয় ভূপাল প্রাচী রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। দুই শত বৎসরের মধ্যে এরূপ সাম্রাজ্যবৃদ্ধির কারণ কি? পশ্চিমে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য, তেমনই আছে। সেকেন্দর এক জনের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এক জনকে জুয়াচুরি করিয়া হাত করিলেন, আর এক জন আপনি শরণাগত হইল। অথচ সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চল এক রাজার অধীন হইয়াছে, ইহার কারণ কি? বোধ হয়, পূর্ব্বাঞ্চলের সমস্ত রাজারাই ব্রাহ্মণের বিরোধী ছিলেন। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাদের সন্ধি হয়, মিল হয়; শেষ দিবসের রাষ্ট্রসমবায়ের* ন্যায় ঐ সন্ধিতে মগধসাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় রাজারা শূদ্র ছিলেন। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট অত্যাচার ছিল, পুরাণে লিখিত আছে। অথচ তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন না। ইহাতে কি বোধ হয়? পূর্ব্বাঞ্চলের লোক ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী হওয়া হেতুকই পরস্পর একতাপাশে বদ্ধ হইবার চেষ্টা করে। রাজকীয় একতার ফল মগধসাম্রাজ্য, আর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একতার ফল বৌদ্ধধর্ম্ম।

মগধসাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষের কি উপকার হইয়াছে।

মগধসাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান উপকার হইয়াছে। বিদেশীয় হস্ত হইতে ভারতের উদ্ধার ও দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য-বিস্তার। এতদ্ভিন্ন আরও একটি আছে। সেইটি আমরা প্রথমে বলি। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য থাকা প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র উপায়। আবার অনেকে আছেন, তাঁহাদের মতে বৃহৎ সাম্রাজ্যই উন্নতির হেতু। দুই মতেই আংশিক সত্য উপলব্ধি হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য অসভ্য অবস্থায় ভাল। উহাতে শীঘ্র শীঘ্র সভ্যতা-বিস্তার হয়; সাক্ষী—গ্রীস ও ইতালী। কিন্তু সভ্যতা, উন্নতি একবার বদ্ধমূল হইলে বৃহৎ সাম্রাজ্যই সুবিধা। রোম ও চীন এই দুই সাম্রাজ্যই প্রাচীন সভ্যতা বজায় রাখিয়া তাহার উন্নতি করিয়া গিয়াছে। মগধসাম্রাজ্যের অদৃষ্টে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভ্য রাজ্য করতলস্থ করিয়া মগধের উৎপত্তি। যত দিন মগধের সাম্রাজ্য ছিল, তত দিন প্রজাবর্গের সুখ ছিল। মগধেরা রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ করিত, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় স্থাপন করিত, বিদ্যার উৎসাহ দিত। মগধের দ্বারা কি উপকার হইয়াছিল, মগধ শোচনীয় ধ্বংসের পর ভারতবর্ষের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিলেই

---

* অনেকে মনে করেন, বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন না, তিনিও গৌতমাদির ন্যায় কতকগুলি দার্শনিক মত প্রচার করেন মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন শত বৎসর পরে বৌদ্ধমত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মত অনেক পরিমাণে সত্য হইবার সম্ভাবনা। কারণ, অশোক রাজার পূর্ব্বে আমরা বৌদ্ধদের কথা বড় একটা শুনিতে পাই না। তাঁহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক্রিয়া প্রকৃষ্টরূপে আরম্ভ হয়।

* Deliace Bonfederation.

জানা যাইবে। এক জন ইতিহাসবিৎ লিখিয়াছেন, পরাক্রান্ত রাজ্য ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইংরাজরাজত্বে ভারতবর্ষ সুখী; তাহার কারণ, ইংরাজ পরাক্রমশালী। মোগল সাম্রাজ্যে যে ভারতের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার কারণ, মোগলেরা পরাক্রমশালী ছিল। মগধের রাজ্যে যে ভারতের এত গৌরব হয়, তাহারও কারণ, মগধ পরাক্রমশালী। বর্ম্মার মগেরা ও সিন্ধুতীরবর্ত্তী হিন্দুরা মগধের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মগধের হস্তগত ছিল। ইংরাজ, মুসলমান ও মাগধে প্রভেদ এই, ইংরাজ ও মুসলমান বিদেশী, মাগধ এদেশী। এই জন্য আমাদের চক্ষে মগধের এত মান। হিন্দুদিগের সময় মগধের ন্যায় বৃহৎ সাম্রাজ্য আর স্থাপিত হইয়াছিল কি না, সন্দেহ। যদিও হইয়া থাকে, মগধের ন্যায় ভারতবর্ষের এত উপকার আর কাহার দ্বারাও সাধিত হয় নাই।

গ্রীক হস্ত হইতে ভারত উদ্ধার।

পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একবার দারা সম্‌তাল্প আর একবার সেকেন্দরের করতলস্থ হইল। সেকেন্দরের ইচ্ছা ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করেন। পুরুরাজ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও সেকেন্দরের কিছু করিতে পারিলেন না। তখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে মগধ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেকেন্দর তাহাতে ভীত হইলেন। তাঁহার সৈন্যদলে প্রভুদ্রোহ ঘটিল, কাজেই সেকেন্দরকে ভারত ছাড়িয়া যাইতে হইল। মগধ গর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। কিন্তু অল্পদিনমধ্যেই সিলিউকস্ আবার অসংখ্য গ্রীক-সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। এবার মগধ হইতেই ভারতের উদ্ধার হইল। ইহার পর চারি পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া আর বিদেশীয় আক্রমণ শুনিতে পাওয়া যায় না। যত দিন মগধের এতটুকু বিক্রম ছিল, তত দিন কেহ ভারতবর্ষে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই। সলিমান পর্ব্বতের ওপারে, ভীমবলী পারদ রাজ্য ছিল। কৈ, পারদীয়ানরা ত একবারও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই। অতএব ভারতবর্ষ যে সিরিয়া ও মিশরের ন্যায় গ্রীকের অধীন হয় নাই, এবং প্রায় পনর শত বৎসর ধরিয়া স্বাধীন ছিল, তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিবিপ্লব, বৌদ্ধধর্ম্ম ও মগধ সাম্রাজ্য।

দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য-বিস্তার।

অশোক রাজা দক্ষিণদেশীয় লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রথম ধর্ম্মপ্রচারক পাঠান এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হয়েন। তাঁহার দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও দাক্ষিণাত্যে স্বধর্ম্মবিস্তারের চেষ্টা পান। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতাই অধিক হয়। তাহার কারণ, বৌদ্ধেরা ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইত, সেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যস্থাপনেরও চেষ্টা পাইত। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ফুরাইতে না ফুরাইতে যতি হইতেন। এইরূপ ধর্ম্মভাবের আধিক্য দেশের মঙ্গলকর হয় না।

মঠের সৃষ্টি।

মঠের সৃষ্টি বিপ্লবের একটি কুফল। বৌদ্ধেরা সর্ব্বপ্রথমে মঠের সৃষ্টি করেন। বুদ্ধের সখা পাটলীপুত্ররাজ স্বীয় রাজধানীতে প্রথম মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মঠের ইতিহাস পরে বর্ণনীয়।

উপরি-উল্লিখিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তার্থ।

আমরা বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি। বুদ্ধিবিপ্লবের শেষ দশায় দেশের কি ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বিষয়ের কয়েকটি কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইব। বুদ্ধিবিপ্লবের শেষ দশায় দেখা গেল, সমাজ পূর্ব্ব অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দুইটি পরিষ্কৃত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বদিক্ ব্রাহ্মণবিরোধী, অনার্য্যপ্রধান। পশ্চিম দিক্ আর্য্যপ্রধান, ব্রাহ্মণশাসিত। ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাচীন অত্যাচার ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের বেদ আজিও গুপ্ত পুস্তক আছে, সাধারণের জন্য এক সেট নূতন স্মৃতিপুস্তক হইয়াছে। স্মৃতি প্রায় বেদের তর্জ্জমা মাত্র, ভাষা নূতন। স্মৃতির ভাষা আর বুদ্ধ গ্রন্থের ভাষা প্রায়ই এক, কেবল স্মৃতিতে বৈদিক প্রয়োগ অধিক, বৌদ্ধগ্রন্থে অবৈয়াকরণ প্রয়োগ অধিক, দেশীয় চলিত ভাষার উদ্ধৃত কথা অধিক। ব্রাহ্মণবিরোধিগণের মধ্যে এক জন দলপতি পাইলেন, তাঁহার নামে তাঁহাদের নাম হইল। ব্রাহ্মণেরা আপন ধর্ম্ম কাহাকেও দিতেন না, উহারা সকলকেই সমানরূপে স্বধর্ম্ম দান করিত। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকে এ কারণ পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল; ব্রাহ্মণবিরোধিগণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একদল হইল, ইহাদের রাজ্যশাসনক্ষমতা অধিক হইল, ইহারা ব্রাহ্মণদিগের দেশেও আধিপত্য বিস্তার করিল। ব্রাহ্মণেরা অনেকে পলাইয়া দক্ষিণাপথে জঙ্গল আশ্রয় করিলেন, অনেকে কথঞ্চিৎ স্বধর্ম্ম লইয়া দেশে রহিলেন। বন্যজাতীয়দিগকে ক্ষত্রিয়ত্ব দিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মের সহিত আপনার ধর্ম্ম মিশাইয়া আর এক নূতন আধিপত্যের,

নূতন-সভ্যতার এবং নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। মালব গুজরাটের পূর্ব্বাংশে, রাজবারার দক্ষিণাংশে পুরাণাদির উৎপত্তি, নাগকুল অগ্নিকুলের উৎপত্তি ও পৌরাণিকতা ও বর্ত্তমান সভ্যতার উৎপত্তি। ব্রাহ্মণদিগের দীক্ষিত করিবার প্রণালী অতি চমৎকার। আমরা জানি, হিন্দুধর্ম্মে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু কাম্বেল সাহেব বলেন,—হিন্দুরা সাঁওতাল পরগণায় গ্রামকে গ্রাম হিন্দু করিয়া লইতেছে। এক জন ব্রাহ্মণ একটি গ্রামে গেল; সেখানে পূজা অর্চ্চনা আরম্ভ করিল; সাঁওতালেরা তাহার কাছে পীড়ার ঔষধ প্রভৃতি লইতে আসিল; ক্রমে কালীপূজা করিতে শিখিল; রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনিল; তাহারা হিন্দু হইল। পাদরীরা তাহাদের আর কিছুই করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ সাঁওতালের ব্রাহ্মণ বলিয়া নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইল। দাক্ষিণাত্যে প্রায় এইরূপই ঘটিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে শূদ্র ও অন্ত্যজ লোকই অধিক। এইরূপে ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দাক্ষিণাত্যে আর্য্য আধিপত্য বিস্তার হইল।

বিপ্লবের কুফল।

বিপ্লবের কুফল হিন্দুচরিত্রে বৈরাগ্যের আধিক্য। ঐহিক বিষয়ে ইহাদের তাদৃশ মনোযোগ নাই। এ জগৎ মায়া, ভ্রম; যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা এ জন্মের পর, সুতরাং এ জন্মের কাজে তত মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে। সকলেই পরকালের জন্য অধিক চিন্তিত। কেহ প্রমাণ-প্রমেয়াদির তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়সাধিগমের চেষ্টা করিতেছেন, কেহ প্রকৃতিপুরুষের সূক্ষ্মতম বিবেক-খ্যাতি নামক ভেদ নিরূপণ করিয়া দুঃখত্রয়াভিঘাতের চেষ্টায় ফিরিতেছেন, কেহ জড় জগৎকে অবিদ্যাবিরচিত মনে করিয়া ব্রহ্ম ও আমি এক, এই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বীরাসনে উপবেশন করিয়া প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু রোধ করত আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ঐহিকের উপর বিষয়ী লোকেরও বাসনা অল্প। বৌদ্ধদিগের ত ভিক্ষু নামে এক দল লোক শুদ্ধ পারত্রিক চিন্তার জন্য স্বতন্ত্র থাকিত। বিপ্লবের পূর্ব্বে ঐহিক পারত্রিক প্রায় সমান ছিল, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের পর লোকে পারত্রিক চিন্তায় ব্যস্ত হইত। বিপ্লবের পর সকলেই যতি। যিনি ব্রহ্মচারী, তিনিও যতি, যিনি গৃহস্থ, তিনিও যতি। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, তিন আশ্রম না কাটাইয়া যতি হইতে পারিবেন না। শেষ দেখি, বৌদ্ধেরা বঙ্গসাগরতীরবর্ত্তী উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, কর্ণাট, সিংহলের অনার্য্যদিগকে বৌদ্ধ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা মালব কেন্দ্র হইতে দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কেরল পৌরাণিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।* এই ভাবে ভারতবর্ষ রহিল। ইহার পর হইতে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূত্রপাত পরে বর্ণনীয়। পঞ্জাবের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নূতন আর্য্যগণ আসিয়া মিলিতে লাগিল। হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণেরা উহাদিগকে বড় ঘৃণা করিত। অনার্য্যগণ একেবারে বৌদ্ধ হইল না। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশে আজিও অনার্য্যধর্ম্ম প্রচলিত আছে যে সকল জাতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহে, অথচ ব্রাহ্মণ পুরোহিত মানে না, তাহারাই অনার্য্যধর্ম্মাবলম্বী। যেমন আমাদের দেশে ডোম, পোদ ইত্যাদি। ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে, তথাপি ত্রিপুরা-পুরোহিতদিগের প্রভুত্ব আজিও কমে নাই। প্রতি বৎসর কয়েক দিন ধরিয়া উঁহাদের প্রতাপে কাহারও বাহির হইবার যো থাকে না। একবার রাজা বাহির হইয়াছিলেন। বিচারে তিনি দণ্ডনীয় হন। এইরূপে বুদ্ধিবিপ্লবের শেষ অবস্থায় তিন ধর্ম্মাবলম্বী লোক দৃষ্ট হইল,—অনার্য্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধদিগের নূতন ধর্ম্ম, তাহাদের ঐক্য অধিক, তাহাদিগের ক্ষমতা অধিক। ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। অনার্য্য প্রায়ই পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছে।

[বঙ্গদর্শন—৫ম খণ্ড—১২৮৪ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

* দক্ষিণেও ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সকল দেশেই ছিল। যে মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-ক্ষমতা অধিক, সেইখানেই ইলোরের মন্দির আছে।

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ

অবতারণা

অশোক রাজার সময়ে—মৌর্য্যবংশের অধিকার-কালে—মগধসাম্রাজ্যের উন্নতির মুখে—খৃষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে, যখন সভ্য ভারতের অধিকাংশ লোকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়—যখন বুদ্ধদেবের নাম বিশ্বামিত্র, বাদরায়ণ প্রভৃতি বেদপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নাম ঢাকিয়া ফেলে—যখন ব্রাহ্মণগণও আমাদের সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নব অভ্যুদয় দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে, ঐ অল্পসংখ্যক হীনবল, বীর্য্যহীন, বিচারপরাজিত ব্রাহ্মণগণই আবার ভারতবর্ষের একাধিপতি হইবেন, আবার তাঁহাদিগেরই গৌরবে ভারত গৌরবান্বিত হইবে। বোধ হয়, কেহই এরূপ প্রত্যাশা করেন নাই। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরেই হউক, ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের পদানত হইবেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বিচ্ছিন্ন ক্ষমতাশূন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটি শক্তি ছিল। যে শক্তি থাকিলে কিছুতেই লোকের মার নাই, সেই শক্তি ছিল; যে শক্তিবলে ইহুদীরা আজিও ইহুদী আছে—গেবীরেরা আজিও গেবীর আছে—সেই শক্তি ছিল। যদি পৌরাণিক ধর্ম্মের উৎপত্তি না হইত, যদি চীনের ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ হইত, তথাপি ব্রাহ্মণ নাম বিলুপ্ত হইত না। সে শক্তিটি স্বশ্রেণী-হিতৈষিতা। এখন যেমন লোকের স্বদেশহিতৈষিতা (patriotism) বলিয়া একটি শক্তি জন্মিতেছে, তেমনি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তৎকালে স্বশ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতির (সমস্ত দেশের বা লোকের নয়) ঐক্য এবং ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য একটি প্রবৃত্তি ছিল। স্বীয় ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস, উচ্চতর জ্ঞানজনিত অভিমান, আমার জ্ঞান আছে এই অহঙ্কার, ব্রাহ্মণমাত্রেরই চিরকালই আছে। এই কয়টি শক্তি ছিল বলিয়াই তাঁহারা অনেকবার অনেক বিপদে রক্ষা পাইয়াছেন। এই শক্তি ছিল বলিয়াই দুর্দ্দমনীয় মুসলমানের অসির আঘাতেও পারস্যের ন্যায় ভারতসমাজ ছিন্ন-ভিন্ন হয় নাই। এক্ষণে আমরা যে প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিতেছি, তাহাতে বৌদ্ধের সহিত সংগ্রামে বহু শতাব্দী পরে ব্রাহ্মণ কি উপায়ে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহাই দেখান হইবে।

ধর্ম্মপ্রচারার্থ বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত উপায়াবলী।

আমাদের গৌরবের প্রথম সময়ে—গভীর চিন্তাশীল লোকদিগের সময়ে—যখন উচ্চদরের দার্শনিক মত সকল চারিদিকে প্রচারিত হইতেছিল, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। বুদ্ধদেবের অমানুষশক্তি, নিঃস্বার্থ প্রাণিহিতৈষিতা প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহার অনুগামী হয়—তৎকালীন সামাজিক অবস্থাও উহাদের উন্নতির কারণ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকগণ প্রধানতঃ তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দল মঠে থাকিত, উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষা দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত এবং বুদ্ধত্বলাভের জন্য ধ্যান-ধারণায় রত থাকিত। ইহাদিগেরই জ্ঞানের উন্নতি অবনতিক্রমে ভিক্ষু, অর্হৎ, বোধিসত্ত্ব নাম হইত। উচ্চ বিষয়ের মতামত আলোচনা মঠেই হইত, কোন মতবিষয়ে সন্দেহ হইলে এইখান হইতেই তাহার মীমাংসা হইত। বড় বড় রাজারা ধর্ম্মমত মীমাংসা করিবার জন্য এই ভিক্ষুদের লইয়া সভা করিতেন। দ্বিতীয় দল বিষয়ী লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিত।

তাহারা কোন প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, নীতি, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিত। ইহাদিগের নাম শ্রাবক। এক জন শ্রাবক শব্দের অর্থ করিয়াছেন—যাহারা শুনে; কিন্তু বাস্তবিক শ্রু ধাতু ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া শ্রাবক পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহারা শুনে, তাহাদিগকে শ্রোতা বলে ও যাহারা শুনায়, তাহারাই শ্রাবক। * এই শ্রাবকেরাও বিবাহাদি করিত না। তৃতীয় দল বিষয়ী লোক। ইহারা

---

* কনিংহাম যেরূপ বলেন, যদি শ্রাবকেরা সেইরূপই ছিল, যদি তাহারা কেবল শ্রোতা অর্থাৎ বুদ্ধদিগের সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর লোক ছিল এবং তাহারাই মঙ্ক, যতি বা মোহন্ত হইল, তবে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সকলেই কি মোহন্ত ছিল? তবে অশোক রাজা বৌদ্ধ হইলেন কিরূপে?

পরিশ্রম্ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। বৌদ্ধদিগের ইচ্ছা নয় যে, কেহ বিষয়কর্ম্ম করে। তাহাদের চেষ্টা এই যে, লোকে চিন্তা করিয়া বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির জন্য, নির্ব্বাণের জন্য চেষ্টা করুক, কিন্তু তাহা হইলে জগৎ চলে না। অতএব কতক লোক সংসার লইয়া থাকুক, তাহারা শুনিয়া যেটুকু ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারে করুক, এই পর্য্যন্ত; সুতরাং তাহারা ইতর সাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিত এবং সে চেষ্টায় অনেক লোককে আয়ত্ত করিয়াছিল। দেখ, উহাদের একদল প্রচারক ছিল, একদল প্রচারকদিগের উপর তত্ত্বাবধারণ করিতে থাকিত; ধর্ম্মোন্নতির জন্য এই দুই দলই একান্ত উদ্যোগী, ইহাতেও শীঘ্র শীঘ্র ধর্ম্মপ্রচার হইয়া পড়িল। বৌদ্ধেরা স্ত্রীলোকদিগকেও ধর্ম্মপ্রচার করিতে দিত এবং উহাদিগকেও মঠের মধ্যে স্থান দিত। যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের বিবাদ, তাহারা বৈদিক ক্রিয়াসক্ত; স্ত্রী ও শূদ্র ধর্ম্মশাস্ত্র ও বৈদিকক্রিয়াতে একেবারে বঞ্চিত। বৈশ্যগণও বড় একটা যাগযজ্ঞাদিতে থাকিতে পারিত না। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হইল।

ব্রাহ্মণদিগের উপায়।

এখন নিয়ম এই যে, ইতর সাধারণ লোকে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, সেই ধর্ম্মেরই গর্ব্ব অধিক। একে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম, তাহাতে ধর্ম্মপ্রচার জন্য লোক নিযুক্ত, তাহার উপর আবার বৌদ্ধগণ যে কেবল ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক, এমন নহে—যে কোন জাতীয় লোককেই উন্নত পদ প্রদানেও কাতর নহে।* সুতরাং অনেক লোক ঐ ধর্ম্মে আসিয়া পড়িল। হিন্দুস্থানের পশ্চিমাংশই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান স্থান; ব্রাহ্মণগণ এখন আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইলেন; তাঁহারাও সাধারণ লোকদিগকে আপনার দলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; যেখানে বৌদ্ধদিগের ক্ষমতা প্রবল হয় নাই—সেইখানে যাইয়াই তাহাদিগকে স্মৃতি উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন; অনার্য্যদিগের দেবতা আপন দেবতা বলিয়া গ্রহণ করত দলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবতা-উপাসনা বলিলে প্রায়ই পৌত্তলিকতা বুঝাইত না। জৈমিনি বেদব্যাখ্যার মীমাংসায় লিখেন—তাঁহার মতে দেবতা বলিয়া কোন জীব-পদার্থ নাই, কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনকার ব্রাহ্মণেরা কার্য্যগতিকে সাকার-উপাসক হইবেন, তাঁহাদের মত হইল

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

সাধকেরা নিরাকার ব্রহ্ম বুঝিতে পারে না, অতএব ঈশ্বরের রূপকল্পনা আবশ্যক।

অন্ত্যজ বর্ণ।

অনার্য্যগণ যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, প্রাচীন স্মৃতিতে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিমাত্র বর্ণের উল্লেখ পাই—কিন্তু অনেক পুরাণ এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, বর্ণ পাঁচটি—এই শেষ বর্ণের নাম অন্ত্যজ বা নিষাদ। মাধবাচার্য্য ঋগ্বেদের টীকায় উহাদের নিষাদ নাম দিয়াছেন; অন্যান্য পুরাণে নিষাদ ও অন্ত্যজ শব্দ একপর্য্যায়করূপে ব্যবহৃত। আমরাও আধুনিক সমাজে দেখিতে পাই, এক দল শূদ্রের জল ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করেন, আর এক দলের করেন না। যাহাদের জল ব্যবহার করা যায়—তাহারা সৎশূদ্র, যাহাদের না যায়, তাহারা অন্ত্যজ। আহীরি গোয়ালা সৎশূদ্র, দেশী গোয়ালা অন্ত্যজ। চাষার মধ্যে সদ্গোপ সৎশূদ্র, কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ, দুলে প্রভৃতি ছোট লোকও এই অন্ত্যজ দলের মধ্যে।

জাত্যভিমান।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ব্রাহ্মণেরা এত ঘৃণা করিলেও এই সকল জাতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে রহিল কেন? তাহার এক কারণ এই, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে আসিবামাত্র উহাদের একটু জাত্যভিমান জন্মে,

* বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে রাহুল্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, কশ্যপ ব্রাহ্মণ, কাত্যায়ন বৈশ্য ও উপলি শূদ্র ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক, সকলেই বুদ্ধদেবের নিজ শিষ্য। উপলি যদিও শূদ্র, তথাপি বুদ্ধদেবের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। যখন বুদ্ধদিগের প্রথম ধর্ম্মসভা হয়, বুদ্ধ উপলির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছিলেন, উপলিই বিনয়ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র। বিনয়-ধর্ম্ম সাধারণ লোকদিগের জন্য। বুদ্ধদেব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, শূদ্রদিগের দ্বারাই তাঁহার মত সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার জন্য এক জন শূদ্রই বিশেষ উপযুক্ত। উপলি ধর্ম্মভ্রাতা কশ্যপের সমস্ত প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর করিয়াছিলেন।

এক জন দুলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম, সেও বলিল, মুচিমুসলমান হইতে দুলে উৎকৃষ্ট জাতি; মুচি চাম কাটে, মুসলমানের ব্রাহ্মণ নাই। ব্রাহ্মণদিগের সংস্রবে উহাদের এই জাত্যভিমানটুকু জন্মিয়াছে।

কোথায় অনার্য্যদীক্ষা আরম্ভ হয়।

অনার্য্যদিগের প্রথম দীক্ষা দক্ষিণ-রাজবারায় হয়। দক্ষিণ-রাজবারায় নিষধ বলিয়া একটি রাজত্ব ছিল। নূতন যে পঞ্চম বর্ণ পুরাণে উল্লিখিত আছে, সে পঞ্চম বর্ণের নাম নিষাদ (নিষাদ ও নিষধ একই শব্দ)। তাহাতে বোধ হয়, প্রথম অনার্য্য-প্রবেশ এইখানেই ঘটে। দক্ষিণ-রাজবারায় হিন্দুদিগের প্রধান স্থান। শিব ও শক্তির উপাসনা ব্রাহ্মণেরা এইখান হইতেই প্রাপ্ত হন। কারণ, এখনও দেখা যায়, শৈবদিগের একটি প্রধান দুর্গ রাজবারা। এইরূপে আপন ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিবামাত্র হিন্দুদিগের দল বাড়িয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণদিগের উৎসব।

অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ্য যত সুবিধা, বৌদ্ধ এত নহে। ব্রাহ্মণধর্ম্মের বারোটি সংস্কার আছে। একটি ছেলে হইলে গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলের বিবাহ পর্য্যন্ত লোকে বারোবার আমোদ করিতে পারিবে এবং ঐ বারোটি সংস্কারই তাহারা সমস্ত জীবনের মধ্যে সুখের দিন বলিয়া মনে করে। বৌদ্ধদিগের এরূপ ছিল কি না সন্দেহ। শেষ বৌদ্ধদিগের মধ্যেও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু সে এক বুদ্ধের উপাসনা মাত্র—হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতা দেশভেদে ভিন্ন। যে দেশের লোক যে দেবতা চায়, সে সেই দেবতা উপাসনা করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন:—

'যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমর্হতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥'

শিবভক্ত শিব উপাসনা করিল, বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু উপাসনা করিল—অথচ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্র মান্য হইল। উপরি-উক্ত প্রবন্ধে প্রমাণ হইবে, ইতর লোককে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য বাহ্যিক যে সকল আড়ম্বর আবশ্যক, তাহাতে বৌদ্ধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য অধিক।

ভক্তিশাস্ত্র।

মতামত সম্বন্ধেও সাধারণ লোককে মোহিত করিবার পক্ষে হিন্দুদিগের প্রাধান্য ঘটিয়া উঠিল। বৈদিক সময়ে যাগযজ্ঞ স্বর্গলাভের উপায় ছিল। বুদ্ধিবিপ্লবের সময়ে জ্ঞানই হয় সাযুজ্য, নয় সালোক্য, না হয় নির্ব্বাণলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সময়ে ভক্তিমার্গ ব্রাহ্মণেরা উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। এই ভক্তি এই সময়ে হিন্দুদিগের মূলমন্ত্র হয়। ভক্তি কাহাকে বলে, শাণ্ডিল্যের প্রথম সূত্র এই—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

ঈশ্বরে অর্থাৎ যে কোন দেবতায় পরম অনুরাগই ভক্তি—সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী। পুরাণ বরাবর এই দুই সুরে গাইয়াছেন, ভক্তি ও জ্ঞান। জ্ঞান শিক্ষিতদিগের জন্য, ভক্তি অশিক্ষিতের জন্য। ভক্তিতে শুদ্ধ যে অনার্য্যগণ মোহিত হন, এমন নহে—ভক্তিতে অনেক খাঁটি বৌদ্ধও গলিয়া দেবোপাসক হইয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্র যে নাস্তিক্যনিবারণের প্রধান উপায়, তাহা শুদ্ধ যে আমরাই বলিতেছি, এমন নহে, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটককার তাঁহার আশ্চর্য্য রূপক গ্রন্থে চার্ব্বাক, মহামোহ, বৌদ্ধ প্রভৃতি যে সকল হিন্দুধর্ম্মবিরোধী পাত্র প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাদের কেবল ভয় যে, যোগিনী বিষ্ণুভক্তি তাহাদিগকে না তাড়াইতে পারে। ভক্তি গাঢ় হইয়া একবার মস্তকে প্রবেশ করিলে লোকের বুদ্ধিগুলি উচ্চতর সমালোচনায় কিরূপ অপারগ হয়, তাহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ যে উহাকে ভয় করিবে, আশ্চর্য্য কি?

বেদীতে বসিয়া ধর্ম্মপ্রচার।

হিন্দুরা প্রচারকার্য্যও ছাড়েন নাই। বৌদ্ধেরা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিত। হিন্দুরা শেষ পুরাণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। পুরাণে পাই যে, নৈমিষারণ্য বা আর কোন স্থানে পরাশর বা অন্য কোন ঋষি এই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, হিন্দুরা পরাশরাদি বৈদিক ঋষির নাম করিয়া আপনারা পুরাণপ্রচারকার্য্যে রত হন।

বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মব্যাখ্যা অপেক্ষা হিন্দুদিগের পুরাণপাঠের মোহিনী শক্তিও অবশ্য অধিক। বৌদ্ধেরা বলিলেন, দান কর—ব্রাহ্মণ বলিলেন, দান করিয়া বলিরাজার সর্ব্বস্ব গেল। শেষ আত্মদেহ পর্য্যন্ত দান করিলেন। বৌদ্ধ বলিলেন, সত্য কথা কও—ব্রাহ্মণ বলিলেন যুধিষ্ঠির একটি অর্দ্ধমিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন, এই পাপে নরকদর্শন-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন।

এই পুরাণপ্রচার আরম্ভ হইয়া অবধি অশিক্ষিতগণকে হিন্দুমতে আকর্ষণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইল।

ব্রাহ্মণ শ্রমণের কার্য্যদক্ষতা এবং অনুরাগ।

উপরি-উক্ত প্রবন্ধে বোধ হইল, সাকার উপাসনা, ভক্তিমার্গ উপদেশ ও পুরাণপ্রচার এই তিন উপায়েই ব্রাহ্মণেরা জয়ী হন। ইহার উপর আর একটি কারণও ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম চালাইবার লোক কাহারা? সংসারত্যাগী বিবাহাদিশূন্য ভিক্ষুগণ। প্রথম ধর্ম্মের প্রচারসময়ে ভিক্ষুদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। উঁহারা প্রাণপণে ধর্ম্মপ্রচার-চেষ্টায় রত ছিল। সংসারের সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল প্রাণ-পণে ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই ধর্ম্মার্থ—উৎকট যত্ন কালসহকারে নষ্ট হইল। যখন ভিক্ষুগণ রাজা রাজপুরুষগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, যখন মঠের অতুল ঐশ্বর্য্য হইল, তখন আর ধর্ম্মপ্রচার কে করে। নিয়মমত কার্য্য করিয়াই ভিক্ষুরা ক্ষান্ত থাকিত। ওদিকে ব্রাহ্মণদিগের বড় সুবিধা—তাঁহাদের ধর্ম্ম তাঁহাদের জীবনোপায়। এক জন ব্রাহ্মণ যদি একটি গ্রাম হিন্দু করিল, সে গ্রাম পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাহার থাকিবে। সুতরাং এক দিকে স্বার্থ-সাধনার্থে উৎকট পরিশ্রম, আর দিকে সম্পূর্ণ উদাসীনতা, ইহার মধ্যে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্ম উৎসন্ন হইল। ব্রাহ্মণদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইল।

শ্রমণের হীনবল হইবার আর একটি কারণ।

ভারতবর্ষ যেরূপ দেশ, ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলবান্, বৌদ্ধেরা যদি প্রাণপণে ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে এককালীন দূরীভূত করিয়া তাহার পর বিদেশে প্রচারক পাঠাইত, তাহা হইলে কি হইত, বলা যায় না। কিন্তু তাহা না করিয়া, ঘরের শত্রু বিনাশ না করিয়া, যে সকল লোক ধর্ম্মবিষয়ে উৎকট শ্রম করিয়াছে ও করিতে পারে, এমন সকল লোক বাছিয়া বাছিয়া বিদেশে পাঠাইত। প্রথম অবস্থায় তাহাতে ক্ষতি হয় নাই; যেহেতু নূতন দীক্ষিতদিগের মধ্যে সকলেই সমান উদ্যোগী। কিন্তু শেষ যাহারা কার্য্যক্ষম, তাহারাই দেশ হইতে বাহির হইতে লাগিল; ব্রাহ্মণের সুবিধা হইল। এই সকল প্রচারকেরা বিদেশে বিলক্ষণ শ্রম করিয়াছে, ইহাদিগের মধ্যেও অনেক অগষ্টিন্, স্কোয়ার্টজ্, ডফ সাহেব ছিল। ইহারা বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ তত্তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বীন সাহেবের চৈন পুস্তকের তালিকায় অনেক এদেশীয় লোক অনুবাদক ছিলেন দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মনাশের অপর কারণ।

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার যখন আরম্ভ হয়, তখন যে উঁহারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের সহিতই বিরোধ করিয়াছিল, এমন নহে। প্রথম বিপ্লবসময়ে ব্রাহ্মণবিরোধী অথচ বৌদ্ধশত্রু আর এক দল লোক ছিল। তাহারা তৈর্থিকোপাসক। আমরা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে পুরণ নামক এক জন তৈর্থিকের নাম দেখিতে পাই। প্রথম ইহারাও বৌদ্ধদিগের উন্নতিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকে। পরে যখন বৌদ্ধেরা বিধর্ম্মী বলিয়া আপনদলের অনেক লোককে বৌদ্ধসঙ্ঘ বা বৌদ্ধসমাজ হইতে দূর করিয়া দিতে লাগিল, তখন তৈর্থিকোপাসকেরা উঁহাদের সঙ্গে মিলিতে লাগিল। বৌদ্ধদিগের দুর্ব্বলতার আর একটি কারণ হইল। বৌদ্ধগণ আর এক দোষ করিতেন, তাঁহারা দলাদলি বড় ভালবাসিতেন। বুদ্ধদেব মরিবার ২০০ বৎসরের মধ্যে ১৮টা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল হয় শুনিতে পাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে যত দল হউক না, সবই উঁহাদের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে উচ্চতম অদ্বৈতবাদী হইতে জঘন্য লিঙ্গোপাসক পর্য্যন্ত এক রাজনৈতিক সূত্রে বদ্ধ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে সেটি ছিল না। "তুমি লবণ খাইবে, আমি খাইব না।" এই লইয়া উঁহাদের একবার বড় দলাদলি হয়। য়ুরোপে আজিও ঠিক এইরূপ চলিতেছে। কাথলিকেরা পোপ মানিলেই আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করেন। প্রোটেষ্টাণ্টেরা ফি হাত ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে আপন চর্চ্চ হইতে দূর করিয়া দিতেছেন। এক জন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইহাতে কাথলিকের ক্ষমতা-বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মণের ক্ষমতাও সেকালে ঠিক এইরূপে বাড়িয়াছিল।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদিগের শেষদশা অন্তর্জ্জগতে।

কনিঙ্‌হাম বলেন, সেকন্দর শাহের সময় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের তুল্য সম্মান ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেখিতে পাই, অযোধ্যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণে ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পর শ্রমণের জয় হয়। ফাহিয়নের সময় শুনিতে পাই, দুই-ই সমান; বৌদ্ধেরা যেন একটু অধিক বলবান্। হিয়ানসাঙের সময় বিহারের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? কনিঙহাম যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা তাহার

এই কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহের বলে অনেক বৌদ্ধ সংসারী হিন্দু হইয়া গিয়াছেন, যাহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিহারের পোষণ হইত, সে সকল লোক আর বিহারবাসীদিগকে ভিক্ষা দিতে সম্মত নহে। সুতরাং অনেক মঠ উঠিয়া গেল। ক্রমে যে সকল বিহারের জমীদারী প্রভৃতি ছিল, তাহাই রহিল, অবশিষ্ট উঠিয়া গেল। এই সকল বিহারে বৌদ্ধদিগের দার্শনিক মতের তর্ক-বিতর্ক হইত এবং বিদ্যাবিষয়ে তাহাদের বিশেষ খ্যাতিও ছিল। শঙ্করাচার্য্য এইরূপ মঠবাসী-দিগেরই সঙ্গে বিচার করিয়া অনেককে আত্মাবলম্বিত শুদ্ধাদ্বৈত মতে আনয়ন করেন। যেখানে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সেইখানে শঙ্করাচার্য্য-শিষ্যেরা শুদ্ধাদ্বৈতমতানুযায়ী এক প্রকার পৌত্তলিক প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। যাহা বাকি ছিল, ন্যায়শাস্ত্রের বহুল প্রচারসময়ে ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর বিচার-কালে তাহারও ধ্বংস হইল। উদয়নাচার্য্যের আত্মতত্ত্ববিবেকই বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে লিখিত শেষ গ্রন্থ। কিন্তু বোধ হয়, তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ম্মূল হয় নাই। প্রবোধচন্দ্রোদয়াদি কাব্যগ্রন্থে উহার স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, ১৫ শতাব্দীতে যে নানাপ্রকার নূতন নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, ঐ সময়ে উহার যা কিছু বাকি ছিল, তাহার শেষ স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। তাহার পর প্রায় চারি শত বৎসর আমরা উহাদের নামও শুনিতে পাই নাই। এখন আবার বৌদ্ধদিগকে সমাদর করিতে শিখিয়াছি।

বাহ্যজগতে।

অন্তর্জগতে বৌদ্ধদিগের যে আধিপত্য ছিল, তাহার কথা উক্ত হইল। বাহ্যজগতে উহাদের আধিপত্য অনেক অগ্রেই উৎসন্ন গিয়াছিল। প্রথম প্রচারসময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী রাজারা বুদ্ধকে বিস্তর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু আইন করিয়া প্রজাদিগের বুদ্ধের নিকট গমন বন্ধ করিয়া-ছিলেন। দেবদত্ত উঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘাতক পুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। শেষ দেখিতে পাই, বৌদ্ধেরাই উৎপীড়ক, কনিঙ্‌হামের এনসেণ্ট ইণ্ডিয়ায় দেখি, ৭ম শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধ রাজাই উৎপীড়ক। বৌদ্ধ কুচবেহার অঞ্চলে এক জন ব্রাহ্মণ রাজা হইয়া হিন্দুদিগের উপর দারুণ অত্যাচার করিতেছে। বুন্দেলখণ্ডের নিকটও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাতেই তাদৃশ রাজাদিগের শেষ দশা যে সন্নিকট, বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে এক জনও বৌদ্ধ রাজার নাম নাই। বৌদ্ধেরা এ দেশে না থাকুক, আমরা যদি প্রণিধান করিয়া দেখি, তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের আচার আমাদের নিত্যকর্ম্মমধ্যে নিত্যই দেখিতে পাই।

[বঙ্গদর্শন, ৫ম খণ্ড ১২৮৪ শ্রাবণ।

কলিকাতা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে

অদ্য মহানগরী কলিকাতার কতকগুলি প্রাচীন কথা পাঠকদিগকে উপহার দিব। যাহা বলিব, তাহা হয় প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি, না হয় কোন নব্য বা প্রাচীন গ্রন্থে পড়িয়াছি, নিজে তাহার সত্যতা কখন পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, সুতরাং কিছু কিছু ভুল হইবার সম্ভাবনা। কেহ সে ভুল সংশোধন করিয়া দিলে নিতান্ত বাধিত হইব। আমার এই প্রবন্ধ লিখিবার আর এক উদ্দেশ্য এই যে, দেখা দেখি আরও পাঁচ জনে যিনি যাহা জানেন লিখিবেন এবং ক্রমে কলিকাতার অনেক পুরাতন খবর বাহির হইয়া পড়িবে।

এই যে কলিকাতা নামক স্থান এক্ষণে নানা অট্টালিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছেন, "সিটি অফ পেলেসেস" নাম দিলেও যথাযথ বর্ণনা হয় না, ভাবুন দেখি দুই শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৮৭ সালে ইহার কিরূপ অবস্থা ছিল। বাগবাজার হইতে খিদিরপুর পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূভাগে তিনটি ছোট ছোট গ্রাম ছিল। যেখানে এইক্ষণে ফোর্ট উইলিয়ম বিরাজমান, সেখানে গোবিন্দপুর, লালদীঘি ও গঙ্গার মাঝখানে কলিকাতা, হাটখোলার উত্তর সমস্ত সুতানুটী। কলিকাতা বলিলে যেমন ঐ ক্ষুদ্র গ্রামটি বুঝাইত, তেমনি একটি বৃহৎ পরগণাও বুঝাইত। সুতানুটী বলিলে একটি তালুকও বুঝাইত। একটি রাস্তা দিয়া এই তিনটি গ্রামে যাওয়া যাইত। সেইটি এখন চিৎপুর রোড। প্রতি গ্রামে দুই ঘর এক ঘর করিয়া ভদ্রলোক, ঘর কত জেলিয়া, ঘর কত সোনারবেণে মাত্র বাস করিত। চিৎপুর রোডের অল্প দূরেই জলা-জঙ্গল ছিল, এমন কি, সময়ে সময়ে বাঘেরও দৌরাত্ম্য হইত। সেইরূপ গ্রাম এক্ষণে গঙ্গার ধারে প্রায়ই দেখা যায় না। কোঠা-বাড়ী এক একটা ছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু দোতলা একেবারেই ছিল না। কারণ, তখন নবাবের হুকুম ব্যতিরেকে কেহই দোতলা বাড়ী করিতে পারিত না, এবং নবাবের হুকুম আনাইতে পারে, এইরূপ লোক এ তিন গ্রামে না থাকাই সম্ভব। ইহার মধ্যে আবার শুনিয়াছি, গোবিন্দপুর নূতন পত্তন। আন্দুলের দত্ত চৌধুরী-বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি ঐ গ্রাম পত্তন করেন এবং এই হইতেই হাটখোলার দত্তদিগের উৎপত্তি হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হাটখোলার দত্তেরা হাটখোলায় আসিয়াছেন কি না সন্দেহ। সুতানুটীতে অনেক দিন হইতে একটি হাট ছিল, কিন্তু সে হাট কাহা কর্তৃক স্থাপিত, জানিবার কোন উপায় নাই। কলিকাতার নিকটে কালীঘাট বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ছিল, এবং চিৎপুরের কালীর নিকট নরবলি হইত বলিয়া বহুকাল প্রসিদ্ধ ছিল। শুনিয়াছি, ইংরাজেরা যখন প্রথম মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, তখন তাঁহারা হাটখোলার ঘাটে জাহাজ লাগাইয়া এক জন ধোবাসিয়া চাহিয়া পাঠান। হাটের লোকে ধোবাসিয়ার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ঐ হাটখোলার বসাকদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। বসাকেরা এক জন ধোবা পাঠাইয়া দেন। তদবধি ধোবারা অনেক দিন ইংরাজদের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। তদবধি সেকালে কান্ত ধোবা বলিয়া এক জন ইংরাজের অনুগ্রহে বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী ও ক্ষমতাশালী হইয়া

পূর্ব্বের কথা আমরা যতই কেন বলি না, সবই একটু ঘোর ঘোর বোধ হইবে, পরিষ্কার হইবে না। আমাদের বোধ হয়, বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্যের সূত্রপাত হইতেই সুতানুটীতে ইংরাজদিগের কিছু না কিছু কারবার ছিল, কারণ, নিজ হুগলীতে যখন ইংরাজদের খুব কারবার চলে, তখনও সুতানুটীর উপর তাঁহাদের বিলক্ষণ টান ছিল দেখা যায়। বোধ হয়, চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের যেমন বরাহনগরে ছোট-খাট একটি কুঠী ছিল, সুতানুটীতেও ইংরাজদের সেইরূপ অল্পবিস্তর কিছু কারবার ছিল। যখন মোগলের সহিত যুদ্ধে ইংরাজকে হুগলীর ব্যবসা ফেলিয়া পলায়ন করিতে হয়, তখন তাঁহারা দিন কতক চানকে ও দিন কতক সুতানুটীতে ছিলেন। যাহা হউক, ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তাঁহারা কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর এই কয়েকখানি গ্রামের জমীদারী ক্রয় করিতে অনুমতি পান এবং ঐ সময়ে তাঁহারা লালদীঘি ও গঙ্গার মধ্যে পুরান কেল্লাটি নির্ম্মাণ করেন এবং তদবধি কলিকাতায় তাঁহাদের ভরাভর হয়। তদবধি চার্ণক সাহেব কলিকাতার সংস্থাপনকর্ত্তা

এবং তাঁহার সময় হইতেই ইংরাজদের চানকের বাগান ও আলীপুরের বেলভেডিয়ার উৎপত্তি। জব চার্ণক সাহেবকে এদেশীয় লোকে অত্যন্ত ভালবাসিত, তিনি এদেশীয় একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছিলেন। কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ গোরস্থানে তাঁহার গোর অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। ১৬৯৮ সাল হইতে ১৭৫৭ পর্য্যন্ত কলিকাতার প্রথম যুগ বলিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা একটি সামান্য গ্রাম হইতে একটি নগরের আকার ধারণ করে। ফরাসীদের হাতে যেমন ফরাসডাঙ্গা, ওলন্দাজদের হাতে যেমন চুঁচুড়া, দিনামারদের হাতে যেমন শ্রীরামপুর একটি ছোট-খাট সহর, ইংরাজদের হাতেও কলিকাতা তেমনি ছোট-খাট সহর হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত চারিটি সহরেরই এই যুগের মধ্যে উৎপত্তি, তন্মধ্যে ফরাসডাঙ্গাই কিছু বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, কারণ, ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ইউরোপ হইতে এ যুগের মধ্যে কেহ আর আইসেন নাই।

এই যুগে কলিকাতায় বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী লোক আসিয়া বাস করে এবং বহুসংখ্যক অট্টালিকা নির্ম্মিত ও বাজার সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে চিৎপুর রোডের পশ্চিমে বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বাস হয়, এবং পূর্ব্বে বড় বড় বাগান প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। জলা ও জঙ্গল কাটিয়া বাগান প্রস্তুত করা বড় সহজ ছিল না, প্রায়ই জলার মধ্যস্থলে পুষ্করিণী কাটিয়া সেই মাটী চারিদিক ছড়াইয়া বাগানের জন্য জমী বাহির করিতে হইত। যে কেহ ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে দিয়া যাতায়াত করেন, তিনি দেখিতে পাইবেন যে, এখনও উক্ত রেলওয়ের উভয় পার্শ্বে এই উপায়ে জমী বাহির করা হইতেছে, কিন্তু এখন হয় বেলগাছিয়া অঞ্চলে, পূর্ব্বে হইত চিৎপুর রোডের নিকটে। এই সময়ের দুইটি বাগানের কিছু ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে:—একটির নাম হালসী বাগান ও অপরটির নাম উমীচাঁদের বাগান। হালসী বাগান গোবিন্দরাম মিত্রের বাগান, উহা ইংরাজ জমীদারীর বাহিরে, কিন্তু গোবিন্দরাম মিত্রই বহুকাল অবধি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর ব্লাক জমীদার ছিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে যখন মহারাষ্ট্রখাত খনন হয়, তখন গোবিন্দরাম মিত্রের অনুরোধে ইংরাজেরা হালসী বাগান খাতভুক্ত করিয়া লন। মহারাষ্ট্রখাত এখনও কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর সীমা। অনেকে মনে করেন, বাগবাজারের খালই বুঝি মহারাষ্ট্রখাত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বাগবাজারের খালের একটু দক্ষিণে একটি খানা আছে, সেই খানা ক্রমে ক্রমে আসিয়া সারকিউলার রোডের পূর্ব্বদিকের খানার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। এই খানা বরাবর বাগবাজারের খালের মুখ হইতে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রখাত নামে অভিহিত ছিল। মহারাষ্ট্রখাত কলিকাতার চতুর্দ্দিকে কখনই ছিল না। মহারাষ্ট্রখাত শেষ হইবার পরেই বহুবাজারের রাস্তা। ঐ রাস্তা তৎকালেও বিদ্যমান ছিল। উহা দ্বারা পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া একেবারে পুরান কেল্লায় উঠা যাইত। বহুবাজারের রাস্তার পর দক্ষিণদিকে আরও একটা খাল ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। অনেকে বলেন, তাহার কিয়দংশ বুজাইয়া ত্রিকারা নামক রাস্তা হইয়াছে। তৎকালেও চৌরঙ্গি নামক স্থান ছিল এবং সেই স্থানেই সাহেবেরা বাস করিতেন। কিন্তু সে চৌরঙ্গির সহিত এখনকার চৌরঙ্গির তুলনা হয় না। তখনকার চৌরঙ্গিতেও জলা ও জঙ্গল ছিল। তখন মহারাষ্ট্র খাতের মধ্যে অনেক জায়গায় চাষবাস হইত। এমন কি, ১৭৭৮ সালে যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস মহারাজা নবকৃষ্ণকে সুতানুটীর তালুকদারী প্রদান করেন, তখনও ঐ তালুকের মধ্যে অনেক জায়গায় চাষবাস হইত, কারণ, ঐ দলীলে চাষবাসের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

ইংরাজেরা ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তিন গ্রামের জমীদারী পাইয়া আপনাদিগের কাউন্সেলের এক জনকে জমীদার করিতেন, তিনি দুই হাজার টাকা করিয়া মাহিয়ানা পাইতেন। চারি পাঁচ মাস অন্তর জমীদার বদল হইত অর্থাৎ কাউন্সেলের সকল মেম্বারেরাই কিছুদিন করিয়া দুই হাজার টাকা মাহিয়ানা মারিতেন। তিনি কাজকর্ম্ম কিছুই করিতেন না, কখনও দুই একটা সহি করিতেন। তাঁহার অধীনে এক জন ব্লাক জমীদার থাকিতেন, তাঁহারই হাতে জমীদারীর ভার থাকিত। ব্লাক জমীদারের মাহিয়ানা ত্রিশ টাকা ছিল। কুমারটুলীর মিত্রদিগের আদিপুরুষ গোবিন্দরাম মিত্র ১৭২০ খৃঃ অব্দে ব্লাক জমীদারপদে নিযুক্ত হন, তাঁহার পূর্ব্বে ঐ পদে কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিছুদিন পরে গোবিন্দরাম মিত্রের বেতন ত্রিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা হয়, কারণ, তিনি কোম্পানীর নিকট আরজী করেন যে, ত্রিশ টাকায় ব্লাক জমীদার নামক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্ভ্রম রক্ষা করা হয় না। গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির চিৎপুর রোডের ধারে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গোবিন্দরাম

মিত্রের এক জন কর্ম্মচারী বনমালী সরকার তৎকালের এক জন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। হাটখোলার দত্ত মহাশয়েরা ধনে, মানে ও কুলমর্য্যাদায় কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সরকারী কোন কাজে কখন লিপ্ত হয়েন নাই। নকুড় ধর নামক এক ব্যক্তি এই সময়ে অসাধারণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক। ইংরাজ মহলে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন চাকরী পাইতে হইলে লোক নকুড় ধরের নিকট উমেদারী করিত। এমন কি, ১৭৪৮।৪৯ সালের প্রসিদ্ধ নবকৃষ্ণও নকুড় ধরের নিকট উমেদারী করিতেন এবং ১৭৫০ সালে নকুড় ধর তাঁহাকে হেষ্টিংস সাহেবের মুন্সী করিয়া দেন। নকুড় ধরের প্রকাণ্ড কারবার ছিল। নকুড় ধর নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র রাজা সুখময়। সুখময়ের বংশধরেরা অদ্যাপি নকুড় ধরের অতুল ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছেন। বড়বাজারের মল্লিকেরাও তৎকালে বিলক্ষণ ধনী ছিলেন। ইঁহাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় বিলক্ষণ বিস্তৃত ছিল। উল্লিখিত কয়েকটি পরিবার ভিন্ন কলিকাতায় অন্য কোন প্রসিদ্ধ পরিবারের উল্লেখ এ যুগে পাওয়া যায় না। পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-পরিবারের আদি অন্বেষণ করিয়া এ যুগে কিছু পাওয়া যায় না। যে দুই এক ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা গোবিন্দরাম মিত্রের অধীনে বাজার ইজারা লইতেন অর্থাৎ গোবিন্দরাম মিত্র অল্প টাকায় বেনামী করিয়া সমস্ত বাজারগুলি ডাকিয়া লইতেন এবং পরে বিলক্ষণ লাভ করিয়া ঐগুলি বিলি করিতেন। যে সকল লোককে বিলি করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়। তৎকালে বাজার ইজারা লওয়ায় বিলক্ষণ লাভ ছিল। বাজারে দ্রব্যাদি আসিলে জমীর চাল, ডাল, লবণ, তৈল, সকল দ্রব্যেরই উপর কর লইতেন। সুতরাং তৎকালে বাজার করায় জমীদারের বিলক্ষণ লাভ ছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইজারাদারও বিলক্ষণ লাভ করিত। কোম্পানী জমীদার হইয়া যে কয়টি বাজার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বন্দোবস্তের ভার গোবিন্দরাম মিত্রের হাতে ছিল। গোবিন্দরাম মিত্র তাহা হইতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিত। বর্ত্তমান ঠাকুর-পরিবারের স্থাপয়িতা দর্পনারায়ণ ও নীলমণি [illegible] যুগের লোক। এই সময়ে কলিকাতার বহুসংখ্যক অট্টালিকা প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে ইংরাজদিগের গবর্ণরের বাটী, কৌন্সিল বাটী, চর্চ্চ, কোর্ট হাউস প্রভৃতিই প্রধান। লালদীঘি অতি প্রাচীন পুষ্করিণী। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দ হইতে কলিকাতার তৃতীয় যুগের উৎপত্তি। এই যুগে প্রথমে রাজা নবকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব। রাজা নবকৃষ্ণ পলাশী-যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দাদাকে লিখিয়া পাঠান, দাদা, দালান দেও, এইবারেই পূজা করিতে হইবে। তিন মাসের মধ্যে দালান প্রস্তুত হইল। নবকৃষ্ণ মহাসমারোহে পূজা করিলেন, সমস্ত ইংরাজদিগের নিমন্ত্রণ হইল। কলিকাতার, এমন কি, সমস্ত ভারতবর্ষের যুগপরিবর্ত্তন হইল। এই সালে ইংরাজেরা নূতন কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে গোবিন্দপুর গ্রামটির সমস্ত লোককে উঠাইয়া দিতে হয়। গোবিন্দপুরের অধিবাসীরা এওয়াজি যে জমী পান, তাহাতে শাঁখারীটোলা, ডিঙ্গেভাঙ্গা, বহুবাজার, মঙ্গলা প্রভৃতি স্থানে লোকের বসবাস হয়। তাঁহারা যখন গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া এই সকল স্থানে বাস করেন, তখনও এখানে বাঘের ভয় বিলক্ষণ ছিল। এই সময়ে মুরশিদাবাদেরও প্রধান প্রধান লোক আসিয়া কলিকাতায় বাড়ী করেন। তাহার মধ্যে দেওয়ান দুর্লভরামের পুত্র রাজা রাজবল্লভ বাগবাজারে এবং মহারাজা নন্দকুমার, এখন যেখানে বিডন স্কোয়ার হইয়াছে, তাহার সন্নিকটে প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। মহম্মদ রেজা খাঁ কলিকাতায় আসিলে চিৎপুরে থাকিতেন, কিন্তু কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকটও তাঁহার এক প্রকাণ্ড বাটী ছিল। অতএব পলাশীযুদ্ধের পরই মুরশিদাবাদ অবসন্ন হইতে লাগিল এবং কলিকাতার জাঁক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে কোম্পানীর চাকরী করিয়া কলিকাতার লোকে খুব বড় মানুষ হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নীলমণি ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার ঘোষেরা ও জোড়াসাঁকোর সিংহেরা প্রধান। এই সময়ে পল্লীগ্রাম হইতে অনেক উদ্যমশীল ব্যক্তি বড় মানুষ হইবার আশায় কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জাহাজের কাপ্তেন ধরাই ইঁহাদের প্রধান ব্যবসায় ছিল।

কলিকাতায় যে সকল বড় বড় বাটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে কাপ্তেন ধরা ব্যবসাই দেখিতে পাওয়া যাইবে। পল্লীগ্রামের এই সকল লোক নদীর ধারে বহুদূর অগ্রসর হইয়া মুচিখোলা, ফলতা প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষা করিত। জাহাজের নিশান দেখিয়া জানিত, এ বাড়ুজ্যে মহাশয়ের জাহাজ, পিতুরী মহাশয়ের জাহাজ, এটা দত্ত মহাশয়ের জাহাজ। নূতন জাহাজ

দেখিলেই তাঁহারা তাড়াতাড়ি আক্রমণ করিতেন এবং অল্পসময়ের মধ্যেই অধিকার করিয়া লইতেন। এখন যেমন সমস্ত ব্যবসায় ইংরাজদিগের হাতে গিয়াছে, তখন এরূপ হয় নাই। অনেক দেশীয় লোকও এ ব্যবসায়ের লাভের অংশ ভোগ করিত। এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের লোকও ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আগমন করেন। যখন আমেরিকানেরা প্রথম এ দেশে আসেন, তখন তাঁহারা প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকারকে তাঁহাদের মুরুব্বী করিয়া লন। মার্কিণ দেশে ও এ দেশে এখনও অনেকে জানেন যে, রামদুলাল সরকারই ভারতবর্ষের সহিত আমেরিকা-বাণিজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। তৎকালে যে সকল সমৃদ্ধিশালী লোক কলিকাতায় বাস করিতেন, তাঁহাদের উদারতা অত্যন্ত অধিক ছিল। নবকৃষ্ণ ও রামদুলালের দানশক্তি চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা নবকৃষ্ণকে বিলক্ষণ গালি দিয়া থাকেন। বাঙ্গালীরাও নবকৃষ্ণের প্রতি তত শ্রদ্ধাবান্ নহেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ দেখিলে তাঁহাকে বিলক্ষণ উন্নতমনা বলিয়া বোধ হয়। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা খরচ করেন, কিন্তু তিনি মুসলমানদিগের মস্‌জিদ্ ও খৃষ্টানদের চার্চ্চ নির্ম্মাণেও সাহায্য করেন। পাথুরিয়াঘাটার গীর্জ্জার জমী নবকৃষ্ণের প্রদত্ত। হাতীবাগানের জমীও নবকৃষ্ণের প্রদত্ত। রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট নামক রাস্তাটি সমস্তই নবকৃষ্ণের ব্যয়ে নির্ম্মিত। পূর্ব্বযুগে যেমন নকুড় ধর ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে পরস্পর মিল করাইয়া দিতেন, এ যুগে রাজা নবকৃষ্ণ ঠিক তেমনি ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে কোন অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে নবকৃষ্ণের উমেদারী করিতে হইত নবকৃষ্ণ অনেক লোকের চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। রামবাগানের দত্তেরা নবকৃষ্ণের কেরাণীর বংশ। নবকৃষ্ণের এক পঞ্চরত্ন সভা ছিল, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাহার প্রধান রত্ন। কলিকাতার প্রাচীন তত্ত্ব বলিতে গিয়া আমরা নবকৃষ্ণের এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, নবকৃষ্ণই কলিকাতার এই তৃতীয় যুগের প্রধান ব্যক্তি। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে সুতানুটী তালুক মৌরসী দিয়া তাঁহার পদ-মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেন।

সেকালে কলিকাতায় বহুসংখ্যক কেরাণী ছিলেন। তাঁহারা কিছুই ইংরাজী জানিতেন না, ইংরাজী জানিলে তাঁহাদের কেরাণীগিরি করিতে হইত না। কেরাণী কেবল কপি করিত। আসলে যদি মাছি মরিয়া থাকিত, নকলেও তাহারা মাছি মারিয়া রাখিত, সেই অবধি মাছিমারা কেরাণী প্রসিদ্ধি জন্মিয়াছে। সেকালের লোকে কিরূপ ইংরাজী লিখিতেন, তাহার এক উদাহরণ দিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। বিশ্বম্ভর মিত্র নামে এক ব্যক্তি এক জন সাহেবের নিকট কর্ম্ম করিত। সাহেব হুগলী গিয়াছেন, সন্ধ্যার সময় ঝড়ে সাহেবের জানালার কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, বিশ্বম্ভর মিত্র লিখিতেছেন,—

Sir,

Yesterday vesper a great hurricane the valves of the window not fasten great trapidetion and palpitation and then precipetated into the precinct. God grant master long long life and many many post.

P. S. No tranquility since yalve broken. I have sent carpenter to make reunite.

পাঠকবর্গ এই ইংরাজী দেখিয়া হাসিবেন না। এখনও অনেকে Costly লিখিতে Costive লিখিয়া থাকেন। তবে সেকালের ইংরাজী দেখিয়া হাসিবার কারণ কি?

[নব্যভারত।

শিক্ষা-সন্দর্ভ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই প্রণীত

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি ? এ কথা লইয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত যে কত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে—তাহার ঠিকানা নাই। কত লোক যে কত কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার নির্ণয় হয় না। যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, যাঁহার যেরূপ শিক্ষা, যাঁহার যেরূপ সহবাস, যাঁহার যেরূপ সমাজ, তিনি সেইরূপ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত লইয়া আবার অনেকে কত বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়াছে, কত বাগ্‌-বিতণ্ডা করিয়াছে, কত রাশি রাশি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছে। যখন বৈদিক সময়ে মনুষ্যজীবনের প্রথম অবস্থা, যখন মনুষ্যপ্রকৃতির অসীম ক্ষমতা দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সর্ব্বত্র দেবতা দেখিত ও সেই দেবতাদিগের আরাধনা করিত, যখন যাগযজ্ঞ স্তবস্তুতিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ছিল, ক্রমে যখন চিন্তাশক্তি প্রবল হইতে লাগিল, যখন পৃথিবীর সুখের সঙ্গে জন্মজরামরণকৃত দুঃখ অত্যন্ত ও একান্ত মিশ্রিত বোধ হইতে লাগিল, তখন ইহকালের সুখে বিসর্জ্জন, পরলোকের শুদ্ধ চৈতন্যভাবে অবস্থান করাই (মুক্তিই) জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। যখন অসংখ্য অনার্য্যগণের মধ্যে আর্য্যজাতির সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল, তখন বংশবৃদ্ধি করিয়া পিতৃ-পিতামহের নাম রক্ষা করা জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। যখন দারুণ রৌদ্রতপ্ত আরবীয়গণ মহম্মদের মত অবলম্বন করত প্রথম সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিল—প্রথম চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল, তখন মৃত্যুর পর দিব্যাঙ্গনাসংসর্গে স্বর্গপুরে মদিরা পান করাই বিধেয় স্থির হইল। যখন পুরোহিতপদদলিত য়ুরোপ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন, তখন ধর্ম্মের জন্য পুরোহিত দিগকে অকাতরে ধনদান করাই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া সংকল্পিত হইল। ইহা অপেক্ষাও আবার যখন য়ুরোপের অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন পোপ মহাশয় ঈশ্বরের নায়েব-দাওয়ান হইয়া স্বর্গের এক প্রকার নোট (indulgeners) প্রচার করিলেন। সেই নোট ভাঙ্গাইয়া যে টাকা দিবে, তাহার জীবন ধন্য ও সেই "স্বর্গলোকে মহীয়তে" স্থিরীকৃত হইল।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থায় জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিগণিত হইয়াছে। সমাজ যখন প্রথম উন্নতির মুখে, তখন একরূপ উদ্দেশ্য, যখন উন্নতি হইতেছে, তখন একরূপ, যখন অতি উন্নতি, তখন আর একরূপ। আবার যখন সমাজ অধঃপাতে যাইতেছে, তখন আর এক প্রকার।

ন্যায়সূত্রে প্রয়োজন নামে একটি পদার্থ আছে, তাহার দুই অঙ্গ ;—মুখ্য ও গৌণ। বস্তুতঃ মনুষ্যজীবনে যা কিছু করা যায়, তাহার উদ্দেশ্যই সুখ। কিন্তু দুঃখ-নাশ ব্যতীত সুখ হয় না। এজন্য দুঃখনাশও গৌণ প্রয়োজন অবধারিত হইয়াছে। দুঃখনাশ উপায়, সুখ উদ্দেশ্য। কিন্তু সুখ কি? আবার গোলযোগ! কেহ বলিবেন, পরলোকের সুখই সুখ ; কেহ বলিবেন, ইহকালের সুখই সুখ, কেহ বলিবেন, দুঃখ ও সুখ দুই খারাপ। দুইএর নাশই ভাল। কৃপণ বলিবেন, অর্থ-সংগ্রহই সুখ, কেরাণী বলিবেন, গার্হস্থ্য সুখই সুখ, পণ্ডিত বলিবেন, লেখা-পড়ার সুখই সুখ, স্বদেশ-হিতৈষী বলিবেন, দেশের মঙ্গলেই সুখ। আবার সেইরূপ লোকের শিক্ষা, প্রকৃতি, সংসর্গ, সহবাস, জাতি, গুণে সুখের আকার ভিন্ন ভিন্ন। আমি যাহাকে দুঃখ বলি, রামা চাঁড়াল তাহাকে সুখ বলে ; আমি যাহাকে সুখ বলি, রামা চাঁড়াল তাহাকে আহাম্মকি বলে ; নবীন কেরাণী তাহাকে দারুণ কষ্ট বলে। আমি কলম চালাইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি ভাবিয়া অস্থির হইতেছি, আবার ইহাতে যদি আনন্দ না হইত, কখন এ কর্ম্ম করিতাম না, কিন্তু আমার পাশে বসিয়া এক জন বলিতেছেন, আরে ভাই, যার জীবনের যে উদ্দেশ্য, সেই তাহা বুঝিবে, তোর এত মাথাব্যথা কেন?

জীবনের উদ্দেশ্য কি বুঝিতে হইলে আগে জীবন কাহাকে বলিতেছি, তাহা জানা চাই। আমরা ধর্ম্মজীবন, নৈতিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, পারমার্থিক জীবনের কোন কথাই বলিতেছি না। আমরা মনুষ্যজীবনমাত্রের কথা কহিতেছি। মনুষ্যের জীবনটি কি? শুদ্ধ জন্ম হইলেই কি জীবন হইল? তাহা নহে। জীবন বলিতে গেলে জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত মনুষ্য যে প্রকারে বাঁচিয়া থাকে, তাহার নাম জীবন। মনুষ্যজন্মলাভ করিয়াই বহুসংখ্যক কষ্টকর ও জীবনান্তকর প্রাকৃতিক নিয়ম ও পদার্থে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। জীবন আর কিছু নহে, এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিমেষান্ত বা ব্যবহিত যুদ্ধের নাম জীবন। মনুষ্যকে কষ্ট দিবার ও মনুষ্যজীবন নাশ করিবার জন্য কতশত কারণ রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। যে বায়ু মনুষ্যের পরম বন্ধু, যাহা ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত চলে না, সেই বায়ুই কত সময় পীড়ার কারণ, কত সময়ে ঝড়রূপে সহস্র সহস্র মনুষ্যবধের কারণ হয়। যে জল নহিলে এক দণ্ড চলে না, সেই জল খারাপ হইয়া কত দেশ একেবারে জনশূন্য বিজন অরণ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছে। কত দেশ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। এ সকল ত উপকারী জিনিসে অপকার করিতেছে, কত কত জন্তু আছে, মনুষ্যের জীবন অপহরণই তাহাদের উদ্দেশ্য, কত কত বিষাক্ত দ্রব্য আছে, তাহার সম্পর্কে জীবন নষ্ট হয়। কত কত পদার্থ আছে, যাহাতে জীবন একেবারে নষ্ট না হউক, ক্রমে মনুষ্যের শরীর ও মন অবসন্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া আসে। স্বভাবের নিয়মে এমন অনেক মনোবৃত্তি অপর ব্যবহার জন্মাইয়া দেয়, যাহাতে নিঃশব্দে অথচ নির্ব্বিরোধে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে। এমন বিষ আছে, যাহা একবার খাইলে যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হয়। নির্ব্বোধ চিন্তাশক্তিশূন্য সদসৎ-বিবেকরহিত এমন অনেক পশুবৎ মনুষ্য আছে, যাহাদের সহিত একবার সংসর্গ হইলে যখনই তাহাদের কথা মনে হয়, তখনই মনে মনে কষ্ট হয়—ঘৃণা হয়। এই সকল অপকারী দুঃখদায়ক কারণপরম্পরার সঙ্গে অনবরত রণ করিয়া জয়ী হইয়া স্বচ্ছন্দে অক্লেশে দীর্ঘ পৃথিবীতে থাকার নাম জীবন। এরূপ যুদ্ধে যে সর্ব্বত্র মনুষ্য জয়ী হইতে পারিবে, এমত নহে। অনেক সময়ে এমন করিয়া চলিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার দুঃখকর সামগ্রী কোনরূপ অপকার করিয়া উঠিতে না পারে। অনেক সময়ে উহাদের হস্ত হইতে পলাইয়া পরিত্রাণ পাইতে হয়। উদাহরণ—প্রতি বৎসর ৫.৬ বার করিয়া ঋতু-পরিবর্ত্তন হয়, প্রতি ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার আহার, বিভিন্ন প্রকার পরিধেয়, বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার প্রয়োজন। ঋতু, তুমি পরিবর্ত্তন করিও না, বলিয়া রাখিবার ক্ষমতা মনুষ্যের আজিও হয় নাই, সুতরাং বিধিমতে চেষ্টা করা উচিত যে, এই দুঃখদায়ক পরিবর্ত্তন কোন ক্ষতি করিতে না পারে। এইরূপ নানাপ্রকার দুঃখকর যন্ত্রণাময় কষ্টসঙ্কুল অবস্থায় আপনাকে এমন করিয়া চালাইতে হইবে যে, কোনরূপ কষ্ট না হয়। এই প্রকারে সুন্দররূপে আপনাকে চালানর নাম জীবন। রোগ-শোক প্রভৃতি যত কিছু মনুষ্যের কষ্ট আছে, সে সকলই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চলিতে না পারার দোষ। এতক্ষণ যে আমরা কেবল বাহ্যজগতের অবস্থার সঙ্গেই মিলাইয়া বলিতেছি, এমন নহে। অন্তর্জ্জগতের অবস্থার সঙ্গেও মিলাইয়া চলিতে হইবে। মনুষ্য স্বজাতিসংসর্গ ভিন্ন চলিতে পারে না। কিন্তু যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয় বায়ুও অনেক স্থলে জীবননাশক হয়, সেইরূপ মনুষ্যের সংসর্গও সময়ে সময়ে সর্ব্বনাশের হেতু হয়। যে মানুষ আপনাকে পূর্ব্বোক্তরূপে চালাইতে না পারে, সে মানুষ খারাপ হইয়া যায়, তাহার সংসর্গে লোকের

অনেক দোষ জন্মায়। সে যেমন বইয়া গিয়াছে, অন্য লোকও তাহার সঙ্গে থাকিলে তেমনি বইয়া যায়। অতএব দূষিত বায়ু যেমন পরিহার্য্য, দূষিত মনুষ্যও সর্ব্বতোভাবে পরিহরণীয়। এইরূপে শরীরস্থিত ও অন্তর্জ্জগৎ এবং বহির্জ্জগৎস্থিত কার্য্যকারণপরম্পরায় যে সকল বিরোধ আছে, সেই সকল বিরোধের কোথাও প্রতিবিধান করিয়া, কোথাও হস্ত এড়াইয়া সকল অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের নাম জীবন। অনেকে বলিবেন, তবে স্বার্থপরতাই জীবন। তাহার উত্তর এই যে, জীবনটুকু নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থপরতাটুকু যে শুধু আমরাই আজি জাহির করিতেছি, এমন নহে, শত শত বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় মনুও বলিয়াছেন:—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

তাঁহার মতে আপনার প্রিয়ও একটি প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু কোন্‌টি আপনার প্রিয়, সেটি বাছিয়া লইতে অনেক কষ্ট হয়, তাহার জন্য উত্তম শিক্ষা আবশ্যক, না হ'লে এক জন অশিক্ষিত লোক আজি আপনার প্রিয় বলিয়া এক কাজ করিয়া বসিল, কালি তাহা তাহার ঘোরতর অপ্রিয় হইল, সে হয় ত ইহজন্মের মত মাটী হইল। কিন্তু শিক্ষিত লোকে চক্ষে আপনার প্রিয় কি, পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিরোধের হাত হইতে উদ্ধারের নামই সেই প্রিয় বস্তু।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নিরন্তর বিরোধী যেখানে, সেখানে সকলেই যে সে সমস্ত বিরোধের হাত হইতে উদ্ধার হইবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। অনেকে দুই এক জায়গায় প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অনেকে বাহ্যজগতের প্রাতিকূল্যের সহিত বিরোধ করিয়া রোগগ্রস্ত হইলেন, অনেকে অন্যান্য সাংসারিক সামাজিক অনেক কারণে যে ভাবে আপনাকে চালান উচিত, সে ভাবে আপনাকে চালাইতে পারিলেন না। তবে তাঁহার জীবন কি জীবন বলিয়া পরিগণিত হইবে না? অবশ্য হইবে। তাঁহারা যদি সেই অবধি সামলাইয়া বরাবর ভাল করিয়া চলিতে পারেন, তাঁহাদের জীবনও জীবন; আর না পারেন, তাঁহাদের দুঃখে শৃগাল-কুকুর রোদন করে; তিনি বাঁচিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে জীবন্মৃত, তাঁহার বাঁচিয়া সুখ নাই। তিনি নিজেও ভাবেন-

"দুঃখসংবেদনায়ৈব ময়ি চৈতন্যমাহিতম্।"

আর তাঁহার নিকটস্থ লোকদিগকে শিক্ষা দেন যে, জগৎ দুঃখময় ইত্যাদি। তাদৃশ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুকম্পা প্রদর্শন উচিত কি না, সে বিষয়ে খুব সন্দেহ। আবার যাঁহারা একবার দুষ্কর্ম্ম করিয়া পরে শোধরাইয়া গেলেন, তাঁহারাই কি—যাঁহারা কখন নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই, তাঁহাদের মত হইতে পারেন? কখনই না। জীবনের ঐ এক দুর্ঘটনার স্মৃতি চিরদিন তাঁহাদের মনে মনে না হয়, শরীরে গাঁথা থাকে, তাহাতে তাঁহাদের শরীর ও মনের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হইতে দেয় না।

যাহারা পূর্ব্বোক্ত বিরোধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া রীতিমত আপনাকে চালাইতে পারে, তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে, শরীর বলিষ্ঠ সুন্দর কর্ম্মক্ষম তেজস্বী হয়, তাহাদের মনোবৃত্তি সকলও পরিবর্দ্ধিত হয়। শুদ্ধ বুদ্ধি শক্তি, শুদ্ধ হৃদয়বৃত্তি, শুদ্ধ কর্ম্মক্ষমতার উন্নতি হইয়া নিবৃত্ত হয় না, সকল প্রকার মনোবৃত্তিই তাহাদের পরিপুষ্ট হয়। তাহাদের দ্বারা জগতের অনেক কাজ হয়; তাহারাই সমাজের শক্তি। সুস্থ শরীরে সবল মন থাকাই অনেকে মনুষ্যজীবনের প্রধান সুখ মনে করেন। তাহা নহে। সেটি সম্যক্ পরিপুষ্ট ও উন্নত মনুষ্যজীবন মাত্র, মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সুস্থ শরীর ও সবল মন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র। তাহা উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি, দেখা যাউক।

মনুষ্য যখন জন্মগ্রহণ করিল, তখন তাহার মত নিঃসহায় অকর্ম্মণ্য জানোয়ার আর নাই। এক বৎসর যাবে কথা ফুটিতে, দুই বৎসরে হাঁটিতে শিখিবে, তার পর কত কি শিখিলে পরে তবে সে আপনার আহার সঞ্চয় করিবার মত শক্তি পাইয়া স্বাধীন হইবে। এইরূপে স্বাধীন হইতে মনুষ্যের ২১ বৎসর লাগে। এই ২১ বৎসর পর্য্যন্ত সমাজ তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, তাহার যত্ন করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিল, তবে ত সে স্বাধীন হইয়া নিজে খুঁটিয়া খাইতে শিখিল। যদি বল, সমাজ খাইতে দিল কৈ, দিল তার বাপ-মা। সত্য, কিন্তু বাপ-মাই খাইতে দেয় কেন? সেও সমাজের নিয়ম বলিয়া ত? প্রাচীন রোমে অনেক বাপ-মা ছেলে হইবামাত্র রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া আসিত, আরও কত জায়গায় যে ছেলে ফেলিয়া দিবার প্রথা ছিল, তাহার ঠিকানা নাই। ক্রমে সমাজবন্ধন যত দৃঢ় হইতে লাগিল, ততই সন্তান-প্রতিপালন পিতামাতার অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। তাহার

পর অনেক পিতামাতা সন্তান প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারেন না, অনেক জায়গায় পিতামাতা বালকের বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন, সর্ব্বত্রই ত সমাজ যে কোনরূপে ছেলেগুলিকে বাঁচাইয়া রাখে, কোন ছেলে পরের দয়ার উপর নির্ভর করে, কেহ দীর্ঘকাল শিক্ষানবীশ থাকে। যেরূপেই হউক, পিতামাতাই হউক, আত্মীয় বন্ধুই হউক, উদাসীনই হউক, সুনিয়মবদ্ধ দানপ্রণালীই হউক—সবই সমাজবন্ধনের হেতুই হইয়া থাকে। সমাজবন্ধন না থাকিলে শতকরা নিরনব্বই জন ছেলে মারা যাইত।

অতএব যখন সাতাইশ বৎসর বয়সে মনুষ্য স্বাধীন হইয়া নিজের উপার্জ্জনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তখন তাহার দেনা অগাধ। এখন হইতে সে যদি শুদ্ধ আপনার মত রোজগার করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তবে সে মহা পাতকী, জুয়াচোর, কারণ, সে দেনা শোধ দিবার কোন উপায় করে না। আবার অনেকে আছেন, তাঁহারা একেবারে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের কোন উপায়ই করেন না। তাঁহারা সমাজের পরম শত্রু, তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফাঁসি দেওয়াই কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহারা অন্য লোকের ন্যায্য উপার্জ্জনের কড়ি লইয়া অনর্থক নষ্ট করেন, কারণ, যে নিজে রোজগার করিবে না, তাহার জীবনধারণ অনর্থক। ডাকাইত, জুয়ারি আর ভিক্ষুক এই তিন জন শেষোক্ত প্রকারের লোক। যাঁহারা আপন ক্ষমতাতীত দেনা করেন; পরের টাকা লইয়া দাঁও মারা ব্যবসায় ও বাবুগিরি করেন, তাঁহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। অতএব যাঁহারা শুদ্ধ নিজের মত রোজগার করিয়া ক্ষান্ত হন ও যাঁহারা রোজগার না করেন, তাঁহারা আপনাদেরও কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ, তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দেনা শোধ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন ও দেন, তাঁহারা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্যক্ সাধন করেন। কিন্তু শুদ্ধ কর্ত্তব্যকর্ম্মসাধনই ত জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তাহার উপর আরও কিছু করিতে হইবে।

এখানে এক প্রশ্ন হইতে পারে—সমাজের দেনা কিরূপে শোধ দেওয়া যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, সমাজের উপকার কর। তোমার নিজের সন্তান-সন্ততির সুন্দররূপে প্রতিপালন কর; তাহাদের উত্তমরূপে শিক্ষা দাও, সমাজের যখন প্রয়োজন হইবে, তখন তাহার জন্য অর্থ, সামর্থ্য ও প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইও না। যাহাতে সমাজের উপকার হয়, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা কর; এইরূপেই সমাজের দেনা শোধ হইবে।

কিন্তু মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্যসাধন শুদ্ধ এই হইলেই হইবে না, বৃদ্ধ অবস্থায় খতাইয়া দেখ, যদি তোমার দেনা থাকে, তবে তুমি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধন করিতে পার নাই। যদি ঠিক ঠিক হয়, তুমি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছ মাত্র; কিন্তু যদি তোমার হিসাবে বেশী থাকে, তবে তোমার জীবন সার্থক। যত বেশী থাকিবে, ততই তোমার বাহবা। নিজে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পার, পরিশ্রমের দ্বারা পার, ধন দ্বারা পার, কর্ত্তব্য যাহা আছে, তাহার অপেক্ষা সমাজের অধিক উপকার করিলেই তোমার মনুষ্য-জীবন সার্থক।

সেকালে এক গল্প শুনিয়াছি, এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল। তাহার বেতন লক্ষ টাকা। তাহাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিবর, তোমার এত টাকার কি দরকার?" সে বলিল, "মহারাজ, ইহার চৌথ শোধ দিতে হয়, চৌথ ধার দিতে হয়, চৌথ আহার করা যায়, আর চৌথ অসময়ের জন্য সংগ্রহ করি।" মন্ত্রিবর ঠিক বলিয়াছিলেন। যে লোক ধার শোধ দিয়া ও ধার দিয়া যাইতে পারে, সেই ধন্য। মনুষ্য-জীবনের দেনা যে যাহার নিকট হইতে লইয়াছি, তাহাকেই শোধ দিতে হইবে, তাহা নহে। লইলাম সমাজের নিকট, দিলাম সমাজকে; পিতামাতার খাইয়া মানুষ হইলাম, মানুষ করিলাম সন্তানকে। দাতার খাইয়া মানুষ হইলাম, দিলাম অনাথকে। দরিদ্রালয় হইতে মানুষ হইলাম, স্থাপন করিলাম বিদ্যালয়। গুরুর নিকট উপদেশ পাইলাম, শিক্ষা দিলাম ছাত্রকে। গ্রন্থকারের নিকট উপদেশ পাইলাম, নিজে গ্রন্থপাঠ করিয়া রচনা করিয়া তাহার ঋণ শোধ দিলাম। কিন্তু সর্ব্বত্র চেষ্টা করা উচিত—যাহা পাইয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিক দেওয়া। পৈতৃক সম্পত্তি কাহারও নয়, সমাজের নিয়মে আমি তাহা পাইলাম। সমাজ আমায় দেওয়াইয়া দিল, আমি সমাজের নিকট ঋণী। আমি যদি সেই টাকা তিন দিনে ফুঁকিয়া দেই, তবে আমি পাপী, আমি সমাজের সর্ব্বপ্রকার দণ্ডের যোগ্য। যদি তাহা কোনরূপে সঞ্চিয়া বঞ্চিয়া রাখিয়া যাই, তবে আমার মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আমি শুদ্ধ পাকা দ্বারবানের কাজ করিলাম বটে, কিন্তু যদি সেই টাকা লইয়া খাটাই, তাহাতে সহস্র লোকের জীবন নির্ব্বাহ হইয়া আবার আমার টাকা বাড়িয়া যায়, তবে আমি

সার্থকজন্মা। আমি যখন পৈতৃক সম্পত্তি বিনা পরিশ্রমে পাইয়াছি, তখন আমি, যে না পাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা সমাজের নিকট অধিক ঋণী। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য আমার তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম, চেষ্টা ও যত্ন করা একান্ত উচিত। যিনি স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি অধিক পাইয়াছেন, তাঁহার একটা মস্ত সুবিধা বিনা পরিশ্রমে পাওয়া হইয়াছে, তাঁহার উচিত সেই পরিমাণে সংসারের উন্নতির চেষ্টা করা। যে বালক অনেক সুবিধায় উত্তমরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট সমাজ অনেক আশা করে। যে হেতু সমাজে তাঁহার চারিদিক হইতে সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, খতাইয়া যে অল্প বা অধিক স্থির করিতে হইবে, তাহার উপায় কি? কোনরূপ তুলাদণ্ড ত নাই, যাহাতে কার কাজ বেশী হইল, কার কম হইল, তা জানা যাবে। তাহার নিখতি নাই, সের-বাটখারা নাই, ওজন নাই, মাপ নাই; টাকায় তাহার মূল্য করা যায় না যে, জানিলাম ৫০০ টাকা ধার আর এই ১০০০ টাকা জমা, ধার শোধ দিয়াও ৫০০ টাকা অধিক থাকিবে। কিন্তু মন তাহার সের-বাটখারা লইয়া বসিয়া আছে; আপনার মনে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, সেই তাহার মাপ। আর এক মাপ যশঃ; বাহিরের লোকে তোমায় ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছে, তাহারা তোমার কাছে থেকে যতটুক আশা করে, তাহা অপেক্ষা তুমি যদি অধিক করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই তাহারা তোমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব যশঃ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নহে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তাহার পরিমাপক মাত্র যাহারা সমস্ত জীবন কেবল কিসে লোক ভাল বলিবে, এই ভাবনায় অস্থির, কেবল লোককে খুসী করিবার চেষ্টায় ফিরে, তাহাদের যদি সার না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত উদ্যম বৃথা, তাহারা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হয় মাত্র। যাহাদের সার আছে, তাহাদের যশঃ সুখ্যাতি বাঁধা। যাহারা যশকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে, তাহারা সের-বাটখারাকে মাপ বলিয়া কিনিয়া লয়।

অনেকে মনে করেন, বিদ্যা জীবনের উদ্দেশ্য, আত্মোন্নতি জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের দেশে প্রথা ছিল যে, বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে দান করিবে, তাহাদের সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ দিবে। কিন্তু বিদ্যা যদি খরচ না হইয়া শুদ্ধ পেটে গজগজ করে, তবে বিদ্যায় কাজ কি? যদি সেই বিদ্যা দ্বারা তুমি আপন দেনা শোধ দিয়া সমাজকে কিছু ঋণ দিয়া যাইতে পার, তবে ত জানি তোমার জীবন সার্থক, নচেৎ তোমার পেটে বাক্স পোরা থাকিলেও তুমি যদি কেবল-আপনার পেট চলিলেই খুসী থাক, তবে তোমার বিদ্যার মুখে আগুন।

তাহাই বলিতেছি যে, বিদ্যা, যশঃ, ধন, মান, পরোপকার এ সকল অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ হইলেও ইহার কোনটিই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নিজের শরীর-মনের উন্নতি হইয়া, নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর বিদ্যা দ্বারা হউক, বুদ্ধি দ্বারা হউক, ধন দ্বারা হউক, পরিশ্রম দ্বারা হউক, সমাজকে কিঞ্চিৎ ঋণী করিয়া যাইতে পারিলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। নচেৎ শুদ্ধ বিদ্যা লইয়া, ধন লইয়া শক্তি লইয়া, স্বাস্থ্য লইয়া ধুইয়া খাইলে কিছুই হইবে না।

[বঙ্গদর্শন ১২৮৫ ফাল্গুন সংখ্যা।

শিক্ষা

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নামক প্রস্তাবে দেখান হইয়াছিল যে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর মনুষ্য সাতাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সমাজের নিকট ধার করিয়া খায়, তাহার পর এই ধার শোধ দেওয়া মনুষ্যের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়। এই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যদি সমাজের আরও কিছু উপকার করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ধার করিয়া যাহা খাইয়াছ, তাহা ত শোধ দিবেই ; শোধ দেওয়ার উপর আরও কিছু বাড়তি করা চাই।

যে সাতাইশ বৎসর আমরা ধার করিয়া খাই, সেই আমাদের শিক্ষার সময় ও দেহপুষ্টির সময়। আমরা প্রতিভাশালী লোকের পক্ষে এ কথা বলিতেছি না। প্রতিভাশালী বা জিনিয়স বলিয়া এক জন লোক আছেন, আমরা স্বীকার করি। ইঁহাদের শরীরপুষ্টি না হইতে পারে, ইঁহাদের সকল মনোবৃত্তি সম্যক্ পরিচালিত না হইতে পারে, তথাপি ইঁহারা জগতের অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারেন। শরীর অসুস্থ, মেজাজ খিটখিটে, কুক্রিয়াসক্ত, অথচ তাঁহারা পৃথিবীতে অনেক বড় বড় কাজ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ প্রস্তাবে তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। প্রতিভাশালী লোক-দিগকে আমরা ভক্তি করি, ভয়ও করি। তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা মনুষ্য সমাজের উপকার হয় বলিয়া ভক্তি করি। তাঁহারা নিজে নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বড় বড় কাজ করিতে পারেন বলিয়া বিস্মিত হই ; কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্তে জগতের অনেক অনিষ্ট হয় বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে বড় ভয় করি। জিনিয়স দূর হইতে ভাল, কিন্তু নিকটে অতি ভয়ানক, তাঁহা-দের দৃষ্টান্তে অনেকের ক্ষতি হয়। অতএব আমরা এ প্রস্তাবে জিনিয়সের নামও করিব না, যাহা মনুষ্যসাধারণের পক্ষে খাটে, এইরূপ কথাই কহিব।

সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে শরীরটি সবল সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহার পর মনোবৃত্তিগুলিরও পুষ্টিসাধন প্রয়োজন। মনুষ্যের মনোবৃত্তি তিন প্রকারের ;— বুদ্ধিশক্তি, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মক্ষমতা। এই তিনেরই সাতাইশ বৎসরের মধ্যে পরিচালনা চাহি। মনুষ্য পৃথিবীতে পড়িয়া আপনার শিক্ষাবস্থা অতিক্রম করিয়া যাহাতে সকল দিকে চক্ষু রাখিতে পারে, সকল জিনিস বুঝিতে পারে, সকল প্রকার লোকের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে, ও সকল প্রকার কার্য্য করিতে পারে, তাহার শিক্ষা এই সাতাইশ বৎসর বয়সের মধ্যে হওয়া চাই। শিক্ষা একমুখী হওয়া কিছু নহে, উহা বিশ্বতোমুখী হওয়া চাই। আমাদের দেশে প্রাচীন-কালে ব্রাহ্মণেরা বামনাই শিক্ষা পাইত, ক্ষত্রিয়েরা রাজাই ও লড়াই শিক্ষা পাইত, ছুতোর ছুতোর্দ্দি শিখিত। এক সময়ে য়ুরোপেও ঠিক এইরূপ ছিল। এরূপ একমুখী শিক্ষার নিশ্চয় ফল অধীনতা, নির্ব্বুদ্ধিতা। একমুখী শিক্ষায় মানুষ তৈয়ারী হয় না, কল তৈয়ারী হয়। যে কোন লোকের চারি-দিকে নজর থাকে, একমুখগণ সকলেই তাহার অধীন আপনা হইতেই হইয়া পড়ে। অতএব যাহাতে সকল দিকে নজর জন্মে, তাহার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। স্বীকার করি যে, মানুষের পক্ষে সকল বিষয় জানা নিতান্ত অসাধ্য, সকল কাজ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সকল বিষয়ে সুরুচি থাকা ও সকলের সহিত সমবেদনা থাকা একান্ত অসম্ভব। স্বীকার করি, মানুষের জ্ঞান, ইচ্ছা ও হৃদয়বৃত্তি সকল চারিদিকে সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির নিয়মসমূহ লৌহময় বেড়া দিয়া মনুষ্যকে বলিতেছে, তুমি এই পর্য্যন্ত যাইও, ইহার অধিক যাইবার ক্ষমতা তোমার নাই। এ সকল স্বীকার করি, তথাপি যতটুকু মনুষ্যে জানিতে পারে, ততটুকু জানা ত প্রয়োজন। ততটুকু জানিতে যে কয়টি মনোবৃত্তি সতেজ ও সবল থাকা প্রয়োজন, সে কয়টিকে ত সতেজ ও সবল রাখা চাই। এইটি শিক্ষার কার্য্য, এইটি শিক্ষার ভার, এইটির জন্য সমাজ দায়ী।

শরীর ও মনের যেরূপ নিকট-সম্বন্ধ, তাহাতে শরীরের উন্নতির প্রতি সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা উচিত। মনুষ্যের শরীরও কলের মত। অধিক দিন শরীর না চলিলে ইহাতেও মরিচা ধরে, এবং অধিক বলে অধিক খাটাইলে ইহারও কল বিগড়াইয়া যায়, ঠিক সময়ে দম দিলে যেমন ঘড়ি অনেক দিন চলে, সেইরূপ নিয়মিত শ্রমেও মনুষ্যশরীর অনেক দিন টিকে। যে কয়েক বৎসর পুত্রের ভরণ-পোষণ করিতে হয়, সেই কয়েক বৎসরে যাহাতে পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে পরি-পুষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে পিতামাতার বিশেষ যত্ন থাকে,— অন্ততঃ সে বিষয়ে ইচ্ছা থাকে। কিন্তু অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অথবা উদ্যোগ অভাবে অনেকে সন্তানের দেহপুষ্টি-সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটান। কেহ কেহ কেবল স্নেহপরবশ হইয়া তৎপক্ষে অনিষ্ট ঘটান। দৌড়িও না, পড়িয়া যাবে, শ্রম করিও না, ক্লান্ত হবে, এ সকল স্নেহবাক্য কতদূর অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে, তাহার সমালোচনা এক্ষণে আমরা করিব না। মূল কথা, শরীর পুষ্ট করা যে আবশ্যক, তাহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। এই পুষ্টি শব্দে যে শুদ্ধ হস্তের বা শুদ্ধ পদের

পুষ্টতা নয়, সে বিষয়েও বোধ হয় কাহারও অমত নাই। যে সকল লক্ষ্মীছাড়া লোক পুত্রের ভরণ-পোষণ ও পুষ্টিবর্দ্ধন বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া মালথসের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা ভিন্ন সকলেই পুত্রের শরীরপুষ্টি বিষয়ে মনোযোগী আছেন।

কিন্তু মানসিক পুষ্টি বিষয়ে এরূপ একমত নাই। কোন জাতি ধর্ম্মশিক্ষাদানই পিতামাতার কর্ত্তব্য মনে করেন। কোন জাতি পুত্র যাহাতে অন্ন করিয়া খাইয়া শীঘ্র পিতাকে অব্যাহতি দিতে পারে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াই পিতার কর্ত্তব্য মনে করেন। কিন্তু আমরা বলি, যেমন শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি প্রয়োজন, মনেরও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি বাঞ্ছনীয়। শরীরের পক্ষে যেমন যাহার সর্ব্বশরীর সবল নহে, সে ভাল বেহারা হইতে পারে না, ভাল মুটিয়া হইতে পারে না, ভাল দাঁড়ী হইতে পারে না, ভাল বাঁকী হইতে পারে না, মনের পক্ষেও সেইরূপ ; যাহার মনোবৃত্তি-সমূহ সম্যক্ পুষ্ট নহে, সে কখন ভাল উকীল হইতে পারে না, ভাল ডাক্তার হইতে পারে না, ভাল কবি হইতে পারে না, খুব উত্তমরূপে কোন কাজই করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যাহার দেহ খুব পুষ্ট নয়, সে কি বাঁকী দাঁড়ী হইতে পারে না? অবশ্যই পারে, কিন্তু তাহার ভাল হইবার সম্ভাবনা বড় অল্প থাকে। সেইরূপ যাহার মন সম্যক্ পুষ্ট নহে, সে কি উকীল, ডাক্তার, কবি হইতে পারে না? অবশ্য পারে, কিন্তু ভাল হইবার সম্ভাবনা অল্প। এক জন জোয়ান লোক ভাল বাঁকী হইয়াও যদি দরকার পড়ে, সে অতি অল্পদিনের মধ্যে দাঁড়ীর কাজ, বেহারার কাজ বা যোগাড়ের কাজ অনায়াসে শিখিয়া লইতে পারে। কিন্তু এক জন রোগা বাঁকী তাহা কখনই পারে না। তাহার বাঁকী হইবার মত শরীর বনিয়া গিয়াছে, তাহার আর কিছু হইবার যো নাই। আর কিছু হইতে গেলে যে পদার্থটুকু থাকা চাই, সেটুকু তাহার জন্মে নাই। বহির্জ্জগতে যেরূপ—অন্তর্জ্জগতেও ঠিক সেইরূপ। যাহার শিক্ষা বিশ্বতোমুখী, তাহার কোন একটি বিষয়ে ক্ষমতা অধিক হইলেও সে সকল কাজই মোটামুটি করিতে পারে। সংসার করিতে গেলে সকল কাজই যে মোটামুটি করা চাই বা জানা চাই, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। স্বাবলম্বন উন্নতির মূল। ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। সকল কাজ মোটামুটি করিতে শিখিলে স্বাবলম্বন প্রবৃত্তির প্রকৃত উন্নতি করা হয়। আর এক কথা এই, অতি প্রাচীনকালে পণ্ডিত হইলেই লোকে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিত। সর্ব্বজ্ঞ ও অভ্রান্ত এক কথা নহে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ শব্দের অর্থ যতদূর বাড়ান যাইতে পারে, অধুনাতন ভট্টাচার্য্যেরা বাড়াইয়া উহাকে অভ্রান্ত সমপর্য্যায়ক করিয়া তুলিয়াছেন। ঋষিরা বা পণ্ডিতেরা যে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রথিত হইতেন, ইহার কারণ কি? শুদ্ধ ঋষিরাই বা কেন, আরিষ্টটল প্রভৃতিও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ইহার কারণ, তাঁহারা যে সমাজে বাস করিতেন, সে সমাজে সাধারণ লোকের মন অপুষ্ট ছিল, আর তাঁহাদের মন সম্যক্ পুষ্ট ছিল অর্থাৎ মোটামুটি অনেক বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল, সুতরাং সামান্য লোকে আপনার সঙ্গে তুলনা করিয়া (তুলনার অমন সামগ্রী আর নাই) উঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিকও যখন সমাজের অভাব অল্প থাকে, সমাজের সেই প্রথম অবস্থায় দুই পাঁচ জন লোক পুষ্টমনা থাকেন, তাঁহাদের দ্বারাই সামান্য সামান্য সমস্ত অভাবপূরণ হয়, সুতরাং সামান্য অভাবপূরণের জন্য মোটামুটি জ্ঞানে চলিত। এখনও সেইরূপ গৃহস্থের সামান্য সামান্য অভাবের জন্য গৃহপতির নিজের মোটামুটি সব জিনিস জানা চাই।

আর এক কথা। পুষ্টমনা ব্যক্তিগণের মধ্যে একমুখী শিক্ষা আরম্ভ হইলে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, কিন্তু প্রথম নানা বিষয়ের শিক্ষা আবশ্যক ; তাহার উপর একমুখী শিক্ষা হইলে উপকার হয়, নতুবা একমুখী শিক্ষা অনিষ্টকরী। তাঁতির একমুখী শিক্ষা, এই জন্য তাহারা সংসারযাত্রায় এত অপটু যে, তাহারা উপহাসের স্থল হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব আগে মোটামুটি শিক্ষা, তার পর এই বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন। আগে সব জিনিসের কিছু কিছু, তাহার পর এক বিষয়ের সবটা। এ বিষয়ে আর একটি কথা আছে। মানুষ জন্মিয়া উকীল হয়, উকীল হইয়া কেহ জন্মে না। সুতরাং আগে মানুষের শিক্ষা, তাহার পর উকীলের শিক্ষা। মানুষের শিক্ষা অর্থে শরীর ও মনের সম্যক্ পুষ্টি, সকল বিষয়ে চিন্তা করিবার ও হাত দিবার শক্তি। তাহার পর কোন একটা জিনিস সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা।

মানুষের মনকে যদি একটি পায়রার ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষায় উহার সকল দ্বার মুক্ত করিয়া রাখে। এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চক্ষু উন্মীলন করিলেই কত বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে জ্ঞানলাভ করা যায় ; কিন্তু যাহার মনের সকল দ্বারগুলি খোলা নাই, যাহার মনোবৃত্তিসমূহ সম্যক্ পুষ্ট নহে, তাহার

পক্ষে সমস্তই অন্ধকার। পরন্তু, যাহার সেই দ্বারগুলি খোলা, সে যে দিবানিশি জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পারে, তাহাই নহে, সে উহার ব্যবহারও করিতে পারে। মনে কর, খোপগুলি খোলা। একটির নাম ব্যাকরণ, একটির নাম সাহিত্য, একটির নাম অলঙ্কার, একটির নাম বিজ্ঞান, একটির নাম হীট, একটির নাম লাইট ইত্যাদি। যখন যে জিনিসটি দেখিল, সে তাহাকে তাহার আপন খোপে রাখিয়া দিল; সুতরাং দরকার হইলে তাহাকে আর হাত বাড়াইতে হইল না। সে যেমন অনেক অধিক জিনিস দেখিতে পায়, তেমনি সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া সাজাইতে পারে এবং দরকারমত ব্যবহার করিতে পারে।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা থাকিলে প্রায়ই লোক চিন্তাই করিতে পারে, ভাবিতেই পারে, কাজ করিতে পারে না। তাহারই জন্য আমরা বলিতেছি, সর্ব্বতোমুখী ও একমুখী দুই প্রকার শিক্ষারই প্রয়োজন। জ্ঞান চারিদিক হইতে আসিবে, এক বা দুই দিক দিয়া বাহির হইবে। নচেৎ সে জ্ঞানে জ্ঞানবানের লাভ হইতে পারে, সমাজের লাভ নাই। উভয়প্রকার শিক্ষা হইলে মনকে লাটিমের সহিত তুলনা করা যায়। লাটিমের কাষ্ঠময় ভাগ সর্ব্বতোমুখী বিদ্যা ও লৌহময় ভাগ একমুখী বিদ্যা। সেই লৌহময় ভাগের উপর লাটিম যেমন ঘোরে, আমাদের মতে উভয়প্রকারের শিক্ষিত লোকও সেইরূপ কাজ করিতে পারে।

যদি বিশ্বতোমুখী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একমুখী শিক্ষা থাকে—তাহা হইলে যে বিষয়ে শিক্ষা, তাহার অনেক উপকার হয়। যদি এক জন প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষিত লোক কোন এক বিষয়ে লাগিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে বিষয়ে লাগিয়া থাকেন, সে বিষয়ের অনেক উন্নতি হয়, নহিলে সে বিষয়ের উন্নতির উপায় নাই। শুদ্ধ মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে কোন বিষয়ের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু তাই বলিয়া শুদ্ধ একমুখী বিদ্যার বিষয়ের উন্নতি হয় না। মনে কর, এক জন দন্ত-চিকিৎসায় যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিল। সে অনেক দেখিল-শুনিল, কিন্তু সে যদি শরীরের অন্য রোগসম্বন্ধে কিছু না শিখিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ভাল চিকিৎসক হইতে পারিবে না। মনে কর, দন্ত উঠে নাই, এমন কোন পঞ্চম বৎসরের বালকের চিকিৎসা করিতে গেলে, বালকের চুলের প্রতি সে কখনই দৃষ্টিপাত করিবে না, কেবল দন্তেরই চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। যদি কেহ তাহাকে দেখাইয়া দেয় যে, বালকের চুলও উঠে নাই, চিকিৎসক তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিবে না। যে কারণে কেশ উঠে নাই, সেই কারণে যে দন্তও উঠে নাই, ইহা তাহার একেবারে অনুভবই হইবে না, কেশের সহিত দন্তের যে এরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা সে কোনমতে বুঝিতে পারিবে না। যদি আর এক জন বহুদর্শী দন্তচিকিৎসকের লিখিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে তাহার দন্তচিকিৎসাজনিত অভিজ্ঞতা তাহারই জীবনাবধি শেষ হইয়া গেল। লিখিতে জানিতে হইলে, সুতরাং অন্য অনেক বিষয়ে শিক্ষা আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শুদ্ধ একমুখী শিক্ষার আর এক দোষ দেখাইব। আমাদের প্রাচীনকালে বৈদ্য বলিয়া স্বতন্ত্র জাতি ছিল না, কি স্বতন্ত্র প্রোফেশন ছিল না। ঋষিদিগের হস্তে যত দিন বৈদ্যশাস্ত্র ছিল, ততদিন শাস্ত্রের উন্নতি হইতেছিল। তাহার পর শুদ্ধ চিকিৎসা বৈদ্যদিগের ব্যবসায় হইল। বৈদ্যেরা পুত্রকে শুদ্ধ বৈদ্যক পড়াইতেন। ক্রমে শিক্ষা সঙ্কীর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাজেই এই সময়ে সংগ্রহগ্রন্থ আরম্ভ হইল। অধিকাংশ লোকই সংগ্রহগ্রন্থ পড়িয়াই বৈদ্য হইতে লাগিল। বৈদ্যশাস্ত্রের হীনাবস্থারও সূত্রপাত আরম্ভ হইতে লাগিল। প্রায়ই সংস্কৃতসংগ্রহগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অমুক ব্যক্তি দেখিলেন, লোকের শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে, ছাত্রেরা আর শাস্ত্রের সকল গ্রন্থ পড়িয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য তিনি তাহার সার সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিলেন। লোকের শক্তির হ্রাস শব্দের অর্থ আর কিছুই নহে, সাধারণশিক্ষার—সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার অভাব। বিদ্যাসংগ্রহগ্রন্থমাত্রে যখন দাঁড়াইল, তখন সে বিদ্যার উন্নতি আর হইল না। সে বিদ্যাবান্ লোক সংকীর্ণমনা হইতে লাগিল। সংগ্রহগ্রন্থকার সর্ব্বজ্ঞ হইলেন, তাঁহার গ্রন্থের উপর সরু কাটা আরম্ভ হইল, ফাঁকি আরম্ভ হইল। বিষয়ে বিদ্যার গৌরব রহিল না, গ্রন্থে বিদ্যার গৌরব হইল। পাঠ লাগানই বাহাদুরী হইয়া দাঁড়াইল।

অতএব শিক্ষার জন্য ও শরীরপুষ্টির জন্য যে ২৭ বৎসর আছে, তাহার মধ্যে এই দুই প্রকার শিক্ষাই দেওয়া প্রয়োজন, প্রথম সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত, তাহার পর ৪।৫ বৎসর একমুখী শিক্ষা। এরূপ শিক্ষিত লোক অনন্ত শক্তির আধার হন, তাঁহাদের সংখ্যায় যত বৃদ্ধি হয়, সমাজের শক্তির ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

[বঙ্গদর্শন—৭ম বর্ষ—১২৮৭ আষাঢ় সংখ্যা।

"সাবেক মনুষ্যত্ব"

ও

"হালের সাইন করা"

ইংরাজের সহবাসে বাঙ্গালী যে কত কি হারাইয়াছে, তাহার ঠিক নাই। বাঙ্গালীর কথকতা উঠিয়া গিয়াছে। কবি, পাঁচালী, যাত্রা একেবারে নাই বলিলেই হয়। যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা স্বভাবের নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠতা, ধর্ম্মপরতা প্রভৃতি বলে সমাজে এক প্রকার অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিতেছে। যে সকল সামাজিক কার্য্যে ও বাৎসরিক পর্ব্বাহে সমস্ত দেশীয় লোক আনন্দে উন্মত্ত হইত, তাহা কমিয়া আসিতেছে। যে সন্তোষ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিত, তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মীয়ের, কুটুম্বের ও প্রতিবেশীর বিপদে সম্পদে লোকে যেমন বুক দিয়া পড়িত, এক্ষণে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

এখন সবাই আপন লইয়া ব্যস্ত, কেহ কাহারও আপদ-বিপদে মনোযোগ দেয় না। কিছুতেই যেন লোকের তৃপ্তি হয় না। দেশীয় সমাজবন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। গ্রাম বা নগরবাসীদিগের মধ্যে যে একটু বাঁধাবাঁধি সম্পর্ক ছিল, সকলেই পরস্পরের কার্য্যে যেমন পরস্পরের মুখাপেক্ষা করিত, এক্ষণে আর সেটা দেখা যায় না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, ইংরাজ রাজপুরুষ হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়াছেন। সকলেই তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করেন। পুরাতন পারিবারিক, গ্রামিক, নাগরিক, সামাজিক বন্ধন খুলিয়া মানুষ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের জাতীয় চরিত্র, এমন কি তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্যও যেন পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব ছিল। মনুষ্যত্ব কথাটি বলিলে যত ভাব ব্যক্ত হয়, এত কি আর একটি কথায় ব্যক্ত হইতে পারে? মনুষ্যত্ব বলিলে লোক-লৌকিকতা, আত্মীয় কুটুম্বিতা, ব্রাহ্মণ সজ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা, গরীব-দুঃখীর প্রতি দয়া, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার, অনাথের সহায়তা, ব্যথিতের ব্যথানিবারণ, দরিদ্রের দুঃখভঞ্জন, নিরন্নকে অন্নদান, বিবস্ত্রকে বস্ত্রদান, অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, সর্ব্বদা ক্রিয়াকলাপ করা, ক্রিয়াকলাপে লোকের অভ্যর্থনা, লোকের বাড়ী যাওয়া-আসা প্রভৃতি যত কিছু মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, সরল, উদার কার্য্য আছে, এক মনুষ্যত্ব শব্দে সকলই বুঝায়। মনুষ্যত্ব বলিলে মনুষ্যসমূহের সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধন বুঝায়। মনুষ্য যত কেন ছোটই হউক না, যে যথার্থ মনুষ্য হইবে, তাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব থাকিবে, সে তাদৃশ নীচ মনুষ্যেরও ব্যথা যত কেন অল্প হউক না, সে ব্যথারও ব্যথী হইবে।

কিন্তু আজিকালি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য আর মনুষ্যত্ব নাই। আজিকালি যে লোক পরের দুঃখে দুঃখী হয়, পরের ব্যথায় যাহার হৃদয় গলিয়া যায়, তাহাকে লোকে আহাম্মক বলে। যে প্রতিবেশীদিগের কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকে, লোকের বিপদ্ দেখিলে বুক দিয়া পড়ে, লোক তাহাকে "হম্বগ" (Htumbug ও Weak-minded) বলে। আজিকালি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। আজিকালি লোকে কেবল "সাইন" করিতে চেষ্টা করে। "সাইন" শব্দটি বাঙ্গালায় তর্জ্জমা হইতে পারে না। বাঙ্গালীর অভিধানে এরূপ উৎকট স্বার্থপরতা-সার-সংগ্রহ-দ্যোতক কথা কহিতে পারে না। পৃথিবীতে যত প্রকার স্বার্থপরতা আছে, বোধ হয়, তাহাদিগের শেষ সীমা "সাইন" করা। আত্মীয় স্বজন দেখিব না, জ্ঞাতি-বন্ধুর মুখপানে চাহিব না, প্রতিবেশী দীন-দুঃখী-দরিদ্র প্রভৃতির প্রতি দৃক্‌পাত করিব না, কেবল দেখিব, আমি কিসে বড় হইতে পারি, কিসে আমার গাড়ী, জুড়ী, বড় বাড়ী প্রভৃতি হয়। কিসে লোকের কাছে অধিক পরিমাণে বাহবা লওয়া যায় (লোকের কাছে বলিতে গেলে কালা বাঙ্গালীর কাছে নয়। শুদ্ধ লাল মুখের কাছে বুঝায়) কিসে সাহেবদিগের কাছে সম্মান বাড়ে, কিসে নামের পাশে ৭।৮টা ইংরাজী অক্ষর যুড়িতে পারা যায়, আমাদের জীবনে শুদ্ধ এইমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহারা আপন জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিয়া যাইতে পারে, লোকে তাহাকেই বড় লোক বলে।

আমি দেখিতেছি, এখনকার বড় লোক ও প্রাচীন বাঙ্গালার বড় লোকে কত তফাৎ।

এখনকার বড় লোক কাহার সহিত মিশেন না, প্রায়ই একাকী থাকেন। সঙ্গে থাকিবার মধ্যে স্ত্রী ও পুত্র; যাঁহারা খুব "সাইন" করিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রী-পুত্রেরও সঙ্গ ভালবাসেন না। পার্শ্বের বাড়ীতে কে থাকে, কখনই খবর লয়েন না। ভাই, ভগিনীপতি, খুড়া, জ্যেঠা কে কোথায় থাকেন, তাহা জানেনও না। তাঁহার কেবল চিন্তা, যাহারা তাঁহা অপেক্ষা বড়, কিসে সেই সকল লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন। নরলোকের প্রায়ই মুখ দেখেন না। যাহারা তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশে ছোট, তাহারা একেবারে অগ্রাহ্যের মধ্যে গণ্য। এই সকল বড়-লোকের দিবানিশি অন্তরের আশা এই যে, সাহেব-লোকে কিসে বড় বলে। এইরূপ বড় লোক যদি আশানুরূপ বাহবা না পাইলেন, তাহা হইলে তিনি ইংরাজরাজের এবং তৎকর্তৃক অনুগৃহীত স্বদেশীয়বর্গের প্রতি উৎকট বিদ্বেষভাবকে হৃদয়ে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। লাভ এই হইল যে, তাঁহার নিজের মনে সুখ রহিল না এবং যে কেহ কার্য্যোপলক্ষে (অন্য উপলক্ষে তাঁহার নিকট কাহার যাইবার হুকুম নাই) তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহে, তাহারই মনে ঐ প্রকার বিদ্বেষভাবরূপ সংক্রামক রোগ চালনা করিয়া দেয়। নিজে তো অসুখী আছেন, অন্যকেও অসুখী করিয়া দেন।

আর সে কালের বড় লোকই বা কিরূপ ছিল? যেখানে এক জন বড় লোক থাকিতেন, সে পরগণা তাঁহার চরিত্রগুণে আলোকিত থাকিত। বাক্যে হউক, কার্য্যে হউক, অর্থের দ্বারা হউক, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশীদিগের উপকারসাধনেই তাঁহারা সকল সময়ে ব্যস্ত থাকিতেন। যাঁহারা উপকার-প্রত্যাশী নহেন, তাঁহাদেরও বিপদে সম্পদে যাওয়া-আসা কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তায় সাহায্য করিতেন। ইহাতে সম্পদের সময় আনন্দ দ্বিগুণতর হইত এবং বিপদের সময় কষ্ট অর্দ্ধেক দূর হইত। সেরূপ বড়লোক প্রাতঃকালে উঠিয়াই বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ একে একে তথায় উপস্থিত হইলেন। পরস্পর মিষ্টালাপে সময় কাটিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে পাঁচুর জামাইয়ের চাকরী, তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় কথা হইয়া গেল। হরে চাঁড়ালের ব্যাম হইয়াছে, তাহার শিশু পুত্রটি কাঁদিয়া আসিয়া বাবুকে সমাচার দিল। তখন সকলেই আহা! হরে চাঁড়াল, দিব্য লোক ছিল বলিয়া নানা প্রকারে তাহার গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাবু বলিলেন, একবার দেখে আসিলে হয় না?

তখন সমস্ত গ্রামস্থ লোক হরে চাঁড়ালের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যাহার মনে যাহা ভাল বিবেচনা হইল, সেইমত ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় সঙ্গেই ছিলেন, অমনি পুঁটলী খুলিয়া ঔষধ দিলেন। দুঃখী লোক অনুপান ও পথ্য কোথায় পাইবে, কর্ত্তার বাড়ী হইতেই তাহার ব্যবস্থা হইল। হরে চাঁড়াল সারিয়া উঠিল। বল দেখি, হরে চাঁড়াল দেশের লোকের প্রতি কত কৃতজ্ঞ হইবে। হরে চাঁড়ালের বাড়ী হইতে আসিতে আসিতে পরাণ মণ্ডল ধরিল, বাবু! আমার বাগানে একবার পদার্পণ করিয়া যান। পরাণও নানা কারণে বাবুর নিকটে বাধ্য আছে। বাবু একবার তাহার বাগানে পদার্পণ করিলে সে কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইবে। বাবু পরাণের বাগানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পরাণের বাগান, পুকুর, গাছ-পালা কেমন সুন্দর হইয়াছে। বাবুর একবার মনে হইল, এই পরাণ এক সময়ে খাইতে পাইত না! মনে একটু খুসী হইয়া কহিলেন, "বা পরাণ! তোর যে দিব্য বাগান হইয়াছে।" পরাণ তখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া গলায় কাপড় দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বাবুকে কহিল, "বাবু, সে আপনারই প্রসাদে।" বাবু "দূর বেটা" বলিয়া সেখান হইতে সত্বরপদে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। রাস্তার একটি গলির মোড়ে রামনাথ বসুর বিধবা স্ত্রী মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেও বাবুর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী, তাহার আর কেহই নাই; কষ্টে দিনপাত করিয়া থাকে; কিন্তু থাকিবার ঘরটি সারায়, তাহার এমন সঙ্গতি নাই। ঘরটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর মেরামত না হইলে শীঘ্রই আশ্রয়হীন হইতে হইবে। বাবু শুনিলেন, মৃত রামনাথের জন্য বিস্তর দুঃখ-আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন, তাহার বিধবা স্ত্রীকে বলিলেন, মা, তুমি এক সময়ে আমার কাছে যাইও, আমি ইহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব। বাবু বাড়ী আসিলেন, তাঁহার অনুচরবর্গ ক্রমে ক্রমে একে একে বিদায় হইয়া গেল। তখন বাবু স্নানাহারের জন্য বাড়ীর ভিতর গেলেন। সেখানে ভাই, ভাইপো, ভাগিনেয়, ভাইঝি-জামাই, নাতি প্রভৃতির আহারাদির দেখা শুনা করিলেন। তাহার পর অতিথি কেহ আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। সকলের আহারাদির পর আপনি আহার করিলেন। একটু বিশ্রামের পর

অভ্যাগত অতিথিদিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ নানাদেশীয় কথাবার্ত্তায় অতীত হইলে, আবার গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া জুটিল। তখন গ্রামের কে কেমন আছে, কাহার কেমন অবস্থা, এই সকল বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তখন বাবু যথাসাধ্য লোকের কষ্টনিবারণের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেকালের বাবুরা ছেলে দেখিলেই কোলে করিয়া লইতেন, কড়ানিয়া, শতকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কাহাকেও "তুমি কি দিয়া ভাত খাইয়াছ", কাহাকেও বা "কে তোমায় অধিক ভালবাসে" ইত্যাদি মিষ্টালাপে খুসী করিয়া দিতেন। কাহাকেও বা দোলাই কিনিয়া দিব বলিয়া খুসী করিতেন। সে দৌড়িয়া গিয়া তার মার কাছে গিয়া বলিত, মা! বাবু আমায় দোলাই কিনিয়া দিবেন বলিয়াছেন। দেশের মধ্যে কেহ কোন নূতন বিদ্যা, নূতন শিল্প শিখিলে, কেহ গুণী হইলে তাহাকে উৎসাহ দেওয়া, তাহাকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করা বাবুর নিত্যকর্ম্মের মধ্যে।

যেমন এক জায়গায় একটি ফুল ফুটিলে তাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়, সেইরূপ কোন জায়গায় এক জন বড়লোক হইলে তাঁহার দ্বারা চারিদিকের লোক উপকৃত হইত। আমাদের নূতন সমাজে এখন আর সে রকম ফুল ফুটে না। সেরূপ বড়লোক আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজের সঙ্গে থাকিয়া, ইংরাজী ভাষা শিখিয়া আমরা বড়ই আত্মম্ভরী ও অসামাজিক হইয়া পড়িয়াছি। "(Live for others)" এইটি আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালীরা যত বুঝিত, এত বুঝি অন্য কোন দেশের লোক বুঝে না। এখনকার ইয়ং বেঙ্গলেরা "(Live for others)" করিবার জন্য সভা, সমাজ এসোসিয়েসন, জলসা, ক্লব, সোসাইটী, মিটিং ইত্যাদি করিয়া থাকেন। একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে এইগুলির তলায়ও "সাইন" করিবার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নাই। অনেকে এই উপায়ে পরহিত করিতে গিয়া গুরুতর আত্মহিত করিয়া বসেন। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল লোকে সভাদি স্থাপন করিতে যায়, তাহারা আপনাপন ইষ্টসিদ্ধি হইলেই সভার প্রতি হতাদর হইয়া পড়ে, সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, লোকে ১০।১৫ বৎসর পরহিতে কাটাইয়া অতি সামান্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় সে পথ পরিত্যাগ করেন। সভা বা এসোসিয়েসনের পরহিত ফাঁপা জিনিস, ভিতরে তাহার সার নাই। খালি হাঁড়ীর মত বাজাইলে খুব শব্দ হয় বটে; কিন্তু কার্য্য তাহাতে কিছু হয় না। কারণ, এখনকার যে সকল লোকে সভা করেন, তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্যই সাইন করা। সুতরাং তাঁহারা সভাগুলিকে এমনি করিয়া তৈয়ার করেন যে, উহাতে শব্দ অধিক হয়। পৃথিবীর লোক জানিতে পারে যে, অমুক অমুক খুব সাইন করিতেছে।

বাঙ্গালীরা ইংরাজ সহবাসে যত কিছু হারাইয়াছেন, মনুষ্যত্বই তাহাদের মধ্যে প্রধান। মনুষ্যত্বের অভাবে সমস্তই সারশূন্য হইয়া উঠিতেছে। গিল্‌টী অধিক চলিতেছে, যত সার কম, ততই অধিক চক্‌চকে হইতেছে। যে সমাজে যথার্থ মনুষ্যত্ববিশিষ্ট লোকের আদর নাই, এবং গিল্‌টী লোকের আদর অধিক, সে সমাজের অবস্থা বাস্তবিকই অতি শোচনীয়। আমাদের এখানে সমাজের অবস্থা সুতরাং বড়ই মন্দ। কিন্তু সে মনুষ্যত্ব কি আর দেখিতে পাইব? আবার কি বাঙ্গালীর মনে মনুষ্যত্ব করিবার বাঞ্ছা প্রবল হইবে? এ ছার সাইন করার বাঞ্ছা তিরোহিত হইবে? ভরসা ত দেখি না, সমাজেরও যে বড় মঙ্গল হইবে, তাহারও ভরসা নাই।

[বঙ্গদর্শন, ৮ম বর্ষ—১২৮৮ আষাঢ় সংখ্যা।

কালেজী শিক্ষা

আমরা কালেজে যে শিক্ষা পাই, সে শিক্ষা কোন কাজেরই নহে। উহা না একমুখী শিক্ষা, না সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা। উহা যে একমুখী শিক্ষা নহে, তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, উহাতে আমাদের কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ শিক্ষা দেয় না। উহা সর্ব্বতোমুখী শিক্ষাও নহে। কারণ, উহাতে শরীরিক শিক্ষার নামও নাই, যাহাতে হৃদয়বৃত্তির উন্নতি হয়, উহাতে তাহার কিছুই নাই, যাহাতে ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, তাহাও উহাতে নাই আছে শুদ্ধ কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা, তাহাও উচ্চতর বৃত্তিসমূহের নহে। প্রধানতঃ কেবল স্মরণ-শক্তির উন্নতির দিকেই অধিক দৃষ্টি।

সত্য বটে, এক্ষণে সর্ব্বত্র 'জিম্নাসিয়ম' হইয়াছে, কিন্তু তাহার উন্নতি নাই। কর্ত্তৃপক্ষের তাহাতে দৃষ্টি নাই। সত্য বটে, স্কুলে কাব্যপাঠ হয়, কিন্তু তাহা হৃদয়বৃত্তিসমূহের পরিচালনার জন্য নহে, শুদ্ধ ভাষা শিক্ষার জন্য। আর বই পড়িয়া যে হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা, সেও বিড়ম্বনামাত্র। ইচ্ছা বা কর্ম্মক্ষমতার মধ্যে আমাদের থাকে পাশ করা, সুতরাং তাহা ভিন্ন অন্য বিষয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষমতা বড় একটা নাই।

যাহা একটু আমরা কালেজে শিখি, তাহার শিখিবার উপায়ও ভাল নহে। আমরা সব শিখি বই পড়িয়া। বিধাতা যেন আমাদের চক্ষুনামক একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, অপর ইন্দ্রিয় যেন কোন কাজেই আসে না। যে সকল জিনিস ঘরের দ্বারে আছে, তাহাও আমরা কেতাব পড়িয়া শিখিতে যাই। দেখিয়া ও শুনিয়া আমরা কিছুই শিখি না। যে জিনিস একবার দেখিলে তৎক্ষণাৎ শিখিব এবং জন্মে ভুলিতে পারিব না, সেই জিনিস আমাদের কেতাবে পড়িয়া তিন মাসে বুঝিতে হইবে ও মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পর্য্যন্ত মনে রাখিতে হইবে। শিখিতে আমোদ হয়, এমন করিয়া কোন শাস্ত্র বা কোন বিষয়ই শিখান হয় না। তাহার উপর যদি আবার মাষ্টারে যত্ন করিয়া বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলেও হয়। তাহা না হইয়া মাষ্টারগণ (একে ত ডাওনিসিয়সের বংশ) তাহাতে আবার ইংরাজী পড়িয়া রুক্ষমেজাজ হইয়াছে। সাহেব প্রোফেসারদিগের ত কথাই নাই। অনেকে বলেন, তুমি বুঝ আর নাই বুঝ, আমার নাম বাহির হইয়া গিয়াছে, আমার মাসিক বেতন বাড়িবে বৈ কমিবে না।

যদি নিজভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন অতি দূরবর্ত্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট দশ বৎসর লাগে। ভাষা-শিক্ষাটি অথচ কিছুই নহে, ভাষা-শিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময়ব্যয় ও এত পরিশ্রম। তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি! বাঙ্গালা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম। ইংরাজীতে আমরা কখন কথা কহি না। এখন আমরা ইংরাজীতে চিঠিপত্রও বড় লিখি না অথচ আমাদের জ্ঞান-উপার্জ্জনের একমাত্র দ্বার ইংরাজী। ইংরাজী আমাদের রাজভাষা। যাঁহারা ইংরাজের সংসর্গে আসিবেন, তাঁহাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন। তাই বলিয়া ছয় কোটি ছয়টি লক্ষ লোক ইংরাজী পড়িয়া মরিবে কেন? বলিবে, ইংরাজ যখন রাজা, সকলেই কোন না কোন সময়ে ইংরাজের সংসর্গে আসিবেন। স্বীকার। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরাজীতে অঙ্ক কষিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরাজী শিখ না কেন? ইংরাজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে, আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরাজীমুখে শিখিতে হয়।

যেরূপ চলিতেছে, ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরাজী শিক্ষা অল্প হয়, আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না; শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্রম করিয়া অতি অল্প জ্ঞানলাভ হয়।

যা-ও বা শিখি, তাহাও শিখিবার জন্য শিখি না; জ্ঞান-অর্জ্জনের জন্য শিখি না। শিখি একজামিন

পাশ করিবার জন্য। আচ্ছা করিয়া পড়ি; যেমন প্রশ্ন দিক, ঠকাইতে পারিবে না, এ জন্য পড়ি না; কেমন প্রশ্ন দিবে, বাছিয়া বাছিয়া তাহাই পড়ি, অনেক সময়ে মাষ্টার মহাশয়েরাও তাহাই পড়ান। ইহার এক ফল এই যে, একজামিন যখন নাই, তখন পড়ি না, একজামিনের সময় রাতদিন পড়ি। লাভ এই হয়, কতকগুলা গুরুপাক জিনিস উদরস্থ হয়, সব হজম হয় না। রাত জেগে যাহা পাঠ করা গেল, তাহা মাসখানেকের মধ্যে ভুলিয়া যাই।

অতএব লেখাপড়ার যে উদ্দেশ্য - মনোবৃত্তি-নিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি—তাহা একেবারেই হয় না। যে চিন্তাশক্তিবলে শিক্ষিতদিগের দ্বারা সমাজের উপকার হইবে, তাহা হয় না। চিন্তা করিবার শক্তি নাই, অথচ জ্ঞান—আমি বড় বুঝি, ইহার অনেক দোষ, কালেজী শিক্ষায় সে দোষগুলি সমুদয়ই ঘটে। যদিও চিন্তাশক্তি দুই চারি জনের জন্মে, তাহাও শূন্যের উপরে। যদি এরূপ হইত, তবে এইরূপ ফল হইত। কিন্তু চিন্তা abstractএর উপর। যাহা আছে, তাহার উপর নহে। যাহাই হউক, তবুও চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হইলেই সেটি বাঞ্চনীয়। কিন্তু তাহা ত হয় না।

অতএব কালেজী শিক্ষায় চিন্তাশক্তি উত্তেজিত হয় না, উহা শুদ্ধ পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হইবার জন্য, এজন্য উহাতে জ্ঞান-অর্জ্জন হয় না। জ্ঞান-অর্জ্জন একটু আধটু হইলেও ইংরাজীমুখে অর্জ্জন করিতে হয় বলিয়া সেই একটুকুতেই অনেক শ্রম লাগে, যাহা শিখি, তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তিও দুই পাঁচটির মাত্র চালনা হয়, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির কিছুই হয় না। কোন একটি বিষয়ও সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা হয় না; অতএব উহা দ্বারা পরিণামে যে করিয়া খাইবে, তাহাও হয় না। কালেজে না একমুখী শিক্ষা হয়, না সর্ব্বতো-মুখী শিক্ষা হয়।

কালেজের ছেলেরা প্রায় পিতা স্বজন প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাসায় অথবা হিন্দু হোষ্টেলে বাস করে, সুতরাং সমাজে থাকিলে ও বাড়ীতে থাকিলে যে সকল মনোবৃত্তি পুষ্ট হয়, তাহার কিছুই হয় না, স্নেহ, মমতা, বিশেষ ভক্তি একেবারেই থাকে না। বাড়ী বা সমাজে যে সকল অভিজ্ঞতালাভ হয়, ইহাদের তাহার কিছুই হয় না। অন্য লোকে কিসে মনে ব্যথা পাইবে, তাহা একেবারেই জ্ঞান থাকে না; অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তি-সমূহের কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি হয় না। শুদ্ধ যদি বাপ মা বা গুরুজনের চোখে চোখে থাকিত, তাহা হইলেই এ সকল লাভগুলি অবশ্যই হইত। সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অনেক কষ্টে এই সকলগুলি শিখিতে হয়। অনেকে হয় ত অনেক জিনিস একেবারেই শিখিতে পারে না। অশিক্ষিতের সহিত সমবেদনা প্রায়ই থাকে না। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অতএব কালেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা নহে। প্রথম, কালেজে যাহা শিক্ষা হওয়া উচিত, তাহাই আমাদের কালেজে অল্প শিক্ষা হয়। সকল শাস্ত্রের কিছু কিছু পড়ান একেবারেই হয় না। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হয়। এক জন কর্ত্তার খেয়াল হইল, জরীপবিদ্যা পড়ান আরম্ভ হইল, কিন্তু ভুগোলবিদ্যা উঠিয়া গেল। ভুগোল পড়িলে দেশীয় কুসংস্কার যত শীঘ্র অপনীত হয়, এত আর কিছুতে হয় না। সেই ভুগোল উঠিয়া গেল। আর এক জন বলিলেন, ছয় বিষয়ে পরীক্ষা ছেলেরা পারিবে কেন? পাঁচ কর। আর এক জন বলিলেন, পাঁচেও বেশী হয়, তিন কর। সুতরাং সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয় না। শুদ্ধ কেতাব পড়িয়া শিখিতে হইলে ছয়টা বিষয় শিখা কঠিন হয় বটে, কিন্তু যদি এক এক বিষয়ে উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের নিকট সেই সেই বিষয় শিক্ষা হয় ও কতক দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে পারে, তবে অনেক জিনিস অল্পে শিক্ষা হইতে পারে।

কালেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, উহার সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য শিক্ষা চাই, সামাজিক শিক্ষা চাই। প্রাক্‌টিকাল শিক্ষা চাই, হাতে হাতিয়ারে অনেক কাজ করা চাই। ঠেকিয়া শিখা চাই, প্রোফেশন্ শিক্ষা চাই।

আমাদের দেশে ইংরাজীশিক্ষাপ্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় ভদ্রসন্তানগণ যে শিক্ষা পাইত, সে শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা। কালেজী শিক্ষার সহিত তুলনা করিলে কেতাবী জিনিস তাহারা কিছুই শিখিত না। তাহারা না ভুগোল শিখিত, না ইতিহাস জানিত, না বিজ্ঞান জানিত, না গণিত জানিত। কেতাবী বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা অল্প থাকিলেও তাহারা অন্যান্য সকল বিষয়ে অল্পপরিশ্রমে আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক শিখিত। কেমন করিয়া নম্র বিনীত হইতে হয়, গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, কেমন করিয়া অল্প সময়, শ্রম ও অর্থব্যয়ে সুন্দররূপে সংসার চালাইতে হয়, গৃহস্থালী করিতে হয়, তাহা সুন্দররূপে শিখিত। পিতার সহিত সে সর্ব্বত্র ফিরিত, সকল জিনিস দেখিত, সকল সমাজে যাইত, সে যেন জন্মিয়া অবধি মানুষ হইবার জন্য এপ্রিণ্টিস্ বা শিক্ষানবীশ থাকিত। এখনকার মত সংসার হইতে, সমাজ

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যবাস করিতে হইত না। যদিও কেতাবী শিক্ষা অল্প হইত, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষিত লোকের সংসর্গে আসিয়া সে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আপনা আপনি শিখিত। মোটামুটি সে অনেক বিষয় জানিত। সে কালে জ্ঞানের উন্নতি ছিল না। জ্ঞানসীমা এত বর্দ্ধিত হয় নাই। সুতরাং প্রাচীন-কালে অর্থাৎ সমাজের প্রথম অবস্থায় যেমন মোটা-মুটি বিদ্যা ছিল, তখনও ঠিক তেমনি ছিল, আর সেই মোটামুটি জিনিস অধিকাংশ ভদ্রসন্তান জানিত ও শিখিত। এখনকার ছেলে যদি লেখাপড়া করিতে গেল, অমনি বাপ মা বলিয়া বসেন—"রাম আমার সংসারের কোন কাজই করিবে না, এ কর্ম্ম আমার রামকে করিতে দিও না, রামের সময় নষ্ট হইবে।" রাম শুদ্ধ লেখাপড়া করিয়াই সময় কাটাইলেন। যখন কলেজ হইতে বাহির হইলেন, একটি গাছবানর বাহির হইলেন। যদি ভাল চাকরী পাইলেন, কি মেলা টাকা রোজগার করিলেন, এক রকম চলিয়া গেল, নহিলে দাঁড়িয়ে সর্ব্বনাশ। সমাজে গেলেন যদি, যেখানে দশ জন লোক আছে, সেখানে গেলেন যদি, একপাশে বসিয়া রহিলেন। জানেন না কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে মিশিতে হয়, মিশিতে পারিলেন না। লোক জানিল, রামাটা লেখাপড়া শিখিলে কি হয়, বড় অহঙ্কারী, নরলোকের সঙ্গে কথাই কহেন না। আমরা রামকে বেশ জানি, রামের অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, শুদ্ধ শিক্ষার দোষে বেচারার নিন্দা হইল।

কালেজী শিক্ষার দোষপ্রদর্শন অনেক করা গেল। কালেজী শিক্ষার অনেক উৎকৃষ্ট গুণ আছে বলিয়াই আমরা উহার দোষপ্রদর্শনে এত যত্নবান্ হইয়াছি। আমাদের দেশীয় কালেজী শিক্ষার প্রধান গুণ এই যে, উহাতে স্বাধীনচিন্তাশক্তি উদ্রেকের যেমন সুবিধা, এমন আর কিছুতেই নাই। সামাজিক অত্যাচারে, সাংসারিক (পিতৃমাতৃকৃত) অত্যাচারে, শিক্ষকদিগের অত্যাচারে চিন্তাশক্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না; আমাদের কালেজে এ তিনের একটিও নাই। আমাদের কালেজের ছাত্রগণের কুসংস্কার যত অল্প, এত আর বোধ হয় কোথাও নাই। কিন্তু কালেজী শিক্ষার গুণকীর্ত্তন আমাদের আবশ্যক নাই, উহার শত দোষসত্ত্বেও আমরা উহাকে ভালবাসি ও আমরা এরূপ সুন্দর শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়া আপনা-দিগকে কৃতার্থ মনে করি এবং এইরূপ মনে করি বলিয়াই অদ্য উহার দোষকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক, আমাদের সংস্কার এই যে, আর দুই সময়ে দুই জাতির অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইয়াছিল, সেই দুইটির সম্যক্ বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের দোষগুণ নির্ব্বাচন করিব। পাঠকগণ দেখিবেন, কালেজী শিক্ষার কত উন্নতি হইলে উহা সম্পূর্ণ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। কালেজী শিক্ষার যদি দোষ সকল অন্তর্হিত হয়, তবে ইহাই পৃথিবীর সকল জাতীয় শিক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।

আমরা যে দুইটি শিক্ষার কথা বলিতেছিলাম, তাহার একটি ভারতবর্ষের, আর একটি গ্রীসের। একটি ব্রাহ্মণদিগের, আর একটি এথিনীয়দিগের। একটিতে ব্রাহ্মণ তৈয়ারী হইত, আর একটিতে সিটিজেন তৈয়ারী হইত। একটির ফল সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতে ব্রাহ্মণজাতির চিরপ্রাধান্য, আর একটির ফল গ্রীক আর্টস, গ্রীক সাহিত্য, গ্রীক চিন্তার চিরপ্রভুত্ব। দুই জাতিই জগতের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক, উভয়ের শিক্ষা হইতেই অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ হয় ১৮ না হয় ২৭ না হয় ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুকুলে বাস করিতেন। তৎকালপ্রচলিত যাবতীয় শাস্ত্রই তাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন। বেদ-বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ, চিকিৎসা তাঁহারা এ সমস্তই কেতাব হইতে শিখিতেন। গুরু তাঁহা-দিগকে শিখাইতেন, গুরু ও শিষ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ। এক জন ভাল করিয়া শিখাইবার জন্য যত্ন করিত আর এক জন ভক্তি করিয়া শিখিবার জন্য যত্ন করিত। শিক্ষা উত্তম হইত। শিষ্য গৃহস্থালীতে গুরুর সহায়তা করিতেন, সুতরাং পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে যে শিক্ষা হওয়া অসম্ভব, সে শিক্ষা অতি সহজেই হইত। গুরু তাহাদিগকে লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে সংসারের কার্য্য করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেন। স্নেহমমতা তাঁহারা গুরুকুলে অনেক শিখিতেন। গুরু তাঁহাদিগকে সমাজে যাইতে শিখাইতেন, গুরু যেখানে যাইতেন, শিষ্য তাঁহার সঙ্গে থাকিতই থাকিত। শিষ্যকে অনেক শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু শিষ্যের গৃহস্থজীবনে যা কিছু আবশ্যক হইত, গুরু সমস্ত শিখাইতেন। কেমন করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য করিতে হয়, যাগযজ্ঞ করিতে হয়, বিচার করিতে হয়, মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয়, ব্যবস্থা দিতে হয়, এই ৩৬ বৎসরমধ্যে তাহারা সব শিখিত। তাহারা প্রাক্টিকেল ও থিওরটিকেল দুইয়ের কমই শিখিত।

বাহির হইয়া যখন এরূপ একটি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তিনি সমাজের মূর্ত্তিমান শক্তিস্বরূপ হইলেন। বড় বড় রাজারা তাঁহার তোষামোদ করিতে লাগিলেন। যিনি তাঁহাকে আপন রাজ্যে স্থাপন করিতে পারিলেন, তিনিই মনে করিলেন, আমার রাজ্য ধন্য হইল। তাঁহাকে সকলে অগ্নির সহিত তুলনা করিত, কারণ, অগ্নির যেমন তেজঃ, তাঁহারও তেমনি। অগ্নি যেমন সর্ব্বভুক্, তিনিও তেমনি সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যার আধার, অনন্তশক্তির আধার। আমরা এখান হইতে বেশ দেখিতে পাইতেছি, তাঁহার শিক্ষার অনেক দোষ ছিল। তাঁহার শিক্ষা অনেকটা প্রোফেশনাল, তিনি ব্রাহ্মণের যাহা দরকার, তাহাই শিখিতেন। মানুষের যাহা দরকার, তাহা ত শিখিতেন না, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক কুসংস্কার তাঁহার থাকিয়াই যাইত। ব্রাহ্মণের শিক্ষার মধ্যে পুরোহিতের শিক্ষা অনেক থাকিত। পুরোহিতশিক্ষায় কলাশিক্ষা একেবারে হইত না, সুরুচি (টেষ্ট) বলিয়া যে জিনিস, তাহার তাঁহারা সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণ নৃত্যগীতাদি শিখিলে পতিত হইতেন। তাঁহার শিক্ষার এত দোষসত্ত্বেও তাঁহার ব্রাহ্মণের শিক্ষা সম্পূর্ণই হইত। আগে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা, তাহার পর একমুখী শিক্ষা না হইয়া, একমুখী শিক্ষার জন্য যত প্রয়োজন, সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা ততদুর পাইত।

গ্রীকেরা কেতাব পড়িয়া অতি অল্প শিখিত। কথাবার্ত্তা, নাট্যশালা, সভাগৃহ প্রভৃতি হইতে তাহাদের শিক্ষা হইত। হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা তাহাদের সম্পূর্ণরূপ হইত। তাহাদের মত উৎকৃষ্ট রুচি আর কোন জাতির কি আছে? তাহাদের নাটক, তাহাদের কাব্য, তাহাদের ভাস্করকার্য্য—তাহাদের রুচিশিক্ষার উৎকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। শারীরিক শিক্ষা তাহাদের মত আর কাহারও হইত না, তাহাদের মেলায় পারিতোষিক দেওয়া হইত, সেই পারিতোষিক পাইত বলিয়া সকলেই ব্যায়াম করিত, শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি গ্রীকদিগের যেমন হইত, এমন কি আর কখন কোন জাতির হইয়াছে? তাহাদের মধ্যে শারীরিক দোষবিশিষ্ট অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ অতি অল্প ছিল। সৌন্দর্য তাহাদের প্রায় সকলেরই ছিল। বিশ্রী লোক, কাণা, খোঁড়া, কুৎসিত তাহাদের দেশে হইতেই পারিত না। তাহারা সকল প্রকার শিক্ষার জন্য প্রাইজ দিত; হেরোডোটস্ ইতিহাস লিখিয়া পড়িলেন, পারিতোষিক পাইলেন, যে যে কোন কাজই করুক না, যদি তাহাতে সাধারণ লোকের সন্তোষ হইল, অমনি প্রাইজ। এত উৎসাহে গ্রীকদিগের যে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর শিক্ষা হইবে, আশ্চর্য্য কি! বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা গ্রীসে যত হইয়াছিল, এত আর কোন জাতির হয় নাই; সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনের যে শুদ্ধ সূত্রপাত হইয়াছিল, এমন নহে, অনেক উন্নতিও গ্রীসে হইয়াছিল। কর্ম্মক্ষমতা গ্রীকদিগের মত আর কাহার ছিল? দুই পাঁচ জন লোকের প্রতিজ্ঞায় যেখানে পারস্যরাজ্যের অক্ষৌহিণী সূর্য্যকরস্পৃষ্ট নীহারবৎ দ্রবীভূত হইয়া গেল, তাহাদের মত কার্য্যক্ষমতা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কাহার? বাস্তবিক গ্রীক বিশেষ এথিনীয়দিগের মত সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা আর কোন জাতির কখন হয় নাই। কিন্তু এত উৎকৃষ্ট শিক্ষা তাহারা বিনা পরিশ্রমে লাভ করিত। শুদ্ধ বিনা পরিশ্রমেই বলি কেন, তাহারা আমোদ করিয়া শিখিত। ইশ্চাইনিস সফোক্লিস তাহাদের শিক্ষা দিত। তাহারা শুদ্ধ আমোদের জন্য থিয়েটারে আসিত, অথচ কিছু না কিছু শিখিয়া যাইত। আবার নাগরিকদিগকে রাজ্যের সমস্ত কার্য্য করিতে হইত, তাহাতে তাহাদের প্রাক্‌টিকেল শিক্ষাও অনেক হইত। নাগরিকগণ বিচার করিতে শিখিত, মন্ত্রিসভায় পরামর্শ দিতে শিখিত, অথচ কাজ করিতেছি বলিয়া কাহারও গায়ে লাগিত না।

ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা ধর্ম্মপ্রধান, গ্রীকদিগের সৌন্দর্য্যপ্রধান। সুতরাং গ্রীকদিগের শিক্ষা ক্রমে ছড়াইয়া সমস্ত নাগরিকগণমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; ব্রাহ্মণদিগের উচ্চতর শিক্ষা গুটাইয়া ক্রমে অল্পসংখ্যকমাত্র লোকে ন্যস্ত হইয়াছিল। গ্রীকেরা ইচ্ছা না থাকিলেও আপনি শিখিতে বাধ্য হইত, ব্রাহ্মণেরা অনেক যত্ন ও শ্রম করিয়া শিখিত।

আমাদের কালেজী শিক্ষা এ দুইয়ের কোনটিরই মত নহে। কিন্তু দোষ সংশোধন করিয়া লইলে ইহা হইতে গ্রীকদিকের অপেক্ষাও উচ্চতর শিক্ষা হইতে পারে। কারণ, আমাদের শিক্ষায় স্বাধীনচিন্তার বড় শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। গ্রীকদিগের কুসংস্কারাপন্ন নাগরিকদিগের দোষে তাহা কখনই হইতে পারিত না। যেখানে সক্রেতিস্‌কে নাস্তিক ও দেবদ্বেষী বলিয়া বধ করিল, তাহাদের চিন্তাশক্তি আধুনিক বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকদিগের মত উন্নতরূপিণী ছিল, কেমন করিয়া বলিতে পারি।

[বঙ্গদর্শন—১ম বর্ষ—১২৮৭ ভাদ্র ।

ভট্টাচার্য্যবিদায়-প্রণালী

ফরাসীদিগের সর্ব্বপ্রধান চিন্তাশীল মহামতি কোমট সাহেব এক দিন সদর্পে সমস্ত য়ুরোপীয় কার্য্যশীল ব্যক্তির নিকট কর চাহিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার এরূপ কর চাওয়া পাগলের কার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু আমরা তাঁহাকে পাগল বলিতে চাহি না; অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর কার্য্যশীল ব্যক্তিগণ চিন্তাশীলদিগকে কর দিয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ শাসনচিন্তার জন্য শাসনকর্ত্তারা কর সংগ্রহ করেন। দ্বিতীয়তঃ নানাবিধ উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়িগণ ফী (fee) দর্শনী, সেলামী, তৈলাট, মেহনতআনা ইত্যাদি আকারে কর সংগ্রহ করেন। বাস্তবিক অর্থনীতিশাস্ত্রে যে উৎপাদক অনুৎপাদক পরিশ্রমবিভাগ আছে, তাহার উৎপাদক শ্রমজীবীরা অনুৎপাদক শ্রমজীবীদিগকে কর দিয়া থাকে। যেমন রাজাকে যে কর দেওয়া যায়, তাহার পরিবর্ত্তে শাসন এবং রক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ যে চিন্তাশীল ব্যক্তিই কর লউন না, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের কোন না কোন বিশেষ কার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্য যিনি প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারেন, তিনি অধিক পরিমাণে কর লন, রাজা অত্যাচার হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করেন, এজন্য পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমিই তাঁহার। বৈদ্য আশু শারীরিক যন্ত্রণার প্রতিকার করিয়া দিতে পারেন, এজন্য তিনি দর্শনী পান, এইরূপ সকল প্রকার অনুৎপাদক শ্রমজীবীরাই কর সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁহাদের সংগ্রহ কায়দার সহিত। তাঁহারা নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিলেন, করিয়া কর লইলেন, ঠিক এরূপ প্রকাশ পায় না; যেন যে দিতেছে, তাহারই গরজে—তিনি কর প্রাপ্ত হইলেন। যে সকল চিন্তাশীলগণ এইরূপে বাহ্যজগতের উপর আপনাদের চিন্তাশক্তি খাটাইতে পারেন, তাঁহারা কায়দা করিয়া কর সংগ্রহ করিতে পারেন; কিন্তু ইঁহাদের চিন্তাশীলতা নীচদরের। যাহা দ্বারা মানুষের মানসিক শক্তির উন্নতি হয়, যাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চিন্তাশীলগণের চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হয়, যাহা সর্ব্ববিশ্বব্যাপিনী, তাহার নাম উচ্চঅঙ্গের চিন্তাশীলতা। এ চিন্তাশীলতার কার্য্য, সাধারণে দেখিতে পায় না; দেখাইবার উপায় নাই, এজন্য এই শ্রেণীর চিন্তাশীলগণ বিশেষ কায়দা করিয়া কর আদায় করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের প্রদত্ত উপকার গ্রহণ করিতে সমর্থ লোকের সংখ্যা অতি অল্প, এ জন্য তাঁহাদিগের করদায়ীদিগের সংখ্যা অল্প। এ জন্য তাঁহাদের করসংগ্রহও অল্প পারিতোষিক অল্প হইলে সে ব্যবসায়ের উন্নতি হয় না, এ জন্য উচ্চঅঙ্গের চিন্তাশীলতা ব্যবসায় অত্যন্ত সুসভ্য দেশ ভিন্ন অত্যন্ত বিরল। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন গ্রীস, ভারতবর্ষ এবং বর্ত্তমান য়ুরোপেই এই ব্যবসায়ের কথঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রমজীবীদিগকে শ্রমের পরিবর্ত্তে আমরা যাহা দিয়া থাকি, তাহার নাম বেতন। নিম্নশ্রেণীর চিন্তাশীল অনুৎপাদক শ্রমজীবীদিগকে তাহাদের শ্রমের পরিবর্ত্তে যাহা দিয়া থাকি, তাহার নাম (Fee) দর্শনী, সেলামী ইত্যাদি। কিন্তু উচ্চঅঙ্গের চিন্তাশীলদিগকে আমরা কি দিয়া থাকি? এইরূপ উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশীলতা যাহাতে প্রসূত হয়, তাহার জন্য আমরা কি চেষ্টা করিয়া থাকি? চিন্তাশীলদিগের উৎসাহবৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজ হইতে কবে কি চেষ্টা হইয়াছে? বরং সকল দেশেরই সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে, যাহারা জ্ঞানী হইবে, যাহারা চিন্তাশীল হইবে, তাহারা দরিদ্র, যাহাদের দ্বারা সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার হইবে, যাহাদের হইতে নূতন নূতন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পথ উদ্ঘাটিত হইবে, যাহাদের চিন্তাগুণে মনুষ্যগণ বহির্জগতের উপর আত্মশক্তি পরিচালনা করত সৃষ্টির একমাত্র অধীশ্বর হইতে পারিবে, তাহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রমজীবীর স্বচ্ছন্দভোগেও বঞ্চিত থাকিবে। আহা, কি সুবিচার!!! বোধ হয়, এই ঘোরতর অবিচারের জন্য ক্ষোভে সমাজের অকৃতজ্ঞতায় মর্ম্মপীড়িত হইয়াই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান চিন্তাশীল-মহামতি কোম্‌ত উদরজ্বালায় জ্বলিয়া সদর্পে দিগ্বিজয়ী সম্রাটের ন্যায় সমস্ত পৃথিবী হইতে কর চাহিয়া বসিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অধুনা লোকের সুবুদ্ধি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। ক্রমে চিন্তাশীলদিগের উৎসাহ দিবার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। দেশের মধ্যে যাহাতে অধিকসংখ্যক চিন্তাশীলতার প্রাবল্য হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, সুইজার্লণ্ড প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ প্রধান প্রধান ছাত্রদিগকে (fellowship)

ফেলোসিপ নামক বহুকালস্থায়ী পুরস্কার দিয়া তাঁহাদিগের সংসারভাবনা দূর করত শুধু উচ্চ অঙ্গের চিন্তার জন্য স্বতন্ত্রীকৃত করা হইতেছে। চিন্তাশীল-দিগের নবনবোন্মেষিনী চিন্তার আদরবৃদ্ধি হওয়াতে উঁহাদিগের পুস্তক বিক্রয় হইতে কিছু কিছু লাভ হইতেছে। অনেক সুসভ্য জাতির মধ্যে অধ্যাপকতা (Imfessorship) স্থাপিত হইতেছে; যাহা দ্বারা অধ্যাপকগণ অল্পকাল কার্য্য করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন উপযোগী বিত্ত সংগ্রহ করত যাবজ্জীবন নূতন নূতন চিন্তায় মগ্ন থাকিতে পারেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ য়ুরোপ দেশে প্রায় সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রের যে সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা চিন্তাশীলতার আদর করিতে ও চিন্তাশীলতার উৎসাহ দিতে শিখিয়াছেন। পুরাকালেও যে যে দেশে উহার যতটুকু আদর ছিল, সেই সেই দেশে ততটুকু উন্নতি হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে, বিশেষ আইওনিয়ন নগরসমূহে এইরূপ উচ্চ অঙ্গের চিন্তা-শীলতার বিলক্ষণ আদর ছিল। তথায় যেমন উৎকৃষ্ট কাব্য-নাটকাদি রচনা করিলে পারিতোষিক পাইত, যেরূপ ব্যায়ামে ও মল্লযুদ্ধাদিতে নৈপুণ্যলাভ করিলে পারিতোষিক প্রাপ্য ছিল, সেইরূপ দর্শন-বিজ্ঞান বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিতে পারিলেও তাহার পারি-তোষিক ছিল। আমরা আডাম স্মিথের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে, গ্রীসীয় অধ্যাপকেরা ছাত্রদত্ত বেতন হইতে অনেক অর্থসঞ্চয় করিতে পারিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ কার্য্যে হউন আর নাই হউন, শাস্ত্রমতে চিন্তামাত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন অঙ্গের চিন্তাশীল অর্থাৎ তাঁহারা রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দণ্ডনীতি ইত্যাদি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যেও উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশীল লোকও অনেক থাকিত, সমস্ত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে মান্য করিত, সমাজে তাঁহাদের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, এবং স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রানির্ব্বাহের উপযুক্ত বিত্তও তাঁহারা নানা প্রকারে সঞ্চয় করিতে পারিতেন। এক জন প্রধান ছাত্র পাঠ সমাপনান্তে স্নান করিয়া গুরুকুল হইতে নির্গত হইলে বহুসংখ্যক রাজারা তাঁহাকে আপন দেশমধ্যে স্থাপনা করিবার জন্য বিশিষ্ট যত্ন করিত। এরূপ স্থলে এরূপ মহাসমা-দৃত ব্রাহ্মণ সুধীগণের মধ্যে উচ্চ অঙ্গের স্বাধীন চিন্তা যে অত্যন্ত উন্নত হইবে, তাহাতে আর আপত্তি কি ?

এই প্রকার উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশীল ব্রাহ্মণদিগের নাম কখন ঋষি, কখন আচার্য্য, কখন উপাধ্যায়, তৎ-পরে ভট্ট এবং সর্ব্বশেষে ভট্টাচার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনুর মতে উঞ্ছবৃত্তি, শীলবৃত্তি ও অযাচিতবৃত্তি উঁহাদিগের মধ্যে প্রশস্ত। অধুনাতন ভট্টাচার্য্যদিগের উঞ্ছ ও শীলবৃত্তি নাই; উঞ্ছ ও শীলবৃত্তির নাম সংসার-ত্যাগ। ইহা অত্যন্ত কষ্টকর, অতএব এই দুই বৃত্তি উঠিয়া যাওয়ায় আমরা তাদৃশ দুঃখিত নহি। ত্রিশ ও চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষায় শরীরপাত করিয়া শেষ যদি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে কেহই আর বিদ্যাশিক্ষা করিতে চাহিবে না। অযাচিত বৃত্তির নাম ভট্টাচার্য্যবিদায়-প্রণালী। উহার অর্থ এই যে, ভট্টাচার্য্যেরা আপন টোলে বসিয়া ছাত্রদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র না লইয়া বিদ্যাদান করিবেন; লোকে সময়ে সময়ে ডাকিয়া (তাঁহারা ভিক্ষা করিতে যাইবেন না, চাহিবেনও না) তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিবে। আমরা পুনরায় এই দেওয়ার নামকে কর বলিলাম। আডাম স্মিথ করগ্রহণপ্রণালী অধ্যায়ে করগ্রহণ সম্বন্ধে যে চারিটি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন, এ কর সে চারি নিয়মের একটি নিয়ম অতিক্রম করে নাই। আডাম স্মিথের প্রথম নিয়ম এই যে, শক্তি ও অবস্থা-নুসারেই সকলের কর। ভট্টাচার্য্য-বিদায় কেহ আপন শক্তি অতিক্রম করিয়া করেন না। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, কর দিতে হইলে কত দিতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা ভট্টাচার্য্য-বিদ্যাস্থলে সে ভার করদাতার হস্তে, সুতরাং এ নিয়ম কোন কালেই অতিক্রম হইবার নহে। তৃতীয়, করদানসময়ের সুবিধা অর্থাৎ যে সময়ে করদাতার সুবিধা হয়, সেই সময়েই উহা আদায় করিতে হইবে। যে সময়ে লোকে আপন খুসিতে কোন সমারোহে অনেক অর্থব্যয় করে, সেই সময়ে তাহার এক অংশই ভট্টাচার্য্যদিগকে দেয়; যখন খরচ করিতে চান, তখন ভট্টাচার্য্য-বিদায় একটিবার হয়, সুতরাং দানে দাতার কোনওরূপ অসুবিধা নাই।

চতুর্থ নিয়ম এই যে, দাতার পকেট হইতে যত যাইবে, সমস্তই যেন গ্রহীতার পকেটে উপস্থিত হয়, মধ্যস্থলে যেন কিছু বাঁচিয়া না যায়। ভট্টাচার্য্যবিদায়ে এ নিয়ম লঙ্ঘন হয় না, যাহা যাহা দেন, সমস্তই ভট্টা-চার্য্যদিগকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, মধ্য হইতে অধ্যক্ষ কেবল কিঞ্চিৎ পারিতোষিক লন। অতএব যত প্রকার এডুকেশান দেশশিক্ষকের আছে, তাহার মধ্যে ভট্টাচার্য্যবিদায়ের প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আমরা ভট্টাচার্য্যবিদায়ের প্রণালীকে দুই আকারে দেখিব। প্রথম শিক্ষাকর, দ্বিতীয় উচ্চ-অঙ্গের চিন্তাশক্তির উৎসাহদানের উপায়।

১। অধ্যাপকেরা একেবারে কি লয়েন না, সমস্ত শিক্ষা বিনামূল্যে বিতরিত হয় (gratis)। শুধু তাহাই নহে। ভট্টাচার্য্যদিগকে ছাত্রগণের আহার যোগাইতে হয় অর্থাৎ স্কলার্সিপ দিতে হয়; ভট্টাচার্য্যদিগের শিক্ষা লোকশিক্ষা নহে, উহা দ্বারা সাধারণ লোক লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে মাত্র শিখিবে, তাহা নহে, উহাতে বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য অলঙ্কার ভাষা ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দেওয়া হয়; অতএব উহা উচ্চশিক্ষা। যে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন অথচ প্রকৃত উচ্চশিক্ষা কিছুই হইয়া উঠিতেছে না, আমাদের প্রণালীতে হইলে সেই শিক্ষায় এক পয়সা ব্যয় হইত না অথচ ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিলে উহা হইতে উচ্চাঙ্গের চিন্তাশক্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত। উচ্চশিক্ষার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি স্কলারসিপ দিয়া থাকেন; সেগুলি বাস্তবিক উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় হয় না, কারণ, কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত যাহা পড়া হয়, তাহাকে উচ্চশিক্ষা বলিতে প্রাণ কেমন করে। নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রেরা যাহা বাঙ্গালায় তিন বৎসরে শিখে, আর ১৫ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপন করে, কালেজে তাহাই অথবা তাহা অপেক্ষা অল্প ইংরাজীতে লিখিতে ২০ বৎসর যায় আর অন্ততঃ ৭।৮ বৎসর পড়িতে লাগে। অতএব নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষা যদি উচ্চশিক্ষা না হয়, তবে বি-এ পর্য্যন্ত শিক্ষা উচ্চশিক্ষা নহে। যে ছাত্রবৃত্তিসমূহ প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাও উচ্চশিক্ষার জন্য নহে, তাহা মধ্যবিধ শিক্ষার জন্য। আমরা যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলিতেছি, তাহা কালেজে হয় না, তাহা কালেজের পর হয়—অতএব সে উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য কি উপায় অবধারিত আছে?—কিছুই নাই। যে এক প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারসিপ আছে, তাহাতেও কি জানি কোন অভিশাপে এরূপ উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত লোক জন্মিল না। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রেমচাঁদ স্কলারসিপ হইতেই ভবিষ্যতে চিন্তাশীল ব্যক্তির উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা।

২। আমরা ওরূপ স্কলারসিপ বৃদ্ধি না করিয়া যদি ভট্টাচার্য্যবিদায়-প্রণালীর বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করি, তাহা হইলে অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়াও বাঞ্ছিতফললাভের অধিকতর সম্ভাবনা। সত্য বটে, এক্ষণে ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত স্বাধীনচিন্তাবিশিষ্ট লোক অতি বিরল। কিন্তু উত্তমরূপ সংস্কার দ্বারা—রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উহার এতদূর উন্নতি করিতে পারা যায় যে, উহা সভ্যমণ্ডলীর আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। ভট্টাচার্য্যদিগের সংস্কারের এক প্রধান সুবিধা এই যে, আজিও উহাদের দল পাকান হয় নাই, যেখানে দল পাকে, সেইখানেই উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশক্তি লোপ হইয়া সাংসারিকতার বৃদ্ধি হয়, অতএব দল যাহাতে না পাকে, তাহার বিশেষ চেষ্টা থাকা আবশ্যক। যেখানে সকলেই স্ব স্ব প্রধান এবং সকলেই এরূপ স্বাধীন প্রাধান্যের অহঙ্কার করেন, সে স্থলে দল পাকিবার সম্ভাবনা অল্প! এক শত বৎসর ইংরাজ শাসনে যদি কোথাও স্বাধীনভাব বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহা আজিও ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে আছে। কিন্তু ক্রমে ভট্টাচার্য্যেরা এই স্বাধীনতা লোপ করিয়া ফেলিতেছেন। আদর অল্প হওয়ায় যতই ভট্টাচার্য্যদিগের বিদ্যা অল্প হইয়া আসিতেছে, যতই তাঁহাদিগের প্রতি লোকের ঘৃণা জন্মিতেছে, ততই তাঁহারা ক্রমে আপনাদিগকে ঘৃণার সম্পূর্ণ পাত্র করিয়া তুলিতেছেন। ক্রমশঃই ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যাশূন্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন। পাঁচ শত পত্র দিতে হইলে দুই শত চলিত পত্র হয় আর তিন শত হয় উপরোধে। যাঁহারা এরূপ উপরোধ করেন, তাঁহাদিগকে ধিক্! তাঁহারা এইরূপ উপরোধ করিয়া ও লইয়া হিন্দুদিগের একটি উৎকৃষ্ট রীতিকে যৎপরোনাস্তি কলুষিত করিয়া থাকেন। ক্রমে এক্ষণে দেখা যায় যে, চলিত পত্রমধ্যেও অধিকাংশ মেকী, কাহারও মাতামহ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া এক্ষণে টোলঘর ভাড়া দিয়াও পত্র পান, কেহ রাজা রাজচন্দ্রের বাড়ীর পুরোহিত, তিনি "বড়লোকঃ সহায়ো যস্য স এব বড়পণ্ডিতঃ।" "বর্ণজ্ঞানাবচ্ছিন্ন তথাপি বড় পণ্ডিতঃ" হইলেন। তাঁহার চলিত পত্র হইল, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই অধ্যক্ষতা করিয়া পত্র হয় অর্থাৎ রাজা দিনদয়াল কর্ম্ম করিয়া পত্র দিলেন, রাজার এক জন পারিষদ—একটু ব্যাকরণজ্ঞান ছিল, অধ্যক্ষ হইলেন, তিনি অমনি বড় পণ্ডিতের মধ্যে গণ্য হইলেন—তাঁহার পত্র চলিল। শুনিয়াছি, এক জন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার বিদ্যাসাধ্য যে অধিক, তাহা কখন শুনি নাই—তিনি শুদ্ধ ভট্টাচার্য্যেরা তাঁহার দেশে গেলে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক আতিথ্য করিয়া এমন প্রতিপত্তি করিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহার সর্ব্বত্র পত্র হয় ও বিদায় প্রায় সর্ব্বোচ্চ। যদি এই সকল দোষ সংশোধন করিয়া, যাঁহারা বিশেষ জ্ঞানাপন্ন, যাঁহারা যথার্থ অধ্যাপকতা করিতেছেন, শুদ্ধ তাঁহাদিগকেই পত্র দেওয়া হয়, এবং বিশেষ খ্যাতি না থাকিলে পত্র না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার আবার উৎসাহ দেওয়া হয়। আর

ভট্টাচার্য্যেরা শুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চ্চা লইয়াই কেন ব্যস্ত থাকিবেন, তাঁহারা ইংরাজী পড়ুন, ইংরাজী দর্শন বিজ্ঞানের অধ্যাপকতা বাড়ী বসিয়া করিতে থাকুন, ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে পাণ্ডিত্যের সহিত ধর্ম্মের যেরূপ নৈকট্যসম্বন্ধ, বঙ্গদেশে সেরূপ নহে। বঙ্গদেশে ভট্টাচার্য্য শিক্ষা অনেকটা Secular, সুতরাং তাঁহারা কেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অধ্যাপকতা আত্মকরগত করুন না। ইংরাজীমুখে সহস্রমুদ্রা বেতনভোগী ইংরাজ শিক্ষক দ্বারা দর্শন বিজ্ঞান ভাষাশিক্ষা অধিক দিন টিকিবে না। ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষা দেশীয় উপায়ে দিতে হইবে। দেশীয় সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা ভট্টাচার্য্যপ্রণালী সস্তা ও সমাজস্থ লোক সুবোধ হইলে অধিক কার্য্যকর। অধ্যাপক বেতনভোগী হইলে তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। ছাত্রদত্ত দক্ষিণা বা Fee ভোগী হইলে দক্ষিণার উপর তাঁহার ঝোঁক দাঁড়ায়। কিন্তু সমাজ যদি ভট্টাচার্য্যদিগের চলাচলের ভার লন, যদি ভট্টাচার্য্যগণ অন্নের জন্য বড়মানুষের খোসামোদ করিয়া দু-পয়সা পাওয়ার প্রত্যাশায় বৃথাসময়ক্ষেপ করিতে বাধ্য না হন, তবে তাঁহারা অনায়াসে চিন্তাশীলতা ও বিদ্যাচর্চ্চার চরমোৎকর্ষসাধন করিতে পারেন। অতএব অধ্যাপকগণের যাহাতে ভালরূপ গুজরান হয়, যাহাতে তাঁহারা স্বকর্ত্তব্যসাধন করিতে পারেন, এবং ফাঁকি দিতে না পারেন, সে বিষয়ে সমাজের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ফাঁকি দেওয়া মনুষ্যের স্বভাব, অধ্যাপকগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই যে তৎস্বভাব ত্যাগ করিতে পারিবেন, তাহার কোন অর্থ নাই। কিন্তু আমাদের অধ্যাপকেরা একখানা টোলঘর খাড়া করিয়াই কিসে দুই পয়সা পান, সেই চেষ্টাতেই দিনরাত বড় মানুষের খোসামোদ করিয়া ছুটিয়া বেড়ান, সেটা আবার অত্যন্ত ঘৃণাকর। টোল খুলিলেন ত লেখাপড়া দক্ষিণান্ত হইল, কেবল জুয়াচুরী খোষামোদ আরম্ভ হইল, কেবল ছেলেবেলায় এক দিন লেখাপড়ায় যে বড় সাইন করিয়াছিলেন, সেই দাম্ভিকতা মাত্র বাকি রহিল, ভড়ং বাড়িল, কার্য্যে অষ্টরম্ভা। যাহাতে আমাদের অধ্যাপকগণ এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার হন, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা ভদ্রলোকমাত্রেরই উচিত। উপায় গুণের পুরস্কার ও নির্গুণের তিরস্কার। কিন্তু গুণ ও দোষ নির্ব্বাচন করে কে? অধ্যক্ষ, অতএব অধ্যক্ষের উপর একটি গুরুতর ভার পড়িতেছে। অধ্যক্ষ কোনক্রমেই অনুপযুক্ত লোককে পত্র দিবেন না, পক্ষপাতিতা করিবেন না, নিজে সর্ব্বপ্রধান বিদ্বান্ হউন, আর নাই হউন, সর্ব্বশাস্ত্রে দৃষ্টিবান কর্ম্মঠ লোক হইবেন, যেখানে 'ছাইতে না জানেন, সেখানে গোড় চিনিতে' পারিবেন। কিন্তু দেশের মধ্যে যদি এক বা দুই জন মাত্র অধ্যক্ষ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যথেচ্ছাচার হইয়া দাঁড়াইবে। এজন্য অধ্যাপকমাত্রেরই অধ্যক্ষতাকর্ম্মে পারদর্শী হওয়া উচিত। সকল অধ্যাপক অধ্যক্ষ, এবং অধ্যক্ষ অধ্যাপক হইলে পক্ষপাতাদি না হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী গুণগ্রাহী কর্ম্মঠ অথচ ব্যবসায়ান্তরাবলম্বী অপত্রপ্রত্যাশী অধ্যক্ষ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই নাই।

কিরূপ লোক অধ্যক্ষ হইবেন, বলা হইল; কিন্তু কিরূপ লোক পত্র পাওয়ার উপযুক্ত, তাহাও জানা আবশ্যক। মাথা চাঁচা দেখিলেই ভিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু পত্র দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ, পত্র মান, পত্র কর। যাহার কর গ্রহণে অধিকার নাই, তাহাকে কেন কর দিতে যাইব? আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে বাল্যে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যৌবনেও লেখাপড়ার চর্চ্চায় ও চিন্তাশীলতা উদ্দীপনে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারাই পত্রপ্রাপ্তির উপযুক্ত, শুদ্ধ টোল করিয়া পড়াইলেই যে তাহাকে পত্র দিতে হইবে, তাহার কোন মানেই নাই। বিদ্বান ব্যক্তি মূর্খ না হইলেই বা বইয়া না গিয়া বিদ্যানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিলেই সে পত্রপ্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র।

এইরূপ অধ্যক্ষ ও এইরূপ অধ্যাপক হইলে চিন্তাশীলতার বৃদ্ধি হয়, উচ্চশিক্ষা প্রস্থত হয়, শিক্ষা ভাল হয় এবং সহজ হয়। কিন্তু হায়, কি আক্ষেপের বিষয়, ভট্টাচার্য্যেরা নিজে জুয়াচোর ভণ্ড হইয়া ও জুয়াচোর এবং ভণ্ডদিগকে আপন দলস্থ করিয়া এবং মূর্খ বড়মানুষেরা না বুঝিয়া যাকে তাকে পত্র দিয়া ব্যবসায়টি মাটীই করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও মহান্ অনিষ্ট-সংসাধন করিতেছেন।

[বঙ্গদর্শন ৭ম বর্ষ—১২৮৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যা।

সমাপ্ত

সমাজ-সংস্কার নিবন্ধরাজি

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই প্রণীত

সমাজের পরিবর্ত্ত কয় রূপ

আজিকালি সমাজ-সংস্কারের বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে। 'সমাজ-সংস্কার কর' বলিয়া কত লোক যে উচ্চৈঃস্বরে গলাবাজী করত ছাপার নাম তুলিয়া লইল, তাহার ঠিকানা নাই। কেহ বিবাহ-সংস্কার, কেহ ধর্ম্ম-সংস্কার, কেহ সমাজ-সংস্কার, কেহ ভারত-সংস্কার, কেহ লেখন-সংস্কার লইয়া দিনকত গোলযোগ করতঃ শেষ, বড় লোক,—গট হইয়া ঘরে বসিয়া গল্প মারিতে লাগিলেন। অনেকেই আপন কাজ অর্থাৎ কিছু পয়সা মারিয়া লইলেন। বিবাহ, ধর্ম্ম, সমাজ, ভারত, লেখন যেমন তেমনি রহিল, তাহাদের আর সংস্কার হইল না। লোকে প্রথম গোলযোগ, নাম সই, দরখাস্ত, লেখালেখি, বকাবকি তুমুল কাণ্ড দেখিয়া ভাবে, এইবার বুঝি কিছু হবে, শেষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে, কি হলো !! বহুকাল ধরিয়া লোকে বলিয়া আসিতেছে, কি হলো !!! অথচ কিছুই হয় না। কেন? কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ খুঁজিতে গেলে প্রথম কারণ কেহই বলিয়া উঠিতে পারে না। আমরা বলি, সংস্কার জিনিসটা কি, একবার তত্ত্ব লওয়া যাউক না কেন? সংস্কারের লক্ষণ কি? প্রকৃতি কিরূপ? কোথায় সংস্কার দরকার হয়? সংস্কার ভিন্ন আর কোন সমাজ-পরিবর্ত্তন আছে কি না? যদি থাকে ত সে কিরূপ? অদ্য আমরা তাহাই দেখিতে বসিব। আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব সংস্কার ও বিপ্লব।

সংস্কার ও বিপ্লব, দুইটি কথার অর্থ কি? সংস্কার শব্দে মেরামত, কোন জায়গা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা সারিয়া লওয়ার নাম সংস্কার। যেমন আমরা বাটীর সংস্কার বা মেরামত করিয়া থাকি। বিপ্লব শব্দে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেওয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেওয়া; কেহ কেহ বলেন, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়ার নাম বিপ্লব; আমরা এ প্রস্তাবে সেরূপ অর্থ গ্রহণ করিব না। কেন? পরে জানা যাইবে। এই দুই প্রকার উপায়ই সময়ে সময়ে দরকার হয়। যখন কোন নূতন সমাজ কোন কারণবশতঃ বিপথগামী হয়, তাহার পরিবর্ত্ত আবশ্যক হয়, সেই পরিবর্ত্তের নাম-সংস্কার। যেমন আথেন্সে ও রোমে ঋণসংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত্ত। যাহারা ঋণ দিত, তাহারা খাতকদিগকে দাস করিত, প্রহার করিত, চুণের গারদে পুরিয়া রাখিত, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিয়া লইত ইত্যাদি, এ অবস্থায় দেশের সমস্ত লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাতে যে বন্দোবস্ত দ্বারা ঋণ-সংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত্ত হইল, সে আইন দ্বারা সমাজ-সংস্কার হইল। ইংলণ্ডের বন্দোবস্ত দেশের লোকে দেশ শাসন করিবে। ১৮৩২

সালে ইংরেজ প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিল যে, যদি দেশের লোকেই দেশ শাসন করিবে, তবে আমাদের লোক কেন মহাসভায় না যায়। তখন রিফরম (Reform Bill) পাশ হইল। রিফরম বিল সমাজ সংস্কার করিল। আবার যখন ফ্রান্সের রাজা, ওমরাহবর্গ ও ধর্ম্মযাজকগণ সকলেই অত্যাচার করিতে লাগিলেন, যখন রাজার বাবুগিরির খরচে, রাজার বেশ্যাদিগের পেন্‌সন দিতে রাজকোষ শূন্য হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন প্যাকটডি ফেমিন (দুর্ভিক্ষ সমাজ) দেশের সমস্ত শস্য ক্রয় করিয়া গোলাজাৎ করত দেশে রোজ রোজ দুর্ভিক্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ব্ব-সঞ্চিত শস্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বড় মানুষ হইতে লাগিলেন, তখন যে কয়েক জন সামান্য লোকের সর্ব্বশক্তিমতী লেখনীপ্রভাবে ফ্রান্সের লোকের চক্ষু উন্মীলিত হইল—যে উন্মীলনে রাজা, ওমরাহ, ধর্ম্মযাজক বাষ্টাইল, অত্যাচার কোথায় উড়িয়া গেল, তাহারই নাম বিপ্লব। ঐ যে আবার ইতালি ও জর্ম্মাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালী ও নানাবিধ অত্যাচার কাটাইয়া একত্র হইতেছে, ইহাও বিপ্লব। ১৬৪৪ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা যে জেমস্‌কে তাড়াইয়া উইলিয়মকে রাজা করিয়া বিপ্লব বিপ্লব বলেন, সে বাস্তবিক বিপ্লব নহে, সে রাজপরিবর্ত্ত মাত্র। সে সংস্কারও নহে, সে বিপ্লবও নহে। আর ইতিহাসের শ্রাদ্ধ না করিয়া মোটা কথায় একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিই। একটা নূতন বাটীর যদি কোথায় একটু চিড় খায়, তাহার মেরামতের নাম সংস্কার। মনে কর, বাড়ীর দুইখানি কড়ি বদ্‌লাইতে হইল, ছাদে দাগ-রাজি করিতে হইল, সে সকলই সংস্কার; কিন্তু যদি বাড়ীটি চৌচাপটে বসিয়া যায় কিম্বা একদিক বসিয়া গিয়া মাঝখানে ফাঁক হইয়া পড়ে, কি অতি প্রাচীন লোণাধরা জরাজীর্ণ হয়, তবে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, সেই ভাঙ্গিয়া ফেলার নাম বিপ্লব। ফল কথা এই, খানিক বদলাইতে হইলেই সংস্কার, আর বুনিয়াদ শুদ্ধ বদলাইতে হইলেই বিপ্লব।

সমাজ-সংস্কার বলিলে বুঝায় যে, সমাজটি যেমন আছে, আদত তেমনটিই থাকিবে। আসলে যেন কোন বিঘ্ন না হয়। বিপ্লবে বুঝায়, আসলই বদলা-ইতে হইবে। সমাজ যেমনটি ছিল, তেমনটি আর না থাকে। সংস্কার করিতে গেলে দেখায় যে, কোন্‌-টুকুতে অনিষ্ট হইতেছে, কোন্‌টুকু বদলাইতে হইবে। বিপ্লবে সেটুকু ঠিক করিবার যো নাই। বিপ্লবে ভাল মন্দ এই দুই অনিষ্ট হইতেছে বোধ হয়। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, ঠিক করিবার উপায় থাকে না। সংস্কারে উদ্দেশ্য ঠিক করিতে পারা যায়, যখন জানা যায় যে, এইটুকু মন্দ, তখন এইটুকু এই উপায়ে বদলাইলেই ভাল হয়, তাহাও জানা যায়। কিন্তু বিপ্লবে উদ্দেশ্য ঠিক হয় না, কতটুকু বদলাইতে হইবে, তাহার নিশানা হয় না। এই জন্যই দেখা যায়, সংস্কার স্থলে লোকে বলে, এই আমরা চাহি। বিপ্লব স্থলে বলে, আমরা এ সব আর চাহি না। রিফরম বিল লইয়া গোলযোগের সময় লোকে বলিল, আমাদের রেপ্রেজেণ্টেটিব দিতে হইবে। ফ্রেঞ্চ বিপ্লবে লোকে বলিল, আমরা রাজা চাহি না, ওমরাহ চাহি না। এইরূপ উদ্দেশ্য স্থির থাকে বলিয়াই দেখা যায় যে, সংস্কার স্থলে রফা-রফিয়াৎ চলে। অর্থাৎ প্রথম অনেক চাহিয়া বসিলেও শেষ কতক দিয়া ঠাণ্ডা করা যায়। যে রিফরম বিলের সময় লোকে সমস্ত লোকের মত লইয়া মেম্বার পাঠাইতে হইবে চাহিয়া বসিল, শেষ রফা হইল, যাহারা বৎসরে ১০ পাউণ্ড খাজনা দেয়, তাহারাই পারিবে, আর কেহ পারিবে না, কিন্তু বিপ্লবস্থলে প্রথম অল্পপরি-বর্ত্তের জন্য আরম্ভ হয়, শেষ সব না বদলাইয়া তৃপ্তি হয় না। ফরাসীরা শাসনপ্রণালী বদলাইবার জন্য আরম্ভ করিয়া শেষ না বদলাইয়াছে, এমন জিনিসই নাই। তাপমান যন্ত্রের মাপ করিবার পারা পর্য্যন্ত বদলাইয়াছে। যত রকম ওজন, মাপ ছিল, সব দশমিক অঙ্কে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছিলাম—বিপ্লবে উদ্দেশ্য ঠিক করা যায় না বলিয়াই বলিয়াছিলাম যে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়ার নাম বিপ্লব নহে, ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফেলার নাম বিপ্লব। গড়িতে গেলে উদ্দেশ্যটা ভাঙ্গার আগে হইতেই ঠিক থাকা চাহি; বিপ্লবে তাহা একেবারে থাকে না। বিপ্লবে যদি কোন উদ্দেশ্য গোড়াগোড়ি স্থির থাকে, তবে সে এই;—

বর্ত্তমান সমাজের দ্বারা আমাদের কাজ চলিতেছে না, ইহাকে ভাঙ্গিয়া মনুষ্যকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন কর, তাহার পর দেখা যাইবে, যদি মনুষ্য সমাজ ভিন্ন থাকিতে না পারে, তখন উপস্থিতমত বিচার করা যাইবে, গড়ার কথা পরে হইবে, আগে ভাঙ্গ, আগে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হও।

উপরে সংস্কার ও বিপ্লবের যেরূপ বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাতে আর একটি মতও দূষিত হইল। অনেকে যে বলেন, "ভাঙ্‌বি ত আগে গড়তে শেখ", আমরা বলি, গড়তে শেখার দরকার নাই। ভাঙ্গিতে

পারিলেই হইল। তবে এক কথা এই, সংস্কার সকলে বুঝিতে পারেন, এইটুকু মন্দ আছে, বাপু, ভাল করিয়া লও। বুদ্ধি যতই মোটা হউক না, এটা সবাই বুঝিতে পারে। কিন্তু বিপ্লব বুঝা কিছু কঠিন। বর্ত্তমান যা আছে, সব বদলাইব, কি হইবে জানিতে পারিব না, ইহা বুঝিয়া, এরূপ কার্য্যে সাহসী হইয়া হস্তক্ষেপ করা সকল মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। আগে ত কেহই বুঝিত না; অষ্টাদশ শতাব্দীর ফিলজফারদিগের কল্যাণে এখন তবু কেহ কেহ বুঝিতেছে। পৃথিবীর সমাজ সকল যেরূপে গঠিত, তাহাতে লোকের "যা আছে বেশ, এর আর বদল কাজ নাই" এই ভাবই জন্মে। বদলাইতে ত ইচ্ছা করেই না, তবে একটু আধটু বদলাইলে যদি ভাল হয়, ক্ষতি নাই। "একেবারে সব বদল, বাপু রে, সে যে বড় ভয়ানক, যা আছে, এর কিছু থাকবে না, না, তা ত পারব না" এই ভাবই বেশী, সুতরাং বিপ্লব কেমন করিয়া হইবে? তবে যে দুই একটি বিপ্লব মাঝে মাঝে হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সমূল পরিবর্ত্তও হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ এই :—তখন লোকে মনে করিয়াছে যে, বর্ত্তমান পাপের ভার, বর্ত্তমান অত্যাচাররাশি আর সহিতে পারি না, এর চেয়ে মরণ ভাল। এ অবস্থা বদলাইলে সুখ হউক আর নাই হউক, অত্যাচার কমিবে, অন্ততঃ উহার রূপান্তরও হইবে। এই বলিয়া জীবনাশায় বিসর্জ্জন দিয়া উন্মত্ত হইয়া লাগিয়াছে, একটা প্রলয় হইয়া গিয়াছে। যে সকল বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, অধিকাংশ পূর্ব্বোক্তরূপ নৈরাশ্যভাব হইতেই হইয়াছে। আর যত বিপ্লব হইয়াছে, অধিকাংশ রাজপরিবর্ত্ত, রাষ্ট্রবিপ্লব অথবা শাসনপ্রণালীপরিবর্ত্ত। সমাজপরিবর্ত্ত এক ফ্রান্সে হইয়াছে, আর কোথায় হইবে? আমরা যে বিপ্লবের কথা কহিতেছি, এও সমাজবিপ্লব। সমাজের আদ্যন্ত পরীক্ষা করিয়া সমাজসংস্কার আবশ্যক বা বিপ্লব আবশ্যক, এরূপ বিচার কোথায় হইয়াছে, বলিতে পারি না। সমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বহুদিন আগে এ সমাজ এ ভাবে চলিবে কি না বলিয়া দেওয়া সামান্য সমাজতত্ত্ববিদের কার্য্য নহে; কিন্তু য়ুরোপে অনেকে ৪০।৫০ বৎসর আগে যে সকল ভবিষৎবাণী করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেক সিদ্ধ হইয়াছে এবং বোধ হয়, চেষ্টা করিলে আরও স্পষ্টরূপে বলা যাইতে পারে। যাহারা বহুদিন পদ্মায় মাঝিগিরি করিতেছে, তাহারা মেঘের আকার, বায়ুর গতি দেখিয়া ৪।৫ ঘণ্টা আগে ঝড় হইবে টের পায়, যদি উদ্ধারের উপর থাকে করে, আর যদি না থাকে, সেই ৪।৫ ঘণ্টা আগেই বলিয়া দেয়—"যে যার চেষ্টা কর, রক্ষা হবার নয়"। বিপ্লবের পূর্ব্বেও ঠিক সেইরূপ বলা চাহি। তবে সমাজতত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে, সমাজনৌকা সময়স্রোতে বেশ চলিয়া আসিতেছে, ঐ পাহাড়ে, ঐ চড়ায় তাহার বানচাল হইবে, এই উপায়ে অন্য পথে চালাইতে পারিলে উদ্ধার, নচেৎ সর্ব্বনাশ। অথবা "এ সমাজগৃহ অত্যন্ত জরাজীর্ণ, সামান্য বাতাসেই ভূমিসাৎ হইবে, বাতাসে পড়িলে অনেক লোক মারা পড়িবে, কাজ নেই, এই বেলা বাতাস না উঠিতে ইহার বিনাশ সম্পাদন কর।" এই সকল কথা যখন বলিতে পারিবে, তখন সমাজতত্ত্বশাস্ত্রের দ্বারা জগতের উপকার হইল বলিয়া স্বীকার করিব। সমাজের সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার কোথায় কি দোষ আছে এবং সেই দোষের জন্য সংস্কার প্রয়োজন বা বিপ্লব প্রয়োজন, বলা সহজ নহে এবং সংস্কার যেখানে প্রয়োজন, সেখানে বিপ্লব হইলে এবং বিপ্লবস্থলে সংস্কার হইলে জগতে ভয়ানক অনিষ্ট হয়; এবং এ পর্য্যন্ত কত দেশ যে এই দোষে উৎসন্ন গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ফরাসীদেশে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যে ভয়ঙ্কর প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহাতে সে এক প্রকার নূতন জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। সে নূতন সমাজে আর বিপ্লব প্রয়োজন করে না। বোধ হয়, কোন বিষয়েই বদল দরকার হয় না, কিন্তু এই ৮৯ বৎসরের মধ্যে সেখানে ৪।৫টি বিপ্লব হইয়া গেল, নূতন সমাজে বিপ্লব হইলে সমাজের শক্তি হ্রাস হয়, তাহা গত প্রুসিয়ার যুদ্ধে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। যেখানে সংস্কারস্থানে বিপ্লব করা হয়, সেখানে ত এইরূপ, আবার যেখানে বিপ্লবস্থানে সংস্কার হয়, সম্পূর্ণ বদল না করিয়া কিছু পরিবর্ত্তে শান্ত থাকা যায়, সেখানে দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। সাক্ষী রোম, রোমের ইতিহাস আদ্যন্ত এই মহৎ সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রোমের সমাজ একটি নগরের সমাজ, এক নগরের শাসন, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখসমৃদ্ধির জন্য যা কিছু দরকার, রোমে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ক্রমে সেই এক নগরীর অদৃষ্টে সমস্ত জগতের আধিপত্য ঘটিল। তখন আর পুরাণ নগরশাসনপ্রণালীতে চলিবে কেন? তখন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত স্বতই প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু সেটি কেহ বুঝিতে পারিল না। যে সেনেট খৃষ্টাব্দের (৪০০) বৎসর পূর্ব্বে সুচারুরূপে রোম শাসন করিয়াছে, সেই সেনেট খৃঃ পূঃ ১৫০

ইউফ্রেটিস্ হইতে আটলাণ্টিক পর্য্যন্ত শাসন করিতে পারিবে কেন? রোমের পক্ষে ভয়ঙ্কর দিন সুতরাং উপস্থিত হইল। এক শত বৎসর ধরিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত, খুন, মারামারি, কাটাকাটি—অত্যাচার, লোমহর্ষণ উৎপীড়ন, নগরদাহ প্রভৃতি পাঠ করিলে শরীর কণ্টকিত হয়। পৃথিবীর অমন দিন যেন আর না হয়। এই সময় এক জন লোক কেবল সম্পূর্ণ বিপ্লব করিতে চেষ্টা করেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন, এ ভাবে আর চলিবে না। সেই লোক কয়াস্ গ্রেকাস্। তাঁহার কথা কেহ শুনিল না। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য গণনা, এক শত বৎসরের রক্তস্রোতের পর শেষ তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই দাঁড়াইল। অগষ্টস্ যাহা করিলেন, গ্রেকাস্ও ঠিক তাহাই করিতে চাহিয়াছিলেন। রোমের স্বাধীনতা-বিলোপ ও যথেচ্ছাচার নামক শাসনপ্রণালী প্রচলন, এই বিপ্লবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিপ্লব হইল বটে, বিপ্লবে উপকারও হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় তিন বৎসর বিশাল রোমান-সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল, অন্ততঃ ভয়ানক অন্তর্বিদ্রোহ হয় নাই। কিন্তু যথেচ্ছাচারে সমস্ত লোকের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল, শেষ সেই বিশাল সভ্যসাম্রাজ্য অসভ্য লোকের উৎপীড়নে লণ্ডভণ্ড হইয়া আবার কতশত বৎসর ধরিয়া পৃথিবী শুদ্ধ রক্তস্রোতে আর্দ্র করিতে লাগিল। পরিণামে যাহাই হউক, যখন অগষ্টসের সময় বিপ্লব সমাধা হয়, তখন সকলেই বলিয়াছিল, "আঃ, বাঁচিলাম, এক শত বৎসরের অরাজক ত শেষ হইল, এখন নিশ্বাস ফেলিবার সময় হইল।" ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে বুঝিতে একটু দেরী হয়, আবার সেই ভাঙ্গা বাড়ীর দৃষ্টান্তে দেখাই। যদি যখন বাড়ীটির একটু দাগরাজী হইলেই চলে, সে সময় তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেল, তাহাতে গৃহস্থের অনিষ্ট বৈ ইষ্ট নাই। আবার যখন বাড়ীটি সম্পূর্ণরূপে জরাজীর্ণ হইয়াছে, যখন একটু বাতাস হইলেই বুনিয়াদ শুদ্ধ নড়ে, যখন লোণা লাগিয়া সব ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অশ্বত্থগাছের শিকড় যখন তেতলা হইতে নামিয়া মাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল নয় কি? তাহার যতই মেরামত কর, নিশ্চিন্ত হইয়া সে বাড়ীতে কাহারও বাস করিবার যো নাই। বরং যে গৃহস্থ ভাঙ্গা মন্দিরে নিত্য খোয়া দিতে থাকে, তাহার টাকার বাড় বাঁধে না, হাজার সারাও, কখন্ পড়িবে কখন্ পড়িবে ভয় সর্ব্বদাই করিবে। শেষ এক দিন হয় ত পড়িয়া গিয়া সহস্র সহস্র লোকের গোর হইয়া চিরকাল প্রতিবেশীদিগকে ভূতের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। এরূপ বাড়ীর সংস্কার করিলে হয় ত দু' পাঁচটি ঘর বাসযোগ্য হইতে পারে, অথবা এখনি পড়িত, না হয় দু' বৎসরের জন্য তাহা রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই দুই বৎসরও সর্ব্বদা সশঙ্কিত। আমার মতে তেমন বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল। এই ভাঙ্গা বাড়ীর দৃষ্টান্তটি আমাদের হিন্দু সমাজে বেশ খাটে। হিন্দুসমাজ কতকেলে সমাজ যে, তাহার ঠিকানা হয় না। ইহার বুনিয়াদ অতি সঙ্কীর্ণ। মনুর সংহিতায় দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ যখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখন তাহারই কোথাও কোথাও প্রকৃত হিন্দুসমাজ ছিল। যখন এলাহাবাদের এ দিকে আর্য্যদিগের নাম ছিল না, যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বৈ জাতি ছিল না, তখন এই সমাজ ছিল। তাহার পর কত ধর্ম্ম, কত বিপ্লব গিয়াছে, কত নূতন শাসনপ্রণালী হইয়া গিয়াছে, এখন ২০০০ জাতি হইয়াছে। ভারতের অর্দ্ধেক মুসলমান হইয়াছে। ইংরাজেরা সর্ব্বোপরি সর্ব্বশক্তিময়ী ডানা বিস্তার করিয়া সকলকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে, হিন্দুসমাজের জাঁকটুকু ছাড়া আর কি আছে? এখন কি না আমরা হিন্দুসমাজকে ভারতসমাজের (Indian Nation) সঙ্গে এক করিয়া ধরি। কি ভুল! এমন হিন্দুসমাজের যত শীঘ্র অস্তিত্ব-বিলোপ হয়, ততই ভাল।

সমাজ মনুষ্যের জন্য, মানুষ সমাজের জন্য নহে। মানুষ আপনাদের সুখসমৃদ্ধি-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য সমাজ বলিয়া একটি নূতন সৃষ্টি করে। উচিত যে, যেমন মানুষের মনের শরীরের ও সংসারের অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সমাজেরও পরিবর্ত্তন হয়। তাহা হইলেই সমাজের উদ্দেশ্য স্থির থাকে। আরনোল্ড বলেন, সমাজেরও বাল্য, শৈশব ও যৌবন আছে, বৃদ্ধাবস্থাও আছে, মৃত্যুও আছে। সমাজের ক্রমে পরিবর্ত্তন স্বতই হয়, সেই পরিবর্ত্তনটি সমাজস্থ লোকের আয়ত্তমত করিয়া দেওয়া বড় দরকার। আপনি পরিবর্ত্তন হইলে এই-মত হইবে, এইমত হইলে এই দোষ হইবে, অতএব একে এ দিকে ফিরাও, ওরূপ দোষ ঘটিলে দেশের অনিষ্ট হইবে। এই সকল বিবেচনায় সমাজ চালান পাকা ড্রাইভারের কাজ। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, মনুষ্য সমাজের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সমাজ বজায় রাখাই মানুষের কাজ, যে অসুরের অবতার, সেই সমাজের পরিবর্ত্তন চাহে। এরূপ

ভাবিলে-ও তদনুসারে কার্য্য করিলে সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং বিস্তর অপকার হয়। এই কথা কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে। প্রথম উদাহরণ রোমান জগৎ। রোমসমাজ এক সময়ে সমস্ত জগৎ জয় করিয়া সমস্ত জগৎকে রোমান করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু উত্তরদেশীয় অসভ্যদিগের দৌরাত্মে সেই রোমান সমাজ লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোমের নাম-লোপ হইল। যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালীর প্রভাবে ও উৎপীড়নে রোমের যেরূপ নির্জীবাবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে রোমসমাজবিনাশ জগতের ভাবী উন্নতির সূত্রপাত মাত্র। রোমসাম্রাজ্য ধ্বংস হইল, রোম নগর ভস্মসাৎ হইল। রোমসাম্রাজ্য মধ্যে ১০।১২টি প্রবলপরাক্রম স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইল। নূতন আইন-কানুন চলিতে লাগিল, কিন্তু লোকে তখন বলিত, আমরা রোমান সাম্রাজ্যের লোক। ভস্মাবশিষ্ট রোমপুরী তখন তাহাদের মনে মনে রাজধানী রহিল। শেষ রোমক সাম্রাজ্য পুনরুদ্দীপন করা রাজাদিগের একটা উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। কত কাটাকাটি মারামারির পর ৩ বৎসর পরে সার লেমেন আবার হোলি রোমান এম্পারার উপাধি লইলেন। নামে রোম হইল, কাজে যে অসভ্য শাসন, তাই রহিল, সার লেমেন মরিলে আবার Emperor এই উপাধির জন্য ২০০ বৎসর লড়াই-ঝগড়া চলিতে লাগিল। শেষ দশম শতাব্দীতে ওথো আপন দেশে Emperor নাম বদ্ধমূল করিয়া গেলেন। ওথোর পরও এই Emperor হবার জন্য কত লোকে কত মারামারি করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহারও কারণ এই উপাধি। শেষ উপাধি পড়িল ডিউক অব অষ্ট্রিয়ার ঘাড়ে। অষ্ট্রিয়ার রাজ্য ছোট, নাম বড়। ডিউক এমপেরর তৃতীয় ফার্দ্দিনান্দের দারিদ্র্য ইউরোপে আজিও হাসির জিনিস হইয়া রহিয়াছে। শুদ্ধ হাসির জিনিস হইলে না হয় একটু হাসিয়াই ছাড়িয়া দিতাম। এই মৃত সাম্রাজ্যের জ্বালায় জার্ম্মাণী ও ইটালী কখন একত্রিত হইতে পারে নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া অমন সুখভূমি ইটালী শত শত বৎসর ধরিয়া শ্মশান-ভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। শেষ নেপোলিয়ান ১৮০৬ সালে রোমসাম্রাজ্যের নাম তুলিয়া দিলেন। তাহার ফল দেখ, ইটালী বাঁচিল, জার্ম্মাণী বাঁচিল, এই দুইটি দেশ এই ৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর প্রধান দেশমধ্যে গণ্য হইয়াছে।

যদি রোম নামের মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া ইটালী ও জার্ম্মাণী যখন উহাদের সুদিন ছিল, তখন হইতে আপন আপন নামে রাজ্য করিত, যদি একাদশ শতাব্দী হইতে মিলান প্রভৃতি নগরগুলি ও জার্ম্মাণী রাইনদ্বিবা নগর সমবায় সকল স্বাধীনভাবে উন্নতি লাভ করিত, তবে কি আর জার্ম্মাণী ইটালীর দুর্দ্দিন হইত, না ফ্রান্স এত দৌরাত্ম্য করিতে পারিত। সত্য বটে, ভাল জিনিস যত্ন ক'রে বেশী রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। রোমসাম্রাজ্যও একটি ভাল জিনিস। কিন্তু যখন সেই রোম ভাল জিনিস, যখন রোম ধ্বংস হইবে নিশ্চয়, জন কত Antiquarian লাগাইয়া দাও, রোমের যা কিছু ভাল ছিল, তাহার একটা রেজিষ্টর হইয়া থাকুক, ভবিষ্যতে লোকে পড়িয়া শিখিতে পারিবে। তাহা না করিয়া যখন সেই ভাল জিনিস রক্ষা হইবার নহে, তখন তাহা রক্ষার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া অগণ্য প্রাণিসংহার, যখন ধ্বংস হইয়া গেল, তখন আবার সেই মৃত বস্তুর ভূত উদ্ধারের বৃথা চেষ্টায় পৃথিবী শোণিতাক্ত করা, ভূত উদ্ধার হইলে সেই ভূত আশ্রিত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে ১২শত বৎসর ধরিয়া নানারূপ কষ্ট দেওয়া কি উচিত, না বিবেচনার কাজ? ভাল জিনিস ভাল, ভাল জিনিসের স্মৃতি ভাল। ভাল জিনিস মন্দ হইলে ভাল নয়। ভাল জিনিস কচলাইয়া তিত করিলে ভাল নয়, ভাল জিনিস পচাইয়া দুর্গন্ধ করিলেও ভাল নয়। রোম ভাল ছিল, কিন্তু রোমের যে ছায়া ১৮০৬ সাল পর্য্যন্ত ইয়ুরোপের মস্তক আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভাল ছিল না।

বঙ্গীয় পাঠক, য়ুরোপীয়দিগের আহাম্মকি দেখিয়া হাসিও না। তোমাদের সমাজও ঐরূপ ছায়াবৃত, ঐরূপ ভূতাবেশ বৈ আর কিছু নয়। তোমাদের যে হিন্দুসমাজ, বল দেখি—তার কি আছে? হিন্দু-সমাজ ছিল—যখন বুদ্ধদেব জন্মান নাই। বুদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইল, হিন্দুর আর কি রহিল? কিন্তু তোমরা এই ২৫০০ বৎসর কেবল ভূতের বোঝা টানিয়া বেড়াইতেছ বৈ নয়। বৌদ্ধদের সঙ্গে যত দিন সমাজে জোরে লড়িয়াছ, তত দিন তোমাদের জীবন ছিল সন্দেহ নাই। তাহার পর যে দিন হইতে মগধ সাম্রাজ্য স্থাপন হইল, সেই দিন হইতে কি তোমাদের পাততাড়ি গুড়ান উচিত ছিল না? তাহা না করিয়া বলবানের সঙ্গে দুর্ব্বলের বিবাহ হইলে দুর্ব্বলের যত দোষ ঘটে, সব তোমাদের ঘটিল, তোমরা ভীরুতা, দুষ্টামি, ফেরাবি শিখিতে লাগিলে। বৌদ্ধেরা ক্রমে ক্ষীণতেজাঃ

হইয়া আসিলে, তোমরা আবার প্রবল হইলে। তখন তোমাদের ঘটে যে বিষয়-বুদ্ধি ছিল, সেটুকুর লোপ হইয়া গিয়াছে। তোমরা নূতন সমাজ সৃষ্টি না করিয়া সেই সেকেলে বেদ উদ্ধার করিতে গেলে, পৌত্তলিক ও বৈদিকে বিবাদ আরম্ভ হইল। এই বিবাদে তোমাদের সমাজ ক্রমে অন্তঃসারবিহীন হইয়া পড়িল; যেখানে ঐক্যের দরকার, সেইখানে ঘরে ঘরে অনৈক্য হইল। শেষ বেদ, স্মৃতি, বুদ্ধ, জৈন, পুতুল, ব্রহ্ম সব দুরন্ত মুসলমানের হাতে পড়িল। তাহাতেই তোমাদের লজ্জা হইল কৈ? সমাজ-পরিবর্ত্তনের কটা চেষ্টা করিয়াছ? বলিলে কি না অদৃষ্টের ফল! রোমানেরাও সেকালে বলিয়াছিল অদৃষ্টের ফল। বড় সুবিধা। দু'বার বলিলে অদৃষ্টের ফল, দুটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলে—সব—সব দুঃখ ঘুচিয়া গেল, আপনাদের দোষ যে, তাহা একবারও ত ভাবিলে না।

যাহা হউক, আমাদের সমাজে সংস্কার কি বিপ্লব আবশ্যক, সে কথা তুলিয়া কাজ নাই। আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব এই যে, সমাজের কত প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। দেখা গেল যে, সে দুই প্রকার;—সংস্কার ও বিপ্লব। দুইএরই সময় আছে, কিন্তু সংস্কারের সময় বিপ্লব বা বিপ্লবের সময় সংস্কার হইলে হিতে বিপরীত হয়। তাহার ফল অতি ভয়ানক।

[বঙ্গদর্শন ৫ম বর্ষ—১২৮৪।

স্ত্রী-বিপ্লব

কয়েক মাস ধরিয়া দাম্পত্যদণ্ডবিধির অতি কঠিন দণ্ড ও নিয়ম সকল আমার উপর জারী হইতেছে—জরীমানা, বেত্রাঘাত, কারাবাস, দ্বীপান্তর, নির্জ্জন কারাবাস, সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত করণ, শেষ মৃত্যুপর্য্যন্তও বুঝি আমার অদৃষ্টে ঘটে! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি (দোহাই ধর্ম্মের যদি মিথ্যা বলি), আমার কোন অপরাধ নাই, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি রোজ ঠিক্ আটটার সময় হাজির থাকি, কখন উপার্জ্জনের এক পয়সা নিজখরচ বলিয়া লই না, জবা-বিবি রাত্রে না ঘুমাইলে ঘুমাই না, বাছিয়া বাছিয়া দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের বই হইতে সম্বোধন-পদ সংগ্রহ করি; তবুও আমার উপর এই সকল কঠিন আজ্ঞা! মনে করিলাম, পূর্ব্বজন্মে হয় ত কোনদিন পূজার সময়ের ঢাকাই সাড়ী মনোমত হয় নাই—অতএব প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিলাম। মিলের Subjection of women পড়িয়া শুনাইলাম, দাম্পত্য অত্যাচারের Passive obedience প্রিচ করিয়া এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিলাম। কলম পিষে খাই, সুতরাং বই পড়া বা লেখা ছাড়া অন্য প্রায়শ্চিত্ত জোগায় না। কিছুতেই পাপ গেল না। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভরত শিরোমণি, মহেশ ন্যায়রত্নের নিকট ব্যবস্থা লইয়া নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ক্রমেই কঠিন দণ্ড আজ্ঞা হইতে লাগিল। হাজার হোক্, পুরুষ বাচ্ছা—রোক্ একটু আছে। দাম্পত্যবীজক সমাজের উন্মূলন করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম। সেই দিনেই টাবাবেড়ে ওয়ার্লড এসোসিয়েশন নামে একটি সভা স্থাপন করিলাম (পাঠক হাসিবেন না, কলিকাতায় জন আষ্টেক লোক যদি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন করিতে পারে, তবে টাবাবেড়ে আমরা ওয়ার্লড এসোসিয়েশন কেন করিতে না পারিব? এখানেও ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস আছে, প্রাইমারী স্কুল আছে) প্রথম বক্তা আমি, আমার বিষয় স্ত্রী-দমন—স্ত্রীর উপর পুরুষের যে সহজ স্বত্ব ও দেশীয় আইনের স্বত্ব আছে, তাহার ব্যবহার করা, আর দাম্পত্য-দণ্ডবিধি উঠাইয়া দেওয়া। আমার বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই চারুবাবু—টাবাবেড়ের গ্লাডষ্টোন—আপনার স্ত্রীর গাঢ় আলিঙ্গনলাভ পুরস্কারের লোভে স্বজাতিবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, যত বিরুদ্ধ হইতে পারে, তত বিরুদ্ধ বক্তৃতা ছড়াইলেন। আমার এত বড় মানবমঙ্গল কার্য্যে একেবারে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিলেন। হতাশ্বাস হইয়া বাড়ী গেলাম। এত কাল নিরপরাধ ছিলাম,—আজ রাজবিদ্রোহ অপরাধ—ঝাঁটা লাথি প্রভৃতি পড়িতে লাগিল, বিব্রত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। নানা যন্ত্রণায় অনেক দেরিতে নিদ্রা আসিল। সে ত সুষুপ্তি নয়, স্বপ্নমাত্র। যে সকল স্বপ্ন, তাহার একটি দেখিলে আমি ত আমি, আমার চৌদ্দপুরুষের প্লীহা চমকাইয়া উঠিত। আমি ত সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—যদি সত্যি ঘরের মাথা কাটা যায়—দাম্পত্য-দণ্ডবিধি তবুও বরং ভাল; কিন্তু—বাবা! মেয়ে মানুষকে অপমান করা, তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করা কিছু নয়! উহাতে মহাপ্রলয় ঘটে। চোখের উপর দেখিলাম, ঘটিয়া গেল। কেমন করিয়া ঘটিল, তাহাও দেখিলাম।

একবার নিদ্রা আসিতেছে—আবার ভাঙ্গিতেছে, এই অবস্থায় একবার যেই চক্ষু মুদিয়াছি, অমনি বোধ হইল—স্ত্রী-বিপ্লব। দক্ষিণ-আমেরিকায় প্রাচীক্ষেত্রে একদিকে সমস্ত পুরুষ ও আর এক দিকে সমস্ত স্ত্রীলোক। স্ত্রী-শিবির সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ ফিট্-ফাট্, রসদ প্রস্তুত—রণসজ্জা প্রস্তুত—ঢাল-তলোয়ার আদি প্রস্তুত—সব প্রস্তুত! পুরুষদিগের শিবিরে সব গোলযোগ—কেহ কাঁদিতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে। দেখিলাম, ইংরাজ, বাঙ্গালী, ফরাসী, চীনে সব একত্র হয়েছে, আজ আর Black niger নাই। যেন কোন একটা ভীষণ বিপৎপাতে জগৎশুদ্ধ ভাই ভাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্লাড্‌ষ্টোন সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যেকে বলিতেছে—দাদা রক্ষা কর! কেহ বলিতেছে,—"কি হবে! কি হবে!!" কেহ বলিতেছে—"বাবা, ওদের নহিলে চলে না, কেন চটাচ্ছ?" কেহ বলিতেছে—"না হে না—বোঝ না, একটু গরম হওয়া চাই বৈ কি?" কেহ বলিতেছে,—"নাও, ওরা হ'ল আদ্যাশক্তি, ওদের কাছে আবার গরম!" কেহ বলিতেছে,—"মেয়েমানুষকে আমাদের উপর হইতে দিব না, উহারা নীচেই থাকবে।" এক জন বলিতেছে যুদ্ধ ত দশ জন বলিতেছে যুদ্ধ নয়—সন্ধি। যে কোন সর্ত্তে হয়, এখন মিট্‌লে বাঁচি। তখন বিসমার্ক চক্ষুর পাতা তুলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা—দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ—একটা সভা কর।" অমনি উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধির ধান্যপেষণ যন্ত্রের পাশে সবে মিলিয়া দাঁড়াইল। এমনি ভিড় হইল যে, সমস্ত বেলজিয়ানেরা চাপা পড়িয়া মরিয়া গেল। তখনি "রক্ষা কর—রক্ষা কর!" বাবা, যুদ্ধ নয়—সন্ধি কর, গিন্নী সব খাবার ঘরে নিয়ে গেছে, বাবা, পেটের জ্বালায় মলুম,—চারিদিক্ হইতে এ প্রকার ভয়ানক একটা গোল উঠিল। সে গোলে কান ঝালাপালা হইয়া উঠিল।

কেদারা-মনুষ্য (চেয়ারমেন) "নিয়ম নিয়ম" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। সভার নিয়মাবলীর চতুর্থ রুলের পঞ্চম পদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিছুই হইল না! শেষে অনেক বৃথা উদ্যমের পর বিনা তর্কে চীৎকারের চোটে স্থির হইল, সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাওয়া উচিত। স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিব, সিবিল সার্ব্বিস্, মিলিটারি সর্ব্বিস্, উকীলি, ডাক্তারি, চিহ্নিত কর্ম্ম, অচিহ্নিত কর্ম্ম, সব উহাদিগকে খুলিয়া দিব, নামের শেষে আকার বা দীর্ঘ ঈকার না থাকিলে রাজা, অমাত্য বা কাউনসিলের মেম্বর হইতে পারিবে না ইত্যাদি—

এই সন্ধিপত্র লইয়া যখন সার ফ্রান্সিস্ শূয়ার এম, ডি, মাদম লোরি বিদ্রোহিণীদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন, একটা হাসির ধূম পড়িয়া গেল—হা-হা-হা! এত দিন কি নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইতেছিলেন? এত দিন এরূপ সর্ত্তে রফা হইতে পারিত, এখন আর হয় না। আমরা আর বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারি না, এইবার আল্টিমেটাম পাঠাই, জবাব আসিলেই সন্ধি, নয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এই আমাদের শেষ কথা। পুরুষ জাতি যদি সার্ফ হয়, আমাদিগকে লর্ড বলিয়া মানে, আমাদিগের বাধ্য হয়, আমাদিগকে কখন বিরুক্তি না করে, আর সন্তান-প্রসবের সম্পূর্ণ ভার আপনারা গ্রহণ করে, তবেই সন্ধি হবে।

জবাব আসিল, আমরা সব হইতে পারি। দাস হইতে পারি, সার্ফ হইতে পারি, শ্লেভ হইতে পারি, কখনও অবাধ্য হইব না। কখনও উচ্চ কথা বলিব না, কুর্ণিস ব্যতিরেকে নিকটে পৌছিব না, গা টিপিয়া দিব, পায় হাত বুলাইব; কিন্তু যাহা স্বভাবের নিয়ম, তাহা কি প্রকারে ব্যতিক্রম করিব? পরমারাধ্যা পরমপূজনীয়া দেবীদিগের দুই বৎসরে তিনবার যে অসহ্য প্রসব-বেদনা সহ্য করিতে হয়, আমরা আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করিতাম, যদি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিত। অতএব কেবল ঐ এক সর্ত্ত ছাড়া আর সকল বিষয়েই আমরা স্বীকার।

তখন স্ত্রীলোক-মহলে যুদ্ধ-সভা আহ্বান করা হইল। শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বলিলেন—"আইস, আমরা আমাদিগের জাতিসিদ্ধ কটাক্ষ, ইঙ্গিত, অশ্রু প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা উহাদিগকে কায়দা করি।" তখন মিস্ হরিমতি বলিলেন,—"না না, আর কায়দা করিয়া কাজ নাই। কাছে থাকিলেই সন্তান প্রসব করিতে হইবে—সে বড় যন্ত্রণা।" তখন কেদারা-নারী—যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ফ্রেঞ্চ মাদমেরা অগ্রগামিনী পদাতিনী সাজিলেন। ইংরাজ মিসেরা অশ্বারোহিণী হইলেন। জার্ম্মাণীরা তোপখানার অধিষ্ঠাত্রী হইলেন। ইতালীয়ারা পটি ও মলম লইয়া সৈন্যগণের পশ্চাৎ চলিলেন। মুসলমানীরা তাম্বুরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। হিন্দুনীরা দলের পশ্চাদ্ভাগে রসদ যোগাইতে লাগিলেন। চীনানীরা আবগারি মহলের কর্ত্তৃত্বকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। ব্রাহ্মিকারা মৃত পুরুষ, আর আমেরিকানীরা মৃত-নারী সমাহিত করিবার নিমিত্ত ভার পাইতে প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মিকাদের প্রার্থনা না-মঞ্জুর হইল। কারণ, কয়েক মাস অবধি দৃষ্ট হইতেছিল, উহারা অন্তরে অন্তরে শত্রুর সহিত যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছে। হুকুম হইল, উহারা হিন্দুনীদিগের সহিত সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে থাকুক। হিন্দুনীরা যেন উহাদের উপর নজর রাখে। ইতি উদ্যোগপর্ব্ব।

তখন সমস্ত উদ্যোগ হইলে পর ফৌজ কুচ করিবার হুকুম হইল। ফরাসিনীগণ বিদ্যুদ্বেগে প্রবল বাত্যার ন্যায় পুরুষ-সৈন্য ভেদ করিয়া একেবারে তাহাদিগের ছাউনী দখল করিল। পুরুষগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। শত শত শ্মশ্রুশোভিত আস্ফালিত-গুম্ফ হুঙ্কারগর্ভ আরক্তলোচন দষ্টাধর আলোলিতকেশ অর্থাৎ টেরিশূন্য মস্তকে ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। শোণিতপ্রবাহে নদী বহিতে লাগিল। বৃটানীরা পিশাচিনীর ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই রক্তকর্দ্দমে ঝাঁপ দিয়া প্রলয়কাণ্ড বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তখন অবশিষ্ট পুরুষেরা একত্রিত হইয়া নারীপূজা করিতে আরম্ভ করিল। স্তূপাকৃতি ধূপধুনা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। পুষ্পচন্দন গন্ধ ইকয়েটেরিয়ান মারুতে প্রতাড়িত হইয়া কেন্দ্রপ্রবাহে (Polarcurrent) আনীত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিল। নৈবেদ্যের আয়োজনের কথা অনির্ব্বচনীয়! পাঠক মহাশয়েরা কল্পনাবলে যতদূর পারেন মনে করিয়া লউন। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধিতায় পেটুকচূড়ামণি, জিহ্বাগ্রে লালা সম্বরণ করিয়া সে বর্ণন আমার সাধ্যাতীত। পুরুষেরা নারীদিগের স্তব আরম্ভ করিয়াছে। কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি ত আছেই, তাহার উপর হারমোনিয়ম, পিয়নো, এসরাজ্ প্রভৃতিও বাজিতেছে। ভুলিয়াছিলাম, এই সকল পুরুষেরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া অরিনকো সমতল ক্ষেত্রে নারীপূজা আরম্ভ করিয়াছে। নারীগণ জয়লাভ করিয়া প্রাচিক্ষেত্র ত্যাগ করত উহাদিগের অন্বেষণ করিতেছিল। শেষ যখন অরিনকোক্ষেত্রে উপস্থিত, ধূপধুনা নৈবেদ্যের

আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইল। এক জন আর এক জনকে বলিল—"এ কেমন যুদ্ধ লো!" অমনি শুনিতে পাইল, পুরুষেরা স্তব করিতেছে—তাহার ধ্বনি সমস্ত বাদ্যযন্ত্র-ধ্বনি অতিক্রম করিয়া উঠিতেছে—তাহা ভক্তিভাবে পূর্ণ, স্নেহপ্রবাহ ও প্রেমঘর্ঘর।

সে স্তব এই—হে তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতীং শুভ্রকান্তিং স্তনভারনমিতাঙ্গী রমণীগণ! হে ঘনপীনপয়োধরাভাবনতে রমণীমণ্ডলী! আমরা অপরাধ করিয়াছি। হে মন্মথচুতমঞ্জরীশ্রবণায়তচারুলোচনে সীমন্তিনি! আমাদিগকে মার্জ্জনা কর! হে বরাভয়দাত্রি! আমাদিগকে বর ও অভয় দাও! শুনিয়াছি, যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি। কিন্তু হে চারুভাষিণি! মধুরভাষিণী সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে! শিবে! সর্ব্বার্থসাধিকে! শরণ্যে! আমরা শরণাগত, আমাদিগের প্রতি কেন কঠিন হও? হে গৌরবর্ণে স্বরূপে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতে আমরা ভীত হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় প্রদান কর।

যখন উহারা স্তবের শেষ পদ পাঠ করিতেছিল, তখন একটা বিড়ালাক্ষী, উন্নতঘোণা, বিকটবদনা, রৌদ্রদগ্ধবরণা ফরাসিনী মার্সেলানী উহাদিগের সম্মুখে। তাহার গায়ে একখানিও অলঙ্কার নাই, পুরাতন ছিন্ন বসনে যুদ্ধের রক্ত-কর্দ্দম জমাট হইয়া রহিয়াছে। সে ভাবিল বুঝি, তাহারই জন্য পূজার আয়োজন হইয়া রহিয়াছে। ইহারা বুঝি তাহাকেই গৌরবর্ণা, স্বরূপা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা বলিয়া আহ্বান করিতেছে। ভাবিয়া, সে মাগী পুরুষদিগের দলে ঢুকিল, এবং জাতীয়স্বভাবসুলভ সৌজন্য সহকারে তাহাদের সহিত (শত্রু হইলেও) কথা কহিতে লাগিল। বলিল,—"শুদ্ধ আমায় পূজা করিলে কি হইবে? তোমরা প্রসবের ভার গ্রহণ কর, আমরা সন্ধি করি।"

দূর হইতে মিস্ হরিমতি দেখিল, একটা মার্সেলানী পুরুষের দলে ঢুকিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সদলবলে আসিয়া অগ্রেই বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া সে হতভাগিনীর শিরশ্ছেদ করিল। তখন পুরুষগণ "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া হরিমতির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। হরিমতি বলিল,—"পাপিষ্ঠগণ, এখনও আমাদের সাম্য দিতে রাজি নহিস্, এখনও প্রসবের কষ্ট আমাদের দিতে চাস্, আবার পায়ে পড়িলে দয়া করিব?"—যেমন এই কথা বলা, তেমনি অসি-আস্ফালন। শত শত পুরুষ সে অসির প্রচণ্ড আঘাতে শমনসদনে প্রেরিত হইল। অবশিষ্টগণ প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া পানামা যোজক পার হইয়া পড়িল। হরিমতিও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, সমস্ত দল সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ ধাবমানা! স্ত্রীসৈন্য পানামা পঁহুছিয়া দেখিল, খোজারা পথ আটকাইয়াছে। তাহারা কানষ্টান্টিনোপলে বসিয়া দেখিল, সব স্ত্রী-পুরুষ লড়াই করিতে চলিয়া গেল, তাহারা নিরাশ্রয় ভাবিয়া নৌকা ও জাহাজে চড়িয়া পৃথিবীময় খুঁজিয়া বেড়াইল। শেষ পানামা যোজকে আজ বিজয়িনী হরিমতির সাক্ষাৎ পাইল। উহারা সমস্ত অবগত হইয়া হরিমতিকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিল। সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া হরিমতি একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। খোজারা সুলতানের বালাখানার তৈয়ারী বিন্দু বিন্দু তৈল দিয়া হরিমতির লাঙ্গুলে স্থূলত্ব সম্পাদন করিয়া দিল। তখন হরিমতি বলিল—"আচ্ছা, তোমাদের অনুরোধে ৫০ বৎসরের জন্য Truce করিব। বিষুবরেখার উত্তরে পুরুষ আর দক্ষিণে মেয়েমানুষ থাকিবে। মধ্যে বিষুব-রেখায় খোজারা গার্ড থাকিবে। কোনও পুরুষ কোন মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতে আসিলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।"

আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ!! ৫০ বৎসর স্ত্রীপুরুষে মুখ দেখাদেখি থাকিবে না!—আমার বুক দুড় দুড় করিতে লাগিল। স্বপ্ন—না সত্য? বিবেচনা করিয়া দেখিলাম—স্বপ্ন। সত্য নয়—স্বপ্ন বটে! প্রাণ একটু স্থির হইল। কতকক্ষণ পরে আবার ঘুম আসিল। আবার স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, ৫০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, খোজারা সব মরিয়া গিয়াছে, কেবল জন আষ্টেক স্ত্রীলোক, আর জন সাতেক পুরুষ আছে—পৃথিবী বনে পূর্ণ হইয়াছে, একমাত্র হরিমতি অশ্বারোহণে বিষুবরেখায় ঘুরিয়া গার্ড দিতেছে। ঘুম ভাঙ্গিল। প্রলয় আর কাহাকে বলে? রমণীকুল কোমলা, অবলা, সরলা কুলবালা বটে, কিন্তু বিশ্বাস নাই—একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই প্রলয় সেই মুহূর্ত্তে। কেমন করিয়া সে প্রলয় সংঘটিত করিয়া থাকেন, তাহাও সে দিন স্বপ্নাবস্থায় দেখিলাম। তার পর জাগ্রতাবস্থায়ও অনেক দিন অনেক গৃহে সে প্রলয়ঙ্করী রণরঙ্গিণীমূর্ত্তি দেখিয়াছি। দেখিয়া জ্ঞান হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রাণ গেলেও আর কখনও খোঁপাধারিণীর অবাধ্য হইব না। পাঠকবর্গও সাবধান!

[কল্পনা—১ম বর্ষ—১২৮৭।

তৈলদান

তৈল যে কি পদার্থ, তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ। বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে, তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে?

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্ব্বশক্তিমান্; যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্ব্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে, সে সর্ব্বশক্তিমান্। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা। তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকীলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না, বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে, তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্ল্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গবর্ণর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ। তৈল নহিলে জগতের কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্ব্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্ত্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম ভক্তি; যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম প্রণয়; যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম মৈত্রী; যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য "ফিলনথ পি"। যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম লয়েলটি; যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি। চাকর বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্ত্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়। সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এই জন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্ব্বি দিয়া থাকে। এই জন্যই যখন দুই জনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত, তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা-পুত্রে স্বামি-স্ত্রীতে রাজায়-প্রজায় বিবাদ বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, যে তৈল দিতে পারে, সে সর্ব্বশক্তিমান, কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্য্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্ত্তিমান্।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্য্যন্ত তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে, নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কার্য্য আদায় করিতে হইবে, সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র। সময়—যে সময়েই হউক, তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্তসময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যেরূপেই হউক, তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না, তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্য্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট ১।০ পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না, এক জন ইংরাজীওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে পঁচিশ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া এক বিন্দু দিলে যত কার্য্য হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে, তাহাতে যে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে, তাহার তৈল আমার তৈল হইতে মূল্যবান্। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে, তাহার আরও মূল্যবান্। তাহার উপর যদি ধন থাকে, তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর, বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাক্‌টিকল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে, তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার। অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, বাছিয়া বাছিয়া কোন রায় বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহ-নিষেকের কালেজ খোলা হয়। অন্ততঃ উকীলি শিক্ষার নিমিত্ত ঐ কালেজে এক জন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে, আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার। এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেক্‌চার পাওয়া যায় না। যদিও কোন রীতিমত কালেজ নাই, তথাপি যাঁহার নিকট চাকরীর বা প্রমোশনের শুপারিস মিলে, তাদৃশ লোকের বাড়ী সদাসর্ব্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা তৈল—বাঙ্গালীর যে কেহ কিছু করিয়াছেন, সকলই তৈলের জোরে, বাঙ্গালীদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়; এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃ-পুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড় লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে, ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এ দেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়া আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের শুরু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষে মনে রাখা উচিত, এক তৈলে চাকাও ঘোরে আর তৈলে মনও ফেরে।

[বঙ্গদর্শন ৫ম বর্ষ—১২৮৫ চৈত্র।

মোহিনী

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই প্রণীত

খণ্ড-কাব্য

মোহিনী—মোহিনী মম জীবন-তোষিণী,
মায়ামোহজালে মোরে ঘেরেছ মোহিনী !
আপনা বিস্মৃত হয়ে তব রূপ চিত্র লয়ে
ওই ধ্যান ওই জ্ঞান দিবসরজনী।

একাকী রয়েছি যেন মায়ার কানন,
গাঢ় ইন্দ্রজালে যেন ভুবন মগন !
জগত মোহিনীময় মোহিনীই সমুদয়
মোহিনী মোহিনী মোহি'—নাহি অন্যমন।

আকাশে মোহিনী হেরি—হেরি নদীতটে,
সর্ব্বত্র মোহিনী যেন আঁকা চিত্রপটে ;
যে দিকে নয়ন যায়, মোহিনী দেখিতে পায়,
যা দেখি মোহিনী—হায়, মোহিনীই বটে।

বিধি যেন মোর তরে কত কাল তপ করে
ভাঙ্গিয়া জগত আহা মোহিনীতে গড়েছে,
তাই ত মোহিনীময় এ জগত হ'য়েছে।

কোথা যাও, কোথা যাও, শুন লো মোহিনী
চাঁদের আড়ালে কেন লুকাও সজনি ?
মোহিনী হৃদয়ে রেখে, সর্ব্বাঙ্গে মোহিনী মেখে,
তাই কি চাঁদের আলো ছড়ায় মোহিনী ?

৬

বিদ্যুৎবরণী বামা বিদ্যুৎ অধরে
নয়নে বিদ্যুৎ খেলে বিদ্যুৎ অম্বরে
ছড়াইয়ে রূপরাশি দশদিক্ পরকাশি
হাসি হাসি ভাসি যায় নয়ন-উপরে।

৭

স্থির সৌদামিনী ধনী বরণে তাহার
গমনে—অধরে নেত্রে চঞ্চলা বাহার।
এই আসে এই যায় এই আসে পুনরায়
চঞ্চলা চপলা যেন করিছে বিহার।

৮

চপলা প্রকাশি ডুবে, আর না প্রকাশে,
করাল নীলিম মেঘ তাহারে গরাসে ;
মোরে মোহি'—সৌদামিনী ক্রত শতরূপা জিনি
পুনঃ আসে পুনঃ যায় হৃদয়-আকাশে।

দুর্ভাগ্য যখন ছিল কত কিই ভেবেছি
সংসারের সুখ আশে কতবার ভেসেছি,
নিজে সুখী হব ব'লে মনে আছে কত স্থলে
অস্থিচর্ম্ম ভেদি কত যাতনাই পেয়েছি।

১০

মোহিনী রে, তোর তরে সকলি যে ছেড়েছি,
অপর ভাবনা যত উপাড়িয়া ফেলেছি।
বিধাতা কি শুভক্ষণে মিলাইল তোর সনে
তুমিময়-মোহিময় তদবধি হয়েছি।

১১

ছেড়েছি ছেড়েছি যত পুরাতন ভাবনা,
তুমি বিনে বর্ত্তমানে আর কিছু ভাবি না,
তুমি আমি এক হয়ে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে
থাকিব অনন্ত কাল এই সুধু কামনা।
তুমি বিনে বর্ত্তমানে আর কিছু চাহি না।

১২

মোহিনী মোহিনী মোর হৃদয়ের তোষিণী
প্রেম মোহ মায়া সুখে বিকশিছ পরাণী।
শুনেছে সুখের গান প্রেমে মত্ত মন প্রাণ
"সুখময় প্রেমময় মোহময় মোহিনী!"

১৩

যেন এক সুরাধারা সুধাভাণ্ড হইতে
অজস্র মৃদুলধারে লাগিয়াছে বহিতে,
পড়িয়া হৃদয়'পরে সর্ব্বাঙ্গ অবশ ক'রে
প্রতি লোমকূপ যেন ভরিতেছে অমৃতে।

১৪

বিকল নয়ন মরি কিছু নাহি দেখিছে,
অবশ শ্রবণ হায় কিছু নাহি শুনিছে,
স্পর্শন রসন নাসা ত্যাজিয়াছে সব আশা,
হৃদয় সুধুই মাত্র বিকশিত হইছে।

১৫

হৃদয়কমল পূর্ণ বিকশিত হয়েছে,
লক্ষ লক্ষ দল যেন রূপ ফেটে পড়েছে।
কোমলতা চমৎকার মরি মরি কি বাহার,
সুখের সাগরে যেন ঢলি ঢলি পড়িছে।

১৬

হৃদয়ের কাজ যত হৃদয় তা তেজেছে
বুদ্ধি দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ নির্ব্বাসিত হয়েছে;
যতন গিয়েছে তার সুখ সুধু নির্ব্বিকার
প্রবৃত্তি তাহার মাত্র মোহিনীতে রয়েছে।

১৭

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাখা হৃদিপদ্ম ঢাকিছে
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সুখে মোহিনীতে ভরিছে।
হৃদয় মোহিনীময় মোহিনীই সমুদয়
সুধাধারা মোহিনীরে বারে বারে ঢালিছে।

১৮

প্রেমে সুখে মোহে আর, মোহিনীতে মজিয়ে
গাঢ় যোগনিদ্রাগত, স্পন্দহীন হইয়ে
থাক থাক হৃদ্ আমার—সুধাধারা শতধার
অনন্ত অমৃতহ্রদে বায়ুকরে ডুবায়ে
প্রেমে সুখে মোহে আর মোহিনীতে মজায়ে।

[কল্পনা—৯ম বর্ষ ১২৮৭।